বর্ধমান চর্চা

দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ৩০ নভেম্বর, ২০০০

পরিবেশনা ঃ দে বুক স্টোর
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলি - ৭৩

মুদ্রণে ঃ সুমুদ্রণ এন্টারপ্রাইজ
১০৫, জি.টি.রোড, বর্ধমান

প্রচ্ছদের ছবি ঃ কাটোয়া ২ নং ব্লকের শ্রীবাটি গ্রামের চন্দ্রোদয় মন্দিরের টেরাকোটার কাজ।
ছবি ঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচী

সম্পাদক মণ্ডলীর পক্ষে

১৯৮৯ সালে প্রথম 'বর্ধমান অভিযান গোষ্ঠী'র তত্ত্বাবধানে 'বর্ধমান চর্চা'র শুরু। দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালে। একটা জেলার সামগ্রিক অভিনিবেশই এই চর্চার মূল উদ্দেশ্য। ইতিপূর্বে এই গোষ্ঠীর অনেক সদস্যই ১৯৭৩ সালে 'উদয় অভিযান' পত্রিকার 'বর্ধমান সংখ্যা'র সঙ্গে জড়িত ছিলেন। সে সময় নারায়ণ চৌধুরী ও অনুকূল চন্দ্র সেন মহাশয়ের 'বর্ধমান পরিচিতি' বাজারে অপ্রতুল, আজকের মত বর্ধমান বিষয়ক এত গ্রন্থও প্রকাশিত হয় নি। ক্রমে পত্রিকা গোষ্ঠীর কয়েকজন তরুণ লেখক, কিছু বিদগ্ধ ব্যক্তির সহায়তায় প্রকাশ করেন বর্ধমান বিষয়ক পরপর দুটি গবেষণা গ্রন্থ বর্ধমান চর্চা, বর্ধমান চর্চা -২। যে কাজ আমাদের গোষ্ঠী শুরু করে তা পরবর্তীকালে বহু মানুষের ব্যক্তিগত প্রয়াসে পরিপুষ্টি লাভ করে। এখন বর্ধমান সংক্রান্ত বই বেশ কয়েকটি আছে।

যাইহোক আমরাও থেমে থাকিনি, চর্চা চলতেই থাকে। শুরু হয় বর্ধমান অভিযান গোষ্ঠী ও সহযোগী প্রতিষ্ঠান 'বর্ধমান সমাচার' পত্রিকার যৌথ উদ্যোগে 'অভিযান সংস্কৃতি মঞ্চ', 'শনি সন্ধ্যা বক্তৃতা'। বহু প্রতিভাবান ব্যক্তি, তরুণ গবেষক গবেষিকা এখানে আমন্ত্রিত হন। শুরু হয় সৃজনশীল কাজের নিয়মিত চর্চা। বর্ধমান বইমেলার মঞ্চটিও এইসব কাজে ব্যবহার করা হয়। 'উদয় অভিযান' বন্ধ হয়ে গেলেও 'অভিযান সাময়িকী' পত্রিকাটি এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সম্প্রতি আমাদের কাজের সহযোগিতায় ভারত সরকারের মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক এগিয়ে আসেন। বর্তমান পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ 'বর্ধমান চর্চা'র বিশাল ব্যয়ভার বহনে তাঁদেরও কিছু অবদান আছে। সামান্য কিছু লেখক গবেষকের পরিবর্তন ছাড়া এবারেও 'অভিযান গোষ্ঠী'র সদস্যরাই মূলতঃ এই কাজে ব্রতী হয়েছেন। পাওয়া গেছে পূর্ব কথিত বিদগ্ধ কিছু মানুষের আন্তরিক সহযোগিতা। এতদসত্ত্বেও বলতে বাধা নেই 'বর্ধমান চর্চা'র শুরু যাঁর প্রেরণায়, তিনি এবার ব্যক্তিগত কারণে সম্পাদনার দায়িত্ব নিতে পারেন নি। স্বাভাবিকভাবেই গোষ্ঠীর সম্পাদক হিসেবে আমার উপর বইটির সম্পাদনার দায়িত্ব এসে পড়ে। বলতে বাধা নেই আমার ভূমিকা ব্যবস্থাপনার বাইরে আর কিছুই নয়। সেবার সম্পাদক শ্যামাপ্রসাদ কুণ্ডু ছিলেন একাই একশো, এবার যথার্থই গোষ্ঠীর বই, সকলের যৌথ প্রয়াস। লেখকরা তাঁদের যোগ্যতা অনুযায়ী লিখেছেন আর তাঁদের সহযোগিতা করেছেন এই প্রকল্পের দুই গবেষণা কর্মী, প্রথম জন কামাক্ষ্যাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও দ্বিতীয় জন তরুণ সংস্কৃতি কর্মী অজয় কোনার। শ্রী কোনারের পরিশ্রমের তুলনা নেই। এই নিরলস সহকর্মীর সহযোগিতা ছাড়া নতুন ভাবে 'বর্ধমান চর্চা' প্রকাশ করা গোষ্ঠীর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

বইটি প্রকাশে বহু মানুষের প্রতি আমরা ঋণী। সরকারী আমলা থেকে এই বইয়ে লিখেছেন এমন গবেষক, শিক্ষক, সংস্কৃতিপ্রেমী বহু বহু জন। যাঁরা লেখার ব্যাপারে কথা

দিয়েও দিতে পারেন নি তাঁদের প্রতি আমাদের কোন ক্ষোভ নেই, থাকবে শুধু ভবিষ্যতে লেখা দেওয়ার অনুরোধ। বেশ কিছু লেখকের লেখা এই সংস্করণে না দেওয়ার কৈফিয়ৎ হিসেবে বলতে পারি কোন না কোন কারণে যাঁদের লেখা সময়ানুগ করা সম্ভব হয়নি তাঁদের লেখা এই সংস্করণে দেওয়া সম্ভব হল না। পরিবর্তে নতুন ভাবে নতুন গবেষকদের দিয়ে লিখিয়ে নেবার চেষ্টা হয়েছে। এখন সবটাই পাঠকের বিচার। চর্চা থেমে থাকতে পারে না, শব্দটির মধ্যেই চলার সংকেত, চর্চা নিরবধি, চলতে থাকুক, এও এক অভিযান, জার্নি অনওয়ার্ড।

সমীরণ চৌধুরী

প্রধান সম্পাদক

গবেষণা প্রতিবেদন

নব কলেবরে বর্ধমান চর্চা সাতাশটি প্রবন্ধের সমাহার হলেও এটি ঠিক প্রবন্ধ সংকলন নয়। ভারত সরকারের মানব সম্পদ মন্ত্রকের অধীনে ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ইণ্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ সংস্থায় যে রূপরেখা পাঠানো হয়েছিল, সেইমত বর্ধমান জেলার বিভিন্ন দিকে যাঁরা গবেষণা করছেন, তাঁদের কাছেই সেই সেই বিষয়ে আমরা লেখা চেয়েছিলাম। দীর্ঘদিন ধরে শনি সন্ধ্যা বক্তৃতার মাধ্যমে যেসব গবেষণালব্ধ ফল বর্ধমান অভিযান গোষ্ঠীর কাছে সঞ্চিত হয়েছে এবং বিভিন্ন বিষয়ে নিজেদের করা ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে যেসব তথ্য এসেছে আমাদের হাতে, লেখকদের লেখাতেও অনেকাংশেই তার প্রতিফলন আছে। চেষ্টা করেও কেউ কেউ লেখা দিতে পারেন নি। কেউ কেউ আমরা ঠিক যা চাইছি, তার পুরোটা লেখায় আলোচনা করে উঠতে পারেন নি, আবার কেউ কেউ যা আমরা চেয়েছি, তার প্রতিটি দাবী পূরণ করেছেন তো নিশ্চয়ই, বেশীই দিয়েছেন। সবার প্রতিই আমরা কৃতজ্ঞ কারণ সকলেই ছিলেন আন্তরিক। এই কাজ করতে গিয়ে যেসব মূল্যবান পরামর্শ অভিজ্ঞ এবং বিদগ্ধ জনেদের কাছ থেকে পেয়েছি, তাও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করে কাজে লাগিয়েছি আমরা।

আমাদের প্রাথমিক পরিকল্পনা ছিল চারশ পাতার মধ্যে বইটির পরিসর সীমাবদ্ধ রাখব, কিন্তু ছাপার কাজ করতে গিয়ে দেখা গেল সাড়ে ছয়শ পাতা ছাড়িয়ে গেল। তবুও বলা উচিত বহু বিষয় যেমন স্পর্শ করা হল না, তেমনই কিছু বিষয়ে মাত্র স্পর্শ করাই হল – যা আরো বিস্তারিত লেখা হলে কৌতুহলী পাঠক এবং গবেষকদের ভালো লাগত। একবছর মেয়াদী গবেষণা প্রকল্পে এর বেশী সম্ভব হল না।

পরিশিষ্টের চারটি অংশ গবেষক এবং কৌতুহলী পাঠকদের কথা ভেবে দেওয়া হল, যা অনেকের কাজে লাগবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

এই বইয়ে কয়েকটি বিষয় অবশ্যই থাকা উচিত ছিল অথচ নেই, সেই বিষয়গুলি এই প্রতিবেদনে যতটুকু সম্ভব সংক্ষেপে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি।

আলোকচিত্র দিয়ে সাহায্য করেছেন অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনির্মল দাস, জ্যোতিরিন্দ্র নারায়ণ লাহিড়ি। ভরতপুর স্তূপের ছবিটি আমরা সংগ্রহ করেছি আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়া থেকে।

অজয় কোনার
গবেষণা কর্মীদ্বয়ের পক্ষে

।। এক ।।

বর্ধমান জেলায় মহকুমা পাঁচটি - বর্ধমান সদর(উত্তর ও দক্ষিণ), কাটোয়া, কালনা, দুর্গাপুর ও আসানসোল। সদর মহকুমা সম্পর্কে আলাদা আলোচনা করা হয়নি মহকুমা অধ্যায়ে কারণ সব লেখাতেই সদর মহকুমা প্রসঙ্গে আলোচনা আছেই।

জেলার মোট একত্রিশটি ব্লকের মধ্যে সদর মহকুমাতে আছে এগারোটি ব্লক - বর্ধমান, ভাতার, গলসী-২, আউসগ্রাম-১, আউসগ্রাম-২, জামালপুর, মেমারী-১, মেমারী-২, খণ্ডঘোষ, রায়না-১, রায়না-২। প্রথম পাঁচটি ব্লক নিয়ে হয়েছে বর্ধমান সদর উত্তর এবং বাকী ছয়টি ব্লক নিয়ে বর্ধমান সদর দক্ষিণ। দুটি ভাগেরই সদর দফতর বর্ধমান শহর।

।। দুই ।।

প্রাচীন রাঢ়ভূমির কেন্দ্রস্থল বর্ধমান। প্রাচীনকালে এই অঞ্চল পরিচিত ছিল সুহ্মভূমি হিসাবে। পরবর্তীকালে এই অঞ্চল পরিচিত হয় বর্ধমানভুক্তি হিসাবে - যার সীমারেখা ছিল উত্তরে অজয় নদ, দক্ষিণে দামোদর, মতান্তরে পূর্ব ও দক্ষিণে গঙ্গা, পশ্চিমে অরণ্যপ্রদেশ। যার পরিচয় পাওয়া যায় বিজয়সেনের মল্লসারুল লিপিতে। আইন-ই-আকবরীতে বর্ধমান মহলের উল্লেখ আছে। যার অন্য নাম সরকার সরিফাবাদ। ১৭১৭ খৃষ্টাব্দের পর মুর্শিদকুলি খাঁ-র আমলে সরকার সরিফাবাদ, সেলিমাবাদ ও মান্দারণের বড় অংশ এবং সরকার সাতগাঁওয়ের কিছু অংশ নিয়ে তৈরী হয় চাকলা বর্ধমান। বর্ধমান রাজ তখন কীর্তিচন্দ। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে শাসনের সুবিধার জন্য ইংরেজরা হুগলী এবং হাওড়া জেলাকে বর্ধমান থেকে আলাদা করে। তেজচন্দ এ সময় বর্ধমানরাজ।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের সভ্যতার নিদর্শন বর্ধমান জেলার বাইরে পশ্চিমবঙ্গের অন্য কোথাও পাওয়া যায় নি। বীরভানপুর, ভরতপুর, পাণ্ডুরাজার ঢিবি, মঙ্গলকোট, বাণেশ্বরডাঙ্গা ইত্যাদি প্রত্নক্ষেত্রগুলির যথাযথ খনন এবং অনুসন্ধান আজও হয়নি। তবু যেটুকু কাজ হয়েছে তাতে ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন এখানকার সভ্যতা ফিলিস্টিন ও হিট্রিয় সভ্যতার সমগোত্রীয় অর্থাৎ চার হাজার বছরের।

বর্ধমানের ইতিহাস বলতে শুধুমাত্র এখানকার জনজীবনের ইতিহাসই আমরা ধরছি। কিন্তু এই অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন। ভূ-তত্ত্বের প্রাথমিক জ্ঞান হিসাবে সবাই জানেন - ভূ-ত্বক, তার মহাদেশ এবং মহাসমুদ্রগুলিকে নিয়ে কয়েকটি টেকটোনিক প্লেটের উপর অবস্থিত, যে প্লেটগুলি গলিত ম্যাগমার স্তরের উপরে ভাসমান। পৃথিবীর গতির জন্য এই প্লেটগুলি সঞ্চারমান। একটা সময়ে পৃথিবীর সমস্ত ভূ-খণ্ড একই সঙ্গে ছিল, যার নাম Pansea, পরে এই ভূ-খণ্ড দুটি ভাগে ভেঙে যায়। পঁচিশ কোটি বছর আগে উত্তরে তখন আঙ্গারাল্যাণ্ড, বর্তমান এশিয়া এবং ইউরোপ ছিল যার অংশ এবং দক্ষিণে ছিল গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, কুমেরু এবং ভারতীয়

উপমহাদেশ ছিল যার অংশ। দুইয়ের মধ্যে ছিল টেথিস সমুদ্র। এই গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভারতীয় উপমহাদেশ টেকটোনিক প্লেটের ভেলায় চেপে এশিয়ার দক্ষিণ দিকে এসে ধাক্কা মারে প্রায় সাড়ে ছয় কোটি বছর আগে। সেই প্রবল ধাক্কার ফলে ক্রমে সৃষ্টি হয় আজকের হিমালয়। ভারতীয় উপমহাদেশ এখনো উত্তর-পূর্ব দিকে সরছে। ফলে হিমালয়ের উচ্চতা বাড়ছে। এই পটপরিবর্তন প্রসঙ্গে মোটামুটি আলোকপাত করেছেন বিকাশ রায় তাঁর লেখায়। তবে একটা ছোট্ট কথা এখানে বললে অতিকথনের ভয় নেই, তাহ'ল দামোদর নদ প্রসঙ্গ। ঘনরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গলে বলা হয়েছে, 'আদ্যের গঙ্গা দামোদর।' বাস্তবিক বর্ধমানবাসীর সঙ্গে দামোদরের সম্পর্ক ভালোবাসা এবং ঘৃণা মিশ্রিত। দামোদর যেমন অতীতে তার প্রলয়ঙ্করী বন্যায় ভাসিয়েছে বারবার, তেমনই দিয়েছেও অনেক। সুদূর অতীতে বর্ধমানের মানুষ পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্য ভূ-খণ্ডে নৌ-বাণিজ্য চালিয়েছে একদিকে অজয় অন্যদিকে দামোদর বেয়েই। বাংলাদেশে এই দামোদর ভাগীরথীর চেয়ে অনেক পুরোনো নদী। দামোদর যে যুগে সরাসরি বঙ্গোপসাগরে পড়ত, তখন গঙ্গার মোহানা ছিল রাজমহলের কাছে। পরবর্তী বহু শতাব্দীতে গঙ্গা পূর্ববাহিনী হয়ে ব্রহ্মপুত্রে মিশত। আজকের ভাগীরথী সে তুলনায় অনেক নতুন খাত। যখন দামোদর আগে যশোহরের কাছে সমুদ্রে গিয়ে পড়ত। গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের বয়সও দশ হাজার বছরের বেশী নয়।

অনেক পরবর্তীকালে ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে ভ্যান ডেন ব্রোকের মানচিত্র অনুযায়ী রাজমহলের দক্ষিণে গঙ্গার তিনটি দক্ষিণ বাহিনী শাখা বর্তমান গঙ্গাসাগরের কাছে সমুদ্রে পড়ত। মাত্র একশ বছর পরে রেনেলের আঁকা মানচিত্রে এই তিনটি শাখা-সরস্বতী, ভাগীরথী এবং যমুনা মিশে একটিমাত্র নদী ভাগীরথীতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু দুটো মানচিত্রেই গঙ্গার একটা বড় ধারা পদ্মার খাতে বইছে দেখা যায়। ভাগীরথীর চেয়ে সরস্বতী নদীই আগে বড় ধারা ছিল, যেটি তমলুকের কাছে সমুদ্রে মিশত। এই খাতেই রূপনারায়ণ, দামোদর ইত্যাদি নদী এসে পড়ত। গঙ্গার এই দক্ষিণ বাহিনী ধারা বা ধারাগুলিই মুখ্য ছিল। পদ্মার ধারা প্রধান ধারা হয়েছে মাত্র পাঁচ থেকে ছয়শো বছর আগে।

।। তিন ।।

এখানকার মানুষদের ইতিহাস কতটা পুরোনো? এ প্রসঙ্গে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি বিভিন্ন ঐতিহাসিকের গ্রন্থ থেকে পাওয়া তথ্যকে বিহঙ্গদৃষ্টিতে একবার দেখব।

১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলার কুনকুনে গ্রাম থেকে ভিনসেন্ট বল একটি হরিতাভ প্রস্তরনির্মিত কুঠারফলক আবিষ্কার করেন। একই সময়ে বোকারো কয়লাখনিতে আর একটি কুঠার ফলক আবিষ্কৃত হয়। দু'বছর পর ঝরিয়া কয়লাখনিতে আরও একটি কুঠার ফলক পাওয়া গিয়েছিল। ভ্যালেন্টাইন বল ভারতের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া অস্ত্রের সঙ্গে এগুলির তুলনা করে দেখিয়েছিলেন এগুলির মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য আছে। এবং

তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল দাক্ষিণাত্যের আদিম মানবদের সঙ্গে উত্তরভারতের আদিম মানবদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। প্রত্নপ্রস্তর যুগে এইসব প্রাচীন অস্ত্র দাক্ষিণাত্য থেকে উত্তর-পূর্ব ভারতে আনা হয়েছিল।

প্রস্তরযুগের সবচেয়ে প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া গেছে শুশুনিয়া পাহাড়ে। আবিষ্কারক পরেশচন্দ্র দাশগুপ্তের মতে যা প্রায় এক লক্ষ বছরের প্রাচীন মানবের সাক্ষ্য। অজয় উপত্যকায় সাতকাহুনিয়ার অরণ্য এবং বনমাটির ক্ষয়িষ্ণু প্রান্তর এককালে প্রত্ন প্রস্তরযুগের মানবের অশ্মীভূত কাঠ এবং শঙ্ক ও আয়ুধ নির্মাণের ক্ষেত্র ছিল।

অজয় দামোদর উপত্যকায় পাওয়া তাম্রযুগের সভ্যতা সম্পর্কে ভারতীয় পুরাতত্ব বিভাগের মতে - "In Eastern India the excavations of Pandurajardhibi in Burdwan District, has opened a new chapter by P.C. Dasgupta, Director of Archaeology, West Bengal. The remains of a chalcolithic culture, with painted pottery, channel spouted boats of the type found in Central India and Deccan have revolutionized the accepted notion of archaeology in this region."

এই সভ্যতা মোটামুটি সাড়ে তিন হাজার বছরের বলেই ঐতিহাসিকদের মত। তাম্রযুগের সভ্যতার নিদর্শন পাণ্ডুরাজার ঢিবি ছাড়াও মঙ্গলকোট, রাজারডাঙ্গা, সুরতঢিবি, দেওলি, মন্দিরা, গঙ্গাডাঙ্গা, মঙ্গলকোট, হাজরাডাঙ্গা, সাঁওতালডাঙ্গা, বাণেশ্বরডাঙ্গায় পাওয়া গেছে।

এ অঞ্চলের সভ্যতা সম্পর্কে লিখিত উল্লেখ পাওয়া যায় ঐতরেয় ব্রাহ্মণে। পুণ্ড্রজাতির উল্লেখ এখানে এবং মানব ধর্মশাস্ত্রে পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে ধরে নেওয়া যায় সেই সময়ে উত্তরবঙ্গ আর্যসভ্যতার কাছে পরিচিত ছিল। ঐতরেয় আরণ্যকে বঙ্গ শব্দের সবচেয়ে প্রাচীন উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সময়ে আর্যসভ্যতার মানুষ বঙ্গ, মগধ এবং চের দেশের মানুষদের পক্ষীবৎ জ্ঞান করতেন। শতপথ ব্রাহ্মণ থেকে পাওয়া যায় অগ্নি সরস্বতী তীর হতে সরযূ, গণ্ডকী, কুশী নদী পার হয়ে সদানীরা তীরে এসেছিলেন। কিন্তু মগধ বা বঙ্গদেশে গমন করেননি। রাহুগণ মিথিলা দেশে আগমনের পর ওই অঞ্চল আর্য্য বাসযোগ্য গণ্য হয়।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে যে প্রাচীন জাতি ভূমধ্যসাগর হতে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত অধিকার বিস্তার করেছিল, তারাই সম্ভবতঃ ঋগ্বেদের দস্যু এবং তারাই ঐতরেয় আরণ্যকে পক্ষী নামে অভিহিত হয়েছে। বৈদিক ধর্মসূত্রে বাংলাদেশ আর্যাবর্তের বাইরে বলে গণ্য হলেও মানব ধর্মশাস্ত্রে এ অঞ্চল আর্যাবর্তের অন্তর্ভুক্ত এবং পুণ্ড্র জাতি পতিত ক্ষত্রিয় বলে বর্ণিত হয়েছে। মহাভারতে পুণ্ড্র এবং বঙ্গ - উভয় জাতিই সুজাত ক্ষত্রিয় হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে। জৈন উপাঙ্গ পন্নবনা (প্রজ্ঞাপনা) গ্রন্থে আর্য জাতির তালিকায় বঙ্গ এবং রাঢ়ের উল্লেখ আছে।

পুরাণ এবং মহাভারতের কাহিনী অনুযায়ী দীর্ঘতমা নামের এক অন্ধ ঋষি যযাতির বংশধর

পূর্বদেশের রাজা মহাধার্মিক এবং বীর বলির আশ্রয় লাভ করেন। তাঁর অনুরোধে তাঁর রানী সুদেষ্ণার গর্ভে পাঁচ সন্তান উৎপাদন করেন, যাদের নাম অঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র, সুহ্ম ও বঙ্গ। তাঁদের বংশধরেরা এবং বাসস্থান তাঁদের নামেই পরিচিত। সুতরাং পৌরাণিক কাহিনী মতে উল্লিখিত প্রদেশগুলির অধিবাসীরা এক জাতীয় এবং ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মিশ্রণে উদ্ভূত। কাহিনীটিকে ইতিহাস বলা না গেলেও মহাভারত এবং পুরাণের যুগে এ অঞ্চলে আর্য জাতির প্রভাব নিশ্চিতভাবে জানায়।

মহাভারত এবং রামায়ণে বাসুদেব, চন্দ্রসেন প্রভৃতি পৌণ্ড্র জাতীয় এবং বঙ্গদেশীয় রাজাদের উল্লেখ পাওয়া যায়।

বাংলার বর্তমান অধিবাসীদের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় ভাষী অধিবাসীদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ বলে ঐতিহাসিকদের মত। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ লিখেছেন, 'নাগপূজার কয়েকটি জাতি বাঙ্গালা হইতে এবং ভারতের উত্তরাঞ্চল হইতে তামিলকম্ দেশে যায়। ইহাদের মধ্যে মরণ, চের ও পাঙ্গালাথিরইয়র উল্লেখ্য। ...... পাঙ্গালা যে বাঙ্গালা তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়।'

রাঢ় এবং বঙ্গ অঞ্চলে আর্য সভ্যতা ছড়িয়ে পড়লে আর্য ভাষা,ধর্ম, সামাজিক প্রথা এবং সভ্যতার অন্যান্য অঙ্গ এখানে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাচীন অনার্য ভাষা লুপ্ত হয়। বৈদিক,পৌরাণিক, বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্ম প্রচারিত হল, বর্ণাশ্রম নিয়ম মেনে সমাজ গঠিত হল। কিন্তু প্রাচীন ভাষা, ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠান একেবারে মুছে গেল না। বাঙালী নারীর শাড়ী-সিঁদুর-আলতার ব্যবহার, লাল-হলুদ ব্যবহার, কালী-মনসা পুজো, ধর্মঠাকুর এবং শিবের গাজন এখনো প্রাচীন ধর্ম এবং সমাজের সাক্ষ্য দেয়।

বঙ্গ এবং মগধ খৃষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দে আর্য প্রভাবিত হয়েছিল। কিন্তু পাঁচ থেকে ছয় শতাব্দী পরে সমগ্র আর্য্যাবর্ত মগধের শূদ্ররাজাদের অধীন হয়েছিল। ঐতিহাসিক, ভাষাতাত্ত্বিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিকেরা একমত যে এই শূদ্ররা অনার্য্য বংশোদ্ভূত। পৌরাণিক ধর্মের বিরুদ্ধে এই সময়েই মাথা তোলে জৈন এবং বৌদ্ধধর্ম। দুটি ধর্মই আর্য্যাবর্তের পূর্বাংশে জন্ম নিয়েছিল। জৈন ধর্মের চব্বিশজন তীর্থঙ্করের মধ্যে চৌদ্দজন নির্বাণ লাভ করেছিলেন বঙ্গ এবং মগধে।

চব্বিশতম জৈন তীর্থঙ্কর বর্ধমান- মহাবীরের আবির্ভাবের আগে বঙ্গ এবং মগধ বহু ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। গৌতম বুদ্ধ এবং মহাবীরের নির্বাণ লাভের অল্প সময় পর শিশুনাগ বংশীয় মহাপদ্মনন্দের শূদ্রা পত্নীর গর্ভজাত পুত্র ভারতে একছত্র সম্রাট হয়েছিলেন। এই সময় (আনুমানিক ৩২৭ খৃষ্টপূর্বাব্দে) আলেকজাণ্ডার পঞ্চনদ অধিকার করেছিলেন। এই সময় ভারতের পূর্বপ্রান্তের 'প্রাসিই' এবং 'গঙ্গারিডই' নামে দুটি পরাক্রান্ত রাজ্যের কথা শুনে আর বিপাশা থেকে পূর্ব দিকে অগ্রসর হননি আলেকজাণ্ডার। বিভিন্ন গ্রীক ঐতিহাসিকদের লেখায় গ্রীক রাজদূত মেগাস্থিনিসের ইণ্ডিকা গ্রন্থের যেসব উল্লেখ পাওয়া যায় তাতে জানা যায় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে গঙ্গারিডই স্বাধীন রাজ্য ছিল। কলিঙ্গী যুদ্ধ ছিল এই রাজ্যের সঙ্গে। গঙ্গানদী ছিল এ রাজ্যের পূর্বসীমা। মৌর্য

বংশের তৃতীয় পুরুষ অশোকের সময় মগধের পূর্ব দিকে কোন স্বাধীন রাজ্য ছিল না। তবে রাঢ় অঞ্চল সরাসরি মৌর্য অধিকারে এসেছিল এমনও কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ১৮৫ খৃষ্টপূর্বাব্দে মৌর্যবংশের কাল শেষ হবার পর শুরু হয় শুঙ্গ এবং কুষাণ যুগ। কিন্তু গৌড়, রাঢ় বা বঙ্গ এই সময়ে এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল - এমন কোন প্রমাণ নেই। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর শেষ দিকে যখন কুষাণ সাম্রাজ্য ছোট ছোট খণ্ডরাজ্যে ভেঙ্গে গেছে এবং গুপ্ত রাজবংশ সম্রাট উপাধি গ্রহণ করেন নি, এই সময়ে রাজপুতানার পুষ্করণা অধিপতি চন্দ্রবর্মা সপ্তসিন্ধুর মুখ থেকে গঙ্গার মোহানা পর্য্যন্ত বিস্তৃত আর্য্যাবর্ত জয় করেছিলেন। শুশুনিয়া পাহাড়ে এঁর শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বিভিন্ন তথ্য বিচার করে সিদ্ধান্ত করেছিলেন কুতুবমিনারের কাছে যে লৌহস্তম্ভ আছে তার প্রতিষ্ঠাতা এই একই চন্দ্রবর্মা। যাঁর পিতার নাম সিংহবর্মা, ভ্রাতা নরবর্মা এবং ইনি ৪৬১ বিক্রমাব্দে (৪০৪-৫ খৃষ্টাব্দে) বর্তমান ছিলেন। এলাহাবাদের দুর্গে সম্রাট অশোকের শিলাস্তম্ভে সমুদ্রগুপ্তের যে প্রশস্তি আছে তাতে দেখা যায় সমুদ্রগুপ্ত চন্দ্রবর্মা নামের আর্য্যাবর্তরাজকে বিনষ্ট করেছিলেন।

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে বঙ্গ এবং মগধে কারা রাজত্ব করছিলেন তা এখনো জানা যায়নি। তবে গুপ্তযুগের সূচনা থেকেই রাঢ় এবং গৌড় গুপ্ত অধিকারে ছিল বলেই ঐতিহাসিকদের মত। বর্ধমান জেলার মশাগ্রামে প্রথম চন্দ্রগুপ্তের একটি মুদ্রাও আবিষ্কৃত হয়েছিল। চন্দ্রগুপ্ত লিচ্ছবিরাজকন্যা কুমারদেবীকে বিবাহ করে স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করেছিলেন বলেই অনুমান করা হয়। এজন্য তাঁর মুদ্রায় রাজার পাশে কুমারদেবীর মূর্তি অঙ্কিত এবং পাশে লিচ্ছবিদের নাম লিখিত আছে। মশাগ্রাম থেকে প্রথম চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রা আবিষ্কৃত হওয়াতে কোন কোন ঐতিহাসিকের ধারণা এই অঞ্চল গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এখানকার বলরাম বিষ্ণু মূর্তি গুপ্ত যুগের নিদর্শন বলেই মনে করা হয়।

চন্দ্রগুপ্তের পুত্র সমুদ্রগুপ্ত চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে সিংহাসনে বসেছিলেন। দক্ষিণভারতের কিছু অংশ ছাড়া সারা ভারতবর্ষ সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সমুদ্রগুপ্তের প্রপৌত্র স্কন্দগুপ্ত মারা যান ৪৮০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে। এই সময়ে উত্তরভারতে হুন আক্রমণ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তোলে।

গুপ্ত যুগের শেষ দিকে গোপ বংশের রাজারা রাঢ়ের এই অঞ্চলে রাজত্ব করতেন। গোপচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত এই রাজ্য খুব বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। গুপ্ত যুগের শেষ দিকে সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দিকে গৌড়ের মহাসামন্ত শশাঙ্ক স্বাধীন গৌড়রাজ্য স্থাপন করেন। শশাঙ্কের পরিচয় নিয়ে ঐতিহাসিকেরা একমত নন, তবে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুক্তিপূর্ণ মত যে তিনি ছিলেন মগধের গুপ্তবংশের মানুষ, মহাসেন গুপ্তের পুত্র অথবা ভ্রাতুষ্পুত্র। পুরো নাম শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্ত। শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ নিয়েও ঐতিহাসিকেরা একমত হতে পারেন নি। কেউ মুর্শিদাবাদের রাঙামাটি,কেউ হুগলির মহানদ, কেউ বর্ধমানের কর্জনা নগরকে কর্ণসুবর্ণ বলেছেন।

উত্তর ভারতে হুন আক্রমণে গুপ্ত সাম্রাজ্য সঙ্কুচিত হলেও বাংলাদেশ বহুদিন পর্য্যন্ত গুপ্ত

অধিকারে ছিল। এই বংশের শেষ রাজা বৈন্যগুপ্ত। ইনি ত্রিপুরা অঞ্চলে রাজত্ব করতেন। মল্লাসারুল তাম্রশাসন এবং গুনাইঘর তাম্রশাসন থেকে বৈন্যগুপ্ত সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। মহারাজ বিজয় সেনের উল্লেখ মল্লাসারুল তাম্রশাসনে আছে। বৈন্যগুপ্তের শাসনে তাঁর 'মহাপ্রতিহার, মহাপিলুপত, পঞ্চাধিকরণে পরিক মহাসামন্ত মহারাজ উপাধি, কিন্তু মল্লাসারুল শাসনে তাঁকে মহারাজ উপাধিতে পাওয়া যায়। এই দুই শাসনের বিজয় সেন যদি এক হন, সেক্ষেত্রে স্বীকার করতে হয় গোপচন্দ্রের রাজত্ব রাঢ় পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গোপচন্দ্রের জয়রামপুর তাম্রশাসন উড়িষ্যা পর্য্যন্ত তাঁর রাজ্যসীমা সমর্থন করে। গোপচন্দ্র এবং সমাচারদেবের মধ্যে সম্পর্ক জানা না গেলেও ঐতিহাসিকদের অনুমান সমাচারদের বৈন্যগুপ্তের সমসাময়িক। কারণ বিজয় সেন এই দুই রাজার মহাসামন্ত ছিলেন। গোপচন্দ্র রাজা হন ষষ্ঠ শতকের দ্বিতীয় দশকে। এঁর পিতার নাম ধনচন্দ্র, মাতার নাম গিরিদেবী। ইনি নিজের বাহুবলে রাজত্ব লাভ করেছিলেন। তিনি যে পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন, তা তাঁর সম্রাট পদবী গ্রহণ করা থেকে বোঝা যায়।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পুত্র কুমারগুপ্তের বংশলোপ হবার পর তাঁর দ্বিতীয় পুত্র গোবিন্দ গুপ্ত বা কৃষ্ণগুপ্তের বংশধরেরা পাটলিপুত্রের সিংহাসনে বসেন। গোবিন্দগুপ্ত বা কৃষ্ণগুপ্তের পৌত্র তৃতীয় কুমারগুপ্ত সম্ভবতঃ এই বংশের প্রথম রাজা। এই সময় এঁরা গৌড় এবং রাঢ়ের অধিকারী ছিলেন কিনা জানা যায় না। তৃতীয় কুমারগুপ্তের পৌত্র মহাসেনগুপ্ত ব্রহ্মপুত্র (লৌহিত্য) তীরে কামরূপরাজ সুস্থিতবর্মাকে পরাজিত করেছিলেন।

এই সময়ে গৌড়েশ্বর শশাঙ্কের আবির্ভাব। শশাঙ্ক শৈব ছিলেন। হিউয়েন সাঙের কথা অনুযায়ী তিনি বৌদ্ধ বিদ্বেষী ছিলেন, যা বিশ্বাসযোগ্য নয়। কারণ শশাঙ্কের মৃত্যুর পর হিউয়েন সাঙ গৌড়ে, রাঢ়ে, তাম্রলিপ্তিতে এবং মগধে বহু সমৃদ্ধ সংঘরাম এবং বিহার দেখেছিলেন। শশাঙ্ক বৌদ্ধ বিদ্বেষী হলে তা থাকা সম্ভব ছিল না।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথমভাগে কামরূপরাজ হর্ষদেব গৌড়, ওড্র, কলিঙ্গ ও কোশলের অধিপতি ছিলেন। এই উল্লেখ পাওয়া যায় নেপালে পশুপতিনাথ মন্দিরের পশ্চিম তোরণের পাশে জয়দেবের খোদিত লিপি থেকে। এই লিপি ১৫৩ হর্ষাব্দে (৭৫৯ খৃষ্টাব্দে) লিখিত হয়েছিল। অতএব এই সময়ের আগেই হর্ষদেব গৌড়ের অধিপতি ছিলেন। এই সময় কান্যকুব্জরাজ যশোধর্মা উত্তরাপথে রাজ্যবিস্তারের চেষ্টা করেন। তাঁর সভাকবি বাকপতিরাজ কর্তৃক প্রাকৃত ভাষায় রচিত গউডবহো কাব্যে যশোধর্মার দিগ্বিজয়ের বর্ণনা আছে। কাব্যের সাক্ষ্য অনুযায়ী যশোধর্মা মগধরাজ এবং বঙ্গরাজকে যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন। এই সময়ে মগধরাজ ছিলেন দ্বিতীয় জীবিতগুপ্ত। কিন্তু বঙ্গরাজ কে ছিলেন জানা যায় না। কাশ্মীর রাজ ললিতাদিত্য যশোধর্মাকে পরাজিত এবং সিংহাসনচ্যুত করেন। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ গৌড়েশ্বর ললিতাদিত্যকে কয়েকটি হাতি উপহার দিয়েছিলেন। এর পরে কাশ্মীররাজের আমন্ত্রণে গৌড়েশ্বর কাশ্মীর গেলে ললিতাদিত্য তাঁকে হত্যা করেন।

নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে মহারাজ আদিশূর বঙ্গদেশে কান্যকুব্জ হতে পাঁচজন সাগ্নিক ব্রাহ্মণকে এনেছিলেন ৬৫৪ শকাব্দে। কুলশাস্ত্রের এই উল্লেখ থেকে তিনি সিদ্ধান্ত করেছিলেন

আদিশূর ধর্মপালের পূর্ববর্তী কোন রাজা। কিন্তু অন্যান্য ঐতিহাসিকেরা এই সময়ে শূর বংশীয় কোন রাজার অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রমাণাভাবে সন্দিহান।

মগধের গুপ্তবংশীয় দ্বিতীয় জীবিতগুপ্তের মৃত্যুর পর কোন রাজা গৌড়, মগধ বা বঙ্গে দৃঢ়ভাবে অধিষ্ঠিত হতে পারেন নি। ধর্মপালদেবের খালিমপুর তাম্রশাসন অনুযায়ী প্রকৃতি পুঞ্জ মাৎস্যন্যায় দূর করার উদ্দেশ্যে ব্যপট নামক যুদ্ধকুশল ব্যক্তির পুত্র গোপালদেবকে রাজা নির্বাচিত করেছিল। গোপালদেবের সময় থেকেই গৌড়, মগধ এবং বঙ্গে পাল রাজবংশের সূচনা। বর্তমানে কারো কারো মতে গোপালদেব রাঢ়ের সন্তান। কারো মতে ইনি বরেন্দ্রভূমির সন্তান। তবে এ বিষয়ে কূলপঞ্জীর কিংবদন্তী ছাড়া নিশ্চিত কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। গোপালদেবের পিতামহ ছিলেন সর্ববিদ্যাবিশারদ দয়িতবিষ্ণু। পাল রাজবংশ সাড়ে চারশ বছর গৌড় মগধ শাসন করেছিলেন। গোপালদেব আনুমানিক ৭৫০ থেকে ৭৭০ খৃষ্টাব্দ রাজত্ব করেন।

গোপালের পুত্র ধর্মপাল সিন্ধু নদ এবং উত্তর হিমালয়ের পাদভূমি পর্য্যন্ত জয় করেন। দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বত পর্য্যন্ত রাজ্যসীমা বাড়ান। ধর্মপালের রাজত্বকাল ৮১০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। ধর্মপালের পর পাল সাম্রাজ্য প্রায় সাড়ে তিনশ বছর টিকে ছিল। পাল রাজারা ধর্মে ছিলেন বৌদ্ধ।

পাল সাম্রাজ্যের পতনের কালে চন্দেল্লারাজ যশোবর্মন কাশ্মীর থেকে বাংলাদেশ পর্য্যন্ত বিজয় অভিযান করেন। তাঁর সভাকবি লিখেছেন চন্দেল্লরাজ গৌড় জয় করেন এবং তাঁর পুত্র ধঙ্গ (৯৫৪-১০০০ খৃষ্টাব্দ আনুমানিক) রাঢ়া ও অঙ্গদেশ জয় করেন।

উড়িষ্যার ইরদার জমিদারের কাছে পাওয়া একটি তাম্রশাসনে দেখা যায় নয়পালদের তাঁর রাজত্বের ত্রয়োদশ বর্ষে এক ব্রাহ্মণকে বর্ধমানভুক্তি ও দণ্ডভুক্তি মণ্ডলের অন্তর্গত একখানি গ্রাম দান করেন।

নয়পাল দেবের পিতা মহীপালের সময়ে (৯৮৮-১০৩৮ খৃঃ আনুমানিক) পতনোম্মুখ পাল সাম্রাজ্য আবার মাথা তুলে দাঁড়ায়। তাঁর কীর্তি এতটাই বিখ্যাত যে, বাংলাদেশ ধর্মপাল, দেবপালকে ভুলে গেলেও বিভিন্ন স্থান নাম, লোক প্রবাদ এবং গাথার মধ্যে মহীপাল এখনো বর্তমান। যেমন 'ধান ভানতে মহীপালের গীত' প্রবাদ বা মহীপালদীঘি, মহীপাল, মহীপুর, মহীসন্তোষ, মহীগঞ্জ নামের স্থান। মহীপাল সমগ্র বঙ্গদেশ প্রথমে জয় করেন। এই সময়ে দক্ষিণ রাঢ়ের অধিপতি রণশূর। রাজেন্দ্র চোল যখন বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন সে সময় উত্তর রাঢ় মহীপালের অধীনে থাকলেও দক্ষিণ রাঢ় রণশূরের অধিকারে ছিল।

নয়পালের পর তৃতীয় বিগ্রহপালের সময় কলচুরিরাজ কর্ণদেব (১০৪১-১০৭০ খৃঃ) বাংলাদেশ আক্রমণ করেন। বীরভূমের পাইকোরের একটি শিলাস্তম্ভে কর্ণের লিপি আছে। পরে তৃতীয় বিগ্রহপালের কাছে কর্ণদেব পরাজিত হন এবং নিজের কন্যা যৌবনশ্রীর সঙ্গে বিগ্রহপালের বিবাহ দিয়ে সন্ধি করেন। কর্ণদেব রাঢ়দেশ দখল করলেও তা স্থায়ী

হয়নি। কিন্তু এই যুদ্ধে পালরাজ্য আবার দুর্বল হয়ে পড়ে। এই সময় কয়েকটি স্বাধীন খণ্ডরাজ্য বাংলাদেশে দেখা যায়। রাঢ় অঞ্চলে মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষ ঢেক্করীকে রাজধানী করে স্বাধীন গোপভূম স্থাপন করেন। ঢেক্করীর অবস্থান নিয়ে নানা মত থাকলেও বর্ধমান জেলার দক্ষিণ আউসগ্রামে অজয় নদের দক্ষিণ তীরে ছিল বলে অক্ষয় কুমার মৈত্র এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মত। রমেশচন্দ্র মজুমদারও এই মত সমর্থন করেছেন। ঘনরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গলে ইছাই ঘোষের উল্লেখ আছে।

তৃতীয় বিগ্রহপালের পর দ্বিতীয় মহীপাল রাজা হন। এ সময় উত্তরবঙ্গে কৈবর্ত বংশীয় দিব্য বিদ্রোহী হয়ে বরেন্দ্রভূমি দখল করেন। এটিকে অনেকে কৈবর্ত বিদ্রোহ বললেও সব ঐতিহাসিক এই মত সমর্থন করেন না। দ্বিতীয় মহীপাল নিহত হলে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামপাল রাজা হন। বিভিন্ন রাজশক্তির কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে রামপাল বরেন্দ্রভূমি পুনরুদ্ধার করেন। রামপালের সহযোগী যোদ্ধাদের মধ্যে রাঢ় অঞ্চলের ঢেক্করীরাজ প্রতাপসিংহ, অপরমন্দারের (হুগলী জেলার গড়মান্দারণ) অধিপতি লক্ষ্মীশূর, উচ্ছালের (বর্তমান বীরভূম) রাজা ভাস্কর বা মদকল সিংহ - এঁরা ছিলেন। এঁদের উল্লেখ পাওয়া যায় সন্ধাকর নন্দীর রামচরিতে।

রাঢ় অঞ্চলের বিচারে রামপালের পর পালরাজ্যের কোন প্রভাব এখানে ছিল না। অন্তর্বিদ্রোহে পালরাজ্যও এরপর ভেঙে যায়। উদ্ভব হয় সেন রাজবংশের। রাঢ়ের রাজা হন বিজয়সেন।

রামপালের সামন্ত রাজাদের অন্যতম ছিলেন বিজয়সেন। ইনি বীরভূম অঞ্চলে রাজত্ব করতেন। এঁর প্রধানা মহিষী বিলাসদেবী ছিলেন দক্ষিণ রাঢ়ের শূরবংশের কন্যা। সেন রাজবংশ কর্ণাট দেশীয় ব্রহ্মক্ষত্রিয়। প্রথমে যুদ্ধ ব্যবসায়ী হলেও বিজয়সেনের পিতা হেমন্তসেন ভূ-খণ্ডের অধিপতি হয়েছিলেন। রামপালের মৃত্যুর পর বিজয়সেন বর্মরাজকে পরাজিত করে পূর্ব এবং দক্ষিণবঙ্গ অধিকার করেন। গৌড়রাজ মদনপালকেও ইনি পরাজিত করেন। পালরাজারা এই সময়ে মগধ কেন্দ্রিক হয়ে পড়েন। ১১৫৮ খৃষ্টাব্দে বিজয়সেন মারা যান। ১১৫৮ থেকে ১১৭৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন বল্লালসেন। সেন বংশের সবচেয়ে সমৃদ্ধির কাল এই সময়েই। ১১৭৯ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মণ সেন রাজা হলেও ষাট বছর বয়সে রাজত্ব পাওয়া লক্ষ্মণসেন বেশীদিন গৌড় দখলে রাখতে পারেন নি। সম্ভবতঃ ১২০৩-০৪ খৃষ্টাব্দে বখতিয়ার খিলজি নদীয়া আক্রমণ করেন। ইতিহাসে বিতর্কিত এই ঘটনার পরে পশ্চিম এবং দক্ষিণবঙ্গ সেন রাজবংশের হাত ছাড়া হয়। আনুমানিক ১২০৫ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মণসেন মারা যাবার পর তাঁর দুইপুত্র বিশ্বরূপসেন ও কেশবসেন রাজা হন। দক্ষিণবঙ্গে এবং পূর্ববঙ্গে এঁরা রাজত্ব করেন।

বখতিয়ার খিলজিও মারা যান ১২০৫-৬ খৃষ্টাব্দে (৫০২ হিজরা)। এরপর বখতিয়ারের অনুচর ইজউদ্দিন মুহম্মদ শিরান খিলজী দেবকোটে নিজেকে বখতিয়ারের উত্তরাধিকারী ঘোষণা করেন। মুহম্মদ শিরান এবং আলী মর্দান খিলজি প্রত্যেকেই তিন বছর করে রাজত্ব করে নিহত হন। এরপর রাজত্ব করেন গিয়াসউদ্দিন ইউয়জ (১২১১-১২২৬)।

ইনি দেবকোট থেকে রাজধানী সরিয়ে আনেন লখনৌতিতে (লক্ষণাবতী)। নাসিরুদ্দিন মাহমুদের হাতে গিয়াসউদ্দিন ইউয়জ শাহ্ নিহত হবার পর বাংলার শাসন দিল্লী কেন্দ্রিক হয়ে পড়ে।

গিয়াসউদ্দিন বলবনের সময়ে ১২৭১ খৃষ্টাব্দে লখনৌতির শাসক নিযুক্ত হন আমিন খান। কিন্তু সহকারী শাসক তুগরল খান সর্বেসর্বা হয়ে ওঠেন এবং দিল্লীর কর্তৃত্ব একরকম অস্বীকার করেন। ১২৮০ খৃষ্টাব্দে বলবন তুগরল খানকে দমন করে নিজের কনিষ্ঠ সন্তান বুগরা খানকে (নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহ্) লখনৌতির শাসনভার দিয়ে যান। বুগরাখানের পৌত্র শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ সাতগাঁও শ্রীহট্ট ইত্যাদি অঞ্চল জয় করেন।

চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি তুঘলক বংশের আমলে বাংলায় বিদ্রোহ দেখা দেয়। বাংলার বিভিন্ন অংশে তখন বিভিন্ন শাসনকর্তা। এই সময় সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ (১৩৩৯-৫৮) সমগ্র বাংলাদেশে স্বাধীন সুলতান হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন।

ঐতিহাসিকদের মত অনুযায়ী পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইলিয়াস শাহের প্রপৌত্র বা বৃদ্ধ প্রপৌত্রকে সিংহাসনচ্যুত করেন একজন হিন্দু জমিদার। ইনি রাজা গণেশ (১৪০৯ খৃঃ)। গৌড় ও বঙ্গ অধিকার করেন রাজা গণেশ। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে গণেশ রাজা উপাধি গ্রহণ করেন নি এবং শেখ নূর কুতুব উল আলমের কাছে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নেবার জন্য স্বীকৃতি জানালেও পত্নীর অসম্মতিতে মুসলমান হননি। তিনি সম্ভবতঃ মুসলমানদের বিরাগভাজন না হবার জন্য সাহাবুদ্দিন বায়োজিদ শাহ নাম গ্রহণ করেছিলেন। ৮১৮ (১৪১৪ খৃঃ) হিজরায় তাঁর পুত্র যদু, সুলতান জালালউদ্দিন মহম্মদ শাহ, সিংহাসনে বসেন। জালালউদ্দীনের পুত্র শামসুদ্দিন আহমদ শাহ্ এই বংশের শেষ সুলতান।

নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহের (১৪৪২-৫৯) হাত ধরে পুনরুত্থান হয় ইলিয়াস শাহী বংশের। এই বংশে পাঁচজন সুলতান ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এই সময়কালে হাবশী ক্রীতদাসদের প্রাধান্যে বাংলার অভিজাত সম্প্রদায় বিরক্ত হয়ে ওঠেন। খোজা বারবগের হাতে নিহত হন ফতে শাহ। কিছুদিনের অরাজকতার পর প্রথমে ফিরোজ শাহ (১৪৮৬-৮৯), পরে নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহ (১৪৮৯-৯০) এবং মজঃফর শাহ (১৪৯০-৯৩) অল্পকাল রাজত্ব করেন। এরপর সুলতান নির্বাচিত হন সৈয়দ হোসেন বা আলউদ্দিন হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯)। হোসেন শাহর বংশে পাঁচজন সুলতান ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

ইতিমধ্যে ১৫৩৬ খৃষ্টাব্দে (৯৪৩ হিজরা) শেরশাহ বিহারে প্রবল হয়ে ওঠেন এবং গৌড় দখল করেন। ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর বাদশাহ হুমায়ুন গৌড়েশ্বরের সাহায্যের উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসেন। হুমায়ুন চুনার দুর্গ অধিকার করলে শের খাঁ গৌড় থেকে পলায়ন করেন। হুমায়ুন গৌড় দখল করলেও বেশীদিন অধিকারে রাখতে পারেন নি। ১৫৩৯ খৃষ্টাব্দে শেরশাহ পুনরায় গৌড় দখল করেন। ইনি ফরিদউদ্দিন আবুল মুজাফফর শেরশাহ নাম নিয়ে গৌড়ের সিংহাসনে বসেন। এই সময় বর্তমান বর্ধমান শহরে পায়রাখানায় একটি

মসজিদও নির্মাণ করেন, যেটি কালো মসজিদ নামে পরিচিত। শেরশাহ মাত্র পাঁচ বছরের রাজত্বকালে বাংলাদেশের সোনারগাঁও থেকে লাহোর পর্য্যন্ত একটি রাজপথ নির্মাণ করান এবং শাসন ব্যবস্থার সংস্কার করেন। তাঁর ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা (যা তাঁর কর্মচারী টোডরমল তৈরী করেন) পরবর্তীকালে মুঘল সম্রাট আকবর গ্রহণ করেন।

শেরশাহের মৃত্যুর এবং কয়েক বছর অরাজকতার পর সুলেমান কররানী (১৫৬৪-৭২) এবং তাঁর বংশ ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এই সুলেমান কররানীরই সেনাপতি ছিলেন কালাপাহাড়। পূর্বস্থলীর পট্টদ্বীপ (পাটুলী) ছিল কালাপাহাড়ের মাতুলালয়। ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে মুঘলদের হাতে নিহত হন দাউদ কররানী। কিন্তু মুঘলের অধিকারে এলেও বাংলা সুবার সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা চালু হয় মানসিংহ বাংলাদেশে শাসনকর্তা হয়ে আসার পর ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দে। এই সময়েই বারো ভুঁইয়াদের উত্থান। মানসিংহ রাজমহলে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেছিলেন।

১৬০৩-৪ খৃষ্টাব্দে বর্ধমানের (শরীফাবাদ পরগনার) জায়গীরদার হয়ে আসেন তুর্কী আলি কুলি ইস্তালজু (শের আফগান)। ইতিমধ্যে সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পর দিল্লীর সম্রাট হন জাহাঙ্গীর (১৬০৫)। জাহাঙ্গীর শের আফগানের পত্নী মেহের উন্নিসাকে হস্তগত করার জন্য ধাত্রীপুত্র কুতুবউদ্দিন কোকাকে বাংলার সুবাদার করে পাঠান। উভয়ের মধ্যে যুদ্ধে দু'জনেই নিহত হন (১৬০৭ খৃঃ)। ইতিমধ্যে বর্ধমানের (শরীফাবাদের) চৌধুরী ও নগর কোতোয়াল পদে নিযুক্ত হন লাহোরের প্রাক্তন বাসিন্দা সঙ্গম রাইয়ের তৃতীয় পুরুষ আবুরাম রাই (১৬৫৭ খৃঃ)।

মুঘল সাম্রাজ্যেও এই সময় একটি ঘটনা ঘটে, যা সঙ্গমরাই বংশকে রাজপদের নিকটবর্তী করে তোলে। ১৬২০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে শাহজাদা খুরম (যিনি পরে সম্রাট শাহজাহান) পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে রাজমহল দখল করেন। বিহার, বাংলা এবং উড়িষ্যাও ওঁর অধিকারভুক্ত হয়। এই সময়ে অথবা শাহজাহান সম্রাট হবার পর (১৬২৮ খৃঃ) কামরূপের বিদ্রোহ দমনের সময় সঙ্গম রাই পরিবার বর্ধমানে মুঘল সৈন্যকে রসদ দিয়ে সাহায্য করেন।

১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে বাংলার সুবাদার হয়ে আসেন শায়েস্তা খাঁ। এই সময়ে বাংলা সুবার রাজধানী ছিল ঢাকায়। শায়েস্তা খানের পর ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে সুবাদার হন ইব্রাহিম খাঁ। এই সময়ে চন্দ্রকোনার জমিদার শোভা সিংহ বিদ্রোহী হন। এই বিদ্রোহীকে বাধা দিতে গিয়ে বর্ধমানরাজ কৃষ্ণরাম রাই নিহত হন (জানুয়ারী, ১৬৯৬ খৃঃ)। শোভা সিংহ যোগদান করেন উড়িষ্যার বিদ্রোহী পাঠান সর্দার রহিম খাঁর সঙ্গে। বাংলার সুবাদার ইব্রাহিম খাঁ এই বিদ্রোহ দমনের জন্য কোন ব্যবস্থা নেননি। যদিও কৃষ্ণরামের পুত্র জগৎরাম রাই ছিলেন ঢাকায় তাঁরই আশ্রয়ে। বীতশ্রদ্ধ হয়ে সম্রাট ঔরঙ্গজেব ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে ইব্রাহিম খানের স্থানে সুবাদার নিযুক্ত করেন নিজের পৌত্র আজিম উশসান কে। এঁর আদেশে ফৌজদার জবরদস্ত খাঁ বিদ্রোহ দমন করেন। আজিম উশসান ১৬৯৭ থেকে ১৭১২ পর্য্যন্ত বাংলার সুবাদার পদে ছিলেন, তার মধ্যে ১৭০৪ থেকে বিহারেরও

সুবাদার নিযুক্ত হন। ১৬৯৭ থেকে ১৭০৪ পর্য্যন্ত ইনি ঢাকার পরিবর্তে শাসনের কাজ চালাতেন বর্ধমান থেকে। এঁর তৈরী একটি মসজিদ পায়রাখানা অঞ্চলে এখনো আছে, যেটি জুম্মা মসজিদ নামে পরিচিত। এই বর্ধমানে বসেই আজিম উশসান কলিকাতা, সুতানুটি এবং গোবিন্দপুরের ইজারা দেন ইংরেজদের (যে কারণে ভাষাচার্য্য সুকুমার সেন বর্ধমানকে কলকাতার জননী অভিধা দিয়েছেন)।

ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষ দিকে সারা দেশেই আইন শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ে। ১৭০৭ সালে মারা যান ঔরঙ্গজেব। মুর্শিদকুলি খাঁ এই সময়ে বাংলার দেওয়ান ছিলেন। ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে তিনি সুবাদার নিযুক্ত হন। এই সময় বাংলার উপর দিল্লীর কর্তৃত্ব বিশেষ ছিল না। ফলে বাংলার নবাবরা প্রায় স্বাধীন হয়ে ওঠেন। মুর্শিদকুলি ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে মারা যাবার পর প্রথমে তাঁর জামাতা সুজাউদ্দিন মহম্মদ খান এবং পরে দৌহিত্র সরফরাজ খান নবাব হন (১৭৩৯)। সরফরাজ খানকে হত্যা করে নবাবের কর্মচারী, বিহার প্রদেশের শাসনকর্তা আলিবর্দী খান নবাব হন (১৭৪০)। একই সময়ে বর্ধমান রাজ কীর্তিচন্দ রাই মারা যান এবং বর্ধমানরাজ হন চিত্রসেন রাই।

এই সময়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা বর্গীদের হানা। যে সমস্ত মারাঠা সৈন্যকে রাজকোষ থেকে ঘোড়া এবং অস্ত্র দেওয়া হত, তাদের বলা হত বারগীর। বারগীর অপভ্রংশে বর্গী। ১৭৪১ সালে উড়িষ্যায় বিদ্রোহী রুস্তম জংকে পরাজিত করে ফেরার সময় আলিবর্দী খবর পান রঘুজী ভোঁসলে পাঞ্চেতের মধ্য দিয়ে বর্ধমানে প্রবেশ করে (এপ্রিল, ১৭৪২) লুটপাট শুরু করেছেন। আলিবর্দী বর্ধমানে এলে মারাঠা সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত মুর্শিদাবাদ আক্রমণ এবং লুঠ করেন (৬মে, ১৭৪২)। পরদিন আলিবর্দী মুর্শিদাবাদ পৌঁছালে মারাঠারা কাটোয়া অধিকার করে। এর ফলে রাজমহল থেকে উড়িষ্যার জলেশ্বর পর্য্যন্ত মারাঠাদের অধিকারে আসে। মারাঠাদের অত্যাচারে এ অঞ্চলের কৃষি, শিল্প এবং বাণিজ্য নষ্ট হয়। সাধারণ মানুষ দলে দলে ভাগীরথীর পূর্ব দিকে পালাতে শুরু করে। এই সময়ে বর্ধমান রাজ চিত্রসেন রাই (১৭৪০-৪৪ খৃঃ) বর্ধমানের কাছে তালিত গড় তৈরী করেন, যার ধ্বংসাবশেষ এখনো দেখা যায়। কামান স্থাপিত হয় কৃষ্ণসায়রের উঁচু পাড়ে। কিন্তু চিত্রসেন রাই বর্ধমান শহর রক্ষা করতে অসমর্থ হয়ে পালিয়ে যান হুগলীতে। চিত্রসেন রাই এই বংশে প্রথম রাজা উপাধি পান প্রায় অস্তমিত মুঘল সম্রাটের কাছ থেকে। সমসাময়িক রাঢ়ের কবি গঙ্গারাম রচিত মহারাষ্ট্র পুরাণ এই সময়ের মারাঠা অত্যাচারের মূল্যবান দলিল।

পাটনা এবং পূর্ণিয়া থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে বর্ষা শেষে আলিবর্দী মারাঠাদের আক্রমণ করেন। দাঁইহাটে মারাঠারা জাঁক জমকের সঙ্গে দুর্গাপুজো করবার সময়ে নবমীর ভোরে আলিবর্দী কাটোয়া আক্রমণ করলে ভাস্কর পণ্ডিত বিনাযুদ্ধে পালিয়ে গিয়ে কটক অধিকার করেন। ডিসেম্বর ১৭৪২ সালে আলিবর্দী কটক পুনরুদ্ধার করেন।

দিল্লীর বাদশাহ মারাঠারাজ সাহুকে বাংলা বিহার এবং উড়িষ্যার চৌথ আদায়ের অধিকার দেন। সেই অনুযায়ী সাহু নাগপুরের রঘুজী ভোঁসলেকে ওই অধিকার দেন। এর ফলে উদ্ভূত

বিপদ থেকে রক্ষা পেতে দিল্লীর বাদশাহ পেশোয়া বালাজী রাওয়ের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ১৭৪২ এর নভেম্বরে বালাজী রাও প্রতিশ্রুতি দেন রঘুজী ভোঁসলের সৈন্যদলকে বাংলা থেকে তাড়িয়ে দেবেন।

১৭৪৩ সালের প্রথম দিকে রঘুজী ভোঁসলে ভাস্কর পণ্ডিতকে সঙ্গে নিয়ে কাটোয়া পৌছান। পেশোয়া বালাজী রাও বিহারের মধ্য দিয়ে সৈন্যদল নিয়ে বাংলার দিকে যাত্রা করেন। আসবার পথে উভয় সৈন্যদলই যথেচ্ছ অত্যাচার করতে থাকে। বহরমপুরের ষোলো কিলোমিটার দক্ষিণে ৩০ মার্চ ১৭৪৩ পেশোয়া বালাজী রাওয়ের সঙ্গে আলিবর্দী খানের সাক্ষাৎ হয়। স্থির হয় বাংলার নবাব মারাঠারাজ সাহুকে চৌথ দেবেন এবং বালাজী রাওকে দেশরক্ষার জন্য বাইশ লক্ষ টাকা দেবেন অভিযানের খরচ হিসাবে।

১৭৪৪ সালের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত বাংলাদেশ বর্গীর অত্যাচার থেকে সাময়িকভাবে রক্ষা পেল। ইতিমধ্যে ৩১ আগষ্ট ১৭৪৩ সালে মারাঠারাজ সাহু পেশোয়া বালাজী রাও এবং রঘুজী ভোঁসলের মধ্যে বিরোধ মিটিয়ে দিয়ে স্থির করে দেন বিহারের পশ্চিম অংশের চৌথ আদায় করবেন পেশোয়া এবং বিহারের পূর্ব, বাংলা এবং উড়িষ্যায় চৌথ আদায় করবেন রঘুজী ভোঁসলে। এই কারণে ১৭৪৪ এর মার্চ মাসে ভাস্কর পণ্ডিত মেদিনীপুর এলে আলোচনার ছলে ডেকে এনে আলিবর্দী ২১জন অনুচরসহ ভাস্কর পণ্ডিতকে নিজের শিবিরে ৩১ মার্চ হত্যা করেন।

১৭৪৫ এর ফেব্রুয়ারীতে রঘুজী ভোঁসলে বর্ধমান আক্রমণ করে রাজকোষ থেকে সাত লক্ষ টাকা লুঠ করেন। এই সময় বর্ধমান রাজ ছিলেন অপুত্রক চিত্রসেনের ভ্রাতুষ্পুত্র ত্রিলোকচন্দ (তিলকচন্দ) রাই। ইনি পরে 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি পান মুঘল সম্রাটের কাছ থেকে এবং পাঁচহাজার অশ্বারোহী সেনা রাখবার অধিকার পান।

১৮৪৭ সালের মার্চে আলিবর্দী মারাঠাদের হাত থেকে বর্ধমান উদ্ধার করেন। এরপরও অন্তর্কলহ এবং মারাঠা আক্রমণ চলতে থাকে। অবশেষে ১৭৫১ সালের মে মাসে আলিবর্দী মারাঠাদের সঙ্গে তিনটি শর্তে সন্ধি করেন। সন্ধির শর্তগুলি ছিল –

(১) মীর হবীর আলিবর্দীর অধীনে উড়িষ্যার নাজিম হবেন এবং এই প্রদেশের উদ্বৃত্ত রাজস্ব মারাঠা সৈন্যদের ব্যয় হিসাবে পাবেন রঘুজী ভোঁসলে। (২) বাংলার চৌথ বাবদ রঘুজী ভোঁসলে পাবেন বছরে ১২ লক্ষ টাকা। (৩) মারাঠা সৈন্য সুবর্ণরেখা পার হয়ে বাংলায় প্রবেশ করবে না।

১৭৬০ খৃষ্টাব্দে মীরকাশিম নবাব হন মীরজাফরের পরিবর্তে। ইংরেজদের সঙ্গে নবাবের চুক্তিমত বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের রাজস্ব আদায়ের ভার ইংরেজদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়। এই সঙ্গে ইংরেজ সৈন্যদের জন্য দশলক্ষ টাকা দিতে হয় এবং মাসিক একলক্ষ টাকা কিস্তিতে আরও দশ লক্ষ টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিতে হয়। এছাড়া বিভিন্ন ইংরেজ কর্মচারীকে দিতে হয় সাড়ে সতেরো লক্ষ টাকা।

১৭৬০ সালে এই ঘটনার প্রতিবাদে বর্ধমান রাজ ত্রিলোকচন্দ বীরভূম রাজের সঙ্গে

যৌথভাবে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সৈন্যদের আক্রমণ করেন। জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মোট তিনবার যুদ্ধে দ্বিতীয়বার ত্রিলোকচন্দ জয়লাভ করলেও শেষবার হেরে যান। প্রায় ৫০০ সৈন্য নিহত হয় এবং প্রায় ১০০০ সৈন্য আহত হয় ত্রিলোকচন্দের পক্ষে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন ত্রিলোকচন্দ, তেজচন্দ এবং প্রতাপচন্দ কেউই সহজে মেনে নেননি। তেজচন্দ এবং প্রতাপচন্দ নীলকর সাহেবদের মারধোর করা, নীল কুঠি বন্ধ করে দেওয়ার মতো ঘটনা প্রায়ই ঘটাতেন। ত্রিলোকচন্দের সঙ্গে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সন্ধি হলেও তা হয় বহু টাকার বিনিময়ে। রমেশচন্দ্র দত্তের লেখা ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস থেকে জানা যায় ভারতে সমস্ত করদ রাজ্যের রাজাদের তুলনায় বর্ধমান রাজকে কর হিসাবে সবচেয়ে বেশি টাকা দিতে হতো।

।। চার ।।

এই বইয়ে যেসব প্রসঙ্গে কোন আলোচনা নেই, তার মধ্যে একটি অবশ্যই বর্ধমানের সঙ্গীত চর্চা। সঙ্গীত চর্চার আলোচনা বলতে সাধারণতঃ সমাজের অগ্রসর শ্রেণীর রুচি অনুযায়ী চর্চিত শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আলোচনাই করা হয়। কিন্তু সঙ্গীত শাস্ত্রকাররা এ ছাড়াও লোকসঙ্গীতেরও উল্লেখ করে থাকেন, যার আলোচনা সাধারণতঃ কোন সঙ্গীত গ্রন্থে দেখা যায় না। বর্ধমান জেলার লোক সঙ্গীতের বিভিন্ন ধারা প্রসঙ্গে অতি সংক্ষিপ্ত একটি রেখাচিত্র তুষার পণ্ডিতের লেখায় পাওয়া যাবে। শাস্ত্রীয় সঙ্গীত প্রসঙ্গে কোন কথা বলার আগে বাংলার একটি বিশিষ্ট ধারার সঙ্গীত সম্পর্কে দু-এক কথা বলা প্রয়োজন। যে ধারায় এই জেলার অবদান অনেকখানি। এই ধারাটি বাংলার কীর্তন। যাকে লোকসঙ্গীতের ধারায় ফেলা যাবে না। আবার শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ধারায় ফেললে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতবেত্তারা ঘোরতর আপত্তি করবেন।

কীর্তনের ইতিহাস পুরোপুরি পাওয়া একরকম অসম্ভব। বাংলাদেশে এর প্রচলন জয়দেবের সময় থেকে বলে অধিকাংশের মত। জয়দেব রচিত পদগুলির ছন্দ দেখলে বোঝা যায় এগুলি সুরে গীত হত। 'মাধবে মা কুরু মানিনী মানময়ে' বা দশাবতার স্তোত্রের গতি ভঙ্গী, কমনীয়তা এবং ছন্দের গতি সুরে গীত হত বলে বুঝতে অসুবিধা হয়না। প্রচলিত গীত গোবিন্দের পদে সুর ও তালের সমাবেশ আছে। দশাবতার স্তোত্রে 'মালবরাগেণ রূপকতালেন চ গীয়তে' এমন নির্দেশও দেখা যায়। জয়দেব বাঙালী ছিলেন অথবা দক্ষিণ ভারতীয় সে কূটতর্কে না গিয়ে বলা যায় জয়দেব বর্ধমানের সন্তান। কেন্দুবিল্ব গ্রামে যাঁর অধিষ্ঠান। জাতীয়তা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও তিনি যে গৌড়রাজের (লক্ষ্মণ সেন) সভাকবি ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের রাগরাগিণীকে ভিত্তি করে লোকসঙ্গীতের গীতিময়তা এই সময় থেকেই নতুন রূপ নেয়। পূজারী গোস্বামী বালবোধিনী টীকায় লিখেছেন 'গীতস্যাস্য মালবরাগ রূপকতাল ইত্যাহ মালবেতৈ। তস্য লক্ষণং যথা ...।' তিনি গুর্জরী রামকিরী, বসন্ত ইত্যাদি রাগ এবং রূপক,

নিঃসর, একতালী, যতিতালেরও বর্ণনা দিয়েছেন। শার্ঙ্গদেবের সঙ্গীতরত্নাকার এবং তার আগেও এগুলির উল্লেখ আছে। জয়দেবের গান প্রাচীন শাস্ত্রীয় গীত পদ্ধতিতে গাওয়া হত কিনা তা জানার কোন উপায় অবশ্য নেই।

জয়দেব বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের কিছুকাল পরেই শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব। তাঁর প্রচারিত ধর্মের প্রধান বাহন ছিল কীর্তন। শ্রীচৈতন্য এবং নিত্যানন্দকে কীর্তন গানের স্রষ্টা বলা হয়। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবতে আছে –

আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ
সংকীর্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম পালৌ
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ।।

আবার চৈতন্য ভাগবতেই আছে –

সর্ব নবদ্বীপে দেখে হইল গ্রহণ
উঠিল মঙ্গলধ্বনি শ্রী হরিকীর্তন।।
.....
গঙ্গাস্নানে চলিলেন সকল ভক্তগণ।
নিরবধি চতুর্দিকে হরিসংকীর্তন।।

অর্থাৎ চৈতন্য আবির্ভাবের সময়েও নবদ্বীপের মানুষ গঙ্গাস্নান করতে আসবার সময়ে সংকীর্তন করছিলেন।

সংকীর্তনে মৃদঙ্গ-মন্দিরা-শঙ্খ ঘন্টা ব্যবহৃত হত। মৃদঙ্গ বলতে পাখোয়াজ, যা মৃন্ময় নয়। মৃদঙ্গের উৎপত্তি সম্বন্ধে জানা যায় শিব ত্রিপুরাসুরকে নিহত করলে ত্রিপুরাসুরের রক্ত মেশানো মাটি দিয়ে তৈরী হয় এর অঙ্গ এবং তারই ত্বক এবং অন্ত্র দিয়ে আবরণ ও দল তৈরী হয়। মৃত্তিকার ভঙ্গুর চরিত্রের জন্যই সম্ভবতঃ পরবর্তীকালে মৃদঙ্গ কাঠে তৈরী হত। শ্রীচৈতন্যের সময়েই আবার মৃদঙ্গের উপাদান হিসাবে মাটির ব্যবহার শুরু হয়। সেই হিসাবে শুধু কীর্তনের নয়, শ্রীখোলেরও জনক শ্রীচৈতন্য। ভক্তিরত্নাকরে পাওয়া যায় – শ্রী প্রভুর সম্পত্তি শ্রীখোল করতাল।
তাহে কেহ অর্পয়ে চন্দন পুষ্পমাল।।

কীর্তনের গায়ন পদ্ধতি অনুযায়ী চারটি প্রধান শ্রেণীবিভাগ করা হয় - গরাণহাটি, মনোহরসাহী, রেনেটি এবং মান্দারিনী। কীর্তনের এই শ্রেণীবিভাগ সুরের বৈচিত্র অনুযায়ী হয়েছিল। প্রতিটি ধারার মধ্যে কীর্তনের বৈশিষ্ট্য বর্তমান ছিল। যেমন শ্রুতি ও গমকের প্রাধান্য, রাগরাগিনীর বিশিষ্ট ভঙ্গী, ছন্দের নতুনত্ব (দশকুশী, কাঁসপাহিড়া, তেওট ইত্যাদি), আখরের সংযোজন ইত্যাদি। এই চারটি ছাড়াও ঝাড়খণ্ডী নামের একটি অচলিত ধারার কথাও জানা যায়।

কীর্তনের এই গায়নপদ্ধতিগুলির মধ্যে মনোহরসাহী এবং রেনেটি কীর্তনের স্রষ্টা শ্রীনিবাস

আচার্য। জ্ঞানদাস, বলরামদাস প্রমুখ পদকর্তা মনোহরসাহী কীর্তনকে সমৃদ্ধ করেন। রেনেটি টেঁয়া বৈদ্যপুর অঞ্চলের বৈষ্ণবদাস এবং উদ্ধবদাস দ্বারা সমৃদ্ধ। এই দুটি ধারাই বর্ধমানের নিজস্ব সম্পদ। এই প্রসঙ্গে সঙ্গীতের ইতিহাসকারদের দৃষ্টি আকর্ষিত হলে ভালো হয়। ইতিহাস শুধুমাত্র শাসক এবং শাসন ব্যবস্থার ধারাবাহিক বিবরণ নয়।

বর্ধমান ইতিহাসে শাক্ত পদাবলীর ভূমিকাও অনেকটাই। সাধক কবি রামপ্রসাদের সঙ্গে কমলাকান্তের নামও করা হয় প্রায় সমমর্যাদায়। কমলাকান্তের জন্মস্থান এবং সময় নিশ্চিত জানা যায় না। কোন মতে তাঁর জন্ম ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে ওড়গ্রামে। বর্ধমান রাজবাড়ির তথ্য অনুযায়ী তাঁর জন্ম ১০৭২ অম্বিকা কালনায়। কোন তথ্য অনুযায়ী তাঁর জন্ম ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে। কালনা তাঁর পৈত্রিক আবাস ছিল। মহেশ্বর ভট্টাচার্য এবং মহামায়া দেবীর সন্তান কমলাকান্তর শৈশব, কৈশোর কাটে কালনায়। পিতার মৃত্যুর পর মাতুলালয় চান্নাগ্রামে চলে আসেন। সেখানে কালী সাধনায় সিদ্ধিলাভের খবর ছড়িয়ে পড়লে বর্ধমান মহারাজ তেজচন্দ তাঁকে বর্ধমানে নিয়ে আসেন ১৮০০ খৃষ্টাব্দে। কোন কোন মতে তিনি মহারাজকুমার প্রতাপচন্দের দীক্ষাগুরু ছিলেন। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে এঁর মৃত্যু হয়। এই শাক্ত পদকর্তার প্রভাবেই সম্ভবতঃ সংস্কৃতি মনস্ক মহারাজ মহতাবচাঁদও বেশ কিছু শাক্ত পদাবলী রচনা করেছিলেন।

মার্গ সঙ্গীতের ক্ষেত্রে বর্ধমানের ইতিহাস তুলনায় বেশ আধুনিক। বর্ধমানের রাজ পরিবারের ইতিহাসও খুব বেশী দিনের নয়। এই বংশের প্রথমদিকের কৃষ্ণরাম, জগৎরাম, কীর্তিচন্দ, চিত্রসেন, তিলকচন্দ ইত্যাদিদের যুদ্ধ বিগ্রহেই কেটেছে বেশিরভাগ সময়। এঁদের সঙ্গীতে আগ্রহ কতটা ছিল, কে বা কারা তাঁদের সভাগায়ক ছিলেন, নিশ্চিত তথ্য কিছু এ ব্যাপারে পাওয়া যায় না। তেজচন্দ বিলাসপ্রিয় ছিলেন, কিন্তু তাঁর সময়েও কে ছিলেন, তারও নির্দিষ্ট তথ্য কিছু নেই। এই সময় কালের মধ্যে (১৬৫৭-১৮৪০) এসেছেন হয়ত অনেকে, কিন্তু তাঁদের কোন উত্তরসূরী বর্ধমানে তৈরী হয়নি। মহতাবচন্দের আমলে অল্প কিছুদিনের জন্য সভাগায়কের পদ অলঙ্কৃত করেছেন বিষ্ণপুর ঘরানার বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ যদুভট্ট। যাঁর প্রভাব পড়েছে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং রবীন্দ্রনাথের উপরেও। রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু ধ্রুপদাঙ্গের গানে এঁর প্রভাব সরাসরি পড়েছে। পরে বিজয়চন্দের সময়ে (১৮০৪-১৯৪১) এসেছিলেন বিষ্ণুপুর ঘরানার আর এক দিকপাল সঙ্গীতজ্ঞ গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। বর্ধমানে ইনি কাটিয়ে গেছেন দীর্ঘ ২৯ বছর। গত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এসেছিলেন পণ্ডিত ধ্রুবতারা যোশী। জীবনের পড়ন্ত বেলায় ইনি এখানে এসেছিলেন। জীবনের শেষ বছরগুলি কাটিয়ে গেছেন এখানেই। এই দুই গুণীর জন্য সঙ্গীত পিপাসু মানুষ তৃপ্ত হয়েছেন সত্যি কিন্তু এঁদের কোন উল্লেখযোগ্য উত্তরসূরী বর্ধমানে তৈরী হয়নি, যিনি সর্বভারতীয় সঙ্গীত সমাজে নিজের স্থান করে নিতে পেরেছেন।

।। পাঁচ ।।

বর্ধমানে যেসব প্রাচীন দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া গেছে, তার পূর্ণ তালিকা দেওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া কালনা এবং কাটোয়া মহকুমা প্রসঙ্গে আলোচনায় এ বিষয়ে কিছু তথ্য দেওয়া

হয়েছে। গত এক বছরে কোগ্রামের কাছে অজয় এবং কুনুর নদী থেকে বেশ কয়েকটি বিভিন্ন ধরনের মূর্তি পাওয়া গেছে, যার কালনির্ণয় নিশ্চিতভাবে হয় নি। বিভিন্ন দেবদেবী অনুযায়ী এখানে সংক্ষিপ্ত একটি আলোচনা দেওয়া হল।

১৯৭০ সালে বর্ধমান শহরের আলমগঞ্জে মাটি খুঁড়তে গিয়ে একটি বৃহৎ শিবলিঙ্গ পাওয়া যায়। এর সঙ্গে পাওয়া যায় একটি বিষ্ণু মূর্তির নীচের দিকের ভগ্ন অংশ। গরুড়ের পিঠে উপবিষ্ট এই মূর্তির একটি পা মাত্র বর্তমান আছে। গরুড় মূর্তির দুই হাত বুকের কাছে অঞ্জলীবদ্ধ। কাটোয়া মহকুমার চৈতন্যপুরে একটি বিশেষ ধরনের বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া গেছে। দণ্ডায়মান এই বিষ্ণুমূর্তির দুই হাতে শঙ্খ ও পদ্ম। অপর দুই হাত দুপাশের গদাদেবী ও চক্রপুরুষের মাথায় রক্ষিত।

শক্তিমূর্তির মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য বর্ধমান শহরের রাঢ়েশ্বরী বা সর্বমঙ্গলা মূর্তি। অষ্টাদশভুজা মহিষাসুর মর্দিনী এই মূর্তিটি পাওয়া গিয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি। মূর্তিটির পাদপীঠে অজ্ঞাত লিপিতে কিছু লেখা ছিল। যার পাঠোদ্ধার হয় নি এবং বর্তমানে যা নষ্ট হয়ে গেছে। কাঞ্চননগরে প্রায় ছয় ফুট উঁচু কষ্টিপাথরে খোদাই করা অষ্টভুজা কঙ্কালেশ্বরী কালীমূর্তিও অদ্ভুত। কেউ এই মূর্তিকে বলেছেন মন্বন্তরী মূর্তি, কেউ বলেছেন চামুণ্ডা মূর্তি, কেউ বলেছেন বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবী মূর্তি। মূর্তির বিশেষত্ব দেহের শিরা, ধমনী ও পেশীগুলি খোদাই করে দেখানো আছে। বর্ধমান শহর থেকে সাত কিলোমিটার উত্তর পূর্বে মীর্জাপুর গ্রামে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে পাওয়া গিয়েছিল চতুর্ভুজা, সিংহবাহিনী জয়দুর্গা। শহরের তেইশ কিলোমিটার উত্তর পশ্চিমে সাটীনন্দী গ্রামে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে পাওয়া গিয়েছিল চতুর্ভুজা মহালক্ষ্মী মূর্তি। মূল মূর্তিটি বর্তমানে চুরি হয়ে গেছে তবে তার একটি প্রতিলিপি বর্তমানে ওই গ্রামে রাখা আছে। কাটোয়া মহকুমার অট্টহাস গ্রামে চামুণ্ডা দেবীর একটি অদ্ভুত মূর্তি পাওয়া গেছে।

ভাতার ব্লকের বাবলাডিহি গ্রামে ন্যাংটেশ্বর নামে পূজিত হচ্ছে যে মূর্তি, সেটি শিবমূর্তি বলে পূজিত হলেও কোন কোন গবেষকের মতে এটি কোন জৈন তীর্থঙ্করের মূর্তি। কেতুগ্রামের উজানী গ্রামে পাওয়া গেছে জিন শান্তিনাথের মূর্তি।

মন্তেশ্বর থানার পাতুন গ্রামে বেশ কিছু পাথরের মূর্তির ভগ্নাংশ পাওয়া গেছে। সেগুলির সনাক্তকরণ হয়নি। দুর্গাপুর মহকুমার আড়া গ্রামের রাঢ়েশ্বর শিব এবং কাছাকাছি নগরের ভগ্নস্তূপ এবং ভাঙা পাথরের মূর্তি পাওয়া গেছে বেশ কিছু। কারো অনুমান এটি মেগাস্থিনীস বর্ণিত গঙ্গারিডি রাজ্যের রাজধানী, কারো মতে এই নগর ছিল প্রাচীন গোপভূমের রাজধানী।

// ছয় //

বর্ধমানের লৌকিক দেবদেবীর মধ্যে প্রধান ধর্মরাজ, চণ্ডী এবং মনসা। অমলেন্দু মিত্র তাঁর 'রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর' গ্রন্থে ধর্মরাজের উৎস এবং স্বরূপ খুঁজতে গিয়ে বৈদিক সূর্য্য, বরুণ, ধর্ম ইত্যাদি দেবতা, সাঁওতালদের মারাংবুরু, এমনকি মিশরীয় দেবতার সঙ্গেও

সাদৃশ্য খুঁজেছেন। কিন্তু তাঁর সিদ্ধান্ত ধর্মঠাকুরের কল্পনা একেশ্বরবাদের সঙ্গে মেলে। তাছাড়াও ধর্মঠাকুরের শ্বেত অশ্ববাহন যে রূপ কল্পনা করা হয়, তা কোন বৈদিক দেবতার সঙ্গে মেলে না। মন্ত্র সম্পূর্ণ বাংলা। কোথাও কোথাও ব্রহ্মণ্য প্রভাবে সংস্কৃতের ব্যবহার হলেও তার পরিমাণ যৎসামান্য। পূজারী অল্প ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে ডোম, বাগদী, কোটাল - এই সব সম্প্রদায়ের। আর একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ধর্মঠাকুরের পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে আছে, তা হল রাঢ়ের উগ্রক্ষত্রিয় বা আগুরিদের সঙ্গে ধর্মঠাকুরের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। ঐতিহাসিক কাল থেকে আগুরী এবং সদগোপরাই ছিল রাঢ় অঞ্চলের ভূস্বামী। ফলে ধর্ম ঠাকুরের সেবা-পুজোয় আগুরীরা অপরিহার্য হবার একটা কারণ থেকে যেতে পারে। গুপ্ত যুগে রাঢ় অঞ্চল বৌদ্ধ প্রভাবিত হবার ফলে ধর্মঠাকুর কোথাও কোথাও বুদ্ধ হিসাবে রূপান্তরিত হয়ে থাকতে পারেন। পুজোও এক্ষেত্রে হয় বৈশাখী পূর্ণিমায়। সেন যুগে ব্রহ্মণ্য প্রভাবে অনেক জায়গায় ধর্ম ঠাকুর শিবে রূপান্তরিত হয়েছেন, যা বোঝা যায় শিব মন্দিরের কাছাকাছি মনসার অবস্থানে। বহু গবেষকের এটাও মত যে বর্তমানে শিবের গাজন বলে যা চলে, তা আসলে ছিল ধর্মরাজের গাজন। এর সপক্ষে দুটো প্রমাণের উল্লেখ করা যায়। যেমন কুড়মুন, এরাচিয়া, কুবাচপুর এবং কালিপাহাড়ী অঞ্চলে গাজনের সন্ন্যাসীদের মরার মাথা নিয়ে নাচ এবং কোথাও কোথাও (যেমন কালিপাহাড়ী) শিবের গাজনে বলি হয়। এই বলি মূল বিগ্রহের সামনে না হয়ে কাছাকাছি অবস্থিত ভৈরবের সামনে হয়। শিব পুজোয় বলির কোন বিধান নেই, অন্যদিকে ধর্মরাজের পুজোয় বলি আবশ্যিক।

মনসা সম্পর্কেও বলা যায় বৈদিক দেবী সরস্বতী সর্পদেবী। কিন্তু মনসা এবং সরস্বতী এক নন। প্রাচীন যুগে পূর্ব এবং উত্তর ভারতে নাগ জাতি বলে এক উন্নত সভ্যতার মানুষদের বাস ছিল, যারা বেদানুসারী ছিলেন না। মহাভারতের অর্জুন নাগকন্যা উলূপীকে বিবাহ করেছিলেন। মনসামঙ্গলের কাহিনীতে চাঁদ সদাগরের পুত্র লখিন্দরকে বাসর ঘরে কালনাগিনীর দংশনকে কোন কোন গবেষক মনে করেন এটি সর্প দংশনের ঘটনা নয়, নাগ জাতির প্রতিশোধের ঘটনা। কারণ নাগ জাতির প্রতিশোধ নেবার বিশেষত্ব ছিল তারা আগেই জানিয়ে দিয়ে শত্রুকে শয়ন ঘরে বিষ প্রয়োগে হত্যা করত।

ধর্মরাজ, মনসা এবং চণ্ডীর ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রায় কোথাওই বাঁধানো মন্দির নেই, অধিকাংশ ক্ষেত্রে গাছতলায় বা উন্মুক্ত আকাশের নীচে এঁদের 'থান'। ধর্মরাজের শক্তি হিসাবে বহু জায়গাতেই দেখা যায় পাশাপাশি মনসা বা চণ্ডীর অবস্থান। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধর্মরাজ, মনসা এবং চণ্ডীর কোন মূর্তি নেই। কোন গোল পাথরকে বিগ্রহ হিসাবে পুজো করা হয়।

ভরতপুরের স্তূপ

অট্টহাস চামুণ্ডা

কঙ্কালেশ্বরী কালী - কাঞ্চননগর

বহরাম সাক্কার সমাধি - বর্ধমান
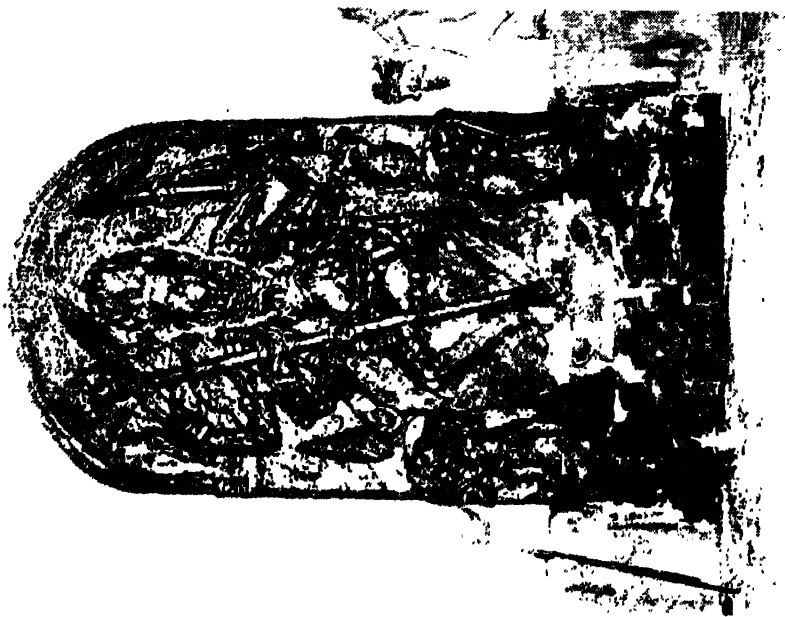
গোপালজীউ মন্দির - কালনা
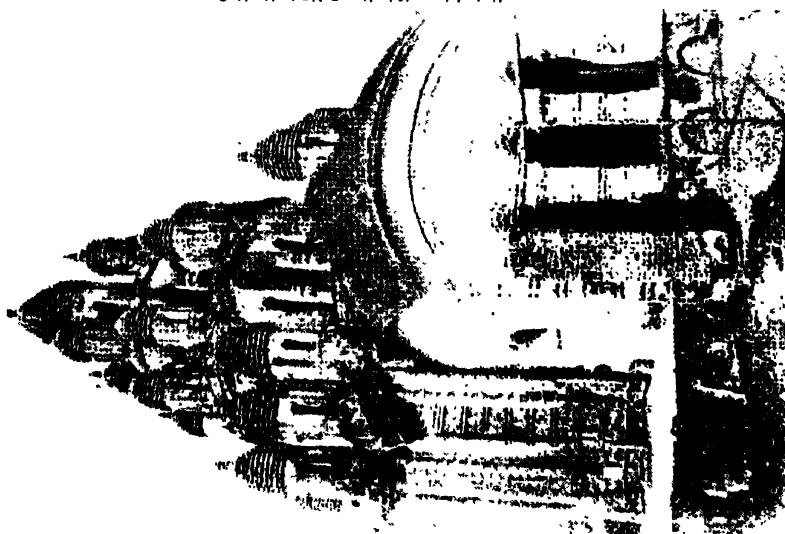
হোসেনশাহী মসজিদ - মঙ্গলকোট
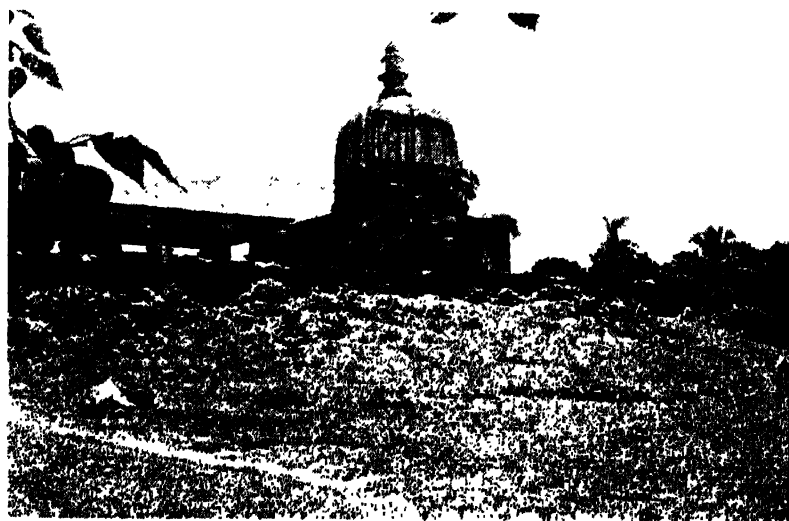
জলেশ্বর মন্দির - জৌগ্রাম
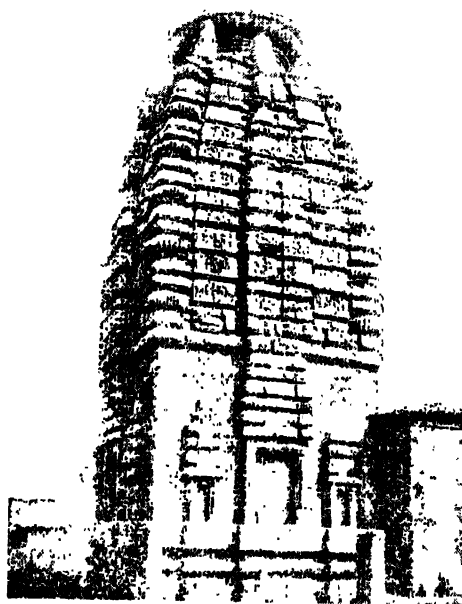
বরাকরের দেউল

গড়তালিত
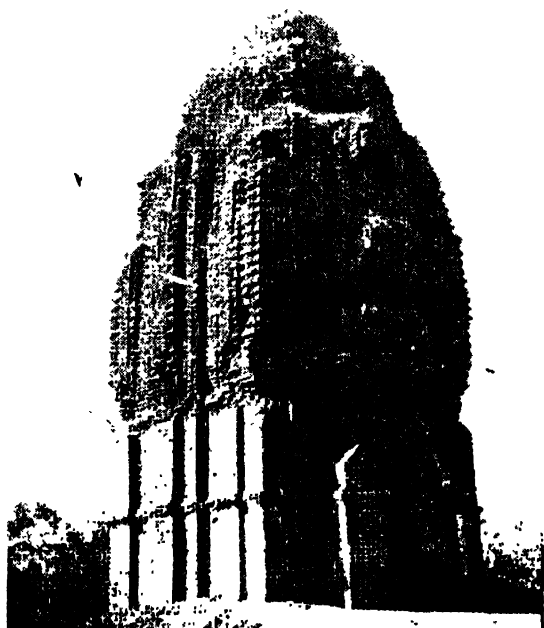
সাতদেউলিয়া
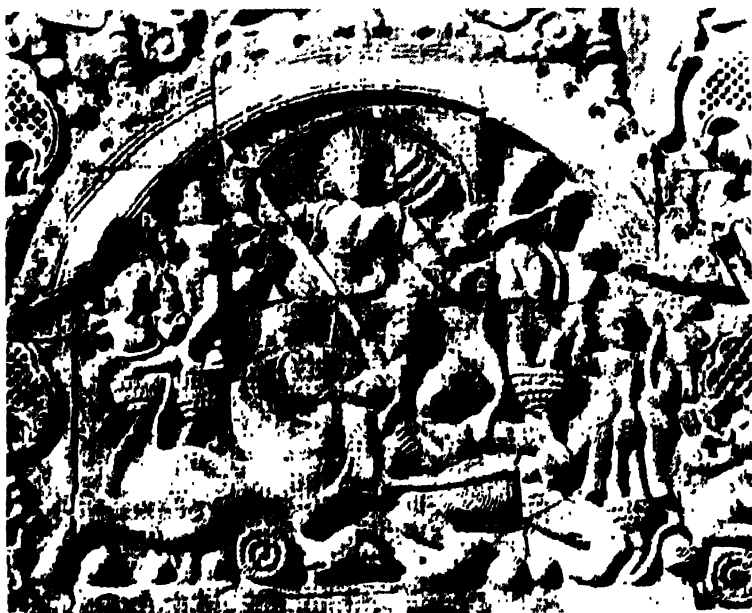
বর্ধমান সর্বমঙ্গলা (রাঢ়েশ্বরী) মন্দিরে টেরাকোটা প্যানেল
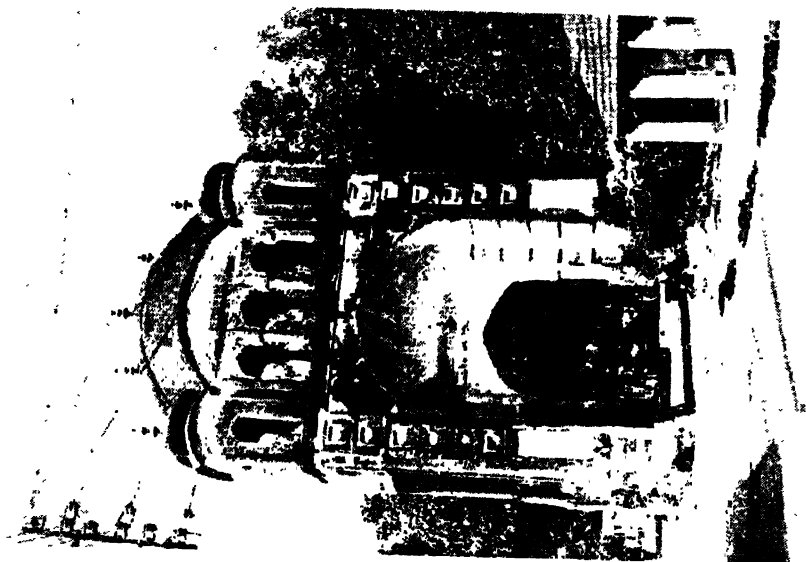
বারদুয়ারী - কাঞ্চননগর
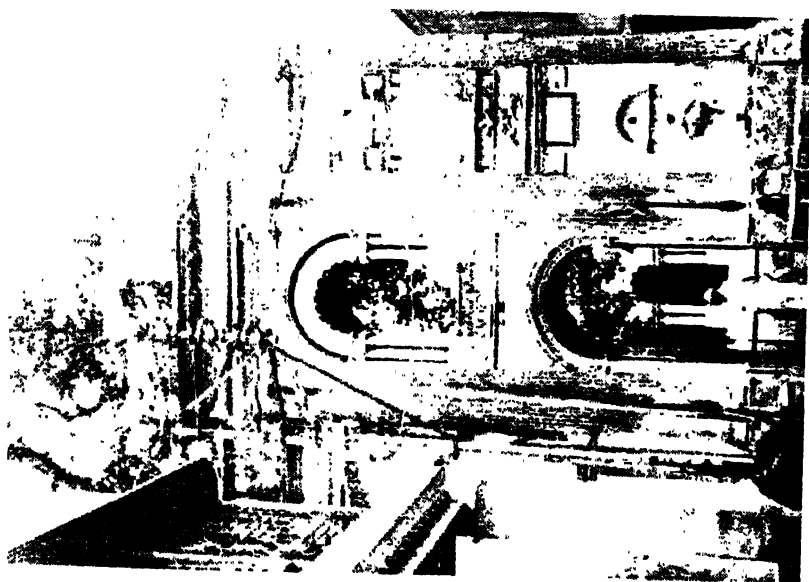
গৌরাঙ্গবাড়ী - কাটোয়া

ইছাই ঘোষের দেউল - কাঁকসা

বর্ধমান জেলার প্রত্নতত্ত্ব

যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী

আঞ্চলিক ইতিহাস রচনায় প্রত্নতত্ত্বের ভূমিকা অপরিহার্য। প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির ঐতিহ্য-এর আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করা যায় যে, পর্যাপ্ত লেখ্য উপাদানের অভাবে প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের সাহায্যে প্রাচীন ইতিহাস রচনা সম্ভবপর। লেখ্য উপাদান ও প্রাচীন মুদ্রা হল আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কিন্তু অনেক সময় এ সকল বস্তু সহজলভ্য নয়। যে কোন অঞ্চলের মানবগোষ্ঠীর বিবর্তনের ইতিহাসকে অনুধাবন করতে হলে প্রত্নবস্তুর সাহায্যে সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে কিছুটা অনুমান করা যায়। আধুনিককালে ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব চর্চার ক্ষেত্রে প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রত্নতত্ত্ব বিশেষ গুরুত্বলাভ করলেও ঐতিহাসিক পর্বের প্রত্নচর্চায় গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। পাণ্ডুরাজার ঢিবি উৎখননের ফলে বর্ধমান জেলায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানবগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইতিহাস সম্পর্কে উৎসাহ দেখা গেলেও বর্ধমান, মঙ্গলকোট, ইন্দ্রানী, কালনা, ঢেকুর প্রভৃতি ঐতিহাসিক যুগের স্থান সমুহের প্রত্নচর্চার কোন নিদর্শন নেই।

বঙ্গদেশের যেকোন অঞ্চল অপেক্ষা রাঢ় জনপদের প্রাচীনত্ব অধিক। সমগ্র রাঢ় অঞ্চলে আবিষ্কৃত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন দৃষ্টে নিঃসন্দেহে মন্তব্য করা যায় যে, প্রস্তর যুগ হতে ঐতিহাসিক কাল পর্যন্ত এই অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে বসবাসকারী মানবগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ে বঙ্গদেশে মানবসভ্যতার বিবর্তনের ধারায় এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল। প্রস্তর আয়ুধ ব্যবহারের যুগ হতে ঐতিহাসিক কাল পর্যন্ত বর্ধমান জেলার মানবগোষ্ঠীর ক্রমবিবর্তনের নজির সমূহ থেকে এক ধারাবাহিক ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রস্তর যুগের শেষ পর্বে বর্ধমান জেলার বীরভানপুরে শিকারজীবি মানুষেরা অধিবসতি স্থাপন করে। শেষ প্রস্তর যুগের মানুষ মুলতঃ ছিল যাযাবর ও পশুশিকারী, যারা আরও পরবর্তী পর্যায়ে খাদ্য সংগ্রহের পরিবর্তে খাদ্য উৎপাদনের কলাকৌশল আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিল। ফলে কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল এবং এই সমাজ জীবনের উন্নততর পর্যায়কে তাম্রাশ্মীয় যুগ বলে চিহ্নিত হয়েছে।

বর্ধমান জেলার কাঁকসার নিকট সাতকাহনিয়া ও পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে শিলীভূত গাছের অংশ থেকে নির্মিত আয়ুধ আবিষ্কৃত হয়েছে। অজয় নদের সন্নিকটে বনকাটিতে অনুরূপ আয়ুধ পাওয়া গেছে। শিলীভূত কাঠে মানুষের দ্বারা তৈরী বস্তু সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে কোন গবেষণা হয় নি। প্রত্নতত্ত্ববিদ ননীগোপাল মজুমদার দুর্গাপুর অঞ্চলে এগেট, চার্ট, যসপার, চালসেডনি ও ফ্লিট পাথরের আয়ুধ আবিষ্কার করেছিলেন। যে মানবগোষ্ঠী এ সকল আয়ুধ ব্যবহার করত তারা বীরভানপুর, আড়া, বনকাটি, কাঁকসা, সাগরডাঙ্গা, গোপালপুর প্রভৃতি অঞ্চল হতে ক্রমশঃ অজয় কুনুর অববাহিকা ধরে উত্তরে কেতুগ্রাম হয়ে সম্ভবতঃ বীরভূম জেলায় ছড়িয়ে পড়েছিল। কেবলমাত্র বর্ধমান জেলায় নয়, রাঢ় অঞ্চলের অরণ্যময়

উচ্চভূমিতে প্রাগৈতিহাসিক মানবগোষ্ঠীর প্রস্তরায়ুধ দৃষ্টে অনুমান করা যায় যে, নবাশ্মীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট জ্ঞাপক মসৃণ কুঠার ও অন্যান্য শিকারজীবি মানুষের আয়ুধের ব্যবহার কোন সুনির্দিষ্ট অধিবসতিকে চিহ্নিত করতে পারে।

নব্যপ্রস্তর যুগের প্রত্নক্ষেত্র

দামোদর নদের উত্তর তীরে দুর্গাপুরের কাছে বীরভানপুর নামক গ্রামে প্রাগৈতিহাসিক মানব সংস্কৃতির পুরাবস্তু আবিষ্কৃত হয়েছিল। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে পাশ্ববর্তী নড়িহা গ্রামের জমিদার অজিত কুমার মুখোপাধ্যায় দামোদর নদের উত্তর তীরে প্রস্তরায়ুধের সন্ধান পেয়ে পুরাতত্ত্ব বিভাগের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের সুপারিন্টেনডেন্ট প্রয়াত ননীগোপাল মজুমদার এই অঞ্চল পরিদর্শন করে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রস্তরায়ুধের নমুনা সংগ্রহ করেন। দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব সর্বেক্ষণের পূর্বাঞ্চলীয় অধিক্ষক বি.বি.লাল স্বল্প পরিসরে উৎখনন কার্য পরিচালনা করেন। পুনরায় ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রী লালের নেতৃত্বে বীরভানপুর প্রত্নক্ষেত্রে উৎখনন কার্য শুরু হলে নব্যপ্রস্তর যুগের একটি পর্বের ইতিহাস উন্মোচিত হয়। এই স্থানে ক্ষুদ্রাশ্মীয় নিদর্শনাবলী সহ বসবাসের নির্মিত কুটিরের চিহ্নস্বরূপ খুঁটি পোতার গর্তের সন্ধান পাওয়া গেছে। কিন্তু ঐ মানব গোষ্ঠীর ব্যবহৃত কোন মৃৎপাত্র আবিষ্কৃত হয় নি।

ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের এক প্রতিবেদনে উক্ত অধিবসতি স্থলের মানবগোষ্ঠী সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এদের ব্যবহৃত পাথরে নির্মিত অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, উক্ত নিদর্শনাবলীর অধিবাসীগণ পশুশিকারী ছিল। মৃত্তিকার গঠনপ্রণালী দেখে বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করেছেন যে, দীর্ঘ আর্দ্রতার অবসানের পর হেলোসিন পর্বের মধ্যকালে অনুকুল পরিবেশে আলোচ্য স্থানে অধিবসতি শুরু হয়েছিল। সেই অনুকুল পরিবেশে গহন অরণ্য মধ্যে বিচরণশীল অরণ্যচারী জীবজন্তু ছিল তাদের জীবন ধারণের প্রধান উপায় অর্থাৎ তারা পশু শিকারী হয়েছিল এবং অধিবসতি অঞ্চলের সন্নিকটবর্তী অংশ দিয়ে প্রবল স্রোত সমন্বিত দামোদর নদ বয়ে যেত। এরূপ এক নির্মল পরিবেশে নদীতীরে বসবাসকারী ও পশু শিকারজীবি মানবগোষ্ঠী প্রস্তর যুগের শেষ পর্বে আবির্ভূত হয়েছিল।

দক্ষিণ ভারতে তিরুচেন্দুরে প্রাপ্ত নিদর্শনগুলিকে বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনার ভিত্তিতে খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০০ বৎসর পূর্বের বলে নির্দেশ করা হয়েছে ; অনুরূপ কারণে বীরভানপুরের পাথরের হাতিয়ার সমূহের নির্মাণকালকে একই প্রাচীনত্বে নিয়ে যাওয়া যায় অর্থাৎ প্রায় ৬০০০ বৎসর পূর্বে বর্ধমান জেলার দামোদর নদের তীরে এক আদিম মানবগোষ্ঠী বসবাস করত। নিকটবর্তী খেজুড়ী, মলনদিঘী ও গোপালপুরে অনুরূপ নিদর্শনাবলী আবিষ্কৃত হয়েছে।

বীরভানপুরের মাইক্রোলিথিক যুগের মানবগোষ্ঠী জীবনধারণের প্রয়োজনের তাগিদে ধীরে ধীরে যাযাবর বৃত্তি পরিত্যাগ করে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে। সম্ভবতঃ সে কারণে

পরবর্তী পর্যায়ের মানবগোষ্ঠী পশুশিকারের সঙ্গে সঙ্গে পশুপালন ও খাদ্যোৎপাদন বিষয়ে সচেষ্ট ছিল। এরূপ পরিবর্তিত সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে 'নবপলীয় যুগ' নামে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। নবাশ্মীয় সংস্কৃতির আয়ুধ সমূহের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল প্রস্তর নির্মিত বিভিন্ন আকৃতিতে গঠিত মসৃণ কুঠার। নবপলীয় যুগের মসৃণ কুঠার রাঢ়ের পশ্চিমাঞ্চলে প্রায় সর্বত্রই আবিষ্কৃত হয়েছে। কাটোয়া শহরে মহকুমা গ্রন্থাগারে এরূপ তিনটি ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির আয়ুধ সংরক্ষিত আছে। প্রস্তরনির্মিত অস্ত্র হতে আদিম মানবগোষ্ঠীর শিল্পকলা জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

তাম্রাশ্মীয় সভ্যতার উন্মেষ

নব্য প্রস্তর যুগ অতিক্রম করে আদিম মানব সমাজ এক যুগান্তকারী সভ্যতার পরিচয় বহন করতে সমর্থ হয়। পশু শিকার ও পশুপালন পর্যায় হতে উন্নীত হয়ে তারা মৃৎপাত্র ও তামার ব্যবহার এবং নির্মাণ কৌশল আয়ত্ত্ব করতে সক্ষম হয়েছিল এবং সর্বশেষ লোহার ব্যবহার আয়ত্ত্বাধীন হওয়ায় সীমিত ক্ষেত্রে ঐ যুগের মানুষ যন্ত্র সভ্যতার সূচনা করে। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ তাম্রবস্তুর নির্মাণকৌশল আবিষ্কার ও ব্যবহারের যুগকে তাম্রাশ্ম বা তাম্রাশ্মীয় অথবা তাম্র-প্রস্তর যুগ নামে অভিহিত করেছেন। তামা ও লোহাকে সংমিশ্রণ করে মানুষ তার প্রয়োজনে লাগাতে সক্ষম হল, যে যুগকে প্রত্নতাত্ত্বিক পরিভাষায় তাম্র-লৌহের মিশ্র যুগ (Chalco - Ferrow cultural period) বলা উচিত। কারণ আরও পরবর্তীকালে ধাতু হিসাবে লোহা যে সময়ে প্রধান স্থান অধিকার করে সে যুগকে লৌহ যুগ নামে অভিহিত করা হয়েছে ।

তাম্রাশ্মীয় পার্বের প্রত্নক্ষেত্র

তাম্রাশ্মীয় সভ্যতার উদ্ভব মানব সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এক বিস্ময়কর ঘটনা। বিভিন্ন প্রত্নক্ষেত্রগুলি হতে আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তু থেকে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দে বর্ধমান জেলার প্রাচীন মানব সমাজ ও তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। এই জেলায় আবিষ্কৃত প্রত্নক্ষেত্রগুলির মধ্যে পাণ্ডু রাজার ঢিবি, মঙ্গলকোট, বাণেশ্বর ডাঙ্গা, ভরতপুর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

পাণ্ডু রাজার ঢিবি

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধীক্ষক দেবকুমার চক্রবর্তী ও ডঃ শ্যামচাঁদ মুখোপাধ্যায় অজয় নদের অববাহিকায় পাণ্ডুক গ্রামে তাম্রাশ্মীয় যুগের কয়েকটি নিদর্শন সংগ্রহ করে ঐ বিভাগের তদানীন্তন অধিকর্তা পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ভেদিয়া রেলস্টেশন হতে ১০ কিলোমিটার পশ্চিমে প্রত্নস্থলটি অবস্থিত। জনশ্রুতি আছে যে, উক্ত স্থানে পাণ্ডু বা পাণ্ডুদাস নামক একজন রাজার গড় ছিল, যা পরিত্যক্ত একটি উঁচু ঢিবিতে পরিণত হয়েছে। গ্রামের উত্তর-পশ্চিম ভাগে উচ্চ ভূ-ভাগটি 'রাজার পোতার

ডাঙ্গা' নামে অভিহিত করা হয় এবং নিকটবর্তী খটনগর গ্রামের দক্ষিণ - পশ্চিম ভাগে বারাসত ডাঙ্গায় উক্ত রাজার ধর্মাধিকরণ ও সৈন্যাবাস ছিল এরূপ প্রবাদ আছে।

১৯৬২,১৯৬৩,১৯৬৪ ও ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে মোট চারবার এই ঢিবিতে উৎখনন কার্য পরিচালনা করা হয়েছিল। উৎখননের ফলে অজয় নদ অববাহিকায় তাম্রাশ্মীয় সভ্যতার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়। এই স্থানের প্রত্নবস্তুর নিদর্শন হতে জানা যায় যে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বৎসর পুর্বে একটি প্রাচীন জনবসতি গড়ে উঠেছিল। ঢিবির সর্বোচ্চ অংশ হতে ১৫ ফুট নীচে আদিম স্তর বা প্রথম স্তরে প্রাপ্ত নিদর্শনাবলী হতে উক্ত স্থানের মানবগোষ্ঠীর ব্যবহৃত দ্রব্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল -ঈষৎ লালচে রং- এর মৃৎপাত্র, হাল্কা বাদামী রংয়ের কলস, কৃষ্ণ-লোহিত মৃৎপাত্র, ধানের ব্যবহার, করোটিবিহীন ৬ টি নরকঙ্কাল ইত্যাদি। মৃৎপাত্রের মধ্যে কৌতুহলোদ্দীপক হল এক ধরনের থালার ভগ্ন অংশ, যার নিম্নাংশে পিলসুজের ন্যায় খাড়া দণ্ডের উপর স্থাপিত। পাথর অপেক্ষা পলিমাটির প্রাচুর্যের জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় তৈজসপত্র নির্মাণে ঐ যুগের মানুষ বিশেষভাবে পারদর্শী ছিল। দুর্গ, রাজগৃহ ও দেবালয় নিমার্ণের জন্য মাটির তৈরী ইঁট রোদে শুকিয়ে ও কাঠের আগুনে পুড়িয়ে ব্যবহার শুরু হয়েছিল। যা আরও পরবর্তীকালে বাস্তব জগতের দৃশ্যাবলী খোদাই করে বা ছাঁচে ঢেলে আগুনে পুড়িয়ে 'টেরাকোটা আর্টের' সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়।

দ্বিতীয় স্তরে আবিষ্কৃত ৯ টি মানব সমাধির বৈচিত্র ও গুরুত্ব অসীম। এই স্তরে আবিষ্কৃত কুম্ভ-সমাধি পূর্ব ভারতের অন্যান্য স্থানে পাওয়া গেছে। ক্ষুদ্রাশ্মীয় হাতিয়ার ও তাম্রনির্মিত দ্রব্যের মধ্যে অলঙ্কার, চুড়ি, কাজলকাঠি, আংটী, মৎস শিকারের বঁড়শি, বর্শাফলক প্রভৃতি আবিষ্কৃত হয়েছে। কর্তনের নিমিত্ত অস্ত্র, পুঁতি ও তামার তৈরী কর্ণাভরণ হল উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার। হাড়ের তৈরী বর্শাফলক ও তীরের অগ্রভাগ, মৃগশৃঙ্গ হতে নির্মিত তীর ও হাড়ের তৈরী হারপুন, যেগুলি এযুগের মানুষের শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক। একটি সচ্ছিদ্র জলহস্তীর দাঁতে নির্মিত বস্তুকে প্রত্নতত্ত্ববিদগণ মাদুলি বলে সনাক্ত করেছেন। শিমুল তুলা দ্বারা তৈরী সরু সূতোয় বোনা কাপড়ের ছিন্নভিন্ন অংশ এবং পোড়ামাটির গোল তকলি দৃষ্টে অনুমান করতে অসুবিধা হয়না যে, পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে বসবাসকারীগণ বয়নশিল্পে পারদর্শী ছিল এবং তারা সম্ভবতঃ নিজেদের তৈরী বস্ত্র পরিধান করত। দ্বিতীয় স্তরে একটি সমাধির নিকট প্রাপ্ত একখণ্ড পোড়া কাঠকয়লা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় হতে তেজস্ক্রিয় অঙ্গার চতুর্দশ (C -14) পরীক্ষান্তে এই স্তরের সময়কাল নির্ণয় করেছে খ্রীষ্টপূর্ব ১২১০ ± ১২০ অর্থাৎ এই স্তরের অধিবসতি খ্রীষ্টপূর্ব দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিল। বীরভূম জেলার মহিষদলে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তু অঙ্গার চতুর্দশ (C -14) পরীক্ষান্তে জানা গেছে যে, খ্রীষ্টপূর্ব নবম-দশম শতকে এই স্তরের উন্মেষকাল। তাহলে এ সকল নমুনা পরীক্ষার দ্বারা অনুমান করা যায় যে, খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দে পাণ্ডুরাজার ঢিবির সভ্যতার প্রথম উন্মেষ কাল। এই প্রসঙ্গে পুরাতত্ত্ববিদ কৃষ্ণস্বামীর মূল্যবান অভিমত থেকে জানা যায় যে, প্রাগৈতিহাসিক বাংলায় এই সভ্যতার উত্থান হয় আরও অতীতে আজ থেকে চার

হাজার বৎসর পূর্বে।

চতুর্থ স্তরের নিদর্শন সমূহকে প্রাচীন ঐতিহাসিক যুগের সূচনা পর্ব বলে অনুমান করা হয়েছে। এই স্তরে প্রাপ্ত মৃৎপাত্রগুলির গায়ে কাঁচা অবস্থায় নক্সা কেটে পোড়ানো হয়েছিল, তা রেখাগুলির রঙের স্থায়িত্ব দেখে বোঝা যায় যে, ঐ রেখাগুলি পোড়ানোর পূর্ব অবস্থায় অঙ্কন করা হয়েছিল। মৃৎপাত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল হাঁড়ি, হাতলযুক্ত কড়াই, অগভীর চওড়া পাত্র, জলসঞ্চয়ের বড় মৃৎপাত্র, হাপর যুক্ত উনান ইত্যাদি। ঢিবির উপরিভাগে পোড়া ইঁটের স্থাপত্য দৃষ্টে উৎখননকারীগণ অনুমান করেন যে, এটি দশম - একাদশ শতকে নির্মিত হয়েছিল। এই অংশে খ্রীষ্টীয় দশম - একাদশ শতকের কয়েকটি প্রাচীন প্রস্তরমূর্তির সন্ধান মিলেছে, তন্মধ্যে একটি বিষ্ণু লোকেশ্বর মূর্তি ছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, ঢিবির সন্নিহিত পূর্বে যে, প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায় সেখানে দুটি বিষ্ণুমূর্তি আছে। বর্তমানে ঐ ধ্বংসাবশেষের মধ্যে আশ্বিন মাসে মহাসমারোহে চণ্ডীপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

ভরতপুর

ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ - এর পূর্বাঞ্চলীয় শাখা ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে বুদবুদ থানার অধীনস্থ ভরতপুরে ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে স্বল্প পরিসরে উৎখনন কার্য পরিচালিত হয়েছিল। প্রত্নস্থলটি পানাগড় হতে ৭ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে দামোদর নদের উত্তর তীরে অবস্থিত। প্রাথমিক রিপোর্ট হতে জানা গেছে যে, সর্বনিম্ন স্তরে প্রাগৈতিহাসিক যুগে ব্যবহৃত প্রস্তর নির্মিত আয়ুধ এবং তার উপরের স্তরে তামার দ্রব্য , জীবজন্তুর হাড়ের তৈরী ব্যবহারিক দ্রব্য , নানা রংয়ের পুঁতি, অলঙ্কার ও বিভিন্ন রং-এ রঞ্জিত বিচিত্র গঠনের মৃৎপাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। অঙ্গার চতুর্দশ পরীক্ষান্তে জানা গেছে যে, সর্ব নিম্নস্তরের তাম্রাশ্মীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিদর্শনাবলী খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ের। ভরতপুরের ঢিবিতে উৎখনন কালে পাণ্ডুরাজার ঢিবির সমপর্যায়ভুক্ত সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে।

সর্বশেষ স্তরে ঐতিহাসিক যুগের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্যের সন্ধান মিলেছে। এই স্তরে পঞ্চরথাকৃতি একটি বৌদ্ধ স্তূপের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে, যা অষ্টম - নবম শতকে নির্মিত বলে অনুমান করা হয়। বিশেষজ্ঞগণের মতে দামোদরের প্লাবনে প্রাগৈতিহাসিক যুগের অধিবসতিটি দীর্ঘকাল পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল এবং পরবর্তীকালে এই স্থানে বৌদ্ধ স্তূপ নির্মিত হয়েছিল। ইষ্টক নির্মিত বর্গাকার আয়তনের (১২.৭৫ মিটার x ১২.৭৫ মিটার) স্তূপটির চতুর্দিক কারুকার্যমণ্ডিত এবং বৃহদাকার কুলুঙ্গিতে ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় পদ্মাসনে উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। ধ্বংসপ্রাপ্ত স্তূপের মোট কুলুঙ্গি সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভবপর না হলেও ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় বজ্রাসনে উপবিষ্ট ৬ টি কুলুঙ্গিতে বুদ্ধমূর্তিগুলি পাওয়া গেছে। এছাড়া ধ্বংসস্তূপের মধ্যে নরম বালি পাথরের কয়েকটি বুদ্ধমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। অনেকের মতে স্তূপটির স্থাপত্য নিদর্শন ওড়িশার রত্নগিরি স্তূপের অনুরূপ।

সর্বসাকুল্যে মোট এগারটি বুদ্ধমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে।

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত পুঁথিতে 'তুলাক্ষেত্র বর্ধমান স্তুপ' - এর উল্লেখ আছে। সমগ্র রাঢ় অঞ্চলে ভরতপুরের স্তুপ ব্যতীত অপর কোন বৌদ্ধস্তুপ আবিষ্কৃত হয়নি। সঙ্গত কারণে অনুমান করা যায় যে, তুলাক্ষেত্র বর্ধমান স্তুপ ভরতপুরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

মঙ্গলকোট

বর্ধমান শহর হতে ৩২ কিলোমিটার উত্তরে প্রাচীন বাদশাহী সড়কের ধারে অজয় - কুনুর অববাহিকায় মঙ্গলকোট গ্রাম অবস্থিত। প্রত্নস্থল হিসাবে মঙ্গলকোট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাম্রাশ্মীয় সভ্যতার উদ্ভবের সময় হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে জনবসতি ও প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন এখানে আবিষ্কৃত হয়েছে। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মঙ্গলকোট পরিদর্শন করেছিলেন। এই স্থানের প্রধান প্রত্নস্থল বিক্রমাদিত্যের ঢিবি নামে পরিচিত এবং নূতনহাট হতে মঙ্গলকোট যাবার পথে গ্রামের বর্হিভাগে অবস্থিত। প্রত্নক্ষেত্রটির আয়তন প্রায় ৭০ বিঘা এবং এর উচ্চতা ১০ ফুট হতে ৩০ ফুট পর্যন্ত। প্রাচীন মঙ্গলকোটের ব্যাপ্তি ছিল উজানী - কোগ্রাম,নূতনহাট, বক্সীনগর, বড়বাজার, পদিমপুর প্রভৃতি গ্রাম নিয়ে।

তাম্রাশ্মীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বর্ধমান জেলার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থান হল মঙ্গলকোট। এছাড়া কুনুর নদীর তীরে নবাশ্মীয় কুঠারসহ অন্যান্য প্রস্তরায়ুধ আবিষ্কৃত হয়েছে। ১৯৯০ খ্রীষ্টাব্দে ২২ শে এপ্রিল 'The Statesman' পত্রিকায় প্রকাশ যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক উৎখনিত মঙ্গলকোটের প্রত্নক্ষেত্রে তাম্রপ্রস্তর যুগ থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত একটা ধারাবাহিক উন্নত সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। মাটির নীচে পাকা ইঁটের তৈরী গৃহের ভগ্নাবশেষ, পয়ঃপ্রণালী, কুষাণ ও গুপ্তযুগের ব্যবহৃত সীলমোহর, মৃৎপাত্র, অলঙ্কৃত প্রস্তর, ছাঁচে - ঢালা তাম্রমুদ্রা ও টেরাকোটা মূর্তি ইত্যাদি প্রত্নসম্ভার হতে অনুমান করা হয় যে, কুষাণ ও গুপ্তযুগে মঙ্গলকোটে একটা সমৃদ্ধশালী নগর সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। মানব-শব সমাধি দেওয়ার রীতি নীতি প্রচলিত ছিল বলে অনুমান করা হয়েছে এবং তাম্রপ্রস্তর যুগের রীতি অনুযায়ী সমাধির সন্নিকটে কৃষ্ণ-লোহিত বর্ণের মৃৎপাত্রের নিদর্শনও আবিষ্কৃত হয়েছে।

মঙ্গলকোটে উৎখননের ফলে মোট ৬ টি স্তরে প্রত্নবস্তুর নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে এবং প্রাপ্ত প্রত্নবস্তু হতে এই সভ্যতাকে ৬ টি পর্যায়ে ভাগ করা যায়।

১. তাম্রাশ্মীয় যুগ, যার ব্যাপ্তিকাল হল খ্রীষ্টপূর্ব ১২০০ অব্দ হতে খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০ অব্দ পর্যন্ত।

২. দ্বিতীয় স্তরে তাম্রাশ্মীয় সভ্যতার অন্তিম পর্ব হতে প্রাচীন ইতিহাসের আদিপর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০ অব্দ হতে খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দ পর্যন্ত।

৩. তৃতীয় স্তরে কাঁচা ইঁট, মাটি দিয়ে পেটানো মেঝে, তুষ ও বালির নিদর্শন

মিলেছে।

৪. চতুর্থ স্তরে কুষাণ যুগের পানপাত্র,কুষাণ মুদ্রা,পোড়ামাটির মূর্তি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

৫. পঞ্চম স্তরে গুপ্ত যুগের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে, যার ব্যাপ্তিকাল ছিল ৪০০ খ্রীষ্টাব্দ হতে ৬০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। এই স্তরের গৃহ ও প্রাকারে ব্যাপকভাবে পোড়া ইটের ব্যবহার মিলেছে। গৃহ নির্মাণে লৌহের ব্যবহার অন্যতম উল্লেখযোগ্য বস্তু।

৬. সর্বশেষ স্তরে মুসলমান আমলের আদি পর্বে ব্যবহৃত বস্তু সমূহ আবিষ্কৃত হয়েছে।

মঙ্গলকোটের প্রত্নক্ষেত্র উৎখননের সময় প্রাপ্ত প্রত্নবস্তু সমূহের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে অধ্যাপিকা শ্রীমতী অমিতা রায় মন্তব্য করেছেন ,'The evidence of ruins of brick built structures scattered all over the village including the stray remains of antiquities and Pot - sherds found all over strongly suggests a most floурshing stage of history in this region from the Kushana period onwards . Excavations have revealed massive structure all made in bricks, belonging both to the Kushana and the Guptas. Indeed, the remains of Gupta structures are revealed in many areas after remaining only the surface layer . Both the periods are marked by the rich antiquities, including a number of seals and sealings.'

এই প্রত্নস্থলে ১৯৫ টি মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে, তন্মধ্যে অধিকাংশ ভূমির উপরিভাগে পাওয়া গেছে। রৌপ্য মুদ্রার সংখ্যা অত্যন্ত বিরল। গোলাকার , চৌকাকৃতির তাম্রমুদ্রার সংখ্যা প্রচুর। আবিষ্কৃত ধাতুর মধ্যে তামা , লোহা, টিন,রৌপ্য প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ভূ-অভ্যন্তর ভাগ হতে আবিষ্কৃত প্রাকারটিকে কেউ কেউ পোতাশ্রয় বলে অনুমান করেছেন। কারণ প্রাচীনকাল হতে বিগত শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত অজয় ও কুনুর নদ সুনাব্য ছিল। এই স্থানে খনিত একটি ঢিবির মধ্যে ঐতিহাসিক কালে নির্মিত একটি কূপের সন্ধান পাওয়া গেছে।

বাণেশ্বর ডাঙ্গা

ভাতার থানার অধীনে বড়বেলুন গ্রামের বাণেশ্বর ডাঙ্গায় প্রাপ্ত তাম্রাশ্মীয় যুগের নিদর্শনাবলী হতে প্রমাণিত হয়েছে যে, বর্ধমান জেলার অপরাপর অঞ্চলে এই সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। কেবলমাত্র দামোদর ও অজয় নদের তীরভূমি অঞ্চলেই তাম্রাশ্মীয় সভ্যতা গড়ে ওঠেনি। জেলার মধ্যবর্তী অঞ্চলে ঐ যুগের মানবগোষ্ঠীর অধিবসতি স্থাপিত হয়েছিল। ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনমাস ব্যাপী উৎখনন কার্য পরিচালনার ফলে সুদূর অতীতে ব্যবহৃত প্রত্নবস্তুর আবিষ্কার হতে পাণ্ডুরাজার ঢিবির সমগোত্রীয় এক সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয় মেলে। আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুর মধ্যে পোড়ামাটির সাধারণ কৌণিক পানপাত্র, কৃষ্ণ-লোহিত মৃৎপাত্রের মধ্যে বহির্মুখী কানা সমন্বিত ভাণ্ড,অভ্রচূর্ণ মিশ্রিত বেলেমাটির তৈরী হাঁড়ি বা

কলস, লৌহনির্মিত তরবারির ভগ্ন অংশ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ঢিবির উপর থেকে প্রায় ১৬ ফুট নিচে গৃহতলের কয়েকটি বিচ্ছিন্ন অংশ আবিষ্কৃত হয়েছে।

বাণেশ্বর ডাঙ্গার দ্বিতীয় যুগের অধিবসতি স্তরে আবিষ্কৃত কৃষ্ণ-লোহিত বর্ণের কৌলালের দৃষ্টান্ত নিম্নে দেওয়া হল ঃ

১. সস্তম্ভ থালির ভগ্নাবশেষ।
২. পানপাত্রের ন্যায় ক্রমশঃ সংকীর্ণ পাত্রের অংশ।
৩. কোশী পাত্র
৪. সুডৌল কলস
৫. বর্হিমুখী ধারালো কানা সমন্বিত ভাণ্ড
৬. ফুলের টবের আকৃতির পাত্র
৭. কানা সমন্বিত কলস।

কিন্তু তৃতীয় স্তরে প্রাপ্ত নিদর্শনাবলী পূর্বতন সংস্কৃতি অপেক্ষা উন্নততর পর্যায়ের। মোরামপেটা অথবা চুনের আস্তরণ দেওয়া মেঝেয় তাম্রাশ্মীয় যুগের মৃৎপাত্র, লৌহপিণ্ড, বাসগৃহ ব্যতীত চুল্লী, পোড়া ইঁটে তৈরী ধর্মীয় বেদী ইত্যাদি বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নিদর্শন। উৎখননকারী দলের মতে আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ত্রয়োদশ - চতুর্দশ শতকে প্রথম স্তরের অধিবসতি ক্ষেত্রটি গড়ে উঠেছিল।

সাঁওতালডাঙ্গা

ভাতার থানার আমারুণ রেলস্টেশনের পশ্চিমে খড়োশ্বরী নদীর তীরে আরাগ্রামের সন্নিকটে সাঁওতালডাঙ্গার ক্ষয়প্রাপ্ত ঢিবিতে প্রাচীনযুগের একই কৃষ্টির নিদর্শন পাওয়া গেছে। ক্ষয়প্রাপ্ত ভূমির উপরিভাগে তাম্রাশ্মীয় সভ্যতার সঙ্গে সুপরিচিত কৃষ্ণলোহিত কলসের মধ্যে সংরক্ষিত অস্থির অবশেষ ও তাম্রনির্মিত চুড়ির নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। ভগ্ন কলসের মধ্যে অস্থি সংরক্ষণের নিদর্শনটি প্রাগৈতিহাসিক যুগের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পরিচায়ক। অনুসন্ধানের ফলে জানা গেছে যে, উত্তর - দক্ষিণে শায়িত এক মানব সমাধি এবং তৎসংলগ্ন অন্ত্যেষ্টিজ্ঞাপক একটি কৃষ্ণলোহিত বর্ণের ভগ্ন কলস ও কৃষ্ণলোহিত মৃৎপাত্র ব্যতীত অন্যান্য নানা আকৃতির মৃৎপাত্র , রত্নপ্রস্তর নির্মিত নানা ধরনের পুঁতি এবং শেষ প্রত্নাশ্মীয় ও ক্ষুদ্রাশ্মীয় আয়ুধের নিদর্শনাবলী । এই সকল আয়ুধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি প্রস্তরপিণ্ড এবং শঙ্ক ফলাকা দেখে অনুমিত হয়েছে যে, এই নদীর তীরে উপরোক্ত অস্ত্রাদিসমূহ পশুশিকার ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রার উপযোগী ছিল।

আলোচ্য প্রত্নক্ষেত্রে অধিক পরিমাণে পুরাবস্তু পাওয়া যায়নি। মনে হয় সন্নিকটবর্তী খড়োশ্বরী নদীর প্রবল বন্যায় উক্ত নিদর্শনাবলী ক্ষয়প্রাপ্ত মৃত্তিকার সঙ্গে ভেসে গেছে। সাঁওতাল ডাঙ্গার ঢিবিতে প্রাপ্ত নিদর্শন হতে অনুমান করা সঙ্গত হবে যে, এই অধিবসতি ক্ষেত্রে প্রথম যুগে প্রত্নাশ্মীয় ও ক্ষুদ্রাশ্মীয় আয়ুধ ব্যবহারকারীগণ বসবাস করেছিল এবং

পরবর্তীকালে ঐ স্থানে তাম্রাশ্মীয় সভ্যতা গড়ে ওঠে। ঢিবির উপরিভাগে পোড়ামাটির পুতুল, সাধারণ রত্নপ্রস্তর, ক্ষুদ্রাশ্মীয় কুঠার ও আংটি সহ তাম্রনির্মিত কয়েকটি দ্রব্য আবিষ্কৃত হয়েছে। দ্বিতীয় চিহ্নিত ক্ষুদ্রাশ্মীয় আয়ুধ, পোড়ামাটির দ্রব্য, তাম্রখণ্ড, তাম্রপিণ্ড পাওয়া গেছে। মৃৎপাত্রের মধ্যে উজ্জ্বল মৃৎপাত্রের নিদর্শন এই স্থানের বিশেষ আকর্ষণীয়

বিবিধ প্রত্নক্ষেত্র

পশ্চিমবঙ্গের যে কোন জেলা অপেক্ষা বর্ধমান ও বীরভূম জেলায় অধিক সংখ্যক প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রত্নক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। উপরোক্ত প্রত্নস্থলগুলি ব্যতীত বর্ধমান জেলায় বিভিন্ন স্থান হতে প্রস্তরায়ুধ , মৃৎপাত্র ও ধাতুনির্মিত সামগ্রী সংগৃহীত হয়েছে।

অজয় - কুনুর অববাহিকায় কাঁকসা থানার বনকাটিতে একটা বৃক্ষের জীবাশ্ম (Wood fossil) আবিষ্কৃত হয়েছে, যা পুরাপ্রস্তর যুগের হাতকুঠার বলে চিহ্নিত এবং এ শ্রেণীর শিকারের উপযোগী হাতকুঠার ব্রহ্মদেশের আনিয়াথিয়ান কৃষ্টির সমগোত্রীয় বলে অনুমান করা হয়। বনকাটিতে মধ্যপ্রস্তর ও নব্যপ্রস্তর যুগের প্রস্তরায়ুধ সমূহের বীরভানপুরে আবিষ্কৃত আয়ুধের সঙ্গে মিল আছে। বনকাটির পশ্চিমে কয়লাখনি অঞ্চলে কার্বোনিফেরাষ যুগের জীবাশ্মের সন্ধান মিলেছে। মেমারী থানার মণ্ডলগ্রামের একটি ঢিবি ও রাইগ্রামের সন্নিকটে হাতীপোতার ডাঙ্গায় কৃষ্ণবর্ণের মৃৎপাত্র ও গাঢ় লাল রঙ - এর পাত্রে কৃষ্ণবর্ণের পালিশ করা হয়েছে। কিন্তু মণ্ডলগ্রামের ঢিবিটি সরকারীভাবে উৎখননের কোন প্রচেষ্টা হয়নি। আড়াগ্রামে ভূ-পৃষ্ঠের ১.৯১ মিটার গভীরে ১ নং ট্রেঞ্চের প্রাপ্ত প্রত্নবস্তু (Charcoal) সি - ১৪ পরীক্ষান্তে জানা গেছে যে, খ্রীষ্টপূর্ব দশম শতকে (খ্রীষ্টপূর্ব ৯১০ অব্দ) উক্তস্থানে জনবসতি ছিল। রাজুয়াবাসী মহম্মদ আয়ুব হোসেনের নিকট রক্ষিত বালুটিয়া গ্রামে প্রাপ্ত কৃষ্ণবর্ণের স-নাল পানপাত্রটি তাম্রাশ্মীয় যুগের সমগোত্রীয়। এছাড়া পানাগড়ের নিকট শিউলীবুড়ির ডাঙ্গা, এরুয়ারে যখের ডাঙ্গা, গুসকরার নিকট ধনটিকরী, গঙ্গাডাঙ্গা, গোস্বামীডাঙ্গা, রাজারডাঙ্গা, কালিকাপুর প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত নিদর্শনগুলি তাম্রাশ্মীয় কৃষ্টির ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সরকারীভাবে আবিষ্কৃত ও স্বীকৃত না হলেও মঙ্গলকোট থানার দেবপুর - শ্রীপুর গ্রামে একটি মজা জলায় প্রাপ্ত প্রত্নবস্তু সমূহকে মঙ্গলকোটের সম-শ্রেণীভুক্ত বলে অনুমান করা হয়েছে। সেচের খাল খননের সময় বহু ভগ্ন ও অভগ্ন মৃৎপাত্র , মাটির কড়াই, কুঁজোর মুখ, বাটির ন্যায় ভোজন পাত্র,পোড়ামাটির পুতুল যক্ষিণীমূর্তি প্রভৃতি সামগ্রিক আবিষ্কারকে তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতির অবদান বলে অনুমান করার যথেষ্ট কারণ আছে। এছাড়া গুপ্ত যুগের রীতিতে নির্মিত বিশ্রামরত ষাঁড়ের গায়ে ত্রিশূলের ছাপ দৃষ্টে ঐতিহাসিক যুগের ধর্মীয় চেতনার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

একটি বিতর্কিত সীলমোহর

পাণ্ডুরাজার ঢিবির তৃতীয় স্তরে আবিষ্কৃত স্টিয়াটাইট পাথরে খোদিত একটি সীলমোহর

প্রত্নতত্ত্ববিদগণের মধ্যে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। মাইকেল রিডলে নামক একজন ইংরেজ প্রত্নতত্ত্ববিদ শিলের লিপি ও চিত্র পরীক্ষা করে মন্তব্য করেছিলেন যে, শিলটি ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের ক্রীটস্ দ্বীপ হতে আগত। মাইকেল রিডলের মতে শিলের উপর মিনোয়ান লিপি অনুসারে A.E.T.E.A., যা আতিয়া নামক কোন গ্রীক নাবিকের নাম, খোদিত আছে। তাঁর মতে উক্ত শব্দ তিনটি অংশে AE, TEE ও AH কে বিভক্ত করে জল, মাছ ও শিরস্ত্রাণ অর্থ করা যায়। রিডলের মতে খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দে এদেশের সঙ্গে তাম্রলিপ্ত বন্দরের মাধ্যমে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের যোগাযোগ ছিল। কিন্তু প্রীতিমাধব রায়ের মতে শিলের উপর আঁকা মাছের সঙ্গে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ইস্টার দ্বীপপুঞ্জের চিত্রলিপির সাদৃশ্য অধিক। মিনোয়ান সভ্যতার আবিষ্কারক ইভান্স ও ডেন্ট্রিসের মতে ফ্যেন্টোস চাকতি ক্রীটসে্ এসেছিল অন্য কোন স্থান হতে এবং ঐ চিত্রলিপি থেকে মিলোয়ান রেখাচিত্র লিপির সৃষ্টি হয়নি। প্রাপ্ত সীলমোহরটির উৎস স্থল সম্বন্ধে নীহার রঞ্জন রায় সন্দেহ পোষণ করেছিলেন 'এই পর্বে এ ধরনের বিস্তৃত বৈদেশিক বাণিজ্যের অন্য কোন প্রমাণ এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই' পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে প্রাপ্ত শিলাটি অধ্যাপক বঙ্কুবিহারী চক্রবর্তী কর্ত্তৃক অন্যভাবে পঠিত হয়েছে। তিনি উৎকীর্ণ লিপিটি 'পুণ্যভূম' বলে পাঠ করেছেন। অপরপক্ষে অতুল সুর রিডলের মতকে সমর্থন করেছিলেন এবং তাঁর মতে এই স্থানে একটি বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। উৎখননকারী দলের নেতা প্রয়াত পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, রিডলের অনুমানকে সমর্থন করেছেন। তাঁর মতে সীলের মধ্যস্থলে অবস্থিত মাছটি প্রকৃতপক্ষে হাতুড়িমুখো হাঙ্গর (যখন তাকে উপব থেকে দেখা যাবে)। উত্তর সাগর ও অন্যান্য সমুদ্রে বিচরণশীল এই প্রাণীর চিত্রন যে বিস্মৃত কালের নাবিকদের অভিজ্ঞতার পরিচায়ক তাতে সন্দেহ নেই।

নরগোষ্ঠীর পরিচয়

পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে প্রাপ্ত বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উপাদান হল ১৪ টি মানব সমাধি। তন্মধ্যে ৬ টি প্রথম যুগের এবং অবশিষ্ট ৮ টি দ্বিতীয় যুগের স্তর হতে আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে মৃতদেহগুলি সরাসরি শায়িত অবস্থায় ছিল এবং মৃতদেহগুলি পূর্ব - পশ্চিমে প্রসারিত অর্থাৎ পূর্বদিকে মাথা এবং পদদ্বয় পশ্চিম দিকে লম্ববান অবস্থায় ছিল। তবে কঙ্কালগুলি সবই মুণ্ডহীন। অস্থি সমাধির নিদর্শনও আবিষ্কৃত হয়েছে। মৃতদেহ সমাধিস্থ করার রীতি দুই যুগেই অপরিবর্তিত ছিল বলে অনুমান করা হয়। দ্বিতীয় যুগের কঙ্কালগুলির মধ্যে একটি কঙ্কালের পায়ের নিম্নাংশ কাটা। ভারতীয় নৃতত্ত্ব সর্বেক্ষণের বিশেষজ্ঞগণের মতে কঙ্কালটি ছিল ত্রিশ বৎসর অথবা তদূর্ধ্ব বয়স্ক কোন পুরুষের। অপর একটি সমাধি স্থানে একটি নারীর কঙ্কাল পাওয়া গেছে। ঢিবির পশ্চিমপ্রান্তে একটি পরিখায় প্রথম যুগের স্তরে দুটি অল্প বয়স্ক শিশুর ও ৩ টি পূর্ণবয়স্ক পুরুষের দেহাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে।

ভূ-অভ্যন্তর ভাগে প্রাপ্ত কঙ্কালসমূহ সঠিকভাবে কোন্ নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত তা নির্ণিত

হয়নি। অতীতে স্থানটি সাঁওতাল বা অন্যকোন আদিবাসী অঞ্চল ছিল, তাই ঐ জনগোষ্ঠী সাঁওতাল বা সমগোত্রীয় হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু নৃতত্ত্ব - বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত । কঙ্কালগুলি একজন পূর্ণবয়স্ক সাঁওতাল অপেক্ষা দীর্ঘাকৃতির । নাকের আকৃতি সাঁওতালদের ন্যায় হলেও মস্তিষ্কের গঠন লম্বাকৃতির। তবে ধাতুর ব্যবহার, গ্রাম পত্তনের ধারা, সমাজ জীবন সাঁওতালদের থেকে পৃথক ছিল। অনেকে কঙ্কালগুলির নৃতাত্ত্বিক পরিমাপের সাহায্যে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে, উত্তর রাঢ়ী কায়স্থ গোষ্ঠীর সঙ্গে কিছুটা মিল আছে। হয়তো এখানকার মানুষেরা অ্যালপাইন নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত ছিল।

বর্ধমান জেলার তাম্রাশ্মীয় প্রত্নক্ষেত্রগুলির বিভিন্ন স্তরে সভ্যতা ও সংস্কৃতির আবিষ্কৃত নিদর্শনাবলী ও অধিবসতির চিহ্ন থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, অন্ততঃপক্ষে খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতক হতে কোন মানবগোষ্ঠী যাযাবর বৃত্তি পরিত্যাগ করে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছিল। কৃষ্ণলোহিত মৃৎপাত্রের নির্মাণ কৌশল ও ধাতুর ব্যবহার তাদের কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সভ্যতার ধারাকে যে উন্নত পর্যায়ে উত্তোলিত করেছিল, তাতে সন্দেহ নেই।

প্রাচীন জীবজন্তু

পাণ্ডুরাজার ঢিবি ও অন্যান্য তাম্রাশ্মীয় যুগের প্রত্নক্ষেত্রে প্রাপ্ত জীবজন্তুর হাড় সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণ বহু মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। তাঁরা মাছের কাঁটা ও জীবজন্তুর হাড়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। কয়েকটি বিশেষ শ্রেণীভুক্ত মাছ ঐ যুগের মানুষের খাদ্য তালিকায় ছিল। মোরগ, সককুদ গৃহপালিত জন্তু (সম্ভবতঃ গরু), মহিষ, ছাগল, শূকর প্রভৃতি জীবজন্তুর হাড়ের নিদর্শন থেকে জানা যায় যে, ঐ শ্রেণীর জীবকে ৩৫০০ বৎসর পূর্বের অধিবাসীরা পোষ মানিয়েছিল এবং ঐ যুগের আবহাওয়ায় এই সকল বিশেষ শ্রেণীভুক্ত জীবকুলের অস্তিত্ব ছিল। এর দ্বারা আরও প্রমাণিত হচ্ছে যে, তাম্রাশ্মীয় যুগে বাংলার মানুষের প্রধান খাদ্য ছিল ভাত, মাছ, দুধ ও মাংস। মৃত জীবজন্তুর হাড়ের নমুনা দেখে অনুমান করা যায় যে, তারা এই হাড়গুলি শিল্পকর্ম ও শিকারের নিমিত্ত ব্যবহার করা হত। বিশেষজ্ঞের ভাষায় ঃ- 'The bone remains of jungle fowl, para deer, swampdeer and jackle from Pandu Rajar Dhipi also testify that the habitate of all these animals and birds were the scrub jungles and forested areas were also covered with grassy plains in the vicinity of the protohistoric habitation. But majority of animals disappeared from this area long time ago since the jungle decreased.'

আরও বহুপূর্বে শুশুনিয়ায় প্রাপ্ত জীবাশ্ম হতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, সুদুর অতীতে বর্ধমান জেলা বা সন্নিহিত স্থানের অরণ্যে সিংহ,হস্তী, বন্য অশ্ব, মহিষ. জিরাফ প্রভৃতি বন্য জীবজন্তু নির্ভয়ে বিচরণ করত। শুশুনিয়ার প্রত্নদ্রব্য সামগ্রী যে সকল স্থানে আবিষ্কৃত হয়েছিল সে সকল স্থান থেকে বর্ধমান জেলার বর্তমান সীমান্ত থেকে প্রায় ২৫/৩০ কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে অবস্থিত ছিল।

ধাতুর ব্যবহার

পাণ্ডুরাজার ঢিবি উৎখননের সময় আবিষ্কৃত লৌহ নির্মিত দ্রব্য সহ একটি প্রাচীন তরবারি পূর্ব ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের এক অমূল্য সম্পদ। প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার শেষ পর্বে চিত্রিত মৃৎপাত্র, প্রবাহনালীযুক্ত মৃৎভাণ্ড, পাথরের ক্ষুদ্র অস্ত্র , নব্যপ্রস্তর যুগের প্রস্তর নির্মিত কুঠার, তামার অলঙ্কার ও লৌহ নির্মিত অস্ত্র - সবই এক সঙ্গে ব্যবহৃত হত। তামার ব্যবহার সম্পর্কে মত পার্থক্য না থাকলেও অনেকের মতে ভারতের পূর্বাঞ্চলে লোহার ব্যবহার ছিল না। তবে একথা স্মরণ রাখা উচিত যে, বর্ধমান , বীরভূম ও পুরুলিয়া জেলায় যথেষ্ট পরিমাণে আকরিক লৌহ পাওয়া এবং বহু প্রাচীনকাল হতে দেশীয় পদ্ধতিতে লোহা গলানো হত। সাম্প্রতিক কালে সিংভূম জেলার খোণ্ডামৌজা গ্রামে একটি পরিত্যক্ত স্থানে কয়েকটি লোহা গলানোর চুল্লীর সন্ধান মিলেছে। অসুরগড় নামক স্থানে বহু পরিত্যক্ত লোহা তৈরীর চুল্লী আবিষ্কৃত হয়েছে। বর্ধমান জেলার সুয়াতার একটি পরিত্যক্ত ঢিবিতে ছোট ছোট লৌহ পিণ্ড দেখা গেছে। রাঢ়ের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ ও সন্নিহিত বিহার রাজ্যের তাম্রখনি হতে সংগৃহীত তামা সাড়ে তিন হাজার বৎসর পূর্বে ব্যবহৃত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ বা মত পার্থক্য নেই।

লৌহের ব্যবহার সম্পর্কিত সন্দেহ অবসানের নিমিত্ত ১৯৮৪-৮৫ খ্রীষ্টাব্দে পরীক্ষামূলকভাবে নমুনা সংগ্রহের জন্য পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে পুনরায় উৎখনন কার্য পরিচালিত হয়েছিল। আবিষ্কৃত নিদর্শনাবলীর মধ্যে লৌহ ও লৌহনির্মিত দ্রব্য এবং বিভিন্ন জীবজন্তুর হাড়ের চিহ্ন পাওয়া গেছে। দ্বিতীয় স্তরে তামার নিদর্শন এর সঙ্গে লোহার অবস্থিতি আশ্চর্যজনক মনে হতে পারে। তবে পাণ্ডুরাজার ঢিবির অনতিদূরে বর্ধমান, বীরভূম ও মানভূম জেলার আকরিক লোহার খনি অবস্থিত এবং নিকটবর্তী জঙ্গল হতে কাঠ সংগ্রহ করে জ্বালানীব কাজে ব্যবহার করা হত। আবিষ্কৃত লৌহপিণ্ড ও লৌহনির্মিত দ্রব্যগুলি দুর্গাপুর ও রাঁচীর ইস্পাত কারখানায় পরীক্ষিত হয়েছে এবং উক্ত লৌহ নির্মিত দ্রব্যের প্রায় ১১০০° সেন্টিগ্রেড উত্তাপ সহ্য করার ক্ষমতা ছিল। লোহা আবিষ্কারের পর এই সভ্যতার কালপঞ্জীকে নূতনভাবে সাজান যেতে পারে।

স্তর বিন্যাস	সংস্কৃতির পরিচয় / যুগ	ভূ-পৃষ্ঠ হতে স্তরের গভীরতা (মিঃ)	প্রাচীনত্ব
১	প্রাক্ তাম্রাশ্মীয় যুগ	৮	খ্রীষ্টপূর্ব ১২৫০ অব্দের পূর্বে
২.ক	তাম্রাশ্মীয় যুগ	৭.৫	খ্রীষ্টপূর্ব ১২৫০ - ১০৫০ অব্দ
২.খ	মিশ্র তাম্রাশ্মীয় যুগ	৬	খ্রীষ্টপূর্ব ১০৫০ - ৯৫০ অব্দ
৩.ক	মিশ্র তাম্রাশ্মীয় যুগ	৫	খ্রীষ্টপূর্ব ৮ ম শতক
৩.খ	লৌহ যুগ	৩	খ্রীষ্টপূর্ব ৬৩০-৪৫০অব্দ
৪	প্রাচীন ঐতিহাসিক যুগ (মৌর্য হতে গুপ্ত যুগ)	৩	খ্রীষ্টপূর্ব ৬৩০-৪৫০অব্দ

৫ ৬	পাল - সেন যুগ মধ্যযুগ	১ ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগ	অষ্টম - দ্বাদশ শতক দ্বাদশ শতকের পরবর্তী কাল

মেদিনীপুর জেলার লালজল হতে ১.৫ কিলোমিটার দূরে পরীক্ষামূলকভাবে অনুসন্ধানের সময় আয়তাকার একটি লোহা গলানোর চুল্লীর সন্ধান পাওয়া যায়। অতীতে অসুর গোষ্ঠী যে পদ্ধতিতে লোহা গলাতো এখানে অনুরূপভাবে লোহা গলানো হত বলে মনে করা হয়। মাটির উপর জ্বালানী কাঠ সাজিয়ে তার উপর আকরিক লৌহ-মৃত্তিকা ঢেলে দিয়ে একটা স্তুপ তৈরী করা হত। পরে স্তুপটিকে কাদামাটি দিয়ে লেপে দেওয়া হত এবং আগুন জ্বালানোর সময়ে বাতাসের অভাবে চুল্লীর মধ্যে যাতে আগুন নিভে না যায় তার জন্য সচ্ছিদ্র পোড়ামাটির নল দুই স্তরে চুল্লীর চারপাশে বসান হত এবং প্রচণ্ড উত্তাপে গলিত লোহা চুল্লীর বাহিরে জমা হত।

রাঢ়ের বিভিন্ন স্থানে প্রাচীন পদ্ধতিতে লোহা গলানোর নিদর্শন পাওয়া গেলেও এখানে অসুর জাতির পরিবর্তে সাঁওতালদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখে অনুমান করা যায় যে, এতদঞ্চল হতে তারা সাঁওতালদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে দক্ষিণ - বিহারে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল। 'অসুর উপকথা' হতে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের আভাস মেলে। সম্ভবতঃ 'অসুর কহনী' হতে বর্ধমান জেলার সাতকাহনিয়া (থানা - কাঁকসা) গ্রাম নামের উদ্ভব হয়েছে। অসুর প্রবাদে লোহাসুরের উপদেশে লাল তীর ছুড়ে লৌহ আকর সন্ধানের কাহিনী কি বর্ধমানের রাঙামাটি/ লালমাটিকে (ল্যাটেরাইট) স্মরণ করিয়ে দেয় ? ঋগ্বেদে আর্য ও অসুর গোষ্ঠীর বিরোধ এবং শিব ও বিষ্ণুর দ্বন্দ্বের পৌরাণিক কাহিনীটি মুণ্ডা (বিষ্ণু উপাসক) ও অসুরদের (শিবোশাসক) বিবাদকে কেন্দ্র করে হয়ত গড়ে উঠেছিল।

তাম্রাশ্মীয় সভ্যতার ধারা ও বিস্তৃতি

নব্য প্রস্তর যুগের পর তাম্রাশ্মীয় সভ্যতার উদ্ভব প্রাচীন মানব সংস্কৃতির ইতিহাসে এক বিস্ময়কর ঘটনা। আদিম মানবগোষ্ঠী শিকার ও পশুপালন বৃত্তির পরবর্তী পর্যায়ে কৃষিকার্যকে আয়ত্ব করে প্রয়োজনের তাগিদে যাযাবর বৃত্তি পরিত্যাগ করে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য সচেষ্ট হয়েছিল। এই পর্বে কৃষিজ দ্রব্য উৎপাদন, মৃৎপাত্র নির্মাণের কলা কৌশল ও ধাতব পদার্থের ব্যবহারকে আধুনিক কালের পরিভাষায় শিল্প বিপ্লবের সঙ্গে তুলনীয়। মৃৎপাত্রের রং, গঠন, অলঙ্করণ, তামা ও লোহার ব্যবহার ও হাড়ের তৈরী শিল্পবস্তুর লক্ষণে চিন্তার অবকাশ রাখে না যে, রাঢ় অঞ্চল মানব সভ্যতা তাম্রাশ্মীয় পর্বে উন্নীত হয়েছিল। এ বিষয়ে নীহার রঞ্জন রায়, পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত ও অতুল সুরের মন্তব্য প্রায় সমপর্যায়ভুক্ত। ধ্বংস স্তুপের মধ্যে আবিষ্কৃত ঘরের মেঝেগুলি লাল রং-এর কাঁকর মাটি দিয়ে পেটান, দেওয়ালে ও মেঝেয় চুনের প্রলেপের চিহ্ন আছে। পরবর্তী স্তরে গৃহনির্মাণে পোড়ামাটির টালি ও চুনের ব্যবহার ছিল।

তাম্রাশ্মীয় অধিবসতি ক্ষেত্রগুলিতে দুদিকে ধারওয়ালা ছুরি, বুরিন জাতীয় অস্ত্র, মসৃণ করার যন্ত্র, নলাকৃতি প্রস্তরখণ্ড হতে অনুমান করা যায় যে, এই পযায়ের প্রাথমিক পর্বে নবাশ্মীয় আয়ুধ সমূহ বর্তমান ছিল। তাম্রনির্মিত বঁড়শির নিদর্শন হতে অনুমান করা যায় যে, অধিবাসীগণ মৎস শিকারী ছিল এবং পরবর্তীকালের উৎখননের সময় ধ্বংস স্তূপের মধ্যে প্রাপ্ত কয়েক শ্রেণীর মাছের শিরদাঁড়ার উপস্থিতি এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বহু ছিদ্রবিশিষ্ট মৃৎপাত্র দৃষ্টে অনুমিত হয় যে, সেটি ধর্মীয় অথবা পারলৌকিক ক্রিয়াকর্মে বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়। যেগুলি স্থানীয় ভাষায় সহস্রধারা নামে পরিচিত। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে প্রয়োজনীয় কোশীপাত্রগুলি ব্যবহারের ধারা সুপ্রাচীন কালের ঐতিহ্য বহন করছে। মৃৎপাত্রগুলির সুসামঞ্জস্যপূর্ণ গঠনপ্রণালী, উজ্জ্বল রং-এর প্রলেপ ও পালিশ, চিত্রণের সংযত বিন্যাস ও মাধুর্য বাংলার তাম্রযুগের মানুষের সুরুচির স্পষ্ট পরিচয়। স্টিয়াটাইট পাথরে খোদিত সীলমোহর, ব্রোঞ্জ নির্মিত মাছ, পোড়ামাটির নৌকা দেখে অনুমান করা হয় যে, এগুলি বর্হিভারতের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে সম্ভবতঃ এখানে এসেছিল। ২০০০ বৎসর বা তৎপূর্বে অজয় ও দামোদর নদের পরিচয় গ্রীক বা রোমানদের নিকট অজানা ছিল না। মঙ্গলকোটের প্রত্নক্ষেত্রটি পাণ্ডুরাজার ঢিবি অপেক্ষা আয়তনে বড় এবং এই সভ্যতার ধারাবাহিকতা আধুনিক ইতিহাসের কাল পর্যন্ত প্রসারিত। পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য প্রত্নক্ষেত্র অপেক্ষা মঙ্গলকোট প্রত্নক্ষেত্রের গুরুত্ব অধিক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাত্ব বিভাগের অধ্যাপিকা ডঃ অমিতা রায় ও অধ্যাপক ডঃ সমীর মুখোপাধ্যায় বিভিন্ন সময়ে চারবার মঙ্গলকোটের উৎখননকার্য পরিচালনা করেছিলেন এবং মঙ্গলকোট সম্পর্কে তাঁদের রিপোর্টটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ । বিভিন্ন স্তর বিন্যাসে প্রাপ্ত প্রত্নদ্রব্য হতে ঐতিহাসিক কালক্রমকে সাজান যায় ঃ

স্তর	সভ্যতার নিদর্শন (প্রত্নবস্তুর নিদর্শন)	ঐতিহাসিক কালক্রম
১	তাম্রাশ্মীয় সভ্যতা	খ্রীষ্টপূর্ব ১২০০ - খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০
২	ঐ	খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০ - খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০
	(তাম্র, ব্রোঞ্জ ও লৌহ	
৩	মৌর্য ও শুঙ্গ যুগ	খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০ - খ্রীষ্টপূর্ব ১০০
৪	কুষান ও গুপ্ত যুগ	প্রথম শতক - চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দ
৫	গুপ্ত পরবর্তী যুগ	৪০০ শতক - ৭০০ শতক
৬	মধ্যযুগ ও মুসলমান অধিবসতির আদিপর্ব	৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ - ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দ
	ভূস্তরের উপরিভাগ হোসেন শাহী ও	
	মোগল আমল	১৪০০ খ্রীষ্টাব্দ - ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দ

তাম্রাশ্মীয় সভ্যতার বিকাশস্থল উত্তর ভারতর সিন্দু-গঙ্গা-সরস্বতী অববাহিকায় যেমন দেখা যায়, অনুরূপ প্রত্নস্থল দক্ষিণ ভারতেও আবিষ্কৃত হয়েছে। তবে পশ্চিমবঙ্গে এই সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারা সম্পর্কে দ্বিমত আছে। কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিদ মন্তব্য করেছেন যে, এই সংস্কৃতির সঙ্গে গাঙ্গেয় উপত্যকা, মধ্যভারত ও রাজস্থানের তাম্রাশ্মীয় সভ্যতার যোগসূত্র ছিল। উত্তর ভারতীয় কৃষ্ণবর্ণের কৌলালের যে সমারোহ বর্ধমানের প্রত্নক্ষেত্রগুলিতে দেখা

গেছে, তাতে গাঙ্গেয় উপত্যকার সঙ্গে যোগসূত্রের সম্ভাবনা অধিক। আবার অনেকে মন্তব্য করেছেন যে, এই যোগাযোগ সাধিত হয়েছিল গাঙ্গেয় ভারতের মাধ্যমে নয়, ওড়িশার মাধ্যমে।

বর্ধমান জেলায় কেবলমাত্র প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রত্নবস্তু আবিষ্কৃত হয়নি, বিভিন্ন স্থান হতে ঐতিহাসিক কালের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। বর্ধমান জেলার ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এই সকল প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। গোপচন্দ্রের মল্লসারুল তাম্রশাসন, ঈশ্বর ঘোষের রামগঞ্জ লিপি, নয়পালের ইর্দালিপি, সিয়ানলিপি, বল্লালসেনের নৈহাটী তাম্রশাসন, লক্ষ্মন সেনের গোবিন্দপুর ও শাক্তিপুর তাম্রশাসন ইত্যাদি প্রত্ন ইতিহাসের উপাদান হতে ঐ সময়ের বর্ধমান জেলার ঐতিহাসিক তথ্য জানা যায়। কালনা, মঙ্গলকোট, কুলুট ও সুয়াতায় প্রাপ্ত মসজিদ লিপিগুলি হতে সমসাময়িক কালের ইতিহাস রচনার উপাদান পাওয়া যায়।

পাণ্ডুরাজার ঢিবির অনতিদূরে গোস্বামী খণ্ডের মাঠের মধ্যে মাকড়া পাথরের একটি বড় মন্দিরের স্থাপত্যের নিম্নভাগ আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রত্নস্থলের আয়তন হল ২১.১৫ মিটার x ১১.৪০ মিটার এবং তন্মধ্যে দেবায়তনটি ৮.৪০মিটার x ৬.২৫ মিটার পরিমিত স্থান জুড়ে আছে। ইহা জমাট ল্যাটেরাইট পাথর দিয়ে নির্মিত হয়েছিল এবং স্থাপত্যটির দেওয়ালে সংস্কারের চিহ্ন দেখা গেছে। ধ্বংস স্তূপের মধ্যে কয়েকটি হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে, যা দশম শতকের বলে অনুমান করা হয়। মূর্তিগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল শিখিবাহন কার্তিকেয় ও একটি সূর্যমূর্তি। এখানে প্রাপ্ত শিরস্ত্রাণ পরিহিত মনুষ্যমূর্তির মস্তকটি পশ্চিম এশিয়ায় প্রাপ্ত প্রাচীন মূর্তির সঙ্গে তুলনীয়। মূল স্তূপের দক্ষিণে ইঁটের তৈরী বেদীতে ঠেশ দিয়ে বসার ব্যবস্থা ছিল (বেঞ্চির আকৃতি)।

সাতদেউলিয়া গ্রামে প্রাপ্ত একটি জৈনমূর্তির পৃষ্ঠপটে ১৪৮ টি তীথঙ্করের মূর্তি খোদিত ফলকটি দশম শতকের বলে অনুমান করা হয়। কাটোয়ার (দাঁইহাটে বেড়া পল্লী) সন্নিকটে প্রাপ্ত একটি তাম্রপটে জৈনধর্মের উপাস্য নৌপঞ্জী বা নবপত্রের খোদিত মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। পশ্চিম বর্ধমানে জামগ্রাম পল্লীতে ভগবান মহাবীরের সিংহলাঞ্ছন স্তম্ভ দৃষ্টে অনুমান করা যায় যে, এক সময়ে এতদঞ্চলে জৈন ধর্ম বিস্তার লাভ করেছিল। বাবলাডিহি বা শঙ্করপুর গ্রামের খ্যাতির উৎস ন্যাংটেশ্বর নামক শিব বিগ্রহের জন্য। শিবরূপে নিত্যপূজিত হলেও আসলে তিনি জৈনদের ত্রয়োদশ তীর্থঙ্কর শান্তিনাথ শঙ্করপুরে শিবের ধ্যানে পূজা পেয়ে আসছেন। আসানসোল শহর হতে ৫ কিলোমিটার উত্তর - পশ্চিমে গড়ুইগ্রামে প্রস্তর নির্মিত শিখর দেউলে একদা নাগছত্রধারী ও দ্বাদশ বাহু সমন্বিত লোকেশ্বর বিষ্ণুমূর্তি অধিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে ঐ মূর্তি চুরি হয়ে গেছে। মন্তেশ্বরের নিকট রাইগ্রামে বিষ্ণুর বরাহ অবতারের মূর্তির উল্লেখ করেছেন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি প্রস্তর নির্মিত একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ চোখে দেখে অনুমান করেছিলেন যে, আদিতে উহা বরাহদেবের মন্দির ছিল। বহুকাল পূর্বে রায়নায় যুগল তীর্থঙ্করের মূর্তি

আবিষ্কৃত হয়েছিল। রায়না থানার কোটশিমুল গ্রামে বঙ্গবারা খাঁ ও তাঁর পুত্র খানজাদ খাঁ একটি বিশাল গড়, আবাস গৃহ ও মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। কোটশিমুল গ্রামের বিস্তারিত ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করতে সক্ষম হলে মধ্যযুগে বর্ধমান জেলার ইতিহাস রচনার উপাদান সংগ্রহ করা সম্ভব হবে। এ ছাড়া বর্ধমান জেলার দক্ষিণ অঞ্চলে বহু গ্রামে ঐতিহাসিক যুগের প্রত্নবস্তু ছড়িয়ে আছে।

প্রাচীন ইন্দ্রানী জনপদের বিকিহাট পল্লীতে কোন এক সময়ে কৃষ্ণপ্রস্তরে নির্মিত একটি বিশাল মন্দির ছিল। কিন্তু একালে এই মন্দিরের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না, কিন্তু দাঁইহাট থেকে যতই কাটোয়ার পথে যাওয়া যায় ততই গঙ্গার তীরবর্তী অঞ্চলে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত খোদিত প্রস্তর চোখে পড়বে। দাঁইহাট শহরের বহু বাড়ীতে এই মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন দেখা যায়। এমনকি এতদঞ্চলের মসজিদ ও মাজারে ইন্দ্রেশ্বর মন্দিরের উপাদান ব্যবহৃত হয়েছে। বর্ধমান জেলার প্রত্ন ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হল বরাকরের চতুর্থ মন্দিরটি। মন্দির বিশেষজ্ঞগণের মতে প্রস্তর নির্মিত এই শিখর দেউলটি অষ্টম শতকে নির্মিত হয়েছিল। অনেকে এই মন্দিরকে জৈন মন্দির বলে অপপ্রচার করলেও প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা শিব মন্দির। পূর্বদিকে রাগাপগের চৈত গবাক্ষে লগুড়ধারী লকুলীসা মূর্তি রয়েছে। সমগ্র মন্দিরের স্থাপত্য ও খোদিত মূর্তিগুলি দেখে সহজেই অনুমান করা যায় যে, বরাকরের পার্বত্য ও অরণ্যময় অঞ্চলে পাশুপত ধর্মের কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল।

প্রায় ছয় হাজার বছর পূর্বে বর্ধমান জেলায় প্রস্তরায়ুধ ব্যবহারকারীরা যাযাবর মানবগোষ্ঠীর উন্নত চিন্তাধারার সংমিশ্রণে মিশ্র ধাতুর উৎপাদন, কৃষির উদ্ভাবনা, পশুপালন, বাস্তু নির্মাণ, শিল্পকলা, ধর্মীয় চেতনার উদ্ভব, মূর্তিপূজা প্রভৃতিকে আয়ত্বাধীনে এনে পরবর্তীকালে অর্থাৎ ঐতিহাসিক যুগে এক উন্নততর সভ্য সমাজ গঠন করতে সক্ষম হয়েছিল, যা সত্যই বিস্ময়কর। মঙ্গলকোট ও পাণ্ডুরাজার ঢিবির ন্যায় অন্যান্য প্রত্নক্ষেত্রগুলিতে সামগ্রিকভাবে উৎখনন ও প্রত্নবস্তুর বিশ্লেষণ কার্যের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলে রাঢ়ের ইতিহাস অন্যভাবে রচনা করা সম্ভবপর হত। বস্তুতঃ জোর দিয়ে মন্তব্য করা যায় যে, রাঢ়ের মাটির নীচে বাংলা তথা বাঙালীর প্রাচীন ইতিহাস চাপা পড়ে আছে। সমগ্র রাঢ় অঞ্চলে ৭৬ টি তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতির প্রত্নস্থল আবিষ্কৃত হয়েছে তন্মধ্যে বর্ধমান জেলায় ২১ টি তাম্রাশ্মীয় সভ্যতার প্রত্নক্ষেত্রের সন্ধান জানা যায়। ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের মতে পাণ্ডুরাজার ঢিবি উৎখননের ফলে আদি সমাজ জীবনের নূতন রূপটি পরিস্ফুট হয়েছে এবং এই রূপ বাঙালীর আদি-ইতিহাসেরই রূপ।

বর্ধমান জেলায় প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে ব্যাপক অনুসন্ধান ও উৎখনন হলে প্রস্তর, তাম্র প্রস্তর, আদি - ঐতিহাসিক ও মধ্যযুগের যে সকল প্রত্নবস্তু আবিষ্কৃত হবে, সেগুলির যথাযথ বিশ্লেষণ করা হলে উত্তরকালে ঐতিহাসিকদের রাঢ় তথা বর্ধমান জেলার ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে যথাযথ সাহায্য করবে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, উৎখনন বিষয়ে এদেশে প্রত্নতত্ত্ববিদদের মধ্যে চিন্তাভাবনা ও কর্ম পদ্ধতিরও অভাব আছে। সরকারীভাবে মেদিনীপুর

(একটা জেলার জন্য দু'খানি গ্রন্থ) জেলা সহ ৮ টি জেলার পুরাকীর্তি বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশিত হলেও প্রচুর উপাদান থাকা সত্ত্বেও বিগত ত্রিশ বছরের মধ্যে বর্ধমান জেলার পুরাকীর্তি বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ নাই এবং আশু প্রকাশের কোন সম্ভাবনাও আছে বলে মনে হয় না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ

1. The Excavations at Pandu Rajar Dhibi - P.C. Dasgupta, Calcutta, 1964.
2. Prehistory and Protohistory of Eastern India - A.Dani,Calcutta,1981.
3. An Encyclopadia of Indian Archaeology(in 2vols.) New Delhi,1989.
4. History of Bengal - Vol.I - Ed. R.C.Majumdar, Dacca, 1943.
5. Prehistory and Beginnings of Civilization in Bengal- A . Sur, Calcutta.
6. Historical Archaeology of India -Ed. Amita Roy & Sami Mukherjee, New Delhi, 1990.
7. The Archaeology of India - D.P. Agarwal, New Delhi, 1982
8. Studies in Archaeology - Ed. Asok Dutta, New Delhi, 1991.
9. Ancient India No.-14, New Delhi.
10. Indian Archaeology : A Review,New Delhi.
11. Steel India, Vol.12,No.1, Special Number , Durgapur.
12. Pratna Samiksha - Vol.1, Directorate of Archaeology, Govt. of W.B.1992.
13. প্রাগৈতিহাসিক বাংলা - পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, কলিকাতা, ১৯৮১
14. প্রাগৈতিহাসিক শুশুনিয়া - পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, কলিকাতা, ১৯৬৮
15. বাঙালীর ইতিহাস (আদি পর্ব) - নীহাররঞ্জন রায়, কলিকাতা - ১৯৮০
16. বাংলা ও বাঙালীর পরিচয় (১ম খণ্ড) - শঙ্কর সেনগুপ্ত,কলিকাতা - ১৯৮৫
17. দুর্গাপুরের ইতিহাস - প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়, দুর্গাপুর, ১৯৮৪
18. বৃহৎ বঙ্গ (২ খণ্ড) - দীনেশ চন্দ্র সেন, কলিকাতা, ১৩৪২
19. বঙ্গভূমিকা - সুকুমার সেন, কলিকাতা, ১৯৭৪
20. বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি (১ম খণ্ড) - যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, কলিকাতা, ১৯৯০

বর্ধমানের সংস্কৃতির নিদর্শন ঃ স্থাপত্য শিল্প ও মূর্তিকলা

অধ্যাপক ভাস্কর চট্টোপাধ্যায়

ভারতবর্ষের শিল্পকলার ইতিহাসে যেমন বাংলার স্থান, তেমনি বঙ্গীয় শিল্পকলার ইতিহাসে বর্ধমানের স্থান স্বীকৃত। বঙ্গের শিল্পীরা বঙ্গজ ছিলেন, তেমনি বর্ধমানের শিল্পীরা বর্ধমানেরই ছিলেন — একথা মনে করার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। বলা যেতে পারে, বঙ্গীয় শিল্পধারায় বর্ধমানের অবদান আছে, যেমন ভারতীয় শিল্পসাধনার ধারায় বাংলার অবদান অনস্বীকার্য। অবশ্য কখনও কোনও বহিরাগত শিল্পী বাংলায় আসেননি একথা মনে করার যেমন কারণ নেই, তেমনি বাংলার শিল্পীরাও ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রান্তে যাননি, একথা মনে করারও কোনো কারণ নেই। তবে বঙ্গের শিল্পী সম্প্রদায়ভুক্ত যাঁরা, তাঁদের মধ্যে বর্ধমানের শিল্প স্রষ্টাদের নাম প্রোজ্জ্বল হয়ে থাকবে। কেননা, বর্ধমানে এমন কিছু শিল্পনিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে যা বাংলার অন্যান্য জনপদে দুর্লভ। শিল্পক্ষেত্রে বর্ধমানের এই মৌলিকতার ভিত্তি সম্ভবতঃ এখানকার উর্বরা মৃত্তিকা, যেখানে ফসল ফলে অনায়াসে এবং অপরিমিত পরিমাণে। খাদ্য সরবরাহের যেখানে অভাব থাকে না, জীবনে নিশ্চিন্ততা থাকে সেখানেই। আর সেই নিশ্চিন্ততা শিল্পীকে তার শিল্প সৃষ্টিতে তন্নিষ্ঠতা দান করে। দামোদর নদীর ক্রোড়ে লালিত এই বর্ধমানে সৃষ্টি ও ধ্বংসের লীলা চলেছে যুগ যুগ ধরে। তার ফলে বহু শিল্প - সৃষ্টি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। আবার নতুন করে সৃষ্টি হয়েছে শিল্পীর অবদান। ভুলে গেলে চলবে না যে, ভারত, বাংলা এবং বর্ধমানের প্রাচীন ও মধ্যযুগের সংস্কৃতির অগ্রগতি ঘটেছিল ধর্মকে অবলম্বন করে, তাই শিল্পের প্রেরণার মূল উৎস ধর্ম। স্থাপত্য ধর্মীয়, ভাস্কর্যও ধর্মীয়। শিল্পকলায় ধর্মনিরপেক্ষতার বিশেষ স্থান ছিল না। অবশ্য ধর্মনিরপেক্ষতার স্থান আছেও একথা বলা যায় একারণে যে, বৌদ্ধ, জৈন, বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত আবার ইসলামীয় ধর্মকে অবলম্বন করেও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করছে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বর্ধমানের সংস্কৃতির অমূল্য নিদর্শন স্বরূপ স্থাপত্য শিল্প ও মূর্তিকলার চিরস্থায়ী মৌলিকত্ব।

কালানুক্রমিকতার বিচারে বর্ধমানের স্থাপত্যশিল্পের আলোচনায় সর্বপ্রথম ভরতপুর প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে আবিষ্কৃত বৌদ্ধস্তূপের উল্লেখ করতে হয়। আনুমানিক অষ্টম - নবম শতকে নির্মিত হয়েছিল এই স্তূপ। গঠনশৈলীর বিচারে একে 'পঞ্চরথ স্তূপ' বলা হয়ে থাকে। অবশ্য বর্ধমান তথা বাংলার অবদান স্তূপ স্থাপত্যে নয়, মন্দির স্থাপত্যে।

বাংলাদেশে মন্দির স্থাপত্যের গোড়াপত্তন হয়েছিল 'নাগর শৈলীর' অনুবর্তনের দ্বারা। ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দিরের আদলে নির্মিত বাংলার প্রাচীন মন্দিরগুলিকে বলা হয় শিখর বা রেখ দেউল। এই মন্দিরের 'শুকনাস শিখর' ঈষৎ বক্ররেখায় ক্রমশঃ স্থূলতা থেকে সূক্ষ্মতর হতে হতে উর্দ্ধে উত্থিত হয়। সেই শিখরের শীর্ষদেশে থাকে আমলক ও চূড়া। এই রীতির প্রাচীন মন্দির রয়েছে বর্ধমান জেলার মেমারীর নিকটে দেউলিয়াতে।

এটি একটি জৈন মন্দির, যদিও মন্দিরের গর্ভগৃহে জৈন তীর্থঙ্করের মূর্তি অনুপস্থিত। মন্দিরটি সম্ভবতঃ অষ্টম শতকের পরে নির্মিত হয়। বরাকরের 'বেগুনিয়া' নামে পরিচিত চারটি মন্দিরের মধ্যে চতুর্থটি অষ্টম শতাব্দীর রেখ দেউল বলে অনুমান করা হয়। পশ্চিমবাংলার প্রাচীনতম রেখ দেউল এইটি। বরাকরের বাকী তিনটি রেখ দেউল পঞ্চদশ শতাব্দীর। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত রেখ দেউল নির্মাণের ঐতিহ্য বর্ধমানে বজায় ছিল। যেমন খুদিকায় (সালানপুর) একটি পরিত্যক্ত মন্দির (১৫শ–১৬শ শতাব্দী), মেমারীর নিকট আমাদপুরে গোপালমন্দির (১৫৭২ খ্রীঃ) , কালনার নিকট বৈদ্যপুরে কৃষ্ণ দেউল (১৫৯৮ খ্রীঃ) , অন্ডালের নিকট কুমারডিহিতে শিবমন্দির (১৬৬১ খ্রীঃ) বর্ধমানের নিকট বৈকুণ্ঠপুরে গোপেশ্বর মন্দির (১৭৩২ খ্রীঃ), অন্ডালের নিকট উখরাতে শিবমন্দির (১৮৩৬ খ্রীঃ), আউসগ্রামের নিকট কালিকাপুরে জোড়া শিব মন্দির (১৮৩৯ খ্রীঃ), মেমারীর নিকট দেবীপুরে লক্ষ্মীজনার্দনের মন্দির (১৮৪৪ খ্রীঃ)., কালনায় প্রতাপেশ্বর মন্দির(১৮৪৯ খ্রীঃ) এবং গলসীর নিকট গোহগ্রামে রাধামাধব মন্দির (১৮৭১ খ্রীঃ)। আবার , তারিখ পাওয়া যায়নি এমন রেখ দেউলও পাওয়া গেছে বর্ধমানের নানাস্থানে — যেমন শ্রীবাটী, বনপাশ, মানকর, নন্দী, খণ্ডঘোষ, সীতাহাটি, সাদিপুর প্রভৃতি।

প্রাচীন বাংলায় ভদ্র বা পীর দেউল একটি স্বতন্ত্র শৈলীর অস্তিত্ব ঘোষণা করে। এই রীতিতে গর্ভগৃহের চাল ক্রমহ্রস্বায়মান পিরামিডাকৃতি হয়ে ধাপে ধাপে উপরের দিকে উঠে যায়। ধাপ বা স্তরের সংখ্যা তিনটি, পাঁচটি বা সাতটি। সর্বোচ্চ এবং ক্ষুদ্রতম স্তরের উপর আমলক ও চূড়া থাকে। এই ভদ্র বা পীর দেউলই উড়িষ্যার রেখ দেউলের সম্মুখস্থ ভোগ মণ্ডপ বা জগমোহন। বাংলায় এই শৈলীর মন্দির যে একসময় যথেষ্ট সংখ্যায় নির্মিত হত তার আভাষ পাওয়া যায় অগণিত প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ মন্দিরের প্রতিকৃতিগুলিতে। কিন্তু এমনিতে এই শ্রেণীর মন্দির বাংলায় বড় একটা দেখা যায় না। বর্ধমান জেলায় বোড়োগ্রামের বলরাম মন্দির এই শ্রেণীভুক্ত বলে মনে করা যেতে পারে। মন্দিরটি মধ্যযুগে নির্মিত।

সাধারণতঃ মন্দিরগুলির ভিত হয় সমচতুষ্কোণাকৃতি। কিন্তু কখনও কখনও 'রথের' আকৃতি বিশিষ্ট মন্দিরও দেখা যায়। এই শ্রেণীর মন্দির রয়েছে ক্ষীরগ্রাম, নাসিক গ্রাম ও কামারপাড়ায়।

মধ্যযুগে বাংলায় সাধারণতঃ মন্দির নির্মিত হত ইট দিয়ে। প্রস্তর দ্বারা মন্দির নির্মাণের প্রমাণ দুর্লভ। তবে, কখনও যে মন্দির প্রস্তর নির্মিত হত না, সেকথা বলা যায় না। কোনও ভূম্যধিকারীর পৃষ্ঠপোষকতায় প্রস্তর নির্মিত মন্দির তৈরী হতে পারত। এপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নির্মিত জগদানন্দপুরের মন্দির।

বর্ধমানে গ্রামের মানুষ খড়ের অথবা টিনের ছাউনি দেওয়া দো-চালা ঘরে যেমন বাস করে, তেমনি ঘরকেই তারা প্রতিষ্ঠা করেছে দেবগৃহ হিসাবে। এই রকম খড়ের ছাউনি যুক্ত মাটির দেয়াল ওয়ালা দেবালয় রয়েছে আমাগোড়িয়া (কেতুগ্রাম), খাণ্ডারী

(আউসগ্রাম) এবং মেমারীর নিকট মগরাতে। আবার মাটির দেয়ালযুক্ত টিনের চালায় আমরা দেবালয় দেখেছি মেমারী থানায় মণ্ডলজনা ও শশিগড়া গ্রামে, রায়না থানায় ভীমপুর, শুকুর, মীর্জাপুর ও নারায়ণপুর গ্রামে। এই চালাঘরের আদলেই নির্মাণ করা হয়েছিল ইটের পাকা গাঁথুনির মন্দির। সেই চালাযুক্ত মন্দিরের নানা বৈচিত্র্য দেখা যায়। যেমন, দো-চালা মন্দিরকে বলা হয় 'একবাংলা'। দো-চালা মন্দিরের উদাহরণ শ্রীবাটির রঘুনাথবাড়ি। আবার দুটি দো-চালা পাশাপাশি একই ভিতের উপর নির্মিত হলে তাকে বলে 'জোড়বাংলা' । বর্ধমানে 'জোড়বাংলা' মন্দির খুব বেশী দেখা যায় না। তবুও যে কয়েকটি জোড়বাংলা এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কৈগ্রামের (মন্তেশ্বর) বরাহবিষ্ণু মন্দির (অষ্টাদশ শতকের প্রথমদিক), কালনার সিদ্ধেশ্বরী মন্দির (১৭৪০ খ্রীঃ), সিঙ্গারকোণের (কালনা) রাধাকান্তের মন্দির এবং ছোটদীঘির (হীরাপুর) রঘুনাথ মন্দির।

দো-চালা মন্দিরের কথা হল। এরপর আমরা দেখি চারপাশে চালযুক্ত চারচালা মন্দির। এইরকম চারচালার শিখর যদি গঠিত হয় আর একটি ক্ষুদ্র চারচালা দিয়ে, তখন তাকে বলা হয় 'আটচালা' মন্দির। প্রবেশদ্বার যুক্ত এইরকম আটচালা মন্দির সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে বর্ধমানে নির্মিত হয়েছিল। যেমন, পূর্বস্থলীর দোগাছিয়ায় গোপীনাথ মন্দির (১৬৫৪ খ্রীঃ), মেমারীর মূলগ্রামে লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির (১৬৯২ খ্রীঃ), গলসীর রামগোপালপুরে লক্ষ্মীজনার্দন মন্দির (১৭২৬ খ্রীঃ), বর্ধমানের বসন্তপুরে জোড়াশিবমন্দির (১৭৪১ খ্রীঃ), কালনার নিকট কুলটীতে শিবমন্দির (১৭৬০ খ্রীঃ), মেমারীর নিকট বড়ারের শিবমন্দির (১৭৭২ খ্রীঃ),. বর্ধমানের গলসীর নিকট শিবমন্দির (১৭৮২ খ্রীঃ), বর্ধমানের নিকট খণ্ডঘোষে শিবমন্দির (১৭৯৫ খ্রীঃ) ।

আটচালা মন্দিরের একটি শিখর যদি ক্ষুদ্রাকৃতি রেখ দেউলের রূপ নেয়, তখন তাকে বলা হয় 'একরত্ন' মন্দির। এই রকম পাঁচটি রেখদেউলের দ্বারা যদি কোনো মন্দিরের পাঁচটি শিখর নির্মিত হয় তখন তাকে বলা হয় 'পঞ্চরত্ন' মন্দির। প্রধানতঃ অষ্টাদশ - উনবিংশ শতাব্দীতে একটি প্রবেশদ্বার যুক্ত 'পঞ্চরত্ন' মন্দির বর্ধমানে নির্মিত হয়েছিল। অবশ্য সপ্তদশ শতাব্দীরও দুই-একটি নিদর্শন পাওয়া যায়। 'পঞ্চরত্ন' মন্দিরের কয়েকটি উদাহরণ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন খণ্ডঘোষের নিকট সাঁকারীতে গোবিন্দ মন্দির (১৬৭৬ খ্রীঃ) , অণ্ডালের নিকট খাঁদরাতে রাধামাধব মন্দির(১৭২১খ্রীঃ) এবং উখরাতে সীতারাম মন্দির (১৭৫০ খ্রীঃ), আবার খণ্ডঘোষের সাঁকারিতে সিংহবাহিনী মন্দির (১৭৬২খ্রীঃ), কাঁকসায় বনকাটিতে শিবমন্দির (১৮৩২ খ্রীঃ), আর কাটোয়ার শ্রীবাটীতে শিবমন্দির (১৮৩৬ খ্রীঃ)।

বর্ধমানে 'নবরত্ন' মন্দিরও আছে। এই মন্দির গঠনে দেখা যায় তিনটি প্রবেশদ্বার যুক্ত আটচালা মন্দিরের উপর কেন্দ্রস্থলে 'পঞ্চরত্ন' যুক্ত আটচালা মন্দির এবং তার চারকোণে চারটি ক্ষুদ্রাকৃতি রেখ দেউল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই শ্রেণীর মন্দির নির্মাণ শুরু হলেও বেশীরভাগই গড়ে উঠেছিল উনবিংশ শতাব্দীতে। অষ্টাদশ শতাব্দীর নিদর্শন গোপালমন্দির।

ফরিদপুরের নিকট সর্পিতে অবস্থিত উনবিংশ শতাব্দীর 'নবরত্ন' মন্দিরের নিদর্শন বুড়োশিব মন্দির। একই শতাব্দীর নিদর্শন বর্ধমানের নিকট কাঞ্চননগরে কঙ্কালী মন্দির, বর্ধমানে অবস্থিত সর্বমঙ্গলা মন্দির এবং কালনা থানার বৈদ্যপুর গ্রামে অবস্থিত বৃন্দাবনচন্দ্র মন্দির।

'পঞ্চবিংশতিরত্ন' মন্দির বর্ধমান জেলায় কয়েকটি দেখা যায়। কালনায় লালজী(১৭৩৯ খ্রীঃ) ও কৃষ্ণচন্দ্র (১৭৫১খ্রীঃ) মন্দির এবং গোপালবাড়ি (১৭৬৬ খ্রীঃ) এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এই শ্রেণীর মন্দিরের গঠনের বৈশিষ্ট্য হল তিনটি প্রবেশদ্বার যুক্ত আটচালা মন্দিরের উপর একটি এবং তার উপর আর একটি ক্রমশ ক্ষুদ্রতর আকৃতির যথাক্রমে আটটি ও চারটি রত্ন বিশিষ্ট মন্দির গঠিত হয়। তাছাড়া মূল মন্দিরের উপরেও থাকে বারোটি রত্ন বা রেখ দেউল আকৃতির চূড়া। বিভিন্ন শ্রেণীর রত্ন মন্দিরগুলিকে বিশ্লেষণ করলে এই সিদ্ধান্তে আসা স্বাভাবিক যে, বাংলার নিজস্ব চালামন্দিরের স্থাপত্যশৈলীর সঙ্গে উড়িষ্যায় রেখ দেউলের শৈলী সমন্বিত করে সপ্তদশ - অষ্টাদশ -উনবিংশ শতাব্দীতে বর্ধমানের শিল্পীরা এক অভিনব মন্দির স্থাপত্যের উদ্ভাবন করেছিলেন।

সমতল ছাদবিশিষ্ট মন্দিরকে বলা হয় 'চাঁদনী'। এই স্থাপত্যরীতির সূচনা হয়েছিল উত্তরভারতে গুপ্তযুগে। সেই প্রাচীন রীতির অনুবর্তন দেখা যায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে। বর্ধমান থানার বামনপাড়ায় রাধাগোবিন্দ মন্দির(১৭৪৫খ্রীঃ), কালনায় রূপেশ্বর মন্দির (১৭৬৫ খ্রীঃ), বর্ধমান থানার কুমারপাড়ায় সত্যনারায়ণ মন্দির এবং আউসগ্রাম থানার বাহাদুরপুরে অবস্থিত রঘুনাথ মন্দির 'চাঁদনী'- শৈলীর -র উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

উড়িষ্যার মন্দিরের একটি বৈশিষ্ট্য হল সম্মুখভাগে সংলগ্ন জগমোহন বা নাটমণ্ডপ। বর্ধমানে এই রীতি সরাসরি গৃহীত না হলেও কয়েকটি ক্ষেত্রে শিল্পীরা মূল মন্দিরের সঙ্গে দ্বারপ্রকোষ্ঠ যুক্ত করেছেন। যেমন, বৈদ্যপুরে রেখ দেউলের সঙ্গে যুক্ত রেখ শৈলীর দ্বারপ্রকোষ্ঠ, দেবীপুরে রেখ দেউলের সঙ্গে যুক্ত 'একবাংলা' দ্বারপ্রকোষ্ঠ এবং উখতায় চারচালা মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত 'চাঁদনী-শৈলীর' দ্বারপ্রকোষ্ঠ!

অর্থাৎ দেখা গেল যে, বর্ধমানের শিল্পীরা বিভিন্ন স্থাপত্য-রীতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন। বাংলার নিজস্ব শিল্প রীতিকে আমরা বলতে পারি 'গৌড়ী-রীতি' বা 'গৌড়ীয় শৈলী'। তার সঙ্গে উড়িষ্যা থেকে আমদানী কৃত 'নাগর শৈলীর'-র সমন্বয় ঘটানো হয়েছে। এই দুই রীতিতে স্বতন্ত্রভাবে মন্দির নির্মিত হয়েছে, তার নিদর্শন পাওয়া যায়। আবার এই দুই রীতির সংমিশ্রণে উদ্ভাবিত শৈলীর পরিচয়ও আমরা পাই। আবার দেখা যায় গুপ্তযুগের স্থাপত্যশৈলীর উত্তরাধিকারের স্বীকরণ এবং তার সঙ্গে 'গৌড়ী' ও 'নাগর' রীতির সংমিশ্রণ। অবশ্য লক্ষণীয় যে, এই পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছিল প্রধানতঃ সপ্তদশ-অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকে। অবশ্য প্রাক্-মধ্যযুগের স্থাপত্যশৈলীর নিদর্শনগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধ্বংসপ্রাপ্ত অথবা কালের প্রকোপে জীর্ণ-দশায় কোনোপ্রকারে অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়াসে রত। চতুর্দশ থেকে ষোড়শ শতক পর্যন্ত ইসলামীয় স্থাপত্য শিল্পের প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হয় মসজিদ, সমাধি, মিনার প্রভৃতিতে। ষোড়শ থেকে উনবিংশ শতকের মধ্যে আবার হিন্দু-মন্দির নির্মাণে জোয়ার এসেছিল। এরই ভিত্তিতে যুক্তিসঙ্গত ভাবে অনুমান করা

যেতে পারে যে, আদি -মধ্যযুগে বর্ধমানে তথা বাংলায় পৌরাণিক ধর্মের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিশেষভাবে দেখা গিয়েছিল, সম্ভবতঃ মধ্যযুগের প্রাদুর্ভাবে ইসলাম ধর্মের প্রভাবে পৌরাণিক ধর্মের প্রতিষ্ঠা ক্ষুণ্ন হয়েছিল। কিন্তু মধ্যযুগে র শেষদিকে এবং আধুনিক যুগের প্রারম্ভে দেখা দিয়েছিল পৌরাণিক ধর্মের 'নবজাগরণ'।

সুলতানি যুগে বাংলায় যেমন, বর্ধমানেও তেমনি মধ্যযুগীয় পারসিক শিল্পরীতিতে গম্বুজ ও মিনারযুক্ত মসজিদ নির্মাণ হতে দেখা যায়। ইসলামীয় স্থাপত্য শিল্পের সঙ্গে গৌড়ী-রীতির স্থাপত্যের মিলন - মিশ্রণ দেখা যায়, যখন চালা মন্দিরের মত মসজিদ নির্মিত হয়। বর্ধমান শহরের বেড় অঞ্চলের নবাববাড়ি এবং রাজবাটীর সন্নিকটে জুম্মা মসজিদ স্থাপত্য – শৈলী – সংমিশ্রণের নিদর্শন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনটি গম্বুজযুক্ত মসজিদ দেখা যায়। তবে কাটোয়ায় আলম খানের মসজিদে রয়েছে ছয়টি গম্বুজ আর কালনায় জামি মসজিদের গম্বুজ সংখ্যা দশটি। বলা বাহুল্য, গম্বুজের সংখ্যা বৃদ্ধির দ্বারা মসজিদের আয়তন ও আড়ম্বর সম্পর্কে দর্শকের মনে একটি স্বাভাবিক ধারণা সৃষ্টি হয়।

টেরাকোটার ভাস্কর্যযুক্ত কয়েকটি মসজিদ এই প্রসঙ্গে উল্লেখের দাবী রাখে। যেমন, মঙ্গলকোটের হোসেনশাহী মসজিদ, কালনার জামি মসজিদ , এবং কেতুগ্রাম থানায় কুলুট গ্রামে হোসেনশাহী আমলের মসজিদ। সাধারণতঃ হিন্দু মন্দিরের গায়ে টেরাকোটার ভাস্কর্য শোভা পায়। উত্তর ভারতে যেসব মসজিদ আছে তার গায়ে এরকম টেরাকোটার অলঙ্করণ দেখা যায় না। যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুমান করা যায় যে, মসজিদ নির্মাণে নিযুক্ত শিল্পীরা হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। সেই কারণে মুসলমান শিল্পীর গঠন পরিকল্পনার সঙ্গে হিন্দু শিল্পীর ভাস্কর্যের কল্পনা যুক্ত হয়েছিল। ।

হিন্দু মন্দিরের উপাদান নিয়ে কয়েকটি মসজিদ বা তার অংশবিশেষ গড়ে উঠেছিল বলে মনে হয়। মজলিশ দীঘির দক্ষিণে ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদ, কাটোয়ায় শাহ্ আলম খানের মসজিদের তোরণদ্বার এবং দাঁইহাটে বদর শাহ্ আউলিয়ার মাজার প্রভৃতি নিদর্শনগুলির মধ্যে হিন্দু মন্দিরের উপাদান দেখা যায়।

মঙ্গলকোট বর্ধমান জেলার একটি ইসলামীয় সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠেছিল। এই স্থানটি আঠারো জন আউলিয়া বা মুসলমান সাধুপুরুষের স্মৃতি বিজড়িত তীর্থক্ষেত্র। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দানেশমন্দ খাঁ, আবদুল্লাহ্ গুজরাতী এবং শাহ জাকের আলি। এঁদের সমাধি মঙ্গলকোটে এখনও রয়েছে। দানেশমন্দের সমাধির নিকটেই দাঁড়িয়ে আছে শাহজাহানের আদেশে তৈরী একটি মসজিদ। মসজিদের গায়ে শিলা ফলকে খোদিত লিপি থেকে জানা যায় যে এই মসজিদটির নির্মাণকাল হিজরি ১০৬৫ অর্থাৎ ১৬৫৪ - ৫৫ খ্রীঃ। মঙ্গলকোটের নিকট দাঁইহাটে হোসেন শাহের আমলের একটি মসজিদ আছে, যার বৈশিষ্ট্য অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বিশ হাত উচ্চতাযুক্ত একটি মৃত্তিকা স্তূপের উপর বিশাল মসজিদটি প্রতিষ্ঠিত। স্তূপটি বৌদ্ধস্তূপ কিনা এখনও জানা যায় নি। মসজিদের খিলান, ইঁট, লতা-পাতা-ফুলের চমৎকার নক্সা এবং প্রচুর সংখ্যক

বৃহদাকার প্রস্তরখণ্ডের ব্যবহার দর্শকের বিস্ময় উদ্রেক করে। এই মসজিদের গায়ে শিলাফলকে উৎকীর্ণ লিপি থেকে জানা যায় "শ্রী চন্দ্রসেন নৃপ" - এর নাম।

বাংলার নিজস্ব শিল্প টেরাকোটা। গঙ্গা-ভাগীরথীর উপত্যকায়, দামোদর - অজয়ের তীরে যে মাটি সহজেই মেলে তাই দিয়ে শিল্পীরা মূর্তি গড়েছেন সুপ্রাচীনকাল থেকে। মূর্তি গঠনের তিনটি পদ্ধতি স্বীকৃত। প্রথমতঃ, সম্পূর্ণ হাতের দ্বারা শিল্পী মূর্তির অবয়ব গঠন করেন। দ্বিতীয়ত ঃ, অংশত হাতে তৈরী এবং অংশত ছাঁচে তৈরী করা হয়। তৃতীয়তঃ, সম্পূর্ণ মৃন্ময় মূর্তিটি ছাঁচে তৈরী করা হয়। এইভাবে মৃন্ময় মূর্তি গঠন শিল্পের ক্রমবিবর্তন ঘটেছে। মূর্তি গঠনের পর তাকে দৃঢ়তা দানের জন্য আগে রৌদ্রে শুকানো হত, তারপর রঙ করা হত। পরবর্তীকালে আগুনের আঁচে শুকিয়ে রঙ করা হত। এই উদ্দেশ্যে শিল্পীদের গৃহে ইঁটের ভাটার মত মৃন্ময় মূর্তির জন্য ভাটা তৈরী করা হত।

সুপ্রাচীনকাল থেকে টেরাকোটার মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রত্নস্থলে। বিশেষতঃ, টেরাকোটার মাতৃমূর্তি প্রচুর সংখ্যায় পাওয়া গেছে তাম্র-প্রস্তরযুগের সংস্কৃতি কেন্দ্রগুলিতে। যেমন, প্রাক্-বৈদিক যুগের হরপ্পা সংস্কৃতির কেন্দ্রগুলিতে। বর্ধমান জেলায় প্রাচীন টেরাকোটার মাতৃমূর্তি পাওয়া গেছে মঙ্গলকোট, পাণ্ডুরাজার ঢিবি এবং বেড়াগ্রামে। প্রাচীন এবং মধ্যযুগে পোড়ামাটির ভাস্কর্য ব্যবহার করা হত মন্দিরগাত্রে অলঙ্করণের জন্য। বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি , রামায়ণ - মহাভারত-পুরাণের কাহিনী, কৃষ্ণলীলা, এমনকি সাধারণ মানুষের জীবনের প্রতিচ্ছবি, লতাপাতা ফুলের অলঙ্করণ রূপায়িত হয় মন্দিরগাত্রে টেরাকোটা ভাস্কর্যে।

মধ্যযুগে বর্ধমানের মন্দিরগুলিতে টেরাকোটার অলঙ্করণ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তবে, পঞ্চদশ থেকে ষোড়শ শতক পর্যন্ত মন্দিরে টেরাকোটার অলংকরণ খুব স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে না। প্রধানতঃ, অষ্টাদশ শতকে নির্মিত মন্দিরগুলিতে টেরাকোটার অলঙ্করণ দর্শকের দৃষ্টিকে নন্দিত করে। যেমন , কালনার লালজী ও কৃষ্ণচন্দ্র মন্দির, সাতগাছিয়ার সিংহবাহিনী মন্দির, সাদিপুরের মদনগোপাল মন্দির, দোগাছিয়ায় সিঙ্গারকোণের রাধাকান্তের মন্দির, কালনায় অনন্ত বাসুদেবের মন্দির, শাঁকারী ও কাটারিয়ায় শিবমন্দির, বাহাদুরপুরের রঘুনাথ মন্দির এবং কালনায় প্রতাপেশ্বর মন্দির। অর্থাৎ , বাংলায় টেরাকোটা শিল্প নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যে সৃষ্ট হলেও পরবর্তীকালে মন্দির স্থাপত্যের অঙ্গীভূত ভাস্কর্যশিল্পে পরিণত হয়।

বাংলাদেশ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পরে ক্রমশঃ পৌরাণিক ভক্তিবাদী ধর্মের অন্তর্গত 'পঞ্চোপাসনা' অর্থাৎ বিষ্ণু, শিব, শক্তি, সূর্য ও গণপতির উপাসনা প্রসার লাভ করে। ভক্তদের উপাসনার নিমিত্ত শিল্পীরা এইসব দেবদেবীর মূর্তি নির্মাণ করেন প্রস্তর দ্বারা। তবে গুপ্তোত্তর কালে, বিশেষতঃ সপ্তম-অষ্টম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ -ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলার প্রস্তর ভাস্কর্যে জোয়ার আসে। লক্ষণীয় যে, পৌরাণিক দেবদেবীর মূর্তির তুলনায় জৈন তীর্থঙ্করের মূর্তি ও বুদ্ধমূর্তি খুব কমই পাওয়া যায়। অস্বীকার করার উপায় নেই যে, অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলায় মহাযান বৌদ্ধধর্মের যথেষ্ট প্রসার

স্থাপত্য ও ভাস্কর্যশিল্পের নিদর্শন বিচারে বর্ধমানের সাংস্কৃতিক অগ্রগতির পরিচয় পাওয়া গেল। সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই যে, বর্ধমানের এই দুই শিল্পের ক্ষেত্রে মধ্যযুগে এবং আধুনিকযুগের প্রথমদিকে বর্ধমানের শিল্পীরা যে অবদান রেখে গেছেন তার মৌলিকত্ব অনস্বীকার্য। বাংলার শিল্পসাধনার ইতিহাসে বর্ধমানের স্থান প্রতিষ্ঠিত।

পাঠপঞ্জী ঃ

নীহাররঞ্জন রায় ঃ বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, কলিকাতা, ১৩৫৬
বিনয় ঘোষ ঃ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, ১ম খণ্ড, কলিকাতা , ১৯৭৮
অশোক মিত্র (সম্পাদিত) ঃ পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বন ও মেলা, পঞ্চম খণ্ড, দিল্লী, ১৯৮২
সুকুমার সেন ঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, পূর্বার্ধ, কলিকাতা, ১৯৭৮; অপরার্ধ, কলিকাতা, ১৯৭৫
আশুতোষ ভট্টাচার্য ঃ বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৭৫
ভাস্কর চট্টোপাধ্যায় ঃ 'বর্ধমানের লোকসংস্কৃতি', স্মরণিকা, ৩৬ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগারের সম্মেলন,বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭০
যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী ঃ বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ১ম ২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৯০ ও ১৯৯১
বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ ঃ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা; ১৩১৪, ১৩২০, ১৩৮৮.
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ঃ কার্য্যবিবরণী, দশম বার্ষিক অধিবেশন, ১৩১৩, ১২ ই ফাল্গুন।
ঃ ইতিহাস , ১৩৮৯
R.D. Banerjee : Eastern Indian School of Medieval Sculpture, Delhi, 1930
D.J.McCutchion : Late Medieval Temples of Bengal, Asiatic Society, 1972
G. Santra : Temples of Midnapure, Calcutta, 1980
H. H. Risley : The Tribes and Castes of Bengal, 2 Vols, Reprinted,Calcutta, 1980,1981.
R.C.Mazumder : History of Bengal, Vol.1, Dacca, 1943.
Bhaskar Chattapadhya : Culture of Bengal, through the Ages, Burdwan University, 1988.
T.P. Bhattacharya : The Cannons of Indian Art, Calcutta, 1963
W.W.Hunter : A Statistical Account of Bengal, Vol-IV, London, 1875-1877
J.C.K.Peterson : Bengal District Gazetteer : Burdwan, Calcutta, 1910
Asiatic Society : Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol.13,No. 3, Calcutta, 1917.

বর্ধমান রাজপরিবারের ইতিবৃত্ত

নীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী

১৬৫৭ থেকে ১৯৫৫ প্রায় তিনশ বছর বর্ধমানের ইতিহাসের সঙ্গে বর্ধমানের রাজপরিবারের ইতিবৃত্ত একাকার হয়ে আছে। এই সময়কালের ইতিহাস আর রাজ পরিবারের ইতিহাস প্রায় অভিন্ন। কিভাবে রাঢ়বাংলার মধ্যমণি বর্ধমানে একটি জমিদারী বংশ প্রতিষ্ঠা পেল এবং ইতিহাসের নানা উত্থানপতনের মধ্যে সুদীর্ঘ তিনশ বছর টিকে রইল সে ইতিহাস কম কৌতুহলোদ্দীপক নয়। এখানে সংক্ষেপে সে কাহিনী আমরা জেনে নেব।

সুচনাপর্ব ঃ বর্ধমান রাজবংশের পূর্বপুরুষদের প্রথম যিনি সুদূর লাহোরের কোটলা মহল্লা থেকে এসে বর্ধমান শহরের উপকণ্ঠে দক্ষিণপূর্ব কোণে বৈকুণ্ঠপুর বেলেরা অঞ্চলে, অধুনা-লুপ্ত বল্লুকা নদীর তীরে স্থিত হলেন তাঁর নাম সঙ্গম রায়(রাই)। তিনি তীর্থ করতে পুরীধামে এসেছিলেন, ফেরার পথে বর্ধমানে এসে এতদঞ্চলের বাণিজ্যের সম্ভাবনায় আকৃষ্ট হলেন। তখন নিকটস্থ দামোদর নদে বজরা, নৌকায় সাজানো পণ্যের সম্ভার। তদুপরি বর্ধমানের উর্বর জমি তাঁকে টানল। সে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দশকের কথা। ১৬১০ সালে তিনি এসেছিলেন। বস্তুতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাংলা ছিল সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ প্রদেশ। ভারতবর্ষের নানা প্রান্ত থেকেই শুধু নয় — "..... Bengal was economically, perhaps the most flourishing province in the whole of India ..... Almost every year a large number of persians, Abyssians, Arabs, Chinese, Turks, Moors, Jews, Georgians, Armenians and merchants from some other parts of Asia poured in Bengal" (R.C. Mazumdar, History of the Freedom Movement in India, Vol. - 1) সঙ্গম রাইও থেকে গেলেন। ব্যবসা বাণিজ্যে মনযোগী হলেন।

আবুরাম ও বাবুরাম ঃ সঙ্গম রায়ের পুত্র বঙ্কুবিহারী রাই, তদীয় পুত্র আবুরাম রাইয়ের আমলে এই পরিবারের সচ্ছলতা বৃদ্ধি পেল। এই সময়ে একটি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনা সম্রাট জাহাঙ্গীর প্রেরিত বাংলার সুবেদার কুতুবউদ্দীনের সঙ্গে বর্ধমানের বিদ্রোহী ফৌজদার শের আফগানের যুদ্ধ। এ হল ১৬১৪ সালের ঘটনা। যুদ্ধে শের আফগানের পরাজয় এবং মৃত্যু ঘটে। শের আফগান পত্নী মেহেরউন্নিসা দিল্লীর সম্রাজ্ঞীর পদে আসীনা হন নূরজাহান রূপে। ইতিহাসের এ এক করুণ কাহিনী। শের আফগানের সমাধি বর্ধমানের অন্যতম দ্রষ্টব্য স্থান এখন ইতিহাসের মূক সাক্ষী রূপে।

আবুরাম রাই বর্ধমানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করলেন। তাঁর সময়ে সম্রাট শাজাহানের মোগলবাহিনী পূর্ববাংলায় বিদ্রোহদমনের উদ্দেশ্যে বর্ধমানের পথে ঢাকা যাত্রার পথে এখানে ছাউনী ফেলেন। মোগল বাহিনীর রসদে টান পড়লে আবুরাম রসদ ও সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেন। এই সহায়তার জন্য মোগল সম্রাট ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে তাঁকে বর্ধমান রেকাবী

বাজারের কোতোয়াল ও চৌধুরী উপাধিতে ভূষিত করেন। পরিবর্তিত হল বংশের ধারা বণিক থেকে রাজকর্মচারীরূপে।

(ঘোড়সওয়ারের ব্যবহার্য জিনিসপত্রাদির বাজারকে রেকাবী বাজার বলা হত। বর্তমানে যেখানে নুতনগঞ্জ বাজার?)

আবুরাম রাইয়ের পুত্র কিষাণবাবু, বাবুরাম নামে অধিক পরিচিত ছিলেন। তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণ ছিলেন। দিল্লীর সম্রাটের নিকট থেকে তিনি লক্ষ টাকার বিনিময়ে বর্ধমান এবং ইব্রাহিমপুর আদি তিনটি পরগণার জমিদারী পেলেন। সূচনা হল জমিদারী এস্টেটের।

জমিদারী পর্ব ঃ বাবুরাম রাইয়ের পুত্র ঘনশ্যাম রায় পিতার এস্টেটের উত্তরাধিকারী হলেন। তাঁর কাটানো শ্যামসায়র আজও তাঁর স্মৃতি বহন করছে। ঘনশ্যামের পুত্র কৃষ্ণরাম রাই। কৃষ্ণসায়র তাঁরই কাটানো, ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে সম্রাট ঔরঙ্গজেবের ফরমান অনুসারে কৃষ্ণরাম সমগ্র বর্দ্ধমান পরগণার জমিদার ও চৌধুরী হলেন। শের আফগানের বিদ্রোহের পর মোগল সম্রাটরা এই প্রদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতা উপলব্ধি করে স্থানীয় শাসকের হাতে জমিদারীর ভার অর্পন করার সিদ্ধান্ত নেন। ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তখন হুগলীতে বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করেছে। ঔরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত। এই সুযোগে চিতুয়া, বরদার (বর্তমানে মেদিনীপুরের অর্ন্তগত) জমিদার শোভা সিংহ ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন এবং উড়িষ্যার পাঠান সর্দার রহিম খাঁ-র সহায়তায় বর্ধমান আক্রমণ করলেন। বাংলার সুবেদার ইব্রাহিম খাঁ এই বিদ্রোহ দমনের কোনো চেষ্টাই করলেন না। ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণরাম রায় এই বিদ্রোহ দমনে সম্রাটের পক্ষে যোগ দেন। যুদ্ধে কৃষ্ণরাম পরাজিত ও নিহত হলেন। পুরনারী সহ অনেকেই শোভা সিংহ কর্তৃক বন্দী হন। পুরনারীগণ সম্ভ্রম রক্ষার্থে জহরব্রত পালন করেন। রাজকুমারী সত্যবতীর সম্ভ্রম হানির চেষ্টা করলে সত্যবতী শোভা সিংহকে হত্যা করেন। পরে ছুরিকাঘাতে আত্মঘাতিনী হন। অতঃপর রহিম খাঁ বিদ্রোহ পরিচালনা করেন। কৃষ্ণরামের পুত্র জগৎরাম ঢাকায় পলায়ন করে আত্মরক্ষা করেন। বিদ্রোহ সারা বাংলা বিহার উড়িষ্যায় ছড়িয়ে পড়ে। বিদ্রোহিরা হুগলী অবরোধ করলে ডাচেরা দুটি গানবোটের সাহায্যে তাদের বিতাড়িত করে। এই সময় ঔরঙ্গজেব তাঁর পৌত্র আজিম-উন-শান কে বাংলার সুবেদার নিযুক্ত করে বিদ্রোহ দমন করতে পাঠান। তাঁর আগমনের পূর্বেই ইব্রাহিমের পুত্র জবরদস্ত খাঁন রাজমহলে বিদ্রোহীদের দমন করেন। জগৎরাম, জবরদস্ত খাঁকে সাহায্য করেন। বিদ্রোহিরা বর্ধমানে পৌছালো। আজিম-উন-শান এদের অনুসরণ করেন। বর্ধমানের দক্ষিণে দামোদর এলাকায় 'মুলকাঠি' তে আবার যুদ্ধ হোল। পরাজিত রহিম খাঁ সন্ধির প্রস্তাব করলেন। আজিম-উন-শান সৈয়দ আনোয়ার এবং খাজা আবুল কাশেম নামে দুই সেনাপতিকে পাঠালেন। ধুরন্ধর রহিম খাঁ উভয়কেই গুপ্ত হত্যা করলেন। এরপর মোগলবাহিনী রহিম খাঁকে যুদ্ধে পরাজিত ও হত্যা করলেন। বিদ্রোহ দমিত হলো। জগৎরাম পৈতৃক জমিদারী ফিরে পেলেন।

মোগলবাহিনীকে সহায়তা করায় খুশি হয়ে ঔরঙ্গজেব জগৎরামকে নতুন ফরমান প্রদান করেন এবং জমিদারী এলাকা বৃদ্ধি পায়। জাহানাবাদ (বর্তমানে আরামবাগ), চম্পানগরী এবং পাণ্ডুয়ার জমিদারী বর্ধমানের সঙ্গে যুক্ত হল। জগৎরাম গুপ্তঘাতকের দ্বারা নিহত হন ১৭০২ খৃষ্টাব্দে।

জগৎরামের দুই পুত্র কীর্তিচাঁদ এবং মিত্রসেন রায়। কীর্তিচাঁদ জমিদারীর ভার প্রাপ্ত হলেন এবং পুরোন শত্রু শোভা সিংহর ভ্রাতা হিম্মৎ সিংহ এবং বিষ্ণুপুরের রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। হিম্মৎ সিংহকে কীর্তিচাঁদ স্বহস্তে নিহত করেন। বর্ধমানের জমিদারী বিস্তৃত হয় চন্দ্রকোনা, বরদা (ঘাটাল), চিতুয়া, ভুরশুট, মনোহরশাহী পরগণা এর অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৭০৬ খৃষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের এবং তার মৃত্যুর পর মহম্মদ শাহ্‌র ফরমান বলে এই সময় বর্ধমান জমিদারী বিশাল আকার ধারণ করে। এই সময় মোট ৫৭ টি পরগণা জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এরপরের পঁচিশ বৎসর মারাঠা শক্তির উত্থানের পর্ব। মারাঠা ঝটিকা বাহিনী উত্তর ভারত থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করে। বাংলার 'বর্গীর হানা'র কথা সকলেই জানেন। কীর্তিচাঁদকে বর্গী হানার মোকাবিলা করতে হয়। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে তার মৃত্যু হয়। বাংলার নবাব তখন আলিবর্দ্দী খাঁ।

কীর্তিচাঁদ বর্ধমান জমিদার বংশের অন্যতম প্রসিদ্ধ পুরুষ। শুধু জমিদারী বিস্তার এবং যুদ্ধ বিগ্রহ নয় তার কীর্তি বিস্তৃত হয় অন্যান্য ক্ষেত্রেও। মন্দির নির্মাণ, পুকুর কাটানো, রাস্তাঘাট তৈরী, শিক্ষার প্রসার সব ব্যাপারেই তিনি মনোযোগী ছিলেন। কাঞ্চননগরে কুটির শিল্পে তাঁরই উদ্যোগ ছিল, রাণীসায়র তাঁরই সময়েই কাটানো। ঘনরাম চক্রবর্তী তাঁর সভাকবি ছিলেন। বৌদ্ধ মঙ্গলকাব্য শ্রী ধর্মমঙ্গল রাজকবি ঘনরামের রচনা। কীর্তিচাঁদকে এই বংশের কীর্তিমান পুরুষরূপে চিহ্নিত করা হয়।

রাজবংশের সুচনা ঃ কীর্তিচাঁদের পুত্র চিত্রসেন রায়। পিতা জীবিত থাকতেই তিনি মোগল সম্রাটের নিকট হতে ১৭২৯ খৃষ্টাব্দে সেলিমাবাদের ইন্দ্রায়ণ পরগণা এবং মান্দারনের মণ্ডলঘাট পরগণার জমিদারী পান। ইনিই প্রথম 'রাজা' উপাধি ও খিলাৎ পান। তখনকার দিনে জমিদারির কাজ ছিল খাজনা আদায় করা এবং ফৌজদারীর কাজ ছিল আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা। মোগল সম্রাট এই দুই ক্ষমতাই বর্ধমান রাজাকে প্রদান করেন। চিত্রসেন পিতার জীবিতকালেই জমিদারী পরিচালনা করেন এবং বাহুবলে গোপভূম জয় করেন। সেনপাহাড়ী দূর্গ তারই নির্মিত। চিত্রসেনও বিদ্যানুরাগী ছিলেন, তাঁর সভাকবি ছিলেন বাণেশ্বর তর্কালঙ্কারত যাঁর রচনা 'চিত্রচম্পু' বর্গী আক্রমণের ঐতিহাসিক প্রামাণ্য ইতিহাস রূপে গ্রাহ্য। চিত্রসেন বেশীদিন রাজত্ব করতে পারেন নি। ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে নিঃসন্তান চিত্রসেনের মৃত্যু হয়। এরপর তাঁর খুল্লতাত মিত্রসেন রায়ের পুত্র তিলকচাঁদ রাজগদীতে বসেন এবং মোগল সম্রাট মহম্মদ শাহ্ ফরমান জারি করে তা অনুমোদন করেন।

বর্গীর হাঙ্গামায় বর্ধমান তখন বিপর্যস্ত। গ্রামের পর গ্রাম জনশূন্য। বর্ধমান শ্মশানে

পরিণত। নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ মারাঠাদের সঙ্গে অসম্মানজনক শর্তে (চৌথ আদায় দেবার কড়ারে) সন্ধিচুক্তি করেন। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মোগলশক্তি ক্ষীয়মান, বাংলার নবাবের অক্ষমতা প্রকট, বর্গীর আক্রমণে জনজীবন এবং অর্থনৈতিক জীবন বিপর্য্যস্ত। বুদ্ধিমান বেনিয়া ইংরেজ যেন এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে বহু লোকক্ষয় এবং অর্থক্ষয়ের পর বাংলার নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ মারাঠাদের সঙ্গে সন্ধি চুক্তি করতে বাধ্য হন। দিল্লীর মোগল সম্রাটের শাসন শিথিল হয়ে পড়ছে - ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে তিলকচাঁদ বাদশাহী ফরমান পেলেন। তার দুই বৎসর পর ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে তিলকচাঁদের সঙ্গে কোম্পানীর বিরোধ বাধে। জমিদারীর বকেয়া খাজনা না দিতে পারায় বিটিশরা তিলকচাঁদের কলিকাতার সম্পত্তি মেয়র কর্তৃক বাজেয়াপ্ত করেন। বিরক্ত তিলকচাঁদ তার এলাকায় বৃটিশদের ব্যবসা বন্ধ করে দেন। অবশেষে নবাবের মধ্যস্থতায় একটি মীমাংসা হয়। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ মারা যান। এর পরের ইতিহাস ভারতের আগামী দু'শ বছরের রাজনীতির গতিসূত্র নির্দ্ধারণ করে দেয়।

পলাশীর যুদ্ধ ও তৎপরবর্ত্তী বর্ধমান

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌল্লার পতনের পর ব্রিটিশ ক্রীড়নক নবাব মীরজাফর ১৭৫৮ তে বর্ধমান চাকলার কিছু অংশ ইংরেজকে দিলেন খাজনা (Revenue) আদায় করার জন্য। ১৭৬০ সালে মীরকাসিম মেদিনীপুর, চট্টগ্রাম সহ চাকলা বর্ধমান কোম্পানীকে দেওয়ানী স্বরূপ দান করলেন। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের ভাষায়, ".... for defraying the expenses of English troops employed in the defence of country." (History of the Freedom Movement in india. page- 12, Vol.- 1). বর্ধমানের রাজকোষ তখন প্রায় শূন্য। বর্গীর হাঙ্গামায় ৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়ে গেছে। এর উপর মীরকাসিম ধার্য বিপুল কর (খাজনা) দেবার ক্ষমতা তিলকচাঁদের ছিল না। তিলকচাঁদ কোম্পানীকে তার দুরবস্থার কথা জানালেন। কোম্পানীর সেনাবাহিনীর সঙ্গে তিলকচাঁদের সেনাবাহিনীর ইতঃস্তত খণ্ডযুদ্ধ চলতে লাগল। প্রায় বিদ্রোহ বলা চলে। ১৭৬০ সালের জুলাই মাসে রাজার সৈন্য ২০০ জনের কোম্পানীর সিপাই বাহিনীকে পরাস্ত করেন। ঐ বৎসর নভেম্বরে মীর কাসিম কোম্পানীকে জানাচ্ছেন যে বীরভূম এবং বর্ধমানের রাজারা দশ থেকে পনেরো হাজার সেনা নিয়ে একটি যৌথ বাহিনী গড়ে তুলেছেন এবং তাঁরা বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত। কোম্পানী খবর পেয়ে মেজর হোয়াইট (Major White)-এর নেতৃত্বে সেনা পাঠালেন। ২৯শে ডিসেম্বরের মধ্যে বিদ্রোহ দমিত হল। ক্ষণস্থায়ী এই বিদ্রোহে মারাঠা সেনাপতি শিউভাট এবং দিল্লীর সম্রাট শাহ্ আলমের মদত ছিল। কিন্তু শেষ মুহুর্তে উপযুক্ত সময় আসেনি এই অজুহাতে শাহ্ আলম পিছিয়ে যান। বীরভূমের রাজা আসাদউজ্জামান সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করেন কিন্তু 'ফকির' ও 'সন্যাসি' দের নিয়ে গড়া রাজসৈন্য (বর্ধমান রাজার) বর্ধমানের দক্ষিণে সঙ্গতগোলার কাছে যুদ্ধে পরাজিত হলেন। যুদ্ধজয়ী ইংরেজ কিন্তু তিলকচাঁদের সঙ্গে সন্ধি করলেন — "The English, however, perhaps wisely, chose to look upon the Raja as still their

friend and continued him in the Zamindari on terms much below the real revenue due to want of money and other reasons." (ibid ..... Page- 59, Vol.- 1). বেনিয়া ইংরেজ তখনও 'বণিকের মানদণ্ড' পুরোপুরি ত্যাগ করে 'রাজদণ্ড' অধিকার করার কথা তেমনভাবে ভাবছে না। তাই তিলকচাঁদের সঙ্গে সন্ধি করছে তারা।

তিলকচাঁদ কিন্তু টাকা দিতে পারলেন না। কোম্পানী তখন বর্ধমানের জন্য 'রেসিডেন্ট' পদ সৃষ্টি করে জনস্টনকে প্রথম রেসিডেন্ট সুপারিনটেন্ডেন্ট করে পাঠালেন। ১৭৬০ সালে কোম্পানীর অধিকারে আসার সময় বর্ধমানের রাজস্ব ধার্য হয়েছিল ৩১,৭৫,৩৯১ সিক্কা টাকা। তিন বছরের মধ্যে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৪১,৭২,০০০ সিক্কা টাকায়। জনস্টন খাজনা আদায় করতে ব্যর্থ হয়ে জমিদারীর কিছু অংশ নিলামে বিক্রি করার ব্যবস্থা করেন। এর ফলে হুগলী ও বর্ধমান জেলায় কয়েকটি নুতন ভূস্বামী পরিবার সৃষ্টি হলো। বর্ধমানে এই সর্বপ্রথম নিলাম পরবর্ত্তীকালে ওয়ারেন হেস্টিংস্‌কে প্রভাবিত করে।

মনসবদারী ঃ ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে তিলকচাঁদ চার হাজারী মনসবদার এবং ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে ৫ হাজারী মনসবদারী প্রাপ্ত হন এবং তিন হাজার অশ্বারোহী সহ বন্দুক রাখার ও রণবাদ্যের অনুমতি পান। সম্রাট তাঁকে 'মহারাজাধিরাজ' উপাধিতে ভূষিত করেন। পরবর্ত্তী বংশধরগণ এই উপাধি ব্যবহার করে আসছেন উত্তরাধিকার সূত্রে। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে (বাংলা ১১৭৬ সন) বাংলাদেশ চরম দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে, 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে যা পরিচিত। বাংলার এক তৃতীয়াংশ লোক এই দুর্ভিক্ষে মারা যান। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে তিলকচাঁদের মৃত্যু হয়। বর্ধমান রাজবংশের একটি অধ্যায় শেষ হয়। এরপর বর্ধমানের রাজপরিবার আর কখনও ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ করেন নি।

জনস্টনের পর মি হে এবং মি বোল্টস্‌ বর্ধমানের রেসিডেন্ট সুপারিনটেন্ডেন্ট নিযুক্ত হয়ে আসেন কিন্তু খাজনা আদায় বাড়ে না। জমিদারীর অংশবিশেষ নীলামে বিক্রি হতে থাকে এবং সুপারিনটেন্ডেন্টরাও নানা রকম দুর্নীতিতে জড়ান। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বর্ধমান জেলাকে শ্মশানে পরিণত করে দেয়। W.W. Hunter- এর 'Annuals of Rural Bengal' বইতে এই সময়ের দুর্ভিক্ষপীড়িত বর্ধমানের যে ছবি পাওয়া যায় তা অত্যন্ত নির্মম ও করুণ। তিলকচাঁদ বর্গীর আক্রমণে এবং মন্বন্তরের কাহিনী বিবৃত করে কোম্পানীকে জানান যে খাজনা দেওয়া সম্ভব নয়।

দুর্যোগ ঃ ১৭৭০ এই জটিল ও ভয়াবহ পরিস্থিতিতে রাজকোষ শূন্যরেখে তিলকচাঁদ মারা যান এবং তার নাবালক পুত্র তেজচাঁদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তেজচাঁদের মাতা মহারাণী বিষ্ণুকুমারী বা বিষুণকুমারী অভিভাবিকা হন। তেজচাঁদকে পিতৃশ্রাদ্ধের জন্য কোম্পানীর কাছে অর্থসাহায্য চাইতে হয়। লালা উমিচাঁদ তখন রাজ এস্টেটের দেওয়ান। বর্ধমান জেলা প্রধান গ্রাহাম ব্রজকিশোর নামে একজন শঠ ও দুর্বৃত্ত লোককে রাজপরিবারের ম্যানেজার নিযুক্ত করেন। ব্রজকিশোর তেজচাঁদকে কার্য্যতঃ বন্দি করে রাখেন এবং মহারাণী বিষ্ণুকুমারীর কাছ থেকে রাজার সীল জোর করে কেড়ে নেন। ব্রজকিশোর এই

রাজসীল ব্যবহার করে যথেচ্ছাচার করতে থাকেন, রাজকোষ আদায়ে অত্যাচার প্রজাপীড়ন বাড়তে থাকে। বিষ্ণুকুমারীকে অপদস্থ করার জন্য হেস্টিংস - বন্ধু বারওয়েল তাঁর নামে কুৎসা রটালেন। কৃষ্ণনগরের মহারাজ নন্দকুমারের পরামর্শে বিষ্ণুকুমারী কাউন্সিল-এ গ্রাহামের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁর বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ ছিল যে তিনি জমিদারী থেকে প্রায় ১১ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেছেন। গ্রাহাম ছিলেন হেস্টিংসের বন্ধু। কাউন্সিল বৈঠকে হেস্টিংস গ্রাহামকে সমর্থন করেন। তিলকচাঁদের সঙ্গে হেস্টিংসের শত্রুতা ছিল। গভর্নর জেনারেল হেস্টিংসের বিরোধীদের সন্দেহ ছিল যে স্বয়ং হেস্টিংসও ব্যক্তিগতভাবে গ্রাহামের আত্মসাৎ করা টাকার ভাগ পেয়েছেন। কিন্তু গ্রাহামের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করা যায়নি। তাঁকে শুধুমাত্র ভৎর্সনা করে ছেড়ে দেওয়া হয়। ১৭৭৬ থেকে ১৭৭৯ এই তিন বছর বর্ধমানের জমিদারী মুলতঃ গ্রাহাম ও ব্রজকিশোরের হাতে ছিল। ১৭৭৯-এ তেজচাঁদ সাবলকত্ব প্রাপ্ত হয়ে জমিদারী অধিকার ফিরে পান।

যুবক তেজচাঁদ ছিলেন উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবের। অসৎ ও উচ্ছৃঙ্খল স্তাবকবৃন্দ তাঁকে সঙ্গ দিত। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর এবং পরে গ্রাহাম ও ব্রজকিশোরের শঠতায় রাজকোষের অবস্থা পূর্বেই ভাল ছিল না। এখন আরও খারাপ হলো। সরকারের খাজনা বাকি পড়ল। আদায়ের দায়ে তেজচাঁদ গৃহবন্দী হলেন তবুও অবস্থার উন্নতি হলো না। অথচ ইংরেজের টাকা চাই-ই। জমিদারী নিলাম হতে থাকল। সিঙ্গুরের দ্বারিকানাথ সিংহ, ভাস্তারার ছকু সিংহ, জনাইয়ের মুখার্জ্জী, তেলেনিপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায়রা হুগলীর এক বিরাট অংশ কিনে নিলেন। ১৭৯০-এ দশ বছরের বন্দোবস্তে (decennial Settlement) - রেভিনিউ বোর্ডের দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ মহারাজার কর প্রচুর ধার্য্য করলেন। ১৭৭১ থেকে ১৭৯২ পর্যন্ত অবাধে প্রজা উৎপীড়ন ও অত্যাচার চলতে থাকে। কিন্তু জমিদারীর অবস্থা খারাপ থেকে আরও খারাপ হতে থাকে।

১৭৯৩ ঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ঃ এই অসহনীয় অবস্থা থেকে বর্ধমান রাজপরিবার মুক্তি পায় ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হবার পর থেকে। ভারতবর্ষের ভূমি-ব্যবস্থার ইতিহাসে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে সে আলোচনার অবকাশ নেই। ১৭৯৩-এ রেগুলেশন - ১ বলে সমস্ত পুলিশী ক্ষমতা সরকারে ন্যস্ত হয়। বর্ধমান জমিদারীর খাজনা নির্ধারিত হয় ৪০ লক্ষ টাকা এবং এক লক্ষ টাকা পুলবন্দী ক র ধার্য করা হয়। (৪০ লক্ষ ১৫ হাজার ১০৯ সিক্কা টাকা এবং ১ লক্ষ ৯৩ হাজার ৭১২ সিক্কা টাকা পুলবন্দী বা বাঁধ মেরামতির বাবদ)। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে অক্ষম রাজা পুনরায় রাজমাতাকে রাজকার্য পরিচালনার ভার দিলেন। কিন্তু রাজার স্বভাবের পরিবর্তন না হওয়ায় এস্টেটের কোন উন্নতি হলো না। ১৭৯৭ খৃস্টাব্দে আরও কিছু মহাল বিক্রী হলো। বিষ্ণুকুমারী মারা যান ১৭৯৮-এ। তেজচাঁদ অতঃপর সংযত হন এবং রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করেন।

পত্তনি প্রথার সৃষ্টি ঃ বর্ধমানের জমিদারীর আয়তন নীলাম বিক্রীর মাধ্যমে ইতিমধ্যেই অনেক সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিল। তেজচাঁদ বাদবাকি এস্টেটকে রক্ষা করার জন্য পত্তনি

প্রথার প্রচলন করেন। বাংলা দেশের ভূমি ব্যবস্থার পত্তনি প্রথা বর্ধমানের অন্যতম অবদান। এই প্রথার মাধ্যমে সমগ্র জমিদারীকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে এক একজন বিত্তশালী লোককে বার্ষিক নির্দ্দিষ্ট খাজনার বিনিময়ে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। ইংরেজ সরকার পরে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে পত্তনি প্রথাকে আইন স্বীকৃতি দেন। পত্তনি প্রথা বর্ধমান -জমিদারীকে রক্ষা করে এবং কালক্রমে বর্ধমান রাজপরিবার যে বাংলাদেশ তথা সমগ্র ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও সমৃদ্ধশালী জমিদারবংশরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করে তার মূলেও এই পত্তনি প্রথা।

মহারাজ তেজচাঁদ আটবার বিবাহ করেন - তার মধ্যে একমাত্র নানকী কুমারীর গর্ভে তার একমাত্র সন্তান জন্ম গ্রহন করেন। শেষ জীবনে তেজচাঁদ বহু জনহিতকর কাজ করেন। তিনি বিদ্যানুরাগী ছিলেন। তাঁর অর্থানুকুল্যে এবং আগ্রহে বর্ধমানে বহু পাঠশালা, টোল এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হয়। কমলসায়র তার আমলেই কাটানো হয়। শেষ বয়সে তিনি শাক্ত ধর্মের প্রতি অনুরক্ত হন এবং সাধক কবি কমলাকান্তকে বর্ধমানে নিয়ে আসেন। শুধু বর্ধমান নয় হুগলী জেলারও অনেক জনহিতকর কাজে তিনি অর্থব্যয় করেন। চুঁচুড়ায় ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন তারই কীর্তি, 'কুন্তিনালার' সেতু তাঁরই অর্থসাহায্যে নির্ম্মিত হয়। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে (মতান্তরে ১৮১৭) Charles-Du-Bordieux কে Principal করে বর্ধমানে একটি কলেজ শুরু করেন। ১৮৩১ বর্ধমান রাজ এস্টেটের সীমানা নির্ধারিত হয় পূর্বে গঙ্গার পশ্চিম সীমানা, দক্ষিণে কংসাবাতী ঘাট, উত্তরে মুর্শিদাবাদের দক্ষিণপ্রান্ত এবং পশ্চিমে পূর্ব পঞ্চকোট। ১৮৩২ সালে তেজচাঁদের মৃত্যু হয়। তেজচাঁদের জীবিত কালে ১৮২১ খৃষ্টাব্দে তেজচাঁদের একমাত্র পুত্র প্রতাপচাঁদের অন্তর্ধান অথবা মৃত্যু হয়েছিল। সে রহস্য কখনই সম্পূর্ণ উম্মোচিত হয় নি। প্রতাপচাঁদ একাধারে কুস্তিগীর, দক্ষ তীরন্দাজ, বিদ্যাবুদ্ধিতে বিচক্ষণ, উচ্ছৃঙ্খল ও যথেচ্ছাচারী ছিলেন। পিতা জীবিত থাকাকালীনই তিনি ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে রাজকার্য্যের ভার পান। তাঁরই উদ্যোগে Regulation VIII of 1819 পাশ হয়। এই Regulation -এর বলে পত্তনি প্রথা আইন সিদ্ধ হয় এর খসড়া প্রতাপচাঁদের তৈরী। এর আগে খাজনা বাকি পড়লে পত্তনিদারের বিরুদ্ধে defaulcation -এর মামলা করা যেত না। ১৮২১ সালে প্রতাপচাঁদ হঠাৎ নিরুদ্দেশ হন। ১৪ বছর পর একজন প্রতাপ চাঁদের আবির্ভাব হয়। পরাণচাঁদ কাপুর তখন রাজ এস্টেটের ম্যানেজার। এই প্রতাপচাঁদকে জাল প্রতাপচাঁদ প্রতিপন্ন করা হয় এবং এইখানেই সঙ্গম রায় পরিবারের সমাপ্তি। প্রতাপচাঁদের কাহিনী এখনও রহস্যাবৃত। বর্ত্তমান রাজপরিবারের উত্তর পুরুষরা অথবা অন্য কেউ এ রহস্যের জাল এখনও উম্মোচন করেননি।

দত্তক প্রথা শুরু ঃ মহতাব বংশ শুরু ঃ পরাণচাঁদ কাপুর (কর্পুর) ছিলেন তেজচাঁদের অন্যতম মহিষী কমলকুমারীর ভাই। কমলকুমারীর পরামর্শে তেজচাঁদ পরাণচাঁদের পুত্র চুনীলাল কাপুরকে দত্তকপুত্র হিসাবে গ্রহন করেন। পরাণচাঁদই নাবালক চুনীলালের পক্ষে রাজ্য পরিচালনা করতে থাকেন। ইতিমধ্যে চুনীলাল কাপুরের নাম পরিবর্তিত হয়ে মহতাবচাঁদ (বা মহতাপ) হয়ে গেছে। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে মহতাবচাঁদ সাবলকত্ব প্রাপ্ত হয়ে

রাজসিংহাসনে বসেন। তৎকালীন গর্ভনর জেনারেল লর্ড বেন্টিঙ্ক মহতাবের মহারাজাধিরাজ উপাধি অনুমোদন করেন। মোগল সম্রাটের বদলে এবার থেকে বৃটিশ সরকার উপাধির স্বীকৃতি দিতে শুরু করলেন। বর্ধমান রাজবংশের আনুগত্যের গতিও ভিন্নমুখ হলো। বৃটিশের সঙ্গে মহতাবচাঁদ সুসম্পর্ক বজায় রাখলেন। ১৮৫৫ সাঁওতাল বিদ্রোহ এবং ১৮৫৭ সিপাহী বিদ্রোহের সময় তিনি বৃটিশকে সর্বপ্রকার সহায়তা করলেন। পুরস্কার স্বরূপ বৃটিশ সরকার তাঁকে Indian legislative council এর অতিরিক্ত মনোনীত সদস্য নিযুক্ত করলেন। বাংলাদেশে মহতাবচাঁদই প্রথম ব্যক্তি যাকে এই সম্মান দেওয়া হলো। (১৮৬৪ সালে) ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে উত্তরাধিকার সূত্রে অস্ত্র রাখার অনুমতি পান। তাঁর নামের আগে সম্মান সূচক His Highness যুক্ত হলো এবং ১৩-তোপের সম্মানাধিকারী হলেন। শুরু হলো এক নতুন যুগের। মহতাবচাঁদ দীর্ঘ ৩৭ বছর রাজত্ব করার পর ১৮৮১ সালে মারা যান। মহতাবচাঁদের আমলে বর্ধমান জমিদারীর সীমানা বিস্তৃত হয়। উড়িষ্যার কুজঙ্গ এবং মেদিনীপুরের সুজসুখা জমিদারী তিনি কিনে নেন। তার অন্যতম স্মরণীয় কীর্তি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন - যা আজ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল হয়েছে।

মহতাবচাঁদ বিদ্যানুরাগী ছিলেন। ১৭১৮ খৃষ্টাব্দে তেজচাঁদ যে Anglo vernacular স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন তাঁকে আরও উন্নত করে হাই ইস্কুলে পরিণত করেন ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে। বর্ধমানে আধুনিক শিক্ষার প্রসারে তাঁর অবদান স্মরণীয়। বর্ধমান ও কালনায় দুটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তাঁরই আগ্রহে। বিদ্যাসাগর মহতাবচাঁদকে 'First man of Bengal' বলে সম্মান জানিয়েছিলেন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বর্ধমানে আসেন এবং মহারাজের পৃষ্ঠপোষকতায় ব্রাহ্মসমাজ শাখার প্রতিষ্ঠা করেন। পরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ বলে তা পরিচিত হয়। এখানে 'ব্রাহ্ম বয়েজ স্কুল' নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় কালক্রমে যা বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল স্কুল নামে প্রসিদ্ধ হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারে তাঁর ঝোঁক ছিল। তাঁর Joint Manager এবং Private Secretary ছিলেন D. Miller রামায়ণ এবং মহাভারতের সংস্কৃত থেকে বাংলা অনুবাদ করানো তাঁর এক স্মরণীয় কীর্তি। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রায়ই তাঁর অতিথি হতেন। এ ছাড়াও বহু পণ্ডিত, মৌলভী ও শিক্ষককে তিনি অর্থ সাহায্য করতেন। জ্ঞানচর্চা ও সংস্কৃতি সাধনা সকল দিকেই তাঁর আগ্রহ ছিল এবং উদারহস্তে তিনি সহায়তা করতেন এসব কাজে। মহতাবচাঁদ প্রজানুরঞ্জক এবং উদারমনা ছিলেন। সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। পোষাকে আচরণে এমনকি তাঁর নামেও (মহতাব বা মহতাপ - চন্দ্র পারসী শব্দ) তাঁর মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছিল। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে (মতান্তরে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে) ভাগলপুরে তাঁর দেহাবসান ঘটে।

মহতাব বংশের সূচনা ঃ আবারও দত্তক ঃ অপুত্রক মহতাবচাঁদ তাঁর শ্যালক বংশগোপাল নন্দের পুত্র ব্রহ্মদাস নন্দকে দত্তক গ্রহন করেন। নামকরণ হয় আফতাব চাঁদ মহতাব। (পরে 'মহতাব' উপাধি বা Surname এই রাজপরিবার পাকাপাকিভাবে গ্রহন করে)। আফতাবচাঁদ ১৮৮৫ সালে অল্পবয়সে মারা যান। এই অল্পসময়ের মধ্যেই বেশকিছু

জনকল্যাণমূলক কাজ করেন। লাকুড়ডিতে জলকল নির্মিত হয় তাঁরই সহায়তায়। রাজ লাইব্রেরীরও তিনিই নির্মাতা। আফতাব চাঁদও অপুত্রক ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর উইল অনুযায়ী জমিদারীর ভার ন্যস্ত হয় Court of Wards-এর উপর। তিনি তাঁর স্ত্রী বিনোদেয়ী দেবীকে উত্তরাধিকারী মনোনয়নের অধিকার দিয়ে গিয়েছিলেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে রাজা বনবিহারী কাপুরের ছেলে বিনোদবিহারী কাপুরকে বিনোদেয়ী দেবী দত্তক নেন। এ নিয়ে পারিবারিক ঝামেলা প্রচুর হয়। যাইহোক ১৬ বছর Court of Wards-এর তত্বাবধানে থাকার পর ১৯০২ খৃষ্টাব্দে বিজনবিহারী কাপুর নাম বদল করে বিজয়চাঁদ মহতাব নামে রাজসিংহাসনে আরোহন করেন। বিজয়চাঁদই এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ। লর্ড কার্জন তখন বাংলার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। এদেশে ইংরেজ শাসন জাঁকিয়ে বসেছে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়েছে ১৮৮৫ সালে। বর্ধমানের শান্ত জনজীবনে স্বাধীনতা আন্দোলনের ঢেউ এসে পৌছায়নি। সুশিক্ষিত বিজয়চাঁদ বংশের ঐতিহ্য অনুসরণ করে বৃটিশ রাজশক্তির সঙ্গে মিত্রতা সম্বন্ধ বজায় রাখতে যত্নবান হলেন। ১৯০৪ সালে কার্জন বর্ধমানে এলেন। তাঁকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য নির্মিত হয় 'স্টার অফ ইন্ডিয়' গেট। ১৯০৬ সালে বিজয়চাঁদ ইউরোপ ভ্রমণে যান। ফিরে এসে ইংরাজীতে Impression নামে পুস্তক রচনা করেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে লর্ড মিন্টোর কাছে মহারাজাধিরাজ খেতাব বংশানুক্রমে ব্যবহারের অনুমতি পান। ১৯০৮ সালে কলিকাতার 'ওভারটুন' হলে তদানীন্তন গর্ভনর স্যার অ্যান্ড্রু ফ্রেজারকে জনৈক বিপ্লবী যুবকের গুলির হাত থেকে রক্ষা করেন। সরকার এজন্য তাঁকে K.C.I.E এবং Indian order of Merit(Class III) সম্মানে ভূষিত করেন।

বিজয়চাঁদ ইংরেজের পরম মিত্র হওয়া সত্বেও জাতীয় কংগ্রেস এবং গোপন বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। বর্তমান মহারাজকুমার ডঃ প্রণয়চাঁদ মহতাবের সঙ্গে আলোচনায় জানা যায় যে তিনি ইংল্যান্ডে গিয়ে একস্থানে ভারতবর্ষকে গ্রেটব্রিটেনের সঙ্গে যুক্ত করে Federation of Greater Britain করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। ১৯০৭ থেকে ১৯১৮ পর্যন্ত তিনি Bengal Legislative Council সদস্য; ১৯০৯ থেকে ১৯১২ পর্যন্ত Imperial Legislature Council এবং ১৯১৮ থেকে ১৯২৪ বঙ্গীয় শাসন পরিষদের সদস্য ছিলেন। শ্রদ্ধেয় স্বাধীনতা সংগ্রামী ফকির রায় এবং অন্যান্যদের কাছ থেকে জানা যায় যে তিনি কংগ্রেসী আন্দোলন এবং বিপ্লবী আন্দোলনকে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে নানাভাবে সহায়তা দিতেন। অর্থাৎ স্বাজাত্যবোধ তাঁর প্রবল ছিল। ১৯২৫ সালে মহাত্মা গান্ধী যখন বর্ধমানে আসেন তিনি তাঁর থাকার ব্যবস্থার তদারকী করেন। পরে সুভাষচন্দ্র বসু (১৯২৮) যখন বর্ধমানে আসেন মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে বক্তৃতা করতে বিজয়চাঁদ তাঁকেও অভ্যর্থনা জানান।

বিজয়চাঁদ মহতাব দীর্ঘ প্রায় চল্লিশ বছর বর্ধমান রাজবংশের প্রধান হিসাবে ভারত ইতিহাসের এক যুগ সন্ধিক্ষণে জমিদারী পরিচালনা করেন। ১৯০২ থেকে ১৯৪১ (বিজয়চাঁদের মৃত্যু) বাংলা তথা ভারতের রাজনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। ১৯০৫

সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন বাঙালীর জাতীয়তাবোধকে তীব্রভাবে জাগিয়ে তুলেছিল। পরে স্বদেশী আন্দোলন সমগ্র বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। শান্ত বর্ধমানেও রাজনীতির অস্থিরতা অনুভূত হতে থাকে। বিজয়চাঁদ সুশিক্ষিত আধুনিক ব্যক্তি ছিলেন। মহতাব বংশে তিনিই প্রথম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁর পুত্র উদয়চাঁদ প্রথম গ্র্যাজুয়েট। বাংলা, ইংরাজী এবং সংস্কৃত ভাষা বিজয়চাঁদ সযত্নে শেখেন। তিনি সুবক্তা, বিদ্যোৎসাহী এবং সংস্কৃত চর্চার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। দেশের পরিবর্তনশীল রাজনীতির গতিপ্রকৃতি তিনি সঠিকভাবে বুঝতে পেরেছিলেন। সেই কারণেই কংগ্রেস আন্দোলনের প্রতি তাঁর পরোক্ষ সমর্থন ছিল।

ব্যক্তি বিজয়চাঁদ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন সেকথা আগেই বলা হয়েছে। বিজয়গীতিকা, ত্রয়োদশী (কাব্য), রণজিৎ (নাটক), মানস-লীলা (বিজ্ঞান-নাট্য), Meditation, Impression, প্রভৃতি কুড়িটি গ্রন্থের রচয়িতা। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন বর্ধমানে অনুষ্ঠিত হয় তাঁরই অর্থসাহায্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায়। রাজ কলেজকে তিনি ডিগ্রী কলেজে উন্নীত করেন। শুধু বর্ধমান নয় কলকাতার শিক্ষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও বিজয়চাঁদের অবদান অসামান্য। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং কলকাতা চিড়িয়াখানা প্রতিষ্ঠায় তাঁর উল্লেখযোগ্য আর্থিক অবদান ছিল। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ এখন নেই। শুধু এটুকু বলা যাক যে বিজয়চাঁদ ছিলেন একজন বর্ণময় পুরুষ, বিদ্যোৎসাহী, বিচক্ষণ, শিক্ষাসংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক এবং রাজনীতি সচেতন ভুস্বামী। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ২৯শে আগষ্ট তিনি উদয়চাঁদ এবং অভয়চাঁদ নামে দুই পুত্রকে রেখে মারা যান।

১৯৪১ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ এক অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তখনও চলছে। দেশব্যাপী ভারত ছাড়ো আন্দোলনের প্রস্তুতি চলছে। অধিকাংশ কংগ্রেস নেতা কারারুদ্ধ। আর কিছুদিন পর গান্ধীজী 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'-র সঙ্কল্প উচ্চারণ করবেন, দেশ উত্তাল হবে। বর্ধমান জেলাও তখন আন্দোলন সত্যাগ্রহ স্বদেশীতে চঞ্চল। বৃটিশ রাজশক্তি সম্ভবতঃ বুঝতে পারছেন যে ঘরে ফেরার সময় হলো। এই অবস্থায় উদয়চাঁদের অভিষেক অনুষ্ঠান যে জাঁকজমক করে হতে পারে না তা বোঝা যায়।

জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ ঃ নতুন যুগের সূচনা ঃ

এরপরের ইতিহাস আর রাজপরিবারের ইতিহাস হতে পারে না। দেশব্যাপী স্বাধীনতার আকাঙ্খার বিস্ফোরণ ঘটেছে। ইংরেজসৃষ্ট রাজা, জমিদার ভুস্বামীরা সযত্নে স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে নিজেদের সরিয়ে রেখেছে। বিজয়চাঁদ ও উদয়চাঁদ স্বাধীনতার আবেগের সঙ্গে খানিকটা যোগাযোগ রেখেছিলেন ঠিকই কিন্তু ততদিনে কংগ্রেসী চিন্তায় জমিদার বিরোধী মনোভাব প্রবল হয়েছে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর এদেশের ভূমিব্যবস্থায় যুগান্তকারী পরিবর্তন সূচিত হয়। জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ করা হয়। ১৯৫৫ সালে উদয়চাঁদ চেষ্টা করেছিলেন এই পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে নিজে মানিয়ে নিতে। ১৯৫২-র প্রথম সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস তাঁকে প্রার্থী করে কিন্তু তিনি পরাজিত হন কমুনিষ্ট প্রার্থী বিনয় চৌধুরীর

কাছে। এক অর্থে ফলাফল পরিবর্তিত সময়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। বিনয় চৌধুরী প্রত্যক্ষ স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন, উদয়চাঁদ ছিলেন ১৬৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত বর্ধমান জমিদার বংশের শেষ উত্তরাধিকারী। এভাবেই প্রায় তিনশ বছরের একছত্র জমিদারীর অবসান হয়। বর্ধমান নতুন যুগে প্রবেশ করে।

বর্ধমান রাজ পরিবার ঃ ইতিহাস পদচিহ্ন ধরে

১১৯৯ খৃষ্টাব্দে পাঠান সেনাপতি বখতিয়ার খিলজি (মেহম্মদ ঘোরীর সেনাপতি) নবদ্বীপ জয় করেন এবং তাঁর অনুচরেরা বর্ধমান জেলার কাঁকসা, চুরুলিয়া প্রভৃতি অঞ্চল জয় করেন। তখন বাংলার রাজা লক্ষণ সেন। ১২০৬ সালে লক্ষণ সেনের মৃত্যু। ১৩৩৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশ পাঠান অধিকারে। ১৩৩৮ সালে মহম্মদ তুঘলক নিজেকে স্বাধীন নবাব বলে ঘোষণা করেন এবং ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে আকবরের বঙ্গবিজয় পর্যন্ত এ প্রদেশে পাঠান প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। ভারতবর্ষে মোগল আধিপত্যের সূচনা ১৫২৬-এ প্রথম পানিপথের যুদ্ধের পর থেকে। এর পঞ্চাশ বছর পর আকবরের সেনাপতি ও রাজমন্ত্রী রাজা টোডরমল পাঠান শাসক দাউদ খাঁকে যুদ্ধে পরাজিত করেন এবং বর্ধমান সহ বাংলা দেশের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল মোগল শাসনাধীন হয়। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে এ অঞ্চলে মোগল শাসন নিষ্কন্টক ছিল না। বাবোভুঁইয়ার কাহিনী সর্বজন বিদিত। ১৫৭৪ থেকে ১৬৫৭ প্রায় আশী বছর বাংলাদেশের সঙ্গে বর্ধমানও অস্থির রাজনীতির আবর্তের মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত করেছে। মুর্শিদাবাদের নবাব মুর্শিকুলি, আলীবর্দ্দী বা সিরাজউদৌল্লার শাসন বর্ধমান মেনে নিয়েছে এমন অকাট্য প্রমাণ মেলে না। এই ৮০ বছর বর্ধমান শাসিত হয়েছে দিল্লী নিযুক্ত ফৌজদারদের মাধ্যমে যাঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন পাঠান। মনে হয় ১৫৯০ সালের মধ্যেই বর্ধমানে মোগল শাসন পাকাপোক্তভাবে কায়েম হয়েছে। 'আইন-ই-আকবরী' (১৫৯০) তে বর্ধমানের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে 'মহাল' অথবা 'পরগণা' এবং সরকার শরিফাবাদ হিসাবে এবং রাজস্ব নির্ধারিত হচ্ছে ১,৮৭৬,১৪২ দাম (আকবরশাহী মুদ্রা)।

৬১১৪ খৃষ্টাব্দে বর্ধমান ইতিহাসের সেই করুণ বিয়োগান্ত নাটকের ঘটনাস্থল। শের আফগান নিহত হলেন এবং মেহেরউন্নিসা নূরজাহান হয়ে দিল্লীর সিংহাসন আলো করতে গেলেন। ১৬২৫-এ জাহাঙ্গীর পুত্র খুরম পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং উড়িষ্যা দখল করার পর বর্ধমান দূর্গ দখল করেন। ততদিনে লাহোরের কোটলী মহল্লার ক্ষেত্রী রাজপুত সঙ্গম রাই দীর্ঘ তীর্থযাত্রা সমাপনান্তে শহরের অনতিদূরে বল্লুকা নদীতীরে বৈকুণ্ঠপুরে এসে বসবাস শুরু করেছেন (১৬১০)। এবং ব্যবসাবাণিজ্য ও তেজারতি কারবারে স্থিত হয়েছেন। এর পর সঙ্গমের উত্তরপুরুষেরা কিভাবে 'বণিকের মানদন্ড' ছেড়ে 'রাজদন্ডের' অধিকারী হলেন সে ইতিহাস আগেই বর্ণিত হয়েছে। এ ইতিহাস হয়ত চমকপ্রদ নয় কিন্তু একজন অধ্যবসায়ী ধনী পরিবারের রাজা হয়ে ওঠার কাহিনী প্রায় ৩০০ বছর ব্যাপী বর্ধমান ইতিহাসে সম্পৃক্ত হয়ে ওঠার কাহিনী হিসাবেও তা জানতে ইতিহাসের ছাত্রদের ঔৎসুক্য স্বাভাবিক।

বর্ধমান রাজপরিবারের কাহিনীকে অকিঞ্চিৎকর বলে নসাৎ করে দেবার একটা ঝোঁক আছে অনেকের মধ্যে। কিন্তু ইতিহাস ব্যক্তিগত পছন্দের মূল্য দেয় না। বাংলাদেশের তথা পূর্বভারতের ভূমি ব্যবস্থায় এই পরিবারের বিশেষ অবদান আছে। ১৭৯৩-এ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সৃষ্টির মাধ্যমে ইংরেজ এদেশের জমিতে মধ্যস্বত্বভোগী এক নুতন শ্রেণীর উদ্ভবে সাহায্য করে। পত্তনি প্রথার মাধ্যমে এই ভূমিব্যবস্থাকে স্থায়ীত্ব প্রদানের কৃতিত্ব বর্ধমান রাজপরিবারের। ১৭৯৩-এ ১নং রেগুলেশন অনুযায়ী জমিদাররা বার্ষিক এক নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ খাজনা আদায় দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারতেন। সমগ্র বংলাদেশে এই রকম জমিদারের সংখ্যা ছিল মুষ্টিমেয়। এর অগে সূর্যাস্ত আইন, দশশালা বন্দোবস্ত নানারকম পরীক্ষানিরীক্ষা হয়েছে, জমিতে মালিকানাস্বত্ত্ব সৃষ্টি হয়েছে যা আগে ছিল না। ইংরেজ তার নিজের দেশের ভূমিব্যবস্থা এদেশে প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু পুরোপুরি সফল হয় নি। বর্ধমানের রাজপরিবার পত্তনি প্রথা সৃষ্টির মাধ্যমে ভূমিব্যবস্থায় অনেকগুলি 'থাক' বা পর্য্যায় সৃষ্টি করলেন। পত্তনিদার-দরপত্তনিদার-সে-পত্তনিদার - এই ক্রমে অসংখ্য মধ্যস্বত্ত্বভোগী ভূস্বামীর সৃষ্টি হল। চৈত্র কিস্তির সময় অনেক পত্তনিদার খাজনা দিতে না পারায় মধ্যস্বত্ত্ব হারিয়ে ফেলতেন। মুলতঃ এদের 'কর্জ' দেবার জন্য বর্ধমানে মাড়োয়ারীরা আসেন। বর্ধমান শহরের ভুতোরিয়া পরিবার সর্বপ্রথম এখানে আসেন। এরা টাকা ধার দিয়ে বহু পত্তনিদারকে রক্ষা করেন কিন্তু নিজেরা সরাসরি জমিতে যান না। এভাবে অসংখ্য 'জমিদার' বা 'তালুকদারের' সৃষ্টি হয়। বর্ধমানে অধিকাংশ জমিদার পত্তনিদার, এরা - রাজকোষে খাজনা আদায় দিতেন। ১৮১৯ সালে পত্তনি প্রথা আইনের স্বীকৃতি পায় এবং সমগ্র বাংলাদেশে এই প্রথার প্রচলন হয় - বৃহৎ জমিদার বংশগুলি রক্ষা পায় এবং দেশজুড়ে অসংখ্য ছোটবড় 'জমিদার' সৃষ্টি হয়।

বর্ধমানের জমিদারের রাজা বা মহারাজা উপাধিপ্রাপ্তির ইতিসাহ পূর্বেই বিবৃত হয়েছে। বাংলাদেশের সবকটি রাজবংশের ইতিহাস (লক্ষণ সেনের পর থেকে) এই। বর্ধমান রাজবংশেরও আরও কিছু বিশিষ্টতার কথা বলা প্রয়োজন। এরা আদিতে ছিলেন বহিরাগত। পাঞ্জাবী রাজপুত ক্ষেত্রী। দত্তকপুত্ররাও তাই। ধর্ম বিশ্বাসে এরা ছিলেন বৈষ্ণব ভাবাপন্ন যদিও বাংলাদেশে প্রচলিত বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে তার কোন মিল ছিল না। লক্ষীনারায়ণ জীউ এদের কূলদেবতা। বংশদেবতা চণ্ডিকা লক্ষীনারায়ণ অর্থাৎ বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন। কিন্তু নিজেদের ধর্ম বিশ্বাস প্রজাদের উপর কখনও চাপিয়ে দেন নি। সকল ধর্মকে সমান উৎসাহ দিয়েছেন। স্থানীয় ধর্মীর মনোভাব ও সংস্কৃতি চেতনার সঙ্গে কখনও বিরোধে যান নি এঁরা। পত্তনিপ্রথার সৃষ্টি করে সরাসরি খাজনা আদায়ের দায়িত্ব নিজেদের হাতে রাখেন নি। ফলে প্রজাপীড়নের অংশীদার হতে হয়নি। কেন্দ্রীয় শক্তির সঙ্গে বিরোধ এড়িয়ে চলেছেন বরাবর। দুর্ভিক্ষ, রাষ্ট্রবিপ্লব মহামারীর সময় প্রজাদের সহায়তা করেছেন। শিক্ষাসংস্কৃতির প্রসারে অকুণ্ঠ সহযোগিতা করেছেন। জলাশয় নির্মাণ, রাস্তাঘাট সংস্কার ও নির্মাণ এবং মন্দির মসজিদ নির্মাণে সহায়তা করেছেন। আর একটা কথা – বর্ধমানে এরা নিজেদের 'বংশ' সৃষ্টি করতে উৎসাহ দেখান নি। পত্তনিদারদের মধ্য

রাজবংশের কেউ ছিলেন না। আসলে এরা নির্বিবাদে থাকতে চেয়েছেন বরাবর। জমিদার প্রথার উচ্ছেদের পর তাই এরা নীরবেই লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যেতে পেরেছেন। বর্ধমানে 'ফিউডাল' বা 'সামন্ততান্ত্রিক' বংশের অবশেষ যে তেমনভাবে নেই তার কারণ এই। যদিও এরা আসলে সামন্তই ছিলেন। এ জেলার সামন্তপ্রথার অবশেষ খুঁজতে হবে পত্তনিদারদের মধ্যে।

আর একটা কথা। বর্ধমান যে ব্যাপকভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ গ্রহন করেনি - তার অন্যতম কারণ সম্ভবতঃ এই যে বর্ধমান রাজপরিবার সকল দিক বজায় রেখে যতদূর সম্ভব প্রজানুরঞ্জন করে চলেছিলেন। স্থানীয় শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ থেকে তাই বৃহত্তর স্বাধীনতার আবেগ সৃষ্টি হয়নি এখানে।

উল্লেখ ঃ

১। History of the Freedom Movement in India, Vol. I; R.C. Mazumdar.

২। বর্ধমান রাজ কলেজ শতবর্ষ স্মরণিজ। ১৮৮১ - ১৯৮১

৩। Freedom Movement in Burdwan : Burdwan District Congress Centenary Celebration Committee (1985)

৪। বর্ধমান রাজ ঃ আব্দুল গণি (ফার্মা কে, এল, এম)

৫। রাজাধিরাজ ঃ ভোলানাথ মোহান্ত।

৬। Indian History : Kaley

৭। সাক্ষাৎকার ঃ ডঃ প্রণয়চাঁদ মহতাব (বর্তমান মহারাজকুমার)

সংযোজন ঃ ১

রাজবংশতালিকা ঃ (১৬১০-এ সঙ্গম রাই বর্ধমানে আসেন। আবু রাই 'চৌধুরী' খেতাব পান ১৬৫৭ সালে। ১৯৫৫-তে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ।)

(ক) সঙ্গম রাই (বৈকুণ্ঠপুরে আসেন) → বঙ্কুবিহারী রাই → আবু রাই (চৌধুরী হন) → বাবু রাই → ঘনশ্যাম রাই → কৃষ্ণরাম রাই → জগৎরাম রাই
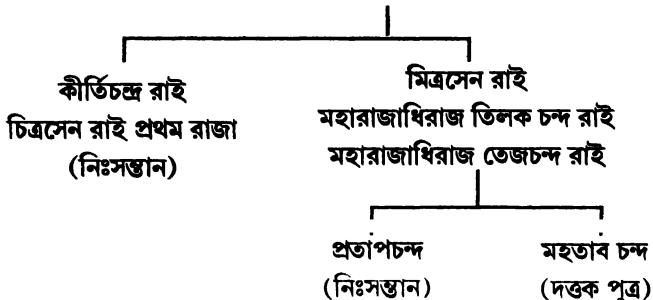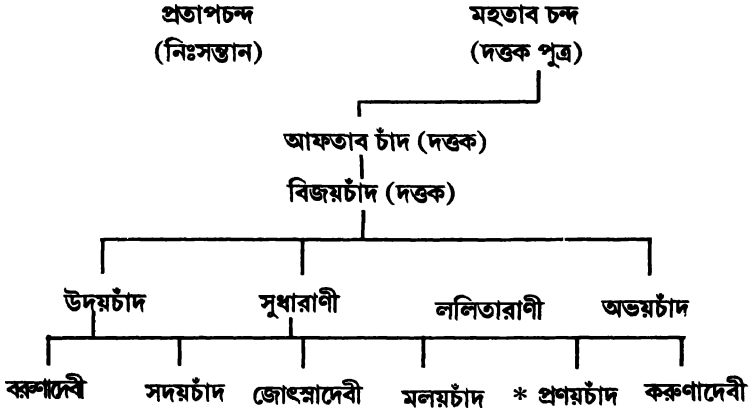
(খ) জেলা বর্ধমান ঃ ভাঙাগড়ার ইতিহাস

১৭৬০ - 'চাকলা বর্ধমান' কোম্পানীর হাতে তুলে দেন নবাব মীর কাসিম। চাকলা বর্ধমানে তখন বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর পরগণা, হুগলী ও বীরভূম যুক্ত ছিল।

১৮০৫- আসানসোলের কিছু অংশ, পরগণা সেন পাহাড়ি ও সেরগড় এবং পরগণা বিষ্ণুপুর বর্ধমান থেকে পৃথক হয় এবং 'জঙ্গল মহল' নামে নুতন জেলা সৃষ্টি হয়। ১৮৩৩ সালে আবার এই অঞ্চল বর্ধমানের সঙ্গে যুক্ত হয়।

১৮২০ - তে, হুগলী এবং ১৮৩৫-৩৬ এ বাঁকুড়া জেলা গঠিত হয়। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বাঁকুড়ার কিছু অংশ বর্ধমানে ফিরে আসে এবং জাহানাবাদ (বর্ত্তমান আরামবাগ) হুগলীর সঙ্গে যুক্ত হয়। এর পর থেকে জেলার সীমানা প্রায় অপরিবর্তিত রয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে মেজর রেনেল এর জরিপ অনুসারে জেলার আয়তন ছিল ৫,১৭৪ বর্গমাইল এবং গ্রামের সংখ্যা ৮ হাজার।

(গ) বর্ধমান জমিদারীর আয়তন ছিল আনুমানিক ৪,১০০ বর্গমাইল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর (১৭৯৩) জমিদারীর বার্ষিক আয় ছিল ৮০ লক্ষ টাকা (আনুমানিক) এবং খাজনা ৪৫ লক্ষ টাকা (মতান্তরে ৪০ লক্ষ টাকা - ২ লক্ষ পুলবন্দী)। জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ হওয়ার সময় পর্যন্ত খাজনার পরিমাণ আর বাড়েনি।
বাবুরাইয়ের সময় বর্ধমান পরগণায় বার্ষিক রাজস্ব ছিল - ১,০০,২৬২ টাকা (সিক্কা)

বর্ধমান জেলায় স্বাধীনতা আন্দোলন

রমাকান্ত চক্রবর্তী

বর্ধমান জেলায় স্বাধীনতা আন্দোলন অবশ্যই পূর্ণাঙ্গ গবেষণার বিষয়। এ সম্বন্ধে বহু তথ্য আছে। এই জেলার সংখ্যাতীত দেশব্রতী বার বার স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন , এবং তার জন্য নিগ্রহ, দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছেন। এই সমীক্ষায় সমস্ত জ্ঞাত তথ্য দেওয়া যাবেনা; এ জেলার সকল স্বাধীনতা -সংগ্রামীর নামধাম পরিচয় উল্লেখ করা যাবেনা । তাঁদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জানিয়ে, বর্ধমান জেলায় স্বাধীনতা আন্দোলন-বিষয়ক এই সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা রচনা করি।

ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রাম যে কখন শুরু হয়েছিল, তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ আছে। স্বাধীনতা - সংগ্রামের প্রকৃত অর্থ এবং তাৎপর্য সম্বন্ধেও বিবিধ মত রয়েছে। এখানে এ সব বিষয় আলোচনা করার সুযোগ নেই। কিন্তু এ তথ্য এখানে অবশ্যই উল্লেখ্য যে, বর্ধমানের রাজা তিলকচাঁদ বর্ধমানে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধিকার মেনে নিতে অস্বীকার করেছিলেন। তার ফলে বর্ধমান শহরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত দামোদর নদের তীরে ১৭৬০ - এ ২৯ ডিসেম্বর যে যুদ্ধ হয়েছিল, তাতে ইংরেজ বাহিনীর আক্রমণে বর্ধমানের পাঁচশত সেনা নিহত হয়েছিলেন, আহত হয়েছিলেন এক হাজার স্থানীয় যোদ্ধা। ইংরেজ-বাহিনীর মাত্র এগারজন সৈন্য নিহত হয়। পলাশীর যুদ্ধের পরে এটাই ছিল তৎকালীন বাংলার ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ঐতিহাসিক মেক্‌লেইন্ লিখেছেন যে, যদি বর্ধমানের রাজা, বীরভূমের রাজা, বিষ্ণুপুরের রাজা, মারাঠাগণ এবং মুঘল সম্রাট ঐক্যবদ্ধভাবে বাংলায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চেষ্টা করতেন, তবে বাংলার নবাবের (মীরজাফর খান-এর) এবং ইংরেজদের সেখানে টিকে থাকাই সম্ভব হত না। [John R. McLane, Land And Local Kingship in Eighteenth Century Bengal, Cambridge, 1993, p.181] অথচ রাজা তিলকচাঁদের সংগ্রামকে স্বাধীনতা -সংগ্রাম বলা যাবে কি ? তিনি তো প্রধানত নিজের স্বার্থরক্ষার জন্যই যুদ্ধ করেছিলেন। এই যুদ্ধে সমগ্র দেশের স্বার্থ কখনই পরিস্ফুট হয়নি। আধুনিক অর্থে দেশপ্রেম , দেশাভিমান তখন স্পষ্ট ছিল না।

এই ভীষণ ঘটনার পর থেকে জমিদারী -ব্যবস্থা তুলে দেওয়া পর্যন্ত, অর্থাৎ প্রায় দুইশত বৎসর পর্যন্ত বিস্তীর্ণকালে বর্ধমানের রাজা-মহারাজারা আর কখনও ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হননি। ইংরেজরা, এবং তাদের দেশী দালালরা ১৭৬৭ থেকে ১৭৭৪ পর্যন্ত বর্ধমানের রাজার কাছ থেকে দফায় দফায় সতের লক্ষ কুড়ি হাজার চারশত তেষট্টি টাকা, এগারো আনা, নয় পাই আদায় করে। তাঁদের মধ্যে বন্য-প্রেমিকরূপে বর্ণিত ধুরন্ধর ওয়ারেন হেস্টিংস পেয়েছিলেন পনের হাজার টাকা, জর্জ ভ্যান্সিটার্ট পেয়েছিলেন পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা, এবং কালীপ্রসাদ বসু পেয়েছিলেন লক্ষাধিক টাকা। এই নির্মম শোষণের ফলে বর্ধমানের রাজার অবস্থা কাহিল হয়ে পড়ে।

ইংরেজরা বর্ধমানকে কামধেনু ভাবত। এমন সোনার দেশ ভারতে তখন আর একটিও ছিল না, লিখেছেন ওয়ালটার হ্যামিলটন [Description of Hindostan, I, Delhi reprint, 1970, p.29] । ১৮১৪ তে বর্ধমান থেকে সংগ্রহ করা রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৪৩২৫৪৬৬৩ টাকা। কৃষির উৎপাদনে বর্ধমান সমগ্র ভারতে শীর্ষস্থানে ছিল; তার নীচে ছিল তাঞ্জোর। অথচ, ১৭৯৩-তে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত হওয়ার পরে বর্ধমানের রায়তদের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যায়। তার আগে, ১৭৯০-তে , একটি সমকালীন হিসাব অনুসারে, দরিদ্র রায়তদের ভাতে মারার জন্য বর্ধমানের রাজা-জমিদাররা তাঁদের বিরুদ্ধে ত্রিশ হাজার দেওয়ানী মামলা করেছিলেন।

অথচ, ক্রমবর্ধমান জমিদারী উৎপীড়ন ও শোষণের বিরুদ্ধে বর্ধমান জেলায় কৃষক বিদ্রোহ হয়নি। এই উৎপীড়নের ও শোষণের মর্মন্তুদ বিবরণ আছে বর্ধমান জেলার সুসন্তান রেভারেন্ড লালবিহারী দে বিরচিত Bengal Peasant Life নামক বিখ্যাত গ্রন্থে। উৎপীড়িত বর্ধমানের কৃষক কেন শান্ত হয়ে থাকলেন ? কেন তাঁরা বিদ্রোহ করলেন না ? এ প্রশ্নের একটা আনুমানিক উত্তর দেওয়া যায়। H.H.Risley - রচিত The Tribes And Castes of Bengal নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের দুই খণ্ডে বর্ধমান জেলার জনগণনার ও জনবিন্যাসের যে বিবরণ আছে প্রসঙ্গক্রমানুসারে, তাতে একটি সুশৃঙ্খলাবদ্ধ , শান্তিময়, ঐতিহ্যসম্মত গ্রামীণ সমাজের ও কৃষ্টির রূপরেখা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এখানে কেউ কারও বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে না, কেউ কিছু ভেঙে দিতে চায় না, কেউ কোন পরিবর্তন চায় না। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য , কায়স্থ, আগুরী, সদ্‌গোপ প্রভৃতি জাতিভুক্ত নানা শ্রেণীর জমিদার-পাটনিদার-জোতদারদের ভূমির উপরে যে নিয়ন্ত্রণ ছিল, এবং যে নিয়ন্ত্রণের উপরে সামাজিক - অর্থনৈতিক সম্পর্ক দাঁড়িয়েছিল, রক্ষণশীলতাই ছিল তার প্রাণবস্তু। ১৮৫৫ -এর সাঁওতাল-বিদ্রোহের প্রভাব বর্ধমানে পড়ল না, কারণ ১৮৭১ এবং ১৮৮১-তে কৃত জনগণনা অনুসারে এই জেলায় 'বাসিন্দা' সাঁওতালদের সংখ্যা ছিল নগণ্য। যেহেতু বর্ধমানে তেমন কিছু নীলচাষও হত না, তাই ১৮৫৯-এর নীল বিদ্রোহের প্রভাবও সেখানে দেখা গেল না। ১৮৫৭ থেকে ১৮৭১-এর মধ্যে সাংঘাতিক 'বর্ধমান জ্বর' (এক ধরনের ম্যালেরিয়া) এ জেলার প্রায় কুড়ি লক্ষ নরনারী শিশুকে উৎসাদিত করে। বহু গ্রাম জনহীন হয়ে যায়। এইরূপ অবস্থায় কে আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কিংবা সংগ্রাম করতে পারত ?

প্রসঙ্গত আরও কতকগুলো তথ্য উল্লেখ্য এবং বিচার্য। বর্ধমান জেলা ছিল প্রধানত 'গ্রাম-বাংলা'। ভারতচন্দ্র-বর্ণিত বর্ধমান নগর, তাঁর কবিত্বময় বর্ণনায় বড় মনে হলেও, ঢাকার এবং মুর্শিদাবাদের সঙ্গে তুলনায় তেমন কিছু বড় শহর ছিল না। কিছু দূরে দানবাকৃতি সম্পন্ন কলকাতার আবির্ভাবে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য মধ্যযুগীয় শহরের মতো বর্ধমান শহরও নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। অনুপার্জিত আয়ের বেশ কিছু অংশ ব্যয় করে রাজারা, শহরটিতে বড় বড় দীঘি কেটে, সুন্দর সুন্দর বাগান করে, মন্দির বানিয়ে, এবং প্রাসাদের বিস্তার ঘটিয়ে সাজিয়েছেন। কিন্তু তার পরেও বর্ধমান প্রকৃত অর্থে বড় শহর ছিল না। ভোলানাথ চন্দ্রের

উপভোগ্য বিবরণে দেখি,[Bholanath Chunder, Travels of a Hindoo, Vol.I, London, 1869,pp.161-201], ১৮৬০-এ মানকর ছিল গুরুত্বহীন; পানাগড় ছিল অনুন্নত; রাণীগঞ্জ, কয়লার খনি থাকলেও, ছিল 'শিশু -শহর', বরাকর ছিল গ্রাম। ১৮৭২ -এর আগে থেকেই বর্ধমান শহরের জনসংখ্যা কমে যেতে থাকে। বর্ধমান, কাটোয়া, কালনা - এই তিনটি শহর এবং বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল মধ্যকালীন। তাদের বিশেষ কোনও 'আধুনিক' রূপ অথবা গঠন ছিল না। যে 'আধুনিক' নগরায়ন ছিল ব্রিটিশ -শাসন বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের একটি বিশিষ্ট ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত, তা বর্ধমান জেলায় ধীরে ধীরে বিকশিত হয়েছে।

বর্ধমান জেলা থেকে বিপুল পরিমাণে রাজস্ব সংগ্রহ করলেও ইংরেজ সরকার সে জেলায় শিক্ষার প্রসারের জন্য অর্থব্যয় করেনি। বর্ধমানে কাপ্তান চার্লস স্টুয়ার্ট ও রাজা তেজশ্চন্দ্র বাহাদুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায় শিক্ষার প্রসারের জন্য যে চেষ্টা করেন, তা অবশ্যই স্মরণীয়। কিন্তু, ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে এত বড় জেলায় ছিল মাত্র সাতাশটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, এবং বর্ধমান শহরে একটি মাত্র দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ। সে কলেজেও বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। বর্ধমান জেলায় তখন মাত্র দশ শতাংশ ব্যক্তি সাক্ষর ছিলেন।) (দ্রষ্টব্য ঃ নগেন্দ্রনাথ বসু, বর্ধমানের ইতিহাস, প্রাচীন ও আধুনিক।) (বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষে ১৯১৪-তে প্রকাশিত, পৃ. ১৩) সমগ্র উনিশ শতকে কেবলমাত্র রামায়ণ ও মহাভারত ছাড়া বর্ধমান শহর থেকে একটিও গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়নি। বর্ধমানের রাজসভায় সাহিত্যিক কৃষ্টি মূলত ছিল প্রাগাধুনিক। বর্ধমানের মুসলমান সাহিত্যিকদের অবদান ছিল কলকাতার বটতলায় ছাপা মাত্র চারটি বই। (দ্রষ্টব্য ঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকি, 'মুসলমান ও বাঙ্গলা সাহিত্য', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৯১৬, ১, পৃ. ৯৫ - ১২১ ; আবদুস সামাদ, 'বর্ধমান রাজসভাশ্রিত বাংলা সাহিত্য', কলিকাতা, ১৯৯১)।

এই অবস্থায় বর্ধমানের রাজনৈতিক কৃষ্টি যে কিরূপ হতে পারে, তা সহজেই অনুমান করা যায়। ১৮৫৭-তে স্বাধীনতা -সংগ্রামে ভারতীয়গণ পরাজিত হলেন। তখন বর্ধমানের মহারাজা , এবং তাঁর সঙ্গে আড়াই হাজার শিক্ষিত বাঙালি বড়লাট ক্যানিং-কে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখালেন। (দ্রষ্টব্য ঃRamakanta Chakrabarty, ed, The Mutinies and the People, Calcutta,reprint, 1969,pp.115 - 117) ১৮৫৭ -তে লন্ডনের Times পত্রিকায় এ তথ্য প্রকাশিত হয়েছিল যে, বর্ধমানের মহারাজা বিদ্রোহ দমনের জন্য ইংরেজ সরকারকে পাঁচ লক্ষ পাউণ্ড অর্থ দান করেন। সরকারের তরফ থেকে তাঁকে সপ্রশংস ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। (পূর্বোক্ত গ্রন্থ)

১৮৬৫-তে বর্ধমান শহরে মিউনিসিপ্যালিটি প্রতিষ্ঠিত হবার পরে সেখানে এই সংগঠনকে কেন্দ্র করে আধুনিক অর্থে রাজনীতির সূত্রপাত হয়। (দ্রষ্টব্য, 'বর্ধমান পৌর শতবার্ষিকী স্মরণিকা', বর্ধমান, ১৯৬৫; এখানে প্রকাশিত তারককুমার মিত্র-রচিত 'বর্ধমান পৌরসভার

ইতিবৃত্ত' দ্রষ্টব্য) প্রথমে ছয়জন সাহেব, এবং নয়জন সরকার মনোনীত ভারতীয় এই নাগরিক সংগঠন পরিচালনা করেছেন। ১৮৬৫ থেকে ১৮৮৪ পর্যন্ত কেবলমাত্র মনোনীত সাহেবই বর্ধমান মিউনিসিপ্যালিটির সভাপতি হতে পারতেন। এরই মধ্যে ১৮৭৩-এ এই সংগঠনে নির্বাচিত সদস্যদের প্রেরণ করার অধিকার স্বীকৃত হয়। ১৮৮৪-তে রায় বাহাদুর নলিনাক্ষ বসু বর্ধমান মিউনিসিপ্যালিটির প্রথম নির্বাচিত সভাপতিরূপে কার্যভার গ্রহণ করেছিলেন। এরূপ নির্বাচনের ফলে বর্ধমানশহরে নাগরিক প্রশাসনের ক্ষেত্রে সাহেবসুবার আধিপত্য আর থাকল না। কিন্তু পৌর নির্বাচনে প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোট দানের অধিকার তখনও স্বীকৃত হয়নি। নলিনাক্ষ বসুর প্রশাসনকালে লাকুড্ডিতে বিশাল পৌর-জলাধার নির্মিত হয়। তিনি বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।

সভা-সমিতি গঠনের মাধ্যমে উদারপন্থী রাজনীতির যে ধারা উনিশ শতকের ত্রিশের দশক থেকেই প্রচলিত ছিল, বহুকাল পর্যন্ত বর্ধমানে তার প্রভাব দেখা যায়নি। ১৮৭৬ -এ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর বন্ধুগণ Indian Association প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই বিখ্যাত সংগঠনের প্রভাবে বর্ধমান জেলায় জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সূত্রপাত হয়েছিল। বর্ধমান শহরে, কালনা শহরে এবং পূর্বস্থলীতে এই প্রতিষ্ঠানের শাখা স্থাপিত হয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে সংযোগ রেখেছিলেন নলিনাক্ষ বসু, জগবন্ধু মিত্র এবং মৌলবী মুহম্মদ ইয়াসিন। এ তথ্য এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, মৌলবী মুহম্মদ ইয়াসিন এবং আবুল কাশেম তখন বর্ধমান শহরে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে কখনই আলিগড়ের 'বিচ্ছিন্নতার' তত্ত্ব প্রচার করেননি। বাঙালি-মুসলমান তাত্ত্বিক আমীর আলির ইসলামের পুনরুত্থান বিষয়ক তত্ত্বের দ্বারাও তাঁরা প্রভাবিত হননি। উদারপন্থী জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সঙ্গেই তাঁরা সংযোগ রেখেছেন। অথচ, বর্ধমানে ১৮৮৫ -তে প্রতিষ্ঠিত ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। কংগ্রেসের সংগঠন এবং জন-সংযোগ -ব্যবস্থা তখন দুর্বল ছিল। ১৮৯৯-তে, এবং ১৯০৪ -এ বর্ধমান শহরে Indian National Conference -এর অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সকল ঘটনার পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায়নি।

বর্ধমানে জাতীয়তাবাদী এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী রাজনৈতিক সংস্কৃতির যে একটি সুপ্রশস্ত , অথচ দুর্লক্ষ্য ভিত্তি ছিল, তা হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো ১৯০৫ - এ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে বিস্ময়কর হয়ে উঠল। বর্ধমানের মহারাজা বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করলেও বর্ধমান জেলায় বিভিন্নস্থানে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা হয়। গ্রামে গ্রামে সংগঠিতভাবে বঙ্গ ভঙ্গ অগ্রাহ্য করা হয়। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী-আন্দোলন কালনা শহরে সুতীব্র হয়ে ওঠে ; তাতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন উপেন্দ্রনাথ হাজরা, দেবেন্দ্রনাথ সেন এববং উপেন্দ্রনাথ সেন। আবুল কাশেম তাতে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি মেমারীতে স্বদেশী-আন্দোলনের প্রধান সংগঠক ছিলেন। বিলাতি কাপড় পোড়াবার অভিযোগে পুলিশ বাঘনাপাড়ার পাঁচটি ছেলেকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। বর্ধমান জেলায় এটাই ছিল প্রথম 'রাজনৈতিক অপরাধ'। বৈষ্ণব এবং সাংবাদিক শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'পল্লীবাসী'- পত্রিকায় এই পাঁচ কিশোরের

বীরত্বের প্রশংসা করলেন। মানকরের বাজারেও বিলাতি কাপড় পুড়িয়েছিলেন রাজকৃষ্ণ দীক্ষিত ; তাঁকেও শাস্তি পেতে হয়। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল কাটোয়াতে, শিঙ্গারকোণে, বৈদ্যপুরে, অকালপোষে, দেয়ারাতে, ধাত্রীগ্রামে, অনুখালে। গ্রামে গ্রামে জাতীয়তাবাদ ছড়িয়ে গেল, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চেতনার সম্প্রসারণ হল। কালনা শহরে প্রতিষ্ঠিত হল স্বদেশী ভাণ্ডার। স্বদেশী ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হল অনুখালে, ঢোলারহাটে, রাইগ্রামে, কৈ-গ্রামে এবং বাঘনাপাড়াতে। সে সময় থেকেই বর্ধমান জেলায় স্বাধীনতা - আন্দোলনে কালনা মহকুমায় বিশিষ্ট স্থান। (দ্রষ্টব্য ঃ Ramakanta Chakrabarty , 'Freedom Movement in Burdwan, 1800 - 1939, A Survey' in Bhaskar Chattopadhyay and Ramakanta Chakrabarty, Freedom Movement in Burdwan , Burdwan District Congress Centenary Celebration Committee, 1985, pp.12-14]

বর্ধমান জেলায় বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন ছিল স্বতঃস্ফূর্ত এবং ক্রমশ সুসংগঠিত। সেখানে বিলাতি-বর্জন অথবা 'বয়কট' — আন্দোলনের ফলে বিলাতি কাপড়ের ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এই কাপড়ের মূল্য হ্রাস হল। বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে এটাই দেখা গেল যে, বঙ্গের অন্যান্য জেলার অধিবাসীদের মতো বর্ধমান জেলার অধিবাসীগণ রাজনীতি এবং অর্থনীতি সম্বন্ধে সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্ত সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। এই আন্দোলনে বর্ধমান জেলার কয়েকজন বুদ্ধিজীবির তথা দেশপ্রেমিকের ভূমিকা ছিল বিশিষ্ট। তাঁরা হলেন প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়, অরবিন্দপ্রকাশ ঘোষ, মানবেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অবিনাশ চক্রবর্তী, রাখালচন্দ্র দেব, বলাই দেবশর্মা এবং স্বামী কমলানন্দ। বর্ধমান জেলায় তাঁরাই বিখ্যাত Dawn Society - র দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে জাতীয় শিক্ষার প্রসারের জন্য পরিশ্রম করেছিলেন। বর্ধমানে তাঁরাই ছিলেন 'নূতন যৌবনের দূত'। প্রসঙ্গত অকালপোষ গ্রামের অরবিন্দপ্রকাশ সরকারি স্কুলের শিক্ষকতা ছেড়ে নামমাত্র বেতনে জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক হলেন। শেষ পর্যন্ত সর্বজন পরিত্যক্ত কুষ্ঠরোগীদের সেবায় নিযুক্ত হয়ে তিনি নিজেই কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হয়েছিলেন। অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় দুঃস্থ ব্যক্তির কন্যার বিবাহের জন্য তিনি দ্বারে দ্বারে অর্থভিক্ষা করেছেন। তাঁর দেশপ্রীতির ও মানব সেবার নিদর্শন অদ্যাবধি অনন্য। কালনার কর্মীবৃন্দ সেখানে একটি জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। উপলতি গ্রামেও জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। স্থানীয় কুটীরশিল্পের উন্নয়নের জন্য কর্মপন্থা উদ্ভাবিত হয়েছিল।

বর্ধমানেও চরমপন্থা ও বিপ্লববাদ স্পষ্ট হয়ে উঠল। নিস্তরঙ্গ বর্ধমানের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে এটা ছিল এক বিরাট তরঙ্গ। বর্ধমান ছিল যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, রাসবিহারী বসু, পুলিনবিহারী দাস মানবেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ খ্যাতনামা বিপ্লবীদের মাতৃভূমি। ১৯০৬-তে বরিশালে ও বর্ধমানে ভয়াবহ বন্যা হয়। সে সময়ে 'বর্ধমান সম্মিলনী'-র মাধ্যমে বর্ধমানে ব্যাপকভাবে ত্রাণকার্য পরিচালিত হয়। সম্ভবত এই অস্থির কালে বিপ্লবীগণ বর্ধমানে এসে তরুণদের মধ্যে বিপ্লববাদ প্রচার করেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে রায়বাহাদুর নলিনাক্ষ বসুর, অরবিন্দপ্রকাশ ঘোষের এবং শরৎচন্দ্র বসুর সম্পর্ক ছিল।

শরৎচন্দ্র বসু এই জন্য পুলিশের কোপদৃষ্টিতে পড়েন। এমনও দাবি করা হয়েছে যে, অরবিন্দ প্রকাশের সঙ্গে গদর দলের সংযোগ ছিল। কিন্তু আসলে তিনি ছিলেন শিক্ষাব্রতী এবং সমাজসেবক। (দ্রষ্টব্য, 'বর্ধমান পরিচিতি', ১৯৫৪-তে পশ্চিমবঙ্গ-কংগ্রেসের বর্ধমান শহরে অনুষ্ঠিত অধিবেশনকালে প্রকাশিত, পৃ. ৪২.৪৪)

বাঘনাপাড়ায় এবং চণ্ডীপুর গ্রামে যুগান্তর দলের সংগঠন ছিল। বর্ধমানে এই বিখ্যাত দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন 'মহামায়া সমিতি'-র স্রষ্টা পশুপতি গঙ্গোপাধ্যায়, জয়দেব রায়, অজিতশরণ বসু এবং কালীকেশব ঘোষ। ১৯০৬-তে রেলওয়ে ধর্মঘটে বর্ধমান জেলায় রেলওয়ে কর্মচারীগণ যোগ দিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত বর্ধমানের বিপ্লববাদী তরুণ বাসুদেব ভট্টাচার্যের কীর্তি আলোচ্য। তাঁর সম্বন্ধে তথ্য আছে J.C.Ker - রচিত Political Trouble in India:A Confidential Report - গ্রন্থে (Delhi, ed.1973,p.399)। ১৯৮৫ - তে চাকদীঘি গ্রামে বাসুদেব জন্মগ্রহণ করেন। 'বয়কট' - আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য স্কুল থেকে তাঁকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। পরে তিনি ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় সম্পাদিত 'সন্ধ্যা' - পত্রিকার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিলেন এবং রাজদ্রোহের অভিযোগে চারমাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেছিলেন। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি ইংল্যান্ডে চলে যান এবং সেখানে কোনও একসময়ে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ ঐতিহাসিক লি ওয়ার্নারকে মারধর করেন। তাঁকে যে কেন বাসুদেব মারধর করেছিলেন, তা জানা যায় না। ইংল্যান্ড থেকে আমেরিকায় গিয়ে তিনি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছিলেন। বর্ধমানে আরও একজন বিপ্লবী ছিলেন যুগান্তর দলের কর্মী সুরেশচন্দ্র মজুমদার(জন্মকাল ঃ ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দ)। বিখাহাটি ডাকাতি মামলায় অভিযুক্ত হয়ে তিনি পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯১৩ -তে বর্ধমানে বন্যা হয়। সে সময়ে বন্যাত্রাণের কাজে নিযুক্ত থেকে বিখ্যাত বিপ্লবী শহীদ যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বাঘাযতীন — জনাকীর্ণ বর্ধমান স্টেশনে অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি এবং অনুশীলন দলের নেতা মাখনলাল সেনের সঙ্গে বিপ্লবীদের একতা সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করেছেন। (প্রাগুক্ত Political Trouble In India,P.427 প্রাগুক্ত 'বর্ধমান পরিচিতি', পৃ. ৪৫; ফকিরচন্দ্র রায়, 'স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিকায়', প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৭৮, পৃ. ১৩০-৩১, ১৩১-৩২) বর্ধমান জেলায় যুগান্তর দলেরই কিছু প্রভাব ছিল। সিয়ারাসোল গ্রামে বিপিনবিহারী গাঙ্গুলির অনুগামী নিবারণ ঘটক এবং তাঁর আত্মীয়া দুকড়িবালা দেবী যুগান্তর দলের একটি ক্ষুদ্র কেন্দ্র গড়েছিলেন। যুগান্তর দলের শাখা রূপে বর্ধমান শহরে আত্মোন্নতি সমিতি গঠিত হয়।

সম্ভবত ১৯১৩-তে বারাণসীর বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা শচীন্দ্রনাথ সান্যাল বর্ধমানে এসে অনুশীলন সমিতির একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত করেন। তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন এবং মানকরের রাধাকান্ত দীক্ষিত। কিন্তু কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগের অভাবে বর্ধমান জেলায় অনুশীলন দল প্রভাবশালী হয়ে উঠতে পারে নি। বর্ধমানে বিভিন্ন বিপ্লববাদী দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়টি অজ্ঞাত। পূর্বে

উক্ত অজিতশরণ বসু বারীন্দ্রকুমার ঘোষের অনুগামী ছিলেন। সাংবাদিক বলাই দেবশর্মা ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের কাছে সাংবাদিকতা শিখেছিলেন। পরবর্তীকালে বর্ধমান জেলার বিখ্যাত কংগ্রেস নেতা যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা এবং জিতেন্দ্রনাথ মিত্র ঋষি অরবিন্দের আদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। জিতেন্দ্রনাথের সঙ্গে বহু বৎসর ধরে National Council of Education- এর সংযোগ ছিল। ত্রিশের দশকে বিজয়কুমার ভট্টাচার্য বর্ধমানে কংগ্রেসের সংগঠন সম্প্রসারিত করেছিলেন। রাজনৈতিক জীবনের শুরুতে উত্তরবঙ্গের যুগান্তর দলের নেতা যতীন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে এবং যতীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত 'গণমঙ্গল সমিতি'-র সঙ্গে বিজয়কুমারের সংযোগ ছিল বলে অনুশীলন দলের কর্মী শহীদ নলিনী বাগচির বন্ধু ছিলেন তিনি। (এসব তথ্য আছে ফকিরচন্দ্র রায়ের পূর্বোক্ত গ্রন্থে,পৃ.১৩২,১৩৩, কালিপদ বাগচী, 'বিপ্লবী যতীন্দ্রমোহন রায়' (কলিকাতা, ১৯৬৫), পৃ. ৬৫ Arún Chandra Guha, First Spark of Revolution, Orient Longman 1971,pp. 51, 84-85; ফকিরচন্দ্র রায়, পৃ. ১৩৪) জাতীয়তাবাদসহ হিন্দু-পুনরুত্থানের তত্ত্বও বর্ধমানে প্রচার করা হয়। এই প্রচারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কমলানন্দ পরিব্রাজক, ভামিনীরঞ্জন সেন, প্রফুল্লকুমার পাঁজা এবং কয়েকজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী। লক্ষণীয়, কমলানন্দ পরিব্রাজক স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন এবং সাম্প্রদায়িক সংহতির ওপরে জোর দিয়েছিলেন। উল্লিখিত তথ্য সমূহ থেকে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, বর্ধমান জেলার স্বদেশপ্রেমিক সাহসী তরুণদের কোনও বিপ্লববাদী দল সংগঠিত করতে পারেনি, ঠিকভাবে পরিচালিত করতে পারেনি। যথার্থ সংগঠন এবং পরিচালনা থাকলে বর্ধমান জেলা নিঃসন্দেহে বিপ্লববাদী সংগ্রামের কেন্দ্রবিন্দু হত।

এ তথ্য ও উল্লেখ্য যে, বর্ধমান জেলায় মুসলমানগণ প্রথম থেকেই সাম্প্রদায়িকতাকে এড়িয়ে চলেছেন। এখানে মুসলিম লীগের প্রভাব কখনও বেশী ছিল না। মুসলমানদের অবিসংবাদিত নেতা আবুল কাশেম এবং মুহম্মদ ইয়াসিন সাম্প্রদায়িকতাকে সমর্থন করেননি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে বর্ধমানে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী খিলাফৎ আন্দোলন বিশেষভাবে জনপ্রিয় হয়েছিল। কংগ্রেস নেতা মহম্মদ ইয়াসিন ছিলেন খিলাফৎ আন্দোলনেরও নেতা। বর্ধমানের জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের অন্য নেতাগণ ছিলেন আবুল হায়াত্, মোল্লা জাহেদ আলী, আবদুল কাদের এবং কচি মিয়াঁ। তাদের সঙ্গে বিপ্লববাদী বলাই দেবশর্মার বন্ধুত্ব ছিল। (দ্রষ্টব্য, ফকিরচন্দ্র রায়, পৃ. ১০৫,১০৭,২৩০-৩১)

মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাবে ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রচলিত ধারা এবং চরিত্র পরিবর্তিত হয়ে গেল। তাঁর দ্বারা পরিচালিত 'রাওলাট - সত্যাগ্রহ' (এপ্রিল,১৯১৯) ভারতের স্বাধীনতা - আন্দোলনের ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। ১৯২০-তে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে ভারতব্যাপী অহিংস অসহযোগ আন্দোলন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তার কারণ ছিল অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালাবাগে বর্বরোচিত গণহত্যা এবং তুরস্কে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মারাত্মক ভূমিকা। ভারতীয়দের

চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য ১৯১৮-তে যে শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের প্রস্তাব করা হয়, তা ভারতের নেতৃবৃন্দ গ্রাহ্য করেননি। সমগ্র ভারতেই তখন শ্রমিক আন্দোলন দুর্বার হয়ে উঠেছিল।

কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে বর্ধমান জেলার প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেছিলেন যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা এবং অমরনাথ দত্ত। বর্ধমান জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন মহম্মদ ইয়াসিন, সম্পাদক ছিলেন যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা। বর্ধমানের মহারাজা এবং জমিদার শ্রেণী অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন। এই আন্দোলনে তাঁদের কায়েমী স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা ছিল। ১৯১৩ থেকে ১৯২০ পর্যন্ত তাঁদের প্রতিনিধিদেরই খর্বিত এবং ক্ষমতাহীন বঙ্গীয় বিধান পরিষদে প্রেরণ করা হয়েছে। মধ্যস্থানীয় সম্পন্ন কৃষকগণ এবং শিক্ষিত 'ভদ্রলোক' শ্রেণী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন থেকে সর্বদা শত হস্ত দূরে থেকেছেন । অতএব, বর্ধমানে এই ধরনের ব্যাপক গান্ধীবাদী আন্দোলনের সাফল্য সন্দেহাতীত ছিল না। ১৯২১-এ কালনাতে , কাটোয়াতে এবং আসানসোলে কংগ্রেস-সমিতি গঠিত হয়। অহিংস অসহযোগের রাজনৈতিক তত্ত্ব, অথবা উদ্দেশ্য জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করার সময় ছিল না তাই এই আন্দোলন কালনাতে এবং কাটোয়াতে কিছুটা সাফল্যমণ্ডিত হলেও, অন্যত্র ফলপ্রসূ হয়েছিল কিনা, সন্দেহ। বর্ধমান জেলায় এই আন্দোলনের নেতা ছিলেন জিতেন্দ্রনাথ মিত্র। ডাক্তার বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় , ডাক্তার গুণেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং আসানসোলে সরস্বতী কর্মমন্দিরের সভ্যগণ। ১৯২২ -এ বর্ধমান শহরে এবং বৈকুণ্ঠপুরে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

অথচ, কোনই সন্দেহ নেই, অহিংস অসহযোগ আন্দোলন বর্ধমান জেলার অগণিত মানুষের মনে রাজনৈতিক আন্দোলন সম্বন্ধে, জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে, অসাম্প্রদায়িক দেশাত্ববোধের প্রয়োজন সম্বন্ধে নতুন ভাবনার সঞ্চার করে, আনে নতুন অনুপ্রেরণা। তার আগে বিপ্লববাদীগণ এবং হিন্দু পুনরুত্থানের তাত্বিকগণ এই ধরনের নতুন ভাবনা, নতুন অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করতে পারেননি। এই কথার প্রমাণ,১৯৩০ -এ আইন অমান্য আন্দোলনে বর্ধমান জেলায় সংখ্যাতীত দেশপ্রেমিকের অংশগ্রহণ, কারাবরণ এবং নিগ্রহবরণ। যতদূর জানা যায়, ১৯২৫ থেকেই বর্ধমানের বিভিন্ন অঞ্চলে পরবর্তী বৃহত্তর আন্দোলনের জন্য কর্মীগণ সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন কাটোয়ার অন্নদা সাহা, হরেরাম মণ্ডল; কালনার গোপেন কুণ্ডু; রানীগঞ্জের ভীমাচরণ রায়; বরাকরের কালুরাম মাড়োয়ারী। (ফকিরচন্দ্ররায়, পৃ. ৩০-৩৫) অন্যান্য কংগ্রেস কর্মীগণ গ্রামাঞ্চলে গিয়ে জাতীয়তাবাদের আদর্শ এবং মহাত্মা গান্ধীর ভাবধারা প্রচার করেছিলেন।

১৯৩০ -এ সমগ্র বর্ধমান জেলায় আইন-অমান্য আন্দোলন পরিব্যাপ্ত হয়। বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ ছাড়াও এই আন্দোলনে যোগ দিয়ে যাঁরা রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন পরবর্তীকালের সাম্যবাদী ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী এবং শহীদ সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বানোয়ারী লাল ভালোটিয়া , কমিউনিষ্ট কর্মী হেলারাম চট্টোপাধ্যায়, মুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায়, পরবর্তীকালের বিখ্যাত কমিউনিষ্ট নেতা বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী, হরেকৃষ্ণ কোনার এবং সরোজ

মুখোপাধ্যায়, বর্ধমান শহরের ডাক্তার অরিণ গুপ্ত, ভামিনীরঞ্জন সেন, পরবর্তীকালের কমিউনিষ্ট নেতা এবং বুদ্ধিজীবি সৈয়দ শাহেদুল্লাহ, মহম্মদ ইয়াসিন, আবদুস সাত্তার এবং দাশরথী তা। (দ্রষ্টব্য, ফকিরচন্দ্র রায়, প্রাগুক্ত; 'বর্ধমান পরিচিতি', প্রাগুক্ত; বলাই দেবশর্মা, বর্ধমানের ইতিহাস, ১৯৫৮; বর্ধমান পৌর শতবার্ষিকী স্মরণিকা, প্রাগুক্ত; সরোজ মুখোপাধ্যায়, 'ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি ও আমরা', প্রথম খণ্ড, কলিকাতা ১৯৮৫; সৈয়দ শাহেদুল্লাহ্, 'বর্ধমান জেলায় কমিউনিষ্ট আন্দোলনের অতীত প্রসঙ্গ', বর্ধমান ১৯৯১; এবং Ramakanta Chakrabarty, প্রাগুক্ত; pp, 20-23), বর্ধমান শহরে ছাত্র এবং যুবকদের সংগঠিত করেছিলেন ফকিরচন্দ্র রায়, পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী এবং শৈলেন্দ্রনাথ রায়। কংগ্রেসের সংগঠন প্রধানত বিজয়কুমার ভট্টাচার্যের অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা মহিষাদলে আইন অমান্য করতে গিয়েছিলেন।

ডাক্তার গুণেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং তাঁর সহধর্মিণী শ্রীমতী সুরমা মুখোপাধ্যায় কাটোয়াতে আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনা করেন। সমগ্র বর্ধমানে মহিলাগণ এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। অন্নদাপ্রসাদ মণ্ডলের নেতৃত্বে কালনাতেও এই আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠেছিল। সমগ্র বর্ধমান জেলাতে বহু যুবক তাতে যোগদান করেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই পরে সাম্যবাদ দ্বারা আকৃষ্ট হন। এমন বলা যায় যে, এই আন্দোলনে বর্ধমান জেলায় সাম্যবাদ প্রচারের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল। আইন অমান্য করার অভিযোগে বর্ধমান জেলায় অন্তত এক হাজার দেশব্রতীকে গ্রেফতার করা হয়। মহিলাদের নেত্রী ছিলেন ডাক্তার *গুণেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পত্নী শ্রীমতী সুরমা মুখোপাধ্যায়, শ্রী ভোলানাথ চৌধুরীর* সহধর্মিণী, রেনুদিদি (শ্রী শচীন্দ্রনাথ অধিকারীর স্ত্রী), এবং মৈমনসিংহের কমিউনিস্ট নেতা শ্রীমণি সিংহের ভগ্নী শ্রীমতী নির্মলা সান্যাল। এই আন্দোলন পূর্বের সমস্ত আন্দোলনের চেয়ে ব্যাপক হয়েছিল। তারফলে বর্ধমান জেলায় তৃণমূলস্তরে যেমন রাজনৈতিক চেতনা *সম্প্রসারিত হল, তেমনই জনপ্রিয়তা অর্জন করল ভারতের জাতীয় কংগ্রেস। প্রবহমান* জমিদারী-জোতদারী সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন দেখা গেল যে, পূর্বে বর্ধমান জেলায় জমিদার-জোতদারদের রাজভক্তি ছিল প্রশ্নাতীত; এখন অনেক জমিদার-জোতদার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। তার ফলে কংগ্রেস কখনই শ্রেণী সংগ্রামের কথা প্রচার করেনি। ১৯৩১-এ গান্ধী-আরউইন চুক্তির পরে, আইন অমান্য আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসে। ১৯৩২-এ বর্ধমান জেলায় কংগ্রেসের পুনর্গঠন করা হয়। কংগ্রেসের সংগঠনে বামপন্থীদের প্রভাব বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে তা প্রয়োজনীয় ছিল।

বর্ধমান শহরে যুব সংগঠনের সূত্রপাত করেছিলেন দুর্লভকিশোর মিশ্র; তিনি কচিবাবু নামে সুপরিচিত ছিলেন। (এ বিষয়ে ফকিরচন্দ্র রায়-রচিত পূর্বোক্ত গ্রন্থে বহু তথ্য আছে। পৃ. ৪৫ -৪৭) যুবকদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের প্রচারে পত্র-পত্রিকার ভূমিকাও প্রথমে উল্লেখযোগ্য। তাদের মধ্যে বিশিষ্ট ছিল 'শক্তি' (১৯৩০-এর পরে বোধহয় মুদ্রিত হয়নি); ভোলানাথ ভঞ্জ-সম্পাদিত 'বর্ধমান'(১৯২১; সাপ্তাহিক); বংশগোপাল চৌধুরী সম্পাদিত

'দেশপ্রিয়'(১৯৩৪); ভুজঙ্গভূষণ সেন সম্পাদিত 'শান্তিজল' (১৯৩৪?) দাশরথী তা সম্পাদিত 'দামোদর'(১৯৩৬, পাক্ষিক); এবং ভবভূতি সোম সম্পাদিত 'পল্লীকথা' (১৯৪০, সাপ্তাহিক), (দ্রষ্টব্য, পূর্বোক্ত 'বর্ধমান পৌরসভার ইতিবৃত্ত' পৃ. ৩৯-৪২)

কচিবাবু বলাই দেবশর্মা সম্পাদিত জাতীয়তাবাদী পত্রিকা 'শক্তি'-র মুদ্রণের ও প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তাঁর বন্ধুরা ছিলেন অম্বিকা নাগ, বিনয় বসু, অন্নদা চক্রবর্তী, পরবর্তীকালে ভারতবিখ্যাত ছায়াছবি-নির্দেশক দেবকীকুমার বসু, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোলাম রহমান ওরফে কচি মিয়াঁ। খাদি-কর্মী মন্মথনাথ সেন পরিচালিত অন্য একটি যুব-সংগঠনও বর্ধমান শহরে ছিল। তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন জিতেন্দ্রনাথ মিত্র, যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা, রাধাকান্ত দীক্ষিত, মুহম্মদ ইয়াসিন এবং আশুতোষ চৌধুরী। কচিবাবুর সংগঠনের সভ্যগণ সশস্ত্র বিপ্লবের সমর্থক ছিলেন। মন্মথসেনের সংগঠন ছিল গান্ধীবাদী, দুটি সংগঠনই গ্রামাঞ্চলে সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপন করার জন্য, পাঠশালা করার জন্য, এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার জন্য চেষ্টা করে।

১৯২৫-এ কলকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিলবঙ্গ ছাত্র সম্মেলনে বর্ধমানের প্রতিনিধি ছিলেন ফকিরচন্দ্র রায় এবং সুধীন্দ্রনাথ সরকার। বর্ধমানে ছাত্র-যুব সংগঠন, এবং বামপন্থী বিপ্লবী আন্দোলন প্রধানত ফকিরচন্দ্র রায়ের অক্লান্ত প্রচেষ্টার জন্যই বিবর্ধিত হয়। অসামান্য এই স্বাধীনতা -সংগ্রামীর জীবনী পূর্ণতরভাবে রচনা করা উচিত। ১৯২৫ - এ ডিসেম্বর মাসে বিপ্লবী রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী শহীদ হয়েছিলেন। তাঁর স্মরণে বর্ধমান শহরে যুবকগণ একটি সভার অনুষ্ঠান করেছিলেন। তার সভাপতি হয়েছিলেন মৌলবী মহম্মদ ইয়াসিন। লক্ষণীয়, বর্ধমানের দেশপ্রেমিক যুবকগণ গান্ধীপন্থী কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত থেকেও ১৯২৮-এ গঠন করেছিলেন 'গুপ্ত সমিতি' । তার সভ্য ছিলেন খাদি-কর্মী মন্মথনাথ সেন, ফকিরচন্দ্র রায়, নিবারণ ঘটক, দুকড়িবালা দেবী, পরবর্তীকালে খ্যাতনামা কমিউনিষ্ট নেতা বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী, সরোজ মুখোপাধ্যায় এবং হেলোরাম চট্টোপাধ্যায়। প্রমথনাথ বসুও এই সমিতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এমন মনে হয় যে, বর্ধমানের 'গুপ্ত সমিতি', অনুশীলন সমিতির মতো, কিংবা শ্রীসংঘের মতো, শক্তিশালী হয়ে উঠতে চেষ্টা করে। 'গুপ্ত সমিতি' থাকার জন্যই বর্ধমান শহরে অনুশীলন সমিতির কিংবা শ্রীসংঘের শাখা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে বেশীদিন টিকে থাকতে পারেনি।

বর্ধমানের ছাত্রদের সঙ্গে নিখিল বঙ্গ ছাত্র সম্মেলনের ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল। 'গুপ্ত-সমিতির' সঙ্গে সম্পর্ক ছিল প্রধানত যুগান্তর গোষ্ঠীর। বিশেষভাবে ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের বারবার বর্ধমানে এসে সমাজবাদের ও প্রগতির বার্তা প্রচার তাৎপর্যবহ ছিল। বিপ্লবী বিপিনবিহারী গাঙ্গুলির পরামর্শে রাইফেল সংগ্রহ করার, অর্থ লুন্ঠন করার, ডিনামাইট দিয়ে রেললাইন উড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা ব্যর্থ হলেও, এক সময়ে বর্ধমান জেলার অনেক তরুণ একই সঙ্গে এই ধরনের কর্মে এবং সমাজবাদে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী 'বীরভূম ষড়যন্ত্র' মূলক ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তার জন্য তাঁকে পাঁচ বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়। হরেকৃষ্ণ কোঙারকে 'স্বদেশী ডাকাত' ভেবে পুলিশ

গ্রেফতার করে। এ তথ্যও উল্লেখ্য যে, 'গুপ্ত সমিতি' গ্রামে গ্রামে গিয়ে লোকসেবা করেছে, মানুষের চেতনা উদ্দীপিত করেছে। বিশের এবং ত্রিশের দুই দশকে বর্ধমানের তরুণদের মধ্যে বিপ্লববাদ, সাম্যবাদ, গান্ধীবাদ এবং জনসেবার আদর্শ সমানভাবে প্রচলিত ছিল। প্রসঙ্গত কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা উল্লেখ্য।

বর্ধমান জেলায় সাম্যবাদী আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃত ছিলেন ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। স্বামী বিবেকানন্দের ছোট ভাই ভূপেন্দ্রনাথকে যদি আমাদের দেশের বিশেষ পরিস্থিতিতে বিপ্লবের ও সাম্যবাদের 'অবধূত' বলা যায়, তবে বোধ হয় ভুল হয় না। ১৯২১ - এ তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নে গিয়েছিলেন। মহামতি লেনিনও তাঁকে জানতেন।

ভূপেন্দ্রনাথ বারবার বর্ধমানে এসে কাজ করেছেন। তিনি নিখিলবঙ্গ যুব-সম্মেলনের স্রষ্টা ছিলেন। বর্ধমানে এসে টাউন হল-এ অনুষ্ঠিত একটি সভায় তিনি বিশ্বের যুব আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে ভাষণ দিয়েছিলেন। ১৯২৮ - এ ২৭ শে ডিসেম্বরে কলকাতায় সমাজবাদী যুব-কংগ্রেসের উদ্যোগে একটি সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ভূপেন্দ্রনাথ তাতে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। এই সম্মেলনে ভাষণ দিয়েছিলেন জওহরলাল নেহরু। এই সম্মেলনে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করা হয়। সাম্যবাদী আন্দোলনেই যে প্রকৃত গণমুক্তির পথ আছে, তাও ঘোষণা করা হয়েছিল। বর্ধমানের 'গুপ্ত সমিতি' এই সম্মেলনে প্রচারিত আদর্শ দ্বারা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়। ১৯৩১ - এ বর্ধমানে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এগুলো হল বর্ধমান জেলা কংগ্রেস সম্মেলন, সমাজবাদী যুব-সম্মেলন এবং ছাত্র সম্মেলন। যুব-সম্মেলনের ও ছাত্র-সম্মেলনের সংগঠকগণ ছিলেন প্রণবেশ্বর সরকার, আমোদবিহারী বসু, বামাপতি ভট্টাচার্য, ফকিরচন্দ্র রায় এবং সরোজ মুখোপাধ্যায়। যুব-সম্মেলনের সূচনা করেন মহারাজকুমার উদয়চাঁদ মহতাব। বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী, আবদুস সাত্তার এবং দাশরথী তা তাতে যোগ দিয়েছিলেন। সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। তাতে রক্ত পতাকা উত্তোলন করা হয়।

১৯৩১-এ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বর্ধমান জেলা-কৃষক সমিতি, তার সভাপতি ছিলেন হেলারাম চট্টোপাধ্যায় ; সম্পাদক ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর চৌধুরী। জাতীয়তাবাদী চেতনার যেমন সম্প্রসারণ হয়, তেমনই সম্প্রসারণ হয় সাম্যবাদের, সমাজবাদের। যে বর্ধমান জেলা বহুকাল ধরে নিদ্রিত ছিল, সে বর্ধমান যেন জেগে উঠল। ১৯৩৩ - এ মে মাসে হাটগোবিন্দপুরে বর্ধমান -জেলা-কৃষক-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তাতে সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। লক্ষণীয়, তাতে তৎকালীন বর্ধমান জেলার ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত ভাষণ দিয়েছিলেন। বহু বিষয় সম্বন্ধে গুরুতর মতভেদ থাকলেও মহাত্মা গান্ধী এবং সাম্যবাদীগণ বুঝেছিলেন যে গ্রামের মানুষদের, কৃষকদের না জাগালে দেশ জাগবে না। এই অর্থে বর্ধমানে সাম্যবাদী কৃষক-সংগঠন জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামকে অর্থবহ এবং সম্প্রসারিত করে তুলেছিল। লক্ষণীয়, বর্ধমানের সাম্যবাদী কর্মীদের এইরূপ প্রচেষ্টা জেলা কংগ্রেসের নেতা বিজয়কুমার ভট্টাচার্য সমর্থন করেছিলেন। বস্তির শিশুদের জন্য তিনি যে বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন, তাতে প্রারম্ভিক পর্যায়ে সাম্যবাদী কর্মী হেলারাম চট্টোপাধ্যায় এবং

সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় শিক্ষকতা করেছেন। এ সময়ে ফকিরচন্দ্র রায় রাজনৈতিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন সত্ত্বেও বৈপ্লবিক 'সন্ত্রাস' -এর তত্ত্ব থেকে সরে আসার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। তাঁকে গ্রেপ্তার করা হলে, এবং বিশেষভাবে সাম্যবাদের প্রসারে, বর্ধমান জেলায় ব্যক্তিভিত্তিক বৈপ্লবিক 'সন্ত্রাস' গুরুত্ব হীন হয়ে পড়ে। যাঁরা একসময়ে সেই মতবাদ গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই সাম্যবাদী আন্দোলনের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন।

১৯৩৫-এ ৫ ই অক্টোবর -এ কমিউনিষ্ট পার্টির বর্ধমান জেলা -শাখা প্রতিষ্ঠিত হল। তার আগে সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'ইন্ডিয়ান প্রলেটারিয়ান, রেভলিউশনারী পার্টি, (দ্রষ্টব্য, সৈয়দ শাহেদুল্লাহ্, 'বর্ধমান জেলায় কমিউনিষ্ট আন্দোলনের অতীত প্রসঙ্গ, বর্ধমান, ১৯৯১, পৃ . ৩৩-৩৪) তার সভ্যগণ ছিলেন হেলারাম চট্টোপাধ্যায়, শাহেদুল্লাহ্, অশ্বিনী মণ্ডল, ধীরেন চট্টোপাধ্যায় এবং শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। শাহেদুল্লাহ সম্পাদক হলেন। গ্রামে গ্রামে কৃষকদের রাজনৈতিক চেতনা তীব্র করে তোলার জন্য দেশব্রতী সাম্যবাদী কর্মীগণ নিরলসভাবে যে কাজ করেছিলেন, তার তাৎপর্য দামোদর খাল-করের বিরুদ্ধে সংগঠিত পরিব্যাপ্ত সত্যাগ্রহ আন্দোলনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। ১৯২৬ থেকে ১৯৩২ -এর মধ্যে দামোদর খাল কাটা হয়; তার ব্যবহার আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছিল ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দে। এই খাল কাটার জন্যে এক কোটির বেশী টাকা খরচ হয়। ১৯৩৫-এ ১৮ ফেব্রুয়ারী তৎকালীন সেচমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন এই প্রস্তাব করলেন যে, যে সকল কৃষকের জমির মধ্য দিয়ে খাল প্রবাহিত হচ্ছিল, তাঁদের বাৎসরিক পাঁচ টাকা আট আনা হারে কর দিতে হবে। সে বৎসরে অক্টোবর মাসের পাঁচ তারিখে ৩ টি আইন হয়ে গেল। এই করের বিরুদ্ধে বর্ধমানের উকিলদের সংগঠন, 'বার অ্যাসোসিয়েশন' প্রতিবাদ করল। খাল কাটার জন্য অনেক কৃষকের লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশী হচ্ছিল। উকিলদের তৎপরতায় গঠিত হয়েছিল বর্ধমান জেলা রায়ত 'অ্যাসোসিয়েশন'। তার প্রধান একজন সমর্থক ছিলেন কংগ্রেসের নেতা আবদুস সাত্তার। তিনি তখন জেলা-কংগ্রেসের সম্পাদক ছিলেন। প্রধানত জেলা-কংগ্রেসের তৎপরতায় বিভিন্ন জায়গায় খাল-করের বিরুদ্ধে জনসভার অনুষ্ঠান করা হয়। জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল বর্ধমান শহরের (ডিসেম্বর ২০, ১৯৩৫; ফেব্রুয়ারী ১০, ১৯৩৭; ফেব্রুয়ারী ১৪, ১৯৩৭;১ মার্চ, ১৯৩৭), সদিয়াতে, ভাতারে এবং কলকাতার এলবার্ট হল-এ । মুজফফর আহমদ-এর সভাপতিত্বে বর্ধমান - জেলা- কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৩৭-এর মে মাসে। তার প্রধান সংগঠক ছিলেন হেলারাম চট্টোপাধ্যায় এবং স্থানীয় কংগ্রেস নেতা মুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায়। নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার বর্ধমানে এসে কিষাণ সম্মেলন করেন (১৩ জুন, ১৯৩৭)। অনেক জমিদার এবং জোতদারও এই আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন; উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম ছিলেন 'এম এল এ' স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় । তিনি ছিলেন চাকদীঘির জমিদার। কংগ্রেস -পরিচালিত 'ক্যানাল -কর-প্রতিকার-সমিতি' (১৯৩৭ - এ ৩১ জানুয়ারীতে প্রতিষ্ঠিত) বিভিন্ন গ্রামে প্রতিবাদ সভার অনুষ্ঠান করে । তাতে বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়, আবদুল্লাহ রসুল, হেলারাম চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ সাম্যবাদী নেতাগণ অংশগ্রহণ করেছিলেন। (দ্রষ্টব্য ঃ Buddhadeva Bhattacharya, ed. Satyagrahas in Bengal, 1918-1939. Calcutta

1977, pp. 237ff) (সৈয়দ শাহেদুল্লাহ্, পূর্বোক্ত, পৃ . ৪৪-৪৬, ৩৫৬-৩৬৫)। ১৯৩৯ -এ ১৫ ফেব্রুয়ারী আউসগ্রামে ননিবালা সামন্তের নেতৃত্বে যে সত্যাগ্রহ আন্দোলন হয়, তাতে বহু মানুষ যোগ দিয়েছিলেন। শেষপর্যন্ত এই আন্দোলনের জন্য সরকার করের পরিমাণ বাৎসরিক দু-টাকা নয় আনাতে নামিয়ে আনতে বাধ্য হয়। দামোদর-ক্যানাল-কর আন্দোলন, অতএব, কিছু সাফল্য যে অর্জন করেছিল, তা অবশ্যই বলা যায়।

পরবর্তী বড় আন্দোলন ছিল ১৯৪২ - এর 'ভারত ছাড়' আন্দোলন। তার প্রভাব বর্ধমান জেলাতেও পড়েছিল। এই আন্দোলনের আগেই প্রধানত বিজয়কুমার ভট্টাচার্য গ্রামে গ্রামে ঘুরে আসন্ন আন্দোলনের বার্তা প্রচার করেছিলেন। আন্দোলনের সূত্রপাতে পুলিশ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ রায়, অজিতকুমার রায়, অলোক সরকার, ভারতচন্দ্র গাঙ্গুলি, অসীম ঘোষ, নারায়ণ দাস হাজরা, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ কর্মীদের গ্রেপ্তার করেছিল। নেতাদের গ্রেফতার করার জন্য বর্ধমান জেলায় এ সময়ে কোনও সুসংগঠিত আন্দোলন হয়নি। এমন দাবী করা হয়েছে যে, দক্ষিণ বর্ধমানে এ সময়ে 'স্বাধীন সরকার' গঠন করা হয়। কিন্তু তার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ১৯৪৩ - এ ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের মধ্যে প্রধানত কমিউনিস্ট কর্মীগণ ত্রাণ সংগঠিত করেছিলেন। তাতে বিশেষভাবে সক্রিয় ছিলেন বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী, সৈয়দ শাহেদুল্লাহ্, শহীদ শিবশঙ্কর চৌধুরী, প্রণবেশ্বর সরকার, জিতেন্দ্রনাথ মিত্র, মুসা মিঞা, নৃপেন ভট্টাচার্য প্রমুখ দেশব্রতী কর্মীগণ। গ্রামে গ্রামে 'ফুড কমিটি' গঠন করা হয়। (সৈয়দ শাহেদুল্লাহ্, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৭-১৩২)। দুর্ভিক্ষে এবং বন্যায় সাম্যবাদী কর্মীদের অক্লান্ত সেবাব্রত তাঁদের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করে। ১৯৪৬ - এ জুলাই মাসে বর্ধমানে বন্দিমুক্তি আন্দোলনেও তাঁদের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল। অথচ, প্রধানত তাত্ত্বিক কারণে তাঁরা 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেননি।

এ পর্যন্ত যে আলোচনা করা হল, তা থেকে কতকগুলো সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে। দেখা গেল যে, কলকাতা থেকে খুব বেশীদূরে অবস্থিত না হলেও, 'বাঙালী রেনেসাঁস' -এর কোনও প্রভাব দীর্ঘকাল পর্যন্ত বর্ধমান জেলায় স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার সম্প্রসারণ সেখানে সামান্যভাবে হয়েছে। ফলত শিক্ষিত 'ভদ্রলোক' শ্রেণীর, তথা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভাবে বহুকালাবধি বর্ধমানের সংস্কৃতিতে প্রধানত জমিদার-জোতদার-পাটনিদারদের প্রাধান্য ছিল প্রশ্নাতীত। গত শতাব্দের সত্তরের দশক থেকে বর্ধমানে মিউনিসিপালিটিকে কেন্দ্র করে যে রাজনীতির আবির্ভাব হল, তা রীতির ও গুণের বিচারে ছিল রাজভক্তিপূর্ণ মধ্যপন্থী নরম রাজনীতি ; কিন্তু তখনই প্রথম রাজনীতির ক্ষেত্রে 'ভদ্রলোক' শ্রেণীর উপস্থিতি স্পষ্ট হয়ে উঠল। বহুকাল পর্যন্ত সমগ্র বর্ধমান জেলায় সমাজই ছিল ব্যক্তির ও সমূহের জীবনের নিয়ন্ত্রক ; এই সমাজ, রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশী সমাজ', যেখানে ব্যক্তি কখনই সমাজের উর্দ্ধে উঠতে পারে না। কিন্তু 'ভদ্রলোক' - দের পদলাভের জন্য রাজনীতিতে ব্যক্তিমানসের আধিপত্য ক্রমশ প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং যখন আধিপত্যের প্রশ্ন বড় হয়ে ওঠে। তখন তাকে কেন্দ্র করেই আসে দল, দলের মতাদর্শ, সংগঠন এবং দলীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য দলাদলি। বর্ধমানে উনিশ শতকের শেষ দুই

দশক থেকে এই ঘটনা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ক্রমশ বর্ধমানের মানুষ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার প্রকৃত মর্ম বুঝতে পারেন; এই বোধ যতই তীব্র হয়, ততই ব্যক্তিস্বার্থের উর্দ্ধে উঠে আসে দেশের কথা, মানুষের কথা, স্বাধীনতার কথা, পরাধীনতার মর্মদাহ। এই বিষয়টি অনিল শীল, গালাহার, জনসন প্রমুখ তথাকথিত 'কেম্‌ব্রিজ' - ঐতিহাসিকগণ আদৌ বুঝতে পারেননি। বর্ধমানে — পিছিয়ে থাকা বর্ধমানে — কেন হঠাৎ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন অমন পরিব্যাপ্ত, অমন তীব্র হয়ে উঠল ? কেন এই জেলার সোনার ছেলেরা যুগান্তর দলের সঙ্গে সংযুক্ত হয় ? কোন আলোকে তাঁদের প্রাণের প্রদীপ জ্বলেছিল ? কেন বর্ধমানের মান্যগণ্য মুসলমান নেতাগণ বিচ্ছিন্নতাবাদকে সমর্থন করেননি ? সামাজিকতার যে মধ্যযুগীয় আদর্শ, অথবা মূল্যবোধ ছিল, দেশপ্রেমে, নতুন জাতীয়তাবাদী চেতনায়, তা এক নূতন অর্থে অন্বিত হল।

এ কথা বলে উপায় নেই যে, গান্ধীজির দ্বারা পরিচালিত ১৯২০ - তে যে আন্দোলন হয়, প্রধানত সংগঠনের দুর্বলতার জন্যই বর্ধমান জেলায় তা দুর্বার হয়ে ওঠেনি। ক্রমশ এই দুর্বলতা দূরীভূত হয়, এবং ১৯৩০ - এর আইন অমান্য আন্দোলনে বর্ধমান জেলা উত্তাল হয়ে ওঠে। ১৯২৫ - এর পর থেকে বহু প্রতিভাশালী দেশপ্রেমিক তরুণ জাতীয়তাবাদ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেদের উন্নতির কথা না ভেবে দেশের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করেছেন। সমগ্র বঙ্গে জাতীয়তাবাদী সংগ্রামে বর্ধমান জেলার বিশিষ্ট স্থান তাঁরাই নির্দিষ্ট করেছেন। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রে বর্ধমানের তরুণরা ক্রমশ শ্রেণীসংগ্রামের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে থাকেন। কোনই সন্দেহ নেই যে, বঙ্গে মার্কসবাদী সর্বহারাদের আন্দোলনে বর্ধমান জেলার কমিউনিষ্ট কর্মীগণ প্রধানত কৃষকদের সংগঠিত করে একটি অসামান্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। এ জন্য তাঁদের যে পরিশ্রম করতে হয়েছে, যে দুঃখকষ্ট সহ্য করতে হয়েছে, তার পূর্ণ বিবরণ এখনও প্রকাশিত হয়নি।

যে নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতির রূপরেখা ১৯৩০-এর পরে বর্ধমান জেলায় পরিস্ফুট হল, তার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল গ্রামে স্বাধীনতার এবং সাম্যের বার্তা-প্রচার। বৈপ্লবিক 'সন্ত্রাস' একটি আদর্শরূপে আর তো গ্রাহ্য ছিল না। হয়তো মনে হতে পারে যে, এত বড় বর্ধমান জেলার একজন দেশপ্রেমিক মানুষও ফাঁসিকাঠে প্রাণ দেননি। কিন্তু শ্রমিক-কর্মী সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে ১৯৩৮ - এ ১৫ নভেম্বর রাণীগঞ্জের কাগজের কলের শ্রমিকদের ধর্মঘট পরিচালনার জন্য সাহেবরাই খুন করেছিল।

আরও লক্ষণীয়, বর্ধমান জেলায় কংগ্রেসের কর্মীদের মধ্যে মতবিরোধ প্রবল হলেও, দক্ষিণপন্থার ও বামপন্থার বৈপরীত্য থাকলেও সমস্ত ব্যাপক আন্দোলনে এবং একটি সময় পর্যন্ত বিভিন্ন নির্বাচনে, তাঁরা প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে একসঙ্গে লড়াই করেছেন। তাঁদের এই ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের জন্যই বর্ধমান জেলায় সাম্প্রদায়িকতা কখনই প্রবল হয়ে উঠতে পারেনি। (এর একটি প্রত্যক্ষদৃষ্ট বিবরণ দ্রষ্টব্য ঃ শাহেদুল্লাহ্, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ৩৯৫ - ৪০০) নেতাদের মধ্যে মতবিরোধ এবং স্বার্থজাত সংঘর্ষ হলেও, তা কখনও বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলনকে প্রভাবিত করেনি।

বর্ধমান ঃ সংক্ষিপ্ত ভৌগোলিক রূপরেখা

জ্যোতিরিন্দ্র নারায়ণ লাহিড়ী

দেশের প্রধান দুটি অর্থনৈতিক কার্য কৃষি এবং শিল্পে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অর্জন করে এবং আগামী দিনে এই দুটি ক্ষেত্রে আরও প্রভূত উন্নতির সম্ভাবনা নিয়ে দক্ষিণবঙ্গের মধ্যভাগে অবস্থান করছে আশ্চর্য বৈচিত্র্যময় জেলা বর্ধমান।

একটি জেলার এক অংশের থেকে অন্য অংশের এত বিপুল বৈপরীত্য শুধু পশ্চিমবঙ্গের অন্য জেলাতে নয়, ভারতবর্ষের অন্যান্য জেলাগুলিতেও বিরল। বর্ধমানের ওই আঞ্চলিক বৈচিত্র্য আক্ষরিক অর্থেই সর্বক্ষেত্রে। জেলার ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, মাটি, অর্থনৈতিক-কার্যকলাপ, মানুষের জীবনযাত্রা সব কিছুতেই এই বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। জেলার পূর্বাংশের সমভাবাপন্ন জলবায়ুতে উর্বর পলি মাটিতে ধানের চাষ জেলাটিকে 'পশ্চিমবঙ্গের শস্যাগার'-এ পরিণত করেছে। আবার পশ্চিমাংশের ছোটনাগপুর মালভূমির প্রান্তবর্তী অংশ থেকে উত্তোলিত খনিজ উপকরণকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে 'ভারতের রাঢ়' নামে পরিচিত দুর্গাপুরের মত শিল্পাঞ্চল। ভৌগোলিক বৈচিত্র্য এবং অর্থনৈতিক বৈচিত্র্য মিলে গড়ে উঠেছে বর্ধমানের সম্পদ ও সমৃদ্ধি।

স্বল্প পরিসরে বর্ধমান জেলার ভৌগোলিক উপাদানগুলোর উপরে সংক্ষেপে আলোকপাত করা এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য। সমগ্র জেলার পুঙ্খানুপুঙ্খ ভৌগোলিক বিবরণ দেওয়া স্থানাভাবে সম্ভব না হলেও এই নিবন্ধ প্রাথমিকভাবে বর্ধমান জেলা সম্পর্কে পাঠকের জিজ্ঞাসার উত্তর দেবে এবং পাঠককে জেলাটি সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু করে তুলবে বলে আশা রাখি।

অবস্থান, আয়তন, আকৃতি

পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ - মধ্য ভাগে বর্ধমান জেলা অবস্থিত। এই জেলার উত্তরে নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলা এবং কিছু অংশে বিহার রাজ্য, পশ্চিম দিকের সংকীর্ণ সীমানায় বিহার রাজ্য ও পুরুলিয়া জেলা, দক্ষিণে বাঁকুড়া ও হুগলী জেলা, পূর্বে হুগলী ও নদীয়া জেলা অবস্থিত। অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখার বিচারে বর্ধমান জেলা উত্তরে ২৩°৫৩´ উত্তর অক্ষরেখা থেকে দক্ষিণে ২২°৫৬´ উত্তর অক্ষরেখা পর্যন্ত এবং পূর্ব দিকে ৮৮°২৫´ পূর্ব দ্রাঘিমারেখা থেকে পশ্চিমে ৮৬°৪৮´ পূর্ব দ্রাঘিমারেখার মধ্যে অবস্থিত।

আয়তনের বিচারে বর্ধমান পশ্চিমবঙ্গের তৃতীয় বৃহত্তম জেলা। (মেদিনীপুর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয়)। ১৯৯১ সালের লোকগণনা অনুসারে বর্ধমান জেলার আয়তন ৭০২৪.৪৩ বর্গ কিলোমিটার।

বর্ধমান জেলার পূর্বাংশের উত্তর - দক্ষিণে সর্বাধিক বিস্তার ১০০ কি.মি-র কিছু বেশী

তুলনায় পশ্চিমাংশে এই বিস্তার কোন কোন স্থানে ২৫ কি.মি.রও কম। অর্থাৎ জেলাটির উত্তর-দক্ষিণে বিস্তার যতই পশ্চিমে যাওয়া যায় ততই সংকীর্ণ হতে থাকে। অনেকে বর্ধমান জেলার আকৃতিকে হাতুড়ীর আকারের সাথে তুলনা করেন। পশ্চিমে এই হাতুরীর হাতল, পূর্ব দিকে মাথা।

ভূ-প্রকৃতি

পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় ১৭৫ কি.মি. বিস্তৃত হওয়াতে বর্ধমান জেলাতে বিভিন্ন ধরনের ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। জেলার ওপর দিয়ে প্রবাহিত নদীগুলির গতিপথ পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায় সমগ্র জেলাটির ভূমির ঢালে পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ভূমির উচ্চতা, ভূমিভাগের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে সমগ্র জেলাটিকে তিনটি সুস্পষ্ট ভূ-প্রাকৃতিক বিভাগে বিভক্ত করা যায়। এগুলো হল — ক) পশ্চিমের ক্ষয়প্রাপ্ত মালভূমি ও তরঙ্গায়িত উচ্চভূমি, খ) মধ্যভাগের অনুচ্চ টিলাযুক্ত প্রায় সমতল কাঁকুরে ভূমি বা রাঢ় অঞ্চল, এবং গ) পূর্বদিকের বিস্তীর্ণ পলি গঠিত সমতল ভূমি।

ক) *পশ্চিমের ক্ষয়প্রাপ্ত মালভূমি ও তরঙ্গায়িত উচ্চভূমি* ঃ জেলার পশ্চিম সীমা থেকে শুরু করে আসানসোল মহকুমার পূর্ব সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলকে এই বিভাগের মধ্যে ধরা যেতে পারে। এখানকার ভূমির উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে মোটামুটিভাবে ১০০ থেকে ৩০০ মিটার পর্যন্ত। এই অঞ্চলে বিচ্ছিন্নভাবে ছোট ছোট কয়েকটি প্রাচীন শিলা গঠিত অনুচ্চ টিলা (হালদা-পাহাড়) দেখতে পাওয়া যায়। তবে কোন ক্ষেত্রেই টিলাগুলোর উচ্চতা ৫০০ মিটারের বেশী নয়। মালভূমির এই অংশটি বিভিন্ন নদীর ক্ষয়কার্যের ফলে আজ তরঙ্গায়িত উচ্চভূমিতে পরিণত হয়েছে। 'ভারতের খনিজ ভাণ্ডার' রূপে পরিচিত ছোটনাগপুর মালভূমির পূর্বাংশের এই অঞ্চলে বিভিন্ন খনিজ সম্পদ পাওয়া যায়।

খ) *মধ্যভাগের অনুচ্চ টিলাযুক্ত প্রায় সমতল কাঁকুরে ভূমি বা রাঢ় অঞ্চল* ঃ আসানসোল মহকুমার পূর্ব সীমা থেকে শুরু করে সমগ্র দুর্গাপুর মহকুমা এবং বর্ধমান সদর মহকুমার আউশগ্রাম ২নং ব্লক নিয়ে এই ভূ-প্রাকৃতিক বিভাগটি গঠিত। এই অংশের ভূ-প্রকৃতি জেলার পশ্চিমাংশের মত বন্ধুর নয় আবার পূর্বাংশের মত অতি সমতলও নয়। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এই অংশের উচ্চতা মোটামুটিভাবে ৫০ থেকে ১০০ মিটারের মধ্যে। পশ্চিমদিকের মালভূমি অঞ্চল থেকে বিভিন্ন নদী পলি ও কাঁকুরে মাটি বয়ে এনে এই সমভূমি সৃষ্টি করেছে। সাঁওতালী ভাষায় 'রাঢ়ো' শব্দের অর্থ 'পাথুরে ভূমি' এই অঞ্চলের মাটি রুক্ষ ও কাঁকর যুক্ত বলেই অঞ্চলটি মোটামুটিভাবে প্রাচীন পলি ও ল্যাটেরাইট মৃত্তিকায় গঠিত।

গ) *পূর্বদিকে বিস্তীর্ণ পলি গঠিত সমতল ভূমি* ঃ জেলার সমগ্র পূর্বাঞ্চল জুড়ে রয়েছে একঘেয়ে বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি। আউশগ্রাম ২ নং ব্লক ছাড়া সমগ্র বর্ধমান-সদর, কালনা এবং
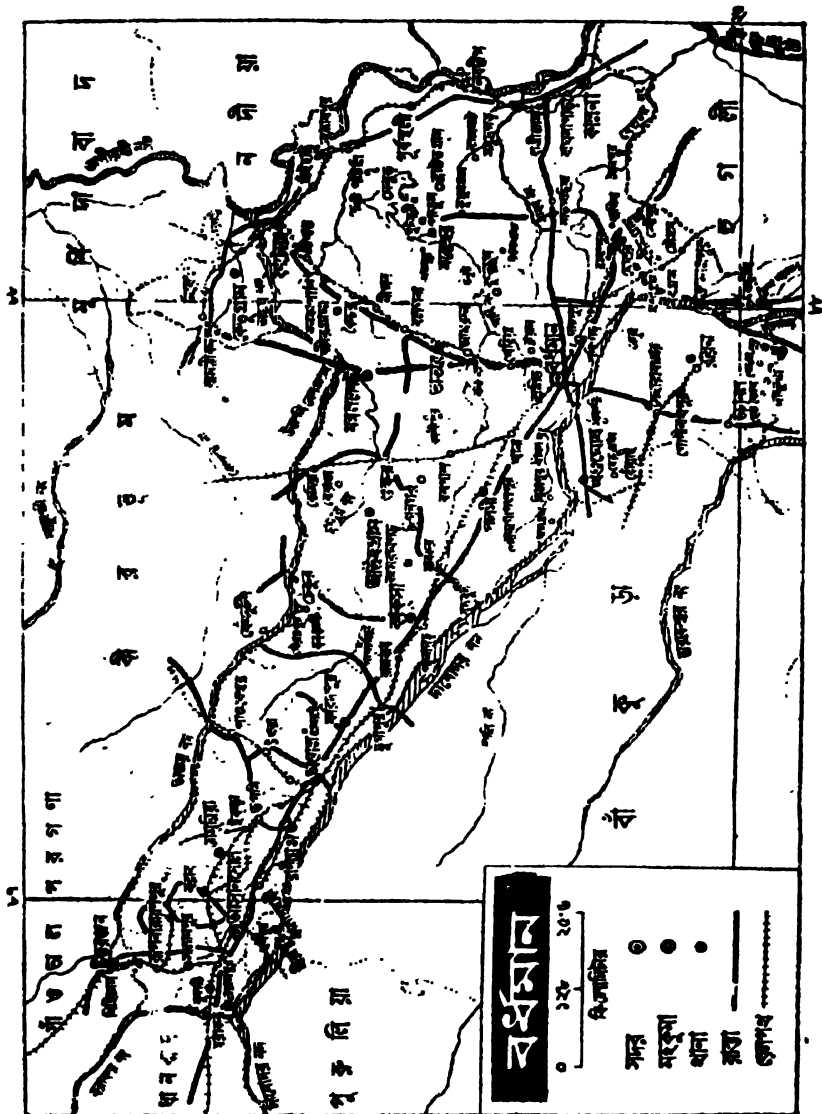
কাটোয়া মহকুমাতে এই একই রকম সমতল ভূমি দেখতে পাওয়া যায়। মূলতঃ ভাগীরথী, অজয় ও দামোদরের পলি সঞ্চিত হয়ে এই সমতল ভূমি গঠিত হয়েছে। অঞ্চলটির পশ্চিমাংশে অজয় ও দামোদরের পলি গঠিত, অন্যদিকে পূর্বাংশের পলি সঞ্চয়ে ভাগীরথীর প্রভাব বেশী লক্ষ্য করা যায়। নবীন পলি গঠিত এই সমভূমি সমগ্র ভারতবর্ষের উর্বর কৃষি ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে অন্যতম। (ম্যাপ - ২)
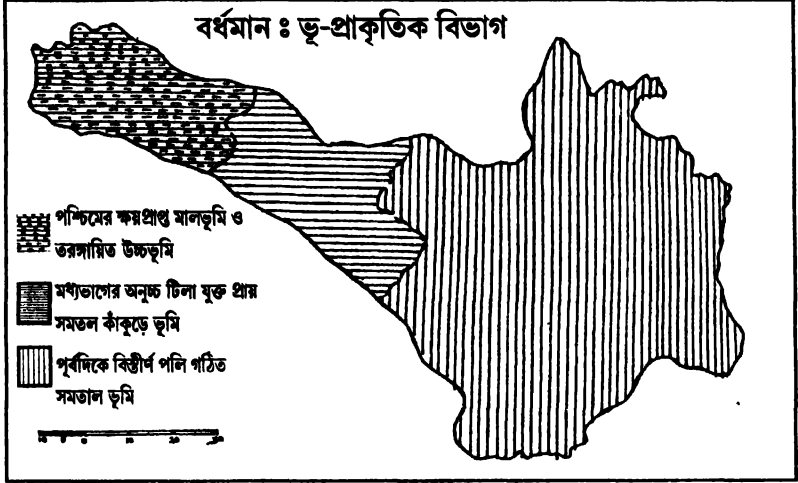
নদ নদী

সভ্য মানুষের জীবন যাপনে নদীর প্রভাব অসীম। প্রাগৈতিহাসিক সময় থেকেই নদীকে ঘিরে নদীর তীরে মানুষের বসবাস। নদীর জল মানুষের পানীয়, কৃষির অপরিহার্য উপকরণ, নদী র বয়ে আনা পলিতে কৃষি ক্ষেত্রের উর্বরতা লাভ, নদীর জলের সহায়তায় গড়ে ওঠা শিল্প-কারখানা-সৃষ্টি ও সৃজন মানুষের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক উন্নতির বুনিয়াদ।

বর্ধমান জেলার নদীগুলোও এই চিরন্তন সত্যের অনুসারী। এই জেলার প্রধান জনবসতি অঞ্চলগুলোর বর্তমান অবস্থান কিংবা অতীতের অবস্থানের তুলনায় এদের অবস্থানের পরিবর্তনের সাথে জেলার ওপর দিয়ে প্রবাহিত নদীগুলোর প্রবাহপথ পরিবর্তনের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। কৃষিতে জেলাটির সমৃদ্ধির পেছনেও নদীর অবস্থান অনস্বীকার্য।

প্রাচীন কালের জনবসতির ধ্বংসাবশেষ পরিত্যক্ত নদী খাতের চিহ্ন, জলাভূমিগুলোর বর্তমান বিস্তার, অতীতের বিভিন্ন ভ্রমণকারী অথবা লেখকদের বর্ণনা যেমন মধ্যযুগে চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল প্রভৃতি মঙ্গলকাব্যের বিবরণ, (অবশ্য ভৌগোলিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করলে মঙ্গলকাব্যগুলির বর্ণনাকে সম্পূর্ণভাবে নির্ভরযোগ্য বলে ধরে নেওয়া যায় না।) যোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে আঁকা জ্যাস্ত-ডি-ব্যারোস, ফ্যান-ডেন-ব্রোক ও

রেনলের নক্সা কিংবা পরবর্তীকালে ইংরেজ লেখকদের বর্ণনা ও সরকারী কাগজপত্র, গেজেটিয়ারের তথ্য একথা প্রমাণ করে যে বর্ধমান জেলার বর্তমান মানচিত্রে (চিত্র - ২) আমরা নদীগুলোর যেরকম বিস্তার লক্ষ্য করি অতীতে তাদের অবস্থান ঠিক এরকম ছিল না।

এই পর্যায়ে আমরা বর্ধমান জেলার ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত প্রাচীন নদীগুলোর বিস্তার, গতিপথের পরিবর্তন ও তার প্রভাব এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্যের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করবো।

ভাগীরথী হুগলী ঃ গঙ্গার শাখা নদী ভাগীরথী বর্ধমান জেলার উত্তর-পূর্ব প্রান্তসীমা দিয়ে জেলার মধ্যে প্রবেশ করছে। জেলাটির পূর্বদিকের ভৌগোলিক সীমারেখা মোটামুটিভাবে এই নদীর দ্বারাই চিহ্নিত। কালনা শহরের কিছুটা দক্ষিণে (নবদ্বীপের কাছের কিছু অংশ বাদ দিলে) এই নদী বর্ধমান থেকে ভাগীরথীতে এসে মিশেছে জলঙ্গী নদী; এখান থেকে ভাগীরথী নদীর দক্ষিণাংশে হুগলী নদী নামে পরিচিত।

বর্ধমান জেলায় প্রবাহিত ভাগীরথীর গতিপথে নিম্ন গতিতে প্রবাহিত নদীর প্রায় সমস্ত বৈশিষ্ট্যই লক্ষ্য করা যায়। মূলত ঃ নদীর জলে পলির পরিমাণ অত্যন্ত বৃদ্ধি , ভূমির খুব সর্পিল গতিতে প্রবাহিত হচ্ছে। নদীটির আরেকটি বৈশিষ্ট্য এর বারবার গতিপথের পরিবর্তন। প্রাচীন মানচিত্রগুলোর সাথে বর্তমান কালের মানচিত্রের তুলনা করলে আমাদের সামনে এই তথ্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একাধিকবার গতি পরিবর্তনের ফলে জেলার পূর্ব দিকে বহু অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ, জলাভূমি, ছোট বড় বিল নদীর উত্তল বাঁকে নতুন নতুন কৃষিজমি এবং জনপদের সৃষ্টি হয়েছে। অন্য দিকে অবতল বাঁকে গড়ে ওঠা শহর গ্রাম এবং কৃষিভূমি তলিয়ে গেছে জলের তলায় । ভাগীরথীর গতিপথের পরিবর্তন এবং এর সাথে পার্শ্ববর্তী শহর ও কৃষিভূমির গঠন ও ধ্বংস সুস্পষ্টভাবে চোখে পড়ে দুটি প্রাচীন নক্সা থেকে। সপ্তদশ শতাব্দীতে আঁকা ফ্যান-ডেন-ব্রোকের নক্সায় দেখা যায় নবদ্বীপ শহরটি ভাগীরথীর পূর্ব তীরে অবস্থিত অন্যদিকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে আঁকা রেনলের নক্সায় যে দামোদরের স্রোত সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত পূর্বাভিমুখী ছিল। বেহুলা বা সরস্বতী নদীর বর্তমান খাতে দামোদর সরাসরি প্রবাহিত হত এবং কালনার কাছাকাছি কোন স্থানে হুগলী নদীতে মিশত। গত তিন শতাব্দীতে দামোদর ক্রমশ দিক পরিবর্তন করে দক্ষিণাভিমুখী হয়েছে। বর্ধমান - কালনা ও কলকাতা ত্রিভূজের মধ্যবর্তী স্থানের অসংখ্য মজে যাওয়া খাল (যেগুলো স্থানীয়ভাবে কানা নদী নামে পরিচিত) দামোদর নদের গতিপথের এই ক্রম পরিবর্তনের সাপেক্ষে সাক্ষ্য দেয়। মজে যাওয়া কানা নদীগুলোর উৎপত্তির বিষয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন মত প্রকাশ করেছিলেন William Willcocks । তিনি ভাগীরথীর মত এই কানা নদীগুলোকেও সেচের উদ্দেশ্যে খনন করা হয়েছিল বলে মত প্রকাশ করেছিলেন, ওই মতও বর্তমানে ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে।

এবার দেখা যাক দামোদরের এই গতি পথের পরিবর্তনের কারণ কি ? ছোটনাগপুর

মালভূমির বন্ধুর ঢালযুক্ত পথে জল পরিবহনের পর পশ্চিমবঙ্গের সমতল অঞ্চলে প্রবেশ নদীর ঢালের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটায়। এরফলে উচ্চগতিতে বয়ে আনা পলির বেশ বড় অংশ নদী আর বয়ে নিয়ে যেতে পারে না, ফলে নদীখাতে এবং দুপাশে পলি জমা হতে থাকে। দামোদরের ক্ষেত্রে কোন কোন স্থানে এই নদী মধ্যবর্তী পলি গঠিত চড়া কঠিন অবস্থায় পরিণত হয় এবং তার উপরে গাছপালা জন্মাতে এমনকি জনবসতি গড়ে উঠতে দেখা যায়। অনেকের মতে নদী খাতের ঢাল কমে গিয়ে নদী গর্ভে অত্যধিক পলির সঞ্চয়ই দামোদরের দক্ষিণাভিমুখে গতি পরিবর্তনের কারণ। তবে শুধুমাত্র পলি সঞ্চয় নদীর গতি পথকে পরিবর্তন করতে পারে বলে মনে হয় না। সেক্ষেত্রে পূর্বমুখী বেহুলা প্রভৃতি ছোট ছোট নদী পথে জল নিষ্কাশিত হওয়াটা স্বাভাবিক ছিল। এছাড়া দ্বারকেশ্বর , রূপনারায়ণ প্রভৃতি দক্ষিণ বঙ্গের নদীগুলোতেও এরূপ বাঁক লক্ষ্য করা যায়। নদী বিজ্ঞানী ডঃ সুপ্রিয় সেনগুপ্ত পশ্চিমবঙ্গের ভূ -গর্ভের কোনও ধীরগতি (Slow)অথচ দীর্ঘস্থায়ী (Prolonged) পরিবর্তনের সাথে নদীর এই গতিপথ পরিবর্তনের রহস্যটি জড়িত আছে বলে মত প্রকাশ করেছেন।

বর্ধমান জেলার ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে দিয়ে খুব বেশী দূর প্রবাহিত না হলেও বর্ধমানের মানুষের জীবন - জীবিকার সাথে দামোদরের বহুদিনের আত্মিক যোগ রয়েছে। অতীত থেকে আজ পর্যন্ত বহুবার দামোদরের বন্যা (J.C.K. Peterson -এর Bengal District Gazetteers - Burdwan অনুসারে ১৮২৩, ২৪, ২৬, ৩০, ৩৫, ৪০, ৪৮, ৫৬, ৫৯, ৬০, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৭০, ৭৭, ৮২, ৯০, ৯৮, ১৯০১, ০৭, ১৩, ১৬, ১৭, ২৩, ৩৫, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২ এবং ১৯৪৩ সালে বন্যা হয়েছিল দামোদর নদে) একদিকে যেমন জেলার বহু সম্পত্তি ও প্রাণ হানির কারণ ঘটিয়েছে অন্যদিকে এই বন্যাই আবার এই জেলার কৃষি ক্ষেত্রে বারবার নতুন পলি সঞ্চয় ঘটিয়ে উর্বর করে তুলেছে বিস্তীর্ণ সমতল ভূমিকে। দামোদরের বন্যাকে নিয়ন্ত্রণ করে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সমস্ত মানুষের স্বার্থে নদীকে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন এর মাধ্যমে একটি বহুমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ এবং তার বাস্তবায়ন করা হয়। এ বিষয়ে প্রবন্ধের জলসেচ অংশে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

অজয় ঃ বিহারের যশিডির পশ্চিমে মুঙ্গের জেলার জামুই পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়ে অজয় নদ চিত্তরঞ্জনের কিছুটা পশ্চিমে বর্ধমান জেলার উত্তর সীমা স্পর্শ করেছে। এরপর পূর্ব দিকে প্রায় ১২৮ কি.মি. প্রবাহিত হচ্ছে বীরভূম ও বর্ধমানের সীমানা নির্দেশ করে। কাটোয়া মহকুমার কেতুগ্রাম ১ এবং ২ নং ব্লক ছেড়ে দিলে অজয় নদই বর্ধমান জেলার উত্তরের সীমা। মঙ্গলকোট ব্লকের উত্তর সীমায় অজয় বর্ধমান জেলায় প্রবেশ করেছে এবং কাটোয়া শহরের কাছে ভাগীরথীর সাথে দেখা যায় শহরটির অবস্থান দেখানো হয়েছে নদীর পশ্চিম তীরে। ভাগীরথীর এই গতিপথ পরিবর্তনের সাক্ষ্য মঙ্গলকাব্যের বর্ণনা থেকেও পাওয়া যায়। বিপ্রদাস (১৯৪৫ খ্রীঃ) , মুকুন্দরাম (ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগ) প্রমুখ মঙ্গলকাব্যের রচয়িতারা ভাগীরথী নদী পথে বণিকদের সমুদ্রযাত্রায় বর্ণনা দিতে গিয়ে কাটোয়া, ইন্দ্রঘাট,

ইন্দ্রানী, দাঁইহাট, নবদ্বীপ, অম্বিকা-কালনা, পূর্বস্থলী, মির্জাপুর, সমুদ্রগড় প্রভৃতি স্থানের নাম উল্লেখ করেছেন। এইসব জায়গাগুলোর কিছু কিছু ভাগীরথীর পূর্বের খাতের উপরে অবস্থিত ছিল। পরবর্তীকালে ১৯৬৪-৬৫ সালে বিজ্ঞানী সুভাষরঞ্জন বসুর জরিপও ভাগীরথীর খাত পরিবর্তনের পক্ষেই সাক্ষ্য দেয়। ভাগীরথীর এইরূপ বারবার খাত পরিবর্তনের কারণ হল নদীতে অত্যধিক পলির সঞ্চয়। অতিরিক্ত পলির সঞ্চয় ভাগীরথীর উৎস স্থান গঙ্গার মূল খাত থেকে প্রায় কুড়ি ফুট উঁচু হয়ে গেছে এবং এর ফলেই গত প্রায় তিনশ বছর ধরে গঙ্গার জলপ্রবাহ মূলত পদ্মার খাত দিয়েই প্রবাহিত হচ্ছে বলে অধ্যাপক ডঃ সুপ্রিয় সেনগুপ্ত মত প্রকাশ করেছেন। এ প্রসঙ্গে William Willcocks তাঁর Ancient System of Irrigation in Bengal গ্রন্থে ভাগীরথীর উৎপত্তি সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তার উল্লেখ সংক্ষেপে করা যায়। Willcocks-এর মতে ভাগীরথী আসলে প্রাকৃতিক খাতে প্রবাহিত স্বাভাবিক জলধারা বা নদী নয়। এটি সেচের সুবিধার জন্য খনন করা খাল। এই ব্যাখ্যা হিন্দু পুরাণ কাহিনীতে বর্ণিত ভগীরথের গঙ্গা আনার ধারণার সঙ্গে কিছুটা মিলে যায়। আধুনিক নদী বিজ্ঞানীদের গবেষণা অবশ্য এই মতকে ভুল প্রমাণ করেছে।

বর্ধমান জেলার সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে ভাগীরথী নদীর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার এবং সংস্কৃত সাহিত্য সৃষ্টির মূল কেন্দ্রগুলো এই নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল এবং বর্ধমানের পূর্বাংশের সাংস্কৃতিক চরিত্রের পরিবর্তন ঘটাতে সাহায্য করেছিল। বর্ধমান জেলায় ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত কাটোয়া, দাঁইহাট এবং কালনা প্রাচীনকালে জেলার বন্দর রূপে পরিগণিত হতো। এইসব বন্দরের মাধ্যমে মূলতঃ লবণ, পাট এবং কাপড় প্রভৃতি দ্রব্যের ব্যবসা বাণিজ্য চলত। পরবর্তীকালে রেলপথের প্রসার এবং ভাগীরথীর নাব্যতা হ্রাসের ফলে জায়গাগুলো বন্দর হিসাবে তাদের গুরুত্ব হারায়। ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত কাটোয়াকে কেন্দ্র করে মারাঠা ও আফগানেরা অষ্টাদশ শতাব্দীতে জেলার পূর্বাঞ্চলে লুঠতরাজ করে ত্রাসের সঞ্চার করে। পরবর্তীকালে এই নদীর তীরেই মুর্শিদাবাদের পলাশীতে ইংরেজদের হাতে সিরাজের পরাজয় বাংলা তথা ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসকে আমূল বদলে দেয়।

দামোদর ঃ বিহারের ছোটনাগপুর মালভূমির পালামৌ টোডির কাছে খামারপোত গিরিশিখর (১,০৫০মি.) থেকে উৎপন্ন হয়ে প্রথমে বিহার পরে পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বর্ধমান ও হাওড়া জেলা পেরিয়ে ফলতার কাছে দামোদর নদ হুগলী নদীতে গিয়ে মিশেছে। বর্ধমান জেলার পশ্চিম দিকে বিহারের ধানবাদ জেলার সাথে সীমানা নির্দেশ করে প্রবাহিত হচ্ছে যথাক্রমে পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলার সাথে বর্ধমানের সীমানা রূপে। গলসী ২ নং ব্লক এবং খণ্ডঘোষ ব্লকের সীমানা নির্দেশ করে দামোদর নদ বর্ধমান জেলার মধ্যে প্রবেশ করেছে। এরপর সরাসরি পূর্ব দিকে বর্ধমান শহর পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে জেলা শহর থেকে প্রায় ২৪/২৫ কিলোমিটার পূর্বে দামোদর নদ হঠাৎ দক্ষিণ দিকে প্রায় সমকোণে বাঁক নিয়েছে । দক্ষিণবঙ্গের নদী মানচিত্র পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় এই

অঞ্চলের অন্য দুটি নদী দ্বারকেশ্বর এবং রূপনারায়ণ ও প্রায় একই রকমভাবে দক্ষিণে বাঁক নিয়েছে। জ্যাও-ডি-ব্যারোস, ভ্যান-ডেন-ব্রোক, রেনল প্রমুখের আঁকা মানচিত্রের কালানুক্রমিক বিচার-বিশ্লেষণ প্রমাণ করে মিলিত হয়েছে। অজয়ের প্রধান উপনদী কুনুর কাঁক্সা থানায় উৎপন্ন হয়ে মঙ্গলকোটের কাছে এই নদের সাথে মিলিত হয়েছে।

অজয় পুরোপুরি বর্ষার জলে পুষ্ট। বর্ষার সময় প্রবল জলোচ্ছ্বাস থাকলেও বছরের অন্যান্য সময় জলের অভাব থাকে। আগে বর্ষার সময় বহু ছোট ছোট স্রোতধারা এই নদের উদ্বৃত্ত জলের স্রোত বহন করত। এখন সেগুলো লুপ্ত হলেও জেলার উত্তরাংশে তাদের সাক্ষ্য হয়ে আছে বহু 'কাঁদর' বা বদ্ধ জলস্রোত। অতীতে এই নদ নৌ-পরিবহনযোগ্য ছিল। ধর্মমঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলে অজয়ের প্রবল প্রবাহের বর্ণনা আছে। ধনপতি ও শ্রীমন্ত অজয়ের জলে ডিঙা ভাসিয়ে সিংহল অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন। সমুদ্রযাত্রায় যাওয়ার উপযোগী নৌ-যানের পরিবহনযোগ্য না থাকলেও উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত অজয়নদের মাধ্যমে রাণীগঞ্জের কয়লা কলকাতায় আনা হতো। বর্তমানে অবশ্য এই নদ বছরের অধিকাংশ সময়ই পরিবহনযোগ্য থাকে না।

এই তিনটি প্রধান নদী ছাড়া বর্ধমান জেলার ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত অন্যান্য ছোট নদীগুলোর কথা সংক্ষেপে আলোচনা করা হল –

বাঁকা ঃ বর্তমান বাঁকা নদীর উৎপত্তি গলসী থানায়। বাঁকা পূর্বে দামোদরের শাখা নদী ছিল এরূপ ভৌগোলিক প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাথমিকভাবে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হওয়ার পর শক্তিগড়ের কাছে উত্তর-পূর্বে বাঁক নিয়ে বাঁকা সমুদ্রগড়ের দক্ষিণে ভাগীরথী -হুগলীর সাথে মিলেছে।

গাঙ্গুড়-বেহুলা ঃ জেলার দক্ষিণ পূর্বাংশের মধ্য দিয়ে অত্যন্ত আঁকাবাঁকা পথে নানা শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে প্রবাহিত হয়ে হুগলী জেলায় প্রবেশ করেছে এই নদী।

কানা ঃ দামোদরের খাত পরিবর্তনের ফলে জেলায় বেশ কয়েকটি মজে যাওয়া নদী বা কানা নদীর সৃষ্টি হয়েছে। এগুলির অধিকাংশেরই বেশিরভাগ সময় জলপ্রবাহ থাকে না।

খড়ি ঃ বুদবুদের কাছে উৎপন্ন হয়ে যথাক্রমে পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে এই নদী নাদনঘাটের কাছে বাঁকার সাথে মিলিত হয়ে সমুদ্রগড়ের দক্ষিণে ভাগীরথীতে গিয়ে মিশেছে।

বর্ধমান জেলার দক্ষিণে হুগলী জেলার সাথে প্রায় ১০/১২ কি.মি. সীমানা নির্দেশ করে প্রবাহিত হচ্ছে দক্ষিণবঙ্গের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নদী দ্বারকেশ্বর।

এছাড়া বর্ধমান জেলার উপর দিয়ে বিভিন্ন অংশে অন্যান্য কয়েকটি ছোট নদী প্রবাহিত

হচ্ছে। এগুলোর মধ্যে মুণ্ডেশ্বরী, দেবখাল, খড়গেশ্বরী, শিবা, খুদিয়া নুলিয়া,তমলা, বাবলা, সিঙ্গারন, খণ্ডেশ্বরী, চাঁদা, গৌরী, ইলসারা, ঘিয়া, হরিণখালি, কামাখ্যাখাল, সাইনী, পাঠানশালা, ভনওয়ার খাল, কামালের খাল, কাঁটাখাল উল্লেখযোগ্য।

শহর অথবা গ্রাম বর্ধমান জেলার একটি বৈশিষ্ট্য হল ছোট বড় জলাধারে জলসঞ্চয়, Peterson -এর District Gazetteers - এ উল্লেখ আছে বর্ধমানের গ্রামাঞ্চলের প্রায় প্রত্যেক পরিবারের একটি নিজস্ব পুকুর আছে। এই পুকুরগুলো প্রাত্যহিক পারিবারিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত হওয়ার সাথে সাথে স্থানীয়ভাবে কৃষিক্ষেত্রে জলসেচেও সাহায্য করে। গ্রামাঞ্চলের মত শহরেও জলাধার তৈরী করে জল সঞ্চয় করে রাখার রীতি বহুদিন ধরে চলে আসছে। এ প্রসঙ্গে বর্ধমান শহরের শ্যামসায়র, কৃষ্ণসায়র, রাণীসায়র প্রভৃতির উদাহরণ।

জলবায়ু

কর্কটক্রান্তি রেখা (২৩.৫° উঃ) জেলার উপর দিয়ে বিস্তৃত থাকায় এক কথায় বর্ধমানের জলবায়ুকে 'উষ্ণ-আর্দ্র মৌসুমী জলবায়ু' বলা যায়। জেলায় স্থান ভেদে বৃষ্টিপাত ও উষ্ণতার তারতম্য বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়। পূর্বাংশে শীত গ্রীষ্মের উষ্ণতার প্রসার কম অন্যদিকে পশ্চিমাংশে শীতের তাপমাত্রা বেশ কম (১৪° সে.) আবার গ্রীষ্মকালীন উষ্ণতা অত্যন্ত বেশি (৪২° সে.)। উষ্ণতা সর্বাধিক থাকে এপ্রিল - মে মাসে, আর ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাসে থাকে সর্বনিম্ন। (চিত্র - ৩, ৪) (ম্যাপ)

মোটামুটিভাবে এপ্রিল, মে, জুন এই তিনমাস বর্ধমানে গ্রীষ্মকাল থাকে। এই সময় জেলার পশ্চিমাংশের বিশেষ করে আসানসোল মহকুমায় তাপমাত্রা গড়ে ৩০° সে.-এর বেশী হয় না। এই সময়ে বঙ্গোপসাগরে স্থানীয়ভাবে সৃষ্ট নিম্নচাপের প্রভাবে জেলায় প্রায়ই বিকালের দিকে বজ্র বিদ্যুৎ সহ ঝড় বৃষ্টি (কালবৈশাখী) হতে দেখা যায়।

জুনের শেষদিকে বর্ধমান জেলায় মৌসুমী বায়ুর প্রবেশ ঘটে। মোটামুটিভাবে জুন থেকে অক্টোবর মাসের মধ্যেই জেলার ৯০ শতাংশ বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে (চিত্র নং - ১) বছরে গড়ে ১৫০০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাতকে জেলার স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত ধরা হয়। চিত্র নং - ২ -এ গত ১২ বছরে বর্ধমান জেলার বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ দেখানো হয়েছে। এই চিত্র থেকে বোঝা যায় জেলায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণের মাঝে মধ্যেই হেরফের হয়। মৌসুমী বায়ুর আসা যাওয়ার অনিশ্চয়তাই এর কারণ। জেলায় বৃষ্টিপাতের আঞ্চলিক তারতম্যও লক্ষণীয়। পূর্বাংশে গাঙ্গেয় উপত্যকায় গড় বৃষ্টিপাতের আঞ্চলিক তারতম্যও লক্ষণীয়। পূর্বাংশে গাঙ্গেয় উপত্যকায় গড় বৃষ্টিপাত যেখানে গড়ে ১৫০০ - ২০০০ মি.মি. পর্যন্ত সেখানে পশ্চিমাঞ্চলের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ গড়ে ১২০০ মি.মি. - ১৫০০ মি.মি.

চিত্র - ১ ঃ জেলার গড় মাসিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মিলিমিটারে)
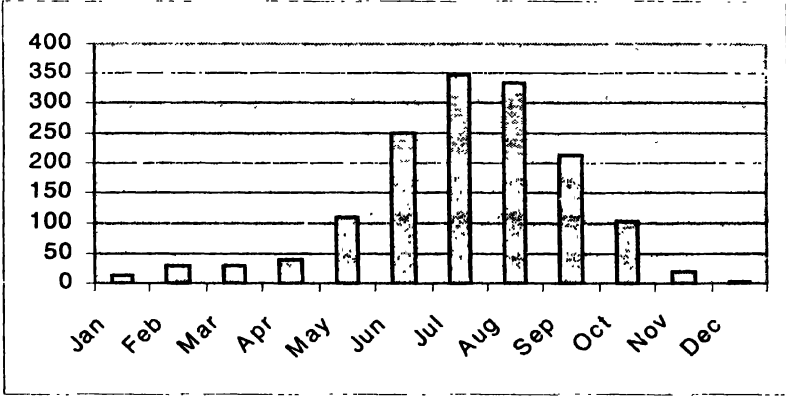
চিত্র - ২ ঃ ১৯৮৭ - ৯৮ পর্যন্ত জেলার মোট বাৎসরিক বৃষ্টিপাত (মিলিমিটারে)
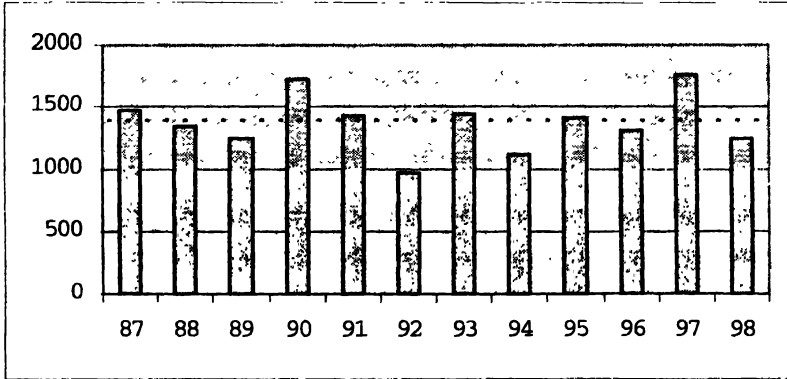
— — গড় স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত

(যান্ত্রিক কারণে লেখচিত্রগুলির সূচক বাংলায় দেওয়া গেল না)

সারণী - ১

বর্ধমান জেলার স্বাভাবিক গড় তাপমাত্রা (°সে.)		
মাস	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
জানুয়ারী	২৬.২	১২.৭
ফেব্রুয়ারী	২৯.৬	১৪.৯
মার্চ	৩৪.০	২০.১
এপ্রিল	৩৭.৫	২৪.৩
মে	৩৭.২	২৪.৮
জুন	৩৪.৮	২৬.১
জুলাই	৩২.০	২৫.৮
আগষ্ট	৩১.৯	২৫.৮
সেপ্টেম্বর	৩২.২	২৫.৭
অক্টোবর	৩১.৪	২৩.৭
নভেম্বর	২৮.৭	১৭.৪
ডিসেম্বর	২৬.২	১৩.৬

বর্ধমান জেলায় শীত স্বল্পস্থায়ী। মোটামুটি নভেম্বরের শেষ দিকে শুরু করে ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত বর্ধমান জেলায় শীত থাকে। শীতকালে সাধারণত বৃষ্টিপাত হয় না। শীতের প্রকোপ পশ্চিমাংশে বেশি, কোন কোন স্থানে তাপমাত্রা ১০°সে.-এর নীচেও নেমে যায়।

মাটি

স্বাভাবিক ভাবেই বর্ধমান জেলার সব জায়গায় একই রকম মাটি দেখা যায় না। জেলায় মূলত তিন ধরনের মাটি দেখা যায় - ক) পলি মাটি, খ) ল্যাটেরিটিক মাটি, এবং গ) লাল ও হলুদ মাটি।

ক) *পলি মাটি ঃ* জেলার পূর্ব দিকের কালনা, কাটোয়া এবং বর্ধমান সদর মহকুমার বেশ কিছু অংশে এই মাটি দেখা যায়। সঞ্চয়ের বয়স অনুসারে পলি মাটি গঠিত অঞ্চলকে আবার দুটি ভাগে ভাগ করা যায়।

অ) প্রাচীন পলি গঠিত অঞ্চল, এবং আ) নবীন পলি গঠিত অঞ্চল.

কেতুগ্রাম ১নং, মঙ্গলকোট, গলসী ১ ও ২ নং, এবং বর্ধমান সদর ব্লকের বেশ কিছু অংশে প্রাচীন পলিদ্বারা গঠিত। এই অংশের মাটির পলি মূলত অজয় ও দামোদর নদের দ্বারা সঞ্চিত। আগে প্রায় প্রতি বছর দামোদর নদের বন্যা বর্ধমানের বেশ কিছু অংশকে প্লাবিত করত এবং নতুন পলির সঞ্চয় ঘটাতো। বর্তমানে দামোদর উপত্যকা প্রকল্পের অধীনে বাঁধ নির্মাণের ফলে বাৎসরিক নতুন পলি সঞ্চয়ের পথ বন্ধ হয়ে গেছে। জেলার প্রায় সমগ্র পূর্বাঞ্চল জুড়ে রয়েছে নবীন পলি মাটি। মূলত ভাগীরথীর দ্বারা সঞ্চিত এই পলি মাটি অত্যন্ত উর্বর এবং উচ্চ জল ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন।
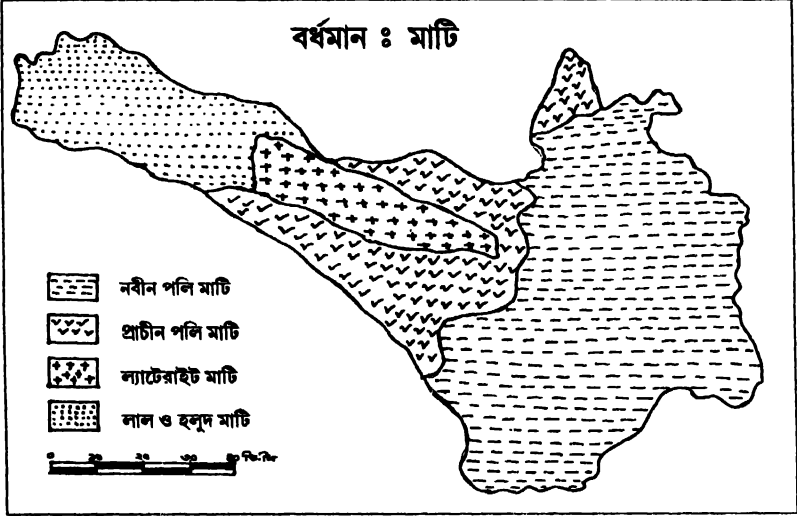
খ) *ল্যাটেরিটিক মাটি ঃ* জেলার দুর্গাপুর ও আউশগ্রাম ব্লকে ল্যাটেরিটিক মাটি দেখা যায়। এই মাটির রঙ লাল। মাটির স্তর খুব বেশী পুরু নয় সামান্য নীচেই ভূমি শিলার আস্তরণ চোখে পড়ে। মাটির দানা বেশ মোটা। ক্ষারের অংশ বেশী এবং জৈব পদার্থের পরিমাণ কম থাকাতে এই মাটি একেবারেই উর্বর নয়।

গ) *লাল ও হলুদ মাটি ঃ* জেলার পশ্চিমাংশে কুলটি, সালানপুর, বারাবণি, হীরাপুর, আসানসোল, জামুরিয়া ১ ও ২নং, রানীগঞ্জ, অণ্ডাল, ফরিদপুর প্রভৃতি ব্লকে ইঁটের মত লাল ও কাঁকরময় হলুদ মাটি দেখতে পাওয়া যায়। অঞ্চলটি মূলত প্রাচীন গ্রানাইট ও নাইস শিলায় গঠিত। এই মাটিতে জৈব পদার্থের এবং কাদার ভাগ কম তাই খুবই অনুর্বর। অনুর্বর মাটির জন্য নদী তীরবর্তী অঞ্চল ছাড়া অন্যত্র কৃষিকাজ ভাল হয় না। (ম্যাপ)

স্বাভাবিক উদ্ভিদ

বর্ধমান জেলার মোট ভৌগোলিক আয়তনের মধ্যে ২৩,৫৭৭.৬৬ হেক্টর জমিতে বনভূমি

রয়েছে। জেলার মোট ভূমির মাত্র ৩.৫ শতাংশ বনভূমি এবং মাথাপিছু বনের পরিমাণ ০.০০৫ হেক্টর।

বিভিন্ন অর্থনৈতিক কার্যকলাপ জেলাতে বনভূমির পরিমাণ কমিয়ে দিয়েছে। পশ্চিমাংশে খনিজ সম্পদ উত্তোলন ও কলকারখানার সম্প্রসারণ এবং পূর্বাংশে কৃষিকার্যের দ্রুত প্রসার বনভূমির পরিমাণকে কমিয়ে দিচ্ছে। এখনও জেলায় যেটুকু বনভূমি অবশিষ্ট আছে তা মূলত পশ্চিমাঞ্চলে দুর্গাপুর, আউসগ্রাম, ফরিদপুর এবং কাঁকসা থানায় সীমাবদ্ধ। এখানকার বনভূমিতে বিভিন্ন ধরণের ক্রান্তীয় পর্ণমোচী বৃক্ষ যেমন শাল, সেগুন, শিশু, খয়ের, অর্জুন, হরতুকী, বাবলা, শিমুল, মহুয়া প্রভৃতি দেখা যায়। পূর্বাংশে বনভূমি আকারে গাছপালা না থাকলেও গ্রামাঞ্চলে বিচ্ছিন্নভাবে বট, অশ্বত্থ, আম, জাম, কাঁঠাল, তাল খেজুর, বাবলা, সুপারি প্রভৃতি গাছ দেখতে পাওয়া যায়।

সারণী - ২

বর্ধমান জেলার মোট বনভূমির বন্টন (১৯৯৬ - ১৯৯৭)	
বনভূমির শ্রেণী	বনভূমির আয়তন (হেক্টরে)
১. সংরক্ষিত বনভূমি	২৫৪.৫৭
২. সুরক্ষিত বনভূমি	২০৪০৪.০০
৩. নির্দিষ্ট শ্রেণীভুক্ত নয় এরূপ বনভূমি	৪৭৬.৬৯
৪. খাস - বনভূমি	১০০.০৩
৫. অসামরিক দপ্তরের অধীনস্থ বনভূমি	২১২০.০১
৬. সমিতির মালিকানাধীন বনভূমি	০.৮২৩
৭. ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বনভূমি	২২০.৫৪
সর্বমোট	২৩৫৭৭.৬৬

বর্তমানে 'সামাজিক বনসৃজন' প্রকল্পে সরকারী উদ্যোগে রাস্তার ধারে, সেচ খাল ও নদীর পাড়ে , রেললাইনের ধারে অথবা কৃষি বা অন্যান্য কাজে অব্যবহৃত জমিতে বৃক্ষরোপণ করে বনজ সম্পদ বৃদ্ধির চেষ্টা করা হচ্ছে।

খনিজ সম্পদ

বর্ধমান জেলার প্রধান খনিজ সম্পদ কয়লা। ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম বাণিজ্যিকভাবে কয়লা উত্তোলন শুরু হয় এই জেলার রানীগঞ্জ অঞ্চলে। ১৭৭৪ সালে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কয়েকজন সরকারী কর্মচারীর উদ্যোগে বেসরকারীভাবে রানীগঞ্জ অঞ্চলে কয়লা

অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা শুরু হয়। সেই প্রচেষ্টা সার্থক রূপ পায় ১৮১৫ - ১৬ খৃষ্টাব্দে। মোটামুটিভাবে ১৮২০ সালে এই অঞ্চল থেকে বাণিজ্যিকভাবে কয়লা আহরণ শুরু হয়। বর্তমানে এই অঞ্চলের প্রায় ২০০ কয়লা খনির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি খনি হল রানীগঞ্জ, রামনগর, তাপসী, পারবেলিয়া, উখড়া, দিশেরগড়, সালানপুর, আসানসোল, চুরুলিয়া, জামুরিয়া প্রভৃতি। সমগ্র রানীগঞ্জ কয়লা ক্ষেত্রের আয়তন প্রায় ১০,০০০ বর্গ কিলোমিটার। নিম্ন গণ্ডোয়ানা যুগের পাথর এখানে সঞ্চিত হয়ে আছে। এই যুগের পাথরের মোট বেধ ৩২০০ মিটার। প্ল্যানিং কমিশনের অ্যাসেসমেন্ট কমিটির হিসাব মত এই কয়লাক্ষেত্রে সব জাতের কয়লার মোট মজুতের পরিমাণ প্রায় ১৯৩২ কোটি মেট্রিক টন। এই হিসাব ৬১০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত। তবে ভালো জাতের মাঝারি কোকিং কয়লার মজুত ৬৭৩ কোটি মেট্রিক টন। বর্ধমান জেলার এই কয়লা ক্ষেত্র থেকে সারা দেশের প্রায় ৩০ শতাংশ কয়লা উৎপাদন হয়ে থাকে।

কয়লা ছাড়া বর্ধমান জেলার রানীগঞ্জ অঞ্চলে কিছু পরিমানে তাপ সহ্য করার ক্ষমতা সম্পন্ন দুর্গল মাটি(fire clay)পাওয়া যায়। (ম্যাপ)

বর্ধমানের পূর্বাংশের বিস্তীর্ণ সমতলভূমিতে নানারূপ ফসলের বিপুল উৎপাদন ভারতের কৃষি মানচিত্রে বর্ধমান জেলাকে বিশিষ্ট স্থান দান করেছে। কৃষি ক্ষেত্রে বর্ধমান জেলার উন্নতির কারণগুলোকে সংক্ষেপে এইভাবে উল্লেখ করা যায় ঃ - ক) নদীবাহিত উর্বর পলিমাটি, খ) উপযুক্ত জলবায়ু(পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত ও প্রয়োজনীয় উত্তাপ) , গ) সঠিক সময়ে সঠিক মাত্রায় জলসেচ, ঘ) রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার , ঙ) উচ্চ ফলনশীল বীজের ব্যবহার, চ) কৃষিতে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার, ছ) জলা ও পতিত জমিতে কৃষিকাজ করে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ বৃদ্ধি, জ) কৃষক সম্প্রদায়ের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা, এবং ঝ) সরকারী চেষ্টায় ভূমিসংস্কার।

১৯৯৭ -'৯৮ সালে বর্ধমান জেলার মোট জমির মধ্যে ৪,৯৬,০৫৩ হেক্টর জমি কৃষিকার্যের অধীন ছিল। এই জমির পরিমাণ মোট জমির প্রায় ৭১.০২ শতাংশ, জেলার অর্ধেকের বেশী মানুষ কৃষি কাজে নিযুক্ত আছেন।

বর্ধমান জেলায় উৎপন্ন প্রধান ফসলগুলিকে প্রধানত পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায় ঃ খাদ্যশস্য, তৈলবীজ, তন্তু ফসল, ডাল জাতীয় শস্য ও অন্যান্য ফসল। খাদ্য শস্যের মধ্যে ধান, গম, কিছু পরিমাণে বার্লি ও ভুট্টা উল্লেখযোগ্য। তৈলবীজ হিসাবে জেলায় চাষ হয় মূলত সরষে ও তিসির। পাট ও মেস্তার চাষ হয় তন্তু ফসল রূপে। ডাল জাতীয় শস্য হিসাবে ছোলা কলাই এবং অন্যান্য ফসলের মধ্যে ইক্ষু, আলু, লঙ্কা ও আদার চাষ হয়। সময়ের হিসাবে বর্ধমানের কৃষি পঞ্জীকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় ঃ খরিফ, রবি ও গ্রীষ্মকালীন চাষের মরশুম।

জেলার প্রধান কৃষিজ ফসল ধান। মূলত আউশ , আমন, বোরো ধান চাষ হলেও এখন জেলার বিভিন্ন স্থানে নানারকম উন্নত উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান চাষ হয়। ধানের উৎপাদনও যথেষ্ট বেশী। ১৯৯৬ - '৯৭ সালে বর্ধমান জেলায় ১৭৪১.৪ হাজার টন ধান উৎপাদিত হয়। ১৯৯৬-'৯৭ সালের হিসাবে বর্ধমান জেলায় হেক্টর প্রতি ধানের উৎপাদন ছিল ২,৭৮১ কিলোগ্রাম; তুলনায় ঐ বৎসর পশ্চিমবাংলার ধান উৎপাদনের গড় হার ছিল হেক্টর প্রতি ২,১৭৯ হেক্টর। ধানের এই বিপুল উৎপাদন বর্ধমান জেলাকে সার্থক ভাবেই 'ভারতের ধান ভাণ্ডার' আখ্যা দিয়েছে।

মোট জমির হিসাবে ধানের পরেই আলুর স্থান। প্রায় ৪১.১ হেক্টর জমিতে আলু চাষ করা হয়। ১৯৯৬-'৯৭ সালে আলুর উৎপাদন ছিল ১,২৪৩.২ হাজার টন। ঐ বছর হেক্টর প্রতি আলুর উৎপাদন ছিল প্রায় ৩০,২৩৩ কিলোগ্রাম (পশ্চিমবঙ্গে ২৬,৯৫৬ কিলোগ্রাম /হেক্টর)

চিত্র - ৩ ঃ ১৯৯৬-৯৭ সালে বর্ধমান জেলার প্রধান শস্যগুলোর উৎপাদন (হাজার টনে)
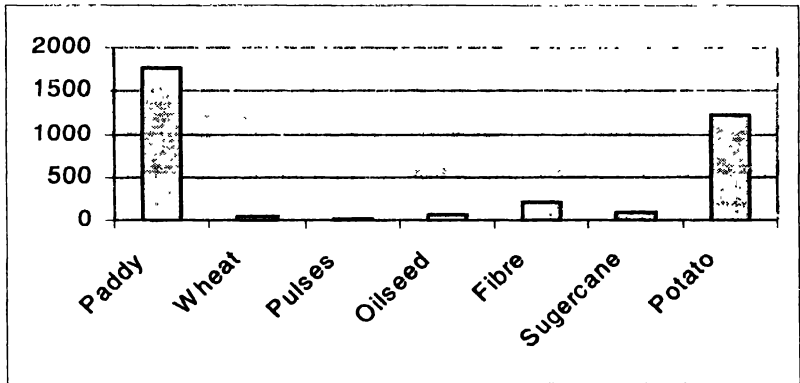
চিত্র - ৪ ঃ ১৯৯৬-৯৭ সালে বর্ধমান জেলার প্রধান ফসল চাষ হওয়া মোট জমির পরিমাণের অনুপাত
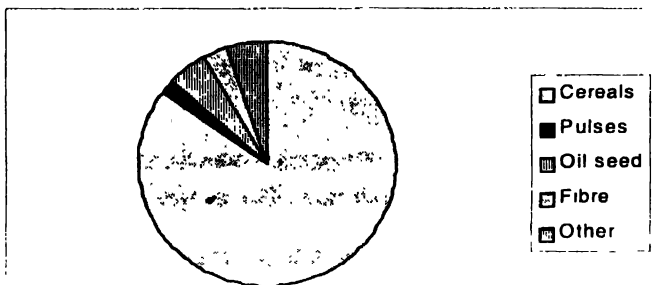
অন্যান্য অনেক ধরনের ফসল উৎপাদিত হলেও মোট জমির বিচারে কোনটিই খুব বেশী স্থান অধিকার করে না। চিত্র নং - ৩ এবং চিত্র নং - ৪ এ বর্ধমান জেলার প্রধান শস্য গুলোর উৎপাদন এবং জেলায় উৎপাদিত শস্যের জন্য মোট ব্যবহৃত জমির একটি রূপরেখা দেওয়া হল।

উৎপাদনের বিচারে বর্ধমান জেলা অত্যন্ত কৃষি সমৃদ্ধ হলেও বর্তমানে এই জেলার কৃষি বেশ কিছু গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন। সংক্ষেপে আমরা এই সমস্যাগুলির উপরে আলোকপাত করবো –

১) অপরিকল্পিতভাবে শস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন রকম বৈচিত্র্য না দেখানোয় বর্তমানে বর্ধমান জেলার কৃষির প্রধান সমস্যা রূপে দেখা দিয়েছে একই শস্যের অতিরিক্ত উৎপাদন এবং এর ফলে ঐ শস্যের বিক্রী অথবা সংরক্ষণের সমস্যা। ধানের উৎপাদন ব্যাপক ভাবে বাড়লেও ঐ ধান / চাল বিক্রির ব্যাপারে গত দু-তিন বছরে কৃষকেরা ব্যাপক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। অবশ্য শুধুমাত্র অতিরিক্ত উৎপাদনই এই সংকটের কারণ নয়। বেশ কিছু প্রতিবেশী দেশ এবং রাজ্য থেকে খোলা বাজারে চাল বিক্রির জন্য চলে আসাতে এবং ঐ চালের দাম জেলায় উৎপন্ন চালের দামের তুলনায় কম হওয়াতে এই সংকট বেশি তীব্র হয়ে দেখা দেয়। (থাইল্যান্ড, পাকিস্তান সহ বাইরের বেশ কিছু দেশ ও প্রতিবেশী পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ , অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে ভাল গুণমানের ও কম দামের ধান গোটা বর্ধমানের ধানের বাজার দখল করে নেওয়ায় বর্ধমানের চাষী ও ধান মালিকেরা ঘোর সংকটে পড়েছে – আজকাল (০৬.০৩.২০০০)।

আলু চাষের ক্ষেত্রেও প্রায় একই সমস্যা গত কয়েক বছরে তৈরী হয়েছে। প্রয়োজনের তুলনায় হিমঘরের সংখ্যা কম থাকায় ও বিদ্যুৎ সরবরাহ উপযুক্ত না থাকায় প্রচুর আলু প্রতি বছর পচে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

২) জলসেচ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নতি জেলায় বেশ কিছু ক্ষেত্রে গুরুতর বিপর্যয় ডেকে এনেছে। এগুলোর মধ্যে ঃ ক) ভৌম জলস্তরের অবনমন খ) জল নিষ্কাশনের সমস্যা ও গ) জলে আর্সেনিকের পরিমাণ বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করা যায়।

৩) অবৈজ্ঞানিকভাবে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ছাড়াই ব্যাপকভাবে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের প্রয়োগ মাটি ও জল দূষণের কারণ হিসাবে দেখা দিয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে খাদ্য শৃঙ্খলের উপরে অযাচিত কু-প্রভাব বিস্তার করেছে।

৪) উচ্চ ফলনশীল শস্য বীজের প্রবর্তন জেলার ফসল উৎপাদনকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে সন্দেহ নেই সেই সঙ্গে জীব বৈচিত্র্যের সঠিক ধারাকে ব্যাহত করেছে।

সমস্যাগুলির সমাধানের ক্ষেত্রে সঠিক বৈচিত্র্যপূর্ণ শস্য নির্বাচন, কৃষকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, কৃষি ছাড়া অন্য জীবিকাতে গ্রামের মানুষকে উৎসাহিত করা, কৃষিজাত

শস্যগুলোকে কোন কুটির শিল্পের মাধ্যমে রূপান্তর ঘটিয়ে আকর্ষনীয়ভাবে বাজার জাত করা প্রভৃতি পন্থার সাহায্য নেওয়া যেতে পারে বলে মনে হয়।

জলসেচ

বর্ধমান জেলার জলসেচ ব্যবস্থা আক্ষরিক অর্থেই অত্যন্ত উন্নত। খারিফ মরশুমে জেলার মোট কৃষি জমির ৭৫ শতাংশ রবি মরশুমে ৪০ শতাংশ এবং গ্রীষ্মে ৩০ শতাংশ জমি জলসেচের আওতায় আসে। পশ্চিমবঙ্গের অন্য জেলাগুলোর কিংবা ভারতের অন্য রাজ্যের জেলা সমূহের তুলনায় এই পরিসংখ্যান যথেষ্ট ঈর্ষনীয়।

দামোদরের উপর বহুমুখী নদী পরিকল্পনা বর্ধমানের জলসেচ ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক উন্নতি ঘটিয়েছে এ নিয়ে কোন সন্দেহ নেই। এক সময় "বর্ধমানের হোয়াং হো" ছিল দামোদর। বন্যার প্রাদুর্ভাব জেলার মানুষের জীবনযাত্রাকে দুর্বিসহ করে তুলেছিল। ১৯৪৩ - এর বন্যার পর তখনকার বাংলা সরকার "দামোদর বন্যা অনুসন্ধান কমিটি" নিযুক্ত করেন। এই কমিটির সদস্যদের মধ্যে ছিলেন বিজ্ঞানী ডঃ মেঘনাদ সাহা ও ঔদক বিজ্ঞানী ডঃ নলিনীকান্ত বোস। এঁরা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসি পরিকল্পনার অনুকরণে দামোদর নদী উপত্যকা পরিকল্পনার প্রস্তাব দেন। মূলত এই প্রস্তাবের ভিত্তিতেই ১৯৪৬ সালে টেনেসি পরিকল্পনার বিশেষজ্ঞ W.L.Voorduin-কে পরামর্শদাতা নিযুক্ত করে দামোদর পরিকল্পনার জন্ম হয়। ১৯৪৮ -এ পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর সক্রিয় উদ্যোগে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন (D.V.C.)-এর কাজ শুরু হয়। ১৯৫৯ - এর মধ্যেই এই বহুমুখী নদী পরিকল্পনার অধীনে চারটি বড় বাঁধ (মাইথন, পাঞ্চেৎ, তিলাইয়া, কোনার) নির্মাণের কাজ শেষ হয়ে যায়। এই পরিকল্পনার রূপায়ণ বর্ধমান জেলার সামগ্রিক উন্নতির ক্ষেত্রে অর্থবহ ভূমিকা নেয়। দামোদরের ভয়ঙ্কর বন্যার হাত থেকে জেলা রক্ষা পায়। সুষ্ঠজলসেচ ব্যবস্থা একফসলী জমিতে দো-ফসলী এবং দো-ফসলী জমিকে তিন ফসলী জমিতে পরিণত করে। অবশ্য এই পরিকল্পনা জেলায় বেশ কিছু সমস্যারও জন্ম দেয় যেমন প্রায় প্রতি বছর নতুন পলির সঞ্চয়ে উর্বরতর হওয়ার সুযোগ থেকে কৃষিক্ষেত্রগুলো বঞ্চিত হতে থাকে। নদীর বিধ্বংসী চরিত্র বিনষ্ট হওয়ায় জনবসতি ও অর্থনৈতিক কার্যকলাপ নদী-তীরবর্তী অঞ্চলে বাড়তে থাকে ফলে নদীর চারপাশে ব্যাপক ভূমিক্ষয় ঘটায় এবং নদী গর্ভে বিপুল পলির সঞ্চয় ঘটিয়ে নদীকে ক্ষীণধারা করে দেয়। ডি.ভি.সি. প্রকল্পের কাজ, প্রভাব কিংবা গুণাগুণ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন, এখানে সংক্ষিপ্তভাবে শুধুমাত্র মূল বিষয়টির উপর আলোকপাত করা হল।

বিভিন্ন মরশুমে বর্ধমান জেলার সেচ -উৎস সমূহ এবং সেচ আওতাধীন ভূমির পরিমাণ সারণী -৩ এ দেখানো হল -

সারণী - ৩

সেচের উৎস	সংখ্যা	জমির পরিমাণ ০০০ হেক্টরে			
		খারিফ	রবি	গ্রীষ্মকালীন	মোট
সেচখাল প্রকল্প (দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন ও ময়ূরাক্ষী নদী প্রকল্প)	২	২৫০	১০	৩৫	২৯৫
গভীর নলকূপ	৫০৮	১১	০৮	০৬	২৫
নদী থেকে উত্তোলন	২৩৬	১১	০৬	০৬	২৩
অগভীর নলকূপ ও সাবমার্শিবল পাম্প	৩১৯৭০	৫০	৮৪	৬৩	১৯৭
পুকুর ও অন্যান্য		৩০	৯৯	৪০	১৬৯

শিল্প

কৃষির মত শিল্পেও বর্ধমান যথেষ্ট অগ্রসর। জেলার শিল্প কেন্দ্রগুলির অবস্থান লক্ষ্য করলে (মানচিত্র - ৪) আমরা দেখবো অধিকাংশ শিল্প কেন্দ্রগুলি জেলার পশ্চিমাংশে অবস্থিত। এই জেলায় গড়ে ওঠা শিল্প ও শিল্প কেন্দ্রগুলি নিম্নরূপ ঃ

শিল্পের নাম	শিল্প কেন্দ্র
লৌহ ইস্পাত শিল্প	দুর্গাপুর, বার্ণপুর, কুলটি
রেল ইঞ্জিন নির্মাণ শিল্প	চিত্তরঞ্জন
টেলিফোনের তার নির্মাণ শিল্প	রূপনারায়ণপুর
রাসায়নিক শিল্প	দুর্গাপুর
অ্যালুমিনিয়াম শিল্প	আসানসোল
সাইকেল তৈরী	আসানসোল
কাগজ শিল্প	রানীগঞ্জ
মালগাড়ীর কামরা তৈরী	বার্ণপুর
পাইপ নির্মাণ শিল্প	কুলটি
সিমেন্ট শিল্প	দুর্গাপুর
সার শিল্প	দুর্গাপুর
অন্যান্য ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প	চিত্তরঞ্জন, দুর্গাপুর, বার্ণপুর, কুলটি, আসানসোল, বর্ধমান।
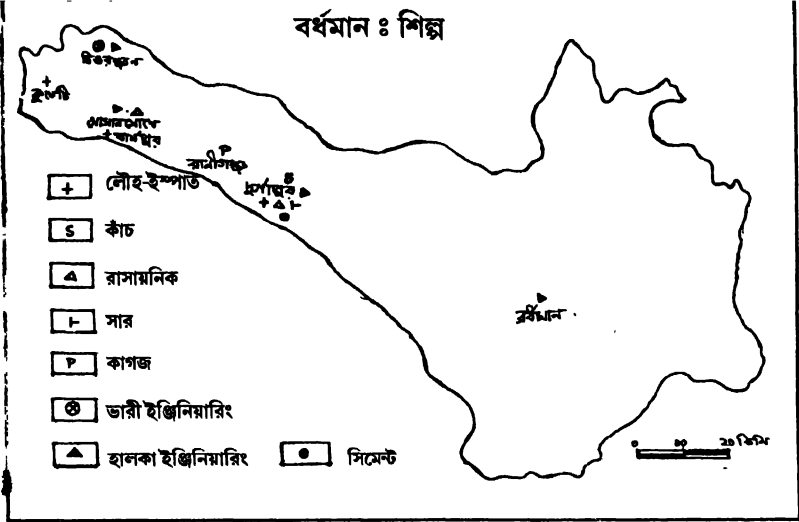
জেলার পশ্চিমাঞ্চলে চিত্তরঞ্জন, আসানসোল, রানীগঞ্জ এবং দুর্গাপুর শহর চারটিকে নিয়ে গড়ে ওঠা শিল্পাঞ্চলে শিল্পগুলির একদেশীভবনের প্রধান কারণগুলি হল ঃ ক) খনিজ সম্পদ হিসাবে স্থানীয় কয়লা ও তাপসহনক্ষম দুর্গল মাটির পর্যাপ্ত যোগান, খ) পার্শ্ববর্তী রাজ্য বিহার থেকে অন্যান্য খনিজ সম্পদের (লৌহ-আকরিক, ম্যাঙ্গানিজ, চুনাপাথর, তামা, বক্সাইট প্রভৃতি) সহজলভ্যতা, গ) পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সমৃদ্ধ বনজ সম্পদ, ঘ) দামোদর নদের জল, ঙ) দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার জলবিদ্যুৎ ও নিকটবর্তী তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো থেকে শক্তি সম্পদের যোগান, চ) কলকাতা ও হলদিয়া বন্দরের সাথে সুন্দর সড়ক ও রেল যোগাযোগ, এবং ছ) ভারতের পূর্বাঞ্চল সহ সমগ্র দেশে উৎপন্ন শিল্প সামগ্রীর ব্যাপক চাহিদা প্রভৃতি।

তবে বর্তমানে বিভিন্ন কারণে জেলার সবচেয়ে বড় শিল্প শহর দুর্গাপুর কিছুটা সংকটের মধ্যে রয়েছে। মূলত রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প সংস্থাগুলো অলাভজনক হয়ে যাওয়ায় সরকার সেগুলো বন্ধ করে দিতে বাধ্য হচ্ছেন। ফলে দুর্গাপুর শহরের শিল্পোৎপাদন ব্যাপকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। (ম্যাপ)

যোগাযোগ

যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রধান মাধ্যম হিসাবে জেলায় রেল ও সড়কপথ এবং আংশিকভাবে জলপথ ও বিমানপথ ব্যবহৃত হয়। পূর্ব রেলের চারটি (পূর্ব রেলপথের প্রধান শাখা, হাওড়া - বর্ধমান কর্ড, হাওড়া - বার হাড়োয়া, হাওড়া - কিউল) এবং দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের একটি শাখা (আসানসোল - আদ্রা) বর্ধমান জেলার মধ্যে দিয়ে গেছে। এছাড়া জেলায় রয়েছে অণ্ডাল - সাঁইথিয়া, অণ্ডাল - সীতরামপুর, অণ্ডাল -গৌরাঙ্গডি এবং ন্যারো গেজের

বর্ধমান - কাটোয়া রেলপথ।

শেরশাহের তৈরী (১৫৩৯–৪০) গ্রাণ্ড-ট্রাঙ্ক রোড বর্ধমান জেলার মধ্যে দিয়ে ১৫৮ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করেছে। জেলার মোট সড়ক পথের দৈর্ঘ্য সংক্রান্ত পরিসংখ্যান ৪ ও ৫ নং সারণীতে দেখানো হল ঃ

সারণী - ৪

পি.ডব্লিউ.ডি. এবং স্থানীয় প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে থাকা সড়কপথ গুলির দৈর্ঘ্য (১৯৯৬-৯৭) দৈর্ঘ্য কি.মি.তে)								
পি.ডব্লিউ.ডি.			স্থানীয় প্রশাসন			মোট		
সমতল	অসমতল	মোট	সমতল	অসমতল	মোট	সমতল	অসমতল	মোট
১৯৩০	৯	১৯৩৯	৩৯০	১৫০৫	১৮৯৫	২৩২০	১৫১৪	৩৮৩৪

সারণী - ৫

P.W.D.-র তত্ত্বাবধানে থাকা জেলার বিভিন্ন প্রকার রাস্তার দৈর্ঘ্য(১৯৯৬-৯৭)দৈর্ঘ্য কি.মি-তে				
জাতীয় সড়ক	রাজ্য সড়ক	জেলা সড়ক	গ্রাম সড়ক	মোট
১৫৯	৩১৫	৭২৪	৭৩৭	১৯৩৯

ভাগীরথী ও খড়ি নদী ছোট ও মাঝারি নৌ-পরিবহন যোগ্য থাকে। দামোদর ও অজয় নদীতে জল থাকলে স্থানীয় ভাবে নৌকা চালানো যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সামরিক প্রয়োজনে জেলায় চারটি বিমানক্ষেত্র নির্মিত হয়। বর্তমানে শুধু আসানসোলের নিঙ্গাঁতে মালবাহী ও পানাগড়ের কাছে বিরুতিহাতে বিশেষ যাত্রীবাহী বিমান অবতরণ করে।

জণবসতি

১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুসারে বর্ধমান জেলার মোট জনসংখ্যা ষাট লক্ষ পঞ্চাশ হাজার দুশ পাঁচ জন। ১৯০১ থেকে ১৯৯১ সালের আদমশুমারি পর্যন্ত জেলার মোট জনসংখ্যার বিচার করলে দেখা যায় শুধুমাত্র ১৯১১ থেকে ১৯২১ এই দশ বছরে জেলাতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি না পেয়ে কিছুটা কমেছিল। বাকি সময়ে জনসংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি পেয়েছে।

(চিত্র নং - ৫)

১৯০১ – ১৯৯১ জেলার মোট জনসংখ্যার বৃদ্ধি
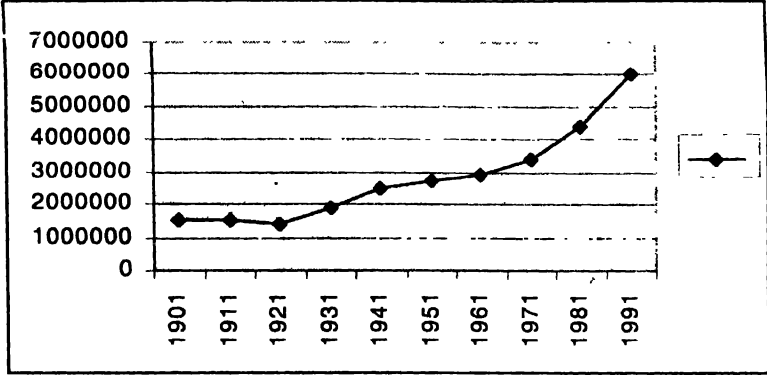
জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বেড়েছে জেলার জনঘনত্ব। ১৯৯১ - এর জনগণনা অনুযায়ী বর্ধমানের জনঘনত্ব ছিল প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৮৬১ জন। গত দশটি আদমশুমারিতে জেলার জনঘনত্বের হেরফের ৬ নং সারণীতে দেখানো হল ঃ

সারণী - ৬

১৯০১ - ৯১ জেলার জনঘনত্বের বৃদ্ধি	
সাল	প্রতি বর্গ কি. মি. তে জন ঘনত্ব
১৯০১	২১৭
১৯১১	২১৮
১৯২১	২০৪
১৯৩১	২২৪
১৯৪১	২৬৯
১৯৫১	৩১২
১৯৬১	৪৩৭
১৯৭১	৫৫৭
১৯৮১	৬৮৮
১৯৯১	৮৬১

এই সারণী পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায় জনসংখ্যার মত জনঘনত্বও ধীরে ধীরে বেড়েছে। ১৯৯১ এর জনঘনত্ব গোটা পশ্চিমবঙ্গের জনঘনত্বের (৭৬৬ জন / বর্গ কি.মি.তে) তুলনায় বেশি। মূলত কৃ-ষি ও শিল্পের প্রভুত উন্নতিতে জীবিকা অর্জনের সুবিধাই জেলার জনঘনত্বকে বাড়িয়ে দিয়েছে। অবশ্য জনসংখ্যার ঘনত্ব জেলার সর্বত্র স্বাভাবিকভাবেই এক রকম নয়।

চিত্র - ৬ ঃ গ্রাম ও শহরের জনঘনত্বের অনুপাত (১৯২১ - ১৯৯১)
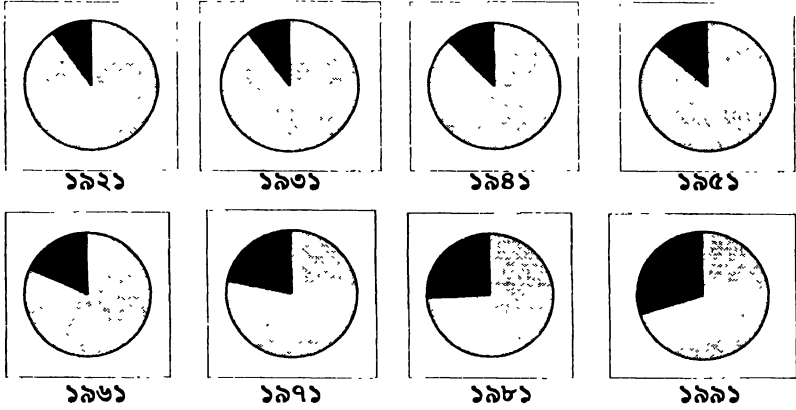
জেলার জনসংখ্যার পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আমাদের সামনে আসে সেটি হল গ্রাম ও শহরাঞ্চলে বসবাসকারী জনবসতির অনুপাতের পরিবর্তন (চিত্র নং - ৬) দেখা যাচ্ছে প্রতি দশ বছর পর পরই প্রায় নিয়মিতভাবে গ্রামে বসবাসকারী মানুষের অনুপাত কমে যাচ্ছে। অর্থাৎ জেলার গ্রামাঞ্চলের মানুষের শহরে বাস করার প্রবণতা বাড়ছে। এই প্রবণতার কারণ হিসাবে আমরা গ্রামাঞ্চলের উদ্বৃত্ত কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং শহরাঞ্চলের অপেক্ষাকৃত উন্নত জীবনযাত্রার মানের কথা বলতে পারি।

সারণী - ৭

১৯০১- ১৯৯১ বর্ধমান জেলার জনসংখ্যার বৃদ্ধি এবং স্ত্রী-পুরুষ অনুপাত

সাল	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী	প্রতি ১০০ জন পুরুষে নারীর সংখ্যা
১৯০১	১৫২৮২৯০	৭৬২৬৯৪	৭৬৫৫৯৬	১০০
১৯১১	১৫৩৩৮৭৪	৭৬৮১৩২	৭৬৫৭৪২	১০০
১৯২১	১৪৩৪৭৭১	৭৩০৩১৭	৭০৪৪৫৪	৯৬
১৯৩১	১৫৭৫৬৯৯	৮১৪৮৯১	৭৬০৮০৮	৯৩
১৯৪১	১৮৯০৭৩২	৯৯৮৮২৫	৮৯১৯০৭	৮৯
১৯৫১	২১৯১৬৬৭	১১৬০৭৬১	১০৩০৯০৬	৮৯
১৯৬১	৩০৮২৮৪৬	১৬৫৮৯৭৬	১৪২৩৮৭০	৮৬
১৯৭১	৩৯১৬১৭৪	২০৭৬২১০	১৮৩৯৯৬৪	৮৯
১৯৮১	৪৮৩৫৩৮৮	২৫৪৮৬০৩	২২৮৬৭৮৫	৯০
১৯৯১	৬০৫০৬০৫	৩১৮৬৮৩৩	২৮৬৩৭৭২	৯০

জনসংখ্যা পরিসংখ্যানের আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক হল নারী-পুরুষের অনুপাত। স্ত্রী ও পুরুষের সংখ্যার সামঞ্জস্য না থাকলে সামাজিক অগ্রগতি ব্যাহত হয়। আমরা গত দশটি লোকগণনাতে ১০০ জন পুরুষ প্রতি জেলার মহিলাদের সংখ্যার পরিসংখ্যান (সারণী-৭) পর্যবেক্ষণ করে দেখতে পাচ্ছি যে এই ৯০ বছরে জেলার স্ত্রী-পুরুষ অনুপাতের খুব বেশী হেরফের হয়নি।

বর্তমানে বর্ধমান জেলার ৩৫.০৯ শতাংশ মানুষ শহরাঞ্চলে বসবাস করেন। জেলার শহর গুলোর জনসংখ্যা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এখানে মোট ৩০ টি এমন শহর রয়েছে যেখানে ১০,০০০-এর বেশী মানুষ বসবাস করেন। এই শহরগুলির মধ্যে ১৪ টি আসানসোল মহকুমায়, ১০টি দুর্গাপুর মহকুমায়, বর্ধমান সদর কাটোয়া এবং কালনা মহকুমায় যথাক্রমে ৩ টি, ২টি, ও ১ টি করে অবস্থিত ।

জেলায় এক লক্ষের বেশি জনসংখ্যা সমন্বিত শহর মাত্র পাঁচটি, এগুলি হল দুর্গাপুর,আসানসোল, বর্ধমান, বার্ণপুর এবং কুলটি ও বরাকর। শহরগুলির মধ্যে জেলা শহর বর্ধমানকে বাদ দিলে অন্য সব শহরই শিল্প অথবা খনি ভিত্তিক। দুর্গাপুর এখনও জেলার সর্বাধিক জনসংখ্যা যুক্ত শহর হলেও বর্তমানে এলাকার প্রধান শিল্পগুলির মধ্যে বেশ কিছুর অবস্থার অবনতি হওয়াতে লোকসংখ্যা ক্রমশই কমে যাচ্ছে।

জেলার পশ্চিমাংশের তুলনায় পূর্বাংশে শহরের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কম। শহরের অবস্থানের এই অসম বন্টন জেলার দুটি অংশে বসবাসকারী মানুষের উপজীবিকার পার্থক্যের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। পূর্বাংশের মাটি, জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি কৃষির উপযোগী হওয়াতে এখানে কৃষিভিত্তিক গ্রাম গড়ে উঠেছে। তুলনায় পশ্চিমদিকে খনি ও শিল্পকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে ছোট বড় অনেকগুলি শহর। তবে একথা অনস্বীকার্য যে পশ্চিমাংশে গড়ে ওঠা ছোট ছোট শহরগুলোর তুলনায় পূর্বাংশের কৃষি ভিত্তিক গ্রামগুলো অনেক ক্ষেত্রেই বেশি জনবহুল এবং সব দিক থেকে বেশি সমৃদ্ধ।

জেলার গ্রামাঞ্চলে ও শহরের মানুষের পেশা ভিত্তিক বিভাগ লক্ষ্য করলে (চিত্র - ৭) কয়েকটি বিষয় সামনে আসে। যেমন -

ক) গ্রামাঞ্চলে কৃষি - নির্ভর জনগোষ্ঠীর আধিক্য ।

খ) অন্যান্য কার্যে নিযুক্ত (যার মধ্যে কলকারখানার , অফিস , আদালত, শিক্ষক, ডাক্তার, উকিল প্রভৃতি পেশার মানুষ অন্তর্ভুক্ত) মানুষের সংখ্যা গ্রামের তুলনায় শহরে বেশী।

গ) পেশা ভিত্তিক বিভাগের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ ভেদ বিচার করলে দেখা যাচ্ছে জেলায় কোন কাজে নিযুক্ত নয় এমন নারীদের সংখ্যা।

সারণী- ৮

বর্ধমান জেলার প্রধান শহর এবং তার জনসংখ্যা (১৯৯১)

মহকুমা/শহরের নাম	লোকসংখ্যা	মহকুমা/শহরের নাম	লোকসংখ্যা
আসানসোল		কোনার ডিহি	১১,৫৪৩
কেন্দা	১২,৮৭২	কাজরা	১৮,৮৩২
শ্রীপুর	১৭,৫৬৭	অণ্ডাল	১৬,২৮৮
নিনগা	১২,৫৬৯	খান্দরা	১৫,৯৩৯
জামুরিয়া	১২,৫৬৯	উখরা	১৮,৪২৪
চিত্তরঞ্জন	৪৭,১৮৬	চকবানকোলা	১১,৫১৬
হিন্দুস্থান কেবল	১৬,৭৩৯	চোরা	১২,০০২
জেমারি	১২,৬০৯	বহুলা	১৪,৪৯১
সিয়ারসোল	২০,৩৫৫	দুর্গাপুর	৪,২৫,৮৩৬
কুলটি-বরাকর	১,০৮,৫১৮	**বর্ধমান সদর**	
আসানসোল	২,৬২,১৮৮	গুসকরা	২৬,৯৯৫
রাণীগঞ্জ	৬১,৯৯৭	মেমারী	২০,৬৯০
নিয়ামতপুর	৫৪,৯৩০	বর্ধমান	২,৪৫,০৭৯
দিশের গড়	৮৬,৮৩২	**কাটোয়া**	
বার্ণপুর	১,৭৪,৯৩৩	কাটোয়া	৫৫,৫৪১
দুর্গাপুর		দাঁইহাট	২০,৩৪৯
দলুর বাঁধ	১০,৩৭২	**কালনা**	
		কালনা	৪৭,২২৯

পুরুষদের তুলনায় বেশি, স্বভাবতই গৃহকর্মে নিযুক্ত বহু সংখ্যক নারীদের 'কর্মহীন' বলে ধরেছেন আদমশুমারী কর্তৃপক্ষ।

চিত্র - ৭ ঃ বর্ধমান জেলার গ্রাম এবং শহরে জনসংখ্যার পেশা ভিত্তিক বিভাগ (১৯৯১)
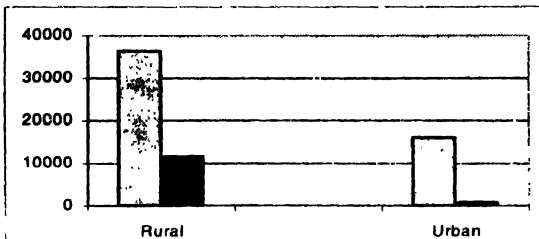
500000
400000
300000
200000
100000
0
Rural
Urban
কৃষি শ্রমিক
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
Rural
Urban
ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক
500000
400000
300000
200000
100000
0
Rural
Urban
অন্যান্য শ্রমিক
40000
30000
20000
10000
0
Rural
Urban
প্রান্তীয় শ্রমিক
পুরুষ শ্রমিক
স্ত্রী শ্রমিক
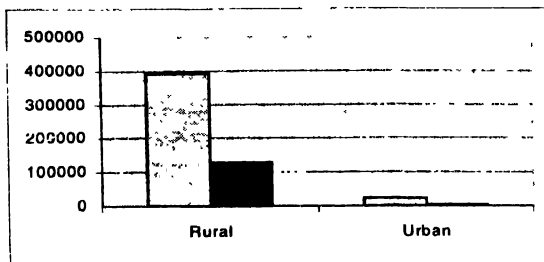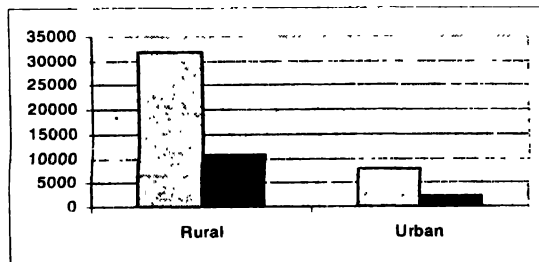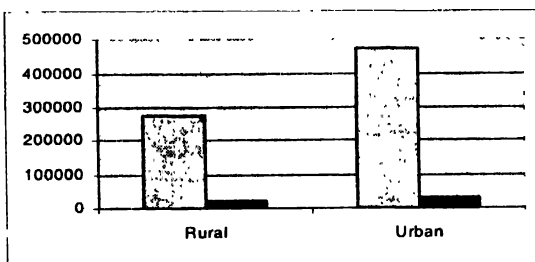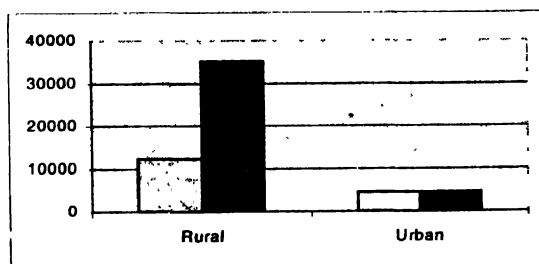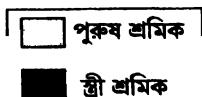
সারণী - ৯

বর্ধমান জেলার অনগ্রসর জাতি ও উপজাতির সংখ্যা (মহকুমা ভিত্তিক) ১৯৯১

মহকুমা	অনগ্রসর জাতি			অনগ্রসর উপজাতি		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
আসানসোল	১৬৯৪৮৮	১৪২০১৬	৩,০৪,৫০৪	৪২৮৪৬	৪১২৬৯	৮৪১১৫
দুর্গাপুর	১৪৪৯৪৩	১২৮০৪০	২৭২৯৮৩	২৬৯০৪	২৪২৪৭	৫১১৫১
বর্ধমান সদর	৩২৫২৫৩	৩১১০৮৩	৬৩৬৩৩৬	৯১২৫২	৮৯৮২৬	১৮১০৭৮
কাটোয়া	১১২৮৬০	১০৭২০৬	২২০০৬৬	৩৭৩৮	৩৫৬৯	৭৩০৭
কালনা	১১৬৩৪৩	১১০২৬১	২২৬৬০৪	২৬২২৯	২৬১৫৩	৫২৩৮২
সমগ্র জেলা	৮৬১৮৮৭	৭৯৮৬০৬	১৬৬০৪৯৩	১৯০৯৬৯	১৮৫০৬৪	৩৭৬০৩৩

চিত্র - ৮ ঃ বর্ধমান জেলার শহর এবং গ্রামাঞ্চলে স্ত্রী পুরুষ ভেদে স্বাক্ষর ও নিরক্ষর জনবসতির অনুপাত
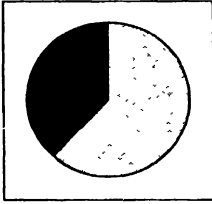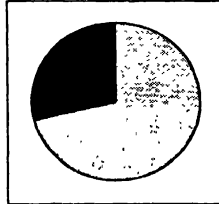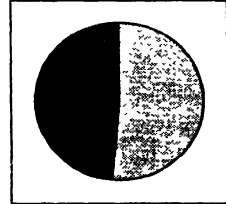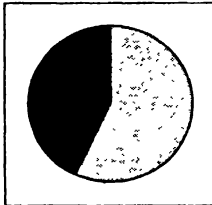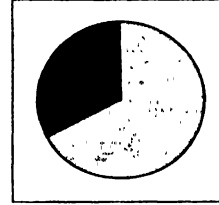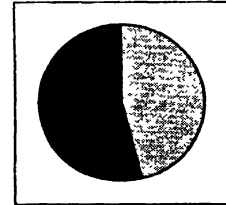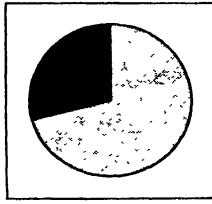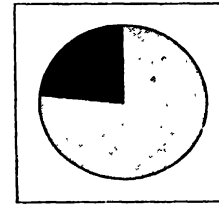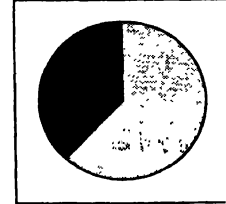
জেলার সাক্ষরতা সংক্রান্ত সরকারী তথ্য বিশ্লেষণ করলে আমাদের সামনে উঠে আসে –
ক) জেলার ৬১.৮৮ শতাংশ মানুষ সাক্ষর,
খ) মহিলাদের (৫১.৪৬%) তুলনায় পুরুষদের (৭১.১২ %) সাক্ষরতার হার বেশী
গ) শহরাঞ্চলের (৭০.৮৬%) তুলনায় গ্রামাঞ্চলে (৫৬.৮৩%) সাক্ষরতার হার কম, এবং
ঘ) শহরের মেয়েদের (৬১.৯২%) তুলনায় গ্রামাঞ্চলের মেয়েদের (৪৫.৯৫%) সাক্ষরতার হার অনেক কম।

বর্ধমান জেলার জনবসতি বন্টনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করে একথা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয় যে জেলার জনবসতির বন্টন, ঘনত্বের হ্রাসবৃদ্ধি পেশাভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ, বৃদ্ধির সামগ্রিক হার সবই মোটামুটিভাবে জেলার প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

উপসংহার

যে বৈচিত্রের কথা দিয়ে বর্ধমান জেলার ভৌগোলিক উপাদানগুলো নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেছিলাম সংক্ষেপে হলেও আমাদের এই নিবন্ধের তথ্য , সারণী, চিত্র ও মানচিত্র জেলার সেই বৈচিত্র্যময়তাকে প্রমাণ করতে পেরেছে বলা যায়। দেশ ও রাজ্যের বর্তমান আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণে দক্ষিণবঙ্গের এই কৃষি ও শিল্প সমৃদ্ধ জেলাটি উপযুক্ত পরিকল্পনা ও পরিকাঠামোর সহায়তা পেলে আগামী দিনে রাজ্য ও দেশের উন্নতিতে অত্যন্ত অর্থবহ ভূমিকা গ্রহণ করবে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

কিছু অন্যান্য তথ্য

মোট কৃষি ভূমির ফসল ভিত্তিক পরিমান (হাজার হেক্টরে)

ফসল	১৯৯২-৯৩	১৯৯৩-৯৪	১৯৯৪-৯৫	১৯৯৫-৯৬	১৯৯৬-৯৭
খাদ্যশস্য ঃ					
১. ধান	৫৪৩.৬	৬০৫.৮	৬০৫.৫	৬১৫.৪	৬২৬.২
ক) আউস	৩০.৫	৩০.৯	৩১.৭	৩৩.৬	৩২.৪
খ) আমন	৪১৮.৯	৪১৬.৯	৪১৩.৩	৪০৪.৯	৪২৩.৮
গ) বোরো	৯৪.২	১৫৮.৮	১৬০.৫	১৭৬.৯	১৭০.০
২. গম	৩.৩	২.২	৩.৪	৪.১	৪.৪
৩. বার্লি	-	-	০.১	০.১	০.২
৪. ভুট্টা	★	★	★	-	★
৫. অন্যান্য দানা শস্য	★	★	-	-	০.১
মোট দানা শস্য	৫৪৬.৯	৬০৮.০	৬০৯.০	৬১৯.৬	৬৩০.৯
মোট ডাল জাতীয় শস্য	১ ৪	১.৭	২ ১	১.৬	৮.০

	মোট খাদ্যশস্য	৫৪৮.৩	৬০৯.৭	৬১১.১	৬২১.২	৬৩৮.৯
	তৈলবীজ ঃ					
১.	সরিষা	৪৮.২	৩৬.৮	৪৩.৮	৩২.৯	২৫.২
২.	তিসি	-	★	★	★	০.৩
৩.	অন্যান্য তৈলবীজ	৬.৫	৮.৭	১০.৯	৬.১	১৪.৮
	মোট তৈলবীজ	৫৪.৭	৫৫.৫	৫৪ ৭	৩৯.০	৪০.৩
	তন্তু ফসল ঃ					
১.	পাট	১২.১	৭.৩	৯.১	১০.২	১২.২
২.	মেস্তা	০.১	★	০.১	★	০.৪
৩.	অন্যান্য তন্তু ফসল	০.১	৭.১	০.২	০.১	০.১
	মোট তন্তু ফসল	১২.৩	৭.৪	৯.৪	১০.৩	১২.৭
	অন্যান্য ফসল ঃ					
১.	আখ	০.৮	০.৬	০.৭	০.৪	১.০
২.	আলু	৩৩.১	৩১.৯	৩২.৫	৩৫.০	৪১.১
৩.	লঙ্কা (শুষ্ক)	১.৭	১.৪	১.৩	১.৯	১.৮
৪.	আদা	০.১	০.১	০.১	★	০.১
	মোট অন্যান্য ফসল	৩৫.৭	৩৪.০	৩৪.৬	৩৭.৩	৪৪.০

★ ৫০ হেক্টর-এর কম

সূত্র ঃ District Statistical Hand Book (Burdwan) - 1996-1997 (Combined)

বর্ধমান জেলার প্রধান শস্যগুলোর উৎপাদন ১৯৯২-৯৩ থেকে ১৯৯৬-৯৭ (হাজার টন)

	ফসল	১৯৯২-৯৩	১৯৯৩-৯৪	১৯৯৪-৯৫	১৯৯৫-৯৬	১৯৯৬-৯৭
	খাদ্যশস্য ঃ					
১.	ধান	১৪০৬.৩	১৬৪১.৬	১৬৯৪.৩	১৬৬৮.৫	১৭৪১.৪
	ক) আউস	৭২.২	৭৭.৯	৮৪.৭	৮৮.১	৭৯.৯
	খ) আমন	১০৩৫.৪	১০৫৭.০	১১১৫.৮	১০৪৫.০	১০৮২.১
	গ) বোরো	২৯৮.৭	৫০৬.৭	৪৯৩.৮	৫৩৫.৪	৫৭৯.৪
২.	গম	৫.২	৪.০	৭.৪	৯.০	১০.৪
৩.	বার্লি	-		০.১	★	০.৩
৪.	ভুট্টা	০.১	★	★	-	★
৫.	অন্যান্য দানাশস্য	★	০.১	০.১	-	★
	মোট দানাশস্য	১৪১১.৬	১৬৪৫.৬	১৭০১.৮	১৬৭৭.৫	১৭৫২.১
	মোট ডাল জাতীয় শস্য	১.১	১.০	১.২	০.৯	৪.৬

	মোট খাদ্যশস্য	১৪১২.৭	১৬৪৬.৭	১৭০৩.০	১৬৭৮.৪	১৭৫৬.৭
	তৈলবীজ ঃ					
১.	সরিষা	৩৩.৫	৩২.১	৩২.৭	২২.৮	২৩.৫
২.	তিসি	-	★	★	★	০.১
৩.	অন্যান্য তৈলবীজ	৬.১	৫.৯	২.০	৪.৫	১১.৭
	মোট তৈলবীজ	৩৯.৬	৩৮.০	৪০.৭	২৭.৩	৩৫.৩
	তন্তু ফসল ঃ ▲					
১.	পাট	১৯২.৮	১৩৪.৫	১৫৭.৮	১৫২.১	২১৪.৫
২.	মেস্তা	১.৩	০.১	০.৪	০.৩	১.২
৩.	অন্যান্য তন্তু ফসল	০.৭	০.৬	১.৮	০.৬	০.৭
	মোট তন্তু ফসল	১৯৪.৪	১৩৫.২	১৫৯.০	১৫৩.০	২১৬.৪
	অন্যান্য ফসল ঃ					
১.	আখ ●	৫.৮	৪.৩	৪.০	২৫.৩	৬৭.১
২.	আলু	৯১১.০	৯১২.৬	৯০৩.০	১০১৯.৪	১২৪৩.২
৩.	লঙ্কা (শুষ্ক)	১.৮	১.৪	০.৩	২.২	২.১
৪.	আদা	০.১	০.১	০.১	০.১	০.১
	মোট অন্যান্য ফসল	৯১৮.৭	৯১৮.৪	৯০৭.৪	১০৪৭.০	১৩১২.৫

▲ হাজার গাঁট প্রতি গাঁট, ১৮০ কেজি হিসাবে

● গুড় হিসাবে

★ ৫০ টনের কম

সূত্র ঃ District Statistical Hand Book (Burdwan) - 1996-1997 (Combined)

তথ্য সহায়তা

১. পশ্চিমবঙ্গ ঃ বর্ধমান জেলা সংখ্যা - ১৪০৩ বঙ্গাব্দ - পঃ বঃ সরকার

ক) বর্ধমান জেলায় কয়লা শিল্পের বিকাশের ধারা – প্রিয়ব্রত দাশগুপ্ত

খ) বর্ধমানের কৃষি —— অজিত হালদার

গ) বন্যা নিয়ন্ত্রণে দামোদর পরিকল্পনা ও বর্ধমান জেলার আর্থ-সামাজিক বিকাশ – — নিশীথ কুমার দত্ত

২. বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি (প্রথম খণ্ড) – যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, পুস্তক বিপণি - – কলকাতা - ১৯৯৫

৩. West Bengal - Editors A. B. Chatterjee, Avijit Gupta. Pradip K. Mukhopadhyay - Firma.k.l. Mukhopadhya Calcutta - 12 - 1970

ভূগোল - ভূতত্ত্ব - প্রাকৃতিক সম্পদ

৪. বিশ্বকোষ ঃ সাক্ষরতা প্রকাশন - কলকাতা - ১৯৮৬

৫. নদী ঃ সুপ্রিয় সেনগুপ্ত (বিচিত্র বিদ্যা গ্রন্থমালা) - জিজ্ঞাসা কলকাতা - ১৯৮২

৬. নদী ঃ দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় - শিশু সাহিত্য সংসদ - কলকাতা - ১৯৯৩

৭. পশ্চিমবঙ্গ পরিচয় - বাসুদেব গঙ্গোপাধ্যায় - শিশু সাহিত্য সংসদ - কলকাতা - ২০০০

৮. জনসংখ্যা তত্ত্বের গোড়ার কথা - (প্রথম খণ্ড) - প্রভাতকুমার মজুমদার - পঃ বঃ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ - ১৯৯১.

৯. ভারতের খনিজ সম্পদ - দিলীপ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় - আনন্দ - কলকাতা - ১৯৮৯

১০. খনি থেকে খনিজ - দিলীপ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় - আনন্দ - কলকাতা - ১৯৮৯

১১. কালো হীরে , কয়লা - ডঃ দেবব্রত চন্দ্র - বেস্ট বুকস্ - কলকাতা - ১৯৯২

১২. সংসদ ভূ-বিজ্ঞান কোষ - দীপঙ্কর লাহিড়ী - সাহিত্য সংসদ - কলকাতা - ১৯৯৯

১৩. Bengal District Gazetteers - Burdwan - J.C.K.Peterson Bengal Secretariat Book Depot. Calcutta - 1910

১৪. বর্ধমান সমগ্র - সম্পাদনা ডঃ গোপীকান্ত কোঙার - দে বুক স্টোর - কলকাতা - ২০০০

ক) বর্ধমান জেলা পরিচিতি - অনিলেন্দু ভট্টাচার্য

খ) বর্ধমান জেলার নদনদী - ননীগোপাল দত্ত

গ) ডি.ভি.সি. -র পঞ্চাশ বর্ষ ঃ প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি - সুধীর চন্দ্র দাঁ

১৫. বর্ধমান পরিক্রমা ঃ- সুধীরচন্দ্র দাঁ - বুক সিণ্ডিকেট প্রা. লিমিটেড - কলকাতা - ১৯৯২

পরিসংখ্যান সহায়তা

1. District Statistical Hand Book - Burdwan - 1996 - 1997 (Combined)
   Bureau of Applied Economics and Statistics. Government of west Bengal.
2. Statistical Abstract (West Bengal - 1997 - 98) - Bureau of Applied Economics and statistics. Government of west Bengal.
3. Annual PLan on Agricultural - 1999 - 2000 - District Burdwan.

মানচিত্র সহায়তা

1. District Planning Map Series - Barddhaman, West Bengal. Survey of India. Department of Science & Technology (1991)

গঠনে, গুণে - জেলা বর্ধমান

বিকাশ রায়

পশ্চিমবঙ্গ, বিশাল উপমহাদেশ ভারতবর্ষের একটি ছোট্ট প্রদেশ হলেও রূপে গুণে কিন্তু ছোট আকারে ভাবার কোন স্থান নেই। এই প্রদেশের ক্ষেত্রফল প্রায় ৮৮৭৫২ বর্গ কি.মি. (৩৪৩২৯ স্কোঃ মাইল) এবং অক্ষাংশে ২১°১০ এবং ২৭°৩৮ উঃ, দ্রাঘিমা ৮৫°৩০ এবং ৮৯°৪৫ পূঃ রেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ। ভূমিবৃত্তি অনুসারে পশ্চিমবঙ্গকে তিনটি ভাগ করা যায় ঃ (১) *উত্তরে অতিরিক্ত উপদ্বীপীয় অঞ্চল* - দার্জিলিং , জলপাইগুড়ি জেলা; (২) *দক্ষিণ পশ্চিমে ঘূর্ণমান স্থলাকৃতির উপদ্বীপীয় ভূ-ভাগ অর্থাৎ ছোটনাগপুর মালভূমির বিস্তৃতি* - মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া,বীরভূম এবং বর্ধমান জেলা এবং (৩) *দক্ষিণ এবং পূর্বে নিম্নস্থ পাললিক ও ব-দ্বীপীয় সমভূমির বিস্তীর্ণ অঞ্চল* - পশ্চিমবঙ্গের বাকী জেলাসমূহ।

প্রদেশের পূর্বে এবং দক্ষিণের জেলাগুলির ঢেউ খেলানো স্থলাকৃতি ক্রমশঃ সমতল ভূমি হতে হতে বঙ্গোপসাগরের তটরেখায় পরিণত হয়েছে। রাজ্যের প্রধান ঢাল দক্ষিণমুখী সমুদ্রপানে হলেও দক্ষিণ পশ্চিমভাগে পূর্বমুখী ঢাল কিন্তু সুস্পষ্ট। রাজ্যের প্রধান নদী বলতে 'গঙ্গা' (উপরের দিকে ভাগীরথী এবং নিচের দিকে হুগলী নদী নামে খ্যাত) কেই বোঝায়। মধ্যে কিছুটা অঞ্চল দিয়ে ময়ুরাক্ষী ও অজয় নদী বয়ে চলেছে। পশ্চিম ভাগে পরিবাহকে নিয়ন্ত্রণ করছে দামোদর,সুবর্ণরেখা ও কংসাবতী নদী তন্ত্র। উত্তরবঙ্গে তিস্তা প্রধান হলেও জলঢাকা - ধরিয়া, মহানন্দা, করতোয়া , তোরসা, রাইঢাক, সংকোশ - গঙ্গাধর এবং রণজিৎ নদী ভালভাবেই পরিবাহকে নিয়ন্ত্রণ করছে। যদিও এই নদীগুলি ব্রহ্মপুত্রর উপনদী । জলবায়ুর দিক থেকে হিমালয় অঞ্চল অর্ধ আল্পসীয় এবং বাকী রাজ্য জুড়ে গ্রীষ্ম মণ্ডলের মত। হিমালয় অঞ্চলে শীতকালে তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নিচে থাকে এবং গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা ২৬° সেঃ পর্যন্ত উঠে যায়। রাজ্যের বাকী অঞ্চলে শীতকালে প্রায় ৭° সেঃ এবং গ্রীষ্মকালে ৪৫° সেঃ এর উপরেও তাপমাত্রা উঠে যায়। রাজ্যে মৌসুমী বায়ু বিরাজ করে জুন মাস থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত। হিমালয় অঞ্চলে ২৫০ থেকে ৫০০ সেঃমিঃ এবং সমতলভূমিতে ১২৫ থেকে ১৯০ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত হয়।

এবার আসা যাক আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় বর্ধমান জেলায়। অক্ষাংশ ২২°৫৫ থেকে ২৩°৫১.৬ উঃ এবং দ্রাঘিমা ৮৬°৪৮ থেকে ৮৮°২৩ পূঃ দ্বারা বেষ্টিত প্রায় ৭০০১ বর্গ কিলোমিটার ক্ষেত্র জুড়ে বর্ধমান জেলা বিভিন্ন ভাগে বিভিন্ন রূপে বিরাজমান। বর্ধমান জেলার ভৌগোলিক অবস্থান হচ্ছে পশ্চিমে বিহারের ধানবাদ জেলা, উত্তর - পশ্চিমে বিহারের সাঁওতাল পরগণা জেলা, উত্তরে বীরভূম জেলা, দক্ষিণ - পশ্চিমে পুরুলিয়া জেলা, দক্ষিণে বাঁকুড়া জেলা, দক্ষিণ-পূর্বে হুগলী জেলা এবং পূর্বে ভাগীরথী (গঙ্গা) নদী।

বর্ধমান জেলা সমুদ্রতল থেকে প্রায় ১০মিঃ (দক্ষিণপূর্ব প্রান্তে) হতে প্রায় ১৫০ মিঃ (উত্তর পশ্চিম প্রান্তে) উঁচুতে বিরাজমান। অর্থাৎ বর্ধমান জেলার ঢাল উত্তর পশ্চিম থেকে দক্ষিণ

পূর্বে।

বর্ধমান জেলার মোটামুটি দুই রূপ। উত্তর পশ্চিম প্রান্ত পাথুরে অঞ্চল । মাটির ঢাকনা সরে গিয়ে অপাবৃত পাথরের ছোট বড় ঢিবি বা ছোট ছোট পাহাড়ের আকারে বিরাজমান। এই রূপ প্রধানত পানাগড় পর্যন্ত দেখা যায়। তারপর থেকে শুধু পুরানো এবং নূতন মাটি দিয়ে গড়া প্রায় সমতল ভূমি। দক্ষিণবঙ্গের উন্নত বর্ধিষ্ণু নাভিস্থল বর্ধমান জেলার উত্তর প্রান্ত দিয়ে অজয় নদী, দক্ষিণ প্রান্ত দিয়ে দামোদর নদী, পূর্বপ্রান্ত দিয়ে ভাগীরথী নদী এবং উত্তর - পশ্চিম প্রান্তে বরাকর নদী তৎসহ মাইথন প্রোজেক্ট জলরাশি দ্বারা বেষ্টিত। পরিবাহ পদ্ধতি যদিও প্রধানত দামোদর, তারপর ভাগীরথী এবং কিছুটা অজয় নদীর উপর নির্ভরশীল কিন্তু আভ্যন্তরীণ পরিবাহ কুনুর, বাঁকা, খড়ী, ঘিয়া, ব্রহ্মানী, বেহুলা, মুণ্ডেশ্বরী, কানাদামোদর, নুনিয়া, সিঙ্গারন, তমলা, কুকুয়া, তুমুনী, চাঁদা, বাবলা,ইলসরা, দেবখাল, খণ্ডেশ্বরী, কাঁটাখাল প্রভৃতি ছাড়াও অসংখ্য খাল বা কাঁদর দ্বারা জেলার বিভিন্ন অঞ্চল নিয়ন্ত্রিত হয়। খড়ি, বাঁকা, বহুলা সমেত কিছু নদী আদিম অবস্থায় দামোদরের জল বহন করে থাকলেও এখন তারা দামোদর নদী থেকে বিচ্ছিন্ন এবং বৃষ্টি ও ক্যানেলের জলের উপর নির্ভরশীল। দামোদর নদী ছাড়া বর্ধমান জেলা মাতৃহীন সন্তানের মত। তাই দামোদর নদীর সম্পর্কে একটু বলে নেওয়া ভাল।

উৎস স্থল পশ্চিম বিহারের অন্তর্গত ছোটনাগপুরের মালভূমির প্রায় ১০০০ মিটার উঁচু খামারপত ও বীরজংগা পাহাড়। দৈর্ঘ্য মোহনা পর্যন্ত প্রায় পাঁচশ ত্রিশ কিলোমিটার । উৎস থেকে প্রথম ৩০০ কিঃমিঃ নদীর ঢাল কিলোমিটার প্রতি ২১/২ থেকে ৩ মিটার , পরের ১৫০ কিঃমিঃ ১মিটার ও শেষের ভাগ মোহনা পর্যন্ত মাত্র ২০ থেকে ৩০ সেন্টিমিটার প্রতি কিঃ মিঃ । দামোদরের মোট অববাহিকার আয়তন প্রায় ২৪,২৩৫ বর্গ কিলোমিটার। তবে দুই তৃতীয়াংশই বিহারে, ছোটনাগপুর মালভূমিতে । নিম্নগতিতে পড়ে কেবলমাত্র এক তৃতীয়াংশ বর্ধমান ,বাঁকুড়া ও হুগলী জেলায়। দামোদরের গুরুত্বের অনেকখানিই উদ্ভূত হয়েছে এই অববাহিকা অঞ্চলের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের থেকে। উচ্চ অংশে দামোদর বইছে কঠিন সুপ্রাচীন রূপান্তরিত গ্রানাইট, নাইস এবং শিষ্ট শিলার ওপর দিয়ে অসংখ্য পাহাড় ও টিলার মধ্যে দিয়ে। ফলে উৎসের কাছাকাছি দামোদরের খাত খুবই অসমান ও উঁচুনিচু, কোথাও কোথাও ছোট জলপ্রপাত সৃষ্টি করে বয়ে চলেছে। পাহাড়ি অঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত বলে এই অংশে দামোদর ও তার উপনদীগুলোর ঢাল বেশী, দুই পাড়ও নদীবক্ষ থেকে খাড়া উঠে গেছে। এখানে দামোদরের উপত্যকা বেশ উঁচু, প্রায় ১৬০ মিটার। উৎস থেকে দেড় কিলোমিটারের মধ্যে দামোদর নেমে এসেছে ৬৩০ মিটারে। প্রায় ৬ কিলোমিটার চলার পর এর উচ্চতা মাত্র ৫০০ মিটার. ১৫০ কিলোমিটার চলার পর উচ্চতা অনেক কমে মাত্র ২৩০ মিটার দাঁড়িয়েছে। তারপর কমতে কমতে বর্দ্ধমানে মাত্র ২৪/২৫ মিটারে এবং মোহনাতে মাত্র ৪ মিটারে। রূপান্তরিত শিলার পর বেশ কিছুটা পথ কয়লা বহনকারী গণ্ডোয়ানা শিলার ওপর দিয়ে নিম্নগতিতে পৌঁছে দামোদর পরিণত হয়েছে এক চওড়া, ধীরবহ ব-দ্বীপীয় নদীতে। নিম্নগতিতে দামোদর বইছে পুরু পলিগঠিত প্রায় সমতল,

ঢালবিহীন ভূমির উপরে। নদীর ঢালও কম। ফলে পাহাড় থেকে বয়ে আনা বালিও পলিকে টানতে না পেরে নদী তাকে সঞ্চিত করছে খাতের উপরে, সৃষ্টি করছে চরের। বালিচরের ফাঁক দিয়ে এঁকেবেঁকে বেণীর মতো বইছে দামোদর। ফলে বর্ষার প্রবল বন্যার সময়ে মাঝে মাঝেই নিজের খাত ছেড়ে দামোদর ছুটে যায় পাশের কৃষিক্ষেতের ভেতরে। তৈরী করে নূতন নূতন চলার পথ। আসানসোল-দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল পেরিয়ে এসে দামোদর পৌঁছিয়েছে বর্ধমান শহরের দক্ষিণ সীমায়। এর কুড়ি - পঁচিশ কিলোমিটার দক্ষিণ পূর্বে চাঁচাই গ্রামের কাছে দামোদর উৎস থেকে দক্ষিণ পূর্ব মুখে প্রবাহিত হয়ে হঠাৎ প্রায় সমকোণে বাঁক নিয়ে দক্ষিণে চলতে শুরু করেছে এবং এটাই দামোদরের তথাকথিত ব-দ্বীপের শীর্ষবিন্দু। উচ্চগতিতে দামোদরে এসে মিশেছে প্রচুর ছোটবড় নদী যেমন হাহারো, জামুরিয়া, কাটারি, খুদিয়া, উশ্রি,বেলপাহাড়ি প্রভৃতি । এদের বৈশিষ্ট্য হল এই যে সকলেই পাহাড়ী,বর্ষার জলে পুষ্ট । ফলে বর্ষাকালে ছাড়া এদের খাতে জল প্রায় থাকেই না, শুকনো বালির ওপর দিয়ে হয়তো কোথাও কোথাও সামান্য জল এঁকে বেঁকে বয়ে চলে। কোনো কোনো নদী বইছে শক্ত ক্ষয় প্রতিরোধক শিলার ওপর দিয়ে। ফলে সৃষ্টি হয়েছে জলপ্রপাত ও খরস্রোত। দামোদরের প্রধান উপনদী হল বরাকর।

নদীমাতৃক ভারতের বিপুলায়তন গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মহানদীর ব-দ্বীপের থেকে কিছুটা পৃথক দামোদরের ব-দ্বীপ। দামোদর সমুদ্রে এসে পড়েনি, পড়েছে নানা শাখায় বিভক্ত হয়ে রূপনারায়ণ বা হুগলী নদীতে । এই নদীগুলোতে জোয়ার ভাঁটা খেললেও মূলতঃ তার জন্যই ব-দ্বীপের সৃষ্টি হয়নি। দামোদরের ব-দ্বীপ গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে অনেকটা আগেই, এমন এক জায়গায় যেখানে পাহাড় থেকে ক্ষয় করে আনা বোঝা বইতে না পেরে নদী সেই ভার নামিয়ে দিচ্ছে। খাতের গভীরতা ও জল ধারণের ক্ষমতা কমে গেলে নদী দুই পাড় ভেঙে অসংখ্য শাখায় সমভূমিতে নেমে আসছে। এরই ফলে নদী এক ব-দ্বীপের আকার ধারণ করছে। অর্থাৎ খাড়াপাড় শেষ হয়ে সমতলে নেমেই দামোদরের বদ্বীপ গঠনের কাজ শুরু হচ্ছে। হুগলী নদী যেন এখানে সমুদ্র মুখ হিসাবে কাজ করে যাচ্ছে। অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ ব-দ্বীপ বলাই ভাল। বর্দ্ধমানের শীর্ষবিন্দু থেকে উত্তরে কালনা এবং দক্ষিণে গেঁওখালি পর্যন্ত এই ব-দ্বীপ বিস্তৃত। বেশ কিছুদিন যাবৎ মানুষের হস্তক্ষেপের ফলে দামোদরের ব-দ্বীপ সৃষ্টির স্বাভাবিক কাজ সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। এর দুই ধারের কৃত্রিম পাড়গুলো নদীর বাড়তি জলকে উপছে পড়তে দেয় না। দামোদরের অধিকাংশ জলই প্রবাহিত হচ্ছে মুণ্ডেশ্বরীর মধ্যে দিয়ে রূপনারায়ণে, বাকী কানা দামোদর হয়ে হুগলীতে। এর উপর ডি.ভি.সি-র বাঁধগুলো ও জলধারগুলো যেমন তিলাইয়া, মাইথন, পাঞ্চেত, কোনার, দুর্গাপুর এবং বিহার সরকারের তেনুঘাট জলের পরিমাণই কমিয়ে দিচ্ছে। উৎসস্থল এবং গতিপথের রূপই দামোদর নদীকে গড়ে তুলেছে ঘন বর্ষায় ভয়ংকর এবং শীত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে অতি শান্ত এক ম্রিয়মান জলধারায়। একদিকে ধ্বংস ও সংহার এর জন্য অনেকে দামোদর নদীকে 'নদ' বলতেও যেমন গদগদ, অন্যদিকে সৃষ্টি ও পালনে নদী মাতার কিন্তু কার্পণ্য নেই। তাই দামোদর মনকে নাড়া দেয়। জুন থেকে সেপ্টেম্বরের বৃষ্টিপাতের সময় বন্যার তীব্রতা যেমন কিছু মানুষের রাতের ঘুম কেড়ে নেয় অন্যদিকে সমস্ত

অববাহিকার কল্যাণ ও উন্নতির সার্থক রূপ দামোদর। বর্ধমান শহর ও শহরতলির এমনভাবে উন্নতিতে ফুলে ফেঁপে ওঠার জন্যই যেন দামোদরের সৃষ্টি। চাষবাস ছাড়াও শহরে শহরে জ্বলে ওঠে দামোদরের কল্যাণে পাওয়া বিদ্যুতের আলো। এত ভাল বালি বোধহয় পশ্চিমবঙ্গের কোন নদীতে পাওয়া যায় না এবং পরিমাণও। দামোদর উপত্যকার প্রকল্পের জন্য যেমন প্রভূত উন্নতি আবার জলের অভাবে কোলকাতা বন্দরের অধঃপতনের অন্যতম কারণ বোধহয়। পশ্চিমের মালভূমি থেকে নেমে আসা দামোদরের বন্যা ভাগীরথী, হুগলী নদীর পলি স্বাভাবিকভাবে সরাতো । বর্তমানে প্রধান সমস্যা উচ্চ অববাহিকা অঞ্চলে ব্যাপক অরণ্য নিধনের ফলে যে বিপুল ভূমিক্ষয় শুরু হয়েছে তার মোকাবিলা করার আশু প্রয়োজন। শিল্পাঞ্চল থেকে বিষাক্ত পদার্থ নদীকে যেভাবে কলুষিত করছে তা বন্ধ করার প্রয়োজন অতি অবশ্যই। আর প্রয়োজন দামোদরের মজে যাওয়া শাখা নদী বা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া নদী বা খালগুলোর সংস্কার, না হলে কলেরা, ম্যালেরিয়া সহ অসংখ্য রোগের আস্তানা হয়ে উঠতে সময় লাগবে না এই উপত্যকা অঞ্চলের। প্রকল্পগুলি সার্থক হলে ছোটনাগপুরের আদিবাসী উপজাতিদের এই পবিত্র নদীটিও বর্ধমান কেন, এই বঙ্গের মানুষের কাছে 'গঙ্গাসম' প্রণম্য হয়ে উঠবে। এখানে একটা কথা বলে নেওয়া দরকার। দামোদর এবং গঙ্গানদীর পলন ভূতাত্ত্বিক পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত এই উভয় পলনই চতুর্থকল্পের শেষভাগ বয়স হলেও দামোদর নদী গঙ্গানদীর তুলনায় অনেক পুরানো। পরীক্ষাগুলি হল –

১। শিলাস্তরের ভৌতিক পারস্পরিক সম্পর্ক। ২। কার্বন – ১৪ বিশ্লেষণ।

জলবায়ু

বর্দ্ধমান জেলার জলবায়ু মাঝারি ধরনের। সারা বছরের জলবায়ু ভাগ করলে দেখা যাবে মৃদু শীত ও তপ্ত। আর্দ্র গ্রীষ্ম এবং দীর্ঘস্থায়ী বর্ষাকাল। দুর্গাপুর - আসানসোল অঞ্চলে (গ্রীষ্মকালে) গরম কিন্তু দুঃসহ। পশ্চিমের গরম হাওয়া যখন বয় তখন তাপমাত্রা ৪৫° সেঃ পর্যন্ত উঠে যায়। এছাড়া তাপমাত্রা সাধারণভাবে জেলায় ৩৭° -৩৮° সেঃ (গ্রীষ্মকালে) এবং ১২°-১৩° সেঃ তাপমাত্রা (শীতকালে) বিরাজ করে। শীতকালে ৫° সেঃ তাপমাত্রাও জেলায় দেখা গেছে। এই জেলাতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১২৫০ মিঃমিঃ থেকে ১৪০০ মিঃমিঃ পর্যন্ত হয়। এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকে জুন মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত জেলাটি কালবৈশাখীর প্রকোপে পড়ে। তবে গত দশ বছরে দেখা গেছে বজ্রপাতের পরিমাণ সেপ্টেম্বর মাসেই সর্বাধিক।

উদ্ভিদ

উদ্ভিদকুলের দিক থেকে হিমালয় অঞ্চল এবং উপকূলীয় অঞ্চলের বিশেষ বিশেষ উদ্ভিদ ছাড়া প্রায় সব রকমেরই উদ্ভিদ জেলায় পাওয়া যায়। তবে আগেকার সেই বনভূমি আর নেই। সময়ের চাহিদায় বেশীর ভাগই আজ চাষের জমিতে পরিণত। আজ সব বনভূমি

একত্র করলে মাত্র ২৭০ - ২৮০ বর্গ কি.মিঃ-র মধ্যে সীমাবদ্ধ। অবশ্য জেলায় শিল্প, খনি শিল্প ও বসবাসের জন্য বেশ কিছু বনভূমি লোপ পেয়েছে। আবার এখন পাকা ও কাঁচা রাস্তার পাশে ,পুকুরের পাড়ে এমন কি বাড়ীতেও কিছু কিছু গাছ লাগানো হচ্ছে। নদীর ধারে ধারে যেখানে প্রচুর গাছ লাগানো সম্ভব সেখানে এখন মানুষের ঘনবসতি। জেলার বনভূমিগুলি ল্যাটেরাইট এবং লালমাটির উচ্চভূমির উপর সাধারণত অবস্থিত। আউসগ্রাম বনভূমি , ওরগ্রাম বনভূমি, আসানসোল বনভূমি (সাঁওতাল পরগণা পর্যন্ত বিস্তৃত) এবং দুর্গাপুর বনভূমি (অজয় নদী পার হয়ে বীরভূম জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত) উল্লেখযোগ্য। সেগুন, শাল, পিয়াশাল, ইউক্যালিপটাস, মিনজরি, অর্জুন, কাজুবাদাম, শিরিষ, আম, বাবলা, মহুয়া, সোনা,শিশু, বাঁশ, নারিকেল, শিমূল, তাল, খেজুর ও আমড়া গাছ প্রভৃত।

কৃষি

খনি, শিল্প অঞ্চল ছাড়া বর্দ্ধমান জেলা কৃষিকার্যের দিক থেকে প্রচণ্ড উন্নত। জেলার প্রায় ৬৫ শতাংশ মানুষ গ্রামেই বাস করেন এবং কৃষিকার্যই প্রধান জীবিকা। ক্যানেল, টিউবওয়েল (গভীর ও অগভীর) , নদীর জল পাম্প করে, কুয়ো, দিঘী এবং পুকুরের জল ব্যবহার করে ধান, গম, যব, আখ, আলু, ভুট্টা, ছোলা, পাট, সরষে, বার্লি, ডাল,বাদাম, বিভিন্ন ফল, ফুল ও সব্জি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন করা হয়। বর্ষাকালীন চাষ ছাড়াও বোরো চাষের কিছু কিছু অঞ্চলে ব্যাপক প্রচলন আছে।

প্রাণী সম্পদ

প্রাণী জগতে মানুষের সংখ্যা প্রচণ্ডভাবে বেড়ে চলেছে। এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলেছে অন্যান্য প্রাণীদের সংখ্যার বিলোপ।

আসানসোল জঙ্গলের বাঘ, কাঁকসা ও কালনার নেকড়ে, অন্যান্য বনভূমির ভাল্লুক, চিতা ও হায়না আজ গল্পের কথা। এরা আজ বিলুপ্ত প্রাণী। কম সংখ্যক হায়না, ময়ূর, হরিণ প্রচুর পরিমাণে, বাঁদর, শৃগাল আজও চোখে পড়ে। গৃহপালিত পশু গরু, মহিষ, ছাগল, গাধা, কুকুর, বিড়াল এমনকি খড়গোশদের নিয়েই জেলায় মানুষদের সহাবস্থান। নদী. দীঘি ও পুকুর থাকায় বিভিন্ন রকমের মাছ পরিমাণ মতই পাওয়া যায়। পাখী ও বিভিন্ন ধরণের দেখা যায় এই জেলাতে।

ভূ-তাত্বিক চিত্র (Stratification)

বর্ধমান জেলার স্তরায়ণতত্ত্ব মোটামুটিভাবে গ্রানিটযুক্ত আর্কিয়ান শিলা (বয়স ২৫০ কোটি বছর প্রায়) কয়লামুক্ত গণ্ডোয়ানা শিলা (৩৫ থেকে ২৯ কোটি বছর), নুড়ি ও বালির স্তর (৮ থেকে ১ কোটি বছর), ল্যাটেরাইট বা লালমাটি কাঁকড় (দশ লক্ষ বছর) এবং পুরানো মাটি (সাড়ে পাঁচ হাজার বছর) ও নতুন মাটি (৮৫০ বছর থেকে আজ পর্যন্ত)। উত্তর পশ্চিম প্রান্তে গ্রানাইট যুক্ত পাথর ছাড়া বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে রয়েছে কয়লাযুক্ত গণ্ডোয়ানা শিলা

বা অঙ্গার যুগের শিলা, অঙ্গার যুগের সূচনা হল এক ব্যাপক আলোড়নের মধ্য দিয়ে। এই আলোড়নের ফলে কয়েকটি বড়ো বড়ো ফাটল সৃষ্টি হল এবং ফাটলের দরুণ রচিত হল কয়েকটি বিস্তীর্ণ গহ্বর। জলে ভরে গেল এই সব গহ্বর এবং ফলে সৃষ্টি হল কয়েকটি হ্রদের।

এই সব হ্রদের মধ্যে স্তরে স্তরে জমতে থাকে নদীবাহিত বালি, কাদা ও গাছপালার অবশেষ। এহেন ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে পলি সঞ্চয়কে 'গণ্ডোয়ানা'র শ্রেণীভুক্ত করা হয় এবং এই অঞ্চল সমেত এই পলিযুক্ত সমগ্র পৃথিবীর দক্ষিণাঞ্চলকে বলা হয় 'গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড'। গণ্ডোয়ানা শিলাস্তরগুলির একেবারে নীচে বরফের স্বাক্ষর আছে অর্থাৎ প্রায় উনত্রিশ কোটি বছর আগে প্রথম পলি সঞ্চয়ের সময় সমস্ত গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড ছিল তুষারে আচ্ছন্ন। অনেক জায়গায় স্তূপীকৃত বরফ হিমবাহের মত প্রবাহিত হয়ে ছিল। হিমবাহের স্বাক্ষর আছে একেবারে নীচের পলির মধ্যে জমা পাথরের কুচির গায়ে। তুষার শীতল পরিবেশের মধ্যে সঞ্চিত পলির মধ্যে জল বা বাতাসের ক্রিয়ায় উদ্ভূত রাসায়নিক ক্ষয়ের চিহ্ন নেই। পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের গ্রানিট থেকে বিশ্লিষ্ট ফেল্‌সপার প্রায় অবিকৃতভাবে রক্ষিত হয়েছে এই পলির স্তরে। তুষার যুগের অবসানে বরফ গলে অসংখ্য নদীনালা সৃষ্টি করে এবং গণ্ডোয়ানা অঞ্চলের হ্রদগুলো জলে ভরে ওঠে কানায় কানায়। হ্রদে চলে পলির সঞ্চয়। স্তরে স্তরে সঞ্চিত হতে থাকে বালি ও কাদা। কাদা ও বালির পর জলের স্রোতে ভেসে আসতে থাকে গাছপালার অবশেষ। ঘন বনে আচ্ছন্ন ছিল সমস্ত গণ্ডোয়ানা অঞ্চল। নদী নালার স্রোতের বেগে অথবা বন্যার জলের তোড়ে গাছপালা ভেঙ্গে পড়ে বাহিত হয় জলের ধারায়। জলের স্রোতের ক্রিয়ায় বিশ্লিষ্ট হয়ে তারা হ্রদের মধ্যে জমতে থাকে। হ্রদের মধ্যে বালি ও কাদার স্তরের সঙ্গে জমাট বাঁধে গাছের পাতা, ডালপালা ও গুঁড়ির ভগ্নাংশ। অক্সিজেনের সহযোগিতা থাকলে রাসায়নিক ক্রিয়া বিনাশকে করে ত্বরান্বিত। কিন্তু জলের মধ্যে অক্সিজেন তেমন সক্রিয় নয়। কাজেই জলে সঞ্চিত উদ্ভিদদের রাসায়নিক পরিবর্ত্তন অতি ধীরে, অতি সুক্ষ্মভাবে চলতে থাকে। গাছের পাতা ডালপালা, মূল ও কাণ্ড সব একাকার হয়ে যায়। পাতা থেকে মুছে যায় তার সবুজ রঙ, মূল ও কাণ্ডের মূল উপাদানগুলির ভারসাম্য হারিয়ে যায়। হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি বায়বীয় উপাদানগুলি ক্রমশঃ উবে গিয়ে অঙ্গারকে মুক্তি দেয়। অঙ্গার স্থিতিশীল, কিন্তু বায়বীয় ও জলীয় উপাদান খোঁজে বস্তুর সীমা থেকে মুক্তি। অঙ্গারকে ঘিরে থাকা বায়বীয় উপাদানের আবরণ উন্মোচিত হয়। এই উন্মোচনকে প্রেরণা দেয় অঙ্গার (পীট) এর উপর জমতে থাকা বালি ও কাদা মাটির চাপ। চাপ থেকে তাপের সৃষ্টি হয়। ভূ-গর্ভের তাপের সঙ্গে তা যুক্ত হয়ে বাষ্পীয় বা বায়বীয় উপাদানগুলিকে উবে যেতে সাহায্য করে। এমনি করে অঙ্গার ক্রমশঃ ব্যক্ত ও মুক্ত হয়ে সৃষ্টি করে পীট থেকে লিগনাইট (অর্ধপরিণত কয়লা) জাতীয় কয়লার। তারপর আরও চাপ এবং তাপ বাড়তে থাকায় লিগনাইট ক্রমশঃ পরিণত হয় বিটুমিনাস বা সাধারণ কয়লায়। কয়লার পূর্ণতম পরিণতি ঘটে অ্যানথ্রাসাইট জাতীয় কয়লার মধ্যে এবং তা ঘটে অনুরূপভাবে চাপ ও তাপ বাড়ার মধ্য দিয়ে। গণ্ডোয়ানা অঞ্চলে সঞ্চিত গাছপালার অবশেষ কয়লার স্তরে রূপান্তরিত হতে কত কোটি বছর সময় লেগেছিল তা

জানা কঠিন। কারণ উদ্ভিদের স্তরের কয়লার স্তরে রূপান্তরের প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় অনুকরণ কোন গবেষণাগারেই সম্ভব নয়। তাছাড়া যে ঘটনা ঘটতে কোটি কোটি বছর লেগে যায় সে ঘটনাকে পরীক্ষামূলক ঘটানোর প্রয়াস কোন বিজ্ঞানীই করতে পারেন না। রাণীগঞ্জ, আসানসোল ও তার চারপাশের অঞ্চল জুড়ে একটা সমুদ্রোপম বিস্তীর্ণ হ্রদের মধ্যে স্তরে স্তরে জমেছিল যে পলি ও উদ্ভিদের স্তর তা কালক্রমে জমাট বেঁধেছিল বেলেপাথর, কাদাপাথর ও কয়লায় এবং তাদের সৃষ্টি হতে প্রায় কুড়ি পঁচিশ কোটি বছর লেগে গিয়েছিল। তাদের একেবারে নীচের দিকে তুষারের চিহ্নযুক্ত অঙ্গারহীন বেলেপাথর, কাদাপাথর ও শিলা খণ্ড যুক্ত কাদা-পাথরের স্তর আছে। তারপর প্যালিওজোয়িক (এখন থেকে উনত্রিশ কোটি বছর) অধিকল্প বা era হয়ে শুরু হয়েছে, মেসোজোয়িক অধিকল্প (প্রায় আঠারো কোটি বছর এর মেয়াদ)। গণ্ডোয়ানা হ্রদে পলি জমার পালা চলে এখন থেকে চৌদ্দ কোটি বছর আগে পর্যন্ত। উদ্ভিদ সঞ্চয়ের পালা শেষ হবার পরও বিস্তীর্ণ পলি যে কি বিপুল পরিমাণে সঞ্চিত হয়েছিল তা আমরা পাশেই পাঞ্চেৎ ও বিহারীনাথ পাহাড়ে গেলে দেখতে পাই। গণ্ডোয়ানা হ্রদে পলি জমতে শুরু করেছিল প্রায় দশ কোটি বছর আগে। অর্থাৎ একটানা প্রায় উনিশ কোটি বছর ধরে চলেছিল গণ্ডোয়ানার পলি ও উদ্ভিজ্জের সঞ্চয়। সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে চলে জমাট বাঁধার পালা ও চাপ ও তাপের ক্রিয়ায়। অবশেষে গণ্ডোয়ানা হ্রদ যখন শুকিয়ে যাবার উপক্রম হল, তখন প্রবল আলোড়নে বিক্ষুব্ধ হল গণ্ডোয়ানার স্তরগুলি এবং শুরু হল ভূগর্ভস্থ তরলিত ম্যাগমার (তরলিত শিলাপুঞ্জ) আত্মপ্রকাশ আগ্নেয়গিরির মধ্য দিয়ে। কয়লা ও সংশ্লিষ্ট শিলাস্তরের মধ্য দিয়ে এই ম্যাগমা জমাট বেঁধে আগ্নেয় শিলার আকার নিয়েছে। রাণীগঞ্জ কয়লা ক্ষেত্রে কয়লা ও তার সঙ্গে স্তরীভূত শিলাকে বিদীর্ণ করে বিরাজ করছে ডলারাইট, মাইকাপেরিডোটাইট বা ল্যাম্প্রেফায়ার নামক আগ্নেয় শিলা। এইসব আগ্নেয় শিলা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎগারের বন্ধ পথগুলিতে জমাট বেঁধে আছে। ক্রিটেশাস (Crataceous)(১৪ কোটি বছর পূর্ববর্তী যুগ) যুগে সংঘটিত এই আগ্নেয় শিলার সঙ্গে সঙ্গে অবসান ঘটল মেসোজোয়িক অধিকল্পের।

তারপর শুরু হল নতুন অধিকল্প, যার নাম ট্যার্শারি (Tertiery) (আট থেকে এক কোটি বছর পর্যন্ত এই অধিকল্পের বিস্তার)। বর্দ্ধমান জেলায় এই অধিকল্পের ওপরের দিকের কিছু শিলাস্তরে আংশিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে আছে। তাদের অধিকাংশই নুড়ি ও বালির স্তর। এই অধিকল্পের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে পুরো অঞ্চল জুড়ে পলি, বালি মাটি সব জমা যেন বন্ধ হয়ে গেল এবং শুরু হল অবক্ষয়ের পালা। তাপ এই অঞ্চলে বাড়তে আরম্ভ করলো। পৃষ্ঠস্থলগুলো পুড়ে লাল হয়ে গেল। যদিও এই কার্যক্রমের বয়স সঠিক জানা যায় না তবুও মোটামুটিভাবে ধরা যায় দশলাখ বছর আগে। বর্দ্ধমান জেলার অনেকাংশে এর স্বাক্ষর এখন দেখা যায়, বাঁকুড়ার সাথে লাগা জায়গাগুলো, গণ্ডোয়ানার পৃষ্ঠস্তলগুলো, মানকর ও পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চল এবং ঝাড়গ্রামে গেলেই দেখা যায়।

বর্দ্ধমান জেলার যে দুটি রূপের কথা বলা হয়েছিল তার অপরটি দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্ত। এই ট্যাশারী (Tertiery) অধিকল্পে বঙ্গোপসাগরের জলে নিমজ্জিত। নুড়ি ও বালিতে তখন

ভরে উঠছে আর সমুদ্র যেন আস্তে আস্তে পিছিয়ে চলেছে। গভীর নলকূপ করতে গিয়ে অনেকেই এই নুড়ি বালির সন্ধান পেয়েছেন জেলার দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তের বিভিন্ন জায়গায়। এই সামান্য জমাট বাঁধা নুড়ি, বালি ও কাদার স্তর বিরাজ করছে এই সব প্রান্তে আর তাদের ওপরে পড়েছে মৃত্তিকার প্রলেপ। এই মৃত্তিকা বয়ে নিয়ে এসেছে নদী। এখানে বঙ্গভূমির উৎপত্তি একটু বলে নেওয়া ভাল। প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগে গঙ্গা ও পদ্মার অববাহিকা অর্থাৎ গঙ্গা, ভাগীরথী, হুগলী ও পদ্মার মধ্যবর্তী অঞ্চল ছিল বঙ্গোপসাগরের আওতায়। তখন রাঢ়ের মালভূমি (বাঁকুড়া, পুরুলিয়া,বীরভূম,বর্ধমান ও মেদিনীপুর) রাজমহল পাহাড় ও শ্রীহট্টের পাহাড়ী অঞ্চল ছুঁয়ে যেত বঙ্গোপসাগরের জল।
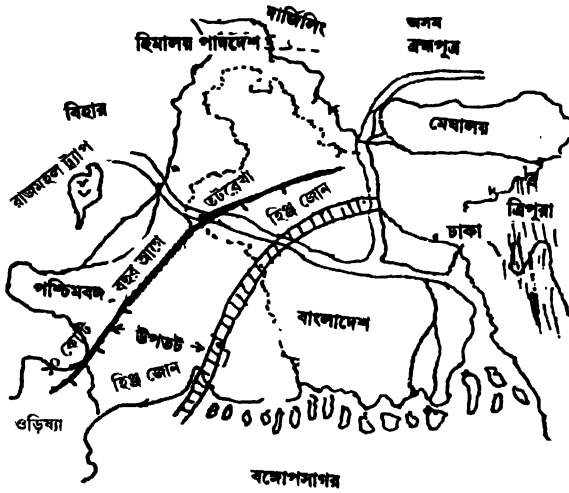
হিমালয় পর্বত থেকে নেমে উত্তর ভারতের সমতলভূমি ধুয়ে গঙ্গা নদীর জলের ধারা সমুদ্রের বিপুল জলরাশিতে লীন হত তার সাথে সাথে চলতো অবক্ষয় ও সঞ্চয়ের পালা। হিমালয় থেকে বিশ্লিষ্ট শিলা চূর্ণের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ছিল নদী খাতে অবক্ষয় জাত বালি ও মৃত্তিকা কণা। নদীর জলের ক্ষুরধারায় তারা সুক্ষ্মতর কণায় পরিণত হত। যাকে বলে 'পলিমাটি', জলের ধারায় জলের মতই তরলিত হয়ে বাহিত হত সমুদ্র অভিমুখে। সমতল ভূমির উপর দিয়ে বয়ে যেতে স্তিমিত হত নদীর বেগের আবেগ। তারপর শুরু হত পলিমাটির সঞ্চয়। নদীখাত বেয়ে সঞ্চয়ের পরিমাণ পরিমিত, কেবলমাত্র স্থুলতর শিলাচূর্ণ বা বালি ও পলির কণা নদীর স্তিমিত স্রোতের সুযোগ নিয়ে জমতে থাকত। সুক্ষ্মবালি বা পলির কণা নদী সমুদ্র মোহনা পর্যন্ত না পৌঁছানো পর্যন্ত জলের ধারার সঙ্গেই মিশে থাকত। নদী সমুদ্রে লীন হওয়ার পর শুরু হত তাদের সঞ্চয়। সমুদ্রের অগাধ জলরাশির অন্তরালে এর সঞ্চয় বহু শতাব্দী ধরে চলে। তারপর ধীরে ধীরে জলের মধ্যে থেকে মাথাচারা দিয়ে উঠেছিল এই বিশাল ব-দ্বীপ, যার নাম দেওয়া হয় বঙ্গভূমি।

নদী থেকে উৎপন্ন কাজেই বঙ্গভূমি সত্যি করেই নদীমাতৃক দেশ। জলের মধ্য থেকে তার
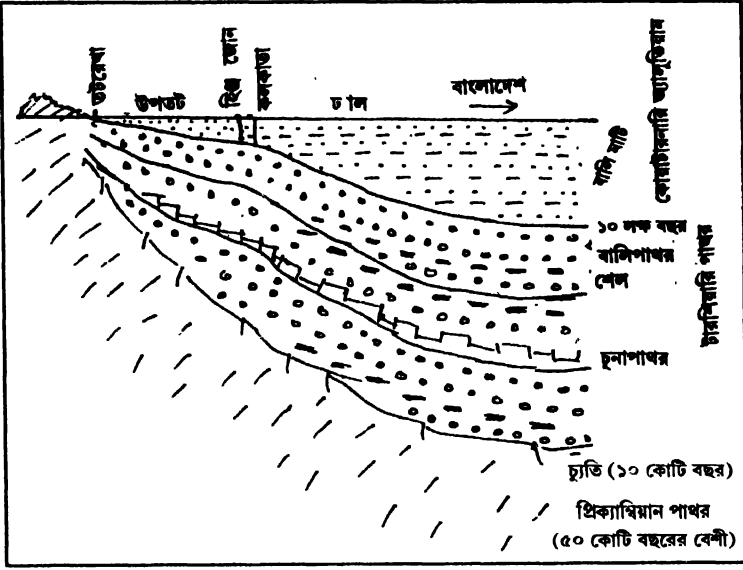
বেসিনের নীচে পলির স্তর বিন্যাস

উত্থানের পরও সৃষ্টির পালা শেষ হয়নি। নদীখাত বেয়ে পলিমাটির সঞ্চয় চলতেই থাকে বলে নদীখাতের মধ্যে পরিবর্ত্তন আসে। পুরানো খাত ভরাট হয়ে গিয়ে নতুন খাত সৃষ্টি হয় এবং নদীর ধারার মধ্যে পরিবর্ত্তন দেখা দেয়। বর্ধমান জেলার বেশ কিছুটা অংশ অনুরূপ ভাবে এবং ছোটনাগপুরের মালভূমি বা মালভূমি সন্নিহিত উঁচুভূমিতে উৎপন্ন অজয় ও দামোদরের জলধারায় নিয়ে আসা অবক্ষয়জাত বালি ও মৃত্তিকা কণায় গড়ে উঠেছে ভাগীরথী ও হুগলীর পশ্চিম তীরে দামোদর ও অজয় নদীর অববাহিকা বা রাঢ়ভূমির অংশ বিশেষ। এখানে ঘটেছে মাটির প্রকৃতির আমূল পরিবর্তন। পলিমাটির সাদাটে ধূসর রঙ এখানে বাদামী রক্তাভায় রূপান্তরিত। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান ও পুরুলিয়া জেলার লোহাযুক্ত ল্যাটেরাইট এবং রকমারি শিলার স্তর থেকে বিযুক্ত লোহা এখানকার মাটিতে এসে মিশেছে। লোহার প্রলেপ মাখানো পলিমাটির পাশাপাশি রয়েছে পাথরের স্তরের অবক্ষয় জাত রুক্ষ বেলে মাটি। বর্ধমান জেলার নদীগুলি বর্ষায় কিছুটা উত্তাল হয়ে উঠলেও তাদের মধ্যে তেমন উদ্দাম আবেগ নেই যা তাদের নির্দিষ্ট খাত থেকে বিচ্যুত করতে পারে। তার সাথে পড়েছে মানুষের হাত যা তাদের নির্দিষ্ট খাতে বাঁধতে চেষ্টা চলছে।

বর্ধমান জেলার পশ্চিমভাগের শেষ সীমার উত্তর দিকের (রূপনারায়ণপুর এর কাছে সালানপুর ব্লকে) কিছুটা জায়গা প্রাক্ কেম্ব্রিয়ান (Pre - Cambrian) কল্পের রূপান্তরিত শিলা দিয়ে গঠিত। জেলার পশ্চিম ভাগের বেশ কিছুটা অঞ্চল (প্রায় ২০৬৪ বর্গ কি.মিঃ) গণ্ডোয়ানা সুপার গ্রুপের পাললিক শিলা দ্বারা আবৃত এবং এই সুপার গ্রুপের নিম্নভাগে (পার্মো-কার্বোনিফেরাস যুগ) (Permo - Carboniferous) প্রচুর পরিমাণে কয়লা।

এই কয়লা প্লাবিত অঞ্চলের নাম 'দামুদা (Damuda) কয়লাক্ষেত্র' বা 'রাণীগঞ্জ কয়লাক্ষেত্র' । জেলার বাকী বৃহত্তর ভাগ কিন্তু পলি দিয়ে তৈরী। ত্রেতাকল্পের বালু এবং মাটি কয়েকটি জায়গায় মাত্র প্রদর্শিত। চতুর্থকল্প এবং অধুনাকল্পের মাটি ও বালুই বেশীরভাগ অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত। জেলার চতুর্থ কল্পের প্রাপ্ত ল্যাটেরাইট বালু ও মাটি প্লেইস্টোসিন (Pleistocene) থেকে হলোসিন (Holocene) অধিকল্পের মধ্যেই সীমাবদ্ধ । বৃহত্তর জায়গা জুড়ে যে কল্পের শিলা লক্ষণ পাওয়া যায় সাধারণভাবে তার স্তরায়ণ তত্ত্ব এখানে পৃথকভাবে দেওয়া হলো ঃ

গঠন নাম	শিলার বর্ণনা	ভূ-তাত্ত্বিক কাল(মিলিয়ন বঃ)
অজয় দামোদর	হলুদ রংয়ের মোটা থেকে সুক্ষ্মদানার লোহময় বালু ঈষৎ ধূসর হলুদ মাটি ও পলি	হলোসিন (Holocene) ১-০.০১ মি.বঃ)
বিষ্টুপুর	বৎক্রমতা লৌহময় বালু, হলুদ লিথোমার্জিক এবং ভ্যারিগেটেড মাটি, ল্যাটেরাইট, চূর্ণকময় পিণ্ড ।	প্লাইয়োসিন হইতেপ্লেষ্টোসিন ৮-১ মিঃবঃ (Pliocene to Pleistocene)
আলিনগর	ব্যৎক্রমতা পাণ্ডু সাদা বালি, ফবোপল আঠালো ধূসর বর্ণের মাটির সহিত অঙ্গারযুক্ত পদার্থ	মায়োসিন ২৫ মি ঃ বঃ (Miocene)
ঘাটপুকুর (পশ্চিমভাগে) এবং তিলক চন্দ্রপুর(পূর্বভাগে)	ব্যৎক্রমতা অঙ্গারযুক্ত শেল, মৃত্তিকাশিলা ধূসর এবং ধূসরকালো রংয়ের বালুস্তর এবং লিগনাইট (পঃ ভাগে) নীলবর্ণের ধূসর মৃত্তিকা শিলা, পাললিক শিলা,বালুকা শিলা, চূর্ণময় শেল চুনাপাথর (খণ্ডময় জীবাশ্ম সমেত) (পূঃ ভাগে)	অলিগোসিন হইতে মায়োসিন (৩৮ - ২৫ মিঃ বঃ) (Oligocene)
কুলডিহা	ব্যৎক্রমতা বালু,কেওলিনিটিক গোরিমাটি ও বালু শিলা, লাল, সবুজ ও সাদা মাটি	মধ্যম ক্রিটেসিয়াম হইতে অলিগোসিন (১৬০ - ৩৮ মিঃ বঃ) (Cretaceous)
দুর্গাপুর	ব্যৎক্রমতা মোটা হইতে খুব মোটাদানার ফেলসফেথিক বালু পাথর, কর্কর এবং কপোবল, কদাচিৎ লাল এবং সবুজ শেল, অঙ্গারযুক্ত শেল এবং বালুশিলা, কয়লা লেন্স।	মধ্যম ট্রায়াসিক হইতে লেয়ার ক্রিটেসিয়সে (২৫০ মিঃ বঃ থেকে ১৬০ মিঃ বঃ) (Mid Triasic to lower Cretaceous)

গঠনে, গুণে - জেলা বর্ধমান

গঠন নাম		শিলার বর্ণনা	ভূ-তাত্ত্বিক কাল(মিলিয়ন বঃ)
গ গো	পাঞ্চেৎ	ব্যুৎক্রমতা মাঝারি থেকে সূক্ষ্মদানার বালু শিলা - ধূসর সবুজ রংয়ের, শেল এবং সবুজ শেল।	লোয়ার ট্রায়াসিক হই'তে কার্বো পারমিয়ান (৩০০ - ২৫০ মিঃ বঃ) (Lower Triasic to Carbo Permian)
য়া না	রাণীগঞ্জ	সাদাটে ধূসর রংয়ের ফেলসফেরিক বালু শিলা, অঙ্গার যুক্ত শেল, ধূসর শেল, কয়লা।	
সু	আয়রণ শেল	শেল, মাটি , লৌহময় খণ্ড	
পা র	বরাকর	সাদা ধূসর ফেলসফেথিক বালুশিলা, কর্কর ও কংগ্লোমারেট, তাপরোধী পলি কয়লা।	
গ্রু প	তালচের	ব্যুৎক্রমতা টিলাইট থেকে সালজাত কংগ্লোমারেট, হলুদ সবুজ বালুপাথর ইত্যাদি।	কার্বোনিফেরাস (৩৫০ মিঃ বঃ) (Carboniferous)
আর্কেয়ান		ব্যুৎক্রমতা গ্রানাইট নাইস, হর্ণব্লেণ্ড শিষ্ট, প্ররিক্রমিত এম্ফিবোলাইট, পেগমাটাইট এবং ভেন ফোয়াটিক।	প্রিকেম্ব্রিয়ান (৩৬০ মিঃ বঃ) (Precambrian)
		ভিত্তি অজানা	

উপরোক্ত কালক্রম স্তরায়নতত্ত্ব যে দেওয়া হল, ভূততত্ত্ববিদেরা নিম্নোক্ত রেখা কয়েকটি বিষয় গবেষণা করে ঠিক করেন।

১। শিলাস্তরের ভৌতিক পারস্পরিক সম্পর্ক পরীক্ষা যারমধ্যে ক্রম উপরোপন, পাশ্বিক বিভিন্নতা , প্রবারণ, বুৎক্রমতা, চ্যুতি, ভাঁজ উদবেধ, বিপরিবর্তন এবং অন্তর্নিবেশ, বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

২। শিলা লক্ষণ পরীক্ষা

৩। পুরাজীবীয় তত্ত্ব যারমধ্যে উদ্ভিদ এবং প্রাণী জগতের চাক্ষুষ ও অনুবীক্ষণীয় জীবাশ্ম বিশেষ পরীক্ষা। কিন্তু চতুর্থ কল্পের শেষভাগের শিলারাশির ক্ষেত্রে কার্বন - ১৪ এবং নাইট্রোজেনের সমতেজস্ক্রিয় পদার্থ দ্বারা কালক্রম নির্ণয় করা হয়।

৪। সমতেজসক্রীয় পদার্থের বয়স নির্ধারণ করা হয় যেমন ইউরেনিয়াম - লেড, রুবিডিয়াম স্ট্রনসিয়াম, পটাশিয়াম - আর্গন ইত্যাদির ক্ষয় পদ্ধতি পরীক্ষা।

৫। ভূচুম্বকীয় অবস্থান পরিবর্তন পরীক্ষা।

৬। পুরাবহতত্ত্ব পরিবর্তন পরীক্ষা

৭। পুরা-ভূগোল এবং সমুদ্র পৃষ্ঠের উত্থানপতনহীন পরীক্ষা

৮। গিরিসৃজনকারী শক্তির ফল পরীক্ষা।

কয়লা সম্পদ ঃ বর্দ্ধমান জেলার খনিজ বৈভব প্রধানত কয়লাকেই বোঝায়। সমগ্র ভারতবর্ষের কয়লাখনি শিল্পের জন্মস্থান রাণীগঞ্জ কয়লাক্ষেত্র অঞ্চলে পৃষ্ঠতল থেকে প্রায় ১২০০ মিটার গভীর পর্যন্ত সঞ্চয় প্রায় ২২১৫০ মিলিয়ন টন এবং বেশী পরিমাণই উন্নতমানের। এই কয়লা সম্পদ গণ্ডোয়ানা সুপার গ্রুপ পাথরের সঙ্গে যুক্ত। কয়লা ছাড়া চীনামাটি , আয়রনে স্টোন সেল, তাপসহিষ্ণু মৃত্তিকা, প্রচুর পরিমাণে নদীর বালি (গৃহাদি নির্মাণ উপকরণ বালি), গঠন কার্য বালি, কাচ শিল্প বালি এবং গেরিমাটিও পাওয়া যায়। চীনামাটি ত্রেতাকল্পের ল্যাটেরাইট এবং দুর্গাপুর সংস্তরের সঙ্গে যুক্ত। পুরুলিয়া, মালিকাপুর, কাটাবেরিয়া , হরিপুর, মলানদিঘী ও ফুল ঝরিতে প্রায় ৮৫.৫০ মিলিয়ন টন সঞ্চয়।

বালি ও মাটি

তাপ সহিষ্ণু মৃত্তিকা রাণীগঞ্জ কয়লা স্তরের সঙ্গে যুক্ত। গণ্ডোয়ানা সুপার গ্রুপের বরাকর গঠনের মধ্যে উৎপন্ন।এই তাপ সহিষ্ণু মৃত্তিকা সুঘট এবং সাদা থেকে ক্রিম রংয়ের রাণীগঞ্জ কয়লাক্ষেত্রে এই মৃত্তিকার সঞ্চয় প্রায় ৪ মিলিয়ন টন। আয়রণ স্টোন সেল (লৌহ পরিমাণ ৪০ - ৫০%) গণ্ডোয়ানা সুপার গ্রুপের উযর স্তরের সঙ্গে যুক্ত। দামোদর নদীতেই বালি (বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত) প্রায় ৬০০ মিলিয়ন টন। গঠন কার্য বালির সঞ্চয় প্রায় ৪.৯০ মিলিয়ন টন এবং গণ্ডোয়ানা সুপার গ্রুপের পাঞ্চেৎ গঠনের সঙ্গে যুক্ত। কাচশিল্প বালি ও গণ্ডোয়ানা সুপার গ্রুপের বালুপাথরের সঙ্গে যুক্ত। গেরিমাটি দুর্গাপুর সংস্তরের সঙ্গে যুক্ত। এছাড়া জেলায় প্রচুর পরিমাণে পলিমাটি (এঁটেল মাটি) বালুমাটি পাওয়া যায় : এই সব মাটি কৃষিকার্য ছাড়াও ইঁটভাটার কাজ এবং কুম্ভকারের কাজে বিপুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।কিছুদিন যাবৎ রাণীগঞ্জ কয়লাক্ষেত্র অঞ্চলে 'ডলোরাইট গর্হক' পাথর পথনির্মাণশিলা হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই পাথরকে উদ্‌বেধী শিলা বলা হয় এবং গণ্ডোয়ানা সুপার গ্রুপের সমস্ত স্তরগুলিতে অর্ন্তভেদ করিয়াছে। ল্যাটেরাইট স্তুপ ও মাটি ভাল মতই পাওয়া যায়।

জেলার ভূমি সম্পদ ঃ

১। ভৌগোলিক ক্ষেত্র - ৭,০০,১০০ হেক্টর

২। মোট কৃষিযোগ্য ভূমি (রোপনভূমি ও ফলের বাগান সমেত) - ৪,৫৫,৩০০ হেক্টর

৩। বনভূমি - ৩১,০০০ হেক্টর

৪। অ-কৃষিভূমি - ১,৮৭,৬০০ হেক্টর

৫। স্থায়ী চারণভূমি ইত্যাদি - ৩,৫০০ হেক্টর

৬। পতিত ভূমি - ১৩,৫০০ হেক্টর

জেলার জল সম্পদ

পৃষ্ঠস্থ জল জেলার আবহাওয়া উপাদান, স্থলভূমির আকৃতি ও প্রকৃতি এবং স্থলভূমির ধারণ ও প্রেরণ ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল। সব মিলিয়ে পৃষ্ঠস্থ জল সম্পদ মাঝারি ধরনের।

বর্দ্ধমান জেলার ভূ-তত্ত্ব ও ভূ-আকৃতিতত্ত্ব জেলার অর্ন্তভৌম জল সম্পদের জন্য সম্পূর্ণরূপে স্পষ্টতঃ দায়ী। জেলার পশ্চিমভাগ আর্কিয়ান যুগ এবং গণ্ডোয়ানা সুপার গ্রুপের শিলাস্তর দ্বারা আবৃত এবং ঢেউখেলানো স্থলাকৃতি। জলবিজ্ঞান অনুসারে জেলার এই এক তৃতীয়াংশ অঞ্চলে দীর্ঘকাল স্থায়ী ভূ-জলের ঘাটতি। এই ভাব দুর্গাপুর পর্যন্ত। দুর্গাপুরের পর হইতে পূর্বভাগ শেষ পর্যন্ত অদৃঢ়ীভূত পলন দ্বারা আবৃত হওয়ার জন্য জলবিজ্ঞান অনুসারে অর্ন্তভৌম জল সম্পদ মাঝারি ধরনের। এই অর্ন্তভৌম জল সম্পদের জলপীঠ,জলতল এবং জলচাপ বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার হওয়ার কারণ ও ভিন্ন ভিন্ন । সুতরাং এই জেলার জল সম্পদ সম্পর্কে আলোচনা বিশদভাবে প্রয়োজন।

জেলার প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে সংক্ষেপে বলতে গেলে - বেশ কিছু অঞ্চলে ভাল মিষ্ট জলের অভাব, জেলায় বোরো কৃষিকার্যের ক্ষেত্রে, খনি অঞ্চলে, শিল্পাঞ্চলে মিষ্টজল এবং ভূ-জলের যথেচ্ছ অপব্যবহার, স্থানে স্থানে পরিবাহ পদ্ধতি অনুন্নত হওয়ায় এবং স্থলঢাল পরিপন্থী হওয়ায় অপ্রয়োজনীয় জমা জল, মৎস্য চাষের পরিপন্থী জমা জল, বন্যা, নদীগুলির মৃৎপ্রাকার ভেঙ্গে পড়া, নদীর জলে শিল্পজাত বিনষ্ট দ্রব্যের যথেচ্ছ সংরক্ষণ এবং অপব্যবহার,রাণীগঞ্জ কয়লাক্ষেত্রের ভূ-কম্পন, বন নিধন, কৃষি জমির হ্রাস, স্থানে স্থানে ইঁট খোলা, নদীনালাগুলিতে পলি জমা ইত্যাদি জেলার উন্নতিতে বাধা এবং বিপজ্জনক সংকেত। আর্সেনিক দূষণ নিয়ে সকলেই খুব চিন্তিত। বর্দ্ধমান জেলায় কেবলমাত্র পূর্বস্থলী ব্লকে ভাগীরথী নদীর পশ্চিমপাড় অঞ্চলে ৩৪.১৫ মিটার গভীর নলকূপের জলে আর্সেনিক পাওয়া যায়। এই আর্সেনিক ভাগীরথীর পলনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। জেলার অন্যত্র আর্সেনিক দূষণের সম্ভাবনা প্রায় নেই। বর্দ্ধমান জেলার অর্ন্তভৌম জল সম্পদ এবং পরিবেশ দূষণ পরিচালন অভিপ্রায় প্রস্তাব সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনার প্রয়োজন। ভবিষ্যতে এইসব আলোচনার পরিবেশনের আশা রাখি। তেমনই আশা রাখি বর্দ্ধমান জেলার পুরাতাত্ত্বিক ক্ষেত্র - দামোদরের তীরে বীরভানপুর, ভরতপুর, তালিতগড়, বর্দ্ধমানেশ্বর, জুজুটির কাছে মন্দির ভূ-গর্ভস্থ, অজয় নদীর তীরে পাণ্ডবেশ্বর, কুনুর নদীর তীরে মঙ্গলকোট, খড়গেশ্বরীর তীরে সাঁওতাল ও বানেশ্বর ডাঙ্গায় কিছু কিছু আবিষ্কৃত নিদর্শন সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা পরিবেশনের।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ

(১) কৃষ্ণাণ এস (১৯৬৮) ঃ ভারতবর্ষ এবং বর্মার ভূতত্ত্ব
(২) সঙ্কর্ষণ রায় (১৯৭৯) ঃ ভূতাত্ত্বিকের চোখে পশ্চিমবাংলা
(৩) গোপেন্দ্রনাথ দত্ত (১৩৭৭) ঃ ভূ-বৈজ্ঞানিক পরিভাষা
(৪) ই.এইচ.প্যাসকো (১৯১৪)ঃ পেট্রোলিয়াম অকারেনসেস অফ্ আসাম এ্যাণ্ড বেঙ্গল।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ জয়িতা রায়, বর্দ্ধমান।
অজয় কোনার, বর্দ্ধমান

নিম্ন দামোদর অঞ্চলে ভাঙন, প্লাবন ও জলমগ্নতার কারণ

ড. বাসুদেব দে

সার সংক্ষেপ

দুর্গাপুর ব্যারেজের নীচে থেকে আরম্ভ করে দ্বারকেশ্বর নদ ও আমতা খালের অন্তর্গত সমস্ত নিচু অঞ্চলকে 'নিম্ন দামোদর অঞ্চল' বলে। দ্বারকেশ্বর, দামোদর, মুণ্ডেশ্বরী, রূপনারায়ণ প্রভৃতি এই অঞ্চলের নদ-নদী। সমস্ত এলাকাটির ক্ষেত্রফল প্রায় তিন হাজার বর্গ কিমি।

বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন, নৌ-চলাচল, মাছ চাষ, আমোদ-প্রমোদ ছিল ডি.ভি.সি'র মূল কর্ম - পরিকল্পনা। কিন্তু 'বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচের জল সরবরাহ লাভ জনক নয়' বলে ডি.ভি.সি. তার সমস্ত উদ্যোগ তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যয় করছে এবং একের পর এক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র - বোকারো, চন্দ্রপুরা, মেজিয়া প্রভৃতি স্থাপন করে চলেছে। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ফ্রান্স থেকে টারবাইন, জার্মান থেকে জেনারেটর নিয়ে আসা হ'য়েছিল, কিন্তু জল-বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় না বা খুব কম হয়। মাছ চাষও লাভ জনক নয়, নৌ চলাচল বন্ধ।

সেচের জল দেবার জন্য দামোদরের দক্ষিণ দিকে ৮৯ কি.মি. প্রধান ক্যানাল, বামদিকে ১৩৭ কি.মি. প্রধান ক্যানাল এবং ২২৭০ কি.মি. শাখা ক্যানাল খনন করা হয়েছে। ১.৯ লক্ষ ও ৬.২৫ লক্ষ একরে (ডানদিকে ও বাঁ দিকে যথাক্রমে) বা মোট ৮.১৫ লক্ষ একরে জল দেবার জন্য ; বাস্তবে গ্রীষ্মে জল দেওয়া হয় মাত্র এক লক্ষ একরে।

মূল পরিকল্পনা থেকে যে ডি.ভি.সি. সরে গেছে তা কেন্দ্র সরকার বা রাজ্য সরকার কেউ-ই দেখেন না।

তথাকথিত পরিবেশবিদ্‌রা ডি.ভি.সি'র ভালো দিকটা (আংশিক বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ ব্যবস্থা) না দেখে কেবলমাত্র খারাপ দিকটাই দেখেন। পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব তাদের নেই, ডি.ভি.সি'র তো নেই-ই।

সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিটি যোজনায় টাকা বরাদ্দ করা হয় ; ৫ম থেকে ৮ম যোজনা পর্যন্ত প্রতিটি যোজনায় যে পশ্চিমবঙ্গ তুলনা মূলকভাবে কম টাকা পেয়েছে তা পশ্চিমবঙ্গ থেকে নির্বাচিত কোন সাংসদ দেখেন না। পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী ও বিধায়করাও বিষয়টি সম্পর্কে উদাসীন।

বছরের ৩১ অক্টোবর তারিখে ডিভিসি'র ড্যাম চারটিতে মোট ২৬ লক্ষ একর ফুট জল রাখার কথা, কিন্তু ডি.ভি.সি. রাখে মাত্র ১২-১৩ লক্ষ একর ফুট জল। ড্যামগুলির সামর্থ্য

অনুযায়ী জল ধরে রাখলে বন্যা সম্পূর্ণ রোধ হ'য়ে যায় এবং খরাতেও সেচের জল পাওয়া যায়, কিন্তু তা ডি.ভি.সি করে না। কেননা পরিকল্পনা অনুযায়ী ড্যামের জন্য যে জমি অধিগ্রহণ করা দরকার, তা ডি.ভি.সি করেনি। ডি.ভি.সি'র উৎপাদিত তাপ বিদ্যুতের ৩৮৫৬.৬২০ MKWH (মিলিয়ন কিলো ওয়াট আওয়ার) পেয়ে আসছে বিহার এবং প.ব. পায় ১৬০ MKWH মাত্র।

যে সব নদ-নদী দুই বা ততোধিক রাজ্য বা দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে, সেই রাজ্য বা দেশ একত্রে বসে নদ-নদী জনিত সমস্যা সমাধানের সূত্র খোঁজার চেষ্টা করে। পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার সরকার এক সঙ্গে ইদানীংকালে বসেনি, কেন্দ্রকেও কোন অনুরোধ করেনি। বিষয়টির ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের নেতা-মন্ত্রীরা উদাসীন।

জল একটি সম্পদ। সে সম্পদ সংরক্ষণে সব রাজ্য অগ্রণী ; পশ্চিমবঙ্গের নেতা, মন্ত্রী ও পরিবেশবিদ্‌রা দায়িত্ব এড়াতে ভুয়ো আদর্শে বিশ্বাসী।

G-7 ভুক্ত দেশগুলো G-77 দেশগুলোকে পৃথিবীর দূষিত পদার্থ শোষনের ক্ষেত্র (Global Pollutant Sink) তৈরী করতে চায়। কিছু সংগঠন ও কিছু ব্যক্তি G-7 ভুক্ত দেশগুলোর টাকা নিয়ে (দান বাবদ) সে কাজে সহায়তা করে যাচ্ছে।

ভূমিকা

ঝাড়খণ্ডের পালামৌ জেলার ছোটনাগপুর মালভূমির খামারপত পাহাড় (১৩৬৬ মিটার) থেকে দামোদর নদের উৎপত্তি। তারপর রাঁচি, হাজারিবাগ, গিরিডি, সাঁওতাল পরগনা এবং ধানবাদ হয়ে ২৯০ কিমি পথ অতিক্রম করে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলী হয়ে হাওড়া জেলার ফলতায় হুগলী নদীর (গঙ্গা) সঙ্গে মিশেছে ২৫১ কিমি পথ অতিক্রম করে। বরাকর, বোকারো, কোনার, জামুরিয়া, সফি, হাহারো, উগ্রি, তিরকি, রাজোয়া, তানরো, ক্ষুদিয়া এবং গোয়াই প্রভৃতি এর ১২টি উপনদী। এদের মধ্যে বরাকর নদী প্রধান ও প্রবল। বিহারে (বর্ত্তমান ঝাড়খণ্ডে) পাহাড়ি এলাকায় দামোদরের যে অববাহিকা, তাকে উঁচু উপত্যকা (Upper Damodar Valley), মধ্যে ধানবাদ ও বর্ধমানের শিল্পাঞ্চল এলাকার ভিতর দিয়ে প্রবাহ পথের চারপাশকে মধ্য উপত্যকা (Middle Damodar Valley) এবং দুর্গাপুর ব্যারেজের নিচে থেকে আরম্ভ করে কলকাতার হুগলী নদীর মোহনা পর্যন্ত অঞ্চলকে বলা হয় নিম্ন দামোদর অঞ্চল বা নিম্ন দামোদর অববাহিকা (Lower Damodar Basin)। * অবশ্য বর্ধমানের সদরঘাটে দামোদর নদ পার হয়ে রায়না-১ ও রায়না-২ ব্লকের যে অঞ্চল তাকে ট্রান্স - দামোদর সহ সমস্ত এলাকাকে দক্ষিণ দামোদরও বলে। সে হিসাবে 'নিম্ন দামোদর' বলতে লোকে খানাকুল-১, খানাকুল-২, বাগনান, উদয়নারায়ণপুর, আমতা প্রভৃতি অঞ্চলকে বোঝেন।

** দামোদরের উচ্চ অববাহিকার ক্ষেত্রফল (catchment area) ৭৫০০ বর্গ মাইল এবং নিম্ন অববাহিকার ক্ষেত্রফল ১০০০ বর্গ মাইল।*

দামোদর দুঃখের নদ। দুঃখের ইতিহাস অনেক। সর্বশেষ ভয়ংকর বন্যা হয়ে যায় ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে, যখন কলকাতা বাকি ভারতের থেকে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ভারত স্বাধীন হবার পর ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের ৭ জুলাই গঠিত হয় দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন (ডি.ভি.সি)। ঐ সময়ে ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার ও নদী বিশেষজ্ঞদের সম্পূর্ণ ধারনা ছিল না বর্ষায় কিভাবে দামোদরের ভয়ংকর জলরাশিকে রোধ করা যায়। ভারত সরকার সে জন্য পৃথিবীর সব কাগজে বিজ্ঞাপন দেন। আমেরিকার টেনেসি ভ্যালি অথরিটির (Tennesse Valley Authority) ইঞ্জিনিয়ার W.L. Voorduin কে নির্বাচিত করেন।

দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা

এই পরিকল্পনায় সাতটি ড্যাম তৈরির পরিকল্পনা করা হয়। স্থানগুলি হলঃ (১) মাইথন, (২) পাঞ্চেৎ, সোনালপুর (৩) আয়ার, (৪) তিলাইয়া, (৫) বলপাহাড়ি, (৬) কোনার, (৭) বোকারো।

বড় জলাধার	৫	নদী জল উত্তোলন সেচ	২৫০
মাঝারি জলাধার	১৬	মৃত্তিকা সংরক্ষণ বাঁধ	১০,০০০
ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প	৮৩৪	কূপ	১৬,০০০
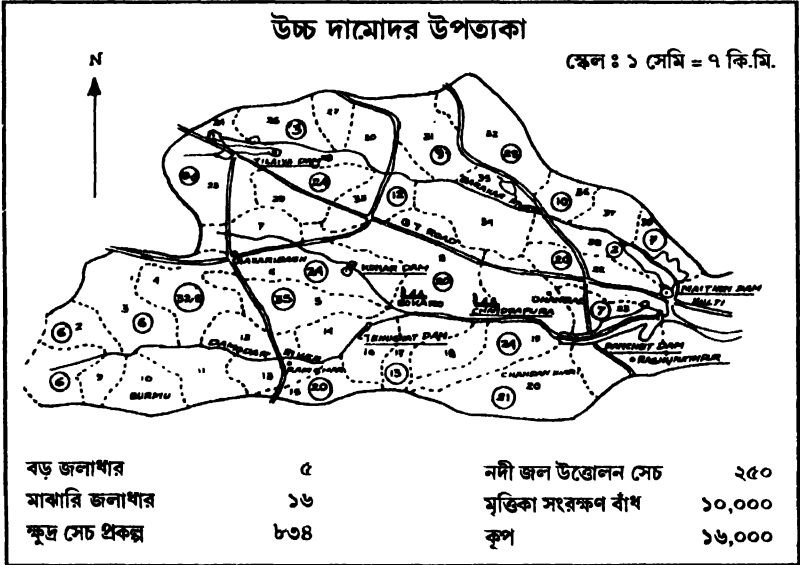
জায়গাগুলি সবই পশ্চিমবঙ্গ সংলগ্ন বিহারে (ইদানিং ঝাড়খণ্ডে) অবস্থিত। ড্যাম তৈরির উদ্দেশ্য বহুমুখী। যেমনঃ (১) বন্যা নিয়ন্ত্রণ (প্রথম অগ্রাধিকার), (২) সেচ, (৩) জলবিদ্যুৎ উৎপাদন, (৪) মাছ চাষ, (৫) জলযান চলাচল ও (৬) আমোদ-প্রমোদ।

লক্ষণীয় এই যে, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি কিংবা শহর ও শিল্পাঞ্চলে জল দেওয়ার পরিকল্পনা ডি.ভি.সি'র মূল পরিকল্পনায় ছিল না।

সাতটি জলাধারের (Dam/Reservoir, ম্যাপে Res) জলধারণের মোট সামর্থ্য হবে ঠিক

করা হয় ৪৬.৮ লক্ষ একর - ফুট। * তা হলে বন্যার সর্বোচ্চ - প্রবাহ (Peak-flow) ১০ লক্ষ কিউসেক (Cubic foot per second, প্রতি সেকেণ্ডে এক ঘন ফুট জল) থেকে কমে ২.৫ লক্ষ কিউসেক হবে এবং বন্যার প্রকোপ কমবে। ঠিক হয় কর্ম-পরিকল্পনা (Project) টি দুটি ধাপে সম্পাদিত হবে। প্রথম ধাপে ৪টি ড্যাম তৈরী হবে ঃ

বরাকর নদীর উপর (১) তিলাইয়া ও (২) মাইথন, কোনার নদীর উপর (৩) কোনার ড্যাম এবং দামোদর নদের উপর (৪) পাঞ্চেৎ ড্যাম। ড্যাম চারটির মোট জলধারণের সামর্থ্য হবে ২৯ লক্ষ একর - ফুট।

সারণী - ১

এই চারটি জলাধারে মোট ২৯ লক্ষ একর ফুট জল রাখার জন্য ড্যাম-ভিত্তিক যে পরিমাণ জমি অধিগ্রহণ করার কথা এবং যে পরিমাণ অধিগ্রহণ করা হয়েছে তা সারণী-২-এ দেওয়া হল।

সারণী - ১

ড্যামের নাম	উচ্চতা (মিটার)	নির্মাণকাল (খৃঃ)	দৈর্ঘ্য (মিটার)	আয়ু বা টিকে থাকার কাল(বছর)
তিলাইয়া	৩৪	১৯৫৩	৩৬৬	১৫১
মাইথন	৪৮	১৯৫৮	৩৫৯০	২৪৬
পাঞ্চেৎ	৪৮	১৯৫৯	৩৫৯০	৭৪
কোনার	৬০	১৯৫৫	৩৯২০	২২১

(সূত্র ঃ *Upper Damodar Valley, by J. Sing*)

সারণী - ২

ড্যাম	তিলাইয়া	কোনার	মাইথন	পাঞ্চেৎ
পরিকল্পনা অনুযায়ী জমির প্রয়োজন / একর	৫৩,০৬৪	১৮,৪৫৬	৫৫,৬৫৬	৪১,৩০৯
অধিগৃহীত জমি / একর	২৬,৫৩২	৯,২২৮	২৭,৮২৮	১৯,৩০৯

(সূত্র ঃ *Upper Damodar Valley, by J. Sing*)

দ্রষ্টব্য এই যে পরিকল্পনা অনুযায়ী দৈর্ঘ্যে এবং উচ্চতায় ড্যামগুলি সব নির্মিত হল ; কিন্তু পরিকল্পনা অনুযায়ী জমি সব অধিগ্রহণ করা হল না। ফলে চারটি ড্যামে ৩১ অক্টোবরের

* *এক একর ফুট = এক একর জমির উপর এক ফুট উঁচু জল*

পর (এই তারিখের পর আর বড় ধরণের বৃষ্টিপাত হবে না ধরে নেওয়া হয়) মোট ২৯ লক্ষ একর - ফুট জল ধরে রাখার কথা বা পরিকল্পনা যেখানে, সেখানে মাত্র ১২-১৩ লক্ষ একর - ফুট জল ধরে রাখা হয়। (জনৈক Executive Engineer এর কাছ হতে তথ্য সংগৃহীত) সুতরাং নিম্ন - দামোদর অঞ্চলের মানুষ খরায় জল পাবেন কোথা থেকে ; কিংবা বন্যা (অবশিষ্ট) রোধ হবে কি করে?

ড্যাম - ভিত্তিক গ্রাম, বাড়ি, পরিবার ও ব্যক্তির উচ্ছেদ
ও/বা ধ্বংস হওয়ার তালিকা নিচের মত ঃ

সারণী - ৩

ড্যামের নাম	গ্রাম	বাড়ি	পরিবার	ব্যক্তি
তিলাইয়া	৫৬	৬২৯	২৬৯১	১৬,১০২
মাইথন	৮৬	১৫৮৮	৫২১১	২৮,০৩০
পাঞ্চেৎ	১৩০	২১১৯	১০৩৩৯	৪১,৪৬১
কোনার	২৭	১১৮	১২১৮	৫,৭৪৭

(সূত্র : *Upper Damodar Valley, by J. Sing*)

Indian Journal of Power পত্রিকার (পৃষ্ঠা ১১) রিপোর্ট অনুযায়ী উচ্ছেদ ও ধ্বংসের তালিকা নিচের মত ঃ

সারণী - ৪

ড্যামের নাম	বাড়ি	পরিবার	ব্যক্তি
তিলাইয়া	৬২৬	৭৭৯	৪,৬৪৮
মাইথন	১৬৮৩	১৯৫১	১১,১৭৪
পাঞ্চেৎ	?	?	?
কোনার	১২৮	১১০	৬৪১

উচ্ছেদ হওয়া মানুষদের পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য ড্যাম অনুযায়ী যে জমি দখল করা / কেনা হয়েছে তার পরিমান নিচের মত ঃ

সারণী - ৫

ড্যামের নাম	পুনর্বাসনের জন্য দেওয়া জমি/একর
তিলাইয়া	১০,০০১ (তিলাইয়া গ্রাম নামে খ্যাত)
মাইথন	১,১৯৯
পাঞ্চেৎ	৬৬
কোনার	১,৩৯২

নিম্ন দামোদর অঞ্চলে ভাঙন

মাইথন জলাধারের জন্য পশ্চিমবঙ্গের ৩০৩৭ একর জমি দখল করা হয়েছে।
(সূত্র ঃ *DVC'র Audit Report, 1961-62*)

উৎখাত হওয়া মানুষ যাঁরা জমির পরিবর্তে টাকা নিয়েছেন তাঁদের জমি ও বাড়ির দাম নিচে দেওয়া হয়েছে।

একর প্রতি জমির দাম ৩৮০.০০ টাকা ; ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে ৬০০.০০ টাকা

বাড়ির দাম ৩.০০ টাকা / বর্গ ফুট ; ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে ৪.০০ টাকা / বর্গ ফুট

(সূত্র Indian Journal of Power, 1965)

ডি.ভি.সি'র বক্তব্য উৎখাত হওয়া মানুষের আর কিছু পাওনা নেই। পরিবেশবিদ্ ও সমাজবিজ্ঞানীদের এ নিয়ে কোন আন্দোলন নেই দেখে সব সত্য বলেই মনে হয়। (তবে তিলাইয়া ড্যামের জন্য উৎখাত হওয়া মানুষদের 'নাতি-পুতিরা বলছে, আমার ঠাকুর্দার জমি আমার থাকতো, আমাকে ফিরিয়ে দাও, নয়তো টাকা বা চাকরি দাও'– জনৈক কর্মী, তিলাইয়া ড্যাম)।

পরিকল্পনা অনুযায়ী চারটি ড্যামে ২৯ লক্ষ একর - ফুট জল রাখা যায়নি, নিম্ন দামোদর অববাহিকায় বন্যা এখনও অব্যাহত, খনন করা ক্যানালের সমস্তটা দিয়ে খরায় এখনও জল দেওয়া যাচ্ছে না, তবুও পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৬৫ সালে বাকি তিনটি ড্যামের কোন প্রয়োজন নেই বলে জানিয়ে দিয়েছেন। 'Govt. of W.B. thought that remaining three dams are not necessary', লিখেছেন, D.V.C.'র সভাপতি N.E.S. Raghavachari, ICS। *(সূত্র ঃ Indian Journal of Power and River Valley Development, p-6, 1968)*

সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ খাতে প্রতিটি যোজনায় রাজ্য ভিত্তিক যে টাকা বরাদ্দ করা হয় কয়েকটি রাজ্যের ক্ষেত্রে তার পরিমাণ নিচের মত (কোটি টাকায়) ঃ

সারণী - ৬

রাজ্যের নাম	৫ম যোজনা ১৯৭৪-৭৯	৬ষ্ঠ যোজনা ১৯৮০-৮৫	৭ম যোজনা ১৯৮৫-৯০	৮ম যোজনা ১৯৯২-৯৭	৯ম যোজনা ১৯৯৭-২০০২
উত্তর প্রদেশ	২৮৭	১৪৬২.৪	১৪২০	৩১৫৯	৮০
অন্ধ্র প্রদেশ	১৯৫.১৬	৮৯০.২৯	১১৮২	২৫০০	১২৭.৪১
বিহার	১৮৫.৯	১১৭৬	১২৮৫	৩২৭০	৪০০
মধ্যপ্রদেশ	১৭৩.৭১	১০৫২	১৩৭৫	২৬৫৬	৪.৬৭
মহারাষ্ট্র	২৯৫.৪২	১৩০৩.৯১	১৩২০	৩৩২৯	২.৭০
গুজরাট	১৫০.৮৫	১০৪৮	১৪৬৯	৩৭৫৬	১০.০০
পশ্চিমবঙ্গ	৮০.৫	৫৯০	২০৮	১০৪৮	৩২৮.৪৪

সূত্র ঃ যোজনা কমিশন, নতুন দিল্লী রিপোর্ট

(সূত্র ঃ ভগীরথ, এপ্রিল - জুন সংখ্যা, ১৯৯৯, কেন্দ্রীয় জল কমিশন, পৃষ্ঠা ১৩৪)

যোজনা কমিশনের রিপোর্ট থেকে এটা স্পষ্ট যে ১৯৭৪ থেকে ১৯৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গকে তুলনামূলকভাবে কম টাকা দেওয়া হয়েছে, তবুও পশ্চিমবঙ্গের কোন সাংসদ, বিধায়ক বা মন্ত্রী বিষয়টি দেখেননি।

রাজ্য ভিত্তিক ড্যামের তালিকা

১৯৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষে মোট ড্যামের সংখ্যা ছিল ২৫১টি। তারপর ১৯৯৯ পর্যন্ত এ সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৪২৯০টি। এর মধ্যে ৬০ মিটার বা তার চেয়ে উঁচু ড্যামের সংখ্যা ৮৩টি। দেশে খরা, বন্যা ও দুর্ভিক্ষ রোধ করার জন্য ড্যাম তৈরি জরুরী, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ এক্ষেত্রে যে একেবারে পিছিয়ে তা নিচের তালিকা থেকে স্পষ্ট ঃ

বিভিন্ন উচ্চতার ড্যামের সংখ্যা এবং উচ্চতা (মিটারে)

সারণী - ৭

রাজ্যের নাম	১৫ পর্যন্ত	১৬-৩০	৩১-৪৫	৪৬-৬০	৬১এর উর্দ্ধে	ড্যামের মোট সংখ্যা
অন্ধ্রপ্রদেশ	৮১	৫৪	১৫	২	৫	১৫৭
আসাম	০	১	০	১	১	৩
বিহার	১৭	৫৪	১৩	৯	১	৯৪
গুজরাট	১৩৭	৩৬৫	২২	৯	৪	৫৩৭
হিমাচল প্রদেশ	০	০	০	১	৪	৫
জম্মু ও কাশ্মীর	০	৭	০	০	২	৯
কর্ণাটক	৮৬	১০০	১৭	৭	৬	২১৬
কেরালা	৫	১৮	১৪	৯	৮	৫৪
মধ্য প্রদেশ	৬৮২	৩৮২	২৩	৩	৩	১০৯৩
মহারাষ্ট্র	৬৫১	৭৬৬	৬৮	২৮	১৫	১৫২৮
ওড়িষা	৫২	৮০	৬	৬	৫	১৪৯
রাজস্থান	৫৬	৫২	১২	৩	৩	১২৬
তামিলনাড়ু	৬	৫৪	২২	১২	১২	১০৬
উঃ প্রদেশ	৬০	৬৮	৬	২	৯	১৪৫
পঃ বঙ্গ	১২	১৩	১	১	০	২৭

সূত্র ঃ Dam Safety Proceedings, 15-17 March 1999, Burdwan P

রাজ্য ভিত্তিক বছরে বন্যার জন্য গড় ক্ষতির পরিমাণ নিচের মত ঃ

সারণী- ৮

রাজ্যের নাম	বছরে গড় ক্ষতি (কোটি টাকায়)
অন্ধ্র প্রদেশ	২৫৭.০৫২৬
আসাম	১৩০.৯৮৪২
বিহার	৯৬.২৩৯৯
গুজরাট	৫২.৮৫০১
হিমাচল প্রদেশ	২২১.৩৭৯৪
জম্মু ও কাশ্মীর	৭৮.৭২৬৫
কর্ণাটক	৫৭.৮৪১৬
কেরালা	২১২.০৭৭১
মধ্য প্রদেশ	৩.৪৪০১
মহারাষ্ট্র	৪৯.১৯৯৭
ওড়িষা	১২৪.৯০২২
রাজস্থান	২৩.১২৯১
তামিলনাড়ু	৩৯.৭২১
উঃ প্রদেশ	২৭২.৭৫০৫
পঃ বঙ্গ	৩৭.৫২৪৫

(সূত্র ঃ ভগীরথ, এপ্রিল - জুন সংখ্যা, ১৯৯৯, পৃঃ ১৩৬)

রাজ্যের আয়তন, লোকসংখ্যা, জলসম্পদের পরিমাণ ও বন্যায় ক্ষতির তুলনামূলক চিত্র পর্যালোচনা করলে পশ্চিমবঙ্গের নিম্ন দামোদর অঞ্চলের বাসিন্দাদের দুর্গতির কথা সহজে অনুভূত হবে ; তারপরে আছে জলা - জমির হিসাব ; ভারতবর্ষে জলা - জমির পরিমাণ সবচেয়ে বেশী পশ্চিমবঙ্গে এবং তার প্রায় সবটাই নিম্ন দামোদর অঞ্চলে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে জলা - ভূমির চিত্রটা নিচের তালিকার মত।

সারণী - ৯

রাজ্যের নাম	জলমগ্ন ভূমি (লক্ষ হেক্টর)
অন্ধ্র প্রদেশ	৩.৩৯
আসাম	৪.৫০
বিহার	৭.০৭
গুজরাট	৪.৮৪
হরিয়ানা	৬.২০
কর্ণাটক	০.১০
কেরালা	০.৬১
মধ্য প্রদেশ	০.৫৭
মহারাষ্ট্র	১.১১

রাজ্যের নাম	জলমগ্ন ভূমি (লক্ষ হেক্টর)
ওড়িষা	০.৬০
পাঞ্জাব	১০.৯০
রাজস্থান	৩.৪৮
তামিলনাড়ু	০.১৮
উঃ প্রদেশ	১৯.৮০
পশ্চিমবঙ্গ	২১.৮০

নিম্ন দামোদর পরিকল্পনা

নিম্ন দামোদর এলাকার উন্নয়নের জন্য কয়েকটি কাজ করা প্রয়োজন ঃ

১. *উঁচু উপত্যকায় বর্ষায় আরো জল ধরে রাখা।* যে চারটি ড্যাম তৈরি হয়ে আছে তাতেই সে অতিরিক্ত জল ধরে রাখা সম্ভব ; কিন্তু পরিকল্পনা অনুযায়ী জমি অধিগ্রহণ করা হয়নি বা অবহেলায় সব ফেলে রেখেছেন বলে ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী জল রাখা হয়না। বিশেষজ্ঞরা বলছেন অতিরিক্ত মাত্র ৪-৫ লক্ষ একর ফুট জল উপরে ধরে রাখলে খানাকুল সহ সমস্ত নিম্ন দামোদর এলাকার সমস্যা সমাধান হয়ে যায়; কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্র ও বিহার (বর্তমানে ঝাড়খণ্ড সরকারের সঙ্গে) সরকারের সঙ্গে এ নিয়ে বসতে কোন উদ্যোগ নিচ্ছে না।

১৯৭৮ সালে বর্ধমানে বন্যার জল প্রবেশ করায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাকি ড্যামগুলির মধ্যে অন্তত একটিও তৈরি করানোর জন্য উদ্যোগ নেয়। এ জন্য বলপাহাড়িতে প্রস্তাবিত ড্যামটি করার জন্য জমি জরিপ পর্যন্ত করা হয়। কেন্দ্রীয় জল কমিশনের এক সদস্যের উপস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও বিহার সরকার (এখন ঝাড়খণ্ড সরকার) সর্বসম্মতিক্রমে বার্ষিক জমি ডি.ভি.সি. ও বলপাহাড়িতে ড্যাম তৈরির পরিকল্পনা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার দুটিকে জানিয়ে দেয় (সূত্র ঃ পৃঃ ১৩, ডি.ভি.সি, বার্ষিক রিপোর্ট এবং অডিট রিপোর্ট, ১৯৯২-৯৩)। কিন্তু তারপর আর কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

নিম্ন দামোদর অঞ্চলের মানুষের বদ্ধমূল ধারণা বর্ধমান শহরে দামোদরের বন্যার জল দ্বিতীয়বার প্রবেশ না করলে পুনরায় কেউ উদ্যোগ নেবেন না। উপরে এই জল ধরে রাখার ব্যবস্থা না করে নিচু এলাকায় নিকাশ জনিত সব উদ্যোগ ব্যর্থ হতে বাধ্য।

২. *নিম্ন দামোদর এলাকায় নিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়ন ঃ*

নিম্ন দামোদর এলাকা প্রায় সমতল। ফলে এখানকার জল স্বাভাবিকভাবে নিকাশ হতে চায় না। ফলে বর্ষায় চাষের সময় জমিগুলি ডুবে থাকে, আমন ধানের চাষ করা যায় না। বিশেষতঃ খানাকুলের চার লক্ষ মানুষ বোরো ধানের চাষের অপেক্ষায় থাকেন এবং বোরো মরশুমে জল না পেলে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। এখানকার নিকাশি ব্যবস্থা সংস্কারের জন্য

দামোদর -আমতা ক্যানেল ও রূপনারায়ণ নদ সংস্কার করা প্রয়োজন ; তাছাড়া মাদারিয়া খাল, ডাকাতিয়া খাল, গুজারপুর খাল, গাইঘাটা খাল, বেনাম খাল, ঘেষোপটা খাল প্রভৃতির সংস্কার করা প্রয়োজন।
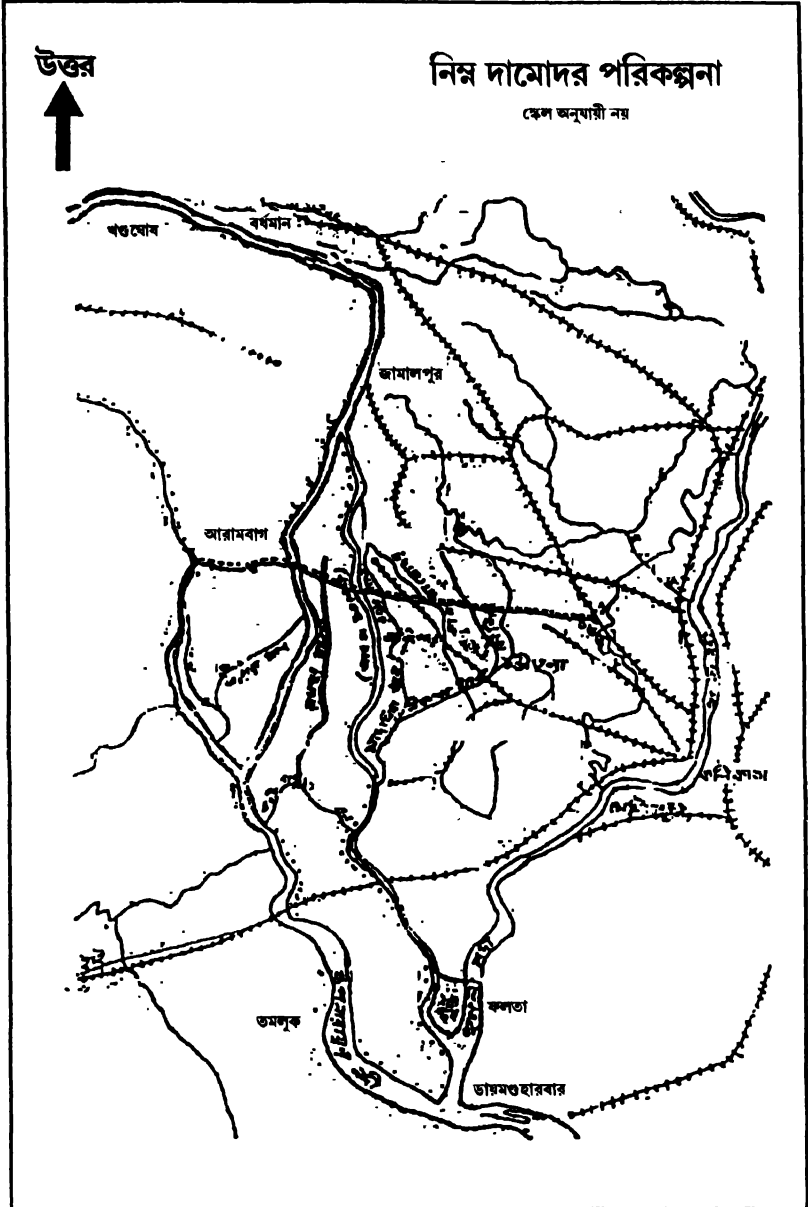
রাজ্য সরকার মাঝে মাঝে এ সব সংস্কারের কথা ভাবেন, কাজে হাত দেন, তারপর অসম্পূর্ণ রাখেন। অনেকটা ড্যাম নিয়ে যে দায়িত্বহীনতার পরিচয় ডি.ভি.সি. ও কেন্দ্রীয় জল কমিশন করেন, ঠিক তেমন। অথচ রাজ্যের নিকাশি ব্যবস্থা, তটবন্ধন, ড্যাম মেরামতি বা তৈরি সবই রাজ্যের হাতে, কেন্দ্র এ বিষয়ে কিছু করবেন না বলে লোক সভায় জানিয়েছেন (সূত্র ঃ *Shri Som Pal Lokh Sabha, on 24.02.1999*, ভগীরথ, এপ্রিল - জুন সংখ্যা, ১৯৯৯, পৃ ১০৭)।

এদিকে ডি.ভি.সি. কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, দুর্গাপুর থেকে আরম্ভ করে হুগলী নদীর মোহনা পর্য্যন্ত সমস্ত নিম্ন দামোদর অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ১৯৬৩-৬৪ খৃষ্টাব্দে। সুতরাং ঐ অঞ্চলে খরা - বন্যা নিয়ে যে সমস্যা তা সবই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের (সূত্র ঃ *B Sengupta, Indian Journal of Power, Dec., 1995, P/194*)।

৩. *দুর্গাপুর ব্যারেজ ও রণডিয়া নদীবাঁধ (weir) ড্রেজিং ঃ*

ডি.ভি.সি'র অবসর প্রাপ্ত একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াররা বলছেন, দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে বালি তোলার দায়িত্ব ইস্টার্ন কোল ফিল্ডস (ই.সি.এল.) লিমিটেডের। শূণ্য কয়লাখনি বালি দিয়ে পূর্ণ করার দায়িত্ব ই.সি.এলের। কিন্তু রোপ-ওয়ে করা ও তা থাকা সত্ত্বেও ই.সি.এল. সে কাজ করে না।

এদিকে কেন্দ্রীয় জল সম্পদের মন্ত্রী শ্রীমতী বিজয়া চক্রবর্তী জানিয়েছেন (সূত্র ঃ ভগীরথ, অক্টোবর - ডিসেম্বর, ১৯৯৯, পৃঃ ৮০) দুর্গাপুর ব্যারেজ পলিমুক্ত করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার কোন প্রস্তাব প্রকাশ করেনি। তাছাড়া রণডিয়ায় যে নদীবাঁধ (Weir) রয়েছে তাও পশ্চিমবঙ্গ সরকার ড্রেজিং করেনি। রণডিয়ার নদী বাঁধ পলি-বালি মুক্ত হলে এবং বাঁধটি আরও ৪/৫ ফুট উঁচু করলে নিম্ন দামোদর এলাকার কিছু সুবিধা হত।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মাইথন - পাঞ্চেৎ ড্যাম ও দুর্গাপুর ব্যারেজ - এর মাঝে যে ১০০০ বর্গমাইল ক্যাচমেন্ট এলাকা রয়েছে, সে এলাকার জল দুর্গাপুর ও রণডিয়ায় ধরে রাখার ব্যবস্থা করলে নিম্ন দামোদর এলাকায় খরা ও বন্যার প্রকোপ কম হবে।

৪. ডি.ভি.সি বলেছে দামোদরের উঁচু অববাহিকায় ৮,৪০০টি চেক ড্যাম তৈরি করা হয়েছে। (DVC রিপোর্ট 1997) ঐ চেক ড্যামগুলি বালি - পলিতে সম্পূর্ণ ভর্ত্তি হয়ে উদ্দেশ্যহীন হয়ে পড়ে আছে কিনা তা জানা প্রয়োজন।

তাছাড়া ডি.ভি.সি প্রস্তাবিত ৭২৬টি ওয়াটারশেড নির্মাণের কাজ বাস্তবায়িত করলেও নিম্ন দামোদর এলাকায় খরা ও বন্যার প্রকোপ কম হবে।

৫. পরিবেশবিদ্‌রা বিভ্রান্তিকর কথা কম বললে সরকার ও ডি.ভি.সি'র কাজ করার সুবিধা হবে এবং তাতে নিম্ন দামোদর এলাকার মানুষেরা উপকৃত হবেন। উদাহরণ হিসাবে 'বিভ্রান্তিকর কথা' গুলির মধ্যে আছে ঃ

'আমেরিকা বড় বড় ড্যাম ভেঙ্গে ফেলছে, সুতরাং আমাদেরও উচিত বাঁধ ও ড্যাম ভাঙ্গা'।

ড্যামগুলি চিরস্থায়ী নয়, প্রতিটি ড্যামের আয়ু একটা নির্দিষ্ট বছর পর্যন্ত। সুতরাং

আয়ুজনিত কারণে ড্যাম ভেঙ্গে না ফেললে স্বাভাবিকভাবে পুরনো ড্যাম ভেঙ্গে গেলে বিপর্যয় ঘটাবে। এ জন্য আমেরিকা পুরনো ড্যাম ভেঙ্গে ফেলতেই পারে, কারণ ও দেশে ড্যাম শিল্পের আয়ু ১০০ বছরেরও বেশী।

তাছাড়া আমেরিকার সংস্কৃতিও পৃথক। ওরা উদ্‌বৃত্ত গম সমুদ্রে ফেলে দেয়, ৫/৭ বছর ব্যবহারের পর মোটর গাড়িও ফেলে দেয়, আমেরিকার চাষীরা প্লেনে/ হেলিকপ্টারে চড়ে শস্য ক্ষেত্রে কীটনাশক ও ওষুধ ছড়ায়। সুতরাং ওরা একটা বা ১০০টা ড্যাম ভা'গছে বলে আমাদের তা অনুকরণ করতে হবে -- এ কথা যুক্তিযুক্ত নয়। বিশেষতঃ ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত আমেরিকায় ড্যামের সংখ্যা ৭৫,১৮৭ আর ১৯৯৭ পর্যন্ত ভারতে মোট ড্যামের সংখ্যা ৪,২৯০টি (সূত্র ঃ Dam Safety Proceedings, March, ১৫-১৭, ১৯৯৯, বর্ধমান সংস্কৃতি ভবন)। যদি আমেরিকা ও ভারতের ভৌগোলিক আয়তন ও লোক সংখ্যার তুলনা করা হয় তবে ভারতে আজ ড্যামের সংখ্যা হওয়া উচিত ১৫,০০০ কমপক্ষে। তা যখন নয়, তখন আমেরিকার সঙ্গে আমাদের তুলনা যুক্তিযুক্ত নয়।

প্রসঙ্গতঃ জানা প্রয়োজন চিন দেশে ড্যামের সংখ্যা ৮৬,৮৫২টি (১৯৯৫–৯৬ সাল পর্যন্ত)।

১৯৮১ সাল পর্যন্ত চিনে আপনা থেকে ভেঙ্গে পড়া ড্যামের সংখ্যা ৩,২০০টি। খারাপ জলবায়ু, নিচু মানের মালমশলা ব্যবহার, অনুন্নত গঠন প্রণালী (W.L. Voorduin কে ভারত সরকার তখন ডেকে এনেছিলেন এ জন্যই) ও রক্ষণাবেক্ষণে অবহেলার কারণে ড্যামগুলি ভেঙ্গে পড়ে। এর মধ্যে দুটো বড় ড্যাম, (বলা হত 'লৌহ ড্যাম') – সিমানটান (Shimantan) এবং বাঁকিয়াও (Banqiao) আছে। শুধুমাত্র এই বড় ড্যাম দুটি ভেঙ্গে পড়ার জন্য চিনে ৮৫,০০০ থেকে ২,৩০,০০০ লোক প্রাণ হারিয়েছিলেন (সঠিক তথ্য জানার উপায় নেই) (সূত্র ঃ জি.ই.ও, এশিয়া প্যাসিফিক, ডিসেম্বর - জানুয়ারী ১৯৯৯, পৃঃ ৬)। ভারতবর্ষে তো ড্যামের ইতিহাস এমন নয়, তবুও এখানে ড্যাম - বিরোধী স্লোগান দেওয়া হয় এবং আমেরিকাবাসির একাংশ মওকা বুঝে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সম্পাদকের কাছে নর্মদা ড্যামের বিরুদ্ধে ডেপুটেশন দেয়। এটা উচিত কাজ নয়।

৬. ডি.ভি.সি'র আইন বিষয়ে ওয়াকিবহাল থেকে কাজ করা।

ডি.ভি.সি. প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সরকারি ক্ষমতা ও ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে বেসরকারি স্বেচ্ছাচারিতা ভোগ করে। এমনি একটা কথা আমেরিকার 'প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট(১৮৮২-১৯৪৫) বলে গিয়েছিলেন, 'Clothed with the power of Government but possessed of the flexibility and initiative of a private enterprise !' এ জন্যই ডি.ভি.সি. ও কেন্দ্রীয় জল কমিশন কেন্দ্র সরকার ও কোন রাজ্য সরকারের নির্দেশ মানতে বাধ্য নয়। রাজ্য সরকার বিধান সভায় রেজোলিউশান করে কেন্দ্র সরকারকে দিলে এবং তারপর কেন্দ্র সরকার চাইলে ডি. ভি. সি.-কে কোন বিষয়ে বাধ্য করতে পারে, নচেৎ নয়।

লোক সংখ্যা বেড়েছে, জলের চাহিদা বেড়েছে, সুতরাং আমাদের বিধায়ক ও সাংসদরা এ দিকটা ভেবে দেখে অগ্রসর হলে নিম্ন দামোদর অববাহিকার মানুষেরা উপকৃত হবেন।

বর্ধমানের জনগোষ্ঠীর ইতিহাস ও জনসংখ্যার বিন্যাস

ভব রায়

বাঙালির সভ্যতা বা বঙ্গসংস্কৃতি বয়সে ঠিক কতটা প্রাচীন? সত্যি বলতে কি - এ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোন সিদ্ধান্তে আজও পৌঁছাতে পারেন নি সমাজতত্ত্ববিদ বা ঐতিহাসিকেরা। অবশ্য শুধু বাঙালি কেন - পৃথিবীর কোন জাতির সভ্যতার ইতিহাসের চুলচেরা, সঠিক বয়স-নির্ধারণ হয়তো বাস্তব কারণেই সম্ভব নয়। তাই, ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিচারে বাঙালির সভ্যতার ইতিহাস বলতে এ তাবৎ আমরা যা জেনেছি, তা মোটামুটিভাবে বিগত দু হাজার বছরের ইতিহাস, যা মোটামুটি তথ্য-প্রমাণের মাধ্যমে ও ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় সমর্থিত ও স্বীকৃত। কিন্তু দু হাজার বছরের আগে কি আমাদের এই বঙ্গদেশের মাটিতে মানুষের অস্তিত্ব ছিল না? অবশ্যই ছিল এবং ঘটনা হল - দু হাজার বছরের আগে - বহু আগে সেই পুরাতন প্রস্তর যুগ বা হিমযুগ পরবর্তী প্রাগৈতিহাসিক আমলেও আজকের পশ্চিমবাংলো বা বঙ্গ নামে এই দেশটিতেও ছিল মানুষের বসবাস যার অজস্র প্রমাণ বিক্ষিপ্তভাবে পাওয়া গেছে। এখানে মনে রাখতে হবে, সেই প্রাচীন আমলে অর্থাৎ আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগে সারা দেশে কোন রকম জেলা-বিভাগ ছিল না। ভাগীরথী, বা দামোদরের মত বড়-বড় নদ-নদী বিভিন্ন অঞ্চলের সীমানা নির্ধারণ করতো। এই কারণে, বর্ধমান জেলার জনগোষ্ঠীর বিবর্তনমূলক ইতিবৃত্ত জানতে হলে সমাজতত্ত্ব বা ইতিহাসের পাতা তন্ন তন্ন করে ওল্টালেও কিন্তু আজকের বর্ধমানের হুবহু মানচিত্রটিকে আমরা খুঁজে পাব না। অবশ্য বল্লাল সেনের আমল থেকে 'বর্ধমানভুক্তি' নামে চিহ্নিত একটি অঞ্চলের কথা জানা যায়, যা এখনকার বর্ধমানের সমার্থক নয়, বরং বলা যায়, এই বর্ধমান ভুক্তি আসলে ছিল ভাগীরথীর দক্ষিণ অংশের এক বিস্তৃততর অঞ্চল (এখনকার বর্ধমান জেলাসহ) এবং পরবর্তীকালে এই অঞ্চল সাধারণভাবে 'রাঢ়-অঞ্চল' নামেই অধিকতর পরিচিত হয়েছিল।

যাইহোক, বর্ধমান জেলার জনগোষ্ঠীর ইতিহাস জানার জন্য আপাতত আমরা এখনকার বর্ধমান জেলার ছবিটিকেই চোখের সামনে রাখবো এবং হাল আমলে এই জেলায় বসবাসকারী জনসাধারণের সূত্র ধরেই আমরা তাদের সমাজতাত্ত্বিক ইতিবৃত্তে পৌঁছাবার চেষ্টা করবো। এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে। ঠিক এই মুহূর্তে আপাতদৃষ্টিতে 'বাঙালি' হয়তো একই ভাষাভাষী, এক অভিন্ন জাতিসত্বা হিসাবে পরিচিত, কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হল-নৃতাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় বাঙালি এক সংকর জাতি - বহু জাতি, উপজাতি, স্থানীয়-বহিরাগত মানব জাতির অজস্র শাখা-প্রশাখার রক্তের সংমিশ্রণে তার উদ্ভব ঘটেছে। তাই, আজকের সমগ্র পশ্চিমবাংলার অন্যান্য অঞ্চলে বসবাসরত বহু জনগোষ্ঠীর সদৃশ অস্তিত্ব যেমন খুঁজে পাওয়া যাবে বর্ধমানের পটভূমিতে, তেমনি মূলত আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন বেশ কিছু স্বতন্ত্র, পৃথক জাতি বা সম্প্রদায়কেও আমরা খুঁজে পাব এই জেলার মাটিতে।

বিগত একশ বছর ধরে বর্ধমান জেলার পটভূমিতে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সামগ্রিকভাবে যে জাতি বা সম্প্রদায়গুলির নাম প্রধানত উল্লেখযোগ্য, সেগুলি হল - বাগ্দী, সদগোপ, আগুরী বা উগ্রক্ষত্রিয়, আদিবাসী-উপজাতি, ব্রাহ্মণ, গোয়ালা, তিলি ও মুসলমান। বলা বাহুল্য, আদিবাসী ও মুসলমানদের বাদ দিলে উপরোক্ত জাতিগুলি অধুনা মূলতঃ হিন্দু ধর্মাবলম্বী হিসাবে পরিচিত। কিন্তু, এখানে মনে রাখা প্রয়োজন, বর্ধমান জেলার জনগোষ্ঠীর ইতিহাস পর্যালোচনাকালে সর্বাগ্রে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রাসঙ্গিকতা উল্লেখ্য, জৈন গ্রন্থ 'আচারাঙ্গ' সূত্রের মাধ্যমে একথা আজ সর্বজনবিদিত যে, জৈনধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মহাবীর ধর্মপ্রচারে উদ্দেশ্যে বর্ধমান অঞ্চল পরিক্রমা করেছিলেন এবং তৎকালীন 'রাঢ়বাসীরা' তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা সত্বেও তাঁর স্বভাবসুলভ উদার ও অহিংস ভাবাদর্শ এই অঞ্চলের এক শ্রেণীর মানুষকে আকৃষ্ট করেছিল। ফলে বর্ধমানের বিভিন্ন অঞ্চলে অন্তত কিছুকালের জন্যেও যে জৈনধর্মের প্রসার ঘটেছিল এটাই স্বাভাবিক। আবার মহাবীরের অন্য নাম 'বর্ধমান' অনুসরণেই বর্ধমান শহর বা বর্ধমান জেলার নামকরণ-স্থান-নাম সম্পর্কিত এটাই সবচেয়ে প্রভাবশালী ও প্রচলিত অভিমত। এছাড়াও, বর্ধমানের বহু স্থানে জৈনধর্মের স্মৃতিবাহী তীর্থঙ্করের প্রস্তরমূর্তি পাওয়া গেছে, বরাকর অঞ্চলের একটি মন্দিরে ও আরও দু-এক জায়গার প্রাচীন মন্দিরে জৈন সংস্কৃতির প্রভাবও সুপরিস্ফুট। এসব থেকেই এই অঞ্চলে জৈন ধর্মের প্রভাব ও প্রাসঙ্গিকতা আরও যুক্তিগ্রাহ্য হয়ে ওঠে। এমনকি, আজও আসানসোলের কাছাকাছি দু-চার জায়গায় একটি বিশেষ উপাধিযুক্ত বেশ কিছু মানুষ রয়েছেন, যারা নিজেদের প্রাচীন জৈন বংশের উত্তরাধিকারী বলে দাবী করেন।

বিগত দুহাজার বছরের ইতিহাসের পাতা ওল্টালে আমরা দেখতে পাই, তিনশ খৃষ্টাব্দ থেকে সাতশ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী গুপ্তরাজতন্ত্রের এই পর্বটি বাদ দিয়ে তার আগে ওপরে দীর্ঘকাল ধরে বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল। বিশেষ করে, বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক পালরাজাদের তিনশ বছরের শাসনকালকে বৌদ্ধধর্মের চরম বিকাশের 'স্বর্ণযুগ'ও বলা যায়। বর্ধমানের মেমারী অঞ্চলে, আঝাপুরের প্রাচীন 'দেউলিয়ার দেউলে' ও বর্ধমান জেলার অন্যান্য কিছু অঞ্চলের পুরাতাত্ত্বিক ভগ্নাবশেষ বৌদ্ধমঠ বা বৌদ্ধবিহারের বৈশিষ্ট আবিষ্কৃত হয়েছে। এসব থেকে প্রমাণিত হয় এককালে বর্ধমান জেলায় বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল। আসলে পাল আমলে বা তার পরবর্তী সময়ে বঙ্গদেশের ধর্মীয় প্রবাহে দেখা গিয়েছিল এক অনন্য, অভূতপূর্ব লক্ষণ-বৌদ্ধ মতবাদের মহাযান-বজ্রযান-সহজযান প্রভৃতি ধারার সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যধর্ম , তান্ত্রিক ধর্ম-শৈব-শক্তি ধারার সমন্বয় ও সহাবস্থান, যার সর্বাধিক স্ফূরণ দেখা গিয়েছিল বর্ধমান ও সন্নিহিত রাঢ় অঞ্চলে। অথচ আশ্চর্যের ঘটনা হল - একদা বর্ধমানের মাটিতে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের এই বিপুল প্রভাব সত্বেও এই দুটি ধর্ম আজ এখানে প্রায় অবলুপ্ত। সাম্প্রতিক সমীক্ষা অনুযায়ী বর্ধমান জেলায় জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বাসিন্দার মোট সংখ্যা সাকুল্যে ৩০০০ এবং তারাও সম্ভবত স্বাধীনোত্তর আমলের বহিরাগত মানুষ। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের এই আপাত -অবলুপ্তির ব্যাখ্যা হিসাবে বলা যায়, উদার অবাধ ধর্মীয় সমন্বয় ধারায় প্রবাহিত

হয়ে এই অঞ্চলে এই দুটি মতবাদ কালের বিবর্তনে চণ্ডী - মনসা - শিব - কালী ইত্যাকার আজকের লোকায়ত হিন্দুধর্মের ছত্রছায়ায় মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

যাই হোক , বর্ধমানের জনগোষ্ঠীর ইতিহাস - পর্যালোচনাকালে আপাতত আমরা আদিবাসী-উপজাতি, ব্রাহ্মণ ও গোয়ালা এই তিনটি গোষ্ঠীকে বাদ দিতে পারি, কারণ বর্ধমান জেলাভিত্তিক সংখ্যাগত বিচারে উল্লেখযোগ্য হলেও এরা একান্তভাবে বর্ধমানের স্বতন্ত্র জাতিগোষ্ঠী হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না। পশ্চিম বাংলার প্রাচীনতম জনগোষ্ঠী হিসাবে আদিবাসী-উপজাতিরা যেমন পশ্চিমবাংলার প্রায় সব জেলাতেই কম-বেশী ছড়িয়ে রয়েছেন, তেমনি সংকর বাঙালি জাতিসত্ত্বার উচ্চবর্ণের সদস্য হিসাবে ব্রাহ্মণরাও বিপুল সংখ্যায় পশ্চিমবাংলার সব জেলাতেই উপস্থিত। গোয়ালা জাতিভুক্ত মানুষও পশ্চিমবাংলার প্রায় সব জেলাতেই কম বেশী ছড়িয়ে রয়েছেন। তবে, সংক্ষিপ্ত পরিচিতি হিসাবে এটুকু বলা যায় যে, বৈদ্য-কায়স্থ-সদগোপের মতই বর্ধমান তথা পশ্চিমবাংলার ব্রাহ্মণজাতিও মূলত ভেডডিড ও অ্যালপীয় উপাদানে গঠিত — আকৃতিগতভাবে গোল এ বিস্তৃত শিরস্ক, সরু নাক ও মাঝারি উচ্চতা। রাঢ় অঞ্চলের এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ দাবি করেন, তাঁরা উত্তরপ্রদেশের পঞ্চব্রাহ্মণের বংশধর এবং আদিশূর তাঁদের কান্যকুব্জ থেকে বাংলায় নিয়ে এসেছিলেন। অতুল সুরের মতে নৃতাত্ত্বিক বিচারে এই দাবি ভিত্তিহীন কারণ দীর্ঘ শিরস্ক উত্তরপ্রদেশের ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বিস্তৃত শিরস্ক বাঙালী ব্রাহ্মণদের জাতিগত প্রায় কোন মিল নেই। গোয়ালাজাতির নৃতাত্ত্বিক উপাদানে অ্যালপীয় মিশ্রণের (পূর্ব ইউরোপের দীনারীয় ও কতকাংশে আর্মনীয় নরগোষ্ঠীকে 'Alpine' বা 'অ্যালপীয়' বলা হয়ে থাকে।) সঙ্গে কিঞ্চিৎ আদি - অস্ট্রাল বৈশিষ্ট্যও লক্ষণীয়; আকৃতিগত পরিচিতি-নাতিবিস্তৃত শিরস্ক, প্রসারিত নাসা ও মাঝারি উচ্চতা।

বর্ধমান বা রাঢ় অঞ্চলের বহমান মানবধারায় প্রাচীনতম সদস্য এবং সেই সুদূর ঐতিহাসিক ও প্রাগৈতিহাসিক আমল থেকে আজও যারা প্রধানতম জাতি হিসাবে এই অঞ্চলে টিকে আছে, তারা হল বাগ্দী সম্প্রদায়। এই জেলার পশ্চিম অংশে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে যে প্রাক-আর্য আমলের প্রাগৈতিহাসিক নিষাদসংস্কৃতি ও সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে, সেই মৃগয়াজীবী নিষাদ সংস্কৃতির অন্যতম উত্তরাধিকারী হল বাগ্দী সম্প্রদায় - অনেক নৃতত্ত্ববিদের এইরকম অনুমান। নৃতত্ত্বের ভাষায় বাগ্দীরা মূলত আদি অস্ট্রাল (Proto-Australoid) গোষ্ঠীভুক্ত , যদিও তার সঙ্গে অন্যান্য জাতি উপজাতির রক্তের সংমিশ্রণও রয়েছে। 'আদি অস্ট্রাল' কথার অর্থ হল অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে তাদের দৈহিক গঠনের সাদৃশ্য। যদিও নৃতত্ত্ববিদদের অন্য শিবিরের মতে, বাগ্দীরা আসলে দ্রাবিড় -নরগোষ্ঠীর বংশধর। আবার কেউ কেউ বলেন, তারা মালজাতির অংশ বিশেষ। অতুল সুর লিখেছেন, 'এরা (বাগ্দীরা) ঋগ্বেদে উল্লিখিত 'বঙ্গদ' জাতির বংশধর কিনা তাও বিবেচ্য। 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের বিশ্লেষণ অনুযায়ী আন্তঃজাতি অনুলোম প্রতিলোম বিবাহের সূত্র অনুসারে বাগ্দী সম্প্রদায়ের আদি পিতা-ক্ষত্রিয় ও আদি মাতা - বৈশ্য। বাগ্দী জাতির মানুষেরা সাধারণত খর্বাকায়, নাতিদীর্ঘ শিরস্ক, নাক প্রসারিত ও চ্যাপ্টা, গায়ের রঙ বেশ

কালো ও মাথার চুল ঢেউ খেলানো। বাগ্দীদের নৃতাত্ত্বিক উৎস সম্পর্কে নানামুনির নানা মত থাকলেও এ সম্পর্কে কোন দ্বিমত নেই - অধুনা তপশিলী সম্প্রদায়ভুক্ত, দারিদ্রক্লিষ্ট এই বাগ্দী জাতি কিন্তু অতীতে শৌর্যে সংস্কৃতিতে এক কালে বঙ্গদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জনগোষ্ঠী হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। বিভিন্ন অঞ্চলের দেশীয় বাঙালী রাজা-মহারাজাদের ক্ষমতা-প্রতিপত্তি-হ্রাস, উপর্যুপরি মন্বন্তর ইত্যাদি কারণে বাগ্দীদের জীবনে নেমে এসেছিল এক দারুণ বিপর্যয়। যার ফলে ক্রমক্ষয়িষ্ণু পথ ধরে নামতে নামতে আজ তাঁরা সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া সামাজিক স্তরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। পেশাগতভাবে আজ তাঁদের পরিচিতি দারিদ্ররেখার নীচের বাসিন্দা, কৃষি-মজুর, রাখাল-বাগাল, বর্গাদার ও কদাচিৎ প্রান্তিক চাষী। সেই সঙ্গে সুদূর অতীত থেকে আজও 'মৎস্যশিকার' তাঁদের উপজীবিকা। বর্ণহিন্দুদের কাছে আজও তাঁরা প্রায় অস্পৃশ্য অথচ আশ্চর্য ঘটনা হল তাঁদের নিজেদের বিভিন্ন উপগোষ্ঠীর মধ্যেও প্রচলিত রয়েছে অন্য এক ধরনের জাতিভেদপ্রথা। বাগ্দীরা মোটামুটিভাবে আটটি উপগোষ্ঠীতে বিভক্ত। অবশ্য বর্ধমান জেলায় তাঁদের চারটি উপগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে। এগুলি হল - (১) তেঁতুলিয়া (২) দুলে (৩) কুশমেটে (৪) মল্লমেটে অথবা মেটে।

সংখ্যাগত বিচারে বর্ধমান অঞ্চলে তথা সমগ্র বঙ্গদেশে বাগ্দীজাতির কতটা গুরুত্ব ছিল ? প্রাচীন গ্রীক লেখকদের রচনাসূত্রে জানা যায়, মৌর্য আমল পর্যন্ত বাগ্দীরাই সমগ্র বঙ্গদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি ছিল। এই প্রসঙ্গে বিগত শতাব্দীর একটি বিশেষ আদমসুমারীর পরিসংখ্যান উল্লেখযোগ্য। আধুনিক যুগের ক্রমোন্নত পরিবহন ব্যবস্থা, বহুমুখী কর্মসংস্থানের সুযোগ, ব্যবসা-বাণিজ্য ধারাবাহিক মাইগ্রেশনের সুবাদে আজ বাগ্দীরা পশ্চিমবাংলার নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় বসবাস করছেন, যার ফলে বর্ধমান জেলার কোন হালফিলের আদমসুমারী থেকে তাঁদের আদি-আবাসস্থল ও নৃতাত্ত্বিক উৎস সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব নয়। তাই এ ব্যাপারে আজ থেকে শতাধিক বছরের আগের - ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারীকে বিশিষ্ট সমাজতত্ত্ববিদেরা মাপকাঠি বা প্রামাণ্য দৃষ্টান্ত হিসাবে ব্যবহার করে থাকেন, কারণ এ সময়ে অবস্থানগত স্থিতাবস্থা পুরোপুরি অক্ষুন্ন ছিল বলে ধরে নেওয়া যায়। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারী অনুসারে বর্ধমান জেলায় মোট জনসংখ্যা ২০,৩৪,৭৪৫ জন, যার মধ্যে বাগ্দীদের সংখ্যা ছিল ২,০৫,০৭৪ জন, অর্থাৎ সেই সময়ে বর্ধমান জেলায় বাগ্দীদের অনুপাত ছিল জেলার মোট জনসংখ্যার দশ শতাংশেরও বেশী। আবার ১৮৭২ - র আদমসুমারীর অন্য একটি হিসাব থেকে জানা যায় সারা বাংলায় বাগ্দী-অধ্যুষিত আটটি জেলায় মোট বাগ্দী-জনসংখ্যা ছিল ৬,৪৪,১৬৮ জন। অর্থাৎ সেই আমলে বঙ্গদেশের মোট বাগ্দীদের প্রায় ৩৫ শতাংশই বাস করতেন শুধুমাত্র বর্ধমান জেলাতেই এবং সে কারণেই সেই সময়ে সমগ্র বর্ধমান জেলাই ছিল সর্বাধিক সংখ্যক বাগ্দী সম্প্রদায়ের বাসভূমি। এই সব তথ্য থেকে বাগ্দীদের আদি-আবাসস্থল ও তাদের বিশেষ আঞ্চলিকতার দাবিযুক্ত জেলা হিসাবে বর্ধমানকে চিহ্নিত করতে কোন অসুবিধা হয় না। এখানে আরও একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। জেলা থেকে জেলান্তরে ঘন ঘন মাইগ্রেশন

প্রবণতার ফলে বর্তমানে এই জেলায় বসবাসরত বাগ্দীদের সঠিক সংখ্যাটি , আদমসুমারীর সাহায্য নিয়েও নিরূপণ করা সম্ভব নয়। তবে, মোটামুটিভাবে বলা যায় , ২০০০ সালের এই মুহূর্তে বর্ধমান জেলায় বসবাসরত মোট বাগ্দীর আনুমানিক সংখ্যা প্রায় চার লক্ষ। নিম্নবর্ণিত সারণী - ১ থেকে বর্ধমান জেলায় মোট জনসংখ্যার অনুপাতে বাগ্দীদের সংখ্যাগত ক্রমবিবর্তনের ছবিটিও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

সারণী

আদমসুমারী - বর্ষ	মোট জনসংখ্যা	বাগ্দীসম্প্রদায়ভুক্ত জনসংখ্যা	মোট জনসংখ্যায় বাগ্দী জনসংখ্যার অনুপাত
১৯০১	১৫,২৮,২৯০	১,৯৭,৬২৪	১৮ শতাংশ
১৯৩১	১৫,৭৫,৬৯৯	১,৮৫,১৭২	১১ শতাংশ
১৯৫১	২১,৯১,৬৬৭	১,৮৯,৬৭১	৮.৭৫ শতাংশ

উপরের পরিসংখ্যানটিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় , ১৯০১ থেকে ১৯৫১ - মাত্র ৫০ বছরের সময় সীমায় বর্ধমান জেলার মোট জনসংখ্যার হিসাবে বাগ্দীদের অনুপাত কমে এসেছে ৫ শতাংশেরও বেশী। বাগ্দীদের এই সংখ্যাগত ও অনুপাতগত ক্রমহ্রাসমান প্রবণতা থেকে যে বিশেষ লক্ষণটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে , তা হল অধুনা বাংলা তথা সারা ভারতব্যাপী আদিম এথনিক (ethnic) জাতিসত্বা সমূহের মধ্যে যে বিলোপ প্রবণতা ও ক্ষয়িষ্ণুতার বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হচ্ছে, বর্ধমান তথা পশ্চিমবাংলার বাগ্দীজাতিও তার অন্যতম দৃষ্টান্ত। যাই হোক, বর্ধমান জেলায় সর্বাধিক সংখ্যক বসবাস করলেও বর্তমানে জেলার সর্বত্র তাদের বন্টন সুষম নয়। এই জেলার পশ্চিম অংশে আসানসোল-দুর্গাপুর মহকুমায় যেমন তুলনামূলকভাবে বাগ্দীদের সংখ্যা কম, তেমনি জেলার উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ অংশে ব্যাপক ঘনত্বে বাগ্দীরা বসবাস করেন।

বর্ধমান জেলায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠ বাগ্দীজাতির পরেই সদগোপদের স্থান। পশ্চিমবাংলার জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে জাতি হিসাবে সদগোপদের স্থান খুব গুরুত্বপূর্ণ না হলেও পৃথকভাবে বর্ধমান জেলার জনবিন্যাসে সুনির্দিষ্ট হয়ে আছে শত শত বছরের ঐতিহ্যবাহিত তাঁদের বিরাট ভূমিকা। জাতিগত বিচারে তাঁরা অব্রাহ্মণ উচ্চবর্ণ-করণ-কায়স্থ গোষ্ঠীর প্রায় সমতুল। নৃতাত্বিক সংজ্ঞায় তাঁরা বাঙালী ব্রাহ্মণ,কায়স্থদের মতোই মূলত অ্যালপীয় উপাদান নিয়ে গঠিত। সদগোপদের শিরাকার জ্ঞাপক সূচক সংখ্যা ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের সঙ্গে প্রায় সমান। এই দুই সম্প্রদায়ের মতোই তাঁরাও বিস্তৃত -শিরস্ক , কিন্তু উচ্চতায় তাঁদের তুলনায় কিছুটা খর্বকার ও নাক ঈষৎ প্রসারিত। জাতিগত উৎসের শাস্ত্রীয় বিচারে 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ' প্রমাণ সূত্র অনুসারে পিতা বৈশ্য ও মাতা - ক্ষত্রিয়। পরাশর মতে পিতা ক্ষত্রিয়, মাতা শুদ্র। সামাজিকভাবে তাঁরা উত্তম সংকর পর্য্যায়ভুক্ত ও 'নবশাখ' গোষ্ঠীর সদস্য। 'নবশাখ' কথার অর্থ হল যে সকল অব্রাহ্মণ জাতির হাতে ব্রাহ্মণরা জল গ্রহণ

করেন। তাঁদের আদি আবাসস্থল বর্ধমান জেলা ও বর্ধমান - বীরভূমের প্রান্তিক এক কালের 'গোপভূমি'। সদগোপজাতির উৎস সন্ধানে একদিকে যেমন সংগৃহীত ঐতিহাসিকসূত্রের পরিমাণ খুবই নগন্য, আবার অন্যদিকে ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য মিথ ও জনশ্রুতির ডালপালা। বিশিষ্ট সমাজতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিকদের প্রায় সকলেই সদগোপদের বিষয়ে কোন বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ মন্তব্য করেননি, কিন্তু বর্ধমানের সদগোপদের বিষয়ে প্রয়াত সমাজতত্ত্ববিদ বিনয় ঘোষ যেন 'একাই একশ' হয়ে কলম ধরেছেন। তাঁর পর্যবেক্ষণ - এ বর্ধমান জেলার পশ্চিম ও উত্তর অংশে প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের সূত্রে যে প্রাগৈতিকহাসিক সভ্যতার ইঙ্গিত ও তাঁর মহিষী অমরাবতীর কীর্তিগাথা ও তাঁদের সুবিস্তৃত গোপসাম্রাজ্যের বিবরণী। পার্শ্ববর্তী কাঁকসা - গৌরাঙ্গপুরের ইছাই ঘোষকে তিনি বর্ণনা করেছেন উত্তর-রাঢ়ের স্বাধীন সামন্তরাজা হিসাবে এবং 'পরাক্রমশালী ' সদগোপ-রাজবংশের সঙ্গে পালরাজাদের ঐতিহাসিক যোগসূত্র প্রমাণের চেষ্টাও করেছেন তিনি। বলা বাহুল্য, বর্ধমানের সদগোপদের এই সমৃদ্ধ ও বর্ণাঢ্য ইতিবৃত্তের সত্যাসত্য আজও ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত হয় নি। তা সত্ত্বেও অন্তত এটুকু বলা যায় , বর্ধমান তথা রাঢ় অঞ্চলের জাতি বিন্যাসে সদগোপ সম্প্রদায় দীর্ঘকাল ধরে এক ঐতিহ্যসমৃদ্ধ জাতি হিসাবে স্বীকৃত। বিগত দুই দশক ধরে এই জেলার জাতিগত বিন্যাসেও তাঁদের গুরুত্ব সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ও তাৎপর্য্যপূর্ণ। সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের প্রচলিত ভিত্তি বর্ষ হিসাবে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারীটিকে পর্য্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, সেই আমলে সারা বঙ্গদেশে সদগোপজাতি ভুক্ত জনসংখ্যা ছিল ৬,১৬,৬৫৯ জন, যা তৎকালীন বঙ্গদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫ শতাংশ। আবার, এই সামগ্রিক সদগোপ জনসমষ্টির মধ্যে ১,৮৫,৮০৪ জন বাস করতেন বর্ধমান জেলায়। অর্থাৎ বঙ্গদেশের মোট সদগোপদের মধ্যে প্রায় ৩০ শতাংশই বাস করতেন শুধুমাত্র বর্ধমান জেলাতেই। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান অনুসরণে বলা যায়, বর্তমানে বর্ধমান জেলায় বসবাসরত সদগোপদের সংখ্যা আনুমানিক তিন লক্ষ।

সদগোপদের পেশাগত বৃত্তান্ত প্রসঙ্গে বিনয় ঘোষের অভিমত , "সদগোপরাই পশ্চিমবাংলার পশুপালন ও কৃষিসভ্যতার অন্যতম ধারক ও বাহক বলে মনে হয়।" বর্ধমান জেলার পটভূমিতে বিনয়বাবুর এই মন্তব্য অনেকটাই সঠিক, সুদূর অতীত থেকে শুরু করে আজও এই অঞ্চলের সদগোপদের প্রধান জীবিকা হল কৃষি। বর্ধমান জেলার বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলের কৃষি-পটভূমিতে প্রগতিশীল ও বিশেষজ্ঞ কৃষিজীবির প্রধান স্থানটি আজও সদগোপদের দখলে। তবে, শিক্ষা ও আধুনিক কর্মজগতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সাম্প্রতিককালে বর্ধমান জেলাতেও সদগোপদের এক উল্লেখযোগ্য অংশ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উচ্চস্তরে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বর্ধমান জেলার মধ্যে আঞ্চলিক বন্টন সুষম না হলেও এই জেলার প্রায় সব থানাতেই কম-বেশী সদগোপদের বসবাস রয়েছে। তুলনামূলকভাবে বীরভূম সীমান্ত সংলগ্ন অঞ্চলে আউসগ্রাম, কাঁকসা, মঙ্গলকোট, বর্ধমান শহর ও তার আশেপাশে ভাতার, মেমারী, জামালপুর থানায় সদগোপদের অধিকতর প্রাধান্য লক্ষণীয়।

বর্ধমান জেলায় আদি-আবাসস্থল এবং কয়েক শতাব্দী ধরে মূলতঃ একটি মাত্র জেলাতেই নিরবচ্ছিন্ন বসবাস চরম কেন্দ্রীভূত এই ধরণের জাতিগত আঞ্চলিকতার বিরলতম দৃষ্টান্ত সম্ভবত 'আগুরী' বা উগ্রক্ষত্রিয়। ''আগুরী, বাগুড়ি,ধান এই তিন নিয়ে বর্ধমান'' - এই আপাতলঘু প্রবচনটিকে মোটেই অতিশয়োক্তি বলে মনে হয় না তথ্য ও ইতিহাসের দিকে তাকালে। সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষায় প্রচলিত ভিত্তিবর্ষ হিসাবে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারী অনুযায়ী তৎকালীন সমগ্র অবিভক্ত বঙ্গদেশে আগুরী জাতিভুক্ত জনসংখ্যা ছিল ৬৯,৭৯১ তার মধ্যে শুধুমাত্র বর্ধমান জেলাতেই ছিল ৫৯,৮৮৭ জন আগুরীদের বসবাস। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে আগুরী জাতির ৮৫ শতাংশ মানুষই বাস করতেন শুধুমাত্র বর্ধমান জেলাতেই। বাঙালী জাতিসত্ত্বার সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিতে অতিক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী হিসাবে বিবেচিত হলেও বিপুল সংখ্যাধিক্যের জোরে আগুরীজাতিও বাগ্দী ও সদগোপদের মতোই নিঃসন্দেহে বর্ধমান জেলার প্রকৃত 'ভূমিপুত্র'।

বহিরাগত, অবাঙালী রাজাদের সঙ্গে আগুরীরা বর্ধমান তথা বঙ্গদেশে প্রথম পদার্পণ করেছিলেন অথবা তারা মূলত ক্ষত্রিয় রাজাদেরই বংশধর। এই ধরনের কিছু মত প্রচলিত আছে জেলার স্থানীয় কোন কোন মহলে। বলা বাহুল্য, এই অভিমত ভিত্তিহীন, কারণ এই মতের সমর্থনে এ তাবৎ কোন সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক তথ্যের খোঁজ পাওয়া যায়নি। বিনয় ঘোষ সঙ্গত কারণেই লিখেছেন,''উগ্রক্ষত্রিয়রা সম্পূর্ণ বাঙালী এবং বাংলাদেশেই তাদের বিকাশ হয়েছে, '' এসবের পরিপ্রেক্ষিতে স্বচ্ছন্দে বলা যায় , কায়স্থ-সদগোপদের মতোই আগুরীরাও অব্রাহ্মণ উচ্চবর্ণের সমতুল এবং 'উত্তম সংকর' পর্যায়ভুক্ত। বর্ধমান জেলাতে তাঁরা সামাজিকভাবে 'নবশাখের' অন্তর্ভুক্ত। শাস্ত্রীয় বিচারে 'সূতসংহিতা' প্রমাণসূত্র মতে তাঁদের আদি উৎস - 'করণ' পিতা ও 'রাজপুত্র' - মাতার সংমিশ্রণ। মতান্তরে 'মনুসংহিতার' বিশ্লেষণে ক্ষত্রিয় 'পিতা' ও 'শূদ্র' মাতা।

মনুর শ্লোক উদ্ধৃত করে নৃবিজ্ঞানী রিজলে আগুরীদের চিহ্নিত করেছেন - 'হিংস্রতাপ্রিয় ও নিষ্ঠুরতাবিলাসী জাতি,' যে কারণে তাঁরা 'উগ্র' বিশেষণভূষিত 'ক্ষত্রিয়'। এ কারণেই সম্ভবত তাঁরা ধর্মীয় ক্ষেত্রে, শক্তির উপাসক - মহিষমর্দিনী, চামুণ্ডা, কালিকা আজও তাঁদের প্রধান আরাধ্যা দেবী। জাতিগতভাবে আগুরীদের মধ্যে রয়েছে আটটি উপগোষ্ঠী - প্রত্যেকটি উপগোষ্ঠী আবার 'কুলীন' ও মৌলিক' - এই দুই ভাগে বিভক্ত। তবে, বর্ধমান জেলায় আগুরীদের মধ্যে প্রধানত এই দুটি ভাগ সুত ও জানা নিজেদের মধ্যে বর্ণগত প্রথা-প্রকরণে তাঁদের সঙ্গে ব্রাহ্মণদের কিছু মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁদের অনেকেই সময় বিশেষে উপবীত ধারণ করেন। শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ-ইত্যকার ব্রাহ্মণসুলভ গোত্র-পরিচিতিও প্রচলিত রয়েছে তাঁদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে। তাঁদের অনেক সামাজিক অনুষ্ঠান রাজকীয় ক্ষত্রিয়রীতিকেও স্মরণ করিয়ে দেয়। বিশেষত এক শ্রেণীর আগুরীর বিবাহ অনুষ্ঠানে স্বয়ম্ভর সভার অনুকরণে সিংহাসন-উপবিষ্টা পাত্রীর বরমাল্য হাতে পাত্র-বরণের ছবিটি অন্য কোন বাঙালী-হিন্দুদের বিবাহ-অনুষ্ঠানে সচরাচর দেখা যায় না।

আগুরীদের দেশপ্রেম, শৌর্যবীর্য, যোদ্ধাবৃত্ত ও সাহসিকতা ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত। বর্ধমান জেলার জমিদার ও সামন্তরাজাদের অনেকেই ছিলেন আগুরী সম্প্রদায়ভুক্ত। তাদের মধ্যে প্রচলিত রায়, চৌধুরী ইত্যাদি উপাধিগুলি আজও সেই স্মৃতি বহন করছে। পেশাগতভাবে তাঁদের জীবিকা কৃষি ও ব্যবসা। বর্ধমান জেলার বিত্তশালী ও সম্পন্ন চাষীদের অধিকাংশই আগুরী; এই জাতির মধ্যবিত্ত, সাধারণ মানুষরাও যথেষ্ট পরিশ্রমী ও উদ্যোগী কৃষিজীবি। তবে, সময়ের সঙ্গে তাল রেখে আগুরী জাতির এক উল্লেখযোগ্য অংশ বর্তমানে বর্ধমান জেলার নাগরিক পরিমণ্ডলে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও রাজনীতিতে প্রথম সারিতে স্থান করে নিয়েছেন। শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের বহুমুখী সুযোগ প্রসারিত হওয়ার ফলে বর্ধমান জেলার ঘেরাটোপ ছেড়ে আজ তাঁরা কলকাতা, হাওড়া, হুগলী, মেদিনীপুর তথা সমগ্র দক্ষিণবঙ্গে, এমনকি বহির্বঙ্গেও ছড়িয়ে পড়েছেন। তা সত্ত্বেও নিরঙ্কুশ সংখ্যাধিক্যে আগুরীরা আজও মূলত বর্ধমান জেলারই বাসিন্দা। বর্ধমান জেলা থেকে অন্যান্য জেলায় মাইগ্রেশনের পরেও বর্তমানে আনুমানিক দুই লক্ষ আগুরী জাতিভুক্ত মানুষ বসবাস করছেন বর্ধমান জেলায়। জেলার মধ্যে আঞ্চলিক বন্টন-বিন্যাসে দেখা যায়, গলসী, বর্ধমান সদর, খণ্ডঘোষ, রায়না, মেমারী, জামালপুর-এক কথায় দামোদর নদীর দুই পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ও ভাতার-মন্তেশ্বর-মঙ্গলকোট-পূর্বস্থলী এলাকায় ব্যাপক ঘনত্বে আগুরীরা বাস করেন। তুলনায় জেলার পশ্চিম অংশে অর্থাৎ দুর্গাপুর-আসানসোল মহকুমায় ও কাঁকসা-আউসগ্রামের মতো বর্ধমান-বীরভূম সীমান্ত অঞ্চলে আগুরীদের বসবাস নগণ্য।

বর্ধমান জেলার প্রধান জাতিসমূহের মধ্যে অন্যতম হল তিলি - অন্তত অতীতের সংখ্যাগত বিচারে। শাস্ত্রীয় মতে তাঁরা 'উত্তম সংকর' পর্যায়ভুক্ত। সামাজিকভাবে 'নবশাখ' গোষ্ঠীর সদস্য। নৃতাত্ত্বিক বিচারে তাঁরা মূলত 'অ্যালপাইন' ও ভেড্ডিড ধারার সংমিশ্রণ। অবয়বগত বৈশিষ্ট্যে তাঁরা মধ্যমাকৃতি, প্রসারিত ও নাক চ্যাপ্টা, দীর্ঘমুণ্ডাকৃতি। তিলিদের জাতিগত উৎস সম্পর্কিত শাস্ত্রীয় বিচারে 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ' মতে পিতা বৈশ্য, মাতা - ব্রাহ্মণ। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারীকে ভিত্তিবর্ষ হিসাবে ধরলে দেখা যায়, সেই সময়ে সমগ্র বঙ্গদেশে তিলি সম্প্রদায়ভুক্ত মোট জনসংখ্যা ছিল ২,৯৩,২১২ তার মধ্যে ৯৩,২০৩ জন বাস করতেন শুধুমাত্র বর্ধমান জেলাতেই। বর্ধমান জেলার জনবিন্যাসে সেই আমলে সংখ্যাগত ক্ষেত্রে অব্রাহ্মণ উচ্চবর্ণের মধ্যে তাঁদের স্থান ছিল দ্বিতীয় অর্থাৎ সদগোপদের পরেই। তাই আগুরীদের উপরের স্থানটি তিলিদের দখলেই ছিল। বর্ধমান তাঁদের আদি আবাস-স্থান, অথচ যে কোন কারণেই হোক, বর্তমানে তিলিদের অতীতের মতো সংখ্যাধিক্য দেখা যায় না। বরং সদগোপ ও আগুরীদের তুলনায় এই জেলায় এখন তাঁরা নিতান্ত সংখ্যালঘু। পক্ষান্তরে হুগলী, কলকাতা ও মেদিনীপুর জেলাই বর্তমানে তিলিদের প্রধান বাসভূমি।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য হল তিলি জাতির উৎসের শিকড়টি বর্ধমানের মাটির গভীরে থাকলেও এই জেলার প্রধান জাতিসমূহের মধ্যে একমাত্র তাদেরই মূল পেশা কৃষি নয়। ছোট বড় ব্যবসা ও বাণিজ্যবৃত্তিই তাঁদের প্রধান জীবিকা, যদিও তাঁদের সহযোগী

পেশা হিসাবে অবশ্যই কৃষির উল্লেখ করতেই হয়। বর্ধমানের জাতি বৃত্তান্ত ও জনবিন্যাস সম্পর্কিত এ তাবৎ আলোচিত অংশে হিন্দু ধর্মাবলম্বী বাঙালী জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন জাতির প্রসঙ্গই এসেছে। কিন্তু, এই জেলায় বসবাসরত মুসলমানদের প্রসঙ্গও এখানে যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য - বৃহত্তর লোকসমাজে প্রথম বর্ধমানের কথা প্রচারিত হয় মুসলমান যুগেই। আইন-ই-আগুরীতে বর্ধমানের উল্লেখ রয়েছে। অতীতে এক সময়ে প্রায় সমগ্র বঙ্গদেশই মুসলমান-শাসনাধীন ছিল। সেই সূত্রে বর্ধমান আরও প্রত্যক্ষভাবে পাঠান-মোগল-তুর্কী শাসনের অধীনে এসেছিল। ১২০০ খৃষ্টাব্দ থেকে শুরু করে ১৬৫০ খৃষ্টাব্দ - বক্তিয়ার খিলজির বঙ্গ-অভিযান থেকে শুরু করে টানা সাড়ে চারশ বছর বর্ধমান জেলা ছিল পাঠান-মোগল-তুর্কী শাসনের অধীন। কুতুবউদ্দীন, শের আফগান, আজিমউসশান, আলিবর্দী প্রমুখ মুসলমান শাসকদের নামের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বর্ধমানের জেলায় মুসলমানদের বসবাসের বিষয়টি। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারীতে বর্ধমান জেলায় মুসলমান বাসিন্দার সংখ্যা ছিল ৩,৪১,৮৭৮ জন জেলার মোট জনসংখ্যার প্রায় ১৬ শতাংশ । এর তিন দশক পরে অর্থাৎ ১৯৮১ -র আদমসুমারী অনুযায়ী মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ৮,৫০,৯৫১ জন। ২০০০ সালে এদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে আনুমানিক তের লক্ষ।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য পশ্চিম বাংলার অন্যান্য জেলার মতোই বর্ধমান জেলার মুসলমান বাসিন্দাদের সিংহভাগই প্রকৃত পক্ষে ধর্মান্তরিত মুসলমান। এর সমর্থনে অতুল সুর লিখেছেন, বাঙালী মুসলমান যে হিন্দুসমাজ থেকেই ধর্মান্তরিত, তা তাদের আচার-ব্যবহার থেকে বুঝতে পারা যায়। '

বাংলার মুসলমান শাসকদের অধিকাংশই ব্যক্তিগতভাবে খাঁটি পাঠান-মোগল বংশোদ্ভূত ও 'আগন্তুক মুসলমান' অভিপ্রায়ে চিহ্নিত হলেও সেই আমলের বাঙালী মুসলমান জনসাধারণ কিন্তু অনতিদূর অতীতেও হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিলেন। এই শতকের গোড়ায় তৎকালীন আদমসুমারীর কমিশনার ই, এ, গেট ও গবেষক বুকানন হ্যামিলটন উপযুক্ত তথ্য ও গবেষণার মাধ্যমে এই ব্যাপক ধর্মান্তকরণের প্রধান কারণ হল একদিকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্য হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর বিজেতা মুসলমান শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচার ও প্রলোভন, অন্যদিকে তৎকালীন অস্পৃশ্যতাভিত্তিক , কঠোর জাতি-বর্ণ প্রথা কন্টকিত হিন্দু সমাজে দারিদ্রক্লিষ্ট নিম্নবর্ণ হিন্দুদের উপর স্বধর্মের উচ্চবর্ণ সমাজপতি ও নেতৃস্থানীয় গোষ্ঠীর অবহেলা, ঘৃণা ও নিপীড়ন। অবশ্য , অনেক হিন্দু স্বেচ্ছায় নিজ ধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান হয়েছিলেন এরকম দৃষ্টান্তও আছে। এসব কারণেই সাধারণভাবে বর্ধমান জেলার মুসলমান বাসিন্দাদের নৃতাত্ত্বিক বিবরণ অবান্তর কারণ ঐতিহাসিকভাবেই তাঁরা মূলত হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর প্রাক্তণ সদস্যমাত্র, তবে, আজও বর্ধমান শহরে ও জেলার কোন কোন অঞ্চলে বসবাসরত মুষ্টিমেয় কিছু মুসলমান রয়েছেন যাঁদের জাতিগত ও ঐতিহ্যগত উৎস সম্ভবত পাঠান-মোগল অথবা অন্য কোন নির্ভেজাল ঐস্লামিক গোষ্ঠী। তাঁদের স্বতন্ত্র আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য ও তাৎক্ষণিক চোখে পড়ার মতো দীর্ঘদেহী, উন্নতনাসা, তপ্তকাঞ্চন

গৌরবর্ণ। অবশ্য ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ে আজ তাঁরাও বাঙালী মুসলমান-জাতিসত্বার মূলপ্রবাহে মিশে গেছেন। তবে, বলা বাহুল্য এই শ্রেণীর মুষ্টিমেয় মুসলমান নিছকই ব্যতিক্রম, যা 'ধর্মান্তরিত মুসলমান' বিষয়ক মূল প্রতিপাদ্যকেই সুপ্রমাণিত করে।

বর্ধমান জেলার মুসলমান বসবাসের কিছু স্থান বৈশিষ্ট্যও লক্ষণীয়। বিভিন্ন মুসলমান জমিদার, জায়গীরদার ও অন্যান্য মুসলমান শাসকদের প্রধান কর্মস্থল সংলগ্ন এলাকাতেই মুসলমান-বাসিন্দাদের ঘনত্ব বেশী আজও তার প্রমাণ চোখে পড়ে। এই কারণেই বর্ধমান শহর, কুসুমগ্রাম, মঙ্গলকোট, কাটোয়া প্রভৃতি অঞ্চলে আজও তুলনামূলকভাবে বেশী সংখ্যায় মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করেন।

বর্ধমান জেলার সংখ্যাগরিষ্ঠ বিভিন্ন জাতির মতই এই জেলার মুসলমানদেরও মূল পেশা কৃষি। সামাজিক অগ্রগতির নিরিখে উচ্চবর্ণ ও মধ্যবিত্ত হিন্দু-সম্প্রদায়ের তুলনায় এখানকার মুসলমানরা আজও কয়েকধাপ পিছনে পড়ে রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে শিক্ষিতের হার কম এবং নিরক্ষরতার হার বেশী।

বর্ধমান জেলার জনগোষ্ঠীর বিবর্তনমূলক ইতিবৃত্তেও জনবিন্যাসে আপাতদৃষ্টিতে বর্ধমানের রাজবংশের প্রাসঙ্গিকতা অনেকটাই অবান্তর মনে হতে পারে কিন্তু অন্যতর দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে আমরা দেখব এই জেলার জনবিন্যাসে বর্ধমানের রাজবংশের রয়েছে অন্তত একটি পরোক্ষ ভূমিকা, যা অবশ্যই যথাযথ মূল্যায়নের দাবী রাখে। বর্ধমান রাজবংশের সূচনা মোটামুটিভাবে সপ্তদশ শতাব্দীতে। এই রাজবংশের আদি পুরুষ সঙ্গম রাই ছিলেন পাঞ্জাব প্রদেশের মানুষ। তিনিই প্রথম পদার্পণ করেন বর্ধমানে। এই সূত্রে আবু রায় ও বাবু রায় - তার পরে কৃষ্ণরাম রায়। ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের এক 'ফরমান' মারফৎ কৃষ্ণ রাম পাকাপাকিভাবে বর্ধমানের শাসনভার লাভ করেন। বিনয় ঘোষ লিখেছেন, "বর্ধমানের রাজারাও বণিকেরর বেশে পাঞ্জাব থেকে এসে মোগলযুগে জমিদার এবং ইংরাজযুগে মহারাজাধিরাজ পর্যন্ত হন। তাঁদের রাজকীয় বিলাসিতা, স্বেচ্ছাচার ও বদান্যতার নিদর্শন বর্ধমানে প্রচুর আছে।" বর্ধমানের রাজাদের সম্পর্কে বিনয়বাবুর এই মন্তব্য আংশিকভাবে সত্য হলেও বাস্তবে বর্ধমান রাজবংশের সামগ্রিক ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর এই মন্তব্য বিদ্বেষী পক্ষপাতদুষ্ট বলেই মনে হয়। প্রকৃত ঘটনা হল - 'বিলাসী, স্বেচ্ছাচারী' ভূমিকার তুলনায় বর্ধমানের রাজা-মহারাজাদের 'দেশপ্রেমিক ও প্রজাস্বার্থে' নিবেদিত প্রাণ কল্যাণব্রতী ইমেজই আজও বর্ধমানের স্থানীয় জনমানসে পরিপূর্ণ উজ্জ্বলতায় সুপ্রতিষ্ঠিত। তাই, বর্ধমানের রাজাদের সম্পর্কে বিনয়বাবুর কণ্ঠোচ্চারিত 'বদান্যতা বিশেষণটিই এক্ষেত্রে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। বঙ্গদেশের অন্যান্য দেশীয় রাজবংশের কথা মনে রেখে নিঃসন্দেহে বলা যায়। বর্ধমান শহরে ও জেলার দূর মফস্বল-গ্রামীণ অঞ্চলেও বর্ধমানের রাজা-মহারাজাদের প্রজাকল্যাণ এর এত অজস্র নিদর্শন ছড়িয়ে আছে, যার তুলনা বিরল। যাই হোক, এসব অন্য প্রসঙ্গ। বর্ধমানের জনবিন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে বর্ধমান রাজবংশের ভূমিকাটিও কম তাৎপর্য্যপূর্ণ নয়। কৃষ্ণরাম রায় থেকে মহারাজাধিরাজ

বিজয় চাঁদ, উদয় চাঁদ এর মাঝে কীর্তিচন্দ্র, চিত্র সেন, তিলক চাঁদ, মহারাণী বিষ্ণুকুমারী ও আরও অনেকে এক কথায় মধ্য সপ্তদশ শতাব্দী থেকে মধ্যবিংশ শতাব্দী এই তিনশ বছরের রাজত্বকে 'সুদীর্ঘ' বিশেষণে ভূষিত করা সম্ভব না হলেও তা খুব কম সময়ও নয়। কিন্তু আশ্চর্যের ঘটনা হল—তিনশ বছরের শাসক এই ভিনদেশী রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতায় নিজেদের আশ্রিত, পুনর্বাসিত ও পরিপুষ্ট কোন ক্ষুদ্রতম, স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠীও, কিন্তু ইতিহাসের পাতায় তো আমরা প্রায়শই দেখি - আমাদের দেশে দু-তিনশ বছরের রাজত্বের সুযোগে হিন্দু - মুসলমান নির্বিশেষে সমস্ত শাসকগোষ্ঠীই কিভাবে তাঁদের আগ্রাসী মানসিকতায় নিজস্ব ধর্ম, প্রাদেশিকতা বা মতবাদের অনুকূলে গড়ে তুলেছেন এক একটি স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠী, যা আবার অনেক সময় আত্মপ্রকাশ করেছে সবচেয়ে প্রভাবশালী ও দাপুটে গোষ্ঠী হিসাবে। বর্ধমান রাজবংশ এক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে বিরল ব্যতিক্রম। সমস্ত ধরনের ধর্মীয় ও প্রাদেশিক সংকীর্ণতা থেকে নিজেদের মুক্ত রেখেছিলেন তাঁরা। সম্ভবত সে কারণেই বর্ধমান জেলার জনবিন্যাসে নিজেদের রাজকীয় প্রভাবের বীজ বপনের পরিবর্তে বংশপরম্পরায় তাঁরা নিজেদেরকে বর্ধমানের হিন্দু-বাঙালী সত্বায় মিলিয়ে মিশিয়ে দেওয়াই শ্রেয় মনে করেছিলেন।

সংখ্যাগরিষ্ঠতার পর্যায়ক্রমে ও আদি আবাসস্থল তথা আঞ্চলিকতা এই দুটি বিষয়কে মনে রেখে বর্ধমান জেলার নির্দ্দিষ্ট কয়েকটি প্রধান জাতির ইতিবৃত্ত আলোচিত হল এই নিবন্ধে। বলা বাহুল্য এর বাইরেও রয়েছে আরও কয়েকটি জাতি কম-বেশী সংখ্যায় বর্ধমান জেলায় যাদের বসবাসের ইতিহাসও যথেষ্ট প্রাচীন। এই অনালোচিত জাতিসমূহে একদিকে যেমন রয়েছে বাউরী, মুচি, ডোম, হাড়ি প্রভৃতি তপশিলী সম্প্রদায়, অন্যদিকে তেমনি রয়েছে কায়স্থ, গন্ধবণিক, সুবর্ণবণিক, তাম্বুলী, বারুজীবি ইত্যাকার বর্ণহিন্দু সম্প্রদায়। এদের নিয়ে অবশ্যই বর্ধমান জেলার অপ্রধান-জাতিবিন্যাস জাতীয় অন্যতর বিশ্লেষণমূলক আলোচনার সুযোগের অবকাশ রয়েছে। আর ব্রাহ্মণ ও গোয়ালা এই দুটি জাতি, অন্ততঃ অতীতের পটভূমিতে সংখ্যাগত পর্য্যায়ক্রমে জেলার অন্যতম প্রধান জনগোষ্ঠীর দাবিদার হলেও কেন তাঁদের নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়নি , তার কারণও উল্লিখিত হয়েছে নিবন্ধের গোড়াতেই।

বর্ধমান জেলার জনবিন্যাস সম্পর্কিত কিছু স্বতন্ত্র আঙ্গিক (Pattern), প্রবণতা ও বৈশিষ্ট্যের উপর আলোকপাত করা যেতে পারে এই প্রসঙ্গে। দামোদর ও ভাগীরথী বর্ধমান জেলার এই দুই নদীর দুই বিপরীত তীর সংলগ্ন গ্রামশহর নির্বিশেষে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জনসংখ্যার ঘনত্ব সবচেয়ে বেশী। এছাড়াও জেলার মধ্য ও পূর্ব অংশেও , যা সচরাচর 'সমতল-রাঢ় হিসাবে পরিচিত, জনবসতির ঘনত্ব বেশী। অন্যদিকে বীরভূম সংলগ্ন বর্ধমানে উত্তরাংশ অর্থাৎ কাঁকসা-আউসগ্রামের 'জঙ্গলমহল' অঞ্চল ও জেলার পশ্চিমাংশে গ্রামাঞ্চলে এক কথায় রুক্ষ পর্বতময় রাঢ় অঞ্চলে জনবসতি তুলনামূলকভাবে অনেক কম। এই প্রসঙ্গে একটি কাকতালীয় তথ্য হল জেলার অধিকতর ঘনবসতি অঞ্চলের তুলনায় সাধারণভাবে কম ঘনত্বের এই শেষোক্ত অঞ্চলে তপশিলী জাতি উপজাতিদের বসবাস গরিষ্ঠতর। এই

জেলার জনবিন্যাসে আর একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা হল নদী এখানে অনেক ক্ষেত্রে জাতিগত বিভাজিকার ভূমিকা নিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, খড়ি নদীর উৎস থেকে মোহনা সামগ্রিক গতিপথের প্রায় পঞ্চাশ মাইল ব্যাপ্তির অর্ধাংশ (উৎস থেকে একটানা কুড়ি মাইল) জুড়ে এই নদীর দুই তীরবর্তী অঞ্চলের জনবসতির বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, নদীর দক্ষিণ দিকের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে যেমন রয়েছে আগুরী-বসবাসের প্রাধান্য , পক্ষান্তরে খড়ির উত্তর দিকের গ্রামাঞ্চলে আগুরীদের বসবাস নেই বললেই চলে। আবার, জেলার সাধারণ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এও অনেকসময় দেখা যায়, ছোট বড় কোন নদীর তীরবর্তী এক পাশে হয়তো রয়েছে অবিমিশ্র মুসলমান অধ্যুষিত গ্রাম, নদীর বিপরীত পাশের লোকালয় কিন্তু নির্ভেজাল সদগোপ বা আগুরীদের গ্রাম হিসাবে চিহ্নিত। আরও একটি বিচিত্র বৈশিষ্ট্য এখানে উল্লেখ করার মতো। বর্ধমান জেলা এমন অনেক মিশ্র বসতিপূর্ণ, এমনকি চার-পাঁচ হাজারী জনসংখ্যারও গ্রাম রয়েছে যেখানে সদগোপ বা আগুরীদের মত জেলার প্রধানতম জাতির কোন মানুষের বসবাস নেই। পাশাপাশি এই প্রবণতাও লক্ষণীয় যে, তপশিলী জাতিভুক্ত কোন মানুষের বাস নেই এমন একটিও গ্রাম বা শহর দেখা যাবে না এই জেলাতে। আবার, সাধারণভাবে স্বীকৃত পশ্চিমবাংলার বিশেষ কয়েকটি প্রধান জাতির উপস্থিতি বর্ধমান জেলায় খুবই নগণ্য বা নেই বললেই চলে। এই জেলার 'মাহিষ্য'বা 'চাষী' কৈবর্ত্যের প্রায় অস্তিত্ব নেই, 'তন্তুবায়' নামমাত্র, কায়স্থ,বৈদ্য, গন্ধবণিক ও সুবর্ণবণিকের সংখ্যাও খুব উল্লেখযোগ্য নয়, বাগদীদের তুলনায় বাউড়িরা নিতান্তই সংখ্যালঘু। আর একটি অন্য ধরনের বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায় এই জেলাতে। স্বাধীনোত্তর কালে পূর্ববঙ্গের কিছু কিছু বাঙালী উদ্বাস্তু পরিবার বর্ধমান জেলার বড় বড় শহরগুলিতে পাকাপাকি বাসিন্দা হয়েছেন, কিন্তু বর্ধমানের গ্রামাঞ্চলে উদ্বাস্তু বাঙালীদের বসবাস এখনও খুবই নগণ্য। নদীয়া-মুর্শিদাবাদ-হাওড়া-উত্তরবঙ্গের গ্রামাঞ্চলেও উদ্বাস্তু বাঙালীদের ব্যাপক বসবাস লক্ষ্য করা যায়।

উপসংহার, একনজরে বিভিন্ন তথ্যসম্বলিত - বর্ধমান জেলার জনসংখ্যার পরিসংখ্যান ও কিছু তুলনামূলক চিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে। সর্বশেষ পরিসংখ্যান অর্থাৎ ১৯৯১-এর আদমসুমারী অনুযায়ী বর্ধমান জেলার মোট জনসংখ্যা ছিল ৬০,৫০,৬০৫ যা পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮.৮৮ শতাংশ। ১৯৮১ -র আদমসুমারী অনুযায়ী এই পরিসংখ্যান ছিল যথাক্রমে ৪৮,৩৫,৩৮৮ এবং ৮.৮৬ শতাংশ। ১৯৯১-র আদমসুমারীভিত্তিক বর্ধমান জেলার জনসংখ্যার ভিন্নতর বিন্যাসে দেখা যায়, মোট পুরুষ - ৩১৮৬৮৩৩, মোট মহিলা - ২৮৬৩৭৭২, পুরুষ-মহিলার তুলনামূলক হিসাবে বর্ধমান জেলায় প্রতি ১০০০ পুরুষ পিছু মহিলার সংখ্যা ৮৯৮, রাজ্যভিত্তিক এই গড় অনুপাতটি হল - ৯১৮ ।

সংশ্লিষ্ট জেলাগত জনসংখ্যা বিন্যাসে আরো কিছু প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যান মোটামুটি

এইরকম :

বর্ধমান জেলায় জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিমিতে - ৮৫১, রাজ্যের গড় ঘনত্ব - ৭৬৬। জেলার মোট জনসংখ্যার মধ্যে তফসিলী জাতির মানুষের সংখ্যা - ১৬,৫৬,৭৩৯, তফসিলী উপজাতি - ৩,৯৩,৯৩৬ ; মোট জনসংখ্যার শতাংশের হিসাবে যা যথাক্রমে - ২৭.৩ ও ৬.৪৯। ১৯৯১ -র আদমসুমারী থেকে বর্ধমান জেলার জনসংখ্যা সম্পর্কিত আরো কয়েকটি আনুষঙ্গিক তথ্য হল — মোট গ্রামীণ জনসংখ্যা - ৩৯,২৭,৬১৩ (৭৪.৩৪ শতাংশ) শহরের জনসংখ্যা — ২১,২২,৯৯২ (২৫.৬৬ শতাংশ) ওই একই আদমসুমারীর পরিসংখ্যানে দেখা যায় - এই জেলায় সাক্ষরতার হার — ৮২.২২ শতাংশ। এই জেলায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির গড় বাৎসরিক হার — ২.৫ শতাংশ। ঠিক এই মুহূর্তে অর্থাৎ ২০০১ সালের আদমসুমারীর প্রাক্কালে বর্ধমান জেলার জনসংখ্যা দাঁড়াবে আনুমানিক ৭০ লক্ষ।

এবার, এক নজরে গত শতাব্দীর কালানুক্রমিক ও আদমসুমারিভিত্তিক বর্ধমান জেলার জনসংখ্যা তালিকা দেওয়া হল ঃ

সাল	জনসংখ্যা
১৯০১	১,৫২৮,২৯০
১৯১১	১,৫৩৩,৮৭৪
১৯২১	১,৪৩৮,৭৭১
১৯৩১	১,৫৭৫,৬৯৯
১৯৪১	১,৮৯০,৫৩২
১৯৫১	২,১৯১,৬৬৭
১৯৬১	৩,০৮৩,৫৬৭
১৯৭১	৩,৯১৬,১৭৪
১৯৮১	৪,৮৩৫,৩৮৮
১৯৯১	৬,০৫০,৬০৫

বর্ধমান জেলার ঠিক এই মুহুর্তে জনসংখ্যা কত ? আগেই এ সম্পর্কে একটি আনুমানিক সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে। ২০০১ সালের আদমসুমারীর আগে সরকারীভাবে সঠিক সংখ্যাটি পাওয়া সম্ভব নয়। তবে, এটুকু বলা যায় — পূর্বালোচিত ১৯৯১ -এর আদমসুমারী অনুযায়ী বর্ধমান জেলার মোট জনসংখ্যার সঙ্গে মোটামুটি ২০ শতাংশ যোগ করলে বর্তমানে জনসংখ্যার একটি আনুমানিক হিসাব পাওয়া সম্ভবপর হবে এবং তার ভিত্তিতে বিভিন্ন পর্যায়ে জনসংখ্যা সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্যাবলীর সাম্প্রতিকতম মোটামুটি কিছু ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

নিছক জনসংখ্যার আক্ষরিক হিসাব নিকাশের (Demographic) বাইরের বর্ধমান জেলার জনবিন্যাস চিত্রের দিকে মনোযোগী দৃষ্টি রাখলে সমাজতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সম্বলিত

(Sociological) কিছু কৌতূহলোদ্দীপক লক্ষণ চোখে পড়বে। অতি সংক্ষেপে, সেগুলির কিছু ইঙ্গিত দেওয়া যেতে পারে। বর্ধমানের সামগ্রিক জনবিন্যাসে বাঁকুড়া বা পুরুলিয়া জেলার মতো স্থায়ী বা অস্থায়ী মাইগ্রেশন প্রবণতা অর্থাৎ অন্য জেলায় চলে যাওয়া বা বসবাসের প্রবণতা দেখা যায় না বললেই চলে। দ্বিতীয়ত, জেলার উত্তর দক্ষিণ ইত্যাদি বিভিন্ন অঞ্চল সাপেক্ষে জনবসতি ঘনত্বের কম বেশী তারতম্য যেমন চোখে পড়ে, তেমনি আরো আশ্চর্যের ঘটনা হল – অঞ্চলগত বিভিন্নতায় সংশ্লিষ্ট জনসাধারণের মধ্যে প্রভাবশালী রাজনীতি-চর্চার ক্ষেত্রেও ঐতিহ্যগত স্বাতন্ত্র ইতস্তত খুঁজে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, অপেক্ষাকৃত জনবিরল উত্তর বর্ধমানে কাঁকসা-বুদবুদ-আউসগ্রাম এর অঞ্চলবিশেষে জেলার মূল রাজনৈতিক প্রবণতার পাশাপাশি মাঝে মাঝে উগ্রতর রাজনীতির অভিঘাত প্রায়শই দেখা যায়। অনুরূপভাবে, জেলার পশ্চিমাঞ্চলের বিশেষত আসানসোলের মতো বাঙালী-অবাঙালী সংখ্যালঘু অধ্যুষিত মিশ্র অঞ্চলে ও কাটোয়ার মতো অন্য ধরনের (গ্রামীণ-শহরভিত্তিক-ঐতিহ্যগত আঞ্চলিক - পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তু - সংখ্যালঘু) মিশ্র অঞ্চলেও মাঝে মাঝে মূল রাজনৈতিক স্রোত -বিরোধী তথা স্থিতাবস্থা - বিরোধী রাজনীতি চর্চার বহিঃপ্রকাশ মাঝে মাঝেই দেখা যায়। অনুসন্ধান বিস্তৃততর ও গভীরতর হলে বর্ধমান জেলার জনবিন্যাস-সংশ্লিষ্ট আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণের উন্মোচন ঘটতে পারে। এই জেলার, জনবিন্যাস বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটি ভিন্নতর প্রসঙ্গের উল্লেখ সম্ভবত অবান্তর হবে না। আগেই বলা হয়েছে – সাধারণত এই জেলা থেকে অন্য জেলায় মাইগ্রেশনের প্রবনতা নেই। কিন্তু, অন্য জেলা বা অঞ্চল থেকে এই জেলায় আসা বা বসবাস করার একটা প্রবণতা – স্থায়ী বা অস্থায়ী মাইগ্রেশনের ঘটনা মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে। এমনকি বর্হিবঙ্গ থেকে আজ থেকে অর্ধশতাব্দী বা তারও বেশী সময় আগে এই জেলায় এসে স্থায়ী বসবাস গড়ে তোলার ঐতিহ্য রয়েছে। আরো যেটা আশ্চর্যেব, বর্ধমান জেলায় স্থায়ীভাবে বসবাসরত অথচ বহিরাগত এই সব জনসাধারণের উল্লেখযোগ্য অংশের মধ্যে অসাধারণ, ঐতিহ্যপূর্ণ হস্তশিল্প দক্ষতা। এইভাবে দেখা যায় –উত্তর বর্ধমানের অঞ্চল বিশেষে রয়েছে 'ডোকরা' ও 'মহালি' সম্প্রদায়ভুক্ত হস্তশিল্পীদের বসবাস। এ ছাড়াও আঞ্চলিক উৎস সমৃদ্ধ আরো কিছু হস্তশিল্পী সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস রয়েছে বর্ধমান জেলার গ্রামীণ পটভূমিতে। এরকম কয়েকটি সম্প্রদায় – ডোম - সূত্রধর-মৃৎশিল্পী-শোলাভিত্তিক-মালাকার ইত্যাদি। তবে, এও উল্লিখিত হওয়া প্রয়োজন – জেলার মোট জনসংখ্যার তুলনায় এ ধরনের গ্রামীণ শিল্পী সম্প্রদায়ের মানুষের মোট সংখ্যা খুবই নগণ্য। কিন্তু, ভিন্নতর সমাজতাত্ত্বিক তাৎপর্যের নিরিখে এই বিশেষ জেলায় তাদের ঐতিহ্যগত বসবাসের ঘটনাটি নিঃসন্দেহে পৃথক গুরুত্ববাহী।

সামগ্রিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে নিঃসন্দেহে বলা যায়, পশ্চিমবাংলার জনগোষ্ঠীর ইতিহাস ও জনসংখ্যার বিন্যাস ' শীর্ষক পটভূমিতে বর্ধমান জেলা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। আগামী দিনের প্রত্নতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক গবেষণার সূত্রে লভ্য উপকরণ এই জেলার জনগোষ্ঠীর বিবর্তনের উপর হয়তো নতুনতর আলোকপাত করবে। রাষ্ট্রের তৃণমূল স্তর থেকে অর্থাৎ জেলা তথা আঞ্চলিক ভিত্তিভূমি থেকে বিভিন্ন জাতিসত্তার পরিচিতি মূলক

'স্বাতন্ত্রের' (Identity) প্রকৃত মূল্যায়ন ও তার সুষম বিকাশের প্রক্রিয়াটি ত্বরান্বিত হতে পারে এবং এইভাবে অর্থবহ হয়ে গড়ে উঠতে পারে জাতীয় পর্যায়ে অখণ্ড 'জাতি'র (Nation)ধারণা। সেই সঙ্গে সমগ্র দেশের আঞ্চলিক ভিত্তিমূল থেকে উৎসারিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, অজস্র বৈচিত্রের মধ্য দিয়ে নিশ্চিতভাবে ফুটে উঠবে প্রকৃত 'জাতীয় সংহতির' মিলনের সুর।

তথ্যসূত্র ঃ

১। বাঙালীর ইতিহাস – নীহাররঞ্জন রায়

২। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি – বিনয় ঘোষ

৩। বাংলার লোকসংস্কৃতি – আশুতোষ ভট্টাচার্য

৪। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস – সুকুমার সেন

৫। বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয় – অতুল সুর

৬। বর্ধমান পরিচিতি – অনুকূলচন্দ্র সেন ও নারায়ণ চৌধুরী

৭। রাঢ়বাংলার মাটি মানুষ ও সংস্কৃতি – ভব রায়

৮। The castes and Tribes of Bengal - H. H. Ristey

৯। Awards of Rural Bengal -- W. W Hunter

১০। Census Report, 1991

বর্ধমান জেলার স্বায়ত্ব শাসন ঃ পৌর অঞ্চল

প্রবীর চট্টোপাধ্যায়

ভূমিকা

হাজার হাজার বছর আগে আমাদের দেশে স্বায়ত্ব শাসন ব্যবস্থার প্রমাণ পাওয়া গেছে। হরপ্পা এবং মহেঞ্জোদাড়োতে বহু বছর আগে পরিপূর্ণ পৌর শাসন ব্যবস্থা ছিল। মেগাস্থিনিস এবং অন্যান্য বিদেশী গবেষক - পর্যটকদের রচনা থেকে আমরা এদেশে স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন ব্যবস্থার অনেক উল্লেখ পেয়েছি। প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যে রাজগীর - নালন্দা তক্ষশীলা প্রভৃতি স্থানে এই সভ্যতার পরিচয় পাওয়া গেছে। সেকালে পৌর বোর্ডকে বলা হত পরিষদ। এই পরিষদের সদস্যরা ছিলেন এস্টিনমি। ছোট ছোট এলাকার (ওয়ার্ড) স্থানিক পদের সদস্যরা নাগরিকদের সুখ বা স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাপার দেখাশোনা করতেন। এঁদের অধীনে থাকতেন "গোপা" নামের কর্মচারী। বৌদ্ধ যুগে তাম্রলিপ্ত বা তমলুক পৌরসভার প্রধানকে পৌরপ্রধান বলা হত।

পরাধীন ভারতবর্ষে বৃটিশ সরকার ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম পৌরসভা গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করে। সেই সময়ে ঐ প্রস্তাবে নাগরিকরা সাড়া না দেওয়ায় ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে পৃথকভাবে ভারতীয় পৌর আইন গৃহীত হয়। সেই আইন অনুসারে শহরাঞ্চলে সুযোগ সুবিধার জন্য বৃটিশ সরকারের কাছে আবেদন জানানোর কথা প্রচারিত হয়। ঐ আইন চালুর পর সেই আমলে প্রাথমিকভাবে এ রাজ্যের ১৫ টি শহর আবেদন করেছিল। রাণীগঞ্জ শহরের নাগরিকবৃন্দই সর্বপ্রথম পৌর সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দাবীতে ঐ আবেদন করে। সেই সময় রাণীগঞ্জ ছিল বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের ২৯ অক্টোবর বৃটিশ সরকার বিজ্ঞপ্তি জারি করে। সেই বছর ২ নভেম্বর প্রথম রাণীগঞ্জ ইউনিয়নের নাম প্রকাশিত হয় সরকারী গেজেটে। সেই আমলে অবিভক্ত বাংলার চল্লিশটি শহরে ইউনিয়ন (পৌরসভা) গঠিত হয়। ১৮৫৬ সালের ২০ আইনের ২ নং ধারা মোতাবেক ১৮৫৭ সালের ২৯ ডিসেম্বর বৃটিশ সরকার সর্বপ্রথম বর্ধমান শহরকেই এই জেলার প্রথম পৌরসভা হিসাবে ঘোষণা করে। ৩৬ টি গ্রাম নিয়ে গঠিত হয়েছিল বর্ধমান পৌরসভা। অবিভক্ত বাংলায় রাণীগঞ্জ সর্বপ্রথম শহরাঞ্চলের দাবীতে আবেদন করলেও ইউনিয়ন ঘোষণার বেশ কয়েক বছর পর রাণীগঞ্জ পৌরসভা স্বীকৃতি লাভ করে।

১৮৫৯ সালে ১২ সেপ্টেম্বর কাটোয়াকে ইউনিয়ন ঘোষণা করা হয়। ১৮৬০ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারী ইউনিয়ন হিসাবে ঘোষিত হয় কালনা। ১৮৬৯ সালের ৫ মার্চ দাঁইহাট শহর পৌরসভার স্বীকৃতি লাভ করে। দাঁইহাট সেই সময় কাটোয়া ইউনিয়নের অধীনে ছিল। ১৮৬৯ সালেই ১২ এবং ১৩ মার্চ কালনা ও কাটোয়া পৌরসভার স্বীকৃতি পায়। ১৮৭১

সালের ৫ জুলাই প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুসারে ১ আগষ্ট থেকে রাণীগঞ্জ পৌরসভার মর্যাদা লাভ করে। ১৮৮৫ সালের ২৩ এপ্রিল বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর আসানসোল পৌরসভার মর্যাদা পায়। আসানসোল পৌরসভা কাজ শুরু করে ১৮৯৬ সালে। এই জেলার দুর্গাপুর, জামুরিয়া, কুলটি, গুসকরা এবং মেমারী পৌরসভাগুলি অনেক পরে যাত্রা শুরু করেছে। ঐ সব পৌরসভাগুলির জন্ম-বৃত্তান্ত পৃথকভাবে পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনায় আসছে।

বর্ধমান জেলার শহরাঞ্চল

"লম্বা কোঁচা, কাছায় টান, বাড়ি জানবি বর্ধমান"। প্রাচীনকালে বর্ধমানের কোনও ভদ্রলোক ভিন জেলা কিংবা পার্শ্ববর্তী রাজ্যে গেলে তাঁকে এইভাবেই চিহ্নিত করা হত বর্ধমানের অধিবাসী হিসাবে। ভাষাতত্ত্ববিদ ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন , " বর্ধমান হচ্ছে কলকাতার মা" কারণ এই বর্ধমান থেকেই মোগল সম্রাট বৃটিশ বণিকদের হাতে সুতানুটি সহ তিনটি মৌজার স্বত্ব অর্পণ করেছিলেন। বৃটিশ আমলের ক্যাপিটাল সিটি , পরবর্তীকালে রাজ্যের রাজধানী কলকাতার জন্ম যে বর্ধমান থেকে শুরু হয়েছিল সেই বর্ধমানের তেমন প্রচারের বাহুল্য নেই। 'কলকাতার মা' বর্ধমানকে ট্যুরিস্ট মানচিত্রে স্থান করে নিতে তাই আজও আন্দোলন করতে হয়। আলোচ্য নিবন্ধে বর্ধমান জেলাকে জানতে এই জেলার শহরাঞ্চল নিয়ে আলোকপাত করছি।

বর্ধমান জেলায় এগারোটি পৌরসভা ও পৌরনিগম ছাড়াও রয়েছে ৫৪ টি সেন্সাস টাউন। পৌর এলাকাগুলি নিয়ে এই জেলায় মোট সেন্সাস টাউনের সংখ্যা পঁয়ষট্টি। জেলার দুইটি পৌর নিগম দুর্গাপুর এবং আসানসোল। এছাড়া নয়টি পৌরসভা বর্ধমান , রাণীগঞ্জ, কালনা, কাটোয়া, দাঁইহাট, গুসকরা, কুলটি, মেমারী এবং জামুরিয়া। এইসব পৌর এলাকা সহ পঁয়ষট্টিটি সেন্সাস টাউনের তালিকা এবং বিবরণ পৃথক তালিকায় রয়েছে।

সেন্সাস টাউন ঃ প্রধানতঃ চারটি নিয়ম অনুসারে সেন্সাস টাউন স্থির করা হয়। সেন্সাস টাউনের যোগ্যতা অর্জন করতে প্রয়োজন -

(১) এলাকায় কমপক্ষে ৫০০০ জনসংখ্যা। অথবা

(২) প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৪০০ মানুষের বাস, অথবা

(৩) প্রতি বর্গ মাইলে ১০০০ মানুষের বাস, অথবা

(৪) এলাকায় কমপক্ষে সত্তর শতাংশ পুরুষ শ্রমিককে কৃষি ছাড়া অন্যত্র (শিল্প-কারখানা প্রভৃতি) কাজে যুক্ত থাকতে হবে।

সেন্সাস টাউনের সংখ্যা হ্রাস ঃ

উন্নত সড়কপথের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, বিদ্যুতায়ন , পাকা বাড়ি, দোকান বাজার প্রভৃতির ক্রমবর্ধমান বিকাশের কারণে বর্ধমান জেলায় শহরাঞ্চলের এলাকা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯১ থেকে ২০০১ এই দশ বছরে বর্ধমান জেলায় শহরাঞ্চলের এলাকা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেলেও সংখ্যার বিচারে কিন্তু সেন্সাস টাউনের সংখ্যা কমে গেছে। পৌর এলাকা বাদে ১৯৯১ সালে এই জেলায় ৬১ টি সেন্সাস টাউন থাকলেও ২০০১ সালে তা

কমে হয়েছে ৫৫ টি। বার্ণপুর পৌরসভা আসানসোল পৌর নিগমের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ; এই কর্পোরেশনের মধ্যেই ঢুকে পড়েছে একদা সেন্সাস টাউন হিসাবে স্বীকৃত আসানসোল ব্লক। ১৯৯১ জনগণনায় সেন্সাস টাউন রূপে পরিচিত রাণীগঞ্জ এবং জামুরিয়া ব্লক এলাকা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে রাণীগঞ্জ পৌরসভায়। তাই ১৯৯১ থেকে ২০০১ এই দশ বছরে সেন্সাস টাউনের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে।

অসঙ্গতি ঃ ২০০১ সেন্সাস টাউনের তালিকায় বেশ কিছু অসঙ্গতি আছে। বহু ক্ষেত্রেই যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করে সেন্সাস টাউনের স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। অনেক ছোট ছোট শিল্প শ্রমিক অধ্যুষিত এলাকা সেন্সাস টাউনের স্বীকৃতি পেলেও এই তালিকায় ৫০০০ কিংবা তার চেয়েও বেশী ঘনবসতিপূর্ণ এলাকার নাম নেই। ২০০১ জনগণনায় ঘোষিত সেন্সাস টাউনের তালিকায় নেই গলসি, সেহারাবাজার, ভাতাড়, কড়ুই, নাসিগ্রাম, হাটগোবিন্দপুর, বড়বেলুন, ক্ষীরগ্রাম, শ্যামসুন্দর, বুদবুদ,পানাগড়, জামালপুর, কুড়মুন, নতুনহাট, কুসুমগ্রাম, মালডাঙ্গা, নিভুজিবাজার, সাতগাছিয়া কিংবা নসরতপুরের নাম। সরকারী নিয়মে ৫০০১ জনসংখ্যা বিশিষ্ট এলাকা সেন্সাস টাউনের মর্যাদা পাওয়ার অধিকারী হলেও ১৪০০০ জনসংখ্যা বিশিষ্ট নসরতপুরকে তা দেওয়া হয়নি।
পৌরসভা - পৌরনিগম ঃ বর্ধমান জেলায় দু'ইটি পৌরনিগম (কর্পোরেশন) সহ মোট এগারোটি পৌর এলাকার মধ্যে প্রাচীনতম বর্ধমান পৌরসভা (১৮৬৫)। কালনা, কাটোয়া এবং দাঁইহাট পৌরসভা স্থাপিত হয় ১৮৬৯ সালের একই দিনে ১ এপ্রিল। এরপর স্থাপিত রাণীগঞ্জ (১৮৭৬), আসানসোল (১৮৯৬), গুসকরা (১৯৮৮), জামুরিয়া (১৯৯৫), কুলটি এবং মেমারী (১৯৯৬) এবং দুর্গাপুর কর্পোরেশন (১৯৯৬)।

একনজরে এগারোটি পৌর এলাকা ঃ

নাম	স্থাপিত	জনসংখ্যা (১৯৯১)	এলাকা বঃ কি.মি.	ওয়ার্ড সংখ্যা
বর্ধমান	১ এপ্রিল ১৮৬৫	২,৪৫,০৭৯	২৩.০৪	৩৫
কালনা	১ এপ্রিল ১৮৬৯	৪৭,২২৯	৬.৪৭	১৪
কাটোয়া	ঐ	৫৫,৫৪১	১০.৭৮	১৯
দাঁইহাট	ঐ	২০,৩৪৯	১০.৩৬	১৪
রাণীগঞ্জ	১ জুন ১৮৭৬	৬১,৯৯৭	৬.৪৫	২১
আসানসোল *	১ জুন ১৮৯৬	২,৬২,১৮৮		৫০
গুসকরা	১ মার্চ ১৯৮৮	২৬,৯৯৫	২১.১৫	
জামুরিয়া	২৭ ডিসেম্বর ১৯৯৫	১,১৮,৪৯৬		২২
কুলটি	১ এপ্রিল ১৯৯৬	২,৪৯,২৮০		
মেমারি	ঐ	২০,৬৯০	১৪.৬৮	১৬
দুর্গাপুর *	৭ অক্টোবর ১৯৯৬	৪,২৫,৮৩৬	১৫৪.২০	৪৩

** চিহ্ন যুক্ত = কর্পোরেশন (পৌরনিগম)*

বর্ধমান জেলার সেন্সাস টাউন ঃ পূর্ণাঙ্গ তালিকা

ক্রম	নাম	আয়তন বর্গ কি.মি	মহকুমা	থানা	গড় বৃষ্টিপাত	বর্ধমান থেকে দূরত্ব	জন সংখ্যা ঃ ২০০১
১	আমকুলা	৩.০১	রাণীগঞ্জ	আসানসোল	১০৪১ মিমি	৯৪ কি.মি	৫৯৩৬
২	মুর্গা থাউল	২.১২	রাণীগঞ্জ	ঐ	ঐ	১০৮ কি.মি.	৭৮৭২
৩	রঘুনাথ চক	০.৮৭	ঐ	ঐ	ঐ	৮৬ কি.মি.	৫৪৭৭
৪	বল্লভপুর	১.৬৭	ঐ	ঐ	ঐ	৮৬ কি.মি.	৫৩৯১
৫	ভানোরা	৬.৭৪	বারাবনী	ঐ	১০৪১ মি.মি.	১২১ কি মি.	৭৭৩২
৬	পাঁচগাছিয়া		আসানসোল (উঃ)	ঐ			৭৬৬৮
৭	কেন্দা	৭.৯৫	জামুরিয়া	ঐ	৮৬৫ মি.মি.	৮০ কি.মি.	১৪,৫১৭
৮	পরাশিয়া	৪.৪৯	ঐ	ঐ	৮৬৫ মি.মি.	৮৭ কি.মি.	৮৬৮৪
৯	বাঁশরা		রাণীগঞ্জ	ঐ			৫১২৮
১০	চেলাদ	৩.৯৩	ঐ	ঐ		১০৪ কি.মি.	৭৯০১
১১	রত্তিবাটি	৬.৪৯	ঐ	ঐ		১০০ কি.মি.	৪৩৭০
১২	চাপুই	১.১৮	ঐ	ঐ		৯৯ কি.মি	৫১৮৫
১৩	জেমারি জেকে	৪ ২৪	ঐ	ঐ	১০৪১	৯৬ কি.মি.	
১৪	কুনুস্তোরিয়া		জামুরিয়া	ঐ			৫৪১৬
১৫	বেলেবাথান		রাণীগঞ্জ	ঐ			৪২৯২
১৬	চিত্তরঞ্জন	২৪.০২	চিত্তরঞ্জন	ঐ		১৪০ কি.মি.	
১৭	হিন্দুস্থান কেবলস	৪.৩৭	সালানপুর চিত্তরঞ্জন	ঐ	১৩০২ মি.মি.	১৩০ কি.মি	
১৮	জেমারি		সালানপুর	ঐ			৩৮৬৫
১৯	রামনগর		পাণ্ডবেশ্বর	দুর্গাপুর			৪৯২৬
২০	ডালুর বাঁধ	১০ ৮৭	ঐ	ঐ		১০০ কি.মি.	১৪,৯৭৮
২১	বিল পাহাড়ি		ঐ	ঐ			৭৭৮৬
২২	কেন্দা-খোট্টামডি		ঐ	ঐ			৭০৯০
২৩	হরিপুর	২.৫০	ঐ	ঐ	১০৪১ মি.মি.	৯০ কি.মি	৬৮,৮৮
২৪	নবগ্রাম		ঐ	ঐ			৪৬৪৩
২৫	কোনার ডিহি	৭.১১	ঐ	ঐ		৮৬ কি.মি.	৮২৪৮
২৬	মান্দারবনি	৩.৮৭	ফরিদপুর	ঐ	১২০০ মি.মি.	১০৫ কি.মি.	৫৪৯৭
২৭	সিরশা		ঐ	ঐ			৫২১৫

ক্রম	নাম	আয়তন বর্গ কি মি.	মহকুমা	থানা .	গড় বৃষ্টিপাত	বর্ধমান থেকে দূরত্ব	জন সংখ্যা ঃ ২০০১
২৮	সরপী	৫ ৪৩	ঐ	ঐ		৮০ কি.মি.	৫৮৯৭
২৯	চক বাঁকোলা	১.৭৮	অণ্ডাল	ঐ		১০২ কি মি	১০,৩১৮
৩০	শঙ্করপুব		ঐ	ঐ			৫৯২১
৩১	বহুলা	৫.৪৪	ঐ	ঐ		৯০ কি মি.	১৬.২৬৪
৩২	ছোড়া	৮.৯৫	ঐ	ঐ		৯৫ কি.মি.	১২,৮৩৯
৩৩	ধান্দা ডিহি		ঐ	ঐ			৩৮৪৩
৩৪	পরাশ কোল	৯.৮২	ঐ	ঐ	১২৬৫ মি.মি	৮৭ কি.মি	১০,৯৮৯
৩৫	সিদুলী		ঐ	ঐ	১২৬৫ মি মি		
৩৬	খান্দবা	৭.৪৯	ঐ	ঐ	১২৬৫ মি মি.	৮৫ কি.মি.	১৩,৪৯০
৩৭	উখরা	৭.৩৩	ঐ	ঐ	১২৬৫ মি মি.	৮০ কি.মি	১৯,৮৬৮
৩৮	মহিরা		ঐ	ঐ			৪৪৯২
৩৯	কাজোড়া	১১.৯২	ঐ	ঐ		৮৫ কি.মি.	২৪,৯৫৫
৪০	হরিশপুর		ঐ	ঐ			৮৪০১
৪১	পলাশবন	২.৮৩	ঐ	ঐ	১২৬৫ মি মি.	৮৩ কি.মি.	৪৮৫৬
৪২	দিগনালা	৩.৬৪	ঐ	ঐ	১২৬৫ মি মি.	৮০ কি.মি.	১২,৫১০
৪৩	অণ্ডাল	২.৭৭	ঐ	ঐ	১২৬৫ মি.মি.	৮০ কি মি.	১৯,৫০৪
৫৪	বাকসা	১ ৯৫	ঐ	ঐ	১২৬৫ মি মি	৮৩ কি.মি.	৪৯,৮০
৪৫	প্রয়াগপুব		কাঁকসা	দুর্গাপুব			৫১৪৯
৪৬	দেবীপুর		ঐ	ঐ			৯১১৫
৪৭	কাঁকসা		ঐ	ঐ	১৩০০ মি মি.	৫৫ কি.মি.	১৬,৫২৮
৪৮	শুকডাল	৪.৫৭	বুদবুদ	ঐ	১৩৫০ মি.মি	৪০ কি.মি.	১১,৭৮৫
৪৯	পানুহাট		কাটোয়া	কাটোয়া		৬০ কি.মি.	৫৬৬৫
৫০	পাটুলী		পূর্বস্থলী	কালনা	১২২১ মি মি.		৪৪৫১
৫১	শ্রীরামপুর		ঐ	ঐ	১২২১ মি.মি		১৭,৭১৫
৫২	হাট সিমলা		ঐ	ঐ	১২২১ মি.মি		৬১৭৫
৫৩	গোপীনাথপুর		ঐ	ঐ	১২২১ মি মি		৪৯৮৩
৫৪	উত্তব গোযারা		কালনা	কালনা			৬৯৭২
৫৫	ধাত্রীগ্রাম	২ ৬০	ঐ	ঐ	১২২১ মি মি	৩৩ কি মি	৯৬০৯
						মোট	৪,৮২,০৬৮

বর্ধমান জেলায় দুইটি পৌর নিগম (দুর্গাপুর ও আসানসোল) নয়টি পৌরসভা এবং ৫৫টি সেন্সাস টাউন আছে। সেন্সাস টাউন নিয়ে আলোচনা আগেই করা হয়েছে। পৌর নিগম এবং পৌরসভা (মোট এগারটি) নিয়ে পৃথকভাবে প্রতিবেদন পেশ করছি। পঞ্চান্নটি সেন্সাস টাউন ও সেগুলির অতিসংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচের তালিকায় দেওয়া হল। (চার্ট ১৩)

১৯৯১ থেকে ২০০১ ঃ বিভিন্ন পৌর এলাকায় সাক্ষরতার হার

ক্রম	পৌরসভা / নিগম	১৯৯১	২০০১	মোট জনসংখ্যা'০১
১.	আসানসোল / নিগম	৭৫.৯৫%	৭১.৫২%	৪,৩৫,৬০২
২.	দুর্গাপুর / নিগম	৭৮.৫৭%	৭৫.১৩%	৪,৮০,২১৭
৩.	বর্ধমান পৌরসভা	৭৫.৭৩%	৭৭.৩৭%	২,৮৫,৮৭১
৪.	রাণীগঞ্জ পৌরসভা	৭২.০৫%	৬৪.৫৪%	১,২২,৭৯১
৫.	কাটোয়া পৌরসভা	৭৫.১৮%	৭৩.৮৮%	৭১.৫৭৩
৬.	কালনা পৌরসভা	৭৬.৯৬%	৭৭.৪৬%	৫২.১৭৬
৭.	মেমারি পৌরসভা	৭১.৬৩%	৬৯.৪০%	৩৬,১৯১
৮.	গুসকরা পৌরসভা	৬৫.৬১%	৭১.৫২%	৩১,৮৬৩
☆৯.	কুলটি পৌরসভা	৬৬.৪৪%	৬০.৬৮%	২,২৬,৮৯৫
১০.	দাঁইহাট পৌরসভা	৬২.৯৬%	৬৫.৭৪%	২২,৫৩৯
☆১১.	জামুরিয়া পৌরসভা	৫৩.৫৩%	৫৮.১৯%	৯৮,৭২০
			মোট	১৮,৬৪,৪৯২

☆ ১৯৯১ সালে পৌরসভা ছিলনা, ব্লকের সাক্ষরতা হার থেকে এই তথ্য সংগৃহীত

☆☆ জেলার সেনসাস টাউন গুলির বিস্তারিত তালিকা পরে দেওয়া হল

আসানসোল পৌর অঞ্চল ঃ

প্রাচীনকালে এখানে আসন বৃক্ষের ঘন জঙ্গল ছিল। আসন কাঠের জন্যই এই স্থান আসানসোল নামে চিহ্নিত হয়। অতীতে কাশীপুর রাজ্যের অধীন মহীশিলা গ্রামে রাজার গড় (দুর্গ) এবং শেরশাহ নির্মিত জি.টি.রোডের ধারে কাশীপুর রাজের কাছারি বাড়ি ছিল। রাজ কর্মচারী তিনকড়ি রায় এবং রামকৃষ্ণ রায় রাজ অনুগ্রহে প্রাপ্ত এই জমিতে আসানসোল গ্রাম স্থাপন করেন।

আসানসোল শহর ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে পৌরসভার স্বীকৃতি লাভ করলেও ১৯০৬ পর্যন্ত পার্শ্ববর্তী রাণীগঞ্জ ছিল মহকুমা শহর। পরে মহকুমা শহর রাণীগঞ্জ থেকে আসানসোলে স্থানান্তরিত হয়। সিপাহী বিদ্রোহের সময় পূর্বভারতে ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলপথে শেষ স্টেশন ছিল রাণীগঞ্জ। বৃটিশ সেনাবাহিনী উত্তর ভারতে যাওয়ার পথে রেলপথে এই রাণীগঞ্জেই

অবতরণ করত। ছোটনাগপুরের কালেক্টর মিঃ হার্ডলি ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে অনুমতি নিয়ে ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে গার্ণার নামে এক সাথীর সহায়তায় আসানসোলে কয়লা উত্তোলনের চেষ্টা শুরু করেছিলেন। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে রুপার্ট জোন্স বড়লাটের কাছে প্রদত্ত রিপোর্টে আসানসোল অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট কয়লা সঞ্চিত থাকার উল্লেখ করেছিলেন। সেই সময় বৃটিশ সংস্থা বেঙ্গল কোল কোম্পানীর সদর দপ্তরও স্থাপিত হয় রাণীগঞ্জের কাছে এগরায়।

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে দ্বারকানাথ ঠাকুর (Carr & Tagore Co.) কয়লা উত্তোলন শুরু করেছিলেন। সেই সময় আসানসোলে রেলপথ ছিল না। নদীপথে দামোদর, অজয়, আমতা, বৈদ্যবাটী, কলকাতার আর্মেনিয়ান ঘাট, বাবুঘাট হয়ে আসানসোলের উৎকৃষ্ট কয়লা নৌকা করে নামত কলকাতার কয়লাঘাটে।

দ্বারকানাথ ঠাকুরের আমলে এই কয়লা পরিবহনে নিযুক্ত বেঙ্গল কোল কোম্পানির ১৫০০ টি নৌকা ছিল। বেতনভুক মাঝি ছিলেন ৯০০ জন। সে এক অন্য ইতিহাস। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে হাওড়ার সাথে রাণীগঞ্জের রেল যোগাযোগ স্থাপিত হয়। তবুও ১৮৭০ পর্যন্ত নদীপথে কয়লা পরিবহন চলেছিল। পশ্চিমদিকে মূলতঃ কয়লা পরিবহনের লক্ষ্যেই কোম্পানী রেলপথের সম্প্রসারণ করে। রাণীগঞ্জের পরেই পশ্চিমে এই রেলপথে যুক্ত হল আসানসোল। বিশেষ কয়েকটি সুবিধার কারণেই ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে আসানসোল শহর পৌরসভার স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে মহকুমা দপ্তরও স্থাপিত হল আসানসোলে। ফলে একদা সমৃদ্ধশালী রাণীগঞ্জকে পিছনে ফেলে অনেক এগিয়ে গেল আসানসোল।

পরাধীন ভারতে আসানসোলে এসে মিশনারীরা তাঁদের বড় ঘাঁটি স্থাপন করেন। ধর্মপ্রচারের সাথে সাথে সাধারণ মানুষের কল্যাণ কামনায় ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে মিশনারীরা রোমান ক্যাথলিক মিশন স্থাপন করেছিলেন। পরবর্তীকালে সেন্টপ্যাট্রিক কনভেন্ট কৃত অনুন্নত শ্রেণীর শিশুদের জন্য আবাসিক বিদ্যালয়, কুষ্ঠাশ্রম প্রভৃতি জনসেবা মূলক কাজের মাধ্যমে মিশনারীরা আসানসোলকে পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে এসেছিলেন। মিশনারীরা তাঁদের ইচ্ছামত দীর্ঘদিন এই আসানসোলে কাজ করতে পারেননি, তবুও সেবা, শিক্ষাদান এবং নিরলস শ্রমের মাধ্যমে তাঁরা আসানসোল শহরকে সকলের নজরে তুলে আনতে উল্লেখযোগ্য অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছিলেন।

১৮৮৪ সালের পৌর আইন অনুসারে ১৮৮৫ সালের ২৩ এপ্রিল ঘোষিত বিজ্ঞপ্তি মোতাবেক ১জুলাই ১৮৮৫ তারিখে আসানসোল পৌরসভা গঠিত হয়; কিন্তু তা কার্যকর হয় দীর্ঘ এগার বছর পর ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ১ জুন থেকে। ১৮৯৬ সালের ১ অক্টোবর ৯ জন মনোনীত সদস্য নিয়ে আসানসোল পৌরসভা গঠিত হয়। সেই সময় পৌরসভার জনসংখ্যা ছিল ১১,৭৩৭। করদাতা ছিলেন ১৬৫৬ জন। রেলপার, ইংরাজ এলাকা, বুধাডাঙ্গা, বস্তিন সাহেবের বাজার, পাকা বাজার, মুন্সী বাজার এবং তালপুকুর চটি এলাকা নিয়ে

আসানসোল পৌরসভা গঠিত হয়েছিল। প্রথমাবস্থায় এই পৌরসভা চলত নিজস্ব সম্পদ এবং কর সংগ্রহের মাধ্যমে। উন্নয়ন বাবদ রাজ্য কিংবা কেন্দ্রীয় সরকার এই পৌরসভা খাতে কোনও অর্থই বরাদ্দ করত না।

১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে স্বাধীনতা লাভের কুড়ি বছর পর রাজ্যের যুক্তফ্রন্ট সরকার সর্বপ্রথম অক্ট্রয় বাবদ কিছু অর্থ সহ পৌরসভার শ্রমিক ও কর্মীদের বেতনের একটা অংশ প্রদানের ব্যবস্থা চালু করে। এই সময় থেকেই আসানসোল পৌরসভার কিছুটা উন্নতি শুরু হয়।

আসানসোল পৌর নিগম ঃ এক নজরে

মোট এলাকা	ঃ ১৩০ বর্গ কিলোমিটার
জনসংখ্যা	ঃ ৪,৩৫,৬০২ (২০০১ জনগণনায়)
ভোটার সংখ্যা	ঃ ২,৯২,৪৯২ (১৯৯৯ পর্যন্ত)
জনসংখ্যার বিচারে	ঃ পুরুষ - ৫২.৬২ এবং মহিলা - ৪৭.৩৮ শতাংশ
শিল্প এলাকা	ঃ ২৭৫০.৩৬ একর
রেলওয়ে এলাকা	ঃ ১৬৩০ একর
পতিত জমি	ঃ ৮২৪৫ একর
খনি এলাকা	ঃ ৬৭৫ একর
কৃষি এলাকা	ঃ ৭৯৪৩.৫২ একর
সাক্ষরতার হার	ঃ ৮০ শতাংশ
প্রধান ভাষা	ঃ বাংলা, হিন্দী ও উর্দু
বস্তী এলাকার জনসংখ্যা	ঃ ২,৩১,৪৮৮ (১৯৯৮)
পৌর নিগমের স্বীকৃতি	ঃ ৩০ মে, ১৯৯৪
পৌর নিগম হওয়ার সময়	ঃ ওয়ার্ড সংখ্যা - ৩৫
বর্তমানে(২০০১)ওয়ার্ড সংখ্যা	ঃ ৫০ টি
বরো অফিস	ঃ ৫ টি
ওয়ার্ড কমিটি	ঃ ৫০ টি
বড় ক্লাব	ঃ আসানসোল ক্লাব এবং ক্যারেট ক্লাব
সিনেমা হল	ঃ ৬ টি
বড পার্ক	ঃ ৪ টি , দামোদর তীরে কমলা নেহরু পার্ক, জি.টি.রোডের ধারে শতাব্দী পার্ক, কসাই মহল্লায় ফইজ-ই-আজম বাগ, নিঘা ঃ গুঞ্জন পরিবেশ কানন।
স্টেডিয়াম	ঃ ৬ টি
বক্সিং রিং	ঃ ১ টি

লাইব্রেরী	ঃ	৬ টি
রেশন দোকান	ঃ	৩২ টি
রেশন কার্ডধারী	ঃ	২,৭১,৮৮৯(ফেব্রুয়ারী '৯৬) প্রাপ্ত বয়স্ক - ২,১৯,৪০২ শিশু - ৫২,৪৮১
মোট বিদ্যালয়	ঃ	১৫০ টি
হাইস্কুল ও কলেজ	ঃ	১৮ টি
প্রযুক্তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	ঃ	২ টি
হোমিও কলেজ	ঃ	১ টি
হাসপাতাল	ঃ	৬ টি
নার্সিং হোম	ঃ	৩০ টি
স্বাস্থ্যকেন্দ্র	ঃ	৪ টি
স্বাস্থ্য পরিষেবায় নিযুক্ত সংস্থা	ঃ	রাজ্য সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগ, আসানসোল মাইন্স বোর্ড অফ্ হেলথ, আসানসোল পৌর নিগম, পূর্ব রেলওয়ে , ইস্টার্ণ কোল ফিল্ড লিঃ এবং ইস্কো।

১৯৯৯ খৃষ্টাব্দে ওয়ার্ড ভিত্তিক ভোটার সংখ্যা ঃ ১ - ৭৪৬৯ ; ২ - ৪৯৮২; ৩ - ৭৩১৯; ৪ - ৬৬৮০; ৫ - ৩৬৫২; ৬ - ৫৭৮৯; ৭ - ৬২৯৯ ; ৮ - ৬৯৩৮; ৯ - ৪২৬৮; ১০ - ৩৭৮; ১১ - ২৫২৩; ১২ - ৪৭৩৪; ১৩ - ২৫৮৫; ১৪ - ৩১৯; ১৫ - ৫০৭৯; ১৬ - ২৬৩৫; ১৭ - ৩৯৭৩; ১৮ - ৪১৪২; ১৯ - ৫৯৪০; ২০ - ৬৮০৮; ২১ - ২৪০৫; ২২- ৪৯৮৫; ২৩ - ৪৩৮২; ২৪ - ৭০৬৫; ২৫ - ৫৪৪২; ২৬ - ৫৯৬৩; ২৭ - ৫৯২৬; ২৮ - ১৩৭২৮; ২৯ - ৯৪৪৮; ৩০ - ৫৭১৯; ৩১ - ৯৫৬১; ৩২ - ৫২৬৯; ৩৩ - ৬৪৩১; ৩৪ - ৩৪০৫; ৩৫ - ৪৩১৪; ৩৬ - ৪৪৬০; ৩৭ - ৫৭৬৬; ৩৮ - ৬৮১৪; ৩৯ - ৫৬৪৩; ৪০ - ৬৮২২; ৪১ - ৫৮৭৯; ৪২ - ৪৮৫৮; ৪৩ - ৬১৫৬; ৪৪ - ১০৬৬৮; ৪৫ - ৮১৫০; ৪৬ - ৭৬১৩; ৪৭ - ৭১২৯; ৪৮ - ৯২৩৮; ৪৯ - ৪৩৭১; ৫০ - ৬০৮৯ ।

এই তালিকায় ১৮টি ওয়ার্ড গ্রামীণ এলাকায় ৩২ টি ওয়ার্ড শহরাঞ্চলে অবস্থিত। গ্রামাঞ্চলের ওয়ার্ডগুলি যথাক্রমে,১, ৩, ৫, ৭, ৯, ১১, ১৩, ১৫, ১৭, ১৯, ২১, ২৩, ২৫, ২৭, ২৯, ৩১, ৩২, ৩৩ । শেষের তিনটি ওয়ার্ড রাণীগঞ্জ, হীরাপুর এবং আসানসোল ব্লক থেকে আসানসোল পৌর নিগমে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।

আসানসোলের কাছে বরাকর নদের ওপর মাইথন জলাধার পর্যটকদের কাছে শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহার রাজ্যকে বিভাজন করেছে বরাকর নদ। মাইথন ড্যামের উচ্চতা ১৩৬ ফুট। কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে এখানের জলবিদ্যুৎ প্রকল্প পরিদর্শন করা এক

দুর্লভ অভিজ্ঞতার ব্যাপার। আসানসোলে দর্শনীয় বেশ কিছু মন্দির, মসজিদ এবং গীর্জা আছে। নীলকণ্ঠেশ্বর মহাদেব, ছিন্নমস্তা, শ্রীগৌরাঙ্গ মন্দির, শ্মশানকালী মন্দির, সত্যনারায়ণ মন্দির এবং ঘাঘর বুড়ি চণ্ডীকা দেবীর স্থান দর্শনীয়। কাছেই আছে কল্যাণেশ্বরী এবং চুরুলিয়ায় বিদ্রোহী কবি নজরুলের জন্মস্থান। আসানসোলের ৫ কিমি. উত্তর-পশ্চিমে গাড়ুই গ্রামে আছে প্রাচীন বিষ্ণুমন্দির। বেলে পাথরে তৈরী এই মন্দির পুরাতত্ত্ব বিভাগ অধিগ্রহণ করেছে।

বর্ধমান পৌর অঞ্চল

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ১ এপ্রিল স্বায়ত্ব শাসন বিভাগের মন্ত্রী বিজয়াপ্রসাদ সিংহরায় ১৯৩২ সালের বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট অনুসারে বর্ধমান পৌরসভার শুভারম্ভ ঘোষণা করেছিলেন। ঐ বছর ৩ এপ্রিল স্বায়ত্ব শাসন বিভাগের সহকারী সচিব ১১১২ নং পত্রে বর্ধমানের বিভাগীয় কমিশনারকে বর্ধমান পৌরসভা অনুমোদনের কথা জানিয়েছিলেন। সেই পত্রে এই পৌরসভায় প্রথম কমিশনার রূপে মতিলাল চৌধুরীর নাম মনোনীত করা হয়েছিল। মতিলাল চৌধুরী ছিলেন বর্ধমানের খ্যাতনামা আইনজীবি। বর্ধমান পৌরসভার প্রথম অধিবেশন হয় ১ মে ১৮৬৫। তাই অনেকে মনে করেন ১ মে তারিখেই জন্ম বর্ধমান পৌরসভার। বর্ধমান শহরাঞ্চলের মুরাদপুর, রাণীগঞ্জ, এরাব মহল্লা প্রভৃতি মৌজা ছাড়াও ৩৬টি গ্রাম নিয়ে বর্ধমান পৌরসভা গঠিত হয়। এই গ্রামগুলি যথাক্রমে এদিলপুর, তেজগঞ্জ, ফকীরপুর, বালামহাট, দেওয়ানগঞ্জ, তবীর মহল্লা, আলিগঞ্জ, আলিমগঞ্জ, কাঠঘর মহল, বঙ্গপুর, ভাটাশালা, গোলাহাট, খজানর বেড়, শাঁকুরি পুকুর, দামরাই, মাসার বেড়, জগৎবেড়, পারবীরহাটা, নীলপুর, ছোটনীলপুর, নিষকিবাজার, কানাই নাটশাল, বেনেপাড়া, ইচলা বাজার, শেয়ালডাঙা, কালীবাজার, হাফিজুল্লার বেড়, রসিকপুর, বাহিরসর্বমঙ্গলা, বাবুরবাগ, কেশবগঞ্জ চটি, গদা, কাজিরহাট, কাবরাপাট্টা, পাহাড়পুর এবং নাথুদ্দি।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ১ মে ৬ জন ইউরোপীয় এবং ৯ জন ভারতীয়কে নিয়ে বর্ধমান পৌরসভার প্রথম অধিবেশন হয়েছিল। এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন মিঃ সি এফ মন্টেসর (পৌরপতি) , মিঃ এস এস হগ (জেলা ম্যাজিস্ট্রেট), মিঃ এল আর (নির্বাহি বাস্তুকার), মিঃ এইচ এস সাদারল্যাণ্ড, ডাঃ এ এ মন্টেল, মিঃ পি মেগার্থা, বাবু পাঞ্জাবলাল বর্মন, বাবু মতিলাল চৌধুরী, বাবু বনমালী মুখার্জী, বাবু হরিনারায়ণ পুরোহিত, বাবু মদনলাল বর্মন, বাবু মহানন্দ রায়, বাবু মদনলাল তেওয়ারী, মুন্সী জোঁহাদ রহিম এবং বাবু ব্রজলাল তেওয়ারী।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে বর্ধমান পৌরসভার আংশিক নির্বাচন হল। ১০৪৫ জন নাগরিকের ভোটে ২২ জন কমিশনার নির্বাচিত হলেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ১৭ জানুয়ারী পৌরসভার প্রধান এবং উপপ্রধান নির্বাচনের সভায় ভারতীয় কমিশনাররা সরাসরি ইংরাজদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে ডাঃ জগবন্ধু মিত্রকে পৌরপতি মনোনীত করেন। বৃটিশ প্রতিনিধিদের

প্রস্তাবিত পৌরপতি এবং উপ-পৌরপতির নাম সেই সভায় ধ্বনি ভোটে বাতিল হয়ে যায়। পৌর সদস্য মদন মোহন তেওয়ারীর প্রস্তাব এবং ডাঃ দীননাথ দাসের সমর্থনে ডাঃ জগবন্ধু মিত্রকে পৌরপতি নির্বাচিত করা হয়। সেই সভায় উপ-পৌরপতি নির্বাচিত হন বাবু মহেন্দ্রনাথ পণ্ডিত।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ২৯ ডিসেম্বর জন সাধারণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে বর্ধমান পৌরসভার প্রথম পৌরপতি হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন বর্ধমানের কৃতি সন্তান রায় বাহাদুর নলিনাক্ষ বসু। উপ-পৌরপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন বাবু মহেন্দ্রনাথ পণ্ডিত।

১৮৮৪ থেকে ২০০০ ঃ পৌরপতি এবং উপ-পৌরপতি

সাল	পৌরপতি	উপ-পৌরপতি
১৮৮৪ - ৯২	নলিনাক্ষ বসু	মহেন্দ্রনাথ পণ্ডিত
১৮৯৩ - ৯৪	নলিনাক্ষ বসু	মুন্সি ইমাম বক্স
১৮৯৪ - ৯৭	জগবন্ধু মিত্র	মীর্জা বেদার বখত্
১৮৯৮ - ১৯১০	নলিনাক্ষ বসু	ডাঃ জগবন্ধু মিত্র
১৯১১ - ১৯১৮	সন্তোষ কুমার বসু	মোঃ নজিরউদ্দিন আমেদ
১৯১৯ - ১৯২৩	সন্তোষ কুমার বসু	নরেশ চন্দ্র মিত্র
১৯২৪ - '২৭	মৌলভী মহঃ ইয়াসিন	নরেশ চন্দ্র মিত্র
১৯২৮ - '৩৬	নরেশ চন্দ্র মিত্র	ডাঃ সত্যচরণ মিত্র
১৯৩৭ - '৪২	গিরীন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়	মহঃ আজেম
১৯৪২ - '৪৬	সন্তোষ কুমার বসু	মহঃ আজেম
১৯৪৬ - '৫২	প্রণবেশ্বর (টোগো) সরকার	অমিয় প্রকাশ নন্দে
১৯৫৩ - '৫৫	তারাকুমার মিশ্র	অমিয় প্রকাশ নন্দে
১৯৫৫	ডাঃ রুদ্রনাথ ঘোষ	ডাঃ বিরজাপতি ভট্টাচার্য
১৯৫৬	ডাঃ কিরীটি দত্ত	ডাঃ বিরজাপতি ভট্টাচার্য
১৯৫৭	ফনিভূষণ সামন্ত	ডাঃ বিরজাপতি ভট্টাচার্য
১৯৫৮	(তিনজন সরকারী পরিচালক)	
১৯৫৮ - '৬২	শৈলেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	ডাঃ চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়
১৯৬২ - '৬৪	ডাঃ কিরীটী দত্ত	ডাঃ চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়
১৯৬৫	পরিচালক এস সি চক্রবর্তী	
১৯৬৬	পরিচালক ডি এল ব্যানার্জী	
১৯৬৬ - ৬৭	পরিচালক এ আর দাশগুপ্ত	
১৯৬৭ - ৭১	শৈলেশ চন্দ্র ব্যানার্জী	গৌরহরি চৌধুরী
১৯৭২ - ৭৬	তারাপদ প্রামাণিক	সাধন ঘোষ
১৯৭৬ - ৭৭	সাধন ঘোষ	মিহির ঘোষাল

১৯৭৭ - ৮১	৪ জন সরকারী পরিচালক আর এন চক্রবর্তী, টি.কে.গাঙ্গুলি জয়ন্ত রায় এবং ইউ সি সেন	
১৯৮১ - ৮৮	সুধাংশু রায়	আমানুল্লাহ্ আকবর
১৯৮৮ - ৯৩	সুরেন্দ্রনাথ মণ্ডল	জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য
১৯৯৩ - ৯৮	সুরেন্দ্রনাথ মণ্ডল	বদ্রী চৌধুরী
১৯৯৮	সুরেন্দ্রনাথ মণ্ডল	আইনুল হক

১৮৮৪ - ৮৫ খৃষ্টাব্দে বর্ধমান জেলার চারটি পৌরসভায় প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বর্ধমান পৌরসভার ৫ টি ওয়ার্ড থেকে ১৫ জন, কাটোয়ার ৩ টি ওয়ার্ড থেকে ৮ জন, কালনার ৩ টি ওয়ার্ড থেকে ১০ জন এবং দাঁইহাট পৌরসভায় ৩ টি ওয়ার্ড থেকে ৮ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে আসানসোল পৌরসভা গঠিত হয়। শুরুর সময় আসানসোলে নয়জন মনোনীত সদস্য ছিলেন পৌরসভায়।

প্রথম নির্বাচনের (১৮৮৪) সময় বর্ধমান পৌরসভার জনসংখ্যা ছিল ৩২,৬২৯। সেই সময় করদাতা ছিলেন ৬২০০ জন। জন্ম লগ্ন থেকেই পৌরসভার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কিংবা প্রার্থী মনোনয়নে রাজনীতির কোনও প্রভাব ছিল না। লড়াই ছিল ব্যক্তি এবং তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাবকেন্দ্রিক। ১৯৭৮ সালে রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রথম ব্যক্তির পরিবর্তে রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের লড়িয়ে দেয়। ১৯৮১ সালে পৌর নির্বাচনেও রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা নির্বাচিত হন। ১৮৮৪ সালের বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল আইন অনুসারে পৌরসভাগুলির নির্বাচন শুরু হয়েছিল। সেই সময়ের ভোটে কোনও গোপনীয়তা ছিল না। ভোট দিতে হত হাত তুলে সমর্থন জানিয়ে। সকল নাগরিক কিংবা করদাতাদের ভোটাধিকার ছিল না। এমনকি মহিলারাও ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলেন। করদাতা পূর্ণবয়স্ক পুরুষ, স্নাতক কিংবা ডিপ্লোমাধারী, আইনজীবি কিংবা ন্যূনতম মাসিক ৫০ টাকা বেতনের চাকুরীজীবিরা ভোটাধিকার লাভ করতেন। বর্ধমান পৌরসভায় প্রথম নির্বাচনে ৬২০০ করদাতার মধ্যে ভোটার ছিলেন এক হাজারের কাছাকাছি। আগেই বলা হয়েছে, সেই সময় বর্ধমান পৌরসভার জনসংখ্যা ছিল বত্রিশ হাজারের বেশী।

১২৫ বছরে বর্ধমান পৌরসভার কিছু স্মরণীয় বছর ঃ

১৮৬৫ পৌরসভার স্বীকৃতি এবং প্রথম অধিবেশন; ১৮৭৩ নির্বাচনের দাবীতে নাগরিকদের স্মারকলিপি প্রদান; ১৮৭৫ - আংশিক নির্বাচনের মাধ্যমে ২২জন কমিশনার; ১৮৭৮ মনোনীত পৌর প্রধানের পদে প্রথম ভারতীয় (ডাঃ জগবন্ধু মিত্র) ; ১৮৮৪ প্রথম নির্বাচিত পৌরপ্রধান (রায় বাহাদুর নলিনাক্ষ বসু); ১৮৯৪ - বংশগোপাল টাউন হল পৌরসভা লাভ করে; ১৮৯৮ - প্রথম জলকল প্রতিষ্ঠা, পৌরভবন এবং পৌর বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠাও হয় একই বছরে। ১৯২৩ - বর্ধমানে বিদ্যুৎ আসে। ১৯২৬ - বর্ধমানের পথে জ্বলে বৈদ্যুতিক আলো ; ১৯২৮ - মহারাজ কুমার উদয় চন্দ পৌর সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯২৯ - শহরের

প্রধান পথগুলিতে পীচ ঢালাই শুরু হয়; ১৯৩০ - বড় রাস্তার ধারে নর্দমাগুলি পাকা হয়; ১৯৩৭ - পৌরসভা মাতৃসদন ও কুষ্ঠ আরোগ্যশালা তৈরী করে ; ১৯৫৪ - জঞ্জাল ফেলার জন্য পৌরসভা প্রথম যন্ত্রচালিত গাড়ি ক্রয় করে ; ১৯৫৫ সালে পৌরসভার ২৫ টি ওয়ার্ডে বিভাজন ; ১৯৫৬ - সরকারী সাহায্যে জলপ্রকল্পের উন্নতি; ১৯৫৯ - শ্মশান ঘাটের উন্নতি, পার্ক ও পথ সংস্কার ; ১৯৬১ - চারটি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ ; ১৯৬৪ - সরকারী পরিচালকদের হাতে চলে যায় পৌরসভা পরিচালনার দায়িত্ব ; ১৯৭১ - ২৮ ডিসেম্বর পৌর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ; ১৯৭২ - নতুন পৌরবোর্ড ক্ষমতায় আসে ; ১৯৭৩ - জীপ এবং সাদা অ্যামবাসাডর গাড়ি কেনা হয় ; ১৯৭৪ - রোড রোলার এবং জঞ্জাল ফেলার ট্রাক কেনা হয় ; একই বছরে পৌরভবনে ৯ লাইনের টেলিফোন পি বি এক্স চালু হয় ; ১৯৭৭ - ৮১ পৌরসভা পরিচালনার ভার আবার সরকারী পরিচালকদের হাতে চলে যায়। ১৯৮১ - গণতান্ত্রিক নাগরিক সমিতি পৌরবোর্ড গঠন করে পৌরপতি নির্বাচিত হন এই পৌরসভারই প্রাক্তন কর্মী সুধাংশু রায়। ১৯৮২ - পৌরসভার নিজস্ব ইঁটভাটা চালু হয় ; ১৯৮৩ - ট্রেঞ্চিং গ্রাউন্ডে জৈব সার এবং সব্জী বাগান প্রকল্প , একই বছরে আসানসোল-দুর্গাপুর ডেভেলপমেন্ট অথরিটির সাহায্যে বি সি রোডের দ্বিমুখীকরণ হয় ; ১৯৮৪ - প্রান্তিক বাজার ; ১৯৮৫ - শহরে শিশুদের জন চারটি পার্ক তৈরী হয়, নর্দমা সংস্কারের উদ্যোগ ; ১৯৮৬ - গৃহহীনদের জন্য শহরে ১৯০ টি গৃহনির্মাণ, পৌর আয় বাড়াতে বাণিজ্য কমপ্লেক্স শুরু, বাস টার্মিনাসের জন্য জমি (তিনকোনিয়া) প্রদান। ১৯৮৭ - হকার্স মার্কেট তৈরী, ১৯৮৮ - শহর থেকে খাটা পায়খানা উচ্ছেদ শুরু, ২৫ থেকে ২৯ টি ওয়ার্ড বিভাজন ; ১৯৮৯ - কর্মরতা মহিলাদের জন্য হোস্টেল তৈরী ; ১৯৯০ - নতুন তিনটি পানীয় জল প্রকল্প, বংশ গোপাল টাউন হলের (দ্বিতল) সম্প্রসারণ ; ১৯৯৩ - ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ডে স্পন্দন কমপ্লেক্স তৈরী ; ১৯৯৪ - শহরের বিভিন্ন পথ সংস্কারে বিশেষ উদ্যোগ (কৃষ্ণসায়র প্রকল্প) ; ১৯৯৫ - নতুন একটি জলপ্রকল্পের উদ্যোগ ; ১৯৯৭ - শাঁকারিপুকুর হাউসিং ময়দানকে মেলা ময়দান তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণ ; ১৯৯৯ - শহরের বিভিন্ন পথের ধারে নর্দমা তৈরীর ব্যাপক উদ্যোগ, শহরের কবরখানাগুলি প্রাচীর দিয়ে ঘেরা হয় ; ২০০০ - হকার্স মার্কেট ভেঙে বিশাল কমপ্লেক্স তৈরীর উদ্যোগ।

একনজরে বর্ধমান পৌরসভা

আয়তন	-	২৩.০৪ বর্গ কিলোমিটার
জনসংখ্যা	-	২,৫৭,৬০৫ (১৯৯১) ২,৮৫,৮৭১ (২০০১)
ওয়ার্ড	-	৩৫ টি
পাকা পথ	-	১৭৬ কি.মি. (পূর্ত দপ্তরের ৩৫ কিমি.)
কাঁচা পথ	-	৪৫ কিমি.
দৈনিক জল সরবরাহ	-	৬৫ লক্ষ গ্যালন
জল প্রকল্প	-	লাকুড্ডি ১ টি

গভীর নলকূপ	-	২৬ টি
জলের ট্যাঙ্ক	-	৬ টি
পাকা নর্দমা	-	৩৫ কি.মি.
কাঁচা নর্দমা	-	১৬ কি.মি.
পৌর পরিচালনায় প্রাথমিক স্কুল	-	১১ টি
পার্ক	-	৬ টি
অতিথি শালা	-	১ টি
সুপার মার্কেট	-	৮ টি
বাজার	-	২ টি
অডিটোরিয়াম	-	১ টি
পে-ইউজ ল্যাট্রিন	-	১ টি
ইঁটভাটা	-	১ টি
তরকারী বাগান	-	১ টি
বাস টার্মিনাস	-	১ টি
শ্মশান	-	১ টি
কর্মরতা মহিলা হোস্টেল	-	১ টি
কবর খানা	-	২ টি

বর্ধমান পৌরসভায় ওয়ার্ডের ক্রম অনুসারে ১৯৯৮ নির্বাচনে বিজয়ী পৌর সদস্যদের তালিকাঃ ১. শ্রীমতি মঞ্জু নন্দী, ২. জনার্দন রায়, ৩. শ্রীমতি লবানী ফুলমালি, ৪. সুরেন্দ্রনাথ মণ্ডল (পৌরপতি), ৫. মেহবুবা খাতুন, ৬. জনাব আইনুল হক (উপ-পৌরপতি), ৭. কৃষ্ণকান্ত সাহা, ৮. অশোক গাঙ্গুলি, ৯. সাধন ওঁরাও, ১০. দিপালী মুখার্জী, ১১. গৌতম সরকার, ১২. অশোক কুমার দত্ত, ১৩. শ্রীমতি রেণুবালা মণ্ডল, ১৪. চঞ্চলা পাল, ১৫. সুশান্ত কুমার মৈত্র, ১৬. রবিশঙ্কর পাল, ১৭. তরুণ খাঁ, ১৮. শ্রীমতী ইভা বিশ্বাস, ১৯. সৈয়দ মহঃ সালে, ২০. অপূর্ব দাস, ২১. শ্রীমতী মিঠু সিংহ, ২২. তড়িৎ ঘোষ, ২৩. মদন কর্মকার, ২৪. মুনমুন হালদার, ২৫. সুখময় রায়, ২৬. হারুনুর রসিদ, ২৭. কৃষ্ণকলি ব্যানার্জী, ২৮. বদ্রী চৌধুরী, ২৯. সঞ্জিত রায়, ৩০. তনুশ্রী সাহা, ৩১. অঞ্জন মুখার্জী, ৩২. সমীর রায়, ৩৩. মৌসুমী হালদার, ৩৪. প্রণব চ্যাটার্জী এবং ৩৫. দিলীপ কুমার দুবে।

বর্ধমান পৌরসভার আয়-ব্যয় ঃ এক নজরে ঃ

বছর	আয়	ব্যয়
১৯৯৫–৯৬	৭,২২,৮৯,০০০	৬,২৮,১১,০০০
১৯৯৬–৯৭	১১,৪৪,৮৬,০০০	৮,৫৭,৮০,০০০
১৯৯৭–৯৮	১১,৯৭,০৯,০০০	৮,৯০,০৪,০০০

' হ্যাণ্ডবুক, বর্ধমান ১৯৯৮

কালনা পৌর অঞ্চল

"ক্ষান্ত বুড়ির দিদি শাশুড়ির তিন বোন থাকে কালনায়
শাড়িগুলো তারা উনুনে বিছায়, হাঁড়িগুলো রাখে আলনায়।"

কালনার উল্লেখ সম্বলিত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত লিমেরিক দিয়ে নিবন্ধ শুরু করছি। কালনা পৌর এলাকার দ্রাঘিমাংশ ৮৮°১৫´ পূর্ব এবং অক্ষাংশ ২৩°১২´২৫´´ উত্তর। হাওড়া থেকে বার হারোয়া লুপ লাইনে অম্বিকা কালনা রেল স্টেশনের দূরত্ব ৮১ কিলোমিটার। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের আগে এই রেল স্টেশনের নাম ছিল কালনা কোর্ট। পরে ধারাবাহিক আন্দোলনের পর এই নাম পরিবর্তন হয়।

প্রাচীন কাল থেকেই কালনা জন অধ্যুষিত বাসভূমি হিসাবে ছিল পরিচিত নাম। গৌতম বুদ্ধ জন্মের আগে শিবিরাষ্ট্র, পরে গঙ্গারাষ্ট্র , গুপ্ত, মৌর্য প্রভৃতি শাসন আমলে এবং পাল-সেন ও সুলতানী রাজত্বে এই কালনার যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। লক্ষ্মণ সেনের আমলে সপ্তগ্রামের শাসন কর্তা মুরারী শমা ছিলেন হিন্দু আমলে কালনার শাসন কর্তা। প্রাচীনকালে এই এলাকা অম্বিকা, আম্বুয়া, বিজয়পুর, আম্বোনা প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে CULNA নামটি প্রাধান্য পায়। ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত রেনেলের মানচিত্রে CULNA, AMBONA প্রভৃতি জনবসতিপূর্ণ এলাকার উল্লেখ আছে।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ১ এপ্রিল বর্ধমান মহারাজ মহতাব চন্দ, পণ্ডিত তর্ক বাচস্পতি এবং মহকুমা শাসক ডঃ গোবিন্দকৃষ্ণ দেব বাহাদুর সহ অসংখ্য সমাজসেবী মানুষের উদ্যোগে কালনা পৌরসভার জন্ম হয়। প্রথম পৌরসভায় প্রশাসকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন মহকুমা শাসক ডঃ গোবিন্দ কৃষ্ণ দেব বাহাদুর। প্রতিষ্ঠা লগ্নে এই পৌরসভায় পনের জন কমিশনারের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশী ছিলেন মনোনীত (নমিনেটেড) সদস্য। ব্রাঞ্চ চার্চ অফ্ স্কটল্যাণ্ড মিশনের প্রতিনিধি, স্থানীয় ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিনিধি, বর্ধমান রাজ সুপারিনটেনডেন্ট প্রমুখ মনোনীত সদস্যদের নিয়ে কালনা মহকুমা শাসকের পৌরোহিত্যে কালনা পৌরসভা গঠিত হয়েছিল। প্রতিষ্ঠার সময় কালনা পৌরসভার বাৎসরিক আয় ছিল ১১৮৫ পাউণ্ড। সেই সময় কলকাতা থেকে কালনার রেল যোগাযোগ ছিল না। প্রয়োজনে ব্যবসায়ী ও কালনার অধিবাসীদের স্টিমারে কলকাতা যেতে হত। আওয়ার মিলার অ্যান্ড কোম্পানির স্টিমার প্রায় প্রতিদিন ছাড়ত কালনার স্টিমার ঘাট থেকে। এই স্টিমার ঘাট ছিল পাথুরিয়া মহল এবং মহিষমর্দিনী তলার মাঝে।

১৮৭১ সালের জনগণনা অনুসারে কালনা পৌরসভার জনসংখ্যা ছিল ২৭,৩৩৩। প্রায় ত্রিশ বছর পর ১৯০১ সালের রিপোর্টে দেখা যায়, জনসংখ্যা কমে মাত্র ৮১২১ হয়ে গেছে। একাধারে ম্যালেরিয়া এবং "বর্ধমান ফিবার"নামক সংক্রামক রোগে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কালনা মহাশ্মশানে পরিণত হয়েছিল। জনবসতি হ্রাস পাওয়ায় একদা সমৃদ্ধশালী শাসপুর, নৃপপল্লী প্রভৃতি অঞ্চল ঘন জঙ্গলে পূর্ণ হয়ে যায়। কালনার সমৃদ্ধশালী

বহু এলাকা ধ্বংস হয়ে যায় বর্ধমান জ্বরের প্রকোপে।

কালনার আগুরি ঃ আমাদের এই বাংলায় একটা প্রবাদ চালু ছিল,'' আগুরি বাগুরি ধান - এই তিন নিয়ে বর্ধমান''। সুলভে সুফলনশীল জমি পাওয়া, ভাগীরথীর কল্যাণে সুগম নৌ-বাণিজ্য এবং নৌ-সেনা বৃত্তির কারণে কালনা মহকুমার তিনটি থানা এলাকায় আগুরি বা উগ্র ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্য দেখা দিয়েছিল। কালনার আগুরিরা মূলতঃ সূত এবং জানা হিসাবে কুলীন ও মৌলিক শ্রেণীভুক্ত। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের জনগণনা অনুসারে অবিভক্ত বঙ্গে ৬৯,৭৯২ জন আগুরির মধ্যে বর্ধমান জেলার আগুরি ছিলেন ৫৯,৮৮৭ জন।

বৃটিশ আমলে যেমন দার্জিলিঙ ছিল বাংলার গ্রীষ্মকালীন রাজধানী, তেমনই বর্ধমানের রাজাদের অবসরকালীন রাজধানী ছিল কালনা। পঞ্চদশ শতাব্দীর আগেও মোগল আমলে কালনার যথেষ্ট প্রাধান্য ছিল। বহুকাল পর্যন্ত বর্ধমান জেলার প্রধান নদী বন্দর ছিল এই কালনা। ভাগীরথীর বুকে ক্রমাগত পলি পড়ায় নদী মজে যায়। একদা সমৃদ্ধশালী কালনার ঐতিহ্য ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যায় নদীপথ সংস্কার না হওয়ায়। ষোড়শ শতাব্দীতে মোগল আমলে মজলিস আর বদর সাহেব নামে দুই ভাই কালনায় এসেছিলেন।

ব্যবহার এবং চরিত্রগুণে কালনার জনমনে তাঁদের বিশেষ প্রভাব পড়েছিল। এন্তেকালের পর তাঁরা কালনার জনমানসে পীরের সম্মান লাভ করেন। সেই আমলে ঈদের সময় মহা ধুমধাম হত কালনায়। বহু দূরদূরান্ত থেকে সম্ভ্রান্ত মুসলমানরা সপরিবারে পাল্কি নিয়ে আসতেন কালনায়। পরে কালনা বৈষ্ণব সংস্কৃতিরও মুখ্য কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দ কালনায় এসেছিলেন। শোনা যায়, গৌরী দাস পণ্ডিতের শ্রীপাটে তেঁতুলগাছ তলায় বসে শ্রীচৈতন্য নাম গান করেছিলেন। কালনার শ্রীপাটে সেই ঐতিহাসিক তেঁতুল গাছ মাঝে আগুন লেগে মৃত প্রায় হলেও পরে আবার সেটি সজীব হয়ে উঠেছিল।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনজন মনোনীত সদস্য সহ মোট পনের জন সদস্য নিয়ে মাত্র দুই বর্গ মাইল এলাকা নিয়ে কালনা পৌরসভা গঠিত হয়েছিল। প্রতিষ্ঠার সময় এই পৌর এলাকায় জনসংখ্যা ছিল ৮৬০৩ জন। করদাতার সংখ্যা ছিল ২৬৯৪ জন। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, জন্মলগ্ন থেকে ১৮৯০ পর্যন্ত এখানের পৌর প্রতিনিধি কিংবা আয় ব্যয়ের কোনও নথি পাওয়া যায়নি। ১৮৯১ থেকে কালনার পৌর প্রতিনিধিদের নাম নথিভুক্ত আছে পৌরসভার রেকর্ডে।

কালনা পৌরসভার জন্মলগ্ন থেকে এস ডি ও বা মহকুমা শাসক পৌর প্রশাসকের দায়িত্বে ছিলেন। পরে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা এই পদে আসীন হন। ১৮৯০-৯১ কালনা পৌরসভার চেয়ারম্যান পদে চন্দ্রনাথ রায়ের নাম পাওয়া গেছে। তাঁর মৃত্যুর পর সূর্যনারায়ণ সর্বাধিকারী পৌরপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সেই সময় ফ্রী চার্চ অফ্ স্কটল্যান্ড মিশনের প্রতিনিধি সেখ ওসমান গণি, ব্রাহ্ম সমাজের অঘোর নাথ চট্টোপাধ্যায়, হিন্দু পণ্ডিতদের

প্রতিনিধি তারাধন ভট্টাচার্য এবং বর্ধমান রাজের প্রতিনিধি ছিলেন রাজ সুপারিনটেনডেন্ট মাধবলাল মেহেরা।

১৮৯৭ - ১৯০৯ পর পর চারটি পৌর বোর্ডে প্রধানের দায়িত্বে ছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর প্রবল প্রতিদ্বন্দি বিধুভূষণ চট্টোপাধ্যায় ১৮৯৭ এবং ১৯০৩ এই দুই পর্বে সহকারী প্রধানের দায়িত্বে থাকার পর ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে অঘোরনাথকে পরাজিত করে পৌর প্রধানের পদ লাভ করেন। কিন্তু মাত্র তিন বছরেই সেই বোর্ড ভেঙে যায়। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় পুনরায় পৌরপ্রধানের পদে ফিরে আসেন। ১৯১৫ - ১৮ যতীন্দ্রনাথ বসু মল্লিক, যোগেশ চন্দ্র মিত্র(১৯১৮), রামচন্দ্র চক্রবর্তী (১৯২১ পর্যন্ত), শান্তশীল দত্ত (১৯২১ - ২৫), বিধুভূষণ চট্টোপাধ্যায় (১৯২৫ - ২৯), বীরেন্দ্র কুমার মল্লিক (১৯৩৪ পর্যন্ত), মথুরা মোহন গাঙ্গুলি(১৯৩৮ পর্যন্ত), বিনোদ বিহারী মুখার্জী(১৯৩৯ পর্যন্ত), তারাপদ ঠাকুর(১৯৩৯ - ৪৭), দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৪৭ - ৫১), সুধাংশুভূষণ চট্টোপাধ্যায় (১৯৫১ - ৫৯), প্রকৃতিভূষণ দত্ত (১৯৫৯ - ৬৭), তড়িৎভূষণ সাঁবুই (১৯৬৭ - ৭১), তারাপদ ঠাকুর (১৯৭২ - ৭৭), কৃষ্ণকুমার ভদ্র (১৯৮২ - ৮৬), চিত্তরঞ্জন রায় (১৯৮৬ - ২০০০)। ডাঃ গৌরাঙ্গ গোস্বামী (২০০০ থেকে) পৌর প্রধানের দায়ত্ব পালন করেছেন।

কালনা পৌরসভা ঃ একনজরে

রেলস্টেশন	ঃ	অম্বিকা কালনা
আয়তন	ঃ	৬.৪৭ বর্গ কিলোমিটার
জনসংখ্যা	ঃ	১৯৯১ জনগণনায় ৪৭,২২৯
		২০০১ - ৫২,১৭৬
মোট হোল্ডিং	ঃ	এগারো হাজার
ওয়ার্ড সংখ্যা	ঃ	১৮ টি
মৌজা	ঃ	৬ টি
প্রথম পৌর প্রশাসক	ঃ	ডঃ গোবিন্দ কৃষ্ণ দেব বাহাদুর(১৮৬৯)
মোট পৌর কর্মী	ঃ	১৫২ জন
ফেরী ঘাট	ঃ	১ টি
শিশু উদ্যান	ঃ	৩ টি
সাংস্কৃতিক মঞ্চ (পুরশ্রী)	ঃ	১ টি
স্টেডিয়াম	ঃ	১ টি
সুপার মার্কেট	ঃ	১ টি
শবদাহ কেন্দ্র	ঃ	১ টি
যাত্রী নিবাস (পান্থনীড়)	ঃ	১ টি

কালনা পৌরসভার আয়-ব্যয় ঃ এক নজরে ঃ

বছর	আয়	ব্যয়
১৯৯৫–৯৬	১০,৯৩,৯০০০	১৪,০৪,৩০০০
১৯৯৬–৯৭	১৮,৭৭,৫০০০	১১,২৪,১০০০
১৯৯৭–৯৮	২৭,৮৮,৮০০০	২০,৪০,৬০০০

সূত্র ডিস্ট্রিক্ট স্ট্যাটিসটিক্যাল হ্যাণ্ডবুক, বর্ধমান ১৯৯৮

প্রথম নির্বাচন ঃ ১৮৮৪ - ৮৫ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম কালনা পৌরসভায় তিনটি ওয়ার্ড থেকে দশ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। সেই সময় কালনা পৌরসভার জনসংখ্যা ছিল ৯৫৯৪। করদাতার সংখ্যা - ২২৫০। প্রথম নির্বাচনে ৬৫৩ জন ভোটারের মধ্যে ভোট দিয়েছিলেন মাত্র ১৭১ জন। একই সময়ে কাটোয়া পৌরসভার নির্বাচনে আরও কম সংখ্যক ভোটার ভোট দিয়েছিলেন। কাটোয়ায় ৩৬০ জন ভোটারের মধ্যে ভোট দেন মাত্র ৫১ জন।

১৮২৫ খৃষ্টাব্দে মিশনারী রেভঃ কোরী অবং রেভঃ ডিয়ার সাহেব প্রথম কালনা শহরে চারটি বাংলা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। পরবর্তীকালে এখানে তিনটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে রেভঃ আলেকজান্দার কালনা শহরে প্রথম ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। Folk Tales of Bengal গ্রন্থ প্রণেতা রেভঃ লাল বিহারী দে এই বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে কালনায় বর্ধমান রাজার আনুকুল্যে রাজস্কুল স্থাপিত হয়।

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে কালনা শহরে মহকুমা দপ্তর চালু হয়। সেই সময় মন্তেশ্বর, ভাতুরিয়া এবং কালনা এই তিনটি থানা নিয়ে কালনা মহকুমা গঠিত হয়েছিল। ভাতুরিয়ার পরিবর্তে পরে পূর্বস্থলী থানা স্থাপিত হয়। কালনা মহকুমার শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষায় ১০৬ জন পুলিশ এবং ২২৬০ জন চৌকিদার নিযুক্ত হয়েছিল। সেই আমলে নদীপথে অপরাধের (জলদস্যু) সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও শহর বা গ্রামাঞ্চলে অপরাধ ছিল নগন্য। মাত্র বারো জন কয়েদি থাকার উপযুক্ত একটি কারাগার তৈরী হয়েছিল সেই আমলে।

১৯৫২ খৃষ্টাব্দে কালনার পথে কেরোসিন আলোর পরিবর্তে বৈদ্যুতিক আলো জ্বলে। ১৯৮৭ থেকে বাড়ি বাড়ি পানীয় জল প্রকল্প শুরু হয়। আগে এখানে মাত্র তিনটি জলের পাম্প ছিল, বর্তমানে পাম্প হাউসের সংখ্যা নয়টি। কালনা পৌরসভা ট্যুরিস্টদের জন্য পান্থ নীড় নামে একটা ট্যুরিস্ট লজ তৈরী করেছে। কালনার বড় মিত্র পাড়া এলাকায় (ফোন নং - 03454 - 55532) এই পান্থনীড়ের দূরত্ব বাস টার্মিনাস থেকে মাত্র আধ কিলোমিটার। কালনার খেয়া ঘাট থেকেও দূরত্ব এক কিলোমিটার।

পান্থনীড়ে পনেরটি ঘর সহ ২৪ শয্যা যুক্ত একটা পৃথক ডরমেটরি আছে। 'এটাচ বাথ ডবল বেড' ঘরের ভাড়া ২৪ ঘন্টার জন্য পঞ্চাশ টাকা। "সিঙ্গল বেড এটাচ বাথ" ঘরের ভাড়া ত্রিশ টাকা মাত্র। ডবল বেডের ৭ টি এবং সিঙ্গল বেডের ৮ টি ঘর আছে পান্থনীড়ে।

ডরমেটরিতে প্রতি শয্যার ভাড়া ২৪ ঘন্টার জন্য পঁচিশ টাকা। কালনা পৌরসভার ফোন নম্বর - 03454 - 55004।

কালনা পৌরসভার সাথে হাত মিলিয়ে কালনা চেম্বার অফ্ কমার্স এই মহকুমা সহ পৌর এলাকাকে পর্যটনের উপযোগী করে গড়ে তুলতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। কালনা বাস টার্মিনাসেই রয়েছে চেম্বার অফ্ কমার্সের দপ্তর। কালনার রবীন্দ্রসদনে প্রতি শনিবার তাঁত কাপড়ের হাট বসে। জামদানি, মসলিন, টাঙ্গাইল প্রভৃতি শাড়ীর মেলা চলে সারাদিন। কালনা পৌরসভার পান্থনীড়, জেলা পরিষদের বাংলো, পূর্ত সড়ক দপ্তরের গেস্ট হাউস কিংবা কোনও হোটেলে থাকার জায়গা বুক করে এই কালনাকে কেন্দ্র করে শহর ছাড়াও দুই তিন দিনে পারিপার্শ্বিক অনেক কিছু দেখে নেওয়া যায়। ভাগীরথীর বুকে সবুজ দ্বীপ, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর, মায়াপুর, ব্যাণ্ডেল, বাঁশবেড়িয়া প্রভৃতি দেখে মন্দির মসজিদ, ক্যাথলিক চার্চ সহ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মানুষ জনের কাছেও অতি পবিত্র তীর্থ স্থান এই কালনা কর্মব্যস্ত জীবনের ফাঁকে নতুন এক আনন্দের স্বাদ এনে দিতে পারে।

কাটোয়া পৌর অঞ্চল

অজয় এবং ভাগীরথীর সঙ্গম স্থল কাটোয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরু থেকেই নানা বিষয়ে গুরুত্ব লাভ করেছিল। প্রাচীনকালে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কাটোয়ার গঙ্গা তীরেই কেশব ভারতীর কাছে দীক্ষা (সন্ন্যাস) গ্রহণ করেছিলেন। মেগাস্থিনিস কাটোয়ায় এসেছিলেন কিনা তা জানা না গেলেও তাঁর রচিত গ্রন্থে খৃষ্টপূর্ব ৩০২ - ২৯৮ সালে অ্যামিসটিস (অজয়) ও ভাগীরথীর সঙ্গম স্থলে ''আরিয়ান কাটাদুপা''র উল্লেখ আছে। পরিব্রাজক ফা হিয়েন পঞ্চম শতকে এই এলাকায় কাটুয়া নগরীর উল্লেখ করেছিলেন। সপ্তম শতকে হিউ-এন-সাঙ-এর বর্ণনায় দৈর্ঘ্য নয় মাইল এবং প্রস্থ আড়াই মাইল এলাকা বিশিষ্ট কাটোয়ার বর্ণনা পাওয়া যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্গীদের হামলার সময় এই কাটোয়াই ছিল মুর্শিদাবাদের প্রবেশ দ্বার। ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে মারাঠা দস্যু রঘুজী ভোঁসলে চল্লিশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে বঙ্গদেশ আক্রমণ করেছিলেন। তখন বাংলার নবাব আলীবর্দি খাঁ। বর্গী দস্যুদের আক্রমণে পরাজিত হয়ে তিনি কাটোয়ার শাঁখাই এলাকায় একটি মাটির দুর্গে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে আলীবর্দি খাঁ মারাঠা সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতকে সরাসরি যুদ্ধে পরাজিত করেন। সেই সময় বর্গীরা সরে গেলেও তাদের অত্যাচার বন্ধ হয়নি।

১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধের আগে লর্ড ক্লাইভ কলকাতা থেকে পশ্চিমে ভাগীরথী হয়ে এই কাটোয়ায় এসে নবাবের সাথে যুদ্ধে তাঁকে পরাজিত করে শাঁখাই দুর্গের দখল নিয়েছিলেন। এই দুর্গ বিজয়ের পর কাটোয়ায় (শাঁখাই)মাত্র কয়েক ঘন্টার অবস্থানেই লর্ড ক্লাইভ পলাশী যুদ্ধের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। কাটোয়া শহরে শিবির স্থাপন করেই বৃটিশ সেনাবাহিনী

লর্ড ক্লাইভের নেতৃত্বে ১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে নবাব সিরাজদৌল্লার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। মীর মদন, মোহনলাল প্রভৃতি অসংখ্য বাঙালী বীর সেই সময় দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। কাটোয়ার আম্রকাননে সেই ঐতিহাসিক যুদ্ধে বাংলা তার স্বাধীনতা হারায়। পরাধীন ভারতের শুরু এই কাটোয়া থেকেই। শাঁখাই দুর্গ অজয়ের বানে ভেসে গেছে। ভগ্নাবশেষও অবশিষ্ট নেই। এই এলাকায় শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের মন্দির তৈরী হয়েছে। কাটোয়া থেকে অজয় পার হয়ে সেই মন্দিরে যাওয়া যায়। কাটোয়ায় (১৭০২) মুর্শিদকুলি খাঁ এবং জাফর আলি খাঁ প্রতিষ্ঠিত "শাহ্ আলমের দরগা" মসজিদ এখনও আছে। শাঁখাই গ্রামেই ইংরাজ আমলে বিশাল নীলকুঠি স্থাপিত হয়েছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে কাটোয়ায় রেল পথ ছিল না। ব্যবসা বাণিজ্য, মাল পরিবহন সব কিছুই চলত নদীপথে। বৃটিশ কোম্পানি কলকাতা থেকে কালনা - কাটোয়ায় স্টিমার চালাত নদী পথে। ভাগীরথীতে ক্রমাগত পলি জমায় ব্যবসা বাণিজ্যের লক্ষ্যেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৮৬০ সাল নাগাদ এখানে রেলপথ বসায়। ১৮৫৯ সালের ১২ সেপ্টেম্বর কাটোয়া ইউনিয়ন (পৌরসভা) ঘোষিত হয়। যে সব গ্রাম নিয়ে এই ইউনিয়ন গঠিত হয়েছিল, সেগুলি যথাক্রমে আতুহাট, দেওয়ান গঞ্জ, দাঁইহাট, বহুসিংহ, বাগাটিকুরি এবং পাতাইহাট। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে প্রায় দশ বছর পর কাটোয়া এবং দাঁইহাট পৃথক পৌরসভার স্বীকৃতি লাভ করে। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে "বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট" নামে পূর্ণাঙ্গ আইন চালু হয়। এই আইনের সাহায্যেই পৌরসভায় নির্বাচন গ্রহণের নিয়ম চালু হয়। সেই সময় মহিলা কিংবা সকল নাগরিকদের ভোটাধিকার ছিল না। ভোট কেন্দ্রে হাত তুলে প্রকাশ্যে ভোট দিতে হত। ১৮৬৯ সালে মহকুমা শাসক (প্রশাসকের দায়িত্ব), তিনজন মনোনীত সদস্য সহ মোট ১২ জনকে নিয়ে কাটোয়া পৌর বোর্ড গঠিত হয়। ১৮৮৫ সালে রাণীগঞ্জ, কালনা ও বর্ধমানের সাথেই কাটোয়ায় প্রথম পৌর নির্বাচন হয়। প্রথম নির্বাচনের চিত্র ছিল এই রকম। কাটোয়া পৌরসভা ঃ জনসংখ্যা - ৬৮২০, করদাতা - ২৩৩৭, ভোটার - ৩৬০, প্রথম পৌর নির্বাচনে প্রথম ভোট দেন মাত্র ৫১ জন ভোটার। অর্থাৎ ভোট দিয়েছিলেন মাত্র ১৪ শতাংশ ভোটার।

ঐ নির্বাচনের আগে পৌরসভাকে ইউনিয়ন বলা হত। ইউনিয়নে ছিল চৌকিদার। (পরে ঐ পদ অবলুপ্ত হয়। ১৯৬৮ সালের ১৯ ডিসেম্বর পৌর প্রশাসকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এম জি চক্রবর্তী। ১৯৭৬ সালের ৬ মার্চ জ্যোর্তিময় দত্ত এবং পরে সুখবিলাস শর্মা কাটোয়া পৌরসভায় প্রশাসকের দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৬৫ সালে এই পৌরসভায় ছিল ১২ টি ওয়ার্ড। ১৯৮৫ সালে নির্বাচনের সময়েও ১২ টি ওয়ার্ডে নির্বাচন হয়। ১৯৯০ সালে ১৪ এবং ১৯৯৫ সালে ১৯ টি ওয়ার্ড হয় কাটোয়া পৌরসভায়। ২০০০ নির্বাচনেও ১৯টি ওয়ার্ড আছে।

১৮৬৯ সালে অবিভক্ত বাংলায় ১০ টি পৌরসভার মধ্যে অন্যতম ছিল কাটোয়া। প্রাক্তন

পৌর প্রধানরা যথাক্রমে স্বাধীনতা সংগ্রামী ডাঃ গুণেন্দ্রনাথ মুখার্জী, সত্যেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, মনীন্দ্রনাথ চন্দ, গিরীজাভূষণ চ্যাটার্জী, অশোক কুমার ব্যানার্জী, সুধাংশু শেখর সরকার, সত্যব্রত ব্যানার্জী, শশাঙ্ক শেখর চ্যাটার্জী এবং রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

কাটোয়া পৌরসভার আয় ব্যয় ঃ

বছর	আয়	ব্যয়
১৯৯৫ - ৯৬	২৩,১৩২,০০০	২১,৪৭২,০০০
১৯৯৬ - ৯৭	২৫,৮৬৫,০০০	২২,৪৬৮,০০০
১৯৯৭ - ৯৮	৪৬,২১১,০০০	৪৬,২১১,০০০

সূত্র ঃ ডিস্ট্রিক্ট স্ট্যাটিসটিক্যাল হ্যাণ্ড বুক, বর্ধমান, ১৯৯৮

২৮ মে ২০০০ তারিখে কাটোয়া পৌরসভার নির্বাচন হয়েছে। ওয়ার্ডের ক্রম অনুসারে পৌর সদস্যদের তালিকা ঃ ১. শ্রীমতি বন্দনা বসু, ২.শ্রীমতি নন্দিতা দত্ত, ৩. শ্রীমতি মঞ্জু রানী ভক্ত, ৪. শ্রী দেবকুমার বৈরাগ্য, ৫. শ্রীমতি শীলা রক্ষিত, ৬. শ্রী মানস কান্তি বিশ্বাস, ৭.শ্রী ধীরেন্দ্র নাথ হালদার, ৮. শ্রীমতি ইউসুফা খাতুন, ৯. খোন্দেকার গোলাম মুর্শেদ, ১০. শ্রী জিতেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী, ১১. শ্রীমতি ফনীন্দ্র নাথ বাগচী, ১৪. শ্রী রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী, ১৫. শ্রীমতি কৃষ্ণা চ্যাটার্জী, ১৬. শ্রী কিংশুক বাগচী, ১৭. শ্রীমতি সুজাতা দাস, ১৮. শ্রী অজয় চট্টোপাধ্যায়, ১৯. শ্রী অমর রাম।

১৪ নং ওয়ার্ড থেকে জয়ী রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় পৌর প্রধান এবং ১৯ নং ওয়ার্ডের সদস্য অমর রাম উপ-পৌরপ্রধান নির্বাচিত হয়েছেন। স্বাধীনতার আগে কাটোয়া পৌরসভার দপ্তর ছিল কাছারী রোডে বর্তমান আই এম এ ভবনের পশ্চিমে ভাঙা বাড়িতে। পৌরসভার দপ্তর চালু হওয়ার আগে এই বাড়িতেই ছিল CUTWA স্কুল।

এক নজরে কাটোয়া পৌরসভা ঃ

আয়তন	ঃ	৭.৯৩ বর্গ কি.মি.
জনসংখ্যা ১৯৮১	ঃ	৩৯,৯১৮
১৯৯১	ঃ	৫৫,৫৩৫
২০০১	ঃ	৭১,৫৭৩
বর্তমানে দারিদ্রসীমার নীচে	ঃ	৩১,২৩৫
বস্তি বাসীর সংখ্যা	ঃ	২৭, ০৬৫
সাক্ষর জনসংখ্যা	ঃ	৫২,৮৮০
সাক্ষরতার হার ১৯৯১	ঃ	৭৫.১৮%
২০০১	ঃ	৭৩.৮৮%
২০০১ জনগণনায় মোট জনসংখ্যা	ঃ	৭১,৫৭৩
পুরুষ	ঃ	৩৬,৪৯৭
মহিলা	ঃ	৩৫,০৭৬
৬ বছরের নীচে	ঃ	৭,২৮৯

দাঁইহাট পৌর অঞ্চল

১৭৪১ খৃষ্টাব্দের ২৭ শে সেপ্টেম্বর দাঁইহাটে বর্গী দস্যু ভাস্কর পণ্ডিতের সাথে আলিবর্দী খাঁ'র যুদ্ধ হয়েছিল। সেই সময় যুদ্ধে জয়লাভের বাসনায় ভাস্কর পণ্ডিত এখানে দুর্গাপুজো করেছিলেন। নবাবের সৈন্যদের সাঁড়াশী আক্রমণে পরাজয় বরণ করে অবশেষে ভাগীরথীর বুকে দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জন দিয়ে পালাতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি।

দাঁইহাটের পশ্চিমে "বেড়া" এলাকায় বিশাল পাথরের একটি স্তম্ভ আছে। এর নাম হনুমান লাঠি। ময়ূরভঞ্জের রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ। বহুদিন ধরে দাঁইহাটের রাস উৎসব বাংলায় খ্যাতিলাভ করেছে। বৈষ্ণব ও শাক্তদের মহা মিলনের উৎসব এই রাস। উৎসব উপলক্ষ্যে এখানে হাজার হাজার ভক্তের সমাগম হয়।

উত্তরে গঙ্গা-ভাগীরথী প্রবাহিত। দক্ষিণে ব্যাণ্ডেল কাটোয়া রেলপথ। এই পথেই ছোট্ট রেল স্টেশন দাঁইহাট। উৎকৃষ্ট তসরের কাপড়,পিতল কাঁসার বাসনের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল দাঁইহাট। বর্ধমান মহারাজের আদি পুরুষ আবুরাম রায় থেকে শুরু করে জগতরাম রায়ের চিতা ভস্ম দাঁইহাটে আছে।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ৫ মার্চ দাঁইহাট শহর পৌরসভার স্বীকৃতি লাভ করে। এর আগে দাঁইহাট ছিল কাটোয়া ইউনিয়নের অধীন। ১৮৮৫ সালে বর্ধমান, কালনা, কাটোয়া প্রভৃতি পৌরসভার সাথেই দাঁইহাট পৌরসভার প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ৩ টি ওয়ার্ডে ৮ জন পৌর প্রতিনিধি নির্বাচিত হন।

দাঁইহাটের বিভিন্ন নাম দণ্ডিহাট, দাঞ্চীহাট, ডাংহাট, ধান্যহাট এবং দাঁইহাটা। পৌরসভা তৈরীর সময় তিনটি ওয়ার্ডের এলাকা ছিল ১০.৪ বর্গ কি.মি.। একশ ছত্রিশ বছর বয়সে এই পৌরসভার ওয়ার্ড সংখ্যা ৩ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৪ টি হলেও সেই অনুপাতে আয়তন বৃদ্ধি হয়নি। পৌর এলাকার আয়তন মাত্র ১১.৪২ বর্গ কি.মি.। ১৯৯১ সালে জনসংখ্যা ছিল ২০,৩৪৯। দশ বছর পরে জনসংখ্যা মাত্র দশ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২২,৫৯৩ জন। এর অর্ধেক (৫০ শতাংশ) তপশীলি অনুন্নত শ্রেণীর।

দাঁইহাট পৌরসভার আয় ব্যয়ঃ

বছর	আয়	ব্যয়
১৯৯৫ - ৯৬	৫৮,৯৬,০০০	৪৬,৭৩,০০০
১৯৯৬ - ৯৭	৬৫,৫৫,০০০	৫৬,০৬,০০০
১৯৯৭ - ৯৮	৫২,৫৪,০০০	৪৬,১৭,০০০

সূত্র ঃ ডিস্ট্রিক্ট স্ট্যাটিসটিক্যাল হ্যাণ্ডবুক, বর্ধমান - ১৯৯৮

২৮ মে ২০০০ দাইহাট পৌরসভার নির্বাচন হয়। ওয়ার্ডের ক্রম অনুসারে নির্বাচিত সদস্যারা ঃ ১. শ্রীমতি রেণুকা সাহা, ২. সন্তোষ কুমার দাস (চেয়ারম্যান), ৩. শ্রীমতি কাজল রাণী

সাহা, ৪. অজিত ব্যানার্জী , ৫. বৈদ্যনাথ মুখার্জী (ভাইস চেয়ারম্যান), ৬. শ্রীমতি গীতা ব্যানার্জী, ৭. শ্রীমতি গৌরী মণ্ডল, ৮. সুবল ঘোষ, ৯. বিদ্যুৎ ভক্ত, ১০. রামেশ্বর সরকার, ১১. সারদা মাঝি, ১২. কালিদাস রায়, ১৩. সুব্রত রায় এবং ১৪. নিখিল চন্দ্র বালা।

এক নজরে দাঁইহাট পৌরসভা ঃ

আয়তন		ঃ	১১.৪২ বর্গ কি.মি.
জনসংখ্যা	১৯৯১	ঃ	২০,৩৪৯
	২০০১	ঃ	২২,৫৯৩
বর্তমানে দারিদ্রসীমার নীচে		ঃ	?
বস্তিবাসীর সংখ্যা		ঃ	?
সাক্ষর জনসংখ্যা		ঃ	১৪,৮৫৪
সাক্ষরতার হার	১৯৯১	ঃ	৭০.৬৩ শতাংশ
	২০০১	ঃ	৬৫.৭৪ শতাংশ
২০০১ জনগণনায় মোট জনসংখ্যা		ঃ	২২,৫৯৩
	পুরুষ	ঃ	১১,৪৬১
	মহিলা	ঃ	১১,১৩২
	৬ বছরের নীচে	ঃ	২,৭৮৫
দৈনিক পানীয় জল সরবরাহ		ঃ	৩ লক্ষ গ্যালন
গভীর নলকূপ		ঃ	৩ টি
পার্ক		ঃ	১ টি
বাজার		ঃ	১ টি
অডিটোরিয়াম		ঃ	১ টি
অ্যাম্বুল্যান্স		ঃ	১ টি
কর আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা		ঃ	বছরে ৪ লক্ষ টাকা
আদায়ের পরিমাণ		ঃ	৪৫ শতাংশ
জলের ট্যাঙ্ক		ঃ	৪ টি
ট্রাক্টর ট্রেলার		ঃ	২ টি
আয়ের উৎস		ঃ	কর, পুকুরের খাজনা, শবদাহ, টাউন হল, বাজার কর প্রভৃতি।

গুসকরা পৌর অঞ্চল

বৌদ্ধ যুগের গ্রাম শেতক (অপভ্রংশে সুয়াতা), অরণ্য পার্শ্বে (অপভ্রংশে বনপাস) এবং দেশক (দেয়াসা) সংলগ্ন গ্রাম ছিল গুসকরা। জনপদ কল্যানীতে গ্রামগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়। সুহ্মদেশের এই গ্রামগুলি বুদ্ধদেবের শ্রীচরণে ধন্য হয়েছিল। গুস্করার উত্তরে সেকালের নদী কোনোয়ার (কুনুর) এবং দক্ষিণে মজা নদী ঘষকুড়া (গুসকরা) বর্তমান। ''ধাইল তারাজুলি গুস্করা কুতুহলী রত্না চলিলা রঙ্গে''। ষোড়শ শতাব্দীতে কবি কঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে মগরাগামী গুস্করা নদীর উল্লেখ পাওয়া যায়। দেবী ভবানী গুস্করা নদীর সাহায্যেই কলিঙ্গরাজকে জব্দ করেন। গুস্করা নদীকে মগরায় এনে শ্রীমন্তকে বিপদে ফেলা হয়েছিল। সেকালে গুস্করা এবং কোনোয়ার নদীর মাঝে ঘষকুড়া ছিল গোপভূমির গণ্ডগ্রাম। কিরাত এবং আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা। চট্টগ্রামের বৌদ্ধ চোঙ্গদার পরিবারের পূর্বপুরুষ বহু কাল আগে রাঢ়দেশে এসে এখানে জনপদ স্থাপনে ব্রতী হয়েছিলেন। পরে বর্ধমান রাজের আমলে চোঙ্গদার বংশের লোকেরাই মহারাজের পত্তনিদার হয়ে গুসকরা শাসন করতেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁর বন্ধু মহারাজ মহতাব চন্দের কাছে বর্ধমান রাজবাটিতে প্রায়শই আসতেন। তাঁর সঙ্গী ছিলেন রাজনারায়ণ বসু। তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ একবার নির্জন স্থানের খোঁজে গুসকরায় এসেছিলেন। শ্যামাসাধক তারাপ্রসন্ন চোঙ্গদার কুনুর নদীর তীরে রমনা থান এলাকা তাঁর সাধনার জন্য নির্দিষ্ট করে দেন। গুসকরায় রমনা আমবাগান দেখে সেখানে শান্তিতে সাধনার সুযোগ পেয়েই সম্ভবতঃ মহর্ষি এই এলাকায় ''শান্তি নিকেতন'' স্থাপনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি গুসকরা সংলগ্ন এলাকায় শান্ত নির্জন এলাকার খোঁজ শুরু করেন। অবশেষে এখান থেকে ২০ কি.মি. দূরে বীরভূমের বোলপুরের কাছে ভুবন ডাঙ্গায় মহর্ষি শান্তি নিকেতনের জন্য জমি ক্রয় করেন।

১৯৭৮ সালে গুসকরা গ্রাম পঞ্চায়েতের সূচনা হয়। দশ বছর পর নোটিফায়েড এলাকা হয় গুসকরা। জন্মলগ্নে গুসকরা পৌরসভার ওয়ার্ড সংখ্যা ৯ থাকলেও বর্তমানে ১৬ টি হয়েছে।

এক নজরে গুসকরা পৌরসভা ঃ

গুসকরা গ্রাম পঞ্চায়েত	ঃ মে ১৯৭৮
গুসকরা নোটিফায়েড এরিয়া	ঃ এপ্রিল ১৯৮৮
ওয়ার্ড সংখ্যা	ঃ ১৬ টি
প্রথম পৌরসভা নির্বাচন	ঃ জুলাই ১৯৯৩
দ্বিতীয় নির্বাচন	ঃ জুলাই ১৯৯৮
আয়তন	ঃ ১৭.০৮ বর্গ কি.মি.
জনসংখ্যা (২০০১)	ঃ ৩১,৮৬৩

পুরুষ	ঃ ১৬,৪৭২
মহিলা	ঃ ১৫,৩৯১
সাক্ষর জনসংখ্যা	ঃ ২১,০১৮
সাক্ষরতার হার (১৯৯১)	ঃ ৬৫.৬১ শতাংশ
সাক্ষরতার হার (২০০১)	ঃ ৭১.৫২ শতাংশ
প্রাথমিক বিদ্যালয়	ঃ ১৫ টি
হাইস্কুল	ঃ ৩ টি
বালিকা বিদ্যালয়	ঃ ১ টি
মহাবিদ্যালয়	ঃ ১ টি

বছর	আয়	ব্যয়
১৯৯৫ - ৯৬	৯২,৫০,০০০	৬৭,৩৮,০০০
১৯৯৬ - ৯৭	৭১,৪৪,০০০	৮০,৬৯,০০০
১৯৯৭ - ৯৮	১,৬০,২০,০০০	১,২৫,০৭,০০০

সূত্র ডিস্ট্রিক্ট স্ট্যাটিসটিক্যাল হ্যাণ্ডবুক, বর্ধমান - ১৯৯৮

১৯৮৮ সালে গুসকরা নোটিফায়েড ঘোষিত হওয়ার পর মনোনীত সদস্যদের তালিকা। (১) তারকেশ্বর পাত্র (চেয়ারম্যান ১ মার্চ ১৯৮৮ থেকে ১৬ অক্টোবর ১৯৯০) ২) হরিবিলাস ভকত (চেয়ারম্যান ১৬ অক্টোবর '৯০ থেকে ২৬ জুলাই ১৯৯৩) ৩) রবীন্দ্রনাথ মাজি (ভাইস চেয়ারম্যান ১ মার্চ '৮৮ থেকে ২৬ জুলাই '৯৩) ৪) শিবদাস মণ্ডল, ৫) সুহাস গড়াই, ৬) শ্রীধর মালিক, ৭) সৈয়দ মহঃ মশীহ, ৮) সেখ মতিয়ার রহমান, ৯) পরেশনাথ বজর।

১৯৯৩ সালের জুলাই মাসে গুসকরা পৌরসভার প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় নির্বাচন হয় ১৯৮৮ সালের জুলাই মাসে। ইতিমধ্যে ওয়ার্ড সংখ্যা ৯ থেকে ১৬ টিতে বিভাজন সম্পূর্ণ হয়েছিল। ওয়ার্ডের ক্রমানুসারে ১৯৯৮ সালে নির্বাচিত পৌর সদস্যদের তালিকা ঃ

১. শ্রীমতি কুসুম বাস্কে, ২. শ্রীমতি সোহাগী বজর, ৩. শ্রী হরিবিলাস ভকত (চেয়ারম্যান), ৪. শ্রী বিনায়ক দাস, ৫. শ্রী রামনারায়ণ মাঝি, ৬. শ্রী শিবদাস মণ্ডল ৭. শ্রীমতি হীরা লোহার, ৮. শ্রীমতি যুথিকা চ্যাটার্জী, ৯. শ্রী রবীন্দ্রনাথ পাত্র, ১০. শ্রী নিত্যানন্দ চ্যাটার্জী, ১১. শ্রীমতি মল্লিকা চোঙদার, ১২. শ্রী চঞ্চল গড়াই, ১৩. শ্রী যোগেশ মাজি, ১৪. সেখ মতিয়ার রহমান, (ভাইস চেয়ারম্যান) ১৫. শ্রী বিশ্বম্ভর মণ্ডল, এবং ১৬. শ্রীমতি কাজলী পাল।

রানীগঞ্জ পৌর অঞ্চল

একশ বছর আগেও রাণীগঞ্জ ছিল ঘন বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ। খাঁটিশুলি এলাকায় ছিল কয়েক ঘর গোপ এবং মুসলমানের বাসভূমি। কুমার বাজারে ছিল কৃষিপল্লী, গোরা বাজারে ছিল বৃটিশ সেনা নিবাস। সিপাহী বিদ্রোহের সময় রেলপথে পূর্বভারতের শেষ রেলস্টেশন ছিল রানীগঞ্জ। উত্তরভারতে যাওয়ার পথে বৃটিশ সেনাবাহিনী রেলপথে এই রানীগঞ্জে অবতরণ করত।

উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ছোটনাগপুরের কালেক্টর এস জি হিট্‌লি সাহেব সর্বপ্রথম রানীগঞ্জ অঞ্চলে কয়লার সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোকপাত করেন। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অনুমতি নিয়ে গার্ণার নামে এক সহকারীর সাহায্যে হিট্‌লি সাহেব প্রথম কয়লা অনুসন্ধানের কাজ শুরু করেন রানীগঞ্জে। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলার গভর্ণরকে এই অঞ্চলে কয়লার সম্ভাবনা নিয়ে অনুসন্ধানের নির্দেশ দেয়। কোম্পানীই পরে রুপার্ট জোন্স নামে এক ইঞ্জিনীয়রকে এই অনুসন্ধানের কাজে পাঠায়।

১৮১২ খৃষ্টাব্দে রুপার্ট জোন্স বর্ধমানের রানীর কাছে এই অঞ্চলে চিনাকুড়ি এবং মুদগা এলাকায় ১৩৩ বিঘা জমির লীজ দলিল লাভ করেন। সেই সময় রানীগঞ্জ ছিল বর্ধমানের রানীর দেবোত্তর সম্পত্তি। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে আলেকজান্দার অ্যান্ড কোম্পানী এই রানীর কাছে খনির জন্য জমি প্রার্থনা করে। সেই সময় বর্ধমান রাজ এস্টেট থেকে শিবগঞ্জ, রানীগঞ্জ এবং হরদডাঙ্গা নামে তিনটি মৌজার লীজ দলিল ঐ কোম্পানীকে দেওয়া হয়। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল কোল কোম্পানীর এজেন্ট হিসাবে জোড়াসাঁকোর দ্বারকানাথ ঠাকুর ঐ তিনটি মৌজার নতুন লীজ দলিল লাভ করেন। উৎকৃষ্ট কয়লা উত্তোলনের সাথে সাথে ভারতের পূর্বাঞ্চলে রানীগঞ্জের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে সারা বিশ্বে।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রানীগঞ্জ শহরের প্রধান প্রাণকেন্দ্র ছিল মঙ্গলপুর। ১৮৫৫ সালের ৩ ফেব্রুয়ারী হাওড়া থেকে রানীগঞ্জ প্রথম ট্রেন চলাচল শুরু করে। ১৮৫৬ সালে সিহারশোল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোবিন্দ প্রসাদ পণ্ডিতের উদ্যোগে রানীগঞ্জে প্রথম হাইস্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। রেলযোগাযোগ স্থাপিত হওয়ার পর কাজের সুবিধার জন্যই মঙ্গলপুর থেকে পুলিশ থানা, ডাকঘর প্রভৃতি রানীগঞ্জে স্থানান্তরিত করা হয়।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে রানীগঞ্জ ছিল মহকুমা শহর। বর্তমান প্রধান ডাকঘরের পিছনে ছিল মহকুমা শাসকের দপ্তর, আদালত প্রভৃতি। ১৯১১ সালে মহকুমা দপ্তর রানীগঞ্জ থেকে আসানসোলে স্থানান্তরিত হওয়ার ফলে রানীগঞ্জের গুরুত্ব অনেকটাই হ্রাস পায়। এক সময় বৃটিশ সংস্থা বেঙ্গল কোল কোম্পানীর প্রধান দপ্তর ছিল রানীগঞ্জের কাছে এগরা মৌজায়।

পশ্চিমদিকে ভাল আরও ভাল কয়লার সন্ধান পাওয়ার সাথে সাথেই তা পরিবহনের স্বার্থে

রেলপথ রানীগঞ্জ ছাড়িয়ে আসানসোল পার হয়ে পশ্চিমে আরও অনেক এগিয়ে গেল। ফলে রানীগঞ্জের গুরুত্ব গেল কমে।

১৮৫০ সালের ২৯ অক্টোবর বিজ্ঞপ্তি জারি মারফৎ বাঁকুড়া জেলার (সেই সময় রানীগঞ্জ বাঁকুড়া জেলায় ছিল) অধীন রানীগঞ্জ ইউনিয়ন হিসেবে ঘোষিত হয়। সেই বছর ২ নভেম্বর প্রকাশিত সরকারী গেজেটে রানীগঞ্জ ইউনিয়নের উল্লেখ ছিল। তবুও ইউনিয়ন ঘোষণার অনেক পরে পৌরসভায় উন্নীত হয় রানীগঞ্জ। ১৮৮৫ সালে রানীগঞ্জ পৌরসভার প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সেইসময় এই পৌরসভার জনসংখ্যা ছিল - ১০,৭৯২। করদাতা - ১,০৬১। সেই আমলে সকল নাগরিকের ভোটাধিকার ছিল না। রানীগঞ্জে ভোটার ছিলেন ৬০০। প্রথম নির্বাচনে ১৫৫ জন ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছিলেন।

রানীগঞ্জ পৌরসভার ইতিহাস ঃ

১৮৭৬ সালে যাত্রা শুরুর সময় রানীগঞ্জ পৌরসভায় মনোনীত চারজন সদস্য ছিলেন ইউরোপীয়। পরে নির্বাচিত ৮ জন সদস্যের মধ্যেও ৪ জন মনোনীত ইউরোপীয়কে রাখা হয়েছিল। রানীগঞ্জে প্রথম ভারতীয় পৌরপ্রধান হন জগন্নাথ ঝুনঝুনওয়ালা। পৌরসভার ইতিহাস থেকে যে সব পৌরপ্রধানের নাম পাওয়া গেছে পরপর উল্লেখ করছি।

প্রথম ভারতীয় পৌরপ্রধান - জগন্নাথ ঝুনঝুনওয়ালা, প্রথম বাঙালি পৌরপ্রধান (১৯২২) -ডাঃ বিপিন বিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯২৫ -গিরিশ চন্দ্র মণ্ডল, ১৯২৮ -ডাঃ বিপিন বিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৩০ -ডাঃ জ্যোতিষ ঘোষ, ১৯৪৫ -ডাঃ মন্মথ নাথ ঘোষ, ১৯৪৬ -ডাঃ জ্যোতিষ ঘোষ, ১৯৫০ - ডাঃ মন্মথনাথ ঘোষ, ১৯৫২ - অনিল কুমার সেন, ১৯৫৪ - হরিপদ নন্দী, ১৯৫৮ -বনোয়ারীলাল ভালোটিয়া, ১৯৬০-তারাপদ ভট্টাচার্য, ১৯৬৭ -ডাঃ শৈলেন্দ্র নাথ ভৌমিক, ১৯৮১ -রথীন কুমার ঘোষ, ১৯৮৯ -বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়, ১৯৯৫ - গৌতম ঘটক, ২০০০ -রুনু দত্ত (২০০০ সালে উপ-পৌরপ্রধান পদে আছেন ৭ নং ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত মহঃ কলিম)।

অতীতে পৌরসভাগুলির জন্য রাজ্য সরকার তেমন কোনও অর্থ সাহায্য প্রদান করত না। ১৯৫৭ - ৫৮ সালে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এখানের স্বাধীনতা সংগ্রামী পৌরপ্রধান বনোয়ারীলাল ভালোটিয়ার আবেদনে প্রথম সাড়া দেন। ডাঃ রায় রানীগঞ্জ পৌরসভার জন্য তের লক্ষ টাকা অনুদান বরাদ্দ করেন ১৯৫৭ -৫৮ সালে। সম্ভবতঃ সেই টাকাতেই রানীগঞ্জে পৌরপ্রধান বনোয়ারীলাল ভালোটিয়ার আমলে নাগরিকদের জন্য প্রথম পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ শুরু হয় (১৯৫৮)।

উল্লেখ্য, ১৮৫০ সালে রানীগঞ্জ ছিল বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত। ১৮৫০ সালেই রানীগঞ্জ-এর অধিবাসীরা বর্ধমান জেলায় অন্তর্ভুক্তির জন্য আবেদন করেন। সেই বছরেই ২ নভেম্বর সরকারী গেজেটে রানীগঞ্জ ইউনিয়ন ঘোষিত হয়। ১৮৭০ সালে রানীগঞ্জ শহর হিসাবে স্বীকৃতি পায়। সেই সময় মহকুমা শহর রানীগঞ্জের অধীনে ৩টি থানা ছিল। কাঁকসা,

নিয়ামতপুর এবং রানীগঞ্জ। এর আয়তন ছিল ৫৩২ বর্গমাইল। রানীগঞ্জের মহকুমা আদালতে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে কাজ করে গেছেন সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

রেলপথ ও রানীগঞ্জ ঃ

ইষ্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানী ১৮৫৪ সালে হাওড়া থেকে হুগলী পর্যন্ত ২৩ মাইল রেলপথ চালু করে। এটাই ছিল পূর্ব ভারতে রেলপথের সূচনা। ১৮৫৫ সালে এই রেলপথ রানীগঞ্জ পর্যন্ত অগ্রসর হয়। ''বাষ্পীয় কল ও ভারতীয় রেলওয়ে'' কালীদাস মৈত্র প্রণীত গ্রন্থে রানীগঞ্জে প্রথম ট্রেন আগমনের ইতিহাস পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে আছে, সেই সময় হাওড়া থেকে রানীগঞ্জ ১২১ কি.মি. রেলপথ নির্মাণে প্রতি কিলোমিটারে এক লক্ষ টাকা হিসাবে খরচ হয়েছিল। প্রথমাবস্থায় রানীগঞ্জ পর্যন্ত ট্রেনে যাত্রীদের জন্য ছিল তিনটি শ্রেণী। ''প্রথম শ্রেণীতে পাল্কী গাড়ির ন্যায় বসিবার গদী, সামি খড়খড়ি ও ছাদ ছিল।'' দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরার মাথায় কোনও আচ্ছাদন (ছাদ) ছিল না। হাওড়া থেকে রানীগঞ্জ প্রথম শ্রেণীতে ভাড়া ছিল ১১ টাকা ৪ আনা।

১৮৫৫ সালের ৩ ফেব্রুয়ারী শনিবার প্রথম রেলগাড়ি আসে রানীগঞ্জে। ২ ফেব্রুয়ারী ১৮৫৫ শুক্রবার 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় এই রেলপথ সম্পর্কে সম্পাদকীয় লেখা হয়েছিল। ঐ সম্পাদকীয়ের অংশ বিশেষ –

''শনিবার দিবসে ৩ ফেব্রুয়ারী রেইল রোড প্রকাশ্য রূপে খোলা হইবেক, তাহার অনুষ্ঠান হইতেছে। হাবড়ায় গেট বাঁধা হইয়াছে.....। গভর্ণর জেনারেল সাহেব অতি সমারোহ পূর্বক বর্ধমান যাইবেন। মহারাজ বর্ধমানাধীশ্বর আপনার রম্য আবাস অতি মনোহর রূপে সজ্জীভূত করিতেছেন। কলিকাতার বিখ্যাত খাদ্য বিক্রেতা উইলিয়াম সাহেব ঐ উদ্যানে ছয়শত সাহেবের খানা সাজাইবেন। ....রানীগঞ্জেও তাম্বু পড়িয়াছে... রজনী যোগে রেইল রোডের মঙ্গলার্থে আতোসবাজী হইবেক।'' – প্রথম ট্রেন যাত্রায় শারীরিক অসুস্থতার কারণে গভর্ণর জেনারেল রানীগঞ্জে আসতে পারেন নি। কলকাতার লর্ড বিশপ, কলকাতা সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি স্যার আর্থার বুলার এবং ভারিঙ্গকে নিয়ে কয়েকশো ইউরোপীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বেলা আড়াইটার সময় রেলপথে রানীগঞ্জে নামেন।

একনজরে রানীগঞ্জ পৌরসভা ঃ

স্থাপিত	ঃ ১জুন, ১৮৭৬
আয়তন	ঃ ২৪.৯৯ বর্গমাইল
ওয়ার্ড	ঃ ২১ টি
জনসংখ্যা ১৯৯১	ঃ ৬১৯৯৭
২০০১	ঃ ১২২৭৯১
পানীয় জল সরবরাহ	ঃ দৈনিক ১১ লক্ষ গ্যালন

নলকূপ ঃ ৩৩টি
ক্ষুদ্রশিল্প ঃ ৪৮০টি
প্রাথমিক বিদ্যালয় ঃ ৪৬ টি
উচ্চ মাধ্যমিক ঃ ১১ টি
হাসপাতাল /স্বাস্থ্যকেন্দ্র ঃ ১ টি
সুপার মার্কেট ঃ ২টি
বাজার ঃ ১ টি
শৌচালয় ঃ ১৩ টি
বস্তিতে বিনোদন কেন্দ্র ঃ ৬ + ৬ (নির্মিয়মান)
ইঁটভাটা ঃ ২৮ টি
ধানকল ঃ নাই
কবরস্থান ঃ ১ টি
শ্মশান ঃ ১ টি (পৌর এলাকার বাইরে)
পাকা রাস্তা ঃ ৩৮ কি.মি.
কাঁচা রাস্তা ঃ ১২ কি.মি.
কংক্রিট রাস্তা ঃ ৫ কি.মি.
ইঁট বাঁধানো রাস্তা ঃ ৯৩ কি.মি.

ওয়ার্ডের ক্রম অনুসারে রানীগঞ্জের পৌর : ' তালিকা :

১. গৌতম ঘটক, ২. স্নেহলতা সিং, ৩. অশোক ভট্টাচার্য, ৪. মহেন্দ্র মিস্ত্রী, ৫. অশ্বিনী মালাকার, ৬. ছন্দা ঘোষ, ৭. মহঃ কলিম, ৮. অনুপ মিত্র, ৯. কৃষ্ণা নন্দী, ১০. রবীন্দ্রনাথ পাল, ১১. মালতী মাজি, ১২. রুনু দত্ত (চেয়ারম্যান), ১৩. রৌশন জাহান, ১৪. হরিদাস পাঠক, ১৫. কার্তিক মণ্ডল, ১৬. লক্ষ্মী ভার্মা, ১৭. সোমাই মাঝি, ১৮. অসীম কাঞ্জিলাল, ১৯. অমর বাউড়ি, ২০. আসিরুদ্দিন খান, ২১. অনিতা রুইদাস।

রানীগঞ্জ পৌরসভার আয় ব্যয় ঃ

বছর	আয়	ব্যয়
১৯৯৫ - ৯৬	২,০১,৪০,০০০	১,৮০,৮৬,০০০
১৯৯৬ - ৯৭	৩,৩২,১৯,০০০	২,৪৬,৩৫,০০০
১৯৯৭ - ৯৮	৪,৪০,৮১,০০০	৩,৪১,০৯,০০০

সূত্র ঃ ডিস্ট্রিক্ট স্ট্যাটিসটিক্যাল হ্যাণ্ডবুক, বর্ধমান, ১৯৯৮.

২০০১ জনগণনায় রানীগঞ্জ পৌরসভার জনসংখ্যা - ১,২২,৭৯১। পুরুষ - ৬৫,৩৬০, মহিলা - ৫৭,৫৩১। সাক্ষর নাগরিকের সংখ্যা - ৭৯,২৫৩। সাক্ষরতার হার - ৬৪.৫৪ শতাংশ।

দুর্গাপুর পৌর অঞ্চল

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময়েও দুর্গাপুরে ছিল ঠ্যাঙাড়ে এবং ডাকাতদলের রাজত্ব। ঘন বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ এই এলাকা ছিল রোগ, হিংস্র জীবজন্তু এবং সর্পসঙ্কুল এক নরক বিশেষ। উনবিংশ শতাব্দীতে এই অঞ্চলে ছিল সদগোপদের রাজত্ব। অমরারগড়ের মহারাজা ভল্লুপদ ঘোষ এখানে রাঢ়েশ্বর নামে সুন্দর শিব মন্দির স্থাপন করেছিলেন। ১৯৬০ সালেও দুর্গাপুরের অধিকাংশ এলাকায় ছিল ঘন বনাঞ্চল।

১৯৫৫ সালের ডিসেম্বর মাসে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের আবেদন ক্রমে ভারত সরকার দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দুর্গাপুরে ইস্পাত কারখানা স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ইস্পাত কারখানার স্থান হিসাবে সেই সময় দুর্গাপুরের স্থান নির্বাচন ছিল খুবই বিজ্ঞান সম্মত। দামোদর উপত্যকার নিম্নপ্রান্তে অবস্থিত এই এলাকা পশ্চিমে কয়লা খনি অঞ্চলের সাথে যুক্ত হওয়ার কারণে দুর্গাপুরের সম্ভাবনা ছিল উজ্জ্বল। ১৯৫৬ সালের অক্টোবর মাসে ভারত সরকার ইসকন নামে (ইন্ডিয়ান স্টিল ওয়ার্কস কনস্ট্রাকশন) এক সংস্থাকে দুর্গাপুরে ইস্পাত কারখানা নির্মাণের বরাত দেয়। কাজ শুরু হয় ১৩ নভেম্বর ১৯৫৬।

১৯৫৯ সালের ২৪ আগস্ট দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার প্রথম কোক চুল্লী ব্যাটারী প্রজ্জ্বলিত হয়। এইভাবেই পরবর্তীকালে মিশ্র ইস্পাত, ডি পি এল, সার কারখানা, সিমেন্ট এবং রাসায়নিক কলকারখানা গড়ে ওঠে ঘন বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ দুর্গাপুরে। ১২০ বর্গমাইল এলাকা দুর্গাপুর ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মানসপুত্র রূপে পরিচিতি লাভ করে।

মহানগরী কলকাতা এবং দেশের রাজধানী দিল্লীর সংযোগরক্ষাকারী রেলপথ, শেরশাহের তৈরী গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড এই দুর্গাপুরের বুক চিরে গেছে। দামোদরের জল, পশ্চিমে পর্যাপ্ত কয়লা, বিহার থেকে সুলভে শ্রমিক প্রভৃতির কল্যাণে শিল্প নগরী দুর্গাপুর সাত এবং আটের দশকে প্রাণ ফিরে পেয়েছিল।

বরাকর থেকে পানাগড় পর্যন্ত জি.টি.রোড প্রায় চারগুণ চওড়া করার কাজ শুরু হওয়ার পর মৃতপ্রায় শিল্পনগরী দুর্গাপুরের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হচ্ছে। দুর্গাপুর পৌর নিগমের উদ্যোগে বৃহৎ পানীয় জল প্রকল্প, পণ্য রপ্তানীতে উৎসাহ দিতে নির্মীয়মান ইন্ডাসট্রিয়াল পার্ক নতুন আশা জোগাচ্ছে।

১৯৯৭ সালের জুন মাসে পৌর নিগম হিসাবে কাজ শুরুর সাথে সাথেই দুর্গাপুরে বহুমুখী প্রকল্প রচিত হচ্ছে। পরিকল্পনার বিকেন্দ্রীকরণ, নীচুতলার জরুরী প্রয়োজন ভিত্তিক সুযোগ সুবিধা প্রভৃতি চটজলদি পৌঁছে দিতে শুরু হয়েছে ব্যাপক উদ্যোগ। পাঁচটি বরো এবং ৪৩ টি ওয়ার্ডের সর্বত্র সমস্যা উপলব্ধি করে তা সমাধানের চেষ্টা হচ্ছে। ১০ম অর্থ কমিশনের নানা প্রকল্প, জাতীয় বস্তি উন্নয়ন, জাতীয় সামাজিক সহায়তা প্রকল্প, ছোট এবং মাঝারি শহরের উন্নয়নের জন্য বিশেষ পরিকল্পনা প্রভৃতি খাতে প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়েছে দুর্গাপুরে।

১৯৯৭ - ৯৯ সালে দুর্গাপুর পৌর নিগমের আয় ছিল ১৩,৫৯,৬৬,০০০ টাকা। সেই আর্থিক বছরে ব্যয় হয়েছে ১১,৭৪,৪২৬ টাকা। (সূত্র ঃ ডিস্ট্রিক্ট স্টাটিসটিক্যাল হ্যাণ্ডবুক, বর্ধমান, ১৯৯৮)।

এক নজরে দুর্গাপুর পৌর নিগম ঃ

নোটিফায়েড এলাকা	ঃ ১ অক্টোবর ১৯৬২
পৌরনিগম হিসাবে যাত্রা	ঃ ১১জুন ১৯৯৭
মোট আয়তন	ঃ ১৫৪ বর্গ কি.মি.
ওয়ার্ড সংখ্যা	ঃ ৪৩ টি
বরো সংখ্যা	ঃ ৫ টি
জনসংখ্যা ১৯৯১	ঃ ৪,১৫,৯৮৬
২০০১	ঃ ৪,৮০,২১৭
সাক্ষর ১৯৯১	ঃ ২,৮৬,১৯১(৬৮.৭৯%)
২০০১	ঃ ৩,৬০,৭৫৪ (৭৫.১২%)

ওয়ার্ড সংখ্যা এবং আয়তনের সাথে পৌর সদস্যদের তালিকা ঃ বন্ধনীর মধ্যে এলাকা বর্গ কিলোমিটারে ঃ

১. তুলসী টুডু (১২.৮০), ২. সাকিলা জমাদার (৯.৮০), ৩. রথীন রায়(৩.৬০), ৪. মনোজ হাজরা (২.৪০), ৫. আলপনা চৌধুরী (১.০৫), ৬. সুবীর সেনগুপ্ত (১.৪০), ৭. প্রভাত কুমার চ্যাটার্জী (২.৮০), ৮. কল্যাণী বসু ঠাকুর (১.৫৫), ৯. বংশীধর সাহা (১.৫০), ১০. মিলন ভট্টাচার্য (১.৯০), ১১. আয়েন চন্দ্র বাউড়ি, ১২. প্রিয়নাথ চ্যাটার্জী(০.৭৫), ১৩. নিয়তি দাস, ১৪. যমুনা মণ্ডল (১.৭০), ১৫. ষষ্ঠীপদ বাগদি (১.২০), ১৬. মহাব্রত কুণ্ডু (৪.২০), ১৭. ভৈরব বাগদি (১.০০), ১৮. তারাশঙ্কর সুকুল (০.৪০), ১৯. আলো ঘোষ (০.৮৫), ২০. মহাদেব পাল (০.৬৫), ২১. বিপ্রেন্দু চক্রবর্তী (১.১৫), ২২. মিতা দাশগুপ্ত (৩.৬৫),২৩. সুশীল ভৌমিক (৩.৫৫), ২৪. রণেন্দ্র কুমার সাহা রায় (১.৭০), ২৫. মঞ্জু ভট্টাচার্য (৯.২০), ২৬. বংশীবদন কর্ম্মকার (১.৭০), ২৭. বি.আচারি (১০.৯০), ২৮. মৈত্রেয়ী চ্যাটার্জী (৮.০৫), ২৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (০.৭৫), ৩০. বিশ্বনাথ পারিয়াল (৩.৭০), ৩১. সুমিত্রা মুখার্জী (৩.৪০), ৩২. সুনীল ঘোষ (৩.৭০), ৩৩. সত্যেন্দ্র কুমার মণ্ডল (১.২০), ৩৪. দেবকী পুর্তি (৬.৪০), ৩৫. স্নেহময় ঘটক (৩.০০), ৩৬. সুদীপা গুন (৪.৯০), ৩৭. অমিতা দত্ত (৬.০০), ৩৮. মণিময় চক্রবর্তী (৬.৫০), ৩৯. অসিত মিত্র (৩.২৫), ৪০. ঝর্ণা দাশগুপ্ত (১.৬০), ৪১. শান্তিময় পণ্ডিত (১.৪০) , ৪২. মনোরঞ্জন গুপ্ত (১.১০) এবং ৪৩. কল্যানী দাস (১১.২৫ বর্গ কি.মি.)।

দুর্গাপুর পৌর নিগম ঃ কর আদায়ের পরিমাণ

বছর	দাবি	আদায়	শতাংশ
১৯৯৬ - ৯৭	৭,৬৬,০৬,৭২১	২,৪৭,৪৫,৩৯০	৩২.৩০

১৯৯৭ - ৯৮	৮,৩৩,৬৪,৫০১	২,৭৭,৮৬,৮৮৫	৩৩.৩৩
১৯৯৮ - ৯৯	৮,৭০,৪০,৪০৫	২,৬৪,৫৩,৮০১	৩০.৩৯

দুর্গাপুর কর্পোরেশন (পৌর নিগম) হওয়ার আগে

সব থেকে ভাল কর আদায় হয়েছিল ১৯৯৫ - ৯৬ সালে। দাবি - ৮,০৩,৪৫,৭৮৬ ঃ আদায় হয় - ৩,৫৩,৯৫,১০১ টাকা। শতাংশের বিচারে ৪৪.০৫।

কুলটি পৌর অঞ্চল

রানীগঞ্জে পর্যাপ্ত কয়লা এবং পাশ্ববর্তী অঞ্চলে আকরিক লৌহের সন্ধান পাওয়ায় উনবিংশ শতাব্দীতেই বার্ণপুর এবং কুলটিতে লৌহ কারখানা তৈরীর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। কয়লা উত্তোলন শুরু হওয়ার প্রায় একশ বছর পর ১৮৭৫ সালে শুরু হয় কুলটির লৌহ কারখানা। এই কারখানা তৈরীর জন্য শ্রমিক বসতি, দক্ষ অদক্ষ কর্মীর আগমনের ফলে গ্রাম কুলটির গুরুত্ব বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। ১৮৮০-৮১ সালে বৃটিশ রাজত্বে ভারত সরকারের অধীন পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট কুলটির লৌহ কারখানা অধিগ্রহণ করে। সেই সময় এর নামকরণ হয় বরাকর আয়রণ ওয়ার্কস। ১৮৯৯ পর্যন্ত এই কারখানার এই নামই ছিল। পরে হয় বেঙ্গল আয়রণ অ্যান্ড স্টিল কোম্পানী লিমিটেড। ১৮৯২ সালেই মার্টিন অ্যান্ড কোম্পানী কুলটি লৌহ কারখানার ম্যানেজিং এজেন্ট হিসাবে কাজ করছিল।

কুলটি ব্লক ছাড়িয়ে সীমান্ত এলাকা সালানপুর ব্লকে রয়েছে মা কল্যানেশ্বরীর মন্দির। রাজা কল্যাণ সিংহের তৈরী। ৫০০ বছরের প্রাচীন দেবীমূর্তি। বন্ধ্যা নারীরা সন্তান কামনায় দূর দূরান্ত থেকে এখানে পূজো দিতে আসেন। প্রচুর ভক্তের সমাগম হয় কল্যাণেশ্বরী মন্দিরে।

১৯৯৩ সালে কুলটি - বরাকর নোটিফায়েড এলাকা, নিয়ামতপুর নোটিফায়েড এবং দিশেরগড় নোটিফায়েড এর তিনটি এলাকা একসাথে যুক্ত হয়ে কুলটি পৌর সভার জন্ম হয়। ১৯৯১ জনগণনায় তিনটি নোটিফায়েড এলাকার মোট জনসংখ্যা ছিল ১,৭৫,০০০। ২০০১ সালে এই সংখ্যা হয়েছে ২,২৬,৮৯৫।

১৯৯১ জন গণনায় কুলটি বরাকর নোটিফায়েড ১,০৮,৫১৮ নিয়ামতপুরে ৫৪,৯৩০ এবং দিশেরগড় নোটিফায়েড এলাকার জনসংখ্যা ছিল ৮৬,৮৩২। পৌরসভায় অন্তর্ভুক্তির সময় কিছু গ্রাম এলাকা বাদ গেছে।

স্থানে স্থানে কিছু কৃষি জমি, অফিস, বাজার, কারখানা, আবাসন প্রভৃতি ছাড়া কুলটি পৌরসভার অধিকাংশ এলাকা জুড়ে আছে কয়লা খনি। জি.টি.রোড হয়ে কুলটির পরিবহন ব্যবস্থা যথেষ্ট ভাল হলেও রেলপথের (রেলস্টেশন) সাথে যোগাযোগের পথ খুবই সংকীর্ণ। ভাঙাচোরা উঁচু নীচু পথে যোগাযোগের ভরসা এখনও ঘোড়ায় টানা এক্কা গাড়ি অথবা সাইকেল রিক্সা।

পৌরসভা হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়ার কয়েক বছরের মধ্যেই ৩৫টি ওয়ার্ডে উন্নয়নের বহুমুখী পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। কুলটি পৌরসভার ৯৯ বর্গ কিলোমিটারে আছে ৩২ শতাংশ গ্রাম এলাকা। ১৯৯১ সালে কুলটি-বরাকর, নিয়ামতপুর ও দিশেরগড় নোটিফায়েড এলাকায় একত্রে সাক্ষরতার হার ছিল ৬৬.৪৪ শতাংশ। ২০০১ জনগণনায় ঐসব এলাকা নিয়ে গঠিত কুলটি পৌরসভায় সাক্ষরতার হার দাঁড়িয়েছে ৬০.৬৮ শতাংশ।

১৯৯৫ থেকে ১৯৯৮ কুলটি পৌরসভার আয় ব্যয়

বছর	আয়	ব্যয়
১৯৯৫ - ৯৬	২,০৪,৪৪,০০০	২,৪০,৫৪,০০০
১৯৯৬ - ৯৭	৩,২২,৯০,০০০	২,৮৬,২৩,০০০
১৯৯৭ - ৯৮	৪,৪৫,৯৮,০০০	২,৯০,৪১,০০০

সূত্র ঃ ডিস্ট্রিক্ট স্ট্যাটিসটিক্যাল হ্যাণ্ডবুক, বর্ধমান, ১৯৯৮.

এক নজরে কুলটি পৌরসভা

স্থাপিত		ঃ ১ এপ্রিল, ১৯৯৬
আয়তন		ঃ ৯৯ বর্গ কি. মি.
গ্রাম এলাকা		ঃ ৩২ শতাংশ
জনসংখ্যা	১৯৯১	ঃ ১,৭৫,০০০
	ঐ-পুরুষ	ঃ ১,১০,০০০
	ঐ-মহিলা	ঃ ৬৫,০০০
	২০০১	ঃ ২,২৬,৮৯৫
	ঐ-পুরুষ	ঃ ১,১৮,৪৮৪
	ঐ-মহিলা	ঃ ১,০৮,৪১১
সাক্ষরতার হার	১৯৯১	ঃ ৬৬.৪৪ শতাংশ
	২০০১	ঃ ৬০.৬৮ শতাংশ
মোট ওয়ার্ড সংখ্যা		ঃ ৩৫ টি
রাস্তা	(বিটুমিন - এ)	ঃ ২৯ কি.মি.
	(কংক্রিট-বি)	ঃ ১০১.৭৫ কি.মি.
	অন্যান্য	ঃ ২১০ কি.মি.
পানীয় জল সরবরাহ (দৈনিক)		ঃ ৬ লক্ষ গ্যালন
ঐ মোট পাইপ লাইন		ঃ ২৭ কি.মি.
ঐ জনস্বাস্থ্য বিভাগ		ঃ ২৯ কি.মি.
নলকূপ		ঃ ১২৭ টি
পাকা নর্দমা		ঃ ২১০ কি.মি.

ক্ষুদ্র শিল্প	ঃ ৮২ টি
হাইস্কুল	ঃ ৫ টি
প্রাথমিক বিদ্যালয়	ঃ ৩৭ টি
কলেজ	ঃ ১ টি

ওয়ার্ডের ক্রম অনুসারে কুলটি পৌরসভার সদস্যদের তালিকা ঃ

১. শঙ্করী টুডু, ২. বাজরানী কাউর, ৩. অসিত বড়ুয়া, ৪. শিবপ্রসাদ রাউত, ৫. সুবোধ হাড়ি, ৬. অলক গুহ, ৭. সুনীতি পাশোয়ান, ৮. বেবী সিং, ৯. শ্যামল বাউড়ি, ১০. নির্মল (বাপি) চট্টোপাধ্যায়, ১১. কপিল মাজি ১২. হলধর কর্মকার, ১৩. মোহনলাল বিশ্বকর্মা, ১৪. শীলা লায়েক, ১৫. বীনা রাজোয়ার, ১৬. চন্দন মাজি, ১৭. অঞ্জন মণ্ডল, ১৮. সুব্রত চট্টোপাধ্যায়, ১৯. পারুল মণ্ডল, ২০. নমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২১. প্রণব মণ্ডল, ২২. সৌমিত্র সেনগুপ্ত, ২৩. দিব্যেন্দু রায়, ২৪. আরতি মাহাতো, ২৫. মহঃ আসলাম, ২৬. উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় (চেয়ারম্যান), ২৭. সারদা সাউ, ২৮. আখতার হোসেন, ২৯. ব্রিজ ভূষণ সিং, ৩০. সুমিতা ঘোষ (ভাইস চেয়ারপার্সন), ৩১. মধুকান্ত শর্মা, ৩২. মহেশ সিং (লালন), ৩৩. উমা রানী গড়াই, ৩৪. মিলন সিনহা, ৩৫. কৃষ্ণ পাল।

জামুরিয়া পৌর অঞ্চল

আসানসোল মহকুমার অধীন জামুরিয়া ব্লকের প্রায় সবটাই কয়লাখনি অঞ্চল। স্থানে স্থানে আছে কিছু বাজার, দোকানপাট, ঘরবাড়ি এবং চাষযোগ্য জমি। নগরায়নের কিছুই নেই জামুরিয়ায়, তবুও এটি পৌরসভা। জনসংখ্যায় মিশ্র সংস্কৃতির প্রভাব আছে। আদিবাসী মানুষও আছেন অনেক।

ঝমুরিয়া বাজার থেকে অণ্ডাল যাওয়ার পথে তিন কিলোমিটার দূরে দামোদরপুর। এখানেই পৌরসভার অফিস। দামোদরপুরের আদিবাসী পাড়ায় প্রতি বছর ১ আশ্বিন ছাতা পরবের মেলা হয়। আশপাশের গ্রাম থেকে সাঁওতাল যুবক যুবতী দল বেঁধে নাচ গান করেন এই উৎসবে। বেঙ্গল কোল কোম্পানীর কারখানা, কাতরাস - ঝরিয়া খনি কোম্পানীর দপ্তর প্রভৃতি এখানের ব্যস্ততম এলাকা ছিল। ১৯৫৯ সালে তৎকালীন রাজ্যপাল শ্রীমতি পদ্মজা নাইডু জামুরিয়ায় সর্বভারতীয় কোলফিল্ড স্পোর্টস্ এর উদ্বোধন করেছিলেন। মাত্র ৬ কি.মি. দূরে চুরুলিয়া গ্রামে জন্মেছিলেন বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম। ইকড়া গ্রামের জমিদার চ্যাটার্জী পরিবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ইতিহাস বিভাগ চালু হওয়ার সময় নগদ এক লক্ষ টাকা দান করেছিলেন। সেই থেকে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির জন্য জমিদার বাড়ির দুইটি আসনের কোটা এখনও বরাদ্দ আছে। শিক্ষানুরাগী জমিদারের উদ্যোগেই ইকড়া গ্রামে বহুকাল আগে ইংরাজী মাধ্যমের হাইস্কুল স্থাপিত হয়েছিল। কয়েক বছর আগেও এই স্কুলটি ছিল সরাসরি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে। সম্প্রতি এই স্কুলের পরিচালন ভার বোর্ড গ্রহণ করেছে। এসব এখন ইতিহাস।

মাত্র ৬ কি.মি. দূরেই কবি নজরুলের জন্মস্থান চুরুলিয়া। প্রতিবছর ২৫মে এখানে সপ্তাহব্যাপী নজরুল মেলা হয়। নজরুল শতবর্ষে বাংলাদেশের প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা, ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী প্রমুখ বহুগণ্যমান্য ব্যক্তি এসেছিলেন চুরুলিয়ায়।

আর্মেনিয়ান এ এস ক্রিট সাহেব ছিলেন জামুরিয়া কয়লা খনির মালিক। তিনিই আসানসোলে প্রথম অ্যামবাসাডর মোটর গাড়ির ডীলারশীপ নিয়েছিলেন। জামুরিয়ার দামোদরপুরে এই ক্রিট সাহেবের বাংলোতেই স্থাপিত হয়েছে পৌরসভার অফিস। জামুরিয়া পৌর এলাকায় সমস্যা প্রচুর। শহরের মাঝে সংকীর্ণ রাস্তা। ১৬ কিলোমিটার দূরে আসানসোল থেকে যোগাযোগের মাধ্যম মিনিবাস। কিছু মিনিবাসই এই শহরের প্রাণ চাঞ্চল্যকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

এক নজরে জামুরিয়া পৌরসভা

স্থাপিত	ঃ ২৭ ডিসেম্বর ১৯৯৫
মোট আয়তন	ঃ ৭৯.২০ কি.মি.
গ্রাম সংখ্যা	ঃ ১৬ টি
জনসংখ্যা (১৯৯১)	ঃ ১,১৮,৪৯৪
(২০০১)	ঃ ৯৮,৭২০
সাক্ষর ১৯৯১	ঃ ৫৩.৫৩ %
সাক্ষর ২০০১	ঃ ৫৮১৯ %
ওয়ার্ড সংখ্যা	ঃ ২২ টি
কাঁচা রাস্তা	ঃ ২০ কি.মি.
মোরাম রাস্তা	ঃ ২১.৫ কি.মি.
পাকা (পীচ) রাস্তা	ঃ ৪৫ কি.মি.
নলকূপ	ঃ ১৭১ টি
খনির সংখ্যা	ঃ ১৬ টি
প্রাথমিক বিদ্যালয়	ঃ ৫৯ টি
উচ্চ বিদ্যালয়	ঃ ১০ টি
স্বাস্থ্যকেন্দ্র	ঃ ১ টি
বাজার	ঃ ৪ টি
অডিটোরিয়াম	ঃ ১টি (নির্মীয়মান)
বস্তির সংখ্যা	ঃ ১৪৬
বস্তি এলাকায় বিনোদন কেন্দ্র	ঃ ১৯ টি
বিবাহ হল	ঃ ৫ টি
শ্মশান ঘাট	ঃ নেই।

ওয়ার্ডের ক্রম অনুসারে পৌর সদস্যদের তালিকা ঃ

১. বিশ্বরূপ পাণ্ডা, ২. পুষ্পা বাউড়ি, ৩. শীলা সরকার, ৪. টুসু মণ্ডল, ৫. অমৃত কোড়া, ৬. মিহির নায়েক, ৭. কালিদাস মুর্মু, ৮. তাপস কবি (পৌরপতি-ফোন নং - ০৩৪১-৪৫৫৫৬২), ৯. বন্দনা চ্যাটার্জী, ১০. সুজিত দত্ত, ১১. মৌমিত্রি অধিকারী, ১২. সোনিয়া কুমারী যাদব, ১৩. সুধাকর চক্রবর্তী, ১৪. চৈতন্য হেমব্রম, ১৫. চন্দনা বাউড়ি, ১৬. মিনু মিত্র, ১৭. চন্দ্রশেখর দাস, ১৮. বিশ্বনাথ চট্টরাজ, ১৯. মীরা নইম, ২০. সার্জানা খাতুন আলি, ২১ ভগীরথ পাশোয়ান, ২২. শেখ আব্দুল বারিক

(১০ নং ওয়ার্ডের সুজিত দত্ত উপ-পৌরপ্রধান)

তাপস কবি পৌরপ্রধানের দায়িত্ব নিয়েছেন ১৯৯৮ সালে। তিনি জামুরিয়ায় দিশেরগড় বিদ্যুৎ প্রকল্পের কর্মী।

১৯৯৬ - ৯৭ সালে জামুরিয়া পৌরসভার আয় ছিল - ৯,৭১,২৬,০০০ টাকা। ব্যয় হয় - ৪,১৬,৭৮,০০০ টাকা। ১৯৯৭ - ৯৮ সালের আয় ১,৮২,৪৭,০০০, ব্যয় হয় মাত্র - ৭১,১৪,০০০।

সূত্র ঃ ডিস্ট্রিক্ট স্ট্যাটিসটিক্যাল হ্যাণ্ডবুক, বর্ধমান, ১৯৯৮।

১৯৯১ সালে জামুরিয়া ১ ও ২ নং ব্লকে সাক্ষরতার হার ছিল ৫৩.৫৩ শতাংশ। ২০০১ সালে ৫৮.১৯ শতাংশ সাক্ষর হয়েছেন।

মেমারী পৌর অঞ্চল

প্রাচীন কাল থেকেই মেমারী ছিল জন অধ্যুষিত এলাকা হিসাবে পরিচিত গঞ্জ। ষোড়শ শতাব্দীতে এই মেমারী মহবতপুর নামে পরিচিত ছিল। প্রায় দেড়শো বছর পর ১৮৭১ সালে অযোধ্যারাম সরকারের বংশধর শ্যামানন্দ সরকার বর্ধমান রাজের কাছে মহবতপুরের নাম বদলের আর্জি জানান। ঐ দাবি মঞ্জুর হলেও নামকরণ কী হবে তাই নিয়ে বিস্তর আলাপ আলোচনা হয়। কৃষি প্রধান এলাকাকে আরবী ভাষায় মামুরী বলা হত। উর্বর কৃষি প্রধান মহবতপুর অতঃপর মামুরী অপভ্রংশে মেমারী নামে পরিচিত হয়ে যায়।

দামোদর, বাঁকা, খড়ি, গাঙ্গুর, ইসলবা, ধুসি, বেহুলা প্রভৃতি নদীর জলে প্লাবিত এই এলাকার জমি ছিল অত্যন্ত উর্বর। ১৮৫৪ সালে পাণ্ডুয়া থেকে মেমারী পর্যন্ত রেল চলাচল শুরু হওয়ায় এই এলাকার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। বর্ধমান রাজ বংশের আদি পুরুষ আবুরাম রায় এই এলাকার সনদ দিয়েছিলেন জমিদার অযোধ্যারাম সরকারকে। আগে এই এলাকার থানা ছিল সাতগাছিয়ায়। ১৮৭১ সালে মেমারী নামে পরিচিতি লাভের পর সাতগাছিয়া থেকে থানা মেমারীতে স্থানান্তরিত হয়।

ভাষাতাত্ত্বিক ডঃ সুকুমার সেন "বাংলা স্থাননাম" গ্রন্থে আরবী শব্দ মামুরী থেকেই মেমারী নামের উৎপত্তি বলে উল্লেখ করেছেন। কোনও কোনও গবেষক অবশ্য মেঘমারী অথবা মা মেরী থেকে মেমারী এসেছে বলে দাবি করেছেন।

বর্ধমানের পূর্ব দক্ষিণে ২২°৫৫´ থেকে ২৩°১২´ ৩০´´ উত্তর অক্ষাংশে ৮৭°৫৯´ থেকে ৮৮°১২´ ৩০´´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে মেমারী অবস্থিত। বর্ষাকালে এই অঞ্চলে ১১০০ থেকে ১৫০০ মি.মি. বৃষ্টিপাত হয়। গ্রীষ্মকালে সর্বাধিক ৪২° শীতকালে সর্বনিম্ন ৮° সেলসিয়াস তাপমাত্রা। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে মেমারির গড় উচ্চতা ২৬ মিটার। ১৯৫১ সালে জনগণনার হিসাবে খাঁড়ো, মেমারী, জোয়ানপুর, দক্ষিণ রাধাকান্তপুর, ইছাপুর প্রভৃতি নিয়ে বর্তমান পৌর এলাকার জনসংখ্যা ছিল ৬৬৯০। ১৯৬১ সালে -১০,৩৯০, ১৯৭১ সালে হয় - ১৪,৫০৬, ১৯৮১ সালে - ২১,৯১৯, ১৯৯১ সালে জনসংখ্যা ২৮,৭০৪ এবং ২০০১ সালে হয়েছে ৩৬,১৯১।

গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে মেমারী নোটিফায়েড হিসাবে কাজ শুরু করেছে ১৯৯২ সালে। প্রায় ৩ বছর পর ১৯৯৫ সালে মেমারী পৌরসভার প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৯৫ সালের ২৬ জুন ১৬ জন পৌর সদস্যকে নিয়ে নতুন বোর্ড গঠিত হয়। ওয়ার্ডের ক্রম অনুসারে পৌর সদস্যরা (১৯৯৫) যথাক্রমে ঃ

১. লক্ষ্মী সোরেন, ২. আমিনা খাতুন (চাকরি পেয়ে ১৯৯৮ সালে ইস্তফা দেন, উপ-নির্বাচনে নির্বাচিত হন শেখ সুফিয়া, ৩. কালু রায়, ৪. শিশির নায়েক, ৫. রতন দাস, ৬. শেখ হোসেন আলি, ৭. কল্যানী বারুই, ৮. আলো ব্যানার্জী, ৯. জয়দেব বিষয়ী, ১০. অরুণ দাশগুপ্ত, ১১. সন্ধ্যা ভট্টাচার্য, ১২. স্বপন বিষয়ী, ১৩. অভিজিৎ কোঙার, ১৪. শিপ্রা কুণ্ডু, ১৫. জনাব আবুল হোসেন এবং ১৬. বিশ্বনাথ বিষয়ী (পৌরপ্রধান)।

২০০০ স্যালে মেমারী পৌরসভার দ্বিতীয় নির্বাচন হয়েছে। ওয়ার্ডের ক্রম অনুসারে দ্বিতীয় পৌর বোর্ডের সদস্যেরা যথাক্রমে ঃ-

১. পীযুষ বিশ্বাস, ২. শেখ সুফিয়া, ৩. শেখ আমিনুল, ৪. প্রশান্ত কুমার, ৫. শ্রীমতি হেমব্রম, ৬. মিতা বসু, ৭. সুপ্রিয় সামন্ত ৮. অরুণ দাশগুপ্ত, ৯. ডলি সর্দার, ১০. বন্দনা ধাড়া, ১১. ললিত চন্দ্র দাস, ১২. স্বপন বিষয়ী, ১৩. মনোজ চৌধুরী, ১৪. অভিজিত কোঙার (উপ পৌরপ্রধান), ১৫. শেখ কেরিমা বেগম এবং ১৬. বিশ্বনাথ বিষয়ী (পৌর প্রধান)।

এক নজরে মেমারী পৌরসভা ঃ

গ্রাম পঞ্চায়েত মেমারী	ঃ ১৯৭৮
নোটিফায়েড মেমারী	ঃ ১ এপ্রিল, ১৯৯২
প্রথম পৌর নির্বাচন	ঃ জুন, ১৯৯৫
দ্বিতীয় পৌর নির্বাচন	ঃ ২৮মে, ২০০০

আয়তন ঃ ১৪.৬৮ বর্গ কি.মি.
ওয়ার্ড সংখ্যা ঃ ১৬ টি
জনসংখ্যা ১৯৯১ ঃ ২৮,৭২৬
২০০১ ঃ ৩৬,১৯১
সাক্ষরতার হার ১৯৯১ ঃ ৭১.৬৩ শতাংশ
২০০১ ঃ ৬৯.৪০ শতাংশ
সাক্ষর জনসংখ্যা ২০০১ ঃ ২৫,১১৭ (৬৯.৪০ শতাংশ)
ভাষাভাষী মানুষ ঃ বাংলা, হিন্দী, উর্দু, ওড়িয়া, পাঞ্জাবী, গুজরাতি প্রভৃতি।
পৌর এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় ঃ ১২ টি
উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ঃ ২ টি
উচ্চ বিদ্যালয় ঃ ১ টি
মহাবিদ্যালয় ঃ ১ টি
পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ঃ ১ টি
স্বাস্থ্যকেন্দ্র ঃ ১ টি
রেশন দোকান ঃ ৯ টি
গ্রন্থাগার ঃ ১ টি

মেমারী পৌর সভার আয় ব্যয় ঃ

বছর	আয়	ব্যয়
১৯৯৫ - ৯৬	১,০৪,৪৪,০০০	৮২,৭৬,০০০
১৯৯৬ - ৯৭	৬৩,০০,০০০	৬০,৫৪,০০০
১৯৯৭ - ৯৮	৫৫,৭৩,০০০	৮২,৮৯,০০০

সূত্র ঃ - ডিস্ট্রিক্ট স্ট্যাটিসটিক্যাল হ্যাণ্ডবুক, বর্ধমান ১৯৯৮.

তথ্য ঋণ ঃ

১. বর্ধমান চর্চা, ১ম ও২য় খণ্ড, চৌধুরী কনসার্ণ, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা।
২. পশ্চিমবঙ্গ, বর্ধমান জেলা সংখ্যা, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর।
৩. বর্ধমান জেলার পুরাকীর্তি ও সংস্কৃতি , জেলা পরিষদ, বর্ধমান ।
৪. সেন্সাস রিপোর্ট ১৯৯১ এবং খসড়া ২০০১।
৫. বর্ধমান পৌরসভা শতবার্ষিকী স্মরণিকা, ১৯৬৫।
৬. বর্ধমান স্মরণিকা (১৯৮২), বর্ধমান জেলা পুস্তক ব্যবসায়ী সমিতি।
৭. দেখি পুরী বর্ধমান , বর্ধমান পৌরসভা।
৮. স্মরণিকা, বর্ধমান উৎসব (১৪০৭), বর্ধমান পৌরসভা।

৯. বর্ধমান সম্মিলনী, হীরক জয়ন্তী স্মরণিকা, ১৩৮০।
১০. পৌর ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ ঃ মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়।
১১. আসানসোল গাইড, রাজা পাবলিসিটি, আসানসোল।
১২. বর্ধমানের গৌরব কাহিনী, সলিল মিত্র, কল্পনা প্রকাশনী, কলকাতা - ৯।
১৩. কালনা পৌরসভার ১২৫ বর্ষ, কালনা পৌরসভা, ১৯৯৪।
১৪. কালনার ইতিবৃত্ত , দীপক কুমার দাস।
১৫. চেম্বার অফ কমার্স, কালনা।
১৬. ডিস্ট্রিক্ট স্ট্যাটিসটিক্যাল হ্যাণ্ডবুক, ১৯৯৮।
১৭. শহর কাটোয়া ও তার সংস্কৃতি, তারকেশ্বর চট্টরাজ।
১৮. কাটোয়া পৌর মজদুর কর্মচারী সংগঠন স্মরণিকা, ১৯৯৯।
১৯. পঃ বঃ প্রধান শিক্ষক সমিতি, ৩৭ তম রাজ্য সম্মেলন স্মরণিকা, ১৯৯৬।
২০. বর্ধমান সমগ্র (প্রথম খণ্ড) ডঃ গোপীকান্ত কোঙার।
২১. "অনুলিপি" - গুসকরা উত্তরণ যুবগোষ্ঠী স্মারক সংখ্যা, ২০০০
২২. "কলমের মুখ" - মেমারী, জুলাই- সেপ্টেম্বর, ২০০০।
২৩. "অগ্নিযুগের রানীগঞ্জ" - গোপাল নন্দা, প্রকাশক পঙ্কজ কুণ্ডু, কুমার বাজার, রাণীগঞ্জ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ

উপরোক্ত গ্রন্থ ও পুস্তিকাগুলি ছাড়াও শ্রদ্ধেয় খায়রুল আলম সিদ্দিকী (চুরুলিয়া), অগ্রজ সাংবাদিক সৌমেন পাল (কালনা), ভ্রাতৃপ্রতিম সাংবাদিক অনমিত্র ঘোষ (চিত্তরঞ্জন), চন্দ্রনাথ ও রণদেব মুখোপাধ্যায় (কাটোয়া) নানাভাবে তথ্য সরবরাহ করে আমাকে অসীম কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। ভ্রাতৃপ্রতিম সাংবাদিক অজয় কোনার এই লেখাটি তৈরীর জন্য ধারাবাহিকভাবে তার ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিবানে আমাকে পীড়ন করে গেছে। অজয়ের নিরলস "তাগাদা" না থাকলে এই লেখা কবে শেষ হত কে জানে। সকলকে আমার অন্তরের অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে শেষ করছি।

বর্ধমান : গ্রাম ও শহরের উন্নয়ন এবং পারস্পরিক যোগসূত্র

গোপা সামন্ত

ভূমিকা

বর্ধমানের রাস্তাঘাটে দীর্ঘদিন ধরে চলাফেরা করার সুবাদে পথচলতি মানুষের বর্ধমান শহর সম্পর্কে নানা মন্তব্য কানে আসে। যেমন 'বর্ধমান আর শহর হল না'। আবার কলকাতার মত বড় শহরের অধিবাসীদের মন্তব্য, 'বর্ধমান আবার শহর নাকি ? এ তো বর্ধিষ্ণু গ্রাম', 'Agriculture is the only culture of Barddhaman.' প্রায়ই কানে আসতো, মনের মধ্যে আলোড়ন হত - তাহলে শহর কি ? কি কি বৈশিষ্ট থাকলে একটা জনবসতিকে শহর বলা যায় ? ভূগোলের ছাত্রী হিসাবে কৌতূহল মেটাতে সেনসাস বই খুলে শহরের বৈশিষ্ট দেখলাম - ৫০০০ এর বেশী জনসংখ্যা, প্রতি বর্গকিমিতে কমপক্ষে ৪০০ জনের বসবাস, কর্মরত জনসংখ্যার তিন চতুর্থাংশ অকৃষিমূলক জীবিকায় নিয়োজিত, পৌর প্রশাসনিক সংগঠন ও কিছু আনুসঙ্গিক সুযোগ সুবিধা যথা রাস্তায় আলো, পাইপের মাধ্যমে জল সরবরাহ ইত্যাদি। মিলিয়ে দেখলাম সব বৈশিষ্টগুলোই বর্ধমানের রয়েছে - তাহলে লোকে বর্ধমানকে শহর বলতে চায় না কেন ?

ভেবে দেখলাম 'শহর' বলতে হয়ত লোকে কলকাতা বা আসানসোলের মডেলটিকে ভাবে - তাই বর্ধমান তাদের কাছে শহর নয়। আর এই মডেলটা হল একটা 'island' যেখানে থাকবে না কোন গ্রামীণ বৈশিষ্টের ছাপ, থাকবে শহুরে জীবনযাপনের ধরন, শহুরে সংস্কৃতি (নাটক, সিনেমা, বিজ্ঞানমেলা, পর্যালোচনা ইত্যাদি)। দু-চার বছর আগে জনৈক ভদ্রলোকের 'ইদানিং বর্ধমানটা একটু শহর হয়েছে' শুনে প্রশ্ন করেছিলাম 'বর্ধমানটা কিভাবে শহর হল ?'। তিনি উত্তর দিলেন 'কেন ? এখানে এখন সংস্কৃতি লোকমঞ্চ হয়েছে যেখানে মাঝে মাঝে নাটক, সিনে উৎসব ও অন্যান্য ধরনের শহুরে সংস্কৃতির চর্চা হয়, ইকো পার্ক হয়েছে, সুইমিং ক্লাব এবং শরীরচর্চার জিম হয়েছে, তারামণ্ডল হয়েছে, সায়েন্স সেন্টার হয়েছে ....'। বুঝলাম বর্ধমানকে শহর বলতে মানুষের আপত্তি ছিল কেন এবং এখনও অনেকের আছে কেন। মনের মধ্যে আবারও প্রশ্ন জাগলো আচ্ছা লোকে যে ব্যঙ্গকরে বলে 'Agriculture is the only culture of Barddhaman.' – এটা কি ভাল না খারাপ।

ছোটবেলা থেকে মনকে নাড়া দেওয়া এই প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজতে শুরু করলাম। আমার গবেষণার কাজ — বর্ধমান শহরের উন্নয়ন, চারপাশের গ্রামাঞ্চলের উন্নয়ন এবং পরস্পরের যোগসূত্র। বর্তমান প্রবন্ধটিতে আমি আমার গবেষণালব্ধ জ্ঞান থেকে কিছু বিষয় তুলে

ধরতে চাই যা আমাদের উপরের প্রশ্নগুলির উত্তর পেতে সাহায্য করবে।

গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তর

কিছুদিন আগে পর্যন্ত বিশেষজ্ঞরা মনে করতেন যে তৃতীয় বিশ্বের শহরগুলির দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ শহরগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়ন নয়। বরং গ্রামাঞ্চলের উন্নয়ন না হওয়ার ফলে দরিদ্র শ্রেণীর মানুষজন শহরগুলিতে কাজের সন্ধানে চলে আসে এবং শহরগুলি দ্রুত বৃদ্ধি পায়। বর্ধমান শহরের বৃদ্ধির জন্য প্রচলিত ধারণাটি কার্যকর কিনা তা অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখি যে বর্ধমান শহরে গ্রাম থেকে চলে আসা লোকজনদের মধ্যে .বেশীরভাগই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। জিজ্ঞাসাবাদের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এসেছে যে, চারপাশের গ্রাম থেকে বর্ধিষ্ণু পরিবারের কিছু লোকজন বর্ধমান শহরে চলে এসেছে উন্নততর পরিষেবার কারণে। এছাড়াও অসংখ্য রাস্তাঘাটের কেন্দ্রস্থলে বর্ধমান শহর অবস্থিত হওয়ায় বিভিন্ন ধরনের চাকুরী বা ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত নিত্যযাত্রীরা এই শহরে স্থানান্তরিত হয়েছে যোগাযোগের সুবিধার জন্য। তবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এইসব স্থানান্তরিত লোকজনদের এখনও গভীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংযোগ রয়েছে তাদের গ্রামের সঙ্গে।

অন্যদিকে শহরের দরিদ্র ও অসংগঠিত কাজকর্মে নিয়োজিত লোকজনদের মধ্যে (বিশেষতঃ রিক্সাওয়ালা) সমীক্ষা করে দেখা গেছে যে চারপাশের গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র লোকজনদের কাজের সুযোগ প্রসারিত হয়েছে। তাই তারা গ্রাম ছেড়ে শহরের অনিশ্চিত জীবনে চলে আসছে না। অন্যদিকে বর্ধমান শহরের ক্রমবর্ধমান বস্তিগুলি দখল করছে বিহার, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বাঁকুড়ার অনুন্নত গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র শ্রেণীর মানুষজন।

গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তরের চিত্র থেকেও একথা বলা যায় যে বর্ধমান শহরের সাথে গ্রামাঞ্চলের উন্নয়নের সম্পর্কটি বেশ নিবিড়। এলাকার গ্রামীণ দারিদ্র্য শহরে স্থানান্তরিত হচ্ছে না। মধ্যবিত্ত তথা বর্ধিষ্ণু সম্প্রদায়ের যে স্থানান্তর ঘটছে তা নিয়ন্ত্রণ করা যায় গ্রামাঞ্চলে রাস্তাঘাট তথা যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং অন্যান্য শহুরে পরিষেবা প্রসারের মধ্য দিয়ে।

তত্ত্বগত দিক

ভূগোলের গবেষণায় পৃথকভাবে গ্রাম ও শহর সংক্রান্ত আলোচনা এবং গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তরের বিষয়টি অনেক দিন ধরে চর্চিত হলেও গ্রাম-শহরের পারস্পরিক সম্পর্কটি তেমনভাবে আলোচিত হয়নি। পরিকল্পনা মাফিক উন্নয়নেও গ্রাম ও শহর সংক্রান্ত

পরিকল্পনা নীতিগুলি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত না করে আলাদাভাবে দেখা হয়েছে। কিন্তু আটের দশকের শুরু থেকে গ্রাম শহরের পারস্পরিক সম্পর্কটি গবেষণা ও পরিকল্পনা -উভয় কাজেই বিশেষ গুরুত্ব পেতে শুরু করেছে। তার বিশেষ কারণ হল উন্নয়নের পরিকল্পনায় এই বিষয়টি অবহেলিত থেকে যাওয়ায় তার ফলগুলি সেভাবে গ্রাম ও শহরের মধ্যে সমভাবে ছড়িয়ে পড়েনি।

কোন দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে গ্রাম-শহরের পারস্পরিক সম্পর্কের গুরুত্বটি অনুধাবন করতে গেলে আমাদের ফিরে দেখতে হবে উন্নয়নের পথ সম্পর্কিত বিভিন্ন তত্ত্বগুলিকে। উন্নয়নের দুটি সর্বাধিক প্রচলিত পদ্ধতি হল — এলাকা ভিত্তিক উন্নয়ন এবং ক্ষেত্রভিত্তিক উন্নয়ন। এলাকা ভিত্তিক উন্নয়নে সাধারণভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয় বিশেষ বিশেষ এলাকার উন্নয়নের উপর, যথা কলকাতা মেট্রোপলিটন অঞ্চল, আসানসোল-দুর্গাপুর এলাকা, সুন্দরবন অঞ্চল ইত্যাদি। এক্ষেত্রে সবসময়ই বেছে নেওয়া হয় বিশেষ বৈশিষ্টপূর্ণ এলাকা যথা- খরাপ্রবণ এলাকা, বিশেষ শহর এলাকা, উপকূল এলাকা, বন্যা প্রবণ এলাকা, পাহাড়ি এলাকা প্রভৃতি। বিশেষ বৈশিষ্টপূর্ণ এলাকা ছাড়া অন্য এলাকায় এ ধরনের উন্নতির কথা সাধারণভাবে ভাবা হয় না। আবার ক্ষেত্রভিত্তিক উন্নয়নে গুরুত্ব দেওয়া হয় আর্থসামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলিকে আলাদাভাবে যথা-গ্রামীণ উন্নয়ন, দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারি মানুষের উন্নয়ন, কৃষিকার্যের উন্নয়ন, খনিজ শিল্পের উন্নয়ন, পশুপালনের উন্নয়ন, পরিষেবার উন্নয়ন প্রভৃতি।

এই দুই ধরনের অর্থনৈতিক উন্নয়নেই কিন্তু উপেক্ষিত হয়েছে গ্রাম শহরের পারস্পরিক সম্পর্কটি যার ফল উন্নয়নকে ব্যাহত করেছে নানাভাবে। উন্নয়নের মূলে রয়েছে যোগসূত্র বা সংযোগসাধন যাকে বাদ দিয়ে বিছিন্নভাবে কোন এলাকার বা ক্ষেত্রের উন্নয়ন সম্ভব নয়। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি গ্রামের চাষীদের উন্নয়নে উৎসাহ (incentive) দেওয়ার সময় ভাবা হয়নি অতিরিক্ত উৎপন্ন শস্যের বাজারীকরণের (marketing) কথা। আউসগ্রাম ব্লকের দুর্গম সাঁওতালপল্লীর উন্নয়নে ছাগল বা শূকর চাষের প্রকল্প দেওয়া হয়েছে কিন্তু নিকটবর্তী বাস রাস্তা থেকে ৫ কিমি দূরে অবস্থিত গ্রামটিতে উৎপাদিত মাংস বিক্রি করার সুযোগ দেওয়ার কথা ভাবা হয়নি। এইভাবে আলাদা আলাদা ক্ষেত্র ভিত্তিক উন্নয়নের ফলাফল ভাল না হওয়ায় আজকের পরিকল্পনাবিদগণ উপলব্ধি করছেন গ্রাম -শহরের পারস্পরিক সম্পর্ক ও যোগসূত্রগুলির উন্নয়নের গুরুত্ব।

উন্নয়নের ফলাফল উপর থেকে চুঁইয়ে নীচে পৌছোবে (top-down approach) না নীচে থেকে ধাপে ধাপে উপরে উঠে আসবে (bottom-up approach) তা নিয়েও বিশেষজ্ঞদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে শহরকেন্দ্রিক সুবিধাগুলি ছোট বা মাঝারি সাইজের শহর বা উন্নয়ন কেন্দ্রের মাধ্যমে গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে দিতে পারলে তার প্রভাবে গ্রামীণ উন্নয়ন ঘটবে। আবার কেউ কেউ মনে করেন গ্রামীণ উন্নয়ন ভালভাবে

করতে পারলে সেই উন্নয়নের ফল কিছু কিছু জায়গায় কেন্দ্রীভূত হবে যেগুলিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে শহর।

উন্নয়নের ধারা উপর থেকে নীচে, অথবা নীচে থেকে উপরে যাই হোক না কেন, গ্রাম ও শহরকে যৌথভাবে ভাবতে হবে কারণ, একটিকে ছাড়া অন্যটির উন্নয়ন সম্ভব নয়। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে গ্রাম ও শহরের সম্পর্কের প্রকৃতি বিষয়ে আবার বিশেষজ্ঞদের মধ্যে দ্বিমত রয়েছে। একদলের মতে তৃতীয় বিশ্বের শহরগুলি হল দ্বীপের মত যেখানে উন্নয়নের ফলাফল কেন্দ্রীভূত হয়েছে কিন্তু তাদের চারপাশে গ্রামাঞ্চলের উন্নয়ন সেভাবে হয়নি এবং গ্রামের সাথে যোগসূত্রগুলিও সেভাবে গড়ে ওঠেনি। এই ধরনের শহরগুলিকে পরজীবি (parasitic) আখ্যা দেওয়া হয়। অন্য দলের বিশেষজ্ঞরা তাদের কাজের মধ্যে দিয়ে দেখিয়েছেন যে তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের (মূলত - আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা এবং এশিয়ার দেশগুলি) বিভিন্ন অঞ্চলের শহরগুলি উন্নয়নমুখি (developmental) কেন্দ্র হিসাবে কাজ করছে এবং চারপাশের গ্রামাঞ্চলের সাথে তাদের যোগসূত্রগুলি ভালভাবে গড়ে ওঠায় সেখানেও উন্নয়ন ঘটছে বেশ দ্রুত গতিতে।

এই তত্ত্বটির ভিত্তিতেই আমার অনুসন্ধান। এর উদ্দেশ্য ছিল বর্ধমান শহর গ্রামীণ অর্থনীতির উপর পরগাছা, নাকি চারপাশের গ্রামাঞ্চলের উন্নয়ন শহরের উন্নয়নের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ঘটছে। অর্থাৎ শহরের উন্নয়নের মূল্যে গ্রামাঞ্চল পিছিয়ে পড়ছে, অথবা ঘটনা এর উল্টো।

বর্ধমান শহরের চারপাশের গ্রামাঞ্চল হিসাবে আমি বেছে নিয়েছি এই অঞ্চলের ১১টি গ্রাম উন্নয়ন ব্লক —— বর্ধমান-১, বর্ধমান-২, মেমারি-১, মেমারি-২, জামালপুর, খণ্ডঘোষ, রায়না-১, ভাতার, গলসী-২, আউসগ্রাম-১ ও মন্তেশ্বর। এই ব্লকগুলির সম্মিলিত এলাকার ঠিক কেন্দ্রস্থলে রয়েছে বর্ধমান শহর। সেদিক থেকে বিবেচনা করে আমরা সমগ্র অঞ্চলটিকে বর্ধমান শহরের প্রভাবাধীন এলাকা (hinterland) বা বর্ধমান অঞ্চল বলতে পারি।

উন্নয়নের ইতিহাস

বর্ধমান জেলার কৃষি অর্থনীতির খ্যাতি ভারতবর্ষে মুঘল আমল থেকেই রয়েছে। একসময় 'বাংলার শস্যভাণ্ডার' বলতে লোকে বর্ধমান জেলাকেই বুঝত। মুঘল আমলে দামোদর নদী থেকে পুরনো সেচপদ্ধতির (overflow irrigation channels) সাহায্য নিয়ে এই জেলার কৃষি উন্নয়ন ঘটেছিল। পরবর্তীকালে ব্রিটিশ শাসনাধীন সময়ে এই জেলার কৃষিকার্য কিছুটা ব্যাহত হয়। কারণ ব্রিটিশরা নদীর পাড় বাঁধার যে প্রকল্প নিয়েছিল

সেগুলি এখানকার পুরোনো দিনের সেচ পদ্ধতি একেবারেই নষ্ট করে দেয়। অবশ্য ব্রিটিশরা কিছু নতুন সেচ প্রকল্প এই অঞ্চলে তৈরী করে যথা ইডেন খাল প্রকল্প, দামোদর খাল প্রকল্প। এই দুটি সেচ প্রকল্পের সাহায্যে বর্ধমান জেলার পূর্বাংশে কৃষি উন্নয়ন চলতে থাকে।

স্বাধীনতা উত্তরকালে 'দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন'(DVC) নামে দামোদর ও তার উপনদীগুলি নিয়ে গড়ে ওঠে একটি বহুমুখী নদী পরিকল্পনা। এই দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের খালগুলির মাধ্যমে এলাকায় কৃষিজমিতে সেচের সুবিধা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। ৬০- এর দশকে কৃষি উন্নয়নের মডেল হিসাবে (Integrated Agricultural District Programme) যে ১৬টি জেলা বেছে নেওয়া হয় তার মধ্যে বর্ধমান ছিল অন্যতম। এই প্রকল্পের নীতিগুলির রূপায়নের মধ্য দিয়ে শুরু হয় জেলার আধুনিক কৃষি উন্নয়ন। এই দশকেরই শেষের দিকে দেখা যায় সবুজ বিপ্লবের নীতিগুলির অনুসরণ; অর্থাৎ কৃষিতে ব্যাপকভাবে উন্নতমানের বীজ (HYV Seeds), রাসায়নিক সার, জলসেচ, কৃষি যন্ত্রপাতি এবং কীটনাশক ঔষধের ব্যবহার শুরু হয়। এর ফলেও কৃষিতে উৎপাদন বাড়তে শুরু করে।

পরিকল্পনাকালীন সময়ে দেশের ভূমিব্যবস্থার পরিবর্তন নিয়ে যে একগুচ্ছ বিল পাস হয় তার সার্থক রূপায়ন (implementation) পশ্চিমবঙ্গে শুরু হয় ৭০ এর দশকের শেষপ্রান্তে তথা ৮০র দশকের শুরুতে। পশ্চিমবঙ্গের ভূমিসংস্কার আন্দোলনে বর্ধমান জেলার কৃষক সম্প্রদায় হরেকৃষ্ণ কোঙারের মত নেতৃত্বের অধীনে যে ভূমিকা পালন করে তা পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে বিশেষভাবে অগ্রগণ্য। ফলাফল হিসাবে আমরা পাই ভূমিব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন - বর্গাদারের নাম নথিভুক্তিকরণ, বর্গাদার উচ্ছেদ বন্ধ, অতিরিক্ত ভূমির অধিগ্রহণ এবং ভূমিহীনদের মধ্যে তার বন্টন। ভূমিব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন এলাকার কৃষি উন্নয়নে যে নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে সে বিষয়ে বহু বিশেষজ্ঞ সহমত পোষণ করেছেন।

যে সমস্ত পরিবর্তনগুলি একসাথে এলাকার ব্যাপক কৃষি উন্নয়নে সহায়তা করেছে সেগুলি হল – দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের জল সেচ প্রকল্প, কৃষি পদ্ধতির আধুনিকীকরণ, ভূমিসংস্কার কর্মসূচীর সার্থক রূপায়ন এবং পঞ্চায়েত ব্যবস্থা বা গ্রামীণ স্বশাসনব্যবস্থা সুদৃঢ়করণ। উন্নত ও বহুফসলী কৃষি ব্যবস্থার মাধ্যমে একদিকে যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে শস্যের উৎপাদন অন্যদিকে তেমনি প্রসারিত হয়েছে গ্রামের দরিদ্র তথা শ্রমিক শ্রেণীর কাজের

সুযোগ। কৃষি উন্নয়নের সাথে তাল মিলিয়ে চলেছে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্য দূরীকরণের বহুসংখ্যক প্রকল্পের রূপায়ন। এর ফলে দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারী লোকজনদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটছে।

গ্রামাঞ্চলের উন্নয়নের পাশাপাশি আমরা বর্ধমান শহরের সমৃদ্ধিকে মেলাতে গিয়ে দেখতে পাই এই দুই-এর মধ্যে সংযোগ রয়েছে। অর্থাৎ গ্রামাঞ্চলের উন্নতির সঙ্গে তাল রেখেই শহরের সমৃদ্ধি বেড়েছে একটু একটু করে। মুঘল আমলে দামোদর নদীর জলপথকে কাজে লাগিয়ে বর্ধমান শহর একটি বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে গড়ে ওঠে। তখন শহরটির কেন্দ্র ছিল দামোদর নদীর তীরে অবস্থিত কাঞ্চননগর এলাকা। বর্ধমান রাজপরিবারের প্রশাসনিক ও আবাসন কেন্দ্র এই শহরে গড়ে ওঠার সুবাদে শহরটির সমৃদ্ধি বাড়তে শুরু করে। মিউনিসিপ্যাল শহর হিসাবে বর্ধমান আত্মপ্রকাশ করে ১৮৬৫ সালে। আধুনিককালে বর্ধমান শহরের বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে চারপাশের গ্রামাঞ্চলের উন্নতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে। কৃষিতে উন্নতির ফলে যে উদ্বৃত্ত উপার্জন সৃষ্টি হয়েছে তার বেশ কিছু অংশ নিয়োজিত হয়েছে বর্ধমান শহরের অর্থনৈতিক কাজকর্মের প্রসারে আর বাকি অংশ জমা হয়েছে বর্ধিষ্ণু গ্রাম ও গঞ্জ (rural market centre) গুলিতে। গ্রামাঞ্চলে ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় শহরে গড়ে উঠেছে অনেক চালকল (rice mill) ও চাল ব্যবসার কেন্দ্র যেগুলি আবার সহায়তা করেছে গ্রামাঞ্চলে উদ্বৃত্ত উৎপাদন বিক্রয়ের কাজে। ফলে উন্নয়ন ঘটছে দ্বিমুখী উপায়ে যা শহর এবং গ্রাম উভয়কেই প্রভাবিত করছে সমানভাবে।

বড় গ্রাম ও গঞ্জ

কৃষিকার্যের উন্নয়ন তথা গ্রামাঞ্চলের উন্নয়নের ফলাফল হিসাবে এই এলাকায় দেখা যায় বর্ধিষ্ণু গ্রাম তথা গঞ্জের দ্রুতহারে বৃদ্ধি। ১৯৭১ সালে আলোচ্য অঞ্চলটিতে বড় গ্রামের সংখ্যা ছিল ৮টি যার সংখ্যা ১৯৯১ সালে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৩২টি। বর্ধিষ্ণু গ্রাম বলতে আমি বোঝাতে চেয়েছি সেইসব গ্রামগুলিকে যাদের জনসংখ্যা ১৯৯১ সালের সেনসাস অনুযায়ী ৫০০০ জনের বেশী, কারণ এই পরিমাণ জনসংখ্যা থাকলে ভারতবর্ষের কোন জনবসতিকে শহর হিসাবে গণ্য করা যায় যদি অবশ্য শহরের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি সেখানে দেখা যায়। বর্ধিষ্ণু গ্রামগুলির সমৃদ্ধির পিছনে একদিকে যেমন রয়েছে গ্রামীণ অর্থনীতির প্রসার তেমনই অন্যদিকে রয়েছে আর্থসামাজিক পরিষেবাগুলির কেন্দ্রীভবন। সামাজিক উন্নয়নের মাপকাঠিগুলির (সাক্ষরতার হার, নারী সাক্ষরতার হার, পুরুষ-নারীর অনুপাত প্রভৃতি) বিচারে বর্ধমান শহরের সঙ্গে এই গ্রামগুলির বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না। পরিষেবামূলক ব্যবস্থা— স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, বাজার, ব্যাঙ্ক, টেলিফোন কেন্দ্র, সমবায় সমিতি, হিমঘর প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা এবং রাস্তাঘাট, সেচব্যবস্থা,

বৈদ্যুতীকরণ প্রভৃতির উন্নতি ও প্রসার বর্ধিষ্ণু গ্রামগুলির দ্রুত বৃদ্ধি তথা সমৃদ্ধিতে ব্যাপক সহায়তা করেছে।

ব্লক		বড় গ্রাম
১।	বর্ধমান-১	রায়ান, নাড়ী, কুড়মুন
২।	বর্ধমান-২	শক্তিগড়
৩।	মেমারী-১	চাঁচাই, পাল্লা
৪।	মেমারী-২	মণ্ডলগ্রাম, সাতগাছিয়া, বোহার, বড়পলাশন
৫।	জামালপুর	জৌগ্রাম, কুলিনগ্রাম, সুরা, আঝাপুর, রূপপুর
৬।	খণ্ডঘোষ	কামালপুর, খণ্ডঘোষ, বেড়ুগ্রাম
৭।	ভাতার	ওড়গ্রাম, এরুয়ার, নাসিগ্রাম, বনপাশ, বামসোর, বড়বেলুন, বলগোনা
৮।	রায়না-১	সেহারাবাজার
৯।	গলসী-২	সাঁকো, গলসী, সাটিনন্দী
১০।	আউসগ্রাম-১	দিগনগর
১১।	মন্তেশ্বর	মন্তেশ্বর, কুসুমগ্রাম

এলাকার বর্ধিষ্ণু গ্রামাঞ্চলগুলির মধ্যে আবার যে সমস্তগুলি একাধিক রাস্তাঘাটের সংযোগস্থলে অবস্থিত সেগুলিতে গড়ে উঠেছে গ্রামীণ বাজার বা গঞ্জ। এইরকম বাজার বা গঞ্জগুলি হল –শক্তিগড়, গলসী, সাতগাছিয়া, মন্তেশ্বর, কুসুমগ্রাম, বনপাশ, সেহারাবাজার, খণ্ডঘোষ, ভাতার, রায়না, সুড়া, জামালপুর ও শ্যামসুন্দর। এই সমস্ত গঞ্জগুলির মধ্যে কর্মরত জনসংখ্যার ১০ শতাংশ ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত কাজকর্মে নিয়োজিত। নানা ধরনের শহুরে পরিষেবা ও সুযোগ সুবিধা এই গঞ্জগুলিতে পাওয়া যায় যার ভূমিকা এলাকার গ্রামীণ উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ। গঞ্জগুলি সাধারণভাবে গড়ে উঠেছে সেইসব স্থানে যেখানে যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা তুলনামুলকভাবে উন্নত। একাধিক রাস্তার সংযোগস্থলে গড়ে ওঠা গঞ্জগুলি একদিকে চারপাশের গ্রামাঞ্চল এবং অন্যদিকে বর্ধমান শহরের সাথে ভালভাবে রাস্তাঘাট দ্বারা যুক্ত। অর্থাৎ এই গঞ্জগুলি বর্ধমান শহরের ছোট ছোট শাখা বা উপগ্রহ কেন্দ্রের মত গড়ে উঠেছে যার প্রভাব এলাকার গ্রামীণ উন্নয়নে খুব বেশী। নগরায়নের বিস্তার ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে এই গঞ্জগুলির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

উপযুক্ত পরিষেবার উন্নয়ন এই গঞ্জগুলিতে ঘটাতে পারলে গ্রাম থেকে শহরের মধ্যবর্তী শ্রেণীর স্থানান্তর আটকানো যেতে পারে যা বর্ধমান শহরের ভবিষ্যত পরিকল্পনার জন্য অত্যন্ত জরুরী। যদি এই গঞ্জগুলির উন্নয়নে এখনই গুরুত্ব না দেওয়া হয় তাহলে একদিন বর্ধমান শহর একটি কলকাতা বা হাওড়ার মত কংক্রীটের জঙ্গলে পরিণত হবে যার ব্যবস্থাপনা হয়ে পড়বে অত্যন্ত দুরূহ।

গ্রাম-শহরের যোগসূত্র

শহর ও গ্রামাঞ্চলের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণে বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন ধরনের যোগসূত্রের কথা বলেছেন যথা - মানুষের চলাচল, পণ্যদ্রব্যের চলাচল, মূলধনের চলাচল, প্রযুক্তির চলাচল, তথ্যের চলাচল, ধারণার চলাচল, প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের চলাচল প্রভৃতি। আলোচ্য সমীক্ষার ক্ষেত্রে বর্ধমান শহর ও তার চারপাশের গ্রামাঞ্চলের মধ্যে যে সমস্ত যোগসূত্র লক্ষ্য করা গেছে সেগুলি হল নিম্নরূপ —

গ্রাম শহরের পারস্পরিক সংযোগ সাধনকারী যোগসূত্র

যোগসূত্রের শ্রেণী	উপাদান
ক) প্রাকৃতিক যোগসূত্র	রাস্তার জালিকা, নদী ও জলপথ জালিকা, রেলপথ জালিকা
খ) অর্থনৈতিক যোগসূত্র	বাজারের নকশা, কাঁচামাল ও মধ্যবর্তী পণ্যের প্রবাহ, ভোগ ও কেনাকাটার ধরন (consumption and shopping pattern), মূলধন ও আয়ের প্রবাহ।
গ) জনসংখ্যার চলনশীলতা যোগসূত্র	সাময়িক ও স্থায়ী স্থানান্তর, কাজের জায়গায় যাতায়াত।
ঘ) প্রযুক্তিগত যোগসূত্র	টেলিযোগাযোগ প্রণালী।
ঙ) সামাজিক আদান প্রদান যোগসূত্র	পারস্পরিক দেখাশোনা(Visiting pattern)।
চ) পরিষেবামূলক যোগসূত্র	ঋণ ও অন্যান্য আর্থিক জালিকা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ জালিকা, স্বাস্থ্য পরিষেবা জালিকা
ছ) রাজনৈতিক, প্রশাসনিক সংগঠনগত যোগসূত্র	রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত শৃঙ্খল, প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত শৃঙ্খল।

ক. *প্রাকৃতিক যোগসূত্র*

কোন অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার বিভিন্ন মাধ্যমগুলি সম্মিলিতভাবে যে জালিকা (Network) তৈরী করে তাকেই আমরা ঐ অঞ্চলের প্রাকৃতিক যোগসূত্র বলতে পারি। অন্যভাবে, সাধারণভাবে বলা যায় যে প্রাকৃতিক যোগসূত্র হল কোন অঞ্চলের সড়কপথ, রেলপথ, জলপথ, বিমানপথ প্রভৃতির সম্মিলিত ব্যবস্থা। অন্যান্য যোগসূত্রগুলি যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে বলেই গ্রাম - শহরের পারস্পরিক

যোগসূত্রগুলির মধ্যে প্রাকৃতিক যোগসূত্রের গুরুত্ব সর্বাধিক।

প্রাকৃতিক যোগসূত্রের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে আমাদের নির্দিষ্ট এলাকাতে দেখতে পেয়েছি তিন ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থা - সড়কপথ, রেলপথ ও নদীপথ। এই তিন ধরনের প্রাকৃতিক যোগসূত্রের মধ্যে আবার পরিষেবা বিস্তৃতির (জনসংখ্যা ও এলাকা উভয়ক্ষেত্রেই) দিক দিয়ে সড়ক পরিবহন বিশেষতঃ বাস পরিষেবার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী।

সড়ক পরিবহন

সমতল ভূ-প্রকৃতি, অধিক জনসংখ্যার ঘনত্ব, কৃষিক্ষেত্রের উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বর্ধমান জেলায় গড়ে উঠেছে একটি তুলনামূলকভাবে উন্নত সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা। বর্ধমান জেলার সড়কপথের ঘনত্ব হল প্রতি ১০০ বর্গ কিমিতে ৩৬.২১ কিমি.। প্রতি লক্ষ জনসংখ্যা পিছু সড়কপথের দৈর্ঘ্য হল ৪২ কি.মি. যা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের গড় অবস্থার (২৫.৫১ কি.মি.) থেকে অনেক বেশী। জেলার সড়ক পথ জালিকাটি তৈরী হয়েছে একটি জাতীয় সড়কপথ (জি.টি.রোড), পাঁচটি রাজ্য সড়ক পথ(SH 5,6,7,8,9), অসংখ্য জেলা সড়ক পথ এবং অগণিত গ্রাম্য সড়কপথ নিয়ে।

বর্ধমান অঞ্চলে যে সড়ক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তার কেন্দ্রস্থলে রয়েছে বর্ধমান শহর। প্রায় মধ্যভাগ দিয়ে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত জি.টি.রোড হল এলাকাটির প্রধান সড়কপথ যা সমগ্র অঞ্চলটিকে পশ্চিমে দূর্গাপুর-আসানসোল শিল্পাঞ্চল এবং দক্ষিণপূর্বে কোলকাতা শিল্পাঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত করেছে। ৮ নং রাজ্য সড়কপথ বর্ধমান শহর থেকে উত্তরে অজয় নদী পার হয়ে বীরভূম জেলার সঙ্গে সংযোগ সাধন করেছে। অন্যদিকের অঞ্চলটি দক্ষিণে হুগলী জেলার সাথে যুক্ত হয়েছে ৭ নং জাতীয় সড়কপথ দ্বারা। এলাকার প্রধান জেলা সড়ক পথগুলি হল বর্ধমান-কাটোয়া রোড, বর্ধমান-কালনা রোড, বর্ধমান-নাদনঘাট রোড, বর্ধমান-গুসকরা বা সিউড়ী রোড, বর্ধমান-কারালাঘাট রোড, বর্ধমান - আরামবাগ রোড এবং বর্ধমান-বাঁকুড়া রোড। প্রতিটি জেলা সড়কপথই বর্ধমান শহরকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দিকে প্রসারিত হয়েছে। রাজ্য ও প্রধান জেলা সড়ক পথগুলির মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থিত গ্রামগুলিকে যুক্ত করেছে অসংখ্য জেলা ও গ্রাম সড়কপথ। সব ধরনের সড়ক পথগুলি মিলে বর্ধমান শহর ও তার চারপাশের গ্রামাঞ্চলে যে প্রাকৃতিক যোগসূত্র তৈরী করেছে তা অঞ্চলটির অন্যান্য যোগসূত্রগুলি গড়ে উঠতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। অঞ্চলটির বাস পরিবহন ব্যবস্থা প্রধানত বেসরকারী বাস পরিবহনকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। তবে বেশী দূরত্বের বাস পরিবহনের ক্ষেত্রে দক্ষিণবঙ্গ বাস পরিবহন সংস্থারও ভূমিকা আছে। অঞ্চলটিতে বেসরকারী বাস পরিবহনের অধীনে রয়েছে ৬৩০ টি বাস, যেগুলি চলাচল করে ২২০ টি রুটে। বিভিন্ন সেকশনে (Section) বেসরকারী ও সরকারী বাস চলাচলের হিসাব নীচের টেবিলগুলিতে দেওয়া হল ঃ

সারণী - ১

বেসরকারী বাস পরিবহন, ১৯৯৮

বিভাগ (section)	রুটের সংখ্যা	বাসের সংখ্যা
কাটোয়া	৩৮	৮৯
কাটোয়া সংলগ্ন (allied)	৮	১৭
নাদনঘাট	২৭	৫৯
গুসকরা	২৪	৫৩
কালনা	২৩	৫৩
ট্রান্স দামোদর	২৯	১০৫
পূর্ব জি.টি.রোড	৪৯	১৫৪
পশ্চিম জি.টি.রোড	২২	৭৩

Source : Regional Transport office, Burdwan.

সারণী- ২

দক্ষিণবঙ্গ বাস পরিবহন, ১৯৯৮

ডিপো	রুটের সংখ্যা	বাসের সংখ্যা
বর্ধমান	১১	১৬
কালনা	৪	৬
আরামবাগ	৩	৪
দুর্গাপুর	৬	১৪
আসানসোল	৪	৭
বাঁকুড়া	২	৩
পুরুলিয়া	৩	৪

Source : South Bengal State Transport Head Office, Burdwan.

সমস্ত বাস রুটগুলিই বর্ধমান শহরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এর কারণ হিসাবে অবশ্যই অঞ্চলটির ভৌগোলিক কেন্দ্রে বর্ধমান শহরের অবস্থান, জেলাশহর হিসাবে বর্ধমানের প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক কার্যাবলী এবং বহুদিনের নাগরিক ইতিহাসের (long tradition of urban history) কথা উল্লেখ করা যায়।

সড়ক পরিবহনের নবতম সংযোজন হল টাউন বাস পরিষেবা। এই এলাকায় টাউন বাস বলতে আবার দু'ধরনের পরিষেবাকে বোঝায়। এক ধরনের টাউন বাস শহরের সীমানার মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন স্থানের মধ্যে চলাচল করে। আর এক ধরনের টাউন বাস রয়েছে যেগুলি বর্ধমান শহরকে চারপাশের গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে। প্রচলিত বাস পরিবহন ব্যবস্থায় ক্রমবর্ধমান চাহিদার সাথে কৃষি উন্নয়ন তথা গ্রামাঞ্চলের উন্নয়নের সাথে যে গ্রাম-শহরের সংযুক্তিকরণের চাহিদা বৃদ্ধি পায় তার সাথে প্রচলিত বাস পরিবহন ব্যবস্থা তাল রাখতে না পারার জন্যই ৯০-এর দশকের প্রথমে গড়ে ওঠে এই নতুন ধরনের টাউন বাস ব্যবস্থা।

প্রথম দিকে টাউন বাস রুটগুলি ছিল স্বল্প দূরত্বের তবে সময় ও ক্রমবর্ধমান চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই বাসগুলির রুটের দৈর্ঘ্য এবং সংখ্যা দুই-ই বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে বর্ধমান শহরকে চারপাশের গ্রামাঞ্চলের সাথে যুক্ত করার জন্য রয়েছে ৪১ টি টাউন বাস যেগুলি ২৪ টি রুটে চলাচল করে। রুটগুলির দৈর্ঘ্য ১১ কিমি. থেকে শুরু করে ৩৫ কিমি. পর্যন্ত বিস্তৃত।

সারণী - ৩

টাউন বাস পরিবহন

রুটের নাম	রাস্তার দৈর্ঘ্য(কিমি)	বাসের সংখ্যা	ট্রিপের সংখ্যা
বর্ধমান - শাঁকারী	১৮	২	৮ + ৮
বর্ধমান - কুমিরকোলা	২৪	২	৬ + ৬
বর্ধমান - খড়গ্রাম	২১	২	৮ + ৮
বর্ধমান - সরঙ্গা	২১	১	৪ + ৪
বর্ধমান - জয়কৃষ্ণপুর	২০	১	৪ + ৪
বর্ধমান - জুজুটি	২৪	১	৪ + ৪
বর্ধমান - দাদপুর	২২	১	৪ + ৪
বর্ধমান - শিকারপুর	৩১	২	৬ + ৬
বর্ধমান - বাহিরঘন্যা	৩৩	২	৬ + ৬
বর্ধমান - শাঁকড়াই	১৯	১	৪ + ৪
বর্ধমান - চান্না	২১	১	৪ + ৪
বর্ধমান - এরুয়ার	৩২	২	৬ + ৬
বর্ধমান - ভোতা	২৭	২	৬ + ৬
বর্ধমান - কুরকুবা	২৫	১	৩ + ৩
বর্ধমান - আমারুণ	২৩	২	৮ + ৮
বর্ধমান - গুনুড়	২৩	১	৪ + ৪

বর্ধমান - কুড়মুন	১৭	২	৮ + ৮
বর্ধমান - বিজুর	৩৫	১	২ + ২
বর্ধমান - সুকুর	১৪	১	৫ + ৫
বর্ধমান - বলগনা	১৫	১	৫ + ৫
বর্ধমান - জামাড়	১২	২	১০ + ১০
বর্ধমান - কোড়াড়	১৩	২	১০ + ১০
বর্ধমান - সিমডাল	১৮	২	১০ + ১০
বর্ধমান - পিলকুড়ি	২০	১	৪ + ৪
বর্ধমান - গাংপুর	১৩	১	৬ + ৬
বর্ধমান - রায়ান	১১	২	১২ + ১২
বর্ধমান - পালিতপুর	১১	১	৯ + ৯
বর্ধমান - বর্ধমান	২৯	১	৫ + ৫
বর্ধমান - বেলকাশ			

Source : Regional Transport office, Burdwan.

গত কয়েক বছরে টাউন বাস সার্ভিস নেটওয়ার্কটি উন্নত হয়েছে - একদিকে যেমন বেড়েছে বাসের সংখ্যা ও রুটের দৈর্ঘ্য তেমনই আবার বেড়েছে নতুন রুটের সংখ্যা তথা রুটের ঘনত্ব। এই টাউন বাসগুলি গ্রাম-শহরের পারস্পরিক দূরত্ব সরিয়ে সম্পর্কটিকে সুদৃঢ় করতে ব্যাপকভাবে সাহায্য করেছে। গ্রামের অধিবাসীরা তাদের উৎপাদিত পণ্যের (সব্জি, দুধ, ছানা, মাছ প্রভৃতি) বাজার হিসাবে বর্ধমান শহরকে ব্যবহার করার জন্যই এই বাসগুলির সুবিধা পাচ্ছে। ভোর বা সকালের দিকে বর্ধমান শহর অভিমুখে যেসব টাউন বাসগুলি আসে তাদের অধিকাংশই যাত্রী অপেক্ষা পণ্যের পরিমাণ থাকে বেশী। ফলে গ্রাম ও শহরের বাজারের সংযুক্তিকরণের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়েছে। এই ধরনের বাস পরিষেবা তুলনামূলকভাবে বর্ধমান শহরের উন্নত পরিষেবার (চিকিৎসা, শিক্ষা, বিনোদন প্রভৃতি) সুযোগ গ্রহণ করার সুবিধাও গ্রামের অধিবাসীদের প্রদান করেছে। বর্ধমান শহর থেকে গ্রামে পণ্যদ্রব্য নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রেও এই বাসগুলির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তবে ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, ২৮ টি টাউন বাস রুটের মধ্যে ২৪ টি রুটই উত্তর-দামোদর তথা দামোদরের বামতীরবর্তী এলাকার মধ্যে বিস্তৃত। দক্ষিণ দামোদরের গ্রামগুলিকে বর্ধমান শহরের সাথে সংযুক্ত করার কাজে এখনও পর্যন্ত টাউনবাসগুলির ভূমিকা খুবই সীমিত। এই তথ্যটি উত্তর দামোদর ও দক্ষিণ দামোদরের প্রচলিত বৈষম্যের তত্ত্বটিকে support করে। প্রাকৃতিক দূরত্ব সৃষ্টিতে দামোদর নদীর কিছু ভূমিকা থাকলেও দক্ষিণ দামোদর এলাকার উন্নয়নের অবহেলায় বর্ধমান অঞ্চলের মানুষের ভূমিকাও কিছু কম নয়। নদীর দুই তীরের ইতিহাসের অসাম্য দূর করার চেষ্টায় আরও বেশী বেশী টাউন

বাসরুট দক্ষিণ দামোদরের বিভিন্ন জায়গাকে বর্ধমান শহরের সাথে যুক্ত করার জন্য গড়ে তোলা দরকার।

এ ছাড়াও বিগত কয়েক দশকে শহর এবং গ্রামগুলিতে প্রচুর সংখ্যায় টু-হুইলারের আমদানী হওয়ায় গ্রাম ও শহরের মধ্যে দূরত্ব কমিয়ে এনেছে।

রেল পরিবহন

সড়ক পরিবহনের পাশাপাশি রেল পরিবহনও এলাকার গ্রাম শহরের সংযুক্তি সাধনের কাজে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। তবে মোট পরিষেবাধীন এলাকার আয়তনের তুলনাতে রেল পরিবহনের থেকে বাস পরিবহনের গুরুত্ব অঞ্চলটিতে অনেক বেশী। পশ্চিমে আসানসোল-দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল এবং দক্ষিণ-পূর্বে কলকাতা শিল্পাঞ্চলের সাথে বর্ধমান শহর তথা চারপাশের গ্রামাঞ্চলের সংযোগ সাধনে রেলপথের গুরুত্ব অপরিসীম। বর্ধমান ও চারপাশের গ্রামাঞ্চল থেকে বহু সংখ্যক নিত্য যাত্রী রেলপথের সাহায্যে এই দুই শিল্পাঞ্চলে যাতায়াত করেন। লোকাল ট্রেনের নেটওয়ার্কটি আবার বর্ধমান শহরকে বিভিন্ন দিকের গ্রামগুলির সাথে যুক্ত করেছে।

এলাকার প্রধান রেলপথগুলি হল - বর্ধমান-হাওড়া(কর্ড ও মেইন), বর্ধমান-আসানসোল, বর্ধমান-বোলপুর রেলপথ। এছাড়াও দুটো ন্যারোগেজ রেলপথ অঞ্চলটির মধ্য দিয়ে প্রসারিত হয়েছে। বর্ধমান-কাটোয়া ন্যারোগেজ রেলপথটি ভাতার ব্লকের বিভিন্ন গ্রামকে একদিকে কাটোয়া আর অন্যদিকে বর্ধমান শহরের সাথে যুক্ত করেছে। খণ্ডঘোষ ব্লক ও রায়না - ১নং ব্লকের মধ্যে দিয়ে প্রসারিত হয়েছে, আর একটি ন্যারোগেজ রেলপথ (বর্তমানে বন্ধ রয়েছে) যেটি অঞ্চলটিকে বাঁকুড়া শহরের সাথে যুক্ত করেছে। বর্ধমান অঞ্চলের বিভিন্ন রেলপথগুলি যাত্রী পরিবহনের পাশাপাশি পণ্য পরিবহনেও, বিশেষ করে গ্রামে উৎপাদিত পণ্য শহরে আনার কাজে, গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

নদী পরিবহন

ভারতবর্ষে মুঘল শাসকের সময় পর্যন্ত দামোদর নদী জলপথ হিসাবে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। ব্রিটিশ আমলে রেলপথের বিস্তার ও পরবর্তী পর্যায়ে সড়কপথের প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে এই জলপথের গুরুত্ব বিশেষভাবে হ্রাস পায়। বর্তমান সময়ে যেখানে সেতু নেই, কেবলমাত্র সেইসব জায়গাতেই পারাপারের জন্য দামোদরের জলপথটি ব্যবহৃত হয়।

বর্ধমান ও তার চারপাশের অঞ্চলে কেবলমাত্র একটি সেতু রয়েছে। এই সেতুটি (কৃষক সেতু) তৈরী হয়েছে বর্ধমান শহরের সাথে দক্ষিণ দামোদর এলাকায় অবস্থিত রায়না, খণ্ডঘোষ থানা তথা হুগলী জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে বর্ধমান শহরের সাথে যুক্ত করার

জন্য। এই একটি সেতু সমগ্র অঞ্চলের সংযোগ সাধনে একেবারেই পর্যাপ্ত নয়। তবে সম্প্রতি আর একটি সেতু জামালপুর ও রায়না ব্লকের মধ্যে অবস্থিত দামোদরের উপর তৈরী হওয়ার কাজ শুরু হয়েছে যেটি এলাকার যোগাযোগের সুযোগ সুবিধা অনেকখানি বৃদ্ধি করতে সক্ষম হবে।

খ. *অর্থনৈতিক যোগসূত্র*

অর্থনৈতিক যোগসূত্রগুলিই সাধারণভাবে গ্রাম ও শহরের অর্থনীতির মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে একটি সুসংহত কার্যকরী অঞ্চল তৈরী করে। কোন অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়ন আজকের দিনে আর বিচ্ছিন্নভাবে ঘটতে পারে না। বাজারের সংযুক্তিকরণ হল অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল কথা। গ্রামের উৎপন্ন দ্রব্য শহরের বাজারে বিক্রি এবং শহরের উৎপন্ন ও বিক্রীত দ্রব্যের গ্রামে সরবরাহের মধ্যে দিয়েই গড়ে ওঠে গ্রাম-শহরের অর্থনৈতিক সংযুক্তিকরণ। এই এলাকার প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক যোগসূত্রগুলি হল নিম্নরূপ ঃ

বাজারের প্রকৃতি

কৃষিকার্যের বাণিজ্যিকীকরণ, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের প্রসার এবং দৈশিক পারস্পরিক আদানপ্রদানের বিস্তার প্রভৃতি সাধারণভাবে গড়ে ওঠে বাজারের প্রসারণকে কেন্দ্র করে। ছোট গ্রাম থেকে শুরু করে বড় শহর পর্যন্ত বাজারের সংযুক্তিকরণ ঘটলে উৎপাদকের, বিশেষতঃ গ্রামের কৃষকের বিশেষ লাভ হয়। কারণ তারা উৎপাদিত দ্রব্যের জন্য সঠিক দাম আদায় করতে পারে। বাজারের যোগসূত্র স্থাপিত হলে কোন অঞ্চলে শিল্প বাণিজ্য এবং পরিষেবামূলক কাজকর্মের প্রসার ঘটে। বাজারের সংযুক্তিকরণ আবার প্রাকৃতিক যোগসূত্রগুলির উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে।

অসংখ্য হাট, গ্রামের বাজার, বাজার শহর প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে বর্ধমান অঞ্চলে যে বাজার পদ্ধতি গড়ে উঠেছে তা গ্রাম-শহরের অর্থনৈতিক মেলবন্ধনে বিশেষভাবে সাহায্য করছে। বাজারের যোগসূত্রগুলি আবার গড়ে উঠেছে অঞ্চলের কৃষি উন্নতিকে কেন্দ্র করে। একদিকে যেমন কৃষিকার্যের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, উন্নত বীজ, সার প্রভৃতির চাহিদা মেটাতে চারপাশের গ্রামাঞ্চলের মানুষ বর্ধমান শহরের বাজারকে ব্যবহার করে কৃষিকার্যের উন্নয়ন করছে, তেমনি গ্রামের অধিবাসীদের আয় বৃদ্ধি করে তাদের ভোগ্যপণ্য ব্যবহারের পরিমাণ বৃদ্ধি করেছে। ফলে ভোগ্যপণ্য সরবরাহের জন্যও গড়ে উঠেছে গ্রাম ও শহরের বাজারের সংযুক্তিকরণ। বাজারের সংযুক্তিকরণ ঘটার ফলে গ্রামের কৃষকরা বর্ধমান শহরের সমান মূল্যে গ্রামের হাট বা বাজারেই তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করতে পারেন।

কাঁচামাল ও ভোগ্যপণ্যের সরবরাহ

গ্রাম ও শহর এলাকার মধ্যে কাঁচামাল ও ভোগ্যপণ্যের সরবরাহের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে গ্রাম-শহরের অর্থনৈতিক যোগসূত্র। বর্ধমান অঞ্চলে প্রধান কৃষিজ দ্রব্য হল ধান। চারপাশের গ্রামাঞ্চলের উৎপাদিত ধান বর্ধমান শহরের চালকলগুলিতে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তবে বড় চালকলগুলির পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত অনেক ছোট ছোট ব্যবসায়ী গ্রামেই চাল উৎপাদন করে তা সরাসরি বর্ধমান শহরের বাজারে বিক্রি করেন।

ধান বা চালের পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলে উৎপাদিত শাকসব্জি, মাছ-মাংস এবং দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য প্রভৃতির বাজারও বর্ধমান শহরের উন্নত যাতায়াত ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। সকালের দিকে যেসব বাস বিশেষত টাউন বাস বর্ধমান শহরের দিকে আসে সেগুলি প্রায়শই দেখা যায় শাকসব্জি বোঝাই হয়ে আসতে। আবার বিকালের দিকের বর্ধমানমুখী বাসগুলিতে ছানার সরবরাহ প্রতিনিয়ত লক্ষ্য করা যায়। সকালের দিকে গ্রাম থেকে দুধ নিয়ে এসে শহরের বাড়ি বাড়ি দুপুর পর্যন্ত সরবরাহ করা গ্রামের গোয়ালাদের একাংশের বড় জীবিকা। শাকসব্জি, ছানা, দুধ সরবরাহকারী গ্রামবাসীদের খালি ঝুড়ি ও বালতি ভর্ত্তি হয়ে গ্রামে যায় বর্ধমান শহরের বাজারের বিভিন্ন ভোগ্যপণ্য। এই ধরনের (নিত্যযাত্রী) সরাসরি ক্রেতা ছাড়া গ্রামের অন্যান্য অধিবাসীদের ভোগ্যপণ্য সাধারণভাবে বাজার সরবরাহের পদ্ধতিতেই গ্রামের বাজারে পৌঁছায়।

ক্রয়বিক্রয়ের ধরন

বিভিন্ন ধরনের কেনাকাটার পদ্ধতির মধ্য দিয়েও গড়ে ওঠে গ্রাম-শহরের মেলবন্ধন। সাধারণভাবে গ্রামের উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী কখনও সরাসরি উৎপাদক মারফৎ এবং কখনও ব্যবসায়ী মারফৎ বর্ধমান শহরে বিক্রয়ের জন্য এসে পৌঁছায়। অন্যদিকে আবার শহরের বাজারের বিক্রিত দ্রব্যসামগ্রী কখনও সরাসরি গ্রামের ক্রেতা ক্রয় করেন। আবার কখনও বাজারের মাধ্যমে তা গ্রামের ক্রেতার হাতে পৌঁছে যায়। গ্রাম শহরের যোগসূত্র স্থাপনে এক্ষেত্রে সরাসরি ক্রেতা বা বিক্রেতার ভূমিকা অনেক বেশী। তবে সরাসরি ক্রয় বা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মানুষের চলাচল সাধারণভাবে একমুখী অর্থাৎ গ্রাম থেকে শহরের দিকে।

বাস পরিবহন ব্যবস্থার প্রসারকে কেন্দ্র করে বর্ধমান শহরে গ্রামের অধিবাসীদের সরাসরি ক্রয়ের সুযোগ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন শুধু পুরুষই নয়, গ্রামের অসংখ্য মহিলাও শহরে এসে সরাসরি ভোগ্যপণ্য ক্রয় করে নিয়ে যান। ভোগ্যপণ্যের দামের খুব বেশী তফাৎ নেই গ্রাম ও শহরের মধ্যে তা আমরা আগেই দেখেছি। তাই শহরে এসে সরাসরি ক্রয় করার অন্যতম কারণ হল 'চয়েস'। শহরের বাজারে যে কোন পণ্যের ভ্যারাইটি অনেক বেশী যার মধ্য থেকে গ্রামের ক্রেতারা নির্বাচন করে নিতে পারেন। তবে একথা বলা যায় যে সরাসরি ক্রয়ের মাধ্যমেও গ্রামের মানুষের সাথে শহরের যোগাযোগ অনেক বেড়েছে।

মূলধন ও আয়ের প্রবাহ

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বিশেষ করে ৭০-র দশকের কৃষি উন্নয়নের আগে পর্যন্ত বর্ধমান অঞ্চলের মূলধন সীমাবদ্ধ ছিল মূলত বর্ধমান শহরবাসী ধনী সম্প্রদায়ের হাতে। শহরের এইসব মূলধনী সম্প্রদায় ছিল হয় রাজকর্মচারী অথবা ব্যবসায়ী। কিছু সংখ্যক জমিদারও শহরে মূলধন বিনিয়োগ করতেন। পরবর্তী পর্যায়ে যখন গ্রামাঞ্চলে কৃষি উন্নয়ন শুরু হল তখন গ্রামেও এক শ্রেণীর মূলধনী সম্প্রদায় গড়ে উঠল। এইসব ধনী কৃষক পরিবারের সঞ্চিত উপার্জন কখনও ব্যবহৃত হল গ্রামাঞ্চলে চালকল বা ব্যবসা বাণিজ্য তৈরী করার কাজে আবার কখনও শহরের বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক কাজকর্মের প্রসারে। অন্যদিকে আবার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে শহরের মূলধনী সম্প্রদায় আবার গ্রামাঞ্চলে অর্থনৈতিক কাজকর্মের প্রসারে টাকা বিনিয়োগ করতে শুরু করেছে। এইভাবে মূলধনের সঞ্চারমানতা গ্রাম ও শহরের মধ্যে যোগসূত্র তৈরী করতে সাহায্য করছে।

আয়ের ক্ষেত্রেও গ্রাম ও শহরের মধ্যে পারস্পরিক প্রবাহ লক্ষ্য করা যায়। বর্ধমান শহরে ও গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী লোকজনদের মধ্যে সাধারণভাবে দুই ধরনের আয়ের শ্রেণী দেখা যায়। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে একটি শ্রেণীর আয় বসবাসকারী অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ থাকে। অর্থাৎ শহরের লোক শহরেই উপার্জন করে এবং গ্রামের লোক গ্রামে। এদের আয়ের ক্ষেত্রে গ্রাম ও শহরের মধ্যে কোন প্রবাহ দেখা যায় না। কিন্তু অপর শ্রেণীর লোকজনদের আয়ের উৎস এবং বসবাসের স্থান আলাদা জায়গায়, অর্থাৎ গ্রাম থেকে শহরে বা শহর থেকে গ্রামে যাতায়াত করে উপার্জন করে। এই ধরনের আয়ের প্রবাহ প্রধানতঃ দেখা যায় গ্রাম ও শহরের সংগঠিত ও অসংগঠিত তৃতীয় শ্রেণীর অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে।

গ. জনসংখ্যার চলনশীলতা যোগসূত্র

জনগণের চলনশীলতার সঙ্গে উন্নয়নের সম্পর্ক খুব নিবিড়। সাময়িক স্থানান্তর এবং কাজের জায়গায় যাতায়াত - এই দুই ধরনের চলনশীলতাই নির্ভর করে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর। অবশ্য স্থায়ী স্থানান্তর আবার নির্ভর করে একগুচ্ছ সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ের উপর যথা - কাজের সুযোগ, বেতন, পরিষেবামূলক অবস্থা, দূরত্ব, খরচ, চলাচলের সুবিধা প্রভৃতি।

বর্ধমান শহরে যে ধরনের স্থানান্তর ঘটেছে চারপাশের গ্রামাঞ্চল থেকে তা পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে এই স্থানান্তরকারী লোকজনদের মধ্যে অধিকাংশই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। কৃষি উন্নয়নের হাত ধরে গ্রামাঞ্চলে কাজের সুযোগ সুবিধা প্রসারিত হওয়ার জন্য গ্রাম থেকে শহরে নিম্নবিত্ত বা গরীব শ্রেণীর লোকজনদের স্থানান্তর প্রায় ঘটছেই না। শহরের অল্প আয়ের অসংগঠিত ক্ষেত্রের কাজকর্মগুলি সেক্ষেত্রে পরিচালিত হয় শহরের স্থায়ী

বসবাসকারী বা বিহার, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম প্রভৃতি অনুন্নত অঞ্চল থেকে আসা নিম্নবিত্তের লোকজনদের দ্বারা।

চারপাশের গ্রামাঞ্চল থেকে স্থায়ীভাবে বর্ধমান শহরের চলে আসা লোকজনদের জিজ্ঞাসাবাদের মধ্যে দিয়ে জানা গেছে এর মূল কারণ হল সামাজিক। অর্থাৎ শহুরে জীবনের হাতছানি এবং গ্রাম ও শহরের মধ্যে পরিষেবামূলক (স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিনোদন) অবস্থার তারতম্যই হল এই শ্রেণীর স্থানান্তরের মূল কারণ। তবে স্থায়ী স্থানান্তর আবার অনেক সময় সাময়িক স্থানান্তর থেকেও গড়ে ওঠে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় গ্রাম থেকে বর্ধমানের কলেজে পড়তে আসা ছাত্ররা একবার শহরে থাকার অভ্যেস গড়ে ওঠার ফলে তাঁদের অনেকেই আর গ্রামে ফিরে যেতে পারেন না। পাকা চাকরি না হলেও কোন না কোন কাজকর্ম জুটিয়ে তারা বর্ধমানেই স্থায়ীভাবে থেকে যেতে চেষ্টা করেন। তবে দেখা গেছে যে, গ্রাম ছেড়ে শহরে এলেও এই সমস্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বেশীরভাগ লোকজনেরই গ্রামের সাথে বেশ সুদৃঢ় অর্থনৈতিক ও সামাজিক যোগাযোগ রয়েছে – যা গ্রাম-শহরের সামগ্রিক যোগসূত্র স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

ঘ. *প্রযুক্তিগত যোগসূত্র*

বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তিগত যোগসূত্রের মধ্যে টেলি যোগাযোগের গুরুত্ব বর্ধমান অঞ্চলে সর্বাধিক। নব্বই-এর দশকে টেলি যোগাযোগের ক্ষেত্রে যে অভূতপূর্ব উন্নতি সারা ভারতবর্ষে দেখা গেছে বর্ধমান জেলাতেও তার প্রভাব ভালভাবে লক্ষ্য করা যায়। বর্ধমান অঞ্চলের প্রধান টেলিকেন্দ্রটি বর্ধমান শহরে অবস্থিত। এই কেন্দ্রীয় অফিসের অধীনে রয়েছে অসংখ্য ছোট ছোট কেন্দ্র যারা তাদের চারপাশের ৫ - ১০ কিলোমিটার এলাকার গ্রামাঞ্চলে টেলিফোন সার্ভিস দিয়ে থাকে। বর্ধমান শহরের কেন্দ্রীয় এক্সচেঞ্জের মোট সংযোগ দেওয়ার ক্ষমতা ছিল ৭,৮০০, যার মধ্যে '৯৯ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত দেওয়া হয়েছিল ৭,৩৯৯ টি সংযোগ।

টেলিফোন যোগাযোগ গ্রামাঞ্চলে প্রসারিত করার জন্য প্রয়োজন বিদ্যুতের সরবরাহ। যেহেতু আমাদের সমীক্ষা অঞ্চলের অধিকাংশ এলাকাতেই বিদ্যুতের সরবরাহ আছে সেহেতু টেলিযোগাযোগ স্থাপনে কোন প্রায়োগিক অসুবিধা দেখা যায় নি। যে সামান্য এলাকাতে বিদ্যুতের সরবরাহ নেই সেখানে আবার MAAR (Multi Accer Radio Relay)পদ্ধতিতে সরাসরি বিভাগীয় এক্সচেঞ্জ থেকে সংযোগ দেওয়া হয়েছে।

বিস্তৃত টেলি-যোগাযোগের সুবিধা এলাকার গ্রামাঞ্চলের জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। টেলিফোন আজকে অন্যান্য পাঁচটা নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মতই গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনে স্থান করে নিয়েছে। যদিও ব্যক্তিগত সংযোগ বেশি রয়েছে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গ্রামবাসীদের বাড়ীতে তথাপি Public booth-র কল্যাণে গ্রামের

গরীব লোকজনও এর সুযোগ নিতে পারে। টেলি যোগাযোগ গ্রাম ও শহরের মধ্যে দূরত্ব কমাতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। সবচেয়ে বেশি অর্থনৈতিকভাবে উপকৃত হয়েছে গ্রামের ব্যবসায়ী ও উৎপাদক গোষ্ঠী। বর্ধমানে বিক্রিত যে কোন দ্রব্যের দাম সম্পর্কে গ্রামের উৎপাদকরা মুহূর্তেই অবহিত হতে পারেন টেলি-যোগাযোগের মাধ্যমে। এর ফলে গ্রাম ও শহর উভয় জায়গাতেই উৎপাদকরা সমান দামে তাদের উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রি করতে পারেন। অবশ্য এই ধরনের গ্রামের উৎপাদকের স্বার্থরক্ষায় টেলি-যোগাযোগের পাশাপাশি উন্নত পরিবহন ব্যবস্থার গুরুত্বও কোন অংশে কম নয়, যার সাহায্য নিয়ে উৎপাদকরা শহরের বাজারে উৎপন্ন দ্রব্য সহজেই বিক্রি করতে পারেন।

ঙ. *সামাজিক আদানপ্রদান যোগসূত্র*

প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক যোগসূত্রের উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে সামাজিক আদানপ্রদান যোগসূত্র। যাতায়াত ব্যবস্থার প্রসারের সঙ্গে মানুষের চলমানতা বৃদ্ধি পায় যা আবার গ্রাম -শহরের পারস্পরিক সম্পর্কে এবং গ্রামের সমাজব্যবস্থায় কিছু মৌলিক পরিবর্তন নিয়ে আসে। শহরে যাতায়াতের বর্ধিত সুযোগ এলাকার গ্রামের মানুষের সামাজিক জীবনে খুব বেশী প্রভাব বিস্তার করেছে।

শিক্ষার বিস্তার, যোগাযোগের প্রসার, বিদ্যুতের প্রসার, গণমাধ্যমের বিস্তার প্রভৃতির মিলিত প্রভাবে গ্রামের চিরন্তন মূল্যবোধের বেশ কিছু পরিবর্তন দেখা গেছে। এর ফলাফল গ্রামীণ সমাজে অনেক ভাল প্রভাব ফেললেও কোন কোন ক্ষেত্রে খারাপ প্রভাবও দেখা গেছে। তবে একথা বলা যায় যে, প্রভাব ভাল বা খারাপ যাই হোক না কেন তা গ্রাম-শহরের সমাজব্যবস্থার পার্থক্যকে দূর করে উভয়ের মধ্যে সমতা আনতে অনেকখানি সক্ষম হয়েছে।

এলাকার সামাজিক যোগসূত্রগুলির মধ্যে প্রধান হল গ্রামের লোকজনদের বিভিন্ন কাজে বর্ধমান শহরে আসার ধরন। গ্রামের সব শ্রেণীর লোকজনদের মধ্যেই শহরে আসার প্রবণতা বেড়েছে যাতায়াত ব্যবস্থার সুযোগকে কেন্দ্র করে। গ্রামের দরিদ্র শ্রেণীর ক্ষুদ্র উৎপাদকেরা তাদের উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রি করার জন্য বাজারে আসেন। কাজের সূত্রে অনেকেই বর্ধমানে আসেন এবং প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য কিনে নিয়ে যান। এই ধরনের যাতায়াত বরাবরই ছিল পুরুষদের। কিন্তু সাম্প্রতিককালে যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতির কল্যাণে গ্রামের নারীদের অনেকেই বর্ধমান শহরে পূজাপার্বন, কেনাকাটা, মেলা, বেড়ানো প্রভৃতি কারণে প্রায়ই আসেন। এই ধরনের সামাজিক যোগাযোগ বৃদ্ধিতে গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের স্থায়ীভাবে শহরে চলে আসার হার অনেকাংশে কমতে দেখা গেছে।

চ. *পরিষেবামূলক যোগসূত্র*

গ্রাম ও শহরের যোগসূত্র স্থাপনে বিভিন্ন পরিষেবা, শিক্ষা পরিষেবা, স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রভৃতির গুরুত্ব খুব বেশী। যে কোনও ধরনের পরিষেবা গড়ে ওঠার জন্য একটা ন্যূনতম

চাহিদার প্রয়োজন হয়। কৃষি উন্নয়নের ফলশ্রুতি হিসাবে বর্ধমানের চারপাশের গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের পরিষেবার চাহিদা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। এই ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর জন্যই গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের পরিষেবার বিস্তার ঘটেছে।

আমাদের সমীক্ষা অঞ্চলে ঋণ ও অন্যান্য আর্থিক পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির ভূমিকাই সর্বাধিক। বর্ধমানের চারপাশের গ্রামাঞ্চলে মোট ১২২ টি ব্যাঙ্কের শাখা যেগুলি গ্রামাঞ্চলে সঞ্চয়ের পাশাপাশি ঋণদানের কাজও করে থাকে। ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে গ্রামাঞ্চলে সহজ সরল পদ্ধতিতে ঋণ ও সঞ্চয়ের কাজ করার ক্ষেত্রে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের গুরুত্ব অনেক বেশী। ঋণের ক্ষেত্রে শহর থেকে গ্রামের দিকে অর্থের প্রবাহ দেখা যায় যার পরিপূরক হিসাবে গ্রামাঞ্চলের সঞ্চয় শহরে আসে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার মাধ্যমে।

প্রাথমিক স্কুল, মাধ্যমিক স্কুল, উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল, ডিগ্রি কলেজ প্রভৃতি মিলে গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা পরিষেবা গড়ে উঠেছে ঠিকই কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা পর্যাপ্ত নয়। এ প্রসঙ্গে নীলা করের লেখাটি পাঠক পড়ে দেখতে পারেন। ফলে শিক্ষার প্রয়োজনে গ্রাম থেকে শহরে মানুষের যাতায়াত বেড়েছে খুব বেশী হারে। এছাড়াও বর্ধমান শহরে রয়েছে নানা ধরনের ট্রেনিং Programme - এর সুবিধা যার সুযোগ গ্রহণ করার জন্যও গ্রাম থেকে শহরে যাতায়াত করে বহুসংখ্যক ছাত্রছাত্রী। যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি এই ধরনের প্রবাহকে অনেক বেশী সুদৃঢ় করেছে। শিক্ষাক্ষেত্রে সবসময়েই মানুষের প্রবাহ শহরমুখী নয়। বর্ধমান শহরের স্কুল কলেজে পড়ার সুযোগ যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী পায়না, তারা আবার গ্রামাঞ্চলের স্কুল ও কলেজগুলিতে পড়ার জন্য শহর থেকে যাতায়াত করে।

স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিকল্পনা ভাল হলেও এর প্রায়োগিক দিকটি গ্রামাঞ্চলে বিশেষভাবে অবহেলিত। এর ফলে গ্রামের মানুষদের ভাল চিকিৎসার জন্য এখনও সর্বাংশে বর্ধমান শহরের উপরেই নির্ভর করতে হয়। গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্যকেন্দ্র থাকলেও সেখানে ডাক্তার, নার্স, ঔষধপত্র, যন্ত্রপাতি প্রভৃতির বিশেষ অভাব লক্ষ্য করা যায়। এর ফলাফল হিসাবে মানুষ চিকিৎসার প্রয়োজনে গ্রাম থেকে শহরে আসে।

ছ. *রাজনৈতিক প্রশাসনিক সংগঠনগত যোগসূত্র*

গ্রাম ও শহরের পরিচালনার কাজে সংযুক্তি সাধন ঘটে থাকে সাধারণভাবে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক যোগসূত্রগুলির সাহায্যে। প্রশাসনের বিভিন্ন ধাপগুলির (জেলা প্রশাসন, Subdivisional প্রশাসন, ব্লক প্রশাসন) পারস্পরিক সংযুক্তির মধ্যে দিয়েই এলাকার উন্নয়ন ও পরিচালনার কাজ চলে। গ্রামীণ উন্নয়নের ক্ষেত্রে আবার সরাসরি ত্রিস্তর পঞ্চায়েতী সংগঠনের গুরুত্ব খুব বেশী। পঞ্চায়েতী সংগঠনের সর্বোচ্চ স্তরে আছে জিলা পরিষদ যার অধীনে রয়েছে এলাকার ১১টি পঞ্চায়েত সমিতি। পঞ্চায়েত সমিতি থেকে আবার উন্নয়ন কার্য পরিচালিত হয় ১১১টি গ্রাম পঞ্চায়েতের। গ্রামীণ উন্নয়নের যাবতীয়

কার্যাবলী এই তিনটি স্তরের সংগঠনের সাহায্যে Top down পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়। উন্নয়নের কার্যাবলী পরিচালনার জন্য গ্রামের পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যদের সবসময়েই বর্ধমান শহরে অবস্থিত জিলা পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ করার প্রয়োজন হয়। এই ধরনের যোগাযোগের মধ্যে দিয়ে একদিকে যেমন গ্রামীণ উন্নয়নের সাফল্য আসে তেমনই আবার গ্রাম ও শহরের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়।

বর্ধমান অঞ্চলে প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক যোগসূত্রের পাশাপাশি গ্রাম-শহরের মেলবন্ধন ঘটানোর কাজে রাজনৈতিক যোগসূত্রের ভূমিকাও যথেষ্ট রয়েছে। এলাকার সর্বাধিক সংগঠিত রাজনৈতিক দল হল সি.পি.আই.এম.। সমগ্র এলাকাটিতে রয়েছে সি.পি.আই.এম. পার্টির ৫ টি জোনাল কমিটি যার অধীনে রয়েছে ৮৬টি লোকাল কমিটি। ১২৭৯ টি শাখা এবং অসংখ্য উপশাখা। এই সমস্ত স্তরের সব ধরনের সংগঠনগুলির পরিচালনার কেন্দ্রীয় ভার থাকে বর্ধমান শহরের প্রধান কেন্দ্রীয় অফিসটির উপর। যে কোন এলাকার যে কোন খবর রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত শৃঙ্খলের মাধ্যমে পৌঁছে যায় শহরের কেন্দ্রীয় অফিসে। অনুরূপভাবে যে কোন রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত শহরের কেন্দ্রীয় অফিস থেকে বিভিন্ন স্তরের মাধ্যমে পৌঁছে যায় তৃণমূল স্তরের সংগঠনগুলিতে। এই ধরনের যোগসূত্রগুলি প্রশাসনিক যোগসূত্রের পাশাপাশি এলাকার সুষ্ঠু পরিচালনায় সহায়তা করে। সাংগঠনিক যোগাযোগের কাজে গ্রামের লোকজনদের প্রায়ই শহরে আসতে হয় কেন্দ্রীয় সংগঠনের কাছে। এর ফলেও গ্রাম ও শহরের দুরত্ব দুর হয়ে আদানপ্রদান বৃদ্ধি পায়।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে বর্তমানে গবেষণার কাজটি তৃতীয় বিশ্বের গ্রাম-শহরের পারস্পরিক সংযোগহীন সম্পর্কের ধারণাটি ভেঙ্গে ফেলতে সাহায্য করে। তবে অবশ্যই এই ক্ষেত্র ভিত্তিক কাজের অভিজ্ঞতা থেকে এটা বলা যায় না যে তৃতীয় বিশ্বের সর্বত্রই গ্রাম-শহরের মধ্যে সুসংহত আদান প্রদানের সম্পর্ক রয়েছে। তবে একথা বলা যায়, যে সমস্ত এলাকায় শহরের অর্থনীতি চারপাশের গ্রামাঞ্চলের অর্থনীতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ এবং উভয়ের উন্নয়ন সমান তালে চলতে থাকে সে সব জায়গায় গ্রাম-শহরের পারস্পরিক সম্পর্কগুলি ভালভাবে গড়ে ওঠে, তা সে এলাকা প্রথম বা তৃতীয় যে বিশ্বেই অবস্থিত হোক না কেন।

বর্ধমানের উপভাষা

সুভাষ ভট্টাচার্য

।। এক ।।

একসময় বাংলা ভাষার আলোচনায় আঞ্চলিক ভাষাগুলিকে কেন্দ্রীয় ভাষার তুলনায় অর্থাৎ মান্য ভাষার তুলনায় নগণ্য বলে মনে করা হত। কিন্তু ভাষাতত্ত্বের চর্চা প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আঞ্চলিক ভাষা সম্পর্কে এই সংকীর্ণ মনোভাবের পরিবর্তন ঘটেছে। ভাষাচর্চায় আঞ্চলিক ভাষার মর্যাদা ও গুরুত্ব যে সর্বৈব স্বীকৃত হয়েছে সে কথা অনস্বীকার্য। বাংলা ভাষার শব্দসম্ভার সম্পর্কে প্রকৃত ও সম্পূর্ণ চিত্র পেতে হলে আঞ্চলিক ভাষার শব্দ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন। সুখের কথা বর্তমানে সেই চেষ্টা চলেছে।

আঞ্চলিক ভাষার প্রতি ভাষা-গবেষকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ায় বিভিন্ন জেলার ভাষার আলোচনা নতুন মাত্রা পেয়েছে। ভাষা সম্প্রদায়ের নিজ নিজ আঞ্চলিক ভাষা সম্পর্কে হীনমন্যতা দূরীভূত হয়েছে এবং নিজ নিজ আঞ্চলিক ভাষা সম্পর্কে কৌতূহলও বেড়েছে। এই প্রারম্ভিক কথাগুলি বলে নিয়ে আমাদের মূল বক্তব্য, অর্থাৎ বর্ধমান জেলার ভাষা সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য বলতে চাই। এই নিবন্ধে বর্ধমান জেলার ভাষার কিছু বৈশিষ্ট্যের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই উপস্থিত আমাদের লক্ষ্য।

আঞ্চলিক ভাষায় সংস্পর্শ-প্রভাব যে কতদূর ক্রিয়াশীল তা যে কোনো একটি জেলার ভাষা নিয়ে সমীক্ষা করলে সহজেই বোঝা যায়। একটি জেলার প্রত্যন্ত এলাকাগুলি যে পার্শ্ববর্তী জেলার প্রভাব বহন করে তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন রয়েছে বর্ধমান জেলার ভাষায়। বর্ধমানের ভাষায় হুগলি, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদের প্রভাব নৈকট্য-জনিত এবং কাজে-কাজেই সংস্পর্শ-জনিত।

যাঁরা আঞ্চলিক ভাষার বৈচিত্র্য সন্ধানে বা আঞ্চলিক ভাষার চরিত্র বিশ্লেষণে আগ্রহী তাঁদের কাছে বর্ধমানের ভাষা একটি কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়। এই ভাষায় রাঢ়ী উপভাষার ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্যগুলি পুরোমাত্রায় বিদ্যমান। কিন্তু বর্ধমান জেলার ভাষাগত বৈশিষ্ট্য শুধু তার ধ্বনিতত্ত্বে নয়, এই ভাষার বৈশিষ্ট্য তার শব্দভাণ্ডারে, রূপতত্ত্বে, বাক্যরীতিতে। বর্ধমান জেলার শব্দগত বৈশিষ্ট্য ও বাক্যপ্রকরণগত বৈশিষ্ট্য আমাদের কৌতূহলী করে তোলে। কেননা এতে এমন একটা স্বকীয়তা আছে যাকে এক আঁচড়েই বর্ধমানের ভাষার লক্ষণ বলে অভ্রান্তভাবে শনাক্ত করা যায়। আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য যদিও বর্ধমানের ভাষার শব্দবৈচিত্র্য সম্বন্ধে আলোচনা, তথাপি এই ভাষার ধ্বনিগত লক্ষণগুলির দিকেও একবার দৃষ্টিপাত করা সমীচীন বলে মনে করি।

।। দুই ।।

কিন্তু তার আগে আমাদের জেনে নিতে হবে বর্ধমানের উপভাষার এলাকাগত পরিচয়। ১৯০৩ সালে প্রকাশিত জর্জ গ্রিয়ারসনের লিংগুইস্টিক সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার পঞ্চমখণ্ডে বাংলা উপভাষার একটা সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রিয়ারসনের আগে এভাবে বাংলা উপভাষার বর্ণনা কেউ দেননি। তিনি মোটামুটিভাবে চারটি ভাগে বাংলার চল্লিশটি উপভাষাকে ভাগ করেছেন। সেই চারটি হল পশ্চিমা বা western, পূর্বী বা eastern, দক্ষিণ-পশ্চিম বা south-western এবং কেন্দ্রীয় বা central. অবশ্য কেন্দ্রীয় বলতে তিনি বুঝেছেন মান্য কথ্য ভাষাকে। গ্রিয়ারসন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বর্গীকরণ করেননি। কেবল উপভাষাগুলির বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর পরে আজ পর্যন্ত অনেকেই বাংলা উপভাষার বর্গীকরণের চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সর্বজনগ্রাহ্য কোনো বর্গীকরণ এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। সর্বজনগ্রাহ্য বর্গীকরণ পাওয়া না গেলেও, বাংলার উপভাষার চালচিত্র এখন অনেকটাই স্পষ্ট। সুকুমার সেনের বর্গীকরণই তুলনামূলকভাবে বেশি গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে। তিনি 'স্থূল বিবেচনায়' বাংলা উপভাষাকে পাঁচটি গুচ্ছে ভাগ করেছেন। সেগুলি হল —

১) রাঢ়ী (মধ্য-পশ্চিমবঙ্গের উপভাষা)
২) ঝাড়খণ্ডী (দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তের উপভাষা)
৩) বরেন্দ্রী (উত্তরবঙ্গের উপভাষা)
৪) বঙ্গালি (পূর্ব ও দক্ষিণপূর্ববঙ্গের উপভাষা)
৫) কামরূপি (উত্তর - পূর্ববঙ্গের উপভাষা)

সুকুমার সেনের এই পাঁচটি থেকে ঝাড়খণ্ডিকে অনায়াসে রাঢ়ীর একটি উপবিভাগ বলে ধরে নিতে পারি। তাহলে দাঁড়াচ্ছে চারটি গুচ্ছ। আর তার প্রথমটি অর্থাৎ রাঢ়ী উপভাষাই উপস্থিত আমাদের বিবেচ্য। বর্ধমানের উপভাষা এই রাঢ়ীর মধ্যেই পড়ে।

তবে এভাবে ভাগ করার সময় সুকুমার সেনের 'স্থূল বিবেচনা' কথাটা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার। কেননা, অনেকেই নিশ্চয় জানেন, রাঢ়ীর অন্তর্গত কোনো কোনো উপভাষার সঙ্গে বরেন্দ্রী ও কামরূপীর কিছু মিল দেখতে পাওয়া যায়। ভৌগোলিক নৈকট্যই এর কারণ। মধ্য বর্ধমানের ভাষার সঙ্গে পশ্চিম বীরভূমের ভাষার তফাত বেশ লক্ষ্য করবার মতো। আবার বর্ধমানের মৌগ্রাম, খণ্ডঘোষ প্রভৃতি এলাকার ভাষায় বাঁকুড়ার ভাষার মিশেল বা প্রভাব বেশ স্পষ্ট। অন্যদিকে বর্ধমানের কেতুগ্রাম, মাঝিগ্রাম, রামজীবনপুর প্রভৃতি এলাকার ভাষায় বীরভূম ভাষার ছাপ বেশ স্পষ্ট। এও সেই নৈকট্যেরই জন্য। কোনো দুটি অঞ্চল যতই নিকটবর্তী হবে, তাদের ভাষার সাদৃশ্য ততই বেশী হবে; দুটি অঞ্চল পরস্পরের যতই দূরবর্তী হবে, ততই তাদের ভাষার পার্থক্য বেশী হবে।

।। তিন ।।

বর্ধমানের ভাষার অন্যতম প্রধান ধ্বনিতাত্ত্বিক লক্ষণ স্বরসংগতি। সিদ্ধ-সেদ্ধ, কৃপণ - কেপ্পন, চৈত্র - চোত্, বিলাত - বিলেত্, উড়ানি - উড়ুনি, দেশি - দিশি। এই সব দৃষ্টান্ত যে বর্ধমানের ভাষার নিজস্ব ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্যের প্রমাণ তা মনে করার কারণ নেই। কেন্দ্রীয় ভাষায় এবং অন্য কোনো কোনো আঞ্চলিক ভাষায়ও অনুরূপ স্বরসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। অন্ত্য মহাপ্রাণিত ব্যঞ্জনের মহাপ্রাণহীনতা বর্ধমানের ভাষার তথা রাঢ়ী উপভাষার একটি ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য। দুধ - দুদ, শাঁখ - শাঁক্ এর দৃষ্টান্ত। তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হিসাবে স্বরভক্তির উল্লেখ করতে হয়। শব্দের আদিতে বা মধ্যে যুক্ত ব্যঞ্জন থাকলে সেই ব্যঞ্জন দুটির মধ্যে একটি স্বরধ্বনি এসে ব্যঞ্জন দুটিকে আলাদা করে দেয়। গ্রাম - গেরাম্, প্রথম - পের্‌থোম্, শুক্র - শুক্কুর্, ক্রমে - কের্‌মে, ব্লু - বুলু, ক্লাব - কেলাব্। উচ্চারণে স্বরভক্তি আঞ্চলিক ভাষার স্বাভাবিক প্রবণতা। সংস্কৃত ইংরেজী প্রভৃতি উৎস থেকে প্রচুর যুক্তব্যঞ্জনের শব্দ বাঙালিকে ব্যবহার করতেই হয়। সেইসব যুক্তব্যঞ্জনকে সরল করে নেওয়ার নানান প্রক্রিয়ার অন্যতম হল স্বরভক্তি। ঘোষীভবন বর্ধমানের ভাষার আর একটি ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য। এর দৃষ্টান্ত শাক - শাগ্, কাক - কাগ্। পঞ্চমত, নিম্নমধ্য অ্যা - ধ্বনির উচ্চমধ্য এ - ধ্বনিতে রূপান্তর - এগারো, বেলা, মেলা, খেলা, এইসব শব্দের মান্য উচ্চারণ যদিও অ্যাগারো, ব্যালা, ম্যালা ও খ্যালা। বর্ধমানে এগুলির এ উচ্চারণই দস্তুর। ষষ্ঠত, শব্দের দ্বিতীয় সিলেবলে ঝোঁক এবং ব্যঞ্জনদ্বিত্ব বর্ধমানে অত্যন্ত প্রকট - বাবা - বাব্‌বা, মেলা - মেল্‌লা, খেলা - খেল্‌লা, ব্যাপার - বেপ্‌পার্ ইত্যাদি। সপ্তমত, একাক্ষর বা এক সিলেবলযুক্ত শব্দের শেষে ম্ ধ্বনি থাকলে আদ্য নিহিত অ ধ্বনি ও ধ্বনিতে পরিণত হয়। গম - গ্যোম্, দম - দ্যোম্। এছাড়া অন্যান্য ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আছে নাসিক্যীভবন - গোড়া—গোঁড়া, হাসপাতাল - হাঁশ্‌পাতাল্; ন্ ধ্বনির ল্ ধ্বনিতে রূপান্তর - নোটিশ - লুটিস্, নোট - লোট্, নেওয়া, নিতে-লেয়া, লিতে, নবান-লবান্ প্রভৃতি ; শব্দের আদ্য অ এবং ও ধ্বনির র্ ধ্বনিতে রূপান্তর - অঞ্জন - রন্‌জোন, ওজন - রোজোন্; মধ্য ব্যঞ্জনলোপ - তুলসী - তুলোশি, দরজা - দরোজা।

কয়েকটি বাক্য নিয়ে উদাহরণ দিয়ে এই ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলো দেখানো যায় - ১) এতো রেতে কোতা যেচিস? ২) ওমনিই যেইতে মোন হোইল তাই যেচি। ক্যানে, তুমি যাবা আমার সঙ্গে? ৩) মোন হোইল, লয় ? যা ক্যানে , বুজবি মজ্‌জা। ৪) তুমি ঘরে দোর এঁইটে ঘুমোও গা। আমি চললাম। ৫) কাইল কাঁটোয়া জাব্‌বো লবানের বাজার কইরতে।

।। ৪ ।।

এবারে আমরা আমাদের মূল আলোচনায় আসি। বর্ধমানের ভাষার কিছু রূপতাত্ত্বিক ও শব্দপ্রয়োগগত বৈশিষ্ট্য আলোচনা করে এই অঞ্চলের ভাষার প্রকৃত চরিত্র - লক্ষণ সম্পর্কে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই এখানে আমাদের উদ্দেশ্য।

প্রথমতঃ কর্ম-বিভক্তিদিগকে বর্ধমানে - দিগে তে পরিণত হয়। আমাদিগে, তাদিগে, ছেলেদিগে। একে আমরা রাঢ়ী উপভাষার একটি রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বলতে পারি। দ্বিতীয়ত, সকর্মক ও অকর্মক দুই প্রকার ক্রিয়াপদেই প্রথম পুরুষের একবচনে ও বহুবচনের সাধারণ অতীতকালে - ল বিভক্তির বদলে - লে বিভক্তির ব্যবহার বর্ধমানের স্বাভাবিক প্রবণতা। দুধটা কে খেলে ? সে বললে ইত্যাদি। তবে বর্তমানে এর পাশাপাশি মান্য ভাষার বলল, খেল প্রভৃতিও ব্যবহৃত হচ্ছে, প্রধানত বেতার, দূরদর্শন প্রভৃতির প্রভাব এবং অনেকাংশ শিক্ষারও প্রভাবে। তৃতীয়ত, ক্রিয়াপদের খেসে (খা + এসে), খাওসে (খাও + এসে) দেখসে (দেখ + এসে) ইত্যাদি রূপ বর্ধমানের উত্তরাঞ্চলের বৈশিষ্ট্য। আবার যাচ্ছি, যাচ্ছে, খাচ্ছি, খাচ্ছে প্রভৃতি ক্রিয়ারূপের যুক্ত ব্যঞ্জনের লোপও লক্ষণীয় - যেচি, যেচে, খেচি, খেচে। চতুর্থত, তুই এর বদলে তু, এবং সম্বোধনে এই এর বদলে এ (এ মানিক, শোন্‌সে, কাগজটা লিয়ে যা) বর্ধমানের বিশেষ প্রবণতা।

।। পাঁচ ।।

বর্ধমানের ভাষার শব্দভাণ্ডার একটি অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়। এই জেলার ভাষায় এমন বহু বহু শব্দ আছে যেগুলি মূলত আঞ্চলিক শব্দ হিসাবেই চিহ্নিত! সেইসব শব্দ অবশ্য পার্শ্ববর্তী অন্য কোনো কোনো জেলায়ও ব্যবহৃত হয়। এমন বহু শব্দও আছে যেগুলি নিতান্তই বর্ধমানের নিজস্ব শব্দ - অন্যত্র সেই শব্দের প্রয়োগ হয় বটে, তবে ধরে নিতে হবে যে সেগুলি বর্ধমান থেকেই অন্যত্র গেছে। আবার এমন শব্দও আছে যেগুলি মান্য ভাষারই অনুরূপ। যে কোনো আঞ্চলিক ভাষার শব্দের বেলায়ও যেমন, বর্ধমানের ভাষার শব্দকেও আমরা প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি - (ক) মান্য ভাষার অনুরূপ শব্দ যাদের অর্থও অনুরূপ , (খ) মান্য ভাষার অনুরূপ শব্দ যেগুলি অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয়, এবং (গ) সম্পূর্ণ ভিন্ন শব্দ।

আমাদের এই আলোচনায় ক শ্রেণীর শব্দ সম্পর্কে বেশী কিছু বলার প্রয়োজন নেই। মা, ভাই, ভাত, মাছ, দুধ, কলা, মাঠ, ঘাট, ফল, আম, দেখা, লাঠি প্রভৃতি অজস্র শব্দ এই শ্রেণীতে পড়ে।

খ শ্রেণীভুক্ত কিছু শব্দ আমরা এখানে উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করছি। দিন শব্দটি বর্ধমানে ক্রিয়া বিশেষণে প্রতিদিন অর্থেও ব্যবহৃত হয় - আমি দিন তার বাড়ি যাই। অনুরূপ আর একটি শব্দ প্রায় । বর্ধমানে প্রায়ই অর্থে প্রায় ব্যবহৃত হয় - সে প্রায় এখানে আসে। পালানো শব্দটিকে বর্ধমানে সাধারণভাবে যাওয়া অর্থেই ব্যবহার করা হয় – অনেক বেলা হল, এবার পালাই গো। বর্ধমানে ভেজাল বা ভ্যাজাল শব্দটির অর্থ ঝামেলা বা ঝঞ্ঝাট, ভালো ভ্যাজাল হল দেখছি। বর্ধমানে ছেলে বলতে প্রায়ই ছেলে ও মেয়ে উভয়কেই বোঝায় - ওগো ছেলে কোলে লাও।

গ শ্রেণীভুক্ত কিছু শব্দের উদাহরণও দেওয়া যাক। মূড়ি (নর্দমা), বোজা (আবর্জনা),

সপ(মাদুর), ঘসি (ঘুঁটে), পারা(মতো), ভিচিকিচি(ঝামেলা), কম্‌নে(কোনদিকে), হোতা (ওখানে), খ্যাড় (খড়), পঁইঠে (সিঁড়ি), অঘোর (অলস), আজল (বোকা), খিটকাল(কেলেঙ্কারী; ঝামেলা) ইত্যাদি। এই নিবন্ধে বর্ধমানের শব্দ সংকলন আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা কেবল বর্ধমানের ভাষার নানান বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে চাই। তাই আপাতত কতকগুলো শব্দের উল্লেখ করা হল মাত্র।

এবারে বর্ধমানের শব্দপ্রয়োগের কিছু বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা যাক। বর্ধমানে জমি অর্থে জায়গা শব্দটির ব্যাপক প্রয়োগ লক্ষণীয় - জায়গা কিনে ঘর করব। আবার বাড়ি অর্থে ঘর শব্দটিও যে প্রচলিত তা এই বাক্যটি থেকেই বোঝা যাবে। বৃষ্টি অর্থে জল - আজ জল হবে গো; শীত অর্থে ঠান্ডা, পাত্র অর্থে জায়গা - দুধের জায়গা দিন গো; ডগা অর্থে ডগ - লাউয়ের ডগ, নারকেল গাছের ডগ ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্ধমানের নিকৃষ্ট বা inferior অর্থে কমা শব্দটির ব্যাপক প্রয়োগ হয়। শব্দটি আঞ্চলিক বটে, কিন্তু এতই কার্যকর ও যথাযথ যে এই শব্দটিকে মান্য ভাষার অভিধানে গ্রহণ করা যায় কিনা তা আভিধানিকরা ভেবে দেখতে পারেন। নিপাত শব্দ হিসাবে দিয়ে ও নিয়ের প্রয়োগ বর্ধমানে খুবই ব্যাপক। বর্ধমানে মনে হওয়া বা ইচ্ছা হওয়া অর্থে মন হওয়া ব্যবহৃত হয় - মন হল তাই চলে এলুম। সম্বোধনে ওগো শব্দের আত্যন্তিক প্রয়োগ আমাদের কিছু উদাহরণ থেকেই বোঝা যাবে। এছাড়া আদপে অর্থে মূলে - মূলে সে ভাতই খায় নাই, নেই বা - নি অর্থে নাই, জলখাবার অর্থে জল অনুসর্গ হিসাবে লেগে শব্দের ব্যবহার - তোমার লেগে বসে আছি, পাগল ও পাগলী অর্থে খ্যাপা ও খেপী, প্রশ্ন করা অর্থে শুধানো - আমি জানিনা গো, ওকে শুধোও - প্রভৃতি বর্ধমানের বিশেষত্ব।

এই প্রসঙ্গে বর্ধমানের কিছু ইডিয়ম বা বাগ্‌ধারার উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। মনে রাখা প্রয়োজন যে বাংলা ভাষার বহু বাগ্‌ধারাই আসলে আঞ্চলিক ভাষার অন্তর্গত। পৌনঃপুনিক ও ব্যাপক প্রয়োগের ফলে আঞ্চলিক প্রয়োগ মান্য ভাষার শব্দভান্ডারে গৃহীত হয়ে যায়। বর্ধমানের বাগ্‌ধারা ও বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছও পৃথকভাবে সংকলনযোগ্য। আপাতত আমরা কয়েকটির উল্লেখ করে প্রসঙ্গ শেষ করছি – মালা ঘোরানো, কোনো ব্যাপার নাই, বাঁশবুকো (গালাগালিতে), আজলগোদা(গালাগালিতে), আদিঙ্গে, আঁচল চেলে, নামুনে (গালাগালিতে), কোনো সিন নাই, আবুজ আবজো।

সেকালের শিক্ষায় বর্ধমান ঃ মধ্যযুগ

সুধীরচন্দ্র দাঁ

শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে প্রাচীনতার ঐতিহ্যবাহী এই বর্ধমান। পঞ্চদশ শতকের আগে এই বর্ধমানে শিক্ষা ব্যবস্থা কেমন ছিল তা জানা না গেলেও মঙ্গলকাব্যে ওই সময়কার শিক্ষা ব্যবস্থার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল থেকে জানা যায়, বর্ধমানের গ্রামে গ্রামে তখন পাঠশালা ছিল এবং বিশেষ বর্ধিষ্ণু গ্রামে টোল, চতুষ্পাঠী প্রভৃতি সংস্কৃত পড়ার কেন্দ্র গড়ে ওঠে। ১২০১ খৃষ্টাব্দে তুর্কী প্রধান মহম্মদ বখতিয়ার বণিকের বেশে (ঘোড়া ব্যবসায়ী) ১৮ জন সঙ্গী (অশ্বারোহী) নিয়ে নদীয়ায় প্রবেশ করলেন। সম্রাট লক্ষ্মণ সেন পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে গেলেন উত্তরবঙ্গের ওপারে ঢাকায়। সেই সঙ্গে শুরু হল বর্ধমানে মুসলমান সুলতানের রাজত্ব এবং ফলে এসে গেল মুসলমান শিক্ষা ও সংস্কৃতি।

১২০১ খৃষ্টাব্দের আগে পর্যন্ত যুগকে হিন্দু যুগ বলে - এই সময় বর্ধমানে সমগ্র বঙ্গে র মত সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার চল ছিল। প্রাকৃত ও তার অপভ্রংশকে ভিত্তি করে আঞ্চলিক বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়। বিশেষ করে মাগধী-প্রাকৃত ও শৌরসেনী অপভ্রংশের মিশ্রণে বাংলা ভাষার আদি - রূপের উদ্ভব হয়। বাংলা সাহিত্যে এই আদি রূপকে চর্যাপদ বলে। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য লুইপাদ, কাহ্নপাদ প্রভৃতি রচিত পদগুলি চর্যাপদ নামে খ্যাত। এই চর্যাপদগুলির মধ্যেই রয়েছে সেকালের শিক্ষা, সভ্যতা ও সমাজ বিন্যাসের পরিচয়।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৯১৬), সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৯২৬) এবং ডঃ সুকুমার সেন প্রমাণ করেছেন চর্যাপদগুলি বৌদ্ধ গান ও দোঁহা। এগুলিই বাংলা ভাষার প্রাচীনতম রূপ - অবহট্টর নির্মোকমুক্ত বাংলা ভাষার প্রাচীনতম পদচিহ্ন। রাঢ় বর্ধমানে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ পরিক্রমা করছিলেন, তার নিদর্শন গ্রাম বর্ধমানে বিভিন্নরূপে ছড়িয়ে রয়েছে। চর্যাপদে দেখা যায়, বিদ্যা ছিল গুরুমুখী। গুরু শিষ্যকে উপদেশ দিতেন এবং সেই উপদেশ জনগণের কাছে শিরোধার্য বলে গণ্য হতো। দোঁহাগুলির বেশির ভাগই আধ্যাত্মমূলক। জীবন ধর্মের আচার ও আচরণে গ্রহণযোগ্য ও পালনীয় বিধি নিষেধ। যেমন –

ভবণই গহণ গম্ভীর বেগে বাহী
দু আন্তে চিখিল মাঝে ন থাহী।।
ধর্মার্থে চাটিল সাঙ্কম গঢ়ই,
পারগামী লোঅ নির্ভর তরই।।

অর্থাৎ ভবনদী গহন গম্ভীর, বেগে প্রবাহিত, দুইধারে কাদা, মাঝে থই নাই, ধর্মের তরে চাটিল সাঁকো গড়িয়াছে, পারগামী লোক নির্ভয়ে তরে।

সে সময় উচ্চবর্ণের মানুষ গুরুগৃহে সংস্কৃত ভাষায় শাস্ত্র ও সাহিত্য চর্চা করতেন। তার উদাহরণ বাঁকুড়া জেলায় প্রাপ্ত পোখরণ গ্রামের শিলালিপি। কিন্তু নিম্ন বর্ণের মানুষ যাঁরা বর্ধমানের আদি বাসিন্দা সেই কিরাত, শবর, ডোম প্রভৃতি শ্রেণীর মানুষ লেখাপড়া শিখত না। জীবনের আচার - আচরণে একটা শৃঙ্খলাবোধ জাগ্রত করার জন্য বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ গান, দোঁহা প্রভৃতি রচনা করেছিলেন এবং এগুলিতে বেশি করে সেই নিম্ন বর্ণেরই উল্লেখ আছে। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন, "চর্যাগীতিতে সমসাময়িক জীবনের যে ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা আর কোথাও নাই। চর্যাগীতিতে যে জীবনচিত্র ক্ষণোদ্ভাসিত তাহা দেব-দেবীর নয়, রাজা - উজীরের নয়, ব্রাহ্মণ শুদ্রের নয় সেকালের ছোটবড় সাধারণ লোকের প্রতিদিনের জীবন যাত্রা ও আচরণের বিম্বপ্রায় প্রতিরূপ - । "অর্থাৎ চর্যাগীতির মধ্য দিয়ে সেকালে সাধারণ মানুষকে শিক্ষা দিবার এক প্রচ্ছন্ন চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় বাঙালীর ইতিহাস গ্রন্থে বলেছেন, সাহিত্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এই গীতগুলি রচিত হয় নাই, হইয়াছিল বৌদ্ধ সহজ সাধনার গূঢ় ইঙ্গিত ও তদনুযায়ী, জীবনাচরণের আনন্দকে ব্যক্ত করার জন্য।" আর পরবর্তী সময়ে এ গুলিই সাধারণ নিম্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে লোকশিক্ষার উপকরণ হিসাবে কাজ করেছে ব্যাপক। নিম্ন সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষ টোল বা চতুষ্পাঠীতে না গিয়েও জীবন সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতো। যেমন –

"উমত সবরো পাগল সবারো মা করগুলী গুহাড়া তোহেরী
নিঅ ঘরিণী, নামে সহজ সুন্দরী
নানা তরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলী ডালী
একেলী সরবী এ বন হিণ্ডুই বর্ণকুণ্ডল বজওারী

এখানে শবরকে সাবধান করে দেওয়া হচ্ছে ঃ ওগো উন্মত্ত শবর, পাগল শবর, গোলে ভুল করিও না। দোহাই তোমার। আমি তোমারই গৃহিণী, নামে সহজ একেলা শবর এ বন ঘুরিয়া বেড়ায়।"

অতএব বলা যায় আজকের মাতৃভাষা বাংলা মাগধী প্রাকৃত ও সুরু করেছিল তখন রাঢ় বর্ধমান এবং রাঢ়বঙ্গের নিম্ন সম্প্রদায় হাড়ি, ডোম, কাহার, শবর, কিরাত গণই স্তন্য দিয়ে তাকে লালন করেছিল।

সংসারে তত্ত্ব কথা অতি সহজ ও সাধারণভাবে বলা হয়েছে যাতে নিম্নসম্প্রদায় ও সাধারণ মানুষের বুঝতে অসুবিধা না হয়। যেমন –

কুলেঁ কুলেঁ মা হোইরে মূঢ়া উজুবাট সংসারা
বাল ভিণ একুবাকুণ ভুলহ রাজপথ কন্ধারা।।
মায়া মোহ সমুদারে অন্ত ন বুঝসি থাহা।
আগে নাব ন ভেলা দীসই ভন্তি ন পুচ্ছসি নাহা।।

অর্থাৎ হে মূঢ়, কুলে কুলে ঘুরিয়া ফিরিও না, সংসারে সহজপথ পড়িয়া আছে। সম্মুখে যে মায়ামোহ সমুদ্র তাহার যদি না বোঝা যায় অন্ত না পাওয়া যায় থই, সম্মুখে যদি না দেখা যায় কোন ভেলা বা নৌকা, তবে এ পথের যাহারা অভিজ্ঞ পথিক, তাহাদের নিকট সন্ধান জানিয়া লও।

প্রাজ্ঞ বা পণ্ডিত ব্যক্তি ছাড়া নিগূঢ় তত্ত্ব কথা বলার অধিকার কারো ছিল না। তাই সিদ্ধাচার্যগণ সাধারণ মানুষের কথা দোঁহার মধ্যে উল্লেখ করলেও বৈষ্ণব বিনয়ের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে প্রাজ্ঞ ব্যক্তির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন ঃ

পণ্ডিঅ লোঅ খমহু মহু এত্থু ন কিঅই বিঅপ্পু
জো গুরুবঅণে মই সুঅই তহি কিং কহমি সুগোপ্পু

অর্থাৎ পণ্ডিত লোক আমাকে ক্ষমা কর, এখানে কিছু বিকল্প করা হইতেছে না। যাহা আমি শুনিয়াছি সুগোপন গুরু বাক্যে তাহা আমি কি করিয়া বলি।

বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য লুইপাদ, কাহ্নপাদ, সরহপাদ প্রভৃতি প্রাচীনতম বাংলা ভাষার এই রূপকে লোকশিক্ষার কাজে ভাবের ও তত্ত্বের বাহন করেছিলেন এবং এইভাবেই রাঢ়বঙ্গে এবং রাঢ় বর্ধমানে দরিদ্রশ্রেণীর নিম্ন ও সাধারণ মানুষের মধ্যে এই ভাষা সংযোগের একমাত্র ভাষা হিসাবে পথ করে নিয়েছিল। অনার্য ভাষাগোষ্ঠী তাই ধীরে ধীরে কোণঠাসা হয়ে পড়ে নিজ সঙ্কীর্ণ সমাজ ও গোষ্ঠীর মধ্যে বেঁচে থাকে। তাকে পথ করে দিতে হয় আগামী দিনের জন্য জনসাধারণের বাংলা ভাষাকে।

হিউয়েন সাঙ্ তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে এই অঞ্চলের লোকজনের যা বর্ণনা দিয়েছেন তা প্রণিধান- যোগ্য। তিনি কর্ণসুবর্ণ (মুর্শিদাবাদে অবস্থিত) থেকে ৭০০ লীর কিছু বেশি দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত উচু {WU(=u)-TU} প্রদেশে এসেছিলেন। তিনি বর্ণনায় বলেছেন, এখানকার জনসাধারণ দুর্ধর্ষ, বেশ লম্বা এবং ময়লা রঙের। কথা বার্তায় এবং আচার-আচরণে তারা মধ্য ভারতের লোকেদের চেয়ে আলাদা। পড়াশুনায় তার অক্লান্ত এবং তাদের মধ্যে অনেকেই বৌদ্ধ। বহু ধর্ম সম্প্রদায় ছিল বিশৃঙ্খলভাবে। হিউয়েন সাঙ্ যাঁদের পড়াশুনায় অক্লান্ত বলেছেন, তাঁরা বেশীর ভাগই বৌদ্ধ। অর্থাৎ বৌদ্ধরা নিজ ধর্ম প্রচারে পড়াশুনা করতেন এবং তা অপরকে বিতরণ করতেন। তখন ছাপাখানা থাকার প্রশ্নই ওঠে না তালপত্র, ভুর্জপত্র বা গাছের ছালে এই সব পুঁথি লেখার কাজ চলতো। হিউয়েন সাঙ্-এর বিবরণী থেকে জানা যায়, এই দেশের রাজা নিজের হাতে পুঁথি নকল করে ধর্মীয় উপহার প্রেরণ করেছেন চীন সম্রাট তে সাঙ্ (Te Tsung) কে। এই পুঁথিটি হলো সংস্কৃত পুঁথি মহাযান ধর্মের। নাম হলো - Ta- fang Te - hua - yea - chang. হিউয়েন সাঙ্ কর্ণসুবর্ণ থেকে তাম্রলিপ্ত গিয়েছিলেন দামোদর অতিক্রম করে বাদশাহী সড়ক ধরে - কাজেই রাঢ় বর্ধমানের তৎকালীন অধিবাসীদের শিক্ষা দীক্ষার পরিচয় তা থেকে জানতে পারি।

সেকালে শিষ্যগণ গুরুমুখী ছিলেন। শিক্ষার মুলতত্ত্ব ছিল অমৃত আহরণ করা। বৈদিক ঋষিগণ এই অমৃতত্ত্বকেই পুর্ণশিক্ষা বলেছেন। "যেনাহং নামৃতস্যাম, যেনাহং কিম কুর্যাম" - যা অমৃতের সন্ধান দিতে পারেনা, তা নিয়ে কি করবো - মৈত্রেয়ীর প্রশ্নই ভারতের চিরকালের শিক্ষাদর্শনের প্রশ্ন। শিক্ষা শেষে গুরুর উপদেশ তৈত্তিরীয় উপনিষদে - " সত্যং বদ, ধর্মং চর, স্বাধ্যায়ন মা প্রমদ ঃ" সত্য বল। ধর্ম আচরণ কর। অধ্যয়ন থেকে বিরত হয়ো না। বা "মাতৃদেব ভব, পিতৃদেব ভব, আচার্য দেব ভব।" অর্থাৎ মাতা দেবতা হোক, পিতা দেবতা হোক, গুরু দেবতা হোক। বৈদিক যুগের এই ধারাবাহিকতা বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের শিক্ষাচার্যগণও অনুসরণ করে এসেছেন। ধর্মাচরণ ও শিক্ষাদানকে, একটি দর্শনে পরিণত করেছিলেন তাঁরা। চর্যাপদগুলিতে জীবন ধর্মের পরিচয় থাকলেও অধ্যাত্মসাধনা ও নীতি শিক্ষাই প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। বৈদিক শিক্ষা যেমন আশ্রমিক ছিল, বৌদ্ধ ও জৈন শিক্ষা তেমনই মঠ - সংঘ ও বিহার কেন্দ্রিক ছিল। অনুমান করা যায় বর্ধমানের (ভরতপুরে বৌদ্ধ স্তূপ আবিস্কৃত হওয়ার ফলে) বহু স্থানে বৌদ্ধ ও জৈন বিহার ও স্তূপ ছিল এবং সেখানে শিক্ষা কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। কিন্তু তার কোন নিদিষ্ট প্রমাণ আমাদের কাছে নেই। সংস্কৃত ভাষাকে পাণিনি শিষ্ট করে তুলতে আর্যাবর্ত্ত ও বঙ্গে তা পণ্ডিতজনের লেখ্য ছায়া ছিল, বৌদ্ধগণ সংস্কৃত ছেড়ে অর্ধমাগধী বা পালি ভাষার প্রচলন করেছিলেন। কিন্তু বুদ্ধদেবের নির্বাণের কয়েক শতাব্দী পরে রাঢ় বর্ধমানের প্রাকৃত মাগধী ও অবহট্টের প্রকোপে প্রাচীনতম বাংলা ভাষার সৃষ্টি নিঃশব্দে শুরু হয়ে যায়। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ সেই বৈদিক গুরুর পথ অনুসরণ করেই শিষ্যদের উপদেশ দিতেন। যা পরবর্তী কালে জনগণের সম্পদ হয়ে ওঠে।

শিক্ষা চিরকালই রাজানুগ্রহের বস্তু ছিল। বাংলায় - গুপ্ত - পাল - সেন রাজের সময়ে সেটা প্রকট হয়ে ওঠে। কিন্তু এই সময় পর্যন্ত লেখ্য ভাষা ছিল সংস্কৃত। ষষ্ঠ শতাব্দীর মহারাজা বিজয় সেনের তাম্রশাসন যা বর্ধমান জেলার মল্লসারুল গ্রামে পাওয়া গিয়েছে তার ভাষা সংস্কৃত এবং অক্ষর ব্রাহ্মী। এছাড়া ধর্মপালের খালেমপুর তাম্রশাসন (অষ্টম শতাব্দীর শেষ), দেবপালের মুঙ্গের তাম্র শাসন (নবম শতাব্দীর প্রথম), মহীশালের বাণগড় তাম্র শাসন (দশম শতাব্দী শেষ), বল্লাল সেনের নৈহাটি তাম্রশাসন (দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম), এবং লক্ষণ সেনের মাধাইনগর তাম্রশাসন (দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়) - সবই সংস্কৃত ভাষায় লেখা। কথ্য ভাষাকে তখন লেখ্য ভাষার মর্যাদা দেওয়া হত না। মুসলমানদের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত পাল ও সেন রাজত্বে শিল্প - শিক্ষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষতা লক্ষণীয়। পাল যুগের ভাস্কর বীতপাল, ধীমান, আচার্য অতীশ দীপঙ্কর, আয়ুর্বেদ শাস্ত্রজ্ঞ চক্রপাণি, কবি সন্ধ্যাকর নন্দী ও সেন যুগের শাস্ত্রজ্ঞ শূলপাণি ধোয়ী কবি এবং জয়দেবের গীতগোবিন্দ রাঢ়বর্ধমানকে প্রেম ভক্তিতে প্লাবিত করেছিল।

রাঢ় বঙ্গের সর্বপ্রাচীন বাংলায় লেখা কাব্য "শূন্যপুরাণ"। ধর্ম ঠাকুরের পূজো

পদ্ধতিকাব্যের আকারে লেখন বর্ধমান জেলার মেমারীর কাছে ভল্লুকা নদীর তীরে অবস্থিত একটি গ্রামের কবি রামাই পণ্ডিত। বর্তমানে ভল্লুকা নদী তীরের সেই গ্রামের অস্তিত্ব গবেষণার বিষয়। সে দশম শতাব্দীর কথা, গৌড়ের সম্রাট তখন ধর্মপাল। শূন্য পুরাণ সুপ্রাচীন বৌদ্ধ কাব্য, এতে আছে ধর্ম ঠাকুরের কোন মূর্তি ছিল না, নিরাকার বা শূন্যাকার তাই নাম শূন্য পুরাণঃ

বাড়ী মোর বল্লুকার
পূজি শ্রী নৈরাকার।।
শূণ্যমূর্তি ধ্যান করি
সাকার মূর্তি ভজি
পূর্ব মুখে পূজা করি
পঞ্চম বেদ পড়ি।

শূন্য পুরাণের কবি রাঢ় বর্ধমানের রামাই পণ্ডিত প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে বিখ্যাত হয়ে আছেন।

১২০১ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ বখতিয়ার রাঢ় বর্ধমানের উপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে নদীয়ায় যান এবং লক্ষ্মণ সেনের রাজ্য জয় করেন। তারপর থেকেই রাঢ় বর্ধমানে মুসলমান সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করে। সংস্কৃত, বাংলা ও পালি ভাষার সঙ্গে আর একটি মাত্রা যোগ হল ফারসী ভাষার। গড়ে উঠলো - মসজিদ মাদ্রাসা ও মোক্তব, আরবী ও ফরসী ভাষা শিক্ষার কেন্দ্রস্থল। বাংলা এবং সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র টোল ও চতুষ্পাঠীর পাশাপাশি। মুকুন্দরামের স্বগ্রামে রক্ষিত ১০৪৭ সাল (বাংলা) ১লা ফাল্গুনের দলিলে দেখা যায়, মুসলমান সুলতানের ফারসী ভাষায় খোদাই করা মোহর ছাপ। অর্থাৎ সাধারণ মানুষের শিক্ষা - সাহিত্যের ভাষা ছিল সংস্কৃত ও বাঙলা।

আকবর দিল্লীর সম্রাট হয়েই তার রাজ্যকে সুদূর বর্ধমান পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। বর্ধমানের শাসনকর্তা শের আফগান নিজে একজন শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর স্ত্রী বেগম মেহেরউন্নিসা একজন বিদূষী মহিলা ছিলেন। শের আফগান মক্তব ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মেহের উন্নিসার অনুরোধেই। দিল্লীর মোগল সম্রাটের সঙ্গে বর্ধমান রাজ শের আফগানের পত্র আদান প্রদান হতো আরবী বা ফরাসী ভাষায়। ধীরে ধীরে গ্রামে গঞ্জেও মক্তব ও মাদ্রাসা গড়ে ওঠে। মেহের উন্নিসার যখন বিয়ে হয় শের আফগানের সঙ্গে তখন তাঁর বয়স পনেরো। শের আফগান অন্তঃপুরে মৌলবী রেখে মেহের উন্নিসাকে উর্দু, আরবী ও ফার্সী ভাষা শেখান। পরবর্তী কালে এই মেহের উন্নিসাই দিল্লীর সম্রাটের বেগম হন ও পরোক্ষে ভারতশাসন পরিচালনা করেন ১৫ বৎসর ধরে (১৬১২ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৬২৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত) - তার পটভূমিকা বর্ধমানেই রচিত হয়েছিল।

প্রাচীন বর্ধমানের অস্তিত্ব রয়েছে বেড়ের নবাব বাড়িতে। এই মুসলমান নবাবগণ

বংশ পরম্পরায় মুসলমান ছাত্রগণের জন্য মক্তব চালিয়ে এসেছেন। এখানে আরবি - ফারসী শিক্ষা দেওয়া হতো এবং গরীব ছাত্রদের বৃত্তিদানের ব্যবস্থা ছিল। বর্ধমান রাজসভায় ভারতচন্দ্র কিছুদিন অতিবাহিত করেন। তাঁর রচনায় বর্ধমানের শিক্ষা ব্যবস্থার একটা পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতচন্দ্রের লেখায় আছে ঃ

"দ্বিতীয় গড়েতে দেখ যত মুসলমান
সৈয়দ মল্লিক, সেখ, মোগল-পাঠান।"
তুর্কী আরবী পড়ে ফারসী মিশালে।
ইলিমিলি জপে সদা ছিলিমিলি মালে।।

এই সময় উচ্চ বংশের মুসলমান যথা সৈয়দ, মল্লিক, সেখরা তুর্কী, আরবি ও ফারসী পড়তেন। সুলতানের রাজদরবারে বা প্রশাসন বিভাগে চাকুরীর জন্য হিন্দুর ছেলেরাও ফারসী পড়তে লাগলো।

বর্ধমানের বাদশাহী নাম - শরিফাবাদ। শরিফের অর্থ সম্ভ্রান্ত। মুসলমান শাসনের আগেই বর্ধমান শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে অভিজাত ছিল। মুসলমান শাসনের সময় পীর ও পয়গম্বরগণও শিক্ষাবিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। আইন-আকবরীতে আছে পীর বাহরাম সাক্কা সম্রাট আকবরের রাজদরবারে একজন দার্শনিক কবি ও শিক্ষা গুরু ছিলেন। তিনি সুফী সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন, ফলে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই তাঁর শিষ্য ছিলেন। হিজরী ৯৭০ অব্দে (১৫৬২-৬৩ খৃষ্টাব্দে) তিনি বর্ধমানে আসেন। কিছুদিন বাদ এখানেই দেহ রাখেন। ময়ূর মহলে তাঁর সমাধি আছে। কবি পীরবাহরাম হিন্দু ও মুসলমানদের চুম্বকের মত আকর্ষণ করতেন। তিনি কয়েকটি মিলন কেন্দ্র ও ধর্ম শিক্ষার কেন্দ্র গড়ে তোলেন। সম্রাট আকবর এই সাধক কবির একজন পরম ভক্ত ছিলেন। সাক্কার দেওয়ান বা কবিতার সংখ্যা খুব বেশী ছিল না। বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরীতে রক্ষিত দুটি খুব সুন্দর দেওয়ান(কবিতা) পার্সী ভাষায় আছে। বর্ধমানে থাকা কালে তিনি কয়েকটি কবিতা লিখেছেন (Persian Works ms - 251 and 365)। বাহরাম সাক্কার কবিতা জীবনধর্মী, মর্মস্পর্শী ও গভীর ধর্মভাবাচ্ছন্ন। এখনও পীরবাহরামের আস্তানায় সেবকরা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে এই দেওয়ান পাঠ করেন। কবিতাগুলি সেকেস্তা - মাত্রা ছেদহীন ফারসী ভাষায় লেখা। একটি কবিতার অনুবাদ ঃ

আমি আত্ম নিগ্রহের (রূঢ়তা) ভেঙ্গে ফেলেছি
আমি দেখবো তাতে কি হয়?
আমি অপযশের (ভালবাসার) বাজারে বসেছি,
আমি দেখবো তাতে কি হয়?
আমি গর্হিতভাবে সাধু সংসর্গে জীবন অতিবাহিত করেছি
আমি দেখবো তাতে কি হয়?

লোকে আমায় সময় সময় ধার্মিক
আবার পরোক্ষণেই লম্পট আখ্যা দেয়
লোকে যা ইচ্ছে বলুক আমি তাই মানি
আমি দেখবো এতে কি হয়?

বাহরাম।

শের আফগানের বেগম মেহের উন্নিসা কেবল নিজেই আরবী - ফারসী ভাষা শেখেন নি, তিনি ফারসী ভাষা শিক্ষার বিস্তারে শের আফগানের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তিনি নিজেও একজন কবি ছিলেন।

"বর মাজারে মা গরীবাঁ নে চেরাগে নে গুলে
নে পারে পারওয়ানা সেজাদ নে সাদায়ে বুলবুলে।"

অর্থ ঃ আমার ন্যায় দীন দরিদ্রের কবরে কোন প্রদীপ জ্বলবে না। কোন ফুলও দেওয়া যাবে না। কোন প্রেমিক - পতঙ্গের পালক এখানে পুড়বে না, কোন বুলবুলের আওয়াজও শোনা যাবে না।

এই লাইন দুটি মেহের উন্নিসার রচনা। মেহেরের যৌবন কেটেছে এই বর্ধমানে। শিক্ষা বিস্তারে তিনি যেমন সক্রিয় ছিলেন কবিতা রচনা করেছেনও বেশ কয়েকটি। "নূরমহালী বাদশা", "দুদামী পেশোয়াজ", "পাঁচ তোলিয়া উড়ানি", "কিনারি ফর্স চন্দনী" - নূরজাহানের দেওয়া নামগুলি পোষাক, অলঙ্কার, আভরণ অভিজাত মুসলমান সংস্কৃতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। শুধু মুসলমান ছেলে মেয়েদের শিক্ষা দান করেই ক্ষান্ত হন নি তিনি, কমপক্ষে পাঁচশত অনাথ বালিকা - কি হিন্দু কি মুসলমান - সৎপাত্রে বিয়ে দিয়েছিলেন।

ষোড়শ শতকের কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী বর্ধমানের পূর্ব-দক্ষিণে দামুন্যা গ্রামের টোলে অধ্যাপনা করতেন। সলিমাবাদের ডিহিদার মামুদ শরিফের অত্যাচারে তিনি গ্রাম ত্যাগ করেন ও মেদিনীপুরের আড়ারা গ্রামের জমিদার বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয়ে থাকেন ও এখানেই বিখ্যাত চণ্ডীমঙ্গল কাব্য (১৫৭৯ খ্রীঃ) লেখেন। চণ্ডীমঙ্গল থেকে মধ্য যুগের এই রাঢ় বর্ধমানের যে চিত্র পাওয়া যায় তা নিখুঁত, জীবন্ত ও মর্মস্পর্শী। সে সময় বেশীর ভাগ মানুষই ছিল দরিদ্র। গ্রামে পাঠশালা, টোল ও চতুষ্পাঠী ছিল এবং পাশাপাশি মসজিদে মক্তব ও মাদ্রাসা ছিল। পড়াশুনা করত বেশীর ভাগই বর্ণ হিন্দু ও অভিজাত মুসলমানগণ। পড়াশুনার অবকাশই ছিল না। কিন্তু দক্ষিণ রাঢ়ে তার ব্যতিক্রম ছিল। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন, "দক্ষিণ রাঢ়ের স্থানে স্থানে এখনও ডোম ও বাগ্দী পণ্ডিতের টোল আছে। সেখানে বামুনের ছেলেরাও পড়ে।" এই সব ডোম, বাগ্দীরা ধর্ম ঠাকুরের পূজারী। ধর্ম চর্চার জন্য তারা সংস্কৃত ভাষা পড়তেন - তবে এদের সংখ্যা নেহাতই অল্প। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম শ্রীমন্তের বিদ্যাচর্চার যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে বোঝা যায়, সেই সময়ে বর্ধমানে শিক্ষাদানের ভালো ব্যবস্থা

ছিল।

বর্ধমান রাজ কীর্তিচাঁদের (১৭০২ - ৪০ খ্রীষ্টাব্দ) রাজ সভায় আশ্রিত সভা কবি ছিলেন ধর্ম মঙ্গলের কবি ঘনরাম চক্রবর্তী। লাউসেন কর্পূরধবলের বাল্যশিক্ষা সম্পর্কে ঘনরাম লিখেছেন ঃ

অকারাদি ককারান্ত জানা হৈল স্বর।
ককারাদি ক্ষকারান্ত হল বর্ণাপর।।
তিনদিনে দুই ভেয়ে যতনে শিখান।
অভিলাষে আঙ্ক আঙ্ক ফলাদি বানান।।
অষ্ট ধাতু অষ্ট সিদ্ধ সুবন্ত অনর।
পড়িল অঙ্কের ভেদ বুদ্ধে করি ভর।।
ধাতুনাম শব্দ ভেদ পড়িগল অপর।।
পরম সুবেশ দোহে সুশীল সুন্দর।।
বেদবাণী জানিতে পাণিনি পড়ে রায়।

এই চিত্র তৎকালীন রাঢ় বর্ধমানের পাঠশালার পাঠ পদ্ধতির চিত্র। অকারাদি - অর্থাৎ স্বরবর্ণের পর, ককারাদি অর্থাৎ ব্যঞ্জনবর্ণের পাঠ, তারপর যুক্তবর্ণ, ধাতুরূপ, শব্দরূপ, গণিত ও শেষে ব্যাকরণ। মঙ্গল কাব্যে রাঢ় বর্ধমানের সমাজ চিত্রগুলি এত নিখুঁত যে অবাক হয়ে ভাবতে হয়।

মঙ্গল কাব্যের আর একজন কবি শ্রীরামপুর কাইতির রূপরাম চক্রবর্তী। তাঁর কাব্যেও রাঢ় বর্ধমানের শিক্ষা ব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি রূপরাম পড়াশুনা করেছিলেন পাষণ্ডা গ্রামে রঘুরাম চক্রবর্তীর টোলে। বর্ধমানের কুলীন গ্রামে পঞ্চদশ শতকে আর্বিভূত হন "শ্রীকৃষ্ণ বিজয়" কাব্যের মালাধর বসু। কুলীন গ্রাম ও পার্শ্ববর্তী জৌগ্রামে টোল ও চতুষ্পাঠী ছিল। মালাধর বসুর "শ্রীকৃষ্ণ বিজয়" চৈতন্য প্রভুর প্রিয় গ্রন্থ। তাঁর পুত্র রামানন্দ বসু মহাপ্রভুর শিষ্য ও ভক্ত ছিলেন। মহাপ্রভু নিজে রামানন্দের সঙ্গে কুলীন গ্রামে এসেছিলেন। গৌড়ের সুলতান মালাধর বসুকে গুণরাজখান উপাধিতে ভূষিত করেন। জৈন তীর্থঙ্কর "মহাবীর বর্ধমান" বর্ধমানে এসেছিলেন এবং এখান থেকে তিনি পদব্রজে জয়ন্তী গ্রাম বা জৌগ্রাম যান। ঋজুকুলা নদীর তীরে জৌগ্রামে তিনি সিদ্ধিলাভ করেছিলেন এবং সিদ্ধি শেষে এক মহা ধর্ম সম্মেলন করেছিলেন। দেশ বিদেশের প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ ও টোল চতুষ্পাঠীর পণ্ডিতগণ এই সম্মেলনে ধর্মালোচনা করেন।

১৪৯৬ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান জেলার কাটোয়ার সন্নিকটে ঝামটপুর গ্রামে জন্মগ্রহন করেন চৈতন্য চরিতামৃতের লেখক কৃষ্ণদাস কবিরাজ। ষোড়শ শতাব্দী বাঙলা ছিল চৈতন্যদেবের প্রেম ভক্তিতে ডুবুডুবু। বাঙলায় তুর্কী আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে বাঙলার জাতীয় জীবনে

যে প্রচণ্ড আঘাত এসেছিল - তা শাপে বর হয়ে দেখা দিল। মধ্যযুগীয় দিগ্‌ভ্রান্ত বাঙালী - অন্যায় অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে দূর্বল ও নির্বীর্যে - ক্লীবত্বের অভিশাপ মাথায় নিয়ে যে জীবন - যন্ত্রণা ভোগ করছিল - তার অবসান হলো। দুর্যোগপূর্ণ আকাশে মেঘমুক্ত উজ্বল আলোর বন্যা নিয়ে আসে যে সূর্য, তার চেয়েও দীপ্যমান হয়ে আবির্ভূত হলেন চৈতন্য মহাপ্রভু। সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জীবনধর্মে বাঙলার বুকে নবজাগরনের সূচনা হলো। তার ঢেউ রাঢ় বর্ধমানেও আছড়ে পড়লো। কাটোয়ার শ্রীখণ্ডে মহাপ্রভুর শিষ্যরা গড়ে তুললেন সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র। দেখতে দেখতে গঙ্গা ও অজয় নদের তীরবর্তী গ্রামগুলি পাটুলী, সমুদ্রগড়, অগ্রদ্বীপ, দাঁইহাট, কালনা প্রভৃতি গ্রাম ও জনপদগুলি সংস্কৃত শিক্ষা ও বৈষ্ণব সাহিত্য সৃষ্টির জোয়ারে ভেসে গেল, মুছে গেল বাঙালীর এতদিনের জড়ত্ব, ক্লেদ, কলুষতা। চৈতন্য যুগে যে জ্ঞান চেতনার প্রবাহ সৃষ্টি হয়েছিল, চৈতন্য পরবর্তীকালেও তার রেশ ছিল।

ষোড়শ শতকের শেষভাগে কাটোয়ার সন্নিকটে সিঙ্গি গ্রামের কবি মহাভারতকার কাশীরাম দাস গাইলেন –

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পূণ্যবান।।

কাঁদড়া গ্রামে চৈতন্য পরবর্তী কবি জ্ঞানদাস নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর পত্নী জাহ্নবা দেবীর নিকট দীক্ষা নিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন পদাবলী সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদকর্তা। জ্ঞানদাসের কবি প্রতিভা চণ্ডীদাসের সঙ্গে তুলনা করা হয় ঃ

আয় দেখি গিয়া গোরা চাঁদে।
এ চাঁদ বদনের আগে গগনের চাঁদ কি লাগে
চাঁদ হেরি চাঁদ লাজে কাঁদে।।

এই ষোড়শ শতকেই (১৫২৩ খ্রীষ্টাব্দে) বর্ধমান জেলার কোগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন বৈষ্ণব কবি লোচন দাস। তার "চৈতন্য মঙ্গল কাব্য" বৈষ্ণব সাহিত্য ও দর্শনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। যেমন -

অমিয় মথিয়া কেবা নবীন তুলিল গো
তাহাতে গড়িল গোরা দেহা।
জগত ছানিয়া কেবা রস নিঙাড়িছে গো
এক ভৈল শুধুই সুনেহা।

বর্ধমান শহরের সন্নিকটে কাঞ্চননগরে এই শতকের কবি গোবিন্দদাস কর্মকার রচিত 'গোবিন্দদাসের করচা' মহাপ্রভুর দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের রোজনামচা বৈষ্ণব সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। ষোড়শ শতকেই (১৫১১ খ্রীষ্টাব্দ) বর্ধমান জেলার আমাইপুর গ্রামে "চৈতন্য মঙ্গল" কাব্যের রচয়িতা জয়ানন্দ মিশ্র জন্মগ্রহণ করেন।

আর একজন পদাবলী কবি শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার গৌরাঙ্গ ভক্তির অপূর্ব নিদর্শন রেখেছেন তাঁর কাব্য সুষমায়। এই শতকেই বর্ধমান জেলার দেনুড় গ্রামে বৈষ্ণব কাব্যের বেদব্যাস কবি বৃন্দাবন দাস "চৈতন্য ভাগবত' রচনা করেন ১৫৩৫ খ্রীষ্টাব্দে। শ্রী শ্রী নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর নির্দেশে তিনি চৈতন্য জীবনীকাব্য রচনা করেন।

কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস।
চৈতন্য লীলাকৃত ব্যাস বৃন্দাবন দাস।।

পঞ্চদশ শতকে ১৪৯৬ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান জেলার কাটোয়ার সন্নিকটে ঝামটপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন বৈষ্ণব কাব্যের মহাকবি 'চৈতন্য চরিতামৃত' কাব্যের স্রষ্টা কৃষ্ণদাস কবিরাজ। তিনি শ্রী শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর সংস্পর্শে আসেন বাল্যকালেই। চৈতন্য জীবনী কাব্যের মধ্যে তাঁর কাব্যখানি শ্রেষ্ঠতম, ভক্তিরসের অপূর্ব নিদর্শন –

চৈতন্যচরিতামৃত যেই জন শুনে।
তাঁহার চরণ ধুঞা করি মুঞি পানে।।

পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে পণ্ডিত রঘুনাথ শিরোমণি মানকরের নিকটে কোটা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। রঘুনাথ ছিলেন নিমাই পণ্ডিতের সহপাঠী। নবদ্বীপের টোলে একসঙ্গে পড়তেন। ন্যায়শাস্ত্র ও দর্শনে রঘুনাথ ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। রঘুনাথ কোটা গ্রামে তাঁর টোল খুলেছিলেন, সেখানে বহুদূর থেকে ছাত্ররা ন্যায় পাঠ নিতে আসতেন। বাঙলার এই গৌরব আর কোন পণ্ডিতের ভাগ্যে জোটেনি। মিথিলার বিখ্যাত পণ্ডিত পক্ষধর মিশ্র এখানে এসে রঘুনাথকে তাঁর কৃতিত্বের জন্য সম্বর্দ্ধনা দিয়েছিলেন।

পঞ্চদশ শতকে আর একজন শিক্ষাচার্য বিখ্যাত হয়ে আছেন। তাঁর নাম 'বুনো রামনাথ'। কালনা মহকুমার সমুদ্রগড় গ্রামে তাঁর জন্ম। সমুদ্রগড়ের চতুষ্পাঠীতে বহুদূর থেকে ছাত্রগণ আসতেন এই পণ্ডিত প্রবর দার্শনিকের কাছে ন্যায় পাঠ নিতে। তাঁর কাছ থেকে পাঠ নিয়ে বহু শিষ্য নিজ গ্রামে টোল খুলেছিলেন। রামনাথ সর্বকালের সর্বযুগের আদর্শ শিক্ষাচার্য ও মণীষী। অষ্টাদশ শতকে বর্ধমানের দুজন মহিলা শিক্ষাচার্য বর্ধমানের প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থায় চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। কোটা গ্রামের রূপমঞ্জরি এবং সোয়াই গ্রামের হটি বিদ্যালংকার। সংস্কৃত সাহিত্য পড়ার জন্য ছেলের বেশে সরগ্রামের পণ্ডিত গোকুলানন্দ তর্কালংকারের টোলে ভর্তি হন রূপমঞ্জরী। বাঙলার পাঠ শেষ করে তিনি কাশী চলে যান। গ্রামে ফিরে তিনি চতুষ্পাঠী খুলে বসেন। তাঁর কাছে বিভিন্ন শাস্ত্রে পরামর্শ নেবার জন্য বহু দূর থেকে জ্ঞান পিপাসু মানুষ ছুটে আসতেন। চিরকুমারী বিদূষী রূপমঞ্জরী রাঢ় বর্ধমানের শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি জ্যোতিষ্ক।

হটি বিদ্যালংকারও কাশীতে শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য আসেন। সেখানে তিনি বেদ, বেদান্ত উপনিষদ আয়ত্ত করে বিদ্যালংকার উপাধি নিয়ে শাস্ত্রচর্চা করেছেন তিনি। কাশীতে তিনি যে ব্যুৎপত্তি ও দক্ষতা অর্জন করেছিলেন তাতে তাঁকে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের

সম্মান দেওয়া হয়। কাশীতেই তিনি চতুষ্পাঠী খুলে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করতে লাগলেন। শুধু বাঙলার নয় ভারতীয় নারী সমাজে হটি বিদ্যালঙ্কার একটি উজ্জ্বল রত্ন। রাঢ় বর্ধমানের গৌরব।

নবদ্বীপ বিদ্যাসমাজের প্রেরণায় রাঢ় বর্ধমানের বহু বড় বড় গ্রামে টোল বা চতুষ্পাঠীর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এই টোল বা চতুষ্পাঠীগুলি খ্যাতিনামা সংস্কৃত অধ্যাপকগণ পরিচালনা করতেন। এতে স্থানীয় বিত্তশালী জমিদারগণ মুক্ত হস্তে অর্থ দান করতেন।

সপ্তদশ শতকে বর্ধমান জেলার জৌগ্রামে সুবিখ্যাত পণ্ডিত কলানিধি ভট্টাচার্যের বিদ্যাপীঠ ছিল। তখন নবদ্বীপ ও শান্তিপুর এই সব কেন্দ্রগুলির আদর্শ ও প্রেরণা ছিল। সেই সময় শান্তিপুরে অধ্যাপনা করতেন প্রবর পণ্ডিত বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য। তাঁর নিকট পাঠ নিতে দূরদুরান্ত থেকে ছাত্রগণ আসতেন। এই সময় বর্ধমান জেলার কাইতি শ্রীরামপুর গ্রামে ধর্মমঙ্গলের কবি রূপরাম চক্রবর্তীর পিতা শ্রীরাম চক্রবর্তী একটি বড় টোল ছিল। এই টোলে ছাত্র সংখ্যা ছিল একশ কুড়ি জন। রায়না থানার পাষণ্ডা ও সন্নিকটবর্তী আড়ুই গ্রামের টোলও চৌ-পাড়ি ছিল। এখানে প্রায় দেড়শত ছাত্র ছিল। রামবাটি গ্রামেও টোল ছিল, কবি ঘনরাম চক্রবর্তী এখানে পড়াশুনা করেছিলেন।

এই সময় নবদ্বীপের শংকর তর্কবাগীশ ও শিবনাথ ন্যায় বাচস্পতী বিখ্যাত ছিলেন। এ ছাড়া কুমার হট্টের বলরাম তর্কভূষণ ও শিশুরাম তর্কপঞ্চানন, ত্রিবেণীর রামচাঁদ তর্কভূষণ, কানাই ন্যায় বাচস্পতি, বাঁশ বেড়িয়ার ব্রজবিদ্যাবাগীশ রামকিশোর তর্কপঞ্চানন, ভৈরব তর্কবাচস্পতি, রাঘব তর্কভূষণ, শান্তিপুরের মোহন বিদ্যাবাচস্পতি, কলিকাতার চতুর্ভূজ ন্যায়রত্ন, অনন্তরাম বিদ্যাবাগীশ, শালকিয়ায় জগমোহন তর্কসিদ্ধান্ত, জনাইয়ের অভয়াচরণ তর্কালঙ্কার প্রভৃতি বিখ্যাত অধ্যাপক ছিলেন। রাঢ় বর্ধমানে এঁদের বহু শিষ্য বিদ্যার্জন শেষ করে নিজ গ্রামে ফিরে গিয়ে টোল বা চতুষ্পাঠী খুলেছিলেন। পণ্ডিতগণের এই তালিকাটি পাওয়া গেছে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের এক বংশধরের পুরাতন পুঁথি থেকে। এখানে ৬৮টি গ্রামের নাম পাওয়া যাচ্ছে, যে গ্রামগুলিতে বড় টোল বা চতুষ্পাঠী ছিল। তার মধ্যে নদীয়া জেলার তিনটি, চব্বিশ পরগণার একটি, হাওড়া জেলার দুটি, বর্ধমানের সতেরোটি এবং হুগলীর পঁয়তাল্লিশটি গ্রাম রয়েছে। এই টোলগুলিতে ১৩৪জন ভট্টাচার্য পণ্ডিতের নাম রয়েছে। যারা অধিকাংশই ন্যায় ও স্মৃতির পণ্ডিত দিকপাল শিক্ষাচার্য।

মধ্যযুগে মুসলমান সুলতানের সহায়তায় সরকারী কাজে ফারসী ভাষা ও শিক্ষা রাজানুকূল্যে পরিচালিত হত। মসজিদে বা মক্তবেও তা সম্প্রসারিত হয়েছিল। কিন্তু সংস্কৃত শিক্ষার ঢেউকে তা দমিয়ে দিতে পারেনি। টোলে সংস্কৃত শিক্ষা কি ভাবে হতো তার বর্ণনা রূপরাম চক্রবর্তীর 'পুস্তকজায়' নামক দ্বিতীয় খণ্ডে আছে। 'কাব্য, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, তিথি উদ্বাহ - প্রায়শ্চিত্ত দুর্গোৎসবাদি, রঘুনন্দনের অষ্ট বিংশতি

তত্ত্ব' - এই সকল বিষয় টোলে পড়ানো হত। তখন টোলের নাম ছিল - চৌপাড়ি (এখনকার চতুষ্পাঠী)। চৌপাড়ি পরিচালনার জন্য জমিদারগণ কৃতি ছাত্রদের বৃত্তি ও জলপানি দিতেন। গ্রামে জনসাধারণের কাছে বিবাহ বা শ্রাদ্ধাদিতে 'চৌপাড়ি আদায়' করা হতো। রাজস্ব বা শিক্ষাকরের মত ইহা অবশ্য দেয় ছিল। অল্পশিক্ষিত পণ্ডিতগণের নিজ নিজ পাঠশালা ছিল। এখানে সংস্কৃতর পরিবর্তে বাংলা ভাষা পড়ানো হতো এতে ব্রাহ্মণেতর জাতির ছেলেরাই পড়তো। মুসলমান ছেলেরাও একই সঙ্গে এই পাঠশালায় পড়তো।

সেকালে পাঠশালা বা টোলে ছাত্র ভর্তি করা হতো পাট্টা - কবুলতির মত দলিল করে। হুগলী জেলার আরামবাগ অঞ্চল হতে এরকম একটা দলিল পাওয়া গেছে (পুরাতন চিঠিপত্র সেকালের শিক্ষা ব্যবস্থা - ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল)। দলিলটি নিম্নরূপ

শ্রী শ্রী হরি
সন ১২৬৬ সাল
মহামহিম শ্রীযুক্ত সোনাতন সরকার বরাবরেষু -
লিখিতং শ্রীশেখ কালাচাঁদ সাং নওপাড়া পরগণে হাবিলী কষ্য একরার পত্রমিদং কার্জ্যানাঞ্চ আগে আপনবার চৌপাড়ি আমাদের গ্রামে থাকায় আমার পুত্র শ্রীশেখ ফজুল হোসেন ও শ্রী তর্কযুদ্ধ হোসেন এই দুই লোককে আপনার নিকট লেখাপড়া কোরিবার কারণ পাটকেলট কট হরফ খাতাসোহী ও হিসাব নিকাশ বাঙ্গালার হিসাবে ও হরফে ও ইস্তাহামে পুরা করিআ দিবেন। আর বাঙ্গালার হিসাব ও সন্ধান স্বর আ আঁকজোকে তৈআর করিয়া দিবেন। ইস্তেহামে পুরা করিয়া দিবেন সন ১২৬৬ সাল নাংসক ১২৬৭ সাল মাহ আশ্বীন তক তৈয়ার করিআ দিবেন আর আমার নিকট দুরমাহা মাঘ মোট চুক্তী সর্বযুদ্ধা কোং ২৫ পোচিষ টাকা দিবো টাকার করার ফি মাহাতে।। আট আনা দিবো পরে এই কেলট্র কট করারের পরে ইস্তাহামে পুরা করিআ ইস্তাম নিআ আপনকার মাহীনে হিসাব নিকাস করিয়া দিবো আর এই করারের ভিতর তৈআর কোরিআ না দিতে পার তবে আমার টাকা ফেরত আপনার ঠাঁই লইবো আর এই টাকা জখন দিবেন এই একরারের পীঠে রোশীদ দিবো এই তদাখ্যা একরার পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১২৬৬ সাল তারিখ ১৩ শ্রাবণ -

শ্রী সেখ কালাচাঁদ
সাং - নওপাড়া

ছাত্রভর্তির এই দলিলটি একটি চুক্তি পত্রের মত। কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়ঃ আবেদনকারী মুসলমান হলেও শ্রী শ্রীহরি দিয়ে চুক্তিপত্র আরম্ভ করেছেন, একশত বছর আগে শিক্ষার যাবতীয় (থাকা - খাওয়া ও পরা) ব্যয়ভার ২৫ টাকায় হতো, একবৎসরের মধ্যে শিক্ষা পূর্ণ হতো - অক্ষর পরিচয়, খাতা সহি, হিসাব নিকাশ, সন্ধান নম্বর - আ, আঁকজোখ ইত্যাদি। শিক্ষাগুরুকে চুক্তি মত শিক্ষা দিতে না পারলে সমস্ত

টাকা ফেরত দিতে হত। এই চুক্তি পত্র অনুমান করা যায় যে মধ্য যুগ থেকে বংশ পরম্পরায় চলে আসছে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত।

পাঠশালায় শিক্ষা দেওয়া হতো বাঙলা ভাষা, গণিত, আর্যা ও বিভিন্ন ধরনের হিসাব। প্রাচীন চিঠিপত্র থেকে ৯৮ প্রকারের 'প্রস্ত' পাওয়া গেছে। একটি সাধারণ গৃহস্থঘরের ছেলেকে ব্যবহারিক জ্ঞানের দিক হতে পরিণত করতে এই 'প্রস্ত' শিক্ষা প্রণালী যথেষ্ট ছিল। পাকা সংসারী হতে গেলে যে বিষয় গুলি অবশ্যই জানা দরকার পাঠশালায় তাই পড়ানো হতো। প্রস্তের সুরুতে অক্ষর শিক্ষা, তারপর যুক্তাক্ষর বানান ও নামতা কড়া - গণ্ডার হিসাব মুখস্থ করতে হতো। মাহিন্দারের মাস মাইনার হিসাব, ধান-চাল-আলু-গুড় প্রভৃতি জিনিষপত্র কেনা বেচার হিসাব শিখতে হতো। এমনকি স্ব-স্ব বৃত্তি বজায় রাখার জন্য সোনা, রূপা, পিতল, কাঁসা প্রভৃতি খরিদ করার হিসাব, মহাজনী কারবারীর সুদকষা, বাটা কষা আবশ্যিক ছিল। মুদিখানা দোকানদারী চালানোর জন্য মুনাফা - জমা - খরচ, 'পসরি - জায়', মনকষা প্রভৃতি শিখতে হতো।

এছাড়া বহু রকমের হিসাব যেমন কাঠাকালি, ইটকালি, নৌকাকালি, দেওয়ালকালি, দধি কালি, পুষ্করিণী কালি, দুধ কালি শেখবার প্রথা ছিল। সাধারণ ভূমির মাপ, রাস্তার মাপ, বার-তিথি, হিসাব-কানুন, চিঠিপত্র লেখার ধারা, সেয়া-খত লেখার পদ্ধতি এই পাঠশালাতেই হতো। জমি-জমা সংক্রান্ত হিসাব যেমন - জমাগুজস্তায় খাজনা, দাখিলা, দলিল, পাট্টাকবুলতি, ইজারা পাট্টা, খোসকবালা, ইজারা, দস্তাবেজ শেখানো হতো। অংকের ধারার পাঠও ছিল বিচিত্র ঃ উদকষ্টি, অষ্টকোটা, লবণকোটাবৃদ্ধ আউটি, অতিবৃদ্ধ আউটি। আইন আদালত সম্পর্কেও এই পাঠশালাতেই শিক্ষা দেওয়ার কাজ ছিল - আদালতের আর্যা, মোক্তারনামা, জবাবল জমা, বন্ধক জবাব, জমানবন্দি রোরকারী, ফয়সালা, এত্তালানামা, এতার রশিদ, শমন জারি, ইস্তেহার ফরিয়াদী, এত্তেলা প্রভৃতি। রাঢ়ের সর্বত্র মুসলমান রাজত্বের শুরু থেকে এই পাঠ-পদ্ধতি ছিল প্রতি পাঠশালাতেই। অর্থাৎ পাঠশালার বিদ্যার্জন শেষ করেই একজন শিক্ষার্থী সমাজ ও সংসারে উপযুক্ত নাগরিক হিসাবে যে কোন দায়িত্ব গ্রহন করার দক্ষতা অর্জন করতো। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, মানবিকতার প্রকাশ, মূল্যবোধের অনুভূতি ও সদাচার মণ্ডিত আদর্শ জীবন এই পাঠশালার শিখন পদ্ধতির মধ্যেই শিক্ষার্থীর মানসমুকুলে সঞ্চারিত হতো - এ কম গৌরবের নয়। হিন্দু বৈদিক ধর্মের বহু প্রতিভাধর ব্যক্তি এই ভাবেই শিক্ষাজীবনের পাঠ গ্রহন করে সমাজ ও দেশকে ধন্য করেছেন। একটি প্রাচীন গ্রাম থেকে প্রাপ্ত দ্বিজ দুর্গারাম ভণিতায় দেখা যায় পাঠশালার পাঠ্যতালিকায় 'শিশু জ্ঞানবৃদ্ধির' শিক্ষণ পদ্ধতি। এই পুঁথিতে চৌত্রিশ অক্ষর শিক্ষাদানের কথা আছে। বর্তমানে বাংলা স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ মিলে মোট ৮৬টি অক্ষর রয়েছে। এই ৩৪ অক্ষরের ধারা আমরা বাঙ্গালা মঙ্গলকাব্যের 'চৌত্রিশা' স্তরের মধ্যে রক্ষিত দেখতে পাই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কাশীতে প্রচলিত মহাজনী বর্ণমালা ৩২ অক্ষরে গ্রথিত।

অক্ষর পরিচয় ও তার পরে শিশু শিক্ষা কি ভাবে হত তা পুঁথির কয়েকটি পঙক্তি তুলে দিলে পরিষ্কার হবে –

প্রথমে আরম্ভ বিদ্যে চৌত্রিশ অক্ষর - - - - -
কিল্লি আদি - - - আংকো আস্কো সিদ্ধি লিখ না করিহ হেলা
অতোর্পর কড়ির অঙ্ক সিখ জতো বালা কড়াকে গুণ্ডাকে লিখ
স্বটিকে বুড়িকে লিখ পুনকে আদি জতো চৌকে লিখিত না করি
হেলা একে চন্দ্র দুয়ে পক্ষ তিনে নেত্র চেরে বেদ পঞ্চবান ছয় ঋতু কয়ে
সাতে সমুদ্র আটে বসু নয়ে নবোগ দশে দ্বিগ জান জতো সিবু।

পাঠশালায় যেসব বাঙ্গালা পুঁথি পড়ানো হতো তার মধ্যে শঙ্করাচার্য কৃত গঙ্গাস্তব, আশ্রয় নির্ণয়, রাধারসকারিকা, কুম্ভকর্ণের রায়বার - বাঙলা, অঙ্গদের রায়বার, খুল্লনা ও ফুল্লরার বারমাসী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া সংস্কৃত ও বাঙলার অন্য বৈষ্ণব নিবন্ধ, স্তোত্রাদি, আবৃত্তি ও পড়ানো হতো। এই সব পাঠশালায় মুসলমান ছাত্রগণও পড়তো। তবে এই সব ছাত্রদের মুসলমান সমাজের বিভিন্নধারা পৃথকভাবে সেখান হতো যেমন; 'মোছলমানের প্রকরণ', পীর মুরিদকে, দাদোকে, পোতাকে, দাদী - নানীকে, বড়োশালা, বড়ো বোনকে বোনাইকে খত লেখবার স্বতন্ত্র সেরেস্তা শেখানো হতো।

মধ্যযুগের শেষে অর্থাৎ সুলতানি আমলের শেষে ব্রিটিশের আগমনের সময়ে পড়ুয়াদের মধ্যে অনেক ভুঞা, বণিক, নায়েক, ঘোষ, চোঙ, বৈরাগী, সো পদবীধারী পড়ুয়ার নাম পাওয়া যায়। তার থেকে মনে হয় - পাঠশালায় উচ্চবর্ণ হিন্দু ও অভিজাত মুসলমান ছাড়াও সাধারণ গরীব ও মধ্যবিত্ত পড়ুয়ার সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে থাকে। জাতি ও বৃত্তিগতভাবে পাঠশালায় বিদ্যাদান করতেন পণ্ডিত মশাই –

'অষ্টাদশ ছাওয়াল পড়িছে নিরন্তর অষ্টাশব্দী আদিকরি পড়িল অমর। বিবিধ প্রকারে অঙ্কশিখি আছে সভে অষ্ট কোটা অষ্টপর শিক্ষা কষ্টের। তিলির নন্দন তার নারদিতে বাস কঠিন কঠিন অঙ্ক করিছে প্রকাশ। শ্রীরামদুলাল দ্বিজ কবিছান্দে কয় অঙ্কহল্যে অস্থির কর্য়ালয়'।

এখানে দেখা যাচ্ছে যে তিলি জাতি তেল ব্যবসা করতো বলে কঠিন কঠিন অঙ্ক কষছে। বিশ্বভারতীর সংগ্রহশালায় সেকালের পাঠশালার কতকগুলি দুর্লভ কড়চা রক্ষিত আছে। এতে পণ্ডিত মহাশয়দের নাম, শিক্ষণ পদ্ধতি, পত্র লিখবার নিয়ম, হেঁয়ালি ও ছড়া লিপিবদ্ধ রয়েছে। গল্পের ছলে কিভাবে গণিত শেখানো হতো তার নমুনা –

'সত্যকরি প্রবাস গেলেন প্রাণনাথ দিব্য করি গেলা দুটিশিরে দিয়া হাথ / বিরহে ব্যাকুল চিত্ত না শুনে বারণ নিঠুর হইয়া নাঞি আল্য প্রাণধন / তিলে শতবার মরিলেক

দিব কত দণ্ডকে সহস্রবার হই মূর্চ্ছা গত / রাগরসবান বসু একত্র করিয়া গরাস্ত্রি তেজিব প্রাণ বান সুচাইয়া / শ্রীরাম দুলাল দ্বিজ বলে শুন সখি জে কহিলে তাই দিবানিশি বুঝ্যা দেখি -।।'

এই কবিতাটির অন্তরালে একটি অঙ্কের উত্তর রয়েছে। অঙ্ক টির সমাধান হলো ঃ রাগ=৬, বাণ=৫, বসু=৮, মোট ২৫ এর থেকে বাণ সুচিয়ে অর্থাৎ ৫ বাদ দিলে থাকে বিষ (বিশ) এই গরল পান করে নায়িকা প্রাণ ত্যাগ করতে চান যদি না তার প্রিয়তম শপথ মেনে প্রবাস থেকে ফিরে আসে।

সেকালের পাঠশালায় আরও দুটি জিনিস পড়ুয়ারা পড়ত। তা হলো, শুভঙ্করী ও খনার বচন। ছাপাখানা ছিল না, তাই পুঁথি নকল করে পুরাতন জীর্ণপ্রায় পুঁথি বাতিল করা হতো। এই ভাবে ধারাবাহিকভাবে নকল পড়ার ও নকল করার জন্য মূল রচনার অদল বদল হতো। বহু ছড়াও। শিখন পদ্ধতির কড়চা লোকমুখে আজও চলে আসছে –

'পিঠে পিঠে শেয়াল চড়ে
গাছের কাঁটাল নীচে পড়ে
আঁধার হলে বাগানে যায়,
সবাই মিলে কাঁটাল খায়।'

কিম্বা,- 'তেল চুকচুকে পাতা
তার ফলে ধরে কাঁটা
খেতে সে মধুর মধুর
বীজ গোটা গোটা'।

সম্রাট আওরঙ্গজেবের দৌহিত্র নবাব আজীম-উশ-শান সপ্তদশ শতাব্দীতে বর্ধমান আসেন। বাঁকানদীর ধারে আলমগঞ্জ তারই সাক্ষ্য বহন করছে। আজীম- উশ- শানের উপস্থিতি সুলতানী সংস্কৃতির সঙ্গে মোগল সংস্কৃতির সূত্রপাত ঘটায়। এর পর ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহি বিদ্রোহের দুশ বছর এবং পলাশীর যুদ্ধের একশ বছর আগে বর্ধমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ক্ষত্রিয় কাপুর আবু রাই ও বাবু রাই লাহোর থেকে বর্ধমানে আসেন। ১৭৫৭ সালে ২৩শে জুন পলাশীর আমবাগানে কামান দাগলো লর্ড ক্লাইভ। এই একশ বছরে রাঢ় বর্ধমান রাজ বংশের আনুকূল্যে শিক্ষা বিস্তারে নুতন করে শিক্ষা ও সংস্কৃতির অনুসন্ধান করেছেন - আবু রাই, বাবু রাই (১৬৫৭ - ১৬৯৬), ঘনশ্যাম রাই, কৃষ্ণরাম রাই (১৬৯৭) জগৎরাম রাই (১৭০২), কীর্তিচাঁদ রাই (১৭০২-১৭৪০) চিত্রসেন রাই (১৭৪০-১৭৫৮), তিলকচাঁদ রাই (বা ত্রিলোকচাঁদ) (১৭৪১ - ১৭৭১) - পলাশীর যুদ্ধের আগে পর্যন্ত বর্ধমান রাজবংশের রাজগণ। রামপ্রসাদের কালিকা *মঙ্গলে* মধ্যযুগের শিক্ষার একটা পরিচয় পাওয়া যায় ঃ

'কল্পতরু তুল্য ভূপ আধিপত্য নানারূপ
দীন নাহি সে দেশে জনকে।।
চৌদিকে চোপাড়িময় পাঠচায় পড়ুয়াচয়
দ্রাবিড় উৎকল কাশীবাসী।
কারো বা ত্রিহুত বাড়ি বিদেশ স্বদেশ ছাড়ি
আগমন বিদ্যা অভিলাষী।'

বর্ধমানের চতুষ্পাঠী ও বর্ধমান মহারাজার (কীর্তিচাঁদের) আনুকূল্যে এই বিদ্যাশিক্ষার প্রসার ও পরিচয় রাঢ় বর্ধমানের প্রাচীন শিক্ষার গৌরব বৃদ্ধি করেছে। ১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠাগণ রাঢ় বর্ধমান আক্রমণ করলে বহু পাঠশালা, চতুষ্পাঠী ধ্বংস হয়, বহু পণ্ডিত নিহত হন এবং অনেক মুল্যবান পুঁথি নষ্ট হয়। গঙ্গারামের মহারাষ্ট্রপুরাণে আছে –

'তবে সব বরগি গ্রামা লুটতে লাগিল
যত গ্রামের লোক সব পলাইল।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পলায় পুঁথির ভার লইয়া
সোনার বাহনা পলায় কত নিক্তি হুড়পি লইয়া।'

১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে আলীবর্দ্দী খাঁ বাংলার তখন নবাব। অদৃশ্য হয়ে যায় রাঢ় বর্ধমানের শিক্ষার অগ্রগতি, প্রগতি ধারা, পাঠশালা, টোল, মাদ্রাসা, চতুষ্পাঠী ও মক্তব! বহু প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়, একটা বড় রকমের ছেদ পড়ে বর্তমানের চলমান জীবনে। ইংরেজদের আগমনে রাঢ় বর্ধমানে পাশ্চাত্য শিক্ষার দ্রুত প্রসার ঘটে এবং চতুষ্পাঠী, টোল ও চতুষ্পাঠী, টোল ও মাদ্রাসা ক্রমশ বন্ধ হতে থাকে। নূতন করে বাংলার জাতীয় জীবনে শিক্ষার পুরাতন শবের শ্মশানে পাশ্চাত্য শিক্ষার নব জাগরণের সূচনা হয়। সে আর এক অধ্যায়।

তথ্যঋণ ঃ

১) বর্ধমান রাজপরিবার ও আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা - ড. আবদুস সামাদ (রাজকলেজ শতবর্ষ স্মরণিকা ১৯৮১)

২) প্রগতির পথে - বর্ধমান জেলা কংগ্রেস স্মারকগ্রন্থ

৩) বর্ধমান গেজেটিয়র (১৯৯০)

৪) Freedom Movement in Burdwan - Bhaskar Chattopadhay And Ramakanta Chakraborty
(Burdwan District congress Centenary Celebration Commitee (1985) Burdwan)

৫) উনিশ শতকে বর্ধমান শহরে ইংরাজী শিক্ষা - কালীপদ সিংহ
(বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল স্কুল শতবর্ষ স্মরণিকা, ১৯৮৩)

শিক্ষার চালচিত্র — বর্ধমান

নীলা কর

শিক্ষা — মানুষকে পূর্ণ মানুষ করে তোলার প্রাথমিক এবং প্রধান চাবিকাঠি। এই শিক্ষা আবার একটা দেশের বা অঞ্চলের আর্থসামাজিক পরিকাঠামোর ওপর অনেকাংশেই নির্ভরশীল। বর্ধমান — যার একদিকে বিরাট শিল্পাঞ্চল অন্য দিকে দিগন্তপ্রসারী সবুজ শস্য ক্ষেত্র — এই রকম একটা বিশাল এবং বৈচিত্র্য পূর্ণ ক্যানভাস — সেখানে শিক্ষা বিস্তারের হীরককণা কোন্ খনিতে কতখানি, কোন্ শস্যক্ষেত্রে তার বাড়ন্ত প্রসার, কোথায় বা খরা, কোথায় দুর্ভিক্ষ তার সঠিক নিরিখ নির্ণয় করা দুরূহ ব্যাপার। তবু এই স্বল্প পরিসরে যতটুকু সম্ভব বর্ধমানের শিক্ষার চালচিত্রের রূপরেখা আঁকার চেষ্টা করছি।

দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা

প্রথমে দেখা যাক কি ছিল দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অগ্রগতি। তপোবনের গুরুগৃহের শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে সুরু করে হিন্দু আমলের চতুষ্পাঠী, টোল, মুসলমান আমলের মক্তব, মাদ্রাসার সঙ্গে অষ্টাদশ শতাব্দীতে যুক্ত হয়েছে পাঠশালা। ১৮০২ সালে বর্ধমানের এক জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জানিয়েছিলেন যে, খুব কম গ্রামই আছে যেখানে পাঠশালা নেই। কিন্তু সে সব পাঠশালায় শুধু পড়তে, লিখতে আর সাধারণ সংখ্যা জ্ঞান শেখানো হ'তো। মুসলিম প্রধান গ্রামে পাঠশালার বদলে মক্তব থাকতো। এইসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বেতন ছিল না। তাঁদের কিছু দ্রব্য সামগ্রী এবং শস্য ওঠার সময় কিছু শস্য দেওয়া হ'তো। লেখাপড়ার মধ্যে হ'তো মাতৃভাষার অক্ষরজ্ঞান, কিছু কিছু কবিতা মুখস্থ, ছোটছোট অঙ্ক। অঙ্কের মধ্যে শুভঙ্করীর প্রাধান্য ছিল। মক্তবে পার্সী ও উর্দু শেখান হ'তো। অনেক হিন্দুগ্রামে সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র টোল ছিল। সম্ভ্রান্ত মুসলমান ছাত্ররা মাদ্রাসায় পড়তো। কেউ কেউ আলাদা ভাবে জমিদারের কাছারি বাড়ীতে গিয়ে জমিদারীর হিসাবপত্র শিখে গোমস্তার কাজ করতো।

পাঠশালার শিক্ষককে গুরুমশাই, টোলে পণ্ডিতমশাই এবং মক্তবে যাঁরা পড়াতেন তাঁদের মৌলবী বলা হ'তো। সাধারণত মাদ্রাসাগুলো মসজিদের সংলগ্ন থাকতো। তথ্যে জানা যায় ১৮১৯ সালে বোহারে মসজিদ সংলগ্ন একটি মাদ্রাসা চালু ছিল। হিন্দু মেয়েদের জন্য শিক্ষার কোন বিশেষ ব্যবস্থা ছিল না। তারা কেউ কেউ পাঠশালায় যেত কিন্তু ৭/৮ বছর বয়েস হয়ে গেলে তাদের আর পাঠশালায় পাঠান হ'তো না। মুসলমান মেয়েদের মক্তবে যাওয়ার অনুমতি ছিল না। তবে কোন কোন অভিজাত মহিলা বাড়ীতে লেখাপড়া শিখতেন।

ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট ১৮১৬ সালে প্রথম সেই সময়কার চলতি শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির জন্য চার্চ মিশনারি সোসাইটির সাহায্যে দু'টি ভার্নাকুলার স্কুল স্থাপন করেন এই জেলায়।

দু'বছরের মধ্যে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ১০-এ। এই কাজের জন্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা ষ্টুয়ার্টের বিরোধিতা করেছিলেন। ষ্টুয়ার্ট প্রবর্তিত স্কুলে প্রাথমিক ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যা, ইতিহাস ছাড়াও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়ও শিক্ষা দেওয়া হ'তো। ষ্টুয়ার্টের বিদ্যালয়গুলির খ্যাতির জন্য ১৮১৯ সালে 'ক্যালকাটা সোসাইটি' তাদের সুপারিনটেণ্ডেন্টকে ৫ মাসের জন্য বর্ধমানে পাঠান ক্যাপ্টেন ষ্টুয়ার্টের শিক্ষা প্রণালী শেখার জন্য।

১৮৩৭ সালে এ্যাডাম রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা অনুসন্ধান করে জানিয়েছেন যে, শিক্ষা ব্যবস্থায় বর্ধমান জেলা রাজ্যের মধ্যে উন্নত। জানা যায় ১৮৩০ সালে বর্ধমান জেলার ১৩টি থানায় ৭২টি স্কুল ছিল যদিও আজকের স্কুলের সঙ্গে সে সব স্কুলের কোন মিল নেই।

আরও জানা যায় বর্ধমানে রেভারেন্ট জে. জে. উইট বেখ্‌ট্ (J.J. Weitbrecht) ১৮৩০-৫২ সালের মধ্যে মিশনারি পরিচালিত ১৪টি স্কুলের তত্ত্বাবধান করতেন। যার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ১টি মেয়েদের স্কুল ছিল এবং পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে প্রথম ১টি হাইস্কুল ছিল যার সঙ্গে একটি হোস্টেলও ছিল হিন্দু ছাত্রদের জন্য। ১৮৩৪ সালের কাছাকাছি সময়ে কালনা ও কাটোয়াতে ব্যাপটিষ্ট মিশনারি সোসাইটি স্কুল স্থাপন করে।

১৮৩৫ সালে তৎকালীন শাসনকর্তা লর্ড উইলিয়াম বেন্টিং রাজ্যে শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে সমীক্ষা চালানোর জন্য ১৮৩৫ সালে উইলিয়াম এ্যাডামকে নিযুক্ত করেন।

এ্যাডাম তাঁর প্রথম প্রতিবেদনে বলেন, ১৯৩০ সালে ১০,০০০ হাজার ৮০০ জন ছাত্র সংস্কৃত শিখতো এবং ১৮০০ জন শিক্ষক ছিলেন। এই শিক্ষা কেন্দ্রগুলির নাম ছিল চতুষ্পাঠী ও টোল – এগুলি রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিল।

ব্রিটিশ শাসনের আগে বাংলায় সংস্কৃত শিক্ষার উচ্চ কেন্দ্রগুলির প্রাধান্য ছিল নদীয়া জেলায় এবং নবদ্বীপ শিক্ষা সংস্কৃতির পীঠস্থান ছিল। বর্ধমান জেলাও এ ব্যাপারে খুব পিছিয়ে ছিল না। অনুসন্ধানে জানা যাচ্ছে দক্ষিণ 'রাধা' যেখানে বর্তমান বর্ধমানের অবস্থান - - নবদ্বীপেরও আগে সেখানে সংস্কৃত শিক্ষার উচ্চ কেন্দ্র ছিল। কালনাতে এর খ্যাতি আরও বেশি ছিল। মোঘল আমলে সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্রগুলির গৌরব কমতে থাকে এবং এই সময় বর্ধমান কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাধান্য পেতে থাকে।

১৮৩৭-৩৮ সালে এ্যাডাম তাঁর তৃতীয় প্রতিবেদনে বলেছেন এই জেলায় (বর্ধমান) ৬২৯টি বাংলা এলিমেন্টারি স্কুল রয়েছে। এর মধ্যে ৯টি মিশনারিরা এবং ১টি বর্ধমানের রাজা পরিচালনা করতেন। এলিমেন্টারি স্কুলের বাইরেও সেই সময় ১৯০টি সংস্কৃত স্কুল ছিল এবং এই সব সংস্কৃত স্কুলের ছাত্র সংখ্যা ছিল ১৩৫৮ জন। এছাড়াও ৯৩টি পারসিয়ান ও ৮টি এ্যারাবিক স্কুল ছিল। এই সময় বর্ধমান কালনা কাটোয়ায় মিশনারিদের উদ্যোগে পরিচালিত ৪টি মেয়েদের স্কুল ছিল। এই সব স্কুলে মাত্র ১৭৫ জন ছাত্র পড়তো; তাদের মধ্যে ৩৬ জন খ্রীষ্টান ও ১জন মুসলমান ছাত্র ছিল। পরবর্তী ৩০ বছরে শিক্ষা ব্যবস্থার আরও কিছু অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। ১৮৬৮ সালে দেখা যাচ্ছে ১০টি এডেড ২টি আন-এডেড, ২২টি মিড্‌ল ইংলিশ স্কুল স্থাপিত হয়েছে। এক তথ্য থেকে জানা যায়,

এই সময় ফ্রি-চার্চ স্কটল্যাণ্ড মিশন বর্ধমান, মেমারী ও কালনাতে তিনটি হাই স্কুল স্থাপন করে। এই সময় চকদীঘিতে একটি অবৈতনিক ইংরাজি হাই স্কুল সারদা প্রসাদ সিংহরায়ের ট্রাষ্টিদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৬৬-৬৭ সালে শুধুমাত্র ইউরোপীয় ছাত্রদের জন্য দু'টি স্কুল খোলা হয়। ১৮৩৪ সালে ইউরোপীয় লেডিস সোসাইটি বর্ধমানে প্রথম মেয়েদের জন্য স্কুল স্থাপন করে। ১৮৩৭ সালে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৪-এ। মেয়েদের স্কুলে ছাত্রীদের বাড়ী থেকে আনা এবং দিয়ে আসার জন্য একজন করে লেডি এসকর্ট থাকতো; ১৮৬৮ সালে মেয়েদের স্কুলের সংখ্যা দাঁড়ায় ৯-এ।

শিক্ষার অগ্রগতি হতে হতে ১৮৯১-এর পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে ১৫ বছর বয়সের উর্দ্ধে শিক্ষিত পুরুষের হার ১৯% এবং তখন মেয়েদের ক্ষেত্রে শিক্ষার হার প্রতি হাজারে মাত্র ৫ জন।

ব্রিটিশ শাসকরা এদেশীয় মানুষদের শিক্ষার দায়িত্ব নিয়েছিলেন ১৮৩০ সালের এক চার্টার অনুসারে – সে বছরই প্রথম শিক্ষা খাতে সরকারী টাকা মঞ্জুর করা হয়। এ সত্বেও ১৯০১ সালের জনগণনার হিসাব থেকে দেখা যাচ্ছে সে বছর দেশে 'সাক্ষর' ও 'শিক্ষিতের হার' শতকরা ৫.৩৫ জন। এরমধ্যে শুধু নাম সই করার মানুষ থেকে বঙ্কিমচন্দ্র কিম্বা জহরলালও থেকে গেছেন।

এবার দেখা যাক ১৯০১ সাল থেকে দশক ভিত্তিতে শিক্ষার অগ্রগতি কিভাবে হয়েছে সারা দেশে ঃ

১৯১১ সালে	–	৫.৯৫ শতাংশ
১৯২১ সালে	–	৭.১৬ শতাংশ
১৯৩১ সালে	–	৯.৫০ শতাংশ
১৯৪১ সালে	–	১৬.১০ শতাংশ
১৯৫১ সালে	–	১৬.৬৭ শতাংশ

এই পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে ১৯০১ সাল থেকে স্বাধীনতা প্রাপ্তির অব্যবহিত পরে ১৯৫১ সালে অর্থাৎ অর্ধশতাব্দীতে শিক্ষার হার বেড়েছে (১৬.৬৭–৫.৯৫) ১০.৭২ শতাংশ।

জে.সি.কে. পিটারসনের বেঙ্গল ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার শিক্ষা ক্ষেত্রে বর্ধমান জেলার যে খতিয়ান দিয়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে ১৯০১ সালে ছেলেদের মধ্যে শিক্ষার হার ২০% এবং মেয়েদের মধ্যে এই হার ১০% । সেই সময় মোট স্কুলের সংখ্যা ছিল ১৪৭০টি। এর মধ্যে ১৪৫৭টি পাবলিক ইনস্টিটিউশন এবং ১৩টি প্রাইভেট ইনস্টিটিউশন। পাবলিক স্কুলের ছাত্র সংখ্যা ছিল ৫৩৪৮৩ জন এবং প্রাইভেট স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ৩৩০ জন।

জে.সি.কে. পিটারসনের মতে বর্ধমান জেলা সেই সময় শিক্ষায় সমস্ত প্রদেশের মধ্যে

সারণী - ১ ঃ **বর্ধমান জেলায় ১৯৬১ সালে বয়স ও লিঙ্গ অনুসারে শিক্ষিতের পরিসংখ্যান**

	মোট জন সংখ্যা			শিক্ষিতের সংখ্যা		স্তর বিহীন শিক্ষিতের সংখ্যা		শিক্ষার স্তর: প্রাথমিক ও জুনিয়ার বেসিক স্তর পর্য্যন্ত		শিক্ষার স্তর: ম্যাট্রিক ও তদূর্ধ স্তর	
বয়সের ভাগ	জনসংখ্যা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা
সববয়সের	৩,০৮২,৮৪৬	১,৬৫৮,৯৭৬	১,৪৩,৮৭০	১,০০৫,৫০২	১,১৬৫,৫০৯	৩,৯১,৪৪৮	১,৮৫,০১৩	১,৮৮,৯৭৮	৬৬,৬১০	৭৩,০৪৮	৬,৭৩৮
০–৪	৪,৬২,৭৭৮	২,২৬,৭১০	২,৩৬,০৬৮	২,২৬,৭১০	৩,২৬,০৬৮	–	–	–	–	–	–
৫–৯	৫,৬১,৭২২	২,৩২,৭৯৫	২,২৮,৯২৭	১,৬৮,৯৯০	১,৮৮,৪৪৯	৫৫,৩২০	৩৪,৪৪৫	৮,৪৮১	৬,০৩৩	–	–
১০–১৪	৩,০৩,১৮২	১,৬৭,৬৮৩	১,৩৫,৪৯৯	৭৬,৬৪২	৮১,৬৯৪	৫৫,২৯৫	৩৫,৬০৯	৩৫,২৪২	১৮,১৬৮	৫০৪	৩২
১৫–১৯	২,৫০,০৭১	১,২৮,০৭২	১,২১,৯৯৯	৫২,৩৩৪	৮২,৯৩৯	৩৭,৮২২	২৫,৬৭০	৩১,৬৩৭	১১,৯৭৪	৬,২৭৯	১,৪০৬
২০–২৪	২,৮৭,৪৫২	১,৫২,০৩৩	১,৩৫,৪২০	৬৭,৯৯১	১,০০,৫৪৭	৪১,৯০৭	২৩,২৪৮	২৫,৮৯৫	৯১,৫৫৯	১৬,২৪০	২,০৬৬
২৫–২৯	২,৮৭,৮৩৭	১,৬৬,৬৩৩	১,২৩,২০৪	৭৬,৩১৬	৯৬,১৯৪	৪২,৫৫৫	১৭,৯৮৭	২১,৫৭৮	৭,৬১৩	১৪,১৮৪	১,৫১০
৩০–৩৪	২,৪১,৪১৯	১,৪২,৬৯০	৯৮,৪৫৯	৭৮,৫৪৩	৭৯,২০৪	৩৬,৯৮৯	১৩,৮৪১	১৬,৯৮৬	৪,৬৩৪	১০,২৬১	৭৮০
৩৫–৪৪	৩,৪৪,০৭৪	২,০৪,৪৪০	১,৩৯,৬৩৪	১,১৪,৮৭৪	১,১৭,৭৯২	৫৪,৬৪৪	১৬,৫৩২	২২,৪২৯	৪,৬৩২	১২,৪৯৩	৬৭৮
৪৫–৫৯	৩,০০,৩৬৬	১,৭০,৮২৭	১,২৯,৫৩৯	৯৫,৩৪৮	১,১৪,৬৪১	৪৬,৯৬১	১১,৭৮৯	১৮,৯৭০	২,৮৯৯	৯১,৪৫৮	২১০
৬০ +	১,৪৩,৯০১	৬৮,৯৫৮	৭৪,৯৪৩	৩৭,৭৪৬	৬৭ ৮১৩	১৯,৯৩৬	৫,৮৮৪	৭,৭৪৬	১,১৯০	৩,৫০০	৫৬
বয়স জানা যায় নি	৩১৩	১৩৫	১৭৮	৯৪	১৬৮	১৯	৮	১৪	২	৮	–

তথ্য ঃ গেজেটিয়ার -- বর্ধমান, মার্চ ১৯৯৪

দশম স্থানে রয়েছে। তাঁর মতে এই সময় বিদ্যালয় পরিদর্শকমণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন ১ জন জেপুটি ইনস্পেক্টর অব স্কুলস্, ও ৩জন সাব ইনস্পেক্টর অব স্কুলস্, ৩ জন এ্যাসিসটেন্ট্ সাব ইনস্পেক্টর অব স্কুলস্ ও ১৩ জন পণ্ডিত পরিদর্শক। সহজেই অনুমেয় এই সব স্কুলের অধিকাংশই প্রাথমিক ও নিম্নমাধ্যমিক পর্য্যায়ের।

১৯৫১-৬১ পর্য্যন্ত দশ বছরে জেলার জনসংখ্যা, শিক্ষিতের সংখ্যার (প্রাইমারি ও জুনিয়র বেসিক পর্য্যন্ত এবং ম্যাট্রিক ও তদূর্ধ) একটি সারণী দেওয়া হল। *(সারণী - ১)*

প্রাথমিক শিক্ষা

স্বাধীনতার পর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে স্তর বিন্যাস – (১) প্রাথমিকস্তর, (২) নিম্ন মাধ্যমিক স্তর, (৩) মাধ্যমিক স্তর, (৪) উচ্চশিক্ষা – কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়।

এলিমেন্টারি এডুকেশন (৬–১৪ বছর) প্রাথমিক ও নিম্নমাধ্যমিকের পর্য্যায়ভুক্ত। ১৯৮৬ সালে জাতীয় শিক্ষানীতিতে প্রাথমিকেরও নিচে একটি স্তর ঠিক হয় – যার নাম প্রাক্ – প্রাথমিক স্তর।

মাধ্যমিকের ক্ষেত্রে মুদালিয়র কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে ১১ শ্রেণীর উচ্চ মাধ্যমিক (১৯৫৭) এবং পরবর্তীকালে কোঠারি কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে দ্বাদশ শ্রেণীর উচ্চমাধ্যমিক কোর্স চালু হয়। একই সময় অন্তর্বর্তীকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশিকা পরীক্ষা চালু করা হয়েছিল।

উচ্চশিক্ষাস্তরে ১০+২+২ চালু ছিল। বর্তমানে ১০+২+৩ স্নাতক স্তর পর্য্যন্ত চালু হয়েছে। এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তরে বিভিন্ন বিষয় পড়ান হয়।

জেলার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা ১৯৪৫ সালের আগে পর্য্যন্ত গ্রামাঞ্চলে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড এবং শহরাঞ্চলে পৌরসভাগুলির তত্ত্বাবধানে ছিল। ১৯৪৬ সালে বর্ধমান 'জেলা স্কুল বোর্ড' গঠিত হয়। এই সময় জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১০৬৬ টি। 'জেলা স্কুল বোর্ড' গঠিত হওয়ার পর গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা জেলা স্কুল বোর্ডের ওপর অর্পিত হলেও শহরাঞ্চলে প্রাথমিক স্কুলগুলি পৌরসভার হাতেই থেকে যায়। এই সময় কিছু কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয়কে পরিকল্পিত ও ধারাবাহিকভাবে পঞ্চমশ্রেণী যুক্ত জুনিয়ার বেসিক স্কুলে রূপান্তরিত করা হয়। প্রাথমিক স্কুলের সঙ্গে জুনিয়র বেসিক স্কুলের মূল পার্থক্য এখানে অঙ্কের বদলে একটি বিশেষ ধরণের ক্র্যাফ্‌টকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

১৯৪৯ সালে সাধনপুর, কিশোরকোণা, মন্তেশ্বর, গণপুর, বড়ামহেশ, দিয়াশা আলিগ্রাম ও সিয়ারসোলে জুনিয়র বেসিক স্কুল স্থাপন করা হয়।

১৯৪৯--৫০ সালে জেলায় ১১৭২টি প্রাথমিক স্কুল ছিল। এর মধ্যে ১১৩২ টি ছেলেদের এবং ৪০টি মেয়েদের স্কুল। এসব স্কুলের মোট ছাত্র সংখ্যা ছিল ৯০,৪৯৮ জন – এর মধ্যে ৬৪,৯১৯ জন ছাত্র এবং ২৫,৫৭৯ জন ছাত্রী।

এই সময় জেলায় ৭টি বেসিক স্কুলে ৪২৬ জন ছাত্র এবং ১৯৮ জন ছাত্রী অর্থাৎ সর্বসাকুল্যে ৬২৪ জন ছাত্রছাত্রী ছিল।

১৯৬৩-৬৪ সালে জুনিয়র বেসিক স্কুল নিয়ে ২৪৪৩ টি প্রাইমারি স্কুল ছিল। এতে ২,৭০,৯৭০ জন ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করতো।

১৯৬৭—৬৮ সালে জেলায় ২২৪৮ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ১৭৬টি জুনিয়র বেসিক স্কুল ছিল। ১৯৬৭—৬৮ সালে প্রাথমিক স্কুলে ছাত্র সংখ্যা ছিল ১,৭৪,২৯৪ জন এবং ছাত্রী ছিল ১,১০,৬২০ জন। জুনিয়র বেসিক স্কুলে ছাত্র সংখ্যা ছিল ২১,৭২০ জন। ছাত্রী সংখ্যা ছিল ১৭৯০২ জন। পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে যে ১৯৫৭-৫৮ সাল থেকে গ্রামাঞ্চলে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করার জন্য প্রাথমিক স্কুলে ছাত্র সংখ্যা ক্রমবর্ধমান।

১৯৬৩ সালে ওয়েস্ট বেঙ্গল আরবান প্রাইমারি এডুকেশন এ্যাক্ট চালু হওয়ায় শহরাঞ্চলেও প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ গঠিত হওয়ায় বর্ধমান জেলাতেও বর্ধমান জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনা করে।

২০০০ সালের আগষ্ট মাসের আগে পর্য্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ অ্যাড-হক ভিত্তিতে পরিচালিত হতো। এবছর আগষ্ট মাসে নির্বাচিত পরিচালক সমিতি গঠিত হয়েছে।

১৯৮৬ সালে জাতীয় শিক্ষানীতি গৃহীত হওয়ার পর প্রাথমিক স্কুলে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য মধ্যাহ্নে খাবারের ব্যবস্থা এবং অপারেশন ব্লাক বোর্ড প্রথা চালু করা হয়। বর্ধমানেও এই ব্যবস্থা চালু হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে আকর্ষণীয় করার জন্য এবং প্রাথমিক স্কুলে ছাত্রসংখ্যা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে বিদেশী অর্থ সাহায্যে 'আনন্দ পাঠ' চালু করে। এই ব্যবস্থা পরিকাঠামোর অভাবে শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নয়, বর্ধমান জেলাতেও খুব বেশি কার্য্যকর হয়নি।

'মিড ডে মিল', 'অপারেশন ব্ল্যাকবোর্ড' ও 'আনন্দ পাঠ' -এর ফলে একদিকে যেমন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা বেড়েছে অন্যদিকে তেমনি প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকের অভাব, স্কুলের ঘরের অভাব, পানীয় জলের অভাব, শৌচাগারের অভাব, খেলার মাঠের অভাবের জন্য ''ড্রপ্ আউটের সংখ্যা''-ও মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

১৯৯৭ সালে ১লা আগষ্ট বর্ধমান জেলা সাক্ষরতা সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত বুকলেটে দেখা যাচ্ছে যে এই সময় প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের পরিচালিত প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা ৩,৭৭৯ টি এবং শিক্ষকের সংখ্যা ১৪,১৬৩ জন। ছাত্র ভর্ত্তির খতিয়ান ঃ

১৯৯০ – ৯১ সালে – ৪,২৫,২৭৪ জন।

১৯৯৬ – ৯৭ সালে – ৬,৩২,৫৮৫ জন।

২০০০ সালে প্রাথমিক স্কুলে ছাত্রভর্ত্তির একটি পরিসংখ্যান সারণী দেওয়া হল।

সারণী - ২

বর্ধমান জেলা

মহকুমা ও ব্লক ভিত্তিক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা এবং ২০০০-২০০১ শিক্ষাবর্ষে প্রথম শ্রেণীতে ভর্ত্তির পরিসংখ্যান (১৭/৭/২০০০ তারিখ পর্যন্ত)

মহকুমা	ক্রমিক সংখ্যা	ব্লক/ পৌরসভা / কর্পোরেশন	সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা	প্রথম শ্রেণীতে ছাত্র ছাত্রীদের ভর্ত্তির সংখ্যা
আসানসোল	১	বারাবনি	৭৯	২২৪৪
	২	জামুরিয়া	৬১	২৩১৪
	৩	রাণীগঞ্জ	৪২	১৬৭২
	৪	সালানপুর	৬৭	২৫৪৮
	৫	আসানসোল এম.সি	১৭৪	৯৯৩১
	৬	জামুরিয়া এম.	৪৭	২০৬১
	৭	কুলটি এম.	৯১	৪৬৮৬
	৮	রাণীগঞ্জ এম.	৩৭	১৭০৯
বর্ধমান উত্তর	১	আউসগ্রাম-১	৯২	৩৮৫৫
	২	আউসগ্রাম-২	১৩০	৩৪২০
	৩	ভাতার	১৬৭	৮০৬১
	৪	বর্ধমান-১	১১০	৪১৩৭
	৫	বর্ধমান-২	৭৯	২৪৭৮
	৬	গলসি-২	১০৫	৪০৯৪
	৭	বর্ধমান এম.	৯৯	৫৩৫৩
	৮	গুসকরা এম.	১৬	৯৫৮
বর্ধমান দক্ষিণ	১	জামালপুর	১৬৫	৬১১৬
	২	খণ্ডঘোষ	১৪১	৫৪৫৬
	৩	মেমারী-১	১০৬	৫৭০৮
	৪	মেমারী-২	১১২	৩৭১৫
	৫	রায়না-১	১২৫	৪৬১৬
	৬	রায়না-২	১১২	৩০৩৮
	৭	মেমারী এম.	১২	৮৮৬
দুর্গাপুর	১	অণ্ডাল	৪৯	২৮৮৫
	২	দুর্গাপুর-ফরিদপুর	৬৩	২৫২৫
	৩	গলসি-১	১১৪	৩৪৫০

মহকুমা	ক্রমিক সংখ্যা	ব্লক/ পৌরসভা/ কর্পোরেশন	সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা	প্রথম শ্রেণীতে ছাত্র ছাত্রীদের ভর্ত্তির সংখ্যা
	৪	কাঁকসা	১০৭	৩৬৭৮
	৫	পাণ্ডবেশ্বর	৩৯	২২৯৬
	৬	দুর্গাপুর (এম.সি)	১০০	৬৫৫৭
কালনা	১	কালনা-১	১১০	৬৪২৮
	২	কালনা-২	১০৭	৪৩৯১
	৩	মন্তেশ্বর	১৭৪	৫৮৯৩
	৪	পূর্বস্থলী-১	১১৪	৬২৫২
	৫	পূর্বস্থলী-২	১১৬	৪২০৩
	৬	কালনা এম.	৩৩	১৫০৬
কাটোয়া	১	কাটোয়া-১	৯৮	৩৮৫৮
	২	কাটোয়া-২	৮৪	৪১১৩
	৩	কেতুগ্রাম-১	৯৭	৩৮৩১
	৪	কেতুগ্রাম-২	৮২	২৮১৮
	৫	মঙ্গলকোট	১৭৬	৬১৯৭
	৬	কাটোয়া এম.	৩৫	১২১৫
	৭	দাঁইহাট এম.	১৮	৬৪৩
জেলায় মোট সংখ্যা			৩৮৮৫	১,৬১,৭৯৯

বর্ধমান জেলায় ২০০০-২০০১ সালে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীতে ভর্ত্তির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ১,৯৫,৪১১ জন। দেখা যাচ্ছে ভর্ত্তি হয়েছে ১,৬১,৭৯৯ জন। অর্থাৎ নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রার ৮২.৮% পূরণ করা গেছে।

এম — মিউনিসিপ্যালিটি (পৌরসভা)
এম.সি. — মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন।

প্রাইমারি শিক্ষার ও অন্যান্য বিষয়ের সাম্প্রতিকতম (৩১.১২.২০০০ পর্যন্ত) যে তথ্য পাওয়া গেছে তার রূপরেখা এইরকম ঃ

১) জেলার আয়তন — ৭০২৪ বর্গ কিমি
২) মহকুমার সংখ্যা — ৬
৩) পঞ্চায়েত সমিতির সংখ্যা — ৩১

৪)	পৌরসভার সংখ্যা	৯
৫)	মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সংখ্যা	২
৬)	শহরের সংখ্যা	৫১
৭)	মৌজার সংখ্যা	২৫৪০
৮)	গ্রামের সংখ্যা	২৫৬৯
৯)	গ্রাম সংসদের সংখ্যা	৩৮৩৩
১০)	শিক্ষাচক্রের সংখ্যা	৫৫
১১)	২০০০ সালে বর্ধিত জনসংখ্যা	৬৯,৭৯,০৮৬
১২)	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোট সংখ্যা	৩৮৯১
১৩)	চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত প্রাইমারি স্কুল	৩৬৬৭
১৪)	পঞ্চম শ্রেণী যুক্ত প্রাইমারি স্কুল	২২৪
১৫)	মেয়েদের প্রাইমারি স্কুল	৩০
১৬)	হিন্দি মাধ্যমের প্রাইমারি স্কুল	১০৭
১৭)	উর্দু মাধ্যমের প্রাইমারি স্কুল	৪৭
১৮)	ওড়িয়া মাধ্যমের প্রাইমারি স্কুল	১
১৯)	বেসরকারী স্কুলের সংখ্যা	৭২১
২০)	শিশু শিক্ষাকেন্দ্রের সংখ্যা	৩৩৩
২১)	৫ থেকে ৮+ বছর পর্যন্ত শিশুর সংখ্যা	৮,৩৭,৪৯০
২২)	চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত স্কুলে ৫ থেকে ৮+ পর্যন্ত শিশু ভর্তির সংখ্যা	৭,৪৫৪,৩১৮
২৩)	পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত স্কুলে ৫ থেকে ৮+ বছর পর্যন্ত শিশু ভর্তির সংখ্যা	২৮,০৪২
২৪)	শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে ভর্তির সংখ্যা	১৮,৩৩৬
২৫)	সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলে ৫ থেকে ৮+ বছর পর্যন্ত শিশু ভর্তির হার	৮৯.০০ %
২৬)	'স্কুল ছুট' শিশুর সংখ্যার হার	৫.৪৭%
২৭)	প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির যোগ্য শিশুর সংখ্যা	১,৯৫,৪১৪
২৮)	প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির সংখ্যা	১,৭৬,৭৯৯
২৯)	সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত প্রথম প্রাইমারি শ্রেণীতে ভর্তির হার	৯০.৪৭%
৩০)	তপসিলী শিশু ভর্তির হার	৩২.৪১%
৩১)	আদিবাসী শিশু ভর্তির হার	৮.০৯%
৩২)	অনুমোদিত শিক্ষক পদ	১৫,৩৪৩
৩৩)	কর্মরত শিক্ষক	১৪,৭১০
৩৪)	শিক্ষকের শূন্যপদ	৬৩৩

৩৫)	শিক্ষক - শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের হার	৬৮.৪২%
৩৬)	অনুমোদিত শিক্ষক ও ছাত্রের অনুপাত	১ : ৪৮.৬
৩৭)	কর্মরত শিক্ষক ও ছাত্রের অনুপাত	১ : ৫০.৬৭
৩৮)	স্কুল ও ছাত্রের অনুপাত	১ : ১৯১.৫৫
৩৯)	স্কুল ও কর্মরত শিক্ষকের অনুপাত	১ : ৩.৭৮
৪০)	স্কুল ও অনুমোদিত শিক্ষকের অনুপাত	১ : ৩.৯৪
৪১)	প্রতি মাসে শিক্ষক বেতন বাবদ খরচ	১১.২৫ কোটি টাকা

এছাড়া বিভিন্ন ধরনের বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে এই জেলায় ৭২১টি। এদের সম্মিলিত ছাত্রছাত্রীদের ভর্ত্তির সংখ্যা (প্রথম শ্রেণীতে) সঠিকভাবে জানা সম্ভব নয়। কারণ এর কোন পরিসংখ্যান রাখার ব্যবস্থা এখনও হয়নি।

আর্থিক ও পরিকাঠামোগত কারণে এবং সরকারের সদিচ্ছার অভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রাথমিক স্কুল বাড়ানো সম্ভব হচ্ছে না বলে সরকার 'প্রাথমিক শিক্ষার সম পর্য্যায়ে' 'শিশু শিক্ষা কেন্দ্র' এবং ধারাবাহিক সাক্ষরতা অভিযান চালু করেছেন। এ ব্যাপারে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

১৯৬৩-৬৪ সাল পর্য্যন্ত প্রাথমিকে (তৃতীয় – পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যন্ত) ইংরাজি বাধ্যতামূলকভাবে পড়ান হতো। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রাথমিকে ইংরাজি তুলে দেবার সিদ্ধান্ত নেয়। প্রাথমিকে ইংরাজি তুলে দেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্তের পর রাজ্যের বিভিন্ন জায়গার মত বর্ধমান জেলাতেও ইংরাজি - মাধ্যম স্কুল ও ইংরাজি শিক্ষার জন্য প্রাথমিক স্কুল বেসরকারিভাবে যত্র তত্র গজিয়ে উঠতে শুরু করে।

প্রাথমিক স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীর পর প্রাইমারি ফাইনাল পরীক্ষার ব্যবস্থাও সরকার তুলে দেন। প্রাথমিকে পাশ ফেল প্রথা উঠে যাবার ফলে প্রাথমিক শিক্ষার মান নিম্নগামী হওয়ায় রাজ্যের অন্যান্য জায়গার মত বর্ধমান জেলাতেও বেসরকারিভাবে নার্সারি, কে.জি. প্রভৃতি বিভিন্ন নামে প্রাক্ প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষার স্কুলগুলি সরকারি প্রাথমিক স্কুলের সমান্তরালভাবে গড়ে উঠছে। সরকারি প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষার মান আশানুরূপ না হওয়ায় শিক্ষিত জনসাধারণের এই ধরনের স্কুলের প্রতি আকর্ষণ বাড়ছে।

মধ্যবিত্ত এমনকি স্বল্পবিত্ত শিক্ষিত অভিভাবকদের ইংরাজি শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ এবং উচ্চশিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় ইংরাজির প্রয়োজনীয়তার জন্য শিক্ষিত অভিভাবকরা তাঁদের সন্তানদের এই ধরনের স্কুলে পড়াতে খুব বেশি আগ্রহী।

যদিও উচ্চবিত্তদের জন্য এবং রাজ্যে বসবাসকারী অন্য ভাষাভাষী ছাত্রছাত্রীদের জন্য আগেও কয়েকটি ইংরাজি মাধ্যম স্কুল ছিল, কিন্তু বর্তমানে ইংরাজি মাধ্যম বেসরকারি প্রাথমিক স্কুল, নার্সারি ও কে.জি. স্কুল শুধু শহরাঞ্চলেই নয়, গ্রামাঞ্চলেও ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠেছে এবং উঠছে। এর অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ শহরাঞ্চলে সরকারি প্রাথমিক স্কুলে ছাত্র সংখ্যা কমে যাচ্ছে।

সঠিক পরিসংখ্যান নিরূপিত না হলেও অসমর্থিত সূত্রে জানা গেছে – বর্ধমান জেলায় বেসরকারী প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা প্রায় ৭২১ টি।

সাক্ষরতা অভিযান

মানুষকে সাক্ষর করার প্রয়াস এ জেলায় আধুনিকতম বিষয় নয়। আজ থেকে একশ বছরেরও বেশি সময়ে মহতাব চন্দ বর্ধমানে সম্পূর্ণ নিজের ব্যয়ে বয়স্ক নিরক্ষরদের শিক্ষার জন্য কয়েকটি নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। সুতরাং বোঝাই যায় – তখনকার দিনেও মানুষকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন স্বয়ং রাজাও। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ও নৈশ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল অনেক গ্রামের মানুষকে সাক্ষর করার জন্য। এ সব বিচ্ছিন্ন ঘটনা। আজকের আর্থ সামাজিক পরিকাঠামোয় এই শিক্ষার প্রয়োজন তাই আরও বেশি জরুরি হয়ে দেখা দিয়েছে।

সারা বিশ্বের এক তৃতীয়াংশ মানুষের বাস আমাদের এই ভারতবর্ষে। সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে পৃথিবীর তিনজন নিরক্ষরের মধ্যে একজন ভারতীয়। কোন দেশেরই উন্নয়ন এবং সর্বাত্মক অগ্রগতি সম্ভব হয় না যদি না সেই দেশের মানুষ শিক্ষার আলো পায়। এই প্রয়োজনের কথা ভেবেই ১৯৬৬ সালে ৮ই সেপ্টেম্বর ইউনেসকো কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল নিরক্ষরতা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে। ভারত সরকার ১৯৮৬ সালে জাতীয় শিক্ষানীতি (National Education Policy-1986) গ্রহণ করেন। এই নীতি অনুসারে ১৯৮৮ সালে নিরক্ষরতা দূরীকরণ কর্মসূচীকে সফল করবার জন্য জাতীয় সাক্ষরতা মিশন স্থাপন করা হয়।

পরবর্তী সময়ে এরই দু'বছর পরে বর্ধমান জেলাতেও ভারত সরকারের অনুদানে ও রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টায় সার্বিক সাক্ষরতার তাগিদে সাক্ষরতা অভিযান সুরু হয় ১৯৯০ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্ম দিনে। সাক্ষরতা অভিযান সুরুর আগে সারা জেলায় নিরক্ষরের সংখ্যা ছিল মোট ১৩,৫২,৯৭৯ জন।

নিচে বয়স ভিত্তিক পরিসংখ্যান দেওয়া হল ঃ

৬–৯ বছরের নিরক্ষর	–	১,৫২,৮৩৬ জন
৯–১৪ বছরের নিরক্ষর	–	১,৭১,০০৩ জন
১৫–৫০ বছরের নিরক্ষর	–	১০,২৯,১৪০ জন
মোট	–	১৩,৫২,৯৭৯ জন

সারা জেলায় প্রায় ৪২ হাজার সাক্ষরতা কেন্দ্র খুলে লক্ষাধিক মানুষের আন্তরিক প্রচেষ্টায় বাড়তি দু'মাস বাড়ী বাড়ী গিয়ে ১৯৯১ সালের মে মাসের মধ্যে অংশ গ্রহণকারী নিরক্ষরদের ১১,৮১,৫২৭ জন নিরক্ষরের মধ্যে ৯,৮৬,৮২৪ জন জাতীয় সাক্ষরতা মিশনের নির্ধারিত মান অর্জন করতে পেরেছে অর্থাৎ অংশগ্রহণকারীদের ৮২.২ শতাংশ সাক্ষর হয়েছে। প্রসঙ্গ ক্রমে বলা যায় এই সাক্ষরতা অভিযানে পুরুষদের চেয়ে মহিলাদেরই সংখ্যা বেশি দেখা যায়।

এই সাফল্যের জন্য ১৯৯১ সালের ২৪ শে আগষ্ট ভারতের তৎকালীন উপরাষ্ট্রপতি মাননীয় শংকরদয়াল শর্মা বর্ধমান জেলাকে পূর্ণসাক্ষর জেলা ঘোষণা করেন – তখন বর্ধমান জেলা ভারতবর্ষের মধ্যে দ্বিতীয় এবং পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে পূর্ণ সাক্ষরতায় প্রথম। যদিও এ সম্বন্ধে এখনও অনেক বিতর্ক রয়ে গেছে এবং আশে পাশে তাকালেই বোঝা যাবে সে সময়ের অনেক পূর্ণসাক্ষর মানুষ আজকে আবার নিরক্ষর হয়ে গেছে।

সাক্ষরতা প্রকল্পের দ্বিতীয় ধাপের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সাক্ষরতা অভিযানের সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সচেতনতাকে যুক্ত করা।

ভারত সরকার বর্ধমান জেলার সার্বিক সাক্ষরতা অভিযানের সাফল্যের জন্য জেলাকে পরীক্ষামুলকভাবে জনশিক্ষণ নিলমের ধাঁচে ধারাবাহিক শিক্ষা প্রকল্পের অনুমোদন দেয়। এই প্রকল্পে সাক্ষরতা অভিযানের সঙ্গে খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক, চর্চাকে যুক্ত করা হয়। ১৯৮৬ সালের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত এই কর্মসূচীর সময় কাল নির্ধারিত ছিল। ১৯৯৬ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসে বর্ধমান জেলা সাক্ষরতা সমিতি ৫ বছরের জন্য 'নবপর্য্যায়ে ধারাবাহিক শিক্ষা প্রকল্প' চালু করেছে।

এসময় পর্য্যন্ত বর্ধমান জেলা সাক্ষরতা অভিযানের প্রয়োজনীয় তথ্য নিচে দেওয়া হল ঃ

(১) আয়তন – ৭০২৮ স্কোয়ার কিলোমিটার

(২) মহকুমার সংখ্যা – ৬ (প্রশাসনিক সুবিধার জন্য উত্তর ও দক্ষিণ বর্ধমান দুটি মহকুমা দেখানো হয়)

(৩) ব্লক – ৩১

(৪) কর্পোরেশন ও মিউনিসিপ্যালিটির সংখ্যা – ১১

(৫) ১৯৯১ সালের জনগণনা অনুযায়ী জনসংখ্যা – ৬০, ৫০, ৬০৫

(৬) আদিবাসী ও তফসিলী জন সংখ্যা ঃ

আদিবাসি – ১২,১৩,৪৩৫

তফসিলী – ২,৭৮,১৯১

(৭) শিক্ষার হার ঃ

পুরুষ – ৭১.১২

মহিলা – ৫১.৪৬

মোট – ৬১.৮৮

(ক) মোট সাক্ষরতা ঃ

সময়সীমা – সেপ্টেম্বর , ১৯৯০ - মে ১৯৯১

নিরক্ষরের সংখ্যা ঃ মোট ঃ ১৩,৫২,৯৭৯

(২০.৮.৯০ তারিখের সমীক্ষা অনুসারে) ৬ – ৯ বছরের ঃ ১,৫২,৮৩৬

৯–৫০ বছরের ঃ ১২,০০,১৪৩

জাতি অনুযায়ী বিভাজন ঃ

আদিবাসী ঃ – ৬,৫৬,৯১৭

তফসিলী ঃ – ১,৮৬,৪১৩

মুসলমান ঃ – ২,৭৪,০০৯
অন্যান্য ঃ – ২,৩৫,৬৪০

(খ) মোট নিরক্ষর ঃ
৬–৯ বছরের ১,৩০,০৭৯ (স্কুলে পাঠান হয়েছে)

(গ) মোট নিরক্ষর ঃ
৯–৫০ বছর
(জাতীয় সাক্ষরতা মিশনের অনুযায়ী শিক্ষিত)
৯,৮৬,৮২৪
(৮২.২ শতাংশ)

(ঘ) সাক্ষরোত্তর পর্ব ঃ
ব্রীজ কোর্স
সময়সীমা ঃ আগষ্ট, '৯১ – মে '৯২

যে সমস্ত নিরক্ষর সাক্ষর হল ঃ ৬২,৯৯৮
এই সময়ে প্রকল্পের শেষে সাক্ষরের সংখ্যা ঃ ১০,৪৯,৮২২

(ঙ) সাক্ষরোত্তর দ্বিতীয় পর্ব ঃ– আগষ্ট, '৯২ – মে, '৯৩
এই সময়ে নিরক্ষর থেকে যারা সাক্ষর হয়েছে ঃ ৩৮,৯৮৬
প্রকল্প শেষে যত সাক্ষর হয়েছে ঃ ১০,৮৮,৭১৮

(চ) ধারাবাহিক কর্মসূচী ঃ
সময়সীমা ঃ জুন, '৯৩ – মার্চ, '৯৪
এপ্রিল, '৯৪ – আগষ্ট, '৯৬
(জনশিক্ষা নিলয়ম ধাঁচে)

এইভাবে ১৯৮১ থেকে বর্ধমান জেলার সাক্ষরতা অভিযানের অগ্রগতি চলছে।

সাক্ষরতার সব পর্য্যায়েই পঞ্চায়েত এবং অন্যান্য কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা নেওয়া হলেও সব শ্রেণীর মানুষকে এই অভিযানের সঙ্গে যুক্ত করা যায়নি। কোথাও কোথাও জেলাবাসি এর পূর্ণ রূপায়ন থেকে বঞ্চিত হয়।

১৯৮১ থেকে ৯৭ পর্য্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের সাক্ষরতার হার ও বৃদ্ধির একটি সারণী এবং তার সঙ্গে বর্ধমান জেলা সাক্ষরতা অভিযানের নবসাক্ষরদের সংখ্যা দেওয়া হল ঃ

পশ্চিমবঙ্গে সাক্ষরতার হার ও বৃদ্ধি ঃ ১৯৮১ – ১৯৯৭

(ভারত সরকারের এন.এস.ও কৃত সমীক্ষা অনুযায়ী)

সারণী - ৩

	সাক্ষরতার হার			হারের বৃদ্ধি	
	১৯৮১	১৯৯১	ডিসেম্বর ৯৭	১৯৮১-৯১	ডিসেম্বর ৯৭
পুরুষ	৫৯.৯৩	৬৭.৮১	৮১.০০	৭.৮৮	১৩.১৯
নারী	৩৬.০৭	৪৬.৫৬	৬৩.০০	১০.৪৯	১৬.৪৪
সমন্বিত	৪৬.৬৫	৫৭.৭০	৭২.০০	৯.০৫	১৪.৩০

কলকাতা সহ রাজ্যের ১৮টি জেলায় সাক্ষরতা অভিযানের ফলাফল (১.৭.২০০০ পর্য্যন্ত) নবসাক্ষর লক্ষে			
জেলার নাম	পুরুষ	নারী	সর্বমোট
বর্ধমান	৪.৫৪	৫.৩২	৯.৮৬
মেদিনীপুর	৫.৭৮	৭.৮৯	১৩.৬৭
বাঁকুড়া	২.২১	৩.৫৭	৬.০৮
বীরভূম	৩.০০	৩.০৮	৬.০৮
কুচবিহার	১.৫০	১.৫৬	৩.০৬
উত্তর ২৪ পরগনা	৩.৮১	৪.২৪	৮.০৬
হুগলী	২.৬৬	৩.৭৭	৬.৪৩
দক্ষিণ ২৪পরগনা	২.৪২	৫.১২	৭.৫৪
হাওড়া	০.৯৭	১.৪৯	২.৪৬
মুর্শিদাবাদ	২.৮৮	২.৪২	৫.৩০
নদীয়া	২.৪৩	২.৪১	৪.৮৪
জলপাইগুড়ি	০.৮৮	০.৯৩	১.৮১
পুরুলিয়া	১.৭২	৩.০১	৪.৭৩
কলকাতা	০.০৫	০.১৩	০.১৮
উত্তর দিনাজপুর	১.৪১	১.১৬	২.৫৭
দক্ষিণ দিনাজপুর	০.৬২	০.৬৩	১.২৫
মালদহ	১.৬৩	১.৫১	৩.১৪
দার্জিলিং (সম্পূর্ণ)	বহির্মূল্যায়ন এখনও হয়নি		
সর্বমোট	৩৮.৮১	৪৮.২৫	৮৭.০৬

তথ্য ও সংস্কৃতি / সা-ক্রো—৩১/২০০০

ধারাবাহিক শিক্ষা প্রকল্পকে আরও দৃঢ় করার জন্য জেলায় একটি জনশিক্ষা প্রসার ভবন নির্মাণের কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। এছাড়া জেলায় মোট ৩৩টি নবসাক্ষরদের জন্য গ্রামীণ গ্রন্থাগার তৈরী হয়েছে। এই সরকারি প্রচেষ্টার সঙ্গে জেলায় বেসরকারী সংগঠনগুলির দ্বারা জেলায় ১৬টি প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা প্রকল্প চলছে। এই প্রকল্পগুলির আওতায় ৭১০টি শিক্ষাকেন্দ্রে ১৭,৭৫০ জন শিক্ষার্থী প্রাথমিক শিক্ষার সমপর্য্যায়ের শিক্ষা গ্রহণ করছে। ৯--১৪ বছরের এইসব শিক্ষার্থীরা কখনও স্কুলে যায়নি অথবা কোন কারণে স্কুল ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। এই সব শিক্ষাকেন্দ্রগুলির মধ্যে তিনটি প্রকল্পে ৬০টি কেন্দ্র কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থানুকুল্যে এবং ১৩টি প্রকল্পে ৬৫০টি কেন্দ্র চলছে রাজ্য সরকারের আর্থিক আনুকুল্যে। ২০০০ সালে ৮ই সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসে সাক্ষরতার সঙ্গে স্বাস্থ্য প্রকল্প যুক্ত করে বর্ধমান জেলা সাক্ষরতা সমিতি নতুন পর্য্যায়ে সাক্ষরতা অভিযান সুরু করলো। এই দিনের প্রচারিত তথ্য থেকে জানা গেল ১৯৯৯ সালে জেলায় ২৮৭টি শিশু শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। ২০০০ সালে ৩৬০টি শিশু স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া

হয়েছে এবং সেজন্য অনুসন্ধানের কাজ চলছে।

এই অভিযানের আগে জেলা ব্যাপি একটি সমীক্ষা চালানো হয়েছে। বর্ধমান জেলা সাক্ষরতা সমিতি কর্তৃক প্রচারিত সাক্ষরতা অভিযান সংক্রান্ত তথ্যাবলি নিচে দেওয়া হল।

জেলা প্রাথমিক কার্য্যক্রম (ডি.পি.ই.পি.) পরিচালিত প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত বাড়ী বাড়ী অনুসন্ধানের রিপোর্ট (২৮.৮.২০০০ – ৫.৩.২০০০)

বর্ধমান জেলার প্রাথমিক শিক্ষার পরিকাঠামো ঃ

(ক)	অনুমোদিত প্রাথমিক স্কুল	সংখ্যা ৩৮৮৫
(খ)	স্কুলের পাকাবাড়ী নেই, থাকলেও জীর্ণ দশাপ্রাপ্ত	৫৮
(গ)	একটি শ্রেণীকক্ষ আছে এবং ছাত্র সংখ্যা ১৫০ ও তদূর্ধ্ব	৭০
(ঘ)	কাঁচা বাড়ী আছে এমন স্কুল ঃ (যেমন অধিকাংশই আছে মন্তেশ্বর ও সালানপুরে)	১৫৫
(ঙ)	কাঁচাবাড়ীর স্কুল যেখানে ক্লাসপ্রতি ছাত্র সংখ্যা ৫০ ও তদূর্ধ্ব (অধিকাংশই পূর্বস্থলী - ১এ)	৬৮
(চ)	পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই (অধিকাংশই মঙ্গলকোটে)	৮৯৭
(ছ)	শৌচাগার নেই (অধিকাংশই পাণ্ডবেশ্বরে)	২৪৫২

বিদ্যালয়ে ভর্ত্তিযোগ্য (out of school) (৫—৮ + বছর)

গ্রামীণ এলাকা

(অ)	সর্বাধিক পূর্বস্থলী – ২	(৫১৫২ জন)
	সর্বনিম্ন রায়না – ১	(৮৪১)

(আ) স্কুলে ভর্ত্তিযোগ্য (out of school) জাতি ও উপজাতি বিভাজন

জাতি উপজাতি	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
তফসিলী জাতি	কাঁকসা	
	২৪৩৩	৪৪৩
তফসিলী উপজাতি	জামালপুর	কেতুগ্রাম-২
	৯৪০	১০
সংখ্যালঘু	মন্তেশ্বর	সালানপুর
	২৩৫২	১১১
অন্যান্য	পূর্বস্থলী-২	গলসি-২
	১৫০১	১০৪

গ্রামীণ এলাকায় স্কুলে ভর্ত্তিযোগ্যদের শতকরাহারে সর্বাধিক প্রভাবিত গ্রাম
সংসদ নবগ্রাম-১ (কেতুগ্রাম-২ ব্লক) ৯১.৫%
সর্বন্যূন প্রভাবিত ঃ মাজিদা ১৭ (পূর্বস্থলী-২) ৫০.৬%

শহরাঞ্চল ঃ

ক) শহরাঞ্চলে স্কুলে ভর্তিযোগ্য (Out of school)
শতকরা হারে সর্বাধিক প্রভাবিত ওয়ার্ড ডি.এম.সি–৮ নং ওয়ার্ড
(দুর্গাপুর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন)

খ) সর্বন্যূন প্রভাবিত ডি.এম.সি. ১৮ নং ওয়ার্ড
(দুর্গাপুর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন)

গ) স্কুলছুট শহর এলাকা
সর্বাধিক কুলটি পৌরসভা (১১৬৫২)
সর্বনিম্ন মেমারি পৌরসভা (৮০৭)

ঘ) শহরাঞ্চলে স্কুলে ভর্ত্তিযোগ্য জাত-উপজাতিগত বিভাজন ঃ

জাতি/ উপজাতি	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	ইত্যাদি
তফসিলী জাতি	দুর্গাপুর এম.সি ২৯৩৬	মেমারি ১৭৩	
উপজাতি	কুলটি ১৯৪০	দাঁইহাট ০	
সংখ্যালঘু	কুলটি ৩৪৭৬	গুসকরা ৩২	
অন্যান্য	কুলটি ৪০৯৮	দাঁইহাট - ৫৭	

নিরক্ষরতা

১। গ্রামীণ নিরক্ষরতা (৯–১৪ বর্ষীয় অধিবাসীদের)

সংশ্লিষ্ট অধিবাসীর সংখ্যা	নিরক্ষর
বালক ৩,৩০,০১৩	৩১,৪৯৩
বালিকা ৩,০৩,১১৮৪৪,৭৪১	
মোট ঃ ৬,৩৩,১৩১	৭৬,২৩৪

২। গ্রামীণ নিরক্ষরতা (১৫– ৪৫ বর্ষীয় অধিবাসীদের)

অধিবাসী	নিরক্ষর
পুরুষ ১৫,৫৯,০৩৭	২,৯৯,৪০৮
মহিলা ১৬,১৪,৫৯৯	৪,৬৭,৭৭৫
মোট ৩১,৭৩,৬৩৬	৭,৬৭,১৮৩

৩। শহরাঞ্চলে নিরক্ষরতা (১৫ – ৪৫ বর্ষীয় অধিবাসীদের)

অধিবাসী	নিরক্ষর
পুরুষ ৬,৪২,২৩৭	৭০,১৫৪
মহিলা ৫,৫০,৯৬৪	৮৭,৭৭৪
মোট ১১,৯৩,২০১	১,৫৭,৯২৮

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কার্য্যক্রম (ডি.পি.ই.পি.) এর জন্য সংগৃহীত জরিপের তথ্যঃ সময়সীমা ২৮.২.২০০০ – ৫.৩.২০০০

মাদ্রাসা সহ নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা

১৮১৭ সালে মতান্তরে ১৮১৬ সালে বর্ধমান মহারাজা তেজচাঁদ বাহাদুর প্রতিষ্ঠিত এ্যাংলো ভার্নাকুলার স্কুলটি জেলার মধ্যে প্রথম হাইস্কুলে (১৮৫৪) পরিণত হয়। এই স্কুলটি দীর্ঘদিন ধরে রাজ পরিবারের অর্থে পরিচালিত হয়। ১৮৮১ সালে রাজ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই স্কুলটি রাজকলেজিয়েট স্কুল নামে পরিচিত হয় এবং পরবর্তী কালে তা সরকার অনুমোদিত ও সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলে পরিণত হয়।

সমসাময়িক প্রাচীন স্কুলের মধ্যে বর্ধমান শহরে বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুল (প্রতিষ্ঠা ১৮৮৩) ও বর্ধমানের তৎকালীন সবচেয়ে বড় স্কুল (ছাত্র সংখ্যা ৩৯৪ জন) বর্ধমান এ্যালবার্ট ভিক্টর স্কুল। আসানসোল শহরে আসানসোল রেলওয়ে হাইস্কুলটিও সেই সময়ের বহু প্রাচীন স্কুলের মধ্যে অন্যতম স্কুল।

১৮৩৪ সালে চার্চ মিশনারিদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বর্ধমান শহরের ইংরাজি স্কুলটি আজকের সি.এম.এস. হাই স্কুল।

প্রাক্ স্বাধীনতাকালে কোন কোন প্রাথমিক স্কুলে নতুন নতুন উচ্চশ্রেণী সংযোজিত হয়ে হাইস্কুলের দিকে এগোচ্ছিল। কোথাও এ্যাংলো ভার্নাকুলার স্কুল কিম্বা ইংরাজি স্কুল ধাপে ধাপে জুনিয়র হাই – হাইস্কুলে রূপান্তরিত হচ্ছিল। কিন্তু সেই সময় মাধ্যমিক শিক্ষার সঠিক স্তর বিন্যাস নির্ধারিত ছিল না।

স্বাধীনতা – উত্তর কালে রাজ্যের মাধ্যমিক শিক্ষার পাঁচটি স্তর বিন্যাস দেখা যায়।

১) পঞ্চমশ্রেণী ও ষষ্ঠশ্রেণী যুক্ত মিড্‌ল স্কুল অর্থাৎ দুই শ্রেণীযুক্ত জুনিয়র হাইস্কুল।

২) পঞ্চমশ্রেণী থেকে অষ্টমশ্রেণী পর্য্যন্ত মিড্‌ল স্কুলগুলির নাম ছিল চতুর্থ শ্রেণী যুক্ত জুনিয়র হাইস্কুল।

৩) ষষ্ঠশ্রেণী থেকে অষ্টমশ্রেণী যুক্ত সিনিয়র বেসিক স্কুল।

৪) পঞ্চমশ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী অথবা প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণীযুক্ত স্কুল।

৫) প্রথম শ্রেণী থেকে একাদশ শ্রেণী অথবা পঞ্চমশ্রেণী থেকে একাদশ শ্রেণী অথবা ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে একাদশ শ্রেণী অথবা নবম শ্রেণী থেকে একাদশ শ্রেণীর

উচ্চমাধ্যমিক ও সবার্থ সাধক (Multipurpose School)।

যদিও পঞ্চম শ্রেণী প্রাথমিক স্কুলে যুক্ত হবার কথা, ক্রমে পঞ্চমশ্রেণী মাধ্যমিকের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেছে। বেসিক স্কুলের ক্ষেত্রে পঞ্চম শ্রেণী নিম্নবুনিয়াদীর সঙ্গে যুক্ত।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে (১৯০৯–১০) বর্ধমান জেলায় আমরা ১৬টি সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত এবং ১২টি সরকারী সাহায্যবিহীন হাইস্কুলের তালিকা পাচ্ছি। এই হাইস্কুলগুলির মধ্যে ৩টি হাইস্কুল বর্ধমান শহরে, একটি হাইস্কুল রেলওয়ে পরিচালিত আসানসোলে। অন্য স্কুলগুলির ছিল দাঁইহাটে, ওকোরস, রাণীগঞ্জে, সাকতোড়িয়া – ডিসেরগড়ে, পূর্বস্থলীতে, কাটোয়ায়, মেমারীতে, ভৈটা, বাগনাপাড়া, পাটুলী, গোপালপুর, শাঁখারী, তোড়কণা, চকদীঘি, কালনা, পুটশুড়ি, মাথরুন, ইথোরা, উখড়া ও সিয়ারসোলে।

জে.সি.কে. পিটারসনের তথ্যানুসারে নিচে সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত (Aided) ও সরকারী সাহায্য বিনীন (Un-aided) স্কুলগুলির তালিকা দেওয়া হল ঃ

সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত (Aided)	সরকারী সাহায্য বিহীন (Unaided)
১) বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল	১) বর্ধমান রাজ কলেজিয়েট
২) ভৈটা	২) বর্ধমান এ্যালবার্ট ভিক্টর
৩) মেমারী	৩) গোপালপুর
৪) নাসিগ্রাম	৪) শাঁখারি
৫) মানকর	৫) তোড়কনা
৬) রায়না	৬) চকদীঘি
৭) ভেদিয়া	৭) কালনা রাজ
৮) বাগনাপাড়া	৮) পুটশুড়ি
৯) পাটুলী	৯) মাথরুন
১০) পূর্বস্থলী	১০) উখড়া
১১) কাটোয়া	১১) ইথোরা
১২) দাঁইহাট	১২) সিয়ারসোল
১৩) ওকোরস	
১৪) রাণীগঞ্জ	
১৫) আসানসোল রেলওয়ে স্কুল	
১৬) সাকতোড়িয়া – ডিসেরগড	

তথ্য ঃ পিটারসন

এই সময় (১৯০৯ – ১০) উপরোক্ত হাইস্কুলগুলি ছাড়াও ৮৫টি মিড্‌ল্ ইংলিশ ও ২২টি মিড্‌ল ভার্নাকুলার স্কুল এই জেলায় ছিল। এই সময়ে মাধ্যমিক স্তরে ছাত্র সংখ্যা ছিল ১১ হাজার ৭০০ শ'। স্কুল পরিচালনা বাবদ খরচা হয়েছিল ১,৭৯,০০০ টাকা যার মধ্যে ২২,০০০ হাজার টাকা সরকারী তহবিল থেকে খরচ হয়েছিল।

১৯৫১ সালে ৩০শে এপ্রিলের আগে পর্য্যন্ত হাইস্কুলগুলিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

অনুমোদন দিত। এই সালে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ গঠিত হওয়ায় স্কুলগুলি মধ্যশিক্ষা পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত হতে থাকে। পরিসংখ্যান অনুসারে এই সময় জেলায় ১১৮ টি হাইস্কুলের মধ্যে ৩৮টি স্থায়ী ভাবে এবং ৮০টি সাময়িকভাবে অনুমোদন পেয়েছিল।

জেলা জনগননা পুস্তকটি থেকে জানা যাচ্ছে যে ১৯৫১ সালে জেলার মহকুমা ভিত্তিক স্কুল, ছাত্রছাত্রী সংখ্যা, শিক্ষক সংখ্যা ও স্কুল পরিচালনার ব্যয় এই রকম ছিল ঃ

সারণী - ৪

মহকমা	হাইস্কুলের সংখ্যা	গড় ছাত্রছাত্রী (১৯৪৬-৫০)	শিক্ষকের সংখ্যা	সামগ্রিক সরকারী সাহায্যের পরিমাণ ১৯৪৬-৪৭ থেকে ১৯৫০-৫১ (টাকার অঙ্কে)
মহকমা সদর	৪৩	১১,৬৩৬	৫২০	৫,৮৫,২২৪
আসানসোল	৩৫	৯,৮৮১	৪৯১	৪,৪৪,৩৭৩
কালনা	১৯	৪,৫৮৭	২০৯	১,৯৯,৩৯৫
কাটোয়া	১৭	৪,১৩৭	১৯১	২,০১,৪৭৮
বর্ধমান জেলায়	১১৪	৩০,২৪১	১,৪১১	৪,৩০,৪৭০

এখানে উল্লেখ্য ১৯৫৭-৫৮ সালে জেলায় হাই স্কুলের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১২৫, ছাত্র সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৫,২৮০ জন। এর মধ্যে ৩১,৬৩০ জন ছাত্র এবং ৩৬৫০ জন ছাত্রী। তথ্যে জানা যাচ্ছে মেয়েরা শিক্ষার ক্ষেত্রে তখন অনেক পিছিয়ে। এই সময় জেলায় ১৫৭টি জুনিয়র হাই / মিড্‌ল স্কুল ছিল। এর ছাত্র সংখ্যা ১২,৮১২ জন। এর মধ্যে ছাত্র ১০,৯৩২ এবং ছাত্রী ১,৮৮০ জন।

১৯৬৩-৬৪ সালে এই ধরনের স্কুলের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৮০ তে। ছাত্র সংখ্যা দাঁড়ায় ২০,৮৪১ জন। এর মধ্যে ১৪,০৯৫ জন ছাত্র এবং ৬,৭৪৬ জন ছাত্রী।

প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রথম দু'বছরে রাজ্যে ৩২৮টি সিনিয়র বেসিক ও পূর্ণবেসিকের মধ্যে বর্ধমান জেলায় ছিল ৪২টি এই ধরনের স্কুল।

১৯৫৭ সালে শিক্ষা'বর্ষ থেকে উচ্চমাধ্যমিক (একাদশ শ্রেণী) পাঠ্যক্রম চালু হয়। এর ফলে জেলাতেও অনেক মাধ্যমিক স্কুল উচ্চমাধ্যমিকের ৭টি শাখার মধ্যে এক বা একাধিক শাখা বিশিষ্ট উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে রূপান্তরিত হতে থাকে। ১৯৫৭-৫৮ সালে জেলায়

৩২টি মাধ্যমিক স্কুল উচ্চ-মাধ্যমিকে (একাদশ শ্রেণীর) রূপান্তরিত হয়। একাদশ শ্রেণীর ছাত্র সংখ্যা দাঁড়ায় ১৪২২০ জন, এর মধ্যে ১২,৭৯৪ জন ছাত্র এবং ১,৪২৬ জন ছাত্রী।

১৯৬৩-৬৪ সালে উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা দাঁড়ায় ১০৪টি।

১৯৭১, ১লা জানুয়ারী উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৭১টি। এর মধ্যে ১৫০টি ছাত্রদের (এর মধ্যে কোন কোনটি সহ শিক্ষা সম্বলিত) এবং ২১টি ছাত্রীদের স্কুল। এই সময় হাইস্কুলের সংখ্যা ছিল ১৯৮ টি। ওই সময়ে কলেজে ৩ বছরের ডিগ্রীকোর্স চালু হওয়ায় হাইস্কুল (১০ ক্লাসের) থেকে স্কুল ফাইনাল পাশকরা ছাত্রছাত্রীদের কলেজে ভর্ত্তি হওয়ার জন্য ১ বছরের প্রাক্ বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা চালু হয়। ১৯৬৪ সালে মার্চ মাসে জেলায় ১৮টি উচ্চমাধ্যমিক স্কুলকে কলা এবং বিজ্ঞান বিভাগে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা কোর্স পড়ানোর অনুমতি দেওয়া হয়। এই সময় জেলার উচ্চমাধ্যমিকের ৪০টি স্কুল ছাত্রদের জন্য (কোন কোন স্কুল সহ-শিক্ষা সহ) কেবলমাত্র কলা বিভাগে পড়ানোর ব্যবস্থা ছিল। এই স্কুলগুলির অনেকগুলিই গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত। এদের মধ্যে সদর মহকুমার সদর থানায় ৫টি আউসগ্রাম থানায় ৪টি, মেমারী থানায় ৩টি, কালনা মহকুমার মন্তেশ্বর থানায় ৪টি এবং কাটোয়া মহকুমার মঙ্গলকোট থানায় ২টি। মেয়েদের জন্য নির্ধারিত ২১টি স্কুলের ৯টিতে কেবলমাত্র কলাবিভাগ (Humanities) ছিল। এদের মধ্যে আসানসোল মহকুমার আসানসোলে ১টি, চিত্তরঞ্জনে ৩টি, ডিসেরগড়ে ১টি ও কুলটিতে ১টি। ১টি স্কুল ছিল কাটোয়ায়। একটি বর্ধমানে। একটি রসুলপুরে অবস্থিত ছিল। মাত্র ১০৬টি ছেলেদের স্কুলে ও ১০টি মেয়েদের স্কুলে কলা ও বিজ্ঞান বিভাগে পড়াশোনার ব্যবস্থা ছিল। এদের মধ্যে কোন কোনটিতে বাণিজ্য, বৃত্তিমূলক শিক্ষা, কৃষি শাখা ছিল। কলা ও বিজ্ঞান দুই-ই বিষয়ের পড়ানোর ৭৩টি স্কুল ছিল সদর, দুর্গাপুর ও আসানসোল মহকুমায়, কাটোয়ায় ছিল ১৮টি, কালনায় ১৫টি এই ধরনের স্কুল ছিল। অনুপাত হিসাবে ধরলে শহর অঞ্চল ও গ্রাম অঞ্চলের অনুপাত ছিল ১ ঃ ২.৫।

বর্ধমান শহরের একটি মেয়েদের স্কুলে ৪টি শাখার পড়ানোর ব্যবস্থা ছিল — কলা, বিজ্ঞান, হোম সায়েন্স ও ফাইন আর্টস। জেলায় ৪টি স্কুলে কলা, বিজ্ঞান ছাড়াও ১টি মেয়েদের স্কুলে হোম সায়েন্স পড়ান হতো। ১৯৭১ সালে ৩১শে মার্চ জেলা পরিদর্শকের তথ্যানুসারে ৩১৩টি ছেলেদের এবং ৬২টি মেয়েদের স্কুলে ১,০৩,০৪৩ ছাত্র এবং ৪১,৪০০ ছাত্রী উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে পড়তো। তখন জেলার ৩১টি সবার্থ সাধক উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে বাণিজ্য শাখায় পড়ার ব্যবস্থা ছিল। ৪টি স্কুলে কৃষি শাখায় পড়াশোনার ব্যবস্থা ছিল। এর মধ্যে সদর মহকুমার রায়না থানায় ২টি এবং জামালপুর থানায় ১টি অবস্থিত ছিল। আর অন্যটি কালনা মহকুমার পূর্বস্থলী থানার সমুদ্রগড়ে। ৬টি স্কুলে বৃত্তিমূলক শাখা ছিল। এদের অবস্থান আসানসোল, বার্ণপুর, রাণীগঞ্জ, দুর্গাপুর। বর্ধমান শহরে ছিল ১টি। ফাইন আর্টস পড়ান হতো ১টি মেয়েদের স্কুলে।

নিচে ১৯৭১-৭২ সালের জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ছাত্র ছাত্রী ও শিক্ষকের একটি সারণী তুলে ধরা হচ্ছে ঃ

সারণী - ৫

স্কুলের শ্রেণী	স্কুলের সংখ্যা		ছাত্র সংখ্যা		শিক্ষকের সংখ্যা		মন্তব্য
১৯৭১-৭২	ছেলেদের	মেয়েদের	ছেলে	মেয়ে	পুরুষ	মহিলা	
উচ্চতর মাধ্যমিক	১৫৬	২১	৭৬০৬৫	২১৮৪২	৩২২৭	৫৪০	ডিস্ট্রিক অফিস বর্ধমান বিবরণী (প্রথম ভাগ) ২৩.৯.১৯৭২ থেকে গৃহীত
উচ্চ মাধ্যমিক	১৭৪	৩৩	৪০৩২২	২১৭১৫	১৬৪২	৩৭৪	
নিম্ন মাধ্যমিক	১৫৭	৪৭	১৪৯৪২	১২৬৫৫	৭৩৪	২৬০	
মাদ্রাসা	৬	—	১৩৩৯	১২৩	৪৮	—	

কোঠারি কমিশনের সুপারিশ (১৯৬৬) অনুসারে ১৯৭৩ সালে রাজ্যের সঙ্গে এই জেলায় মাধ্যমিক, উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠন সুরু হয়। মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশ মত একাদশ শ্রেণীর উচ্চমাধ্যমিকের বদলে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ২ বছরের উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা চালু হয়। প্রাথমিকের পর শিক্ষার পরিকাঠামোটি দাঁড়ায় ১০ ক্লাসের মাধ্যমিক, ২ বছরের উচ্চমাধ্যমিক ও কলেজে ৩ বছরের ডিগ্রী কোর্স। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর উচ্চমাধ্যমিক স্কুল ও কলেজ উভয় প্রতিষ্ঠানেই চালু করা হয়। এই সময় উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ গঠন করে উচ্চমাধ্যমিক স্কুলগুলির কর্তৃত্ব এই সংস্থার হাতে দেওয়া হয়। এই সময় কিছু দশম শ্রেণীর স্কুলকে এবং অনেক একাদশ শ্রেণী যুক্ত স্কুলকে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী যুক্ত উচ্চমাধ্যমিকে রূপান্তরিত করা হয়।

উচ্চমাধ্যমিকে দু'টি শাখা। সাধারণ ও বৃত্তিমূলক। জেলার অধিকাংশ স্কুলই সাধারণ শাখার জন্য অনুমোদন পায় – বৃত্তিমূলক শিক্ষার অনুমোদন পায় হাতে গোনা কয়েকটি স্কুল। রাজ্যের চিত্রও তাই। এর কারণ বৃত্তিমূলক শাখার প্রতি অধিকাংশ ছাত্র ছাত্রীর পড়ার আগ্রহ কম। দুর্গাপুরে টেকনিক্যাল কোর্স এবং বর্ধমানে ট্রেড ও কমার্স ভোকেশনাল কোর্স এখনও চালু আছে। কয়েকটি স্কুলে প্যারা মেডিকেল কোর্স চালু হয়েছিল কিন্তু ৩/৪ বছরের মধ্যেই ছাত্রাভাবে বন্ধ হয়ে যায়। এই সময় জেলা বিদ্যালয় সমূহের পরিদর্শক (মাধ্যমিক) অফিসের এক পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে জেলায় ১২৩টি দ্বাদশ শ্রেণীযুক্ত উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুল রয়েছে। ১১১টি ছেলেদের স্কুল এবং ১২টি মেয়েদের স্কুল। মোট ১২৩টি দ্বাদশ শ্রেণীর উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুলের মধ্যে বর্ধমান সদরে ৪৬টি এবং ১টি সিনিয়র মাদ্রাসা, আসানসোল মহকুমায় ২৪টি, দুর্গাপুর মহকুমায় ১৭টি, কালনা মহকুমায় ২০টি, কাটোয়া মহকুমায় ১৩টি ও ১টি সিনিয়র মাদ্রাসা রয়েছে। এই প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত পরিসরে – দ্বাদশ শ্রেণীযুক্ত উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংক্রান্ত বেশি তথ্য সংযোজন করা সম্ভব নয়।

সারণী - ৬

বর্ধমান জেলা

১৯৮৭-৮৮ সালের বর্ধমান জেলার অনুমোদিত ও সাহায্যপ্রাপ্ত মাদ্রাসা সহ বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা ও স্পনসর্ড স্কুলের সংখ্যা নিচের সারণিতে দেওয়া হল ঃ

	স্কুলের শ্রেণী বিন্যাস	ছেলেদের	মেয়েদের	মোট
১।	উচ্চমাধ্যমিক	৮৩	৭	৯০
২।	গভঃ স্পনসর্ড উচ্চমাধ্যমিক	২	১	৩
৩।	মাধ্যমিক	৩২২	৭৭	৩৯৯
৪।	গভঃ স্পনসর্ড মাধ্যমিক	৪	১	৫
৫।	হাই মাদ্রাসা	১০	১	১১
	মোট	৪২১	৮৭	৫০৮
৬।	জুনিয়র হাই	১৯৬	৩৯	২৩৫
৭।	জুনিয়র হাই মাদ্রাসা	১৪	–	১৪
৮।	সিনিয়র মাদ্রাসা	২	–	২
	মোট	২১২	৩৯	২৫১
	সর্ব মোট	৬৩৩	১২৬	৭৫৯

মহকুমা ভিত্তিক পরিসংখ্যান ঃ (সারণী - ৭)

সারণী - ৭

মহকুমা ভিত্তিক পরিসংখ্যান

বিদ্যালয়ে শ্রেণী বিন্যাস	সদর		আসানসোল		দুর্গাপুর		কালনা		কাটোয়া		মোট
	ছেলেদের	মেয়েদের	ছেলেদের	মেয়েদের	ছেলেদের	মেয়েদের	ছেলেদের	মেয়েদের	ছেলেদের	মেয়েদের	
১। উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়	৩৫	২	১৬	৩	৭	–	১৫	১	১০	১	৯০
২। গভঃ স্পনসর্ড উচ্চ মাধ্যমিক	–	–	–	–	২	১	–	–	–	–	৩
৩। মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১৪৩	২৭	৪৪	২৫	৩৮	৬	৪৩	১২	৫৪	৭	৩৯৯
৪। গভঃ স্পনসর্ড মাধ্যমিক	১	–	–	–	৩	১	–	–	–	–	৫
৫। হাই মাদ্রাসা	৯	১	–	–	–	–	–	–	১	–	১১
মোট	১৮৮	৩০	৬০	২৮	৫০	৮	৫৮	১৩	৬৫	৮	৫০৮
৬। জুনিয়ার হাই	৮১	১৮	৩১	৬	২৭	৪	৩৬	৬	২১	৫	২৩৫
৭। জুনিয়ার হাই মাদ্রাসা	৮	–	–	–	–	–	–	–	৬	–	১৪
৮। সিনিয়ার হাই মাদ্রাসা	১	–	–	–	–	–	–	–	১	–	২
মোট	৯০	১৮	৩১	৬	২৭	৪	৩৬	৬	২৮	৫	২৫১
সর্বমোট	২৭৮	৪৮	৯১	৩৪	৭৭	১২	৯৪	১৯	৯৩	১৩	৭৫৯

জেলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিদর্শক অফিসের তথ্যানুসারে

৩০.১২.২০০০ তারিখের পাওয়া সর্বশেষ মাধ্যমিক শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য এই রকম ঃ

১) জেলার তথ্য ঃ

জেলার আয়তন	৭০২৪ বর্গ কিমি
মহকুমার সংখ্যা	৬
পঞ্চায়েত সমিতির সংখ্যা	৩১
পৌরসভার সংখ্যা	৯
মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সংখ্যা	২
শহরের সংখ্যা	৫১
মৌজার সংখ্যা	২৫৪০
গ্রামের সংখ্যা	২৫৬৯
গ্রাম সংসদের সংখ্যা	৩৮৩৩
শিক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা	৫৫

২) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা

স্কুল

উচ্চতম মাধ্যমিক	মাধ্যমিক	জুনিয়ার হাই	মোট
১৭৮	৪৮১	৯২	৭৫১

মাদ্রাসা

সিনিয়র মাদ্রাসা	হাইমাদ্রাসা	জুনিয়র হাই মাদ্রাসা	মোট
৩	১৩	১৮	৩৪

৩) স্কুল ও মাদ্রাসার মোট সংখ্যা ঃ ৭৮৫

শিক্ষক / অশিক্ষক কর্মীর সংখ্যা

	অনুমোদিত সংখ্যা	কর্মরত সংখ্যা	খালি পদ
শিক্ষক	১৪,৫৮৫	১৩,১১৬	১,৪৬৯
অশিক্ষক	২,৫২৯	২,৪৩৪	৯৫

শিক্ষকদের মধ্যে ৭৬.২২ শতাংশ শিক্ষণ প্রাপ্ত

৪) মোট ছাত্র ছাত্রী সংখ্যা ঃ ৫,৬৬,১৩৭

এদের মধ্যে ২৭.৬ শতাংশ আদিবাসী, ২.৬ শতাংশ তপশিলী

৫) শিক্ষক - শিক্ষা কর্মীদের মাসিক বেতন বাবদ খরচ ১৪.৩৫ কোটি টাকা।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে বিংশ শতাব্দীর অর্ধেক এবং তারপরেও আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে প্রথম দিকে মিশনারিদের প্রচেষ্টা, পরে ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং তারওপরে সমষ্টিগত উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়। সরকারী সাহায্য আসে অনেক পরে। তাও বিভিন্ন স্তরে। প্রথম দিকে সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের সংখ্যা ছিল খুবই কম। এই সাহায্য দু'রকমভাবে দেওয়া হতো – কিছু স্কুলকে ঘাটতি ভিত্তিক সাহায্য এবং কিছু স্কুলকে আংশিক অনুদান। পরবর্তীকালে (১লা মে, '৭২) অধিকাংশ স্কুলই বেতন ঘাটতি ভিত্তিক সাহায্যের আওতায় আসে। তাই আজ নতুন শতাব্দীতেও স্কুলের গৃহনির্মাণ, গৃহ সংস্কার, আসবাবপত্র ক্রয় প্রভৃতি ব্যক্তিগত ও যৌথ উদ্যোগের সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল।

বর্ধমান জেলা যেহেতু কৃষিভিত্তিক – এবং এখানে প্রায় তিনশ' বছরের একটি রাজ পরিবার থাকায় বর্ধমান জেলায় যৌথ উদ্যোগ হুগলী, কলকাতা বা ২৪ পরগনার পরে পরিলক্ষিত হয়েছে।

ব্যক্তিগত উদ্যোগের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি রাজ পরিবার বর্ধমান শহরে রাজ স্কুল, রাজ কলেজ, টেকনিক্যাল স্কুল, কালনায় রাজ স্কুল প্রতিষ্ঠায় অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। এছাড়াও তাঁরা অনেকসময় অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমনকি বর্ধমানের বাইরেও অর্থ সাহায্য করেছেন। সিয়ারসোল রাজপরিবার রাণীগঞ্জ অঞ্চলে ছেলে এবং মেয়েদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন. মহারাজ মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী তাঁর পিতৃভূমি বর্ধমানের মাথরুনে তাঁর বাবার নাম অনুযায়ী মাথরুন নবীনচন্দ্র ইনস্‌টিটিউশন স্থাপন করেন। এই জেলার যব গ্রামে স্ত্রীর নামে কাশীশ্বরী বিদ্যালয় এবং ইথোরায় ছেলের নামে শ্রীশচন্দ্র ইনস্‌টিটিউশন স্থাপন করেন।

ব্যক্তি উদ্যোগে রাজ পরিবারের পর অনেক জমিদার, ভূ-স্বামী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব যাঁদের মধ্যে কেউ কেউ স্বাধীনতা আন্দোলন ও জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন – স্কুল প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নিজের নামে কিম্বা পরিবারের কারো নামে তাঁরা এগিয়ে আসেন।

চকদীঘি জমিদার পরিবার চকদীঘিতে স্কুল স্থাপন করেন। আহার বেলমা (পরবর্তী নাম শ্যামসুন্দর) এর বিশালাক্ষ বসু নিজের গ্রামে স্কুল ও কলেজ স্থাপন করেন।

ভারত বিখ্যাত আইনবিদ স্যার রাসবিহারী ঘোষ তোড়কনা গ্রামে তাঁর বাবার নামে স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। স্যার রাসবিহারী ঘোষ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলকাতা বিজ্ঞান কলেজের জন্য প্রভূত অর্থদান করেন।

কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি স্যার নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় তাঁর নিজের গ্রাম বননবগ্রামে একটি হাইস্কুল স্থাপন করেন।

শ্রীখণ্ড নিবাসী কামাখ্যাচরণ মজুমদারের উদ্যোগে শ্রীখণ্ড বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

বিখ্যাত চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ গণপতি পাঁজা তাঁর নিজের গ্রামে মা ও বাবার নামে যথাক্রমে বিশ্বেশ্বরী উচ্চ বিদ্যালয় ও বিনোদ বিহারী পাঁজা বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপন

করেন।

কাটোয়া-অগ্রদ্বীপ অঞ্চলে রঘুনাথপুরে ব্যবসায়ী মৃত্যুঞ্জয় দে মাখনতোড়ে প্রাথমিক স্কুলটিকে হাই স্কুলে পরিণত করেন।

কালাজ্বরের আবিষ্কারক উপেন্দ্র ব্রহ্মচারীর আর্থিক সাহায্যে পূর্বস্থলী হাইস্কুল গড়ে ওঠে।

এছাড়া মেঝিয়ারি গ্রামে গঙ্গাটিকুরিতে, রাম গোপালপুরে ও অন্যান্য জায়গায় এমনিভাবে গড়ে ওঠে ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠার স্কুলগুলি। স্মরণ করতে পারি আরও একটি নাম – গোলাম রকবানি মল্লিক যিনি তাঁর বাবার নামে চক্ষণদীঘিতে একটি হাইস্কুল স্থাপন করেন।

মুসলমানদের শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য আরও কয়েকটি নাম ঃ মৌলবী আবুল কাসেম ও জনাব আবদুস্ সাত্তার।

জামালপুর থানায় নিজের গ্রামে প্রখ্যাত চিকিৎসক শৈলেন্দ্র নাথ মুখার্জি ইলসরা এস.এন. বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় প্রভূত অর্থদান করেন।

দাঁইহাটের জিতেন্দ্রনাথ মিত্র বর্ধমানের সাধনপুরে ইঞ্জিনীয়ারিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্যোক্তা।

বর্ধমানের আউসগ্রামে তুরকিগ্রামের চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কলকাতায় অভয় চরণ বিদ্যামন্দির, কালীধন ইনস্টিটিউশন ও তীর্থপতি ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠায় প্রভূত অর্থ সাহায্য করেছেন। কলকাতার চারুচন্দ্র কলেজটি তাঁরই নামের স্মারক হয়ে আছে।

শিক্ষাবিদ ও স্বাধীনতা সংগ্রামী গান্ধীবাদী নেতা বিজয় কুমার ভট্টাচার্যের উদ্যোগে গ্রাম উন্নয়ন ও শিক্ষার সংযোগ স্থাপনের জন্য শিক্ষা নিকেতন গড়ে ওঠে। এ ব্যাপারে আমরা অন্যত্র আলোচনা করেছি।

এই প্রবন্ধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বর্ধমান জেলার স্কুল ও কলেজের তালিকা পর্য্যালোচনা করলে দেখা যাবে অনেক স্কুল ও কলেজের নামের সঙ্গে ব্যক্তি নাম জড়িয়ে আছে। এ থেকেই বোঝা যায় শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগের প্রচেষ্টা কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও অর্থ সাহায্যের সঙ্গে সমষ্টিগত উদ্যোগের সমন্বয় সাধন হয়েছে।

বর্ধমান শহরে মাধ্যমিক সমতুল ইংরাজি-মাধ্যম শিক্ষার প্রথম স্কুলটি হচ্ছে সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল। ১৯৬২ সালে বর্ধমানের তৎকালীন জেলা শাসক কে.পি.এ. মেনন শহরের বিশিষ্ট নাগরিকদের নিয়ে ইংরাজি মাধ্যম স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য 'বর্ধমান এডুকেশন ট্রাষ্ট' গঠন করেন। এই ট্রাষ্টের উদ্যোগে বর্ধমান টাউনস্কুলে প্রাতঃ বিভাগে 'মডার্ন স্কুল' নামে ইংরাজি মাধ্যম প্রাথমিক স্কুল খোলা হয় – ২ মাস বাদেই ওই স্কুলটি জেলা শাসকের বাংলোয় স্থানান্তরিত হয়। এই স্কুলটি ১৯৬৪ সালের জানুয়ারী মাসে বর্ধমান ডি.ভি.সি. দপ্তরের অডিটোরিয়ামে কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলের তত্ত্বাবধানে দেওয়া হয়। আসানসোলে মিশনারিদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত কয়েকটি স্কুল ক্রমে ক্রমে ইংরাজি মাধ্যম মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে রূপান্তরিত হয়। দুর্গাপুরে প্রবাসী এক বাঙালির উদ্যোগে ইংরাজি মাধ্যম স্কুল গড়ে ওঠে। দুর্গাপুরের শিল্পাঞ্চলে আসানসোলে ও

রূপনারায়ণপুর অঞ্চলে কয়েকটি স্কুলে ইংরাজি এবং বাংলা দু'টি মাধ্যমেই পড়ান হয় – কোন কোনটিতে হিন্দি ও ইংরাজি মাধ্যমে পড়ান হয়। আসানসোলে ২টি উর্দু মাধ্যম স্কুল আছে।

বর্ধমান শহরে অন্যান্য ইংরাজি মাধ্যম স্কুলগুলির মধ্যে হোলিরক স্কুল, হোলি চাইল্ড স্কুল, ইস্ট এ্যাণ্ড ওয়েষ্ট মডেল স্কুল অন্যতম। এগুলি মাধ্যমিকের সমতুল বিভিন্ন স্তরে পড়ান হয়।

শিক্ষা বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়া শুরু হওয়ায় এবং উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তের একশ্রেণীর মানুষের উচ্চশিক্ষা ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্যের জন্য ইংরাজি মাধ্যম স্কুলে ভর্ত্তি হওয়ার আগ্রহ ক্রমবর্ধমান। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ১৯৮২ সাল থেকে প্রাথমিক পর্য্যায়ে ইংরাজি তুলে দেবার সিদ্ধান্ত। তাই আগামী কয়েক বছরে জেলায় ইংরাজি মাধ্যম স্কুলের সংখ্যা অবশ্যম্ভাবী ভাবে বেড়ে যাবে। ইংরাজি শিক্ষার এবং ইংরাজি মাধ্যম স্কুলে পড়ার আগ্রহ সম্বন্ধে ইতিপূর্বে প্রাথমিক শিক্ষা পর্য্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জেলায় যেখানে মোট জনসংখ্যা ৬০,৫০,৬০৫ সেই তুলনায় প্রাথমিক, মাধ্যমিক, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় – প্রভৃতিতে শিক্ষার যে আয়োজন তা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। আবার মোট জন সংখ্যায় মেয়েদের ক্ষেত্রে শিক্ষার সুযোগ সীমিত। গ্রামাঞ্চলে বেশির ভাগ স্কুল কো-এডুকেশন বা সহ-শিক্ষামূলক – যেখানে মেয়েরা পড়ার সুযোগ পায়, কিন্তু গ্রামে পুরোপুরি মেয়েদের জন্য স্কুল প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য। পরিসংখ্যানে দেখি জেলায় মোট শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা ৩১,৩৬,৭৬১ (৫১.৮৪%) অথচ আমরা জানি একটা দেশের সামগ্রিক মান উন্নয়ন অনেকাংশেই নির্ভর করে শিক্ষার ওপর। স্বাধীনতা-উত্তর কালে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন শাখা প্রশাখা নিয়ে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলেও জন সংখ্যার বিপুল হার বৃদ্ধির ফলে শিক্ষার আনুপাতিক হার কিন্তু যথেষ্টই কম থেকে গেছে।

যদিও সরকার আদিবাসী বা অনগ্রসর শ্রেণীর শিক্ষার প্রচুর সুযোগ সুবিধা করে দিয়েছেন যাতে শিক্ষায় তাদের আগ্রহ বাড়ে। কিন্তু খাদ্য বাসস্থান প্রভৃতির সমস্যা এই আয়োজনের উদ্দেশ্যকে সফল হতে দিচ্ছে না। গ্রামাঞ্চলে বেশ কিছু হোষ্টেল আছে এই সব অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য কিন্তু সেখানেও সমস্যা অনেক। প্রয়োজনের তুলনায় আবাসনের সিট-ও কম। ভগ্ন বাড়ীঘর ও পরিবেশ অনেক সময়ই শিক্ষার অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টিতে বাধা দেয়। বহু স্কুল আছে যেখানে ঘর আছে তো প্রয়োজনীয় বেঞ্চি নেই – ঘরের দরজা জানালা নেই। পায়খানা বা প্রস্রাবখানা নেই। কোথাও কোথাও পানীয় জলেরও সংকট প্রবল। আদিবাসী বা অনগ্রসর শ্রেণীর মেয়েদের হোষ্টেলও কোথাও নেই।

এই সব কারণে এবং মূলতঃ দারিদ্র্যের জন্য বর্ধমানের মত সার্বিক সাক্ষরতা যুক্ত জেলায় জেলাশাসকের অফিসের সামনের সাইনবোর্ডের লেখাটি জ্বলজ্বল করছে। 'দেশের ১০০ জন মানুষের মধ্যে ৩২ জন স্কুলে যায় না।' এর বাইরে যারা প্রাথমিক স্কুলে ভর্ত্তি

হচ্ছে তাদের মধ্যেও 'স্কুলছুট' (ড্রপ আউটের) সংখ্যা ৫০ শতাংশের বেশী। এর সত্যতা যাচাই-এর জন্য আমাদের বেশিদূর যেতে হবে না। 'শিশু শ্রমিক 'আইন'—এর বাস্তব প্রয়োগের দুর্বলতার কারণে চায়ের দোকানে, হোটেলে এবং গৃহ পরিচারক পরিচারিকার ভূমিকায় এই স্কুল ছুটদের কিম্বা স্কুলে না-যাওয়াদের সাক্ষাৎ আমরা সর্বদাই পেয়ে থাকি। প্রাইমারিতে চাল দেওয়া কিম্বা অন্য প্রলোভনেও এইসব শিশুদের আমরা সংবিধানের অন্যতম মৌলিক অধিকার ভোগের সামিল করতে পারছিনা।

বিশেষ ধরনের স্কুল

গান্ধীজীর আদর্শে গ্রামীণ উন্নয়ন ও শিক্ষার সমন্বয়ের জন্য বর্ধমানের অদূরে বড়শুলের কাছে বিজয় ভট্টাচার্য প্রতিষ্ঠা করেন একটি বিশেষ ধরনের স্কুল ১৯৩৫ সালে। তখন প্রতিষ্ঠানটির নাম ছিল 'বিদ্যালয়'। এরপর ১৯৫৩ সালে এর নাম হয় 'শিক্ষানিকেতন'।

কলানবগ্রামে শিক্ষানিকেতনে রয়েছে দরিদ্র ছাত্রদের জন্য ২টি নার্সারি স্কুল (৩—৬ বছরের ছাত্রছাত্রী) ১টি সিনিয়র বেসিক স্কুল, ১টি ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কুল, ১টি বালিকা বিদ্যালয়, ১টি স্কুল মাদার শিক্ষার জন্য ট্রেনিং সেন্টার, ১টি সমাজ সেবাকেন্দ্র এবং একটি উন্নতমানের আঞ্চলিক পাঠাগার।

কাটোয়ার কাছে খাজুরডিহিতে ডাঃ হরমোহন সিং প্রতিষ্ঠিত 'আনন্দ নিকেতনে' প্রতিবন্ধীদের বিভিন্ন ধরনের ট্রেনিং দেওয়া এবং তাদের স্বাবলম্বী করে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য বিশেষ ধরনের স্কুল এই জেলায় কয়েকটি স্থাপিত হয়েছে। গাংপুরের কাছে 'পান্নাময়ী শিশু নিকেতন' নামক প্রতিষ্ঠানে অনাথ শিশুদের শিক্ষার, বৃত্তিশিক্ষার ও স্বাবলম্বী করে তোলার উদ্যোগ প্রশংসনীয়।

মূক-বধির ছাত্রদের জন্য বর্ধমান শহরে চাঁদনিমোড়ে ডাঃ এস.এন. মুখার্জি মুখবধির স্কুল গড়ে উঠেছে। মানসিক প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার জন্য গড়গড়াঘাটে 'স্বয়ম্ভর' এবং চাঁদনিমোড়ে নিরঞ্জন বোধ নিকেতন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। টিকরহাটে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'অনিকেত'।

অন্ধদের শিক্ষা এবং বৃত্তিশিক্ষার জন্য বর্ধমান শহরে সুকান্তপল্লীতে 'বর্ধমান ব্লাইণ্ড একাডেমী', গাংপুরের অদূরে নজরুল স্মৃতি দৃষ্টিহীন বিদ্যালয় এবং দুর্গাপুরে ১টি এবং আসানসোলে ১টি মূকবধির স্কুল গড়ে উঠেছে।

গ্রাম সেবকদের ট্রেনিং-এর জন্য কালনা রোডের ধারে এগ্রিকালচার ফার্মে গ্রাম সেবক ট্রেনিং সেন্টার চালু আছে।

নার্সদের ট্রেনিং-এর জন্য ছোটনীলপুর ভোলানন্দ পল্লীতে নার্সেস ট্রেনিং সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া ১টি রুরাল ট্রেনিং সেন্টার আছে।

বিভিন্ন ধরনের শারীরিক প্রতিবন্ধী ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য আরও শিক্ষাকেন্দ্র ও বৃত্তিশিক্ষাকেন্দ্র আবাসন সহ প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজনীয়তা থাকা সত্ত্বেও সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের অভাবে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান তেমন ভাবে গড়ে উঠছে না জেলায়।

আজকের যুগে প্রতিবন্ধীরা সমাজে এক প্রয়োজনীয় মানবসম্পদ বলেই স্বীকৃত হয়েছে। কারণ দেখা গেছে প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও এদের কারো কারো মধ্যে ব্যক্তিগত প্রতিভা যথেষ্ট রয়েছে – তাদের পূর্ণ বিকাশের সুযোগ চাই।

সারণী - ৮ বর্ধমান জেলা

১৯৯৯–২০০০ শিক্ষা বর্ষে যে সমস্ত জুনিয়র হাইস্কুল, হাইস্কুলে রূপান্তরিত হয়েছে তাদের তালিকা নিচে দেওয়া হল ঃ

ক্রম	স্কুলের নাম	ডাকঘর	মহকুমা	অনুমোদনের তারিখ
১	মসাগ্রাম জুনিয়র হাইস্কুল	মসাগ্রাম	সদর	১ ৫ ৯৯ নবম শ্রেণী ১ ৫ ২০০০ দশম শ্রেণী
২	নতুনগ্রাম জুনিয়র হাইস্কুল	নন্দী	কালনা	ঐ
৩	রহমতনগর ইকবাল একাডেমি জুনিয়র হাইস্কুল	অণ্ডাল	দুর্গাপুর	ঐ
৪	কৃষ্ণপুর জনিয়ার হাইস্কুল	বর্ধমান রাজবাটী	সদর	ঐ
৫	কুলুত এন. জুনিয়ার হাইস্কুল	কুলুত	কালনা	ঐ
৬	আঝাপুর বালিকা বিদ্যালয়	আঝাপুর	সদর	ঐ
৭	খোনাইবান্ধা গোরক্ষনাথ বিদ্যামন্দির	খোনাইবান্ধা	কাটোয়া	ঐ
৮	শ্রীরামপুর জুনিয়র হাইস্কুল	শ্রীপল্লী	সদর	ঐ
৯	সাকতোড়িয়া জুনিয়র হাইস্কুল	ডিসেরগড়	আসানসোল	ঐ
১০	বিজরা জুনিয়ার হাইস্কুল	ধবনী	দুর্গাপুর	ঐ
১১	চিত্তরঞ্জন কোস্তরবা গান্ধী বিদ্যালয়	চিত্তরঞ্জন টাউনশিপ	আসানসোল	ঐ
১২	বোরিংডাঙা জুনিয়ার হাইস্কুল	জামুরিয়াহাট	আসানসোল	ঐ
১৩	পাঁইটা পান্নারাণী বালিকা বিদ্যালয়	পাঁইটা	সদর	ঐ
১৪	বালাইপুর তারাপদ বিদ্যাপীঠ	লালগঞ্জ	আসানসোল	ঐ
১৫	বারিশালী জুনিয়র হাইস্কুল	খণ্ডঘোষ	সদর	ঐ
১৬	কবিতীর্থ চুরুলিয়া নজরুল বিদ্যাপীঠ	চুরুলিয়া	আসানসোল	ঐ
১৭	নেপালীপাড়া হিন্দি জুনিয়র হাইস্কুল	দুর্গাপুর	দুর্গাপুর	ঐ
১৮	আদর্শপল্লী জুনিয়র হাইস্কুল	পানুহাট	কাটোয়া	ঐ
১৯	হাটগাছা জুনিয়র হাইস্কুল	অর্জুনা	কালনা	ঐ
২০	বাগদিয়া সিদ্ধপুর বিদ্যাপীঠ	ভুড়ি	আসানসোল	ঐ
২১	চাকুলিয়া জুনিয়র হাইস্কুল	চাকুলিয়া	কাটোয়া	ঐ
২২	অণ্ডাল মহাবীর জুনিয়র হাইস্কুল	অণ্ডাল	দুর্গাপুর	ঐ
২৩	বেগুনিয়া জুনিয়র হাইস্কুল	বরাকর	আসানসোল	ঐ
২৪	বেলেরি জুনিয়ার হাইস্কুল	বেলেরি	সদর	ঐ
২৫	পানাগড় বাজার জুনিয়র হাইস্কুল	পানাগড় বাজার	দুর্গাপুর	ঐ
২৬	বর্ধমান নিবেদিতা কন্যা বিদ্যালয়	রাজবাটী	সদর	ঐ
২৭	কাঁখোয়া শ্রীঅরবিন্দ বিদ্যামন্দির	কাঁখোয়া	আসানসোল	ঐ
২৮	নেতাজীনগর কলোনি জুনিয়র হাইস্কুল	দুর্গাপুর-১৩	দুর্গাপুর	ঐ
২৯	নৃসিংহপুর জুনিয়র হাইস্কুল	নৃসিংহপুর	সদর	ঐ

৩০	উখড়া কে.বি. জুনিয়র হাইস্কুল	উখড়া	দুর্গাপুর	ঐ
৩১	কুরিচা টি.ডি. জুনিয়র হাইস্কুল	কুরিচা	কালনা	ঐ
৩২	গলিগ্রাম জুনিয়র হাইস্কুল	গলিগ্রাম	সদর	ঐ
৩৩	উখড়া আদর্শ হিন্দি জুনিয়র হাইস্কুল	উখড়া	দুর্গাপুর	ঐ
৩৪	জামুরিয়া বালিকা বিদ্যালয়	জামুরিয়া বাজার	আসানসোল	ঐ
৩৫	রাইপুর কাশিয়াড়া গার্লস	কাশিয়াড়া	বর্ধমান	ঐ

যে স্কুলগুলি জুনিয়র থেকে হাইস্কুল হয়েছে তার মধ্যে ১০টি সদর মহকুমা, ৩টি কাটোয়া মহকুমায়, ৪টি কালনা মহকুমায়, ৮টি দুর্গাপুর মহকুমায়, ৯টি আসানসোল মহকুমায়। এই স্কুলগুলির মধ্যে ৫টি মেয়েদের জন্য। ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে প্রয়োজনীয় স্কুলের অভাব থাকায় এক একটি স্কুলে ছাত্র সংখ্যা অত্যধিক বেশি। অধিকাংশ স্কুলে পরিকাঠামোগত সমস্যা ও শিক্ষকের অপ্রতুলতা প্রকট।

এই পরিসংখ্যান প্রতিবেদন লেখার সময় পর্য্যন্ত (জেলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক অফিস সূত্রে প্রাপ্ত)

সারণী - ৯ বর্ধমান জেলা

যে সমস্ত মাধ্যমিক স্কুল ২০০০ সালে উচ্চমাধ্যমিকে রূপান্তরিত হয়েছে তাদের তালিকা নিচে দেওয়া হল।

ক্রম	স্কুলের নাম	ডাকঘর	মহকুমা
১	বোড়োবলরাম এল.বি. বিদ্যামন্দির	বোড়োবলরাম	সদর
২	শ্যামসুন্দর রামলাল আদর্শ বিদ্যালয়	শ্যামসুন্দর	সদর
৩	গোতান এস.এম.হাইস্কুল	গোতান	সদর
৪	মেড়াল এস.সি.পি. ইনস্‌টিটিউশন	মেড়াল	সদর
৫	তোড়কনা জে.বি. হাইস্কুল	তোড়কনা	সদর
৬	গুসকরা বালিকা বিদ্যালয়	গুসকরা	সদর
৭	কেলেটি জি.এ. বিদ্যাপীঠ	কেলেটি	সদর
৮	দিগ্‌নগর এইচ জে.জে. ইনস্‌টিটিউশন	দিগনগর হাটতলা	সদর
৯	এড়াল আঞ্চলিক হাইস্কুল	এড়াল	সদর
১০	আমারুন ষ্টেশন শিক্ষানিকেতন	আমারুন আর. এস.	সদর
১১	ওড়গ্রাম হাইস্কুল	ওড়গ্রাম	সদর
১২	বাজার বনকাপাশি এস.এম. হাইস্কুল	বাজার বনকাপাশি	কাটোয়া
১৩	কেতুগ্রাম এস.এ.এম. ইন্‌স্‌টিটিউশন	কেতুগ্রাম	কাটোয়া
১৪	কাটোয়া জানকীলাল শিক্ষাসদন	কাটোয়া	কাটোয়া
১৫	বিল্বগ্রাম হাইস্কুল	বিল্বগ্রাম	কাটোয়া
১৬	অগ্রদ্বীপ ইউ.এম. বিদ্যালয়	অগ্রদ্বীপ আর.এস.	কাটোয়া
১৭	ইছাপুর শ্রীগদাধর হাইস্কুল	ইছাপুর	কালনা
১৮	পাড়ুলিয়া কে.কে. হাইস্কুল	পাড়ুলিয়া	কালনা
১৯	বাগনাপাড়া হাইস্কুল	বাগনাপাড়া	কালনা
২০	বৈদ্যপুর রাজরাজেশ্বর বালিকা বিদ্যালয়	বৈদ্যপুর	কালনা
২১	ধাত্রীগ্রাম বালিকা বিদ্যালয়	ধাত্রীগ্রাম	কালনা

২২	পারুলডাঙ্গা নসরতপুর উচ্চ বিদ্যালয়	পারুলডাঙ্গা নসরতপুর	কালনা
২৩	দত্তদেরিয়াটন এস.বি. বিদ্যানিকেতন	দত্তদেরিয়াটন	কালনা
২৪	আছড়া যজ্ঞেশ্বর ইনস্টিটিউশন	আছড়া	আসানসোল
২৫	জলধী কুমারীদেবী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়	সীতারামপুর	আসানসোল
২৬	পানাগড় বাজার হিন্দি হাইস্কুল	পানাগড় বাজার	দুর্গাপুর
২৭	পলাশন এম.এম. হাইস্কুল	পলাশন	সদর
২৮	কাটোয়া বালিকা বিদ্যালয়	কাটোয়া	কাটোয়া

এই পরিসংখ্যান প্রতিবেদন লেখার সময় পর্য্যন্ত (জেলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক অফিস সূত্রে প্রাপ্ত)

ওপরের তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে সদর মহকুমায় ১২টি স্কুল, কাটোয়া মহকুমায় ৬টি স্কুল, কালনা মহকুমায় ৭টি স্কুল, আসানসোল মহকুমায় ২টি স্কুল, দুর্গাপুর মহকুমায় ১টি স্কুল ২০০০ সালে উচ্চমাধ্যমিকের অনুমোদন পেয়েছে। এদের মধ্যে মেয়েদের জন্য কাটোয়ায় ১টি, সদরে ১টি , কালনায় ২টি এবং আসানসোলে ১টি। দুর্গাপুরের স্কুলটি হিন্দি মাধ্যম। অন্য স্কুলগুলি সহ-শিক্ষামূলক। একই বছরে এতগুলি স্কুল উচ্চমাধ্যমিকে রূপান্তরিত হবার কারণ সরকার কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিকের পড়াশোনার আয়োজন তুলে নিয়ে স্কুলে উচ্চ মাধ্যমিক পড়াশোনার নীতি গ্রহণ করেছেন। যে সমস্ত স্কুল মাধ্যমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিকে রূপান্তরিত হয়েছে তাদের অনেকেরই উচ্চমাধ্যমিক পড়ানোর মত পরিকাঠামো এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নেই। কলেজগুলি থেকে উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে স্থানান্তরিত করার কারণ কলেজীয় শিক্ষায় ৩ বছরের ডিগ্রী কোর্স চালু হওয়া।

১৯৯৯-২০০০ সালে বর্ধমান জেলার মাধ্যমিক শিক্ষার তথ্য নিচে দেওয়া হল ঃ

স্কুলের সংখ্যা

উচ্চমাধ্যমিক স্কুল	—	১৫২
মাধ্যমিক স্কুল	—	৪৩৪
হাই মাদ্রাসা	—	২৬
জুনিয়ার হাইস্কুল	—	১৫৯
জুনিয়ার হাইমাদ্রাসা	—	১৪
সিনিয়র হাইমাদ্রাসা	—	৩
মোট	—	৭৮৮

ছাত্র ছাত্রী সংখ্যা

ছাত্র	—	৪,৫০,৮৬৬ জন
ছাত্রী	—	৯৪,৯০১ জন
মোট	—	৫,৪৫,৭৬৭ জন

শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যা

শিক্ষক	–	৯৩৪৫ জন
শিক্ষিকা	–	১৮৩৩ জন
মোট	--	১১,১৭৮ জন

মাহিনা বাবদ খরচ (বেতন ঘাটতি) – সেপ্টেম্বর, ২০০০

– ১৪.৩০ কোটি (এর পরিমাণ প্রতিমাসেই বৃদ্ধি পাবে শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষকদের বাৎসরিক বেতনবৃদ্ধি বাবদ এবং নতুন ডি.এ. ঘোষিত হলে)

শিক্ষক বেতন ছাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিভিন্নখাতে উন্নয়ন বাবদ সরকারী খরচ (১৯৯৮–২০০০)

গৃহনির্মাণ বাবদ	–	৪৫,০০,০০০ টাকা
গৃহসংস্কার	–	২৩,০০,০০০ টাকা
পাঠাগার বাবদ	–	৫,৭০,০০০ টাকা
বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি ক্রয় বাবদ	–	২২,০০০ টাকা

বৃত্তি মূলক শিক্ষা

বর্ধমান জেলার প্রথম ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ – দুর্গাপুর রিজিওনাল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ। এই কলেজটি রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের যৌথ সাহায্যে পরিচালিত হয়। কলেজটি সহ-শিক্ষামূলক হলেও ১৯৭০-৭১ সাল পর্য্যন্ত কোন ছাত্রীই এখানে ভর্ত্তি হয়নি। কারণ হিসাবে মেয়েদের সর্বাত্মক অনীহাকে দায়ি করা যায়। এই ইনস্‌টিটিউশনে ইঞ্জিনীয়ারিং ও টেকনোলজি দুই বিভাগই চালু আছে। উচ্চমাধ্যমিক অথবা সমতুল পরীক্ষায় পাশ করে ৫ বছরের কোর্স পড়ার পর বি.ই. ডিগ্রী পাওয়া যায়। এই প্রতিষ্ঠানে দু'বছর মাষ্টার অব ইঞ্জিনীয়ারিং (এম.ই.) এবং মাষ্টার অব টেকনোলজি অর্থাৎ এম.টেক. পড়ার ব্যবস্থা আছে। বি.ই.ডিগ্রীর পর এই কোর্সে পড়া হয়।

ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ ছাড়াও এই জেলায় ৩টি পলিটেকনিক আছে – যেখানে ৩ বছরের ইঞ্জিনীয়ারিং-এ লাইসেন্সিয়েট কোর্স ও দু'বছরের টেকনিসিয়ানস্‌ ডিপ্লোমা কোর্স চালু আছে। ৩টি পলিটেকনিকের মধ্যে ২টি আসানসোলে ১টি বর্ধমানে। রাণীগঞ্জে ১টি মাইনিং ইনস্‌টিটিউট আছে। অতি সম্প্রতিকালে বর্ধমানে জি.টি. রোড বাইপাশে বামের কাছে মহিলাদের আই.টি.আই. অর্থাৎ পলিটেকনিক কলেজ স্থাপিত হয়েছে।

বর্ধমান শহরে মহারাজাধিরাজ বিজয় চাঁদ ইনস্‌টিটিউট অব ইঞ্জিনীয়ারিং ও টেকনোলজির প্রতিষ্ঠা ১৯৪৯ সালে। এই প্রতিষ্ঠানে সিভিল, মেকানিক্যাল ও ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং-এর লাইসেন্সিয়েট কোর্স ও ড্রাফটসম্যানসিপ কোর্স চালু আছে।

আসানসোলের ২টি পলিটেকনিকের মধ্যে আসানসোল পলিটেকনিকের প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৫৬ সালে। এখানে আংশিক সময় মেকানিক্যাল ও ইলেক্‌ট্রিক্যাল কোর্স পড়ান হয়। অন্য পলিটেকনিকটি কন্যাপুরে – ১৯৬৫ সালে প্রতিষ্ঠিত। এখানেও মেকানিক্যাল ও ইলেক্‌ট্রিক্যাল পড়ান হয়।

জেলায় ৪টি জুনিয়র টেকনিক্যাল স্কুল রয়েছে। এখানে ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপ্লোমা কোর্স পড়ান হয়। এগুলি (১) কন্যাপুর জুনিয়র টেকনিক্যাল স্কুল, (২) সেন্ট ভিনসেন্ট জুনিয়র টেকনিক্যাল স্কুল, (৩) রূপ নারায়ণপুর জুনিয়র টেকনিক্যাল স্কুল এবং (৪) সতীশচন্দ্র শিল্প বিদ্যালয় – কলানবগ্রাম। প্রথম তিনটির অবস্থান আসানসোল মহকুমায় এবং একটি বর্ধমান সদরে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ডাইরেকটরেট অব ইনডাস্‌ট্রিস-এর তত্ত্বাবধানে কয়েকটি ইনডাষ্ট্রিয়াল ট্রেনিং স্কুল আছে। এখানে বিভিন্ন পেশার উপযোগী বৃত্তি শিক্ষা দেওয়া হয়।

দুর্গাপুরে শিল্প সংক্রান্ত গবেষণার জন্য রয়েছে সেন্ট্রাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং রিসার্চ ইনস্‌টিটিউট – যার শুরু ১৯৫১ সাল থেকে। এরই উপযোগী সংস্থা হিসাবে গড়ে উঠেছে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং রিসার্চ এ্যাণ্ড ডেভোলপমেন্ট অর্গানাইজেশন – ১৯৬৫ সালে, ছোট এবং মাঝারি শিল্পের সমস্যা সমাধানের জন্য। এর প্রধান কার্য্যালয় – সি.এম.ই.আর.আই – দুর্গাপুর।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ্ মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়েছে ১৯৬৭ সালে। এখানে এক বছরের প্যারামেডিকেল ও পাঁচ বছরের এম.বি.বি.এস. কোর্স পড়ানো হয়। ✱✱

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় অধীনস্থ্ শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়গুলির মধ্যে একমাত্র বর্ধমান গভঃ কলেজ অব এডুকেশনে স্নাতকোত্তর শিক্ষক শিক্ষণের ব্যবস্থা আছে।

এছাড়া জেলায় জুনিয়ার বেসিক ট্রেনিং স্কুল রয়েছে কলানবগ্রামে, শক্তিগড়ে, বিদ্যানগরে ও লাউদহে।

বর্ধমান জেলা

অনুমোদিত ও সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের তালিকা (৩১.৮.৯৮)

বর্ধমান সদর

বর্ধমান পৌরসভার অন্তর্গত ছেলেদের / সহঃ শিক্ষামুলক স্কুল ঃ

(১) বড়নীলপুর এ.ডি.পি. বিদ্যামন্দির (মা. ১.১.৬৮), (২) বর্ধমান বানীপীঠ (মা. ১.১.৪৮), (৩) বর্ধমান বিদ্যার্থীভবন (মা. ১.১.৫৪), (৪) বর্ধমান সি.এম.এস. (উ.মা. ১.৪.৬০, ১.৭.৭৬), (৫) বর্ধমান সি.এম.এস–মর্নিং (মা. ১.১.৭৯), (৬) বর্ধমান হাই মাদ্রাসা (মা. সহশিক্ষা. ১.১.৫৮), (৭) বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাই (উ.মা. ১.১.১৮৮৩, ১.৭.৭৬), (৮) বর্ধমান রাজ কলিজিয়েট হাই (উ.মা. ১.১.৫৪,

১.৭.৭৬), (৯) বর্ধমান রেলওয়ে বিদ্যাপীঠ (মা. ১.১.৬৯), (১০) বর্ধমান শিবকুমার হরিজন বিদ্যালয় (মা. ১.১.৬৫), (১১) বর্ধমান শ্রীরামাশিস হিন্দি হাই (মা. ১.১.৬২), (১২) বর্ধমান শ্রী আর. কে. এস. হাই-শ্যামসায়র (মা. ১.১.৬৫), (১৩) বর্ধমান শ্রী আর.কে.এস. হাই – বোরহাট (উ.মা. ১.১. ৬৪, ১.৭.৮৬), (১৪) বর্ধমান টাউন স্কুল (উ.মা. ১.১.২৫, ১.৭.৭৬), (১৫) ইছলাবাদ হাই (মা. ১.১.৬৯), (১৬) কাঞ্চন নগর ডি. এ. দাস হাই (মা. ১.১.৭১), (১৭) খাজা এ.এস.বেড় হাই (মা. ১.১.৬৪), (১৮) নেহেরু বিদ্যাপীঠ (মা. ১.১.৭১), (১৯) রথতলা এম.ডি. বিদ্যানিকেতন (১.১.৬৮), (২০) সাধনপুর বিবেকানন্দ হাই (মা. ১.১.৭১), (২১) তেজগঞ্জ হাইস্কুল (মা. ১.৫.৯৫), (২২) বর্ধমান দুবরাজদীঘি হাই (মা.১.৫.৯৫)।

বর্ধমান পৌরসভার অন্তর্গত মেয়েদের স্কুল ঃ

(১) ভারতী বালিকা বিদ্যালয় (উ.মা. ১.৪.৬০, ১.৭.৯৯), (২) বর্ধমান বিদ্যার্থীভবন গার্লস হাই (উ.মা. ১.৫.৯৫), (৩) বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল গার্লস হাই (উ.মা. ১.১.৪০, ২০,৯,৭৬), (৪) বর্ধমান রেলওয়ে বালিকা বিদ্যাপীঠ (মা. ১.১.৭৩), (৫) বর্ধমান সাধুমতী বালিকা শিক্ষা সদন (মা. ১.১.৭১) (৬) হরিসভা হিন্দু গার্লস হাই–ডে (উ.মা. ১.১.৪৬, ১.৭.৭৬), (৭) হরিসভা হিন্দু গার্লস হাই – মর্ণিং (মা. ১.১.৬২), (৮) মহারানী অধিরাণী গার্লস হাই (উ.মা. ১.১.৫৭), (৯) রথতলা এম.ডি. বালিকা বিদ্যালয় (মা.১.১.৮৪), (১০) বর্ধমান বানীপীঠ গার্লস হাই (মা. ১.৫.৯৬)।

বর্ধমান পৌরসভার অন্তর্গত ছেলেদের / সহঃশিক্ষামূলক জুনিয়র হাই ঃ

(১) বর্ধমান টাউন জুনিয়ার হাই (১.১.৬৩), (২) নারী শান্তনু ঘোষ মেমোরিয়াল জুনিয়র হাই (সহ-শিক্ষা, ১.১.৮২), (৩) কৃষ্ণপুর জুনিয়র হাই (সহঃ শিক্ষা, ১.১.৮২), (৪) উদয়পল্লী শিক্ষানিকেতন জুনিয়র হাই (সহ-শিক্ষা, ১.১.৭০), (৫) বর্ধমান আদর্শ বিদ্যালয়।

বর্ধমান পৌরসভার অন্তর্গত মেয়েদের জুনিয়র হাই ঃ

(১) বর্ধমান নিবেদিতা কন্যা জুনিয়র হাই, (২) বর্ধমান বিবেকানন্দ বালিকা বিদ্যালয় (১.১.৭৪), (৩) ইছলাবাদ বিবেকানন্দ বালিকা বিদ্যালয় (১.১.৮৪), (৪) শিবকুমার হরিজন বিদ্যালয় ফর গার্লস (১.১.৭৮)।

বর্ধমান সদর ব্লক – ১

ছেলেদের / সহ-শিক্ষা মূলক স্কুল ঃ

(১) কাদরা এ.কে. হাই (মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৭২), (২) কলিগ্রাম হাই (মা. সহ-শিক্ষা

১.১.৬৪), (৩) কোড়ার আর. কে. হাই (মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৬৫), (৪) ক্ষেতিয়া হাই (মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৭১), (৫) কুড়মুন হাই (উ.মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.১৬, ১.১.৭৬), (৬) পঞ্চপল্লী এম.সি.হাই (মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৬৬), (৭) রায়ান হাই (মা. সহঃ শিক্ষা, ১.১.৬৩), (৮) সিমডালী থাকমনি হাই (মা. সহ-শিক্ষা, ৩১.১২.৫৩), (৯) তালিত গৌড়েশ্বর হাই (মা-সহ-শিক্ষা, ১.১.৬৫), (১০) বলগনা হাই (মা, ১.৫.৯৬), (১১) ঘুটিয়া সিদ্দিক সিনিয়র মাদ্রাসা (১.১.৮২)।

জুনিয়র হাই ঃ ছেলেদের, মেয়েদের ও সহ-শিক্ষা মূলক ঃ

(১) বালিসা পঞ্চপল্লী জুনিয়র হাই মাদ্রাসা (১.১.৮০), (২) ছোটবেলুন জুনিয়র হাই (সহ-শিক্ষা, ১.১.৮২), (৩) জামাড় কে.সি.পি. জুনিয়র হাই (সহ-শিক্ষা, ১.৪.৬০), (৪) লাকুড্ডি বিদ্যামন্দির জুনিয়র হাই (সহ-শিক্ষা, ১.১.৭২), (৫) কলিগ্রাম গার্লস জুনিয়র হাই (১.১.৭৮)।

বর্ধমান সদর ব্লক – ২

ছেলেদের / সহ-শিক্ষামূলক স্কুল / মেয়েদের ঃ

(১) বেলকাশ পি.পি. ইন্‌স্‌টিটিউশন (মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৮৪), (২) ভাণ্ডারডিহি পি.বি. বিদ্যামন্দির (মা.সহ-শিক্ষা, ১.১.৬৬), (৩) ভিটা এম.পি. ইন্‌স্‌টিটিউশন (উ.মা.সহ-শিক্ষা, ১.১.৪৯, ১৮.১.৭৭), (৪) বড়শুল সি.ডি.পি. হাই (উ.মা., সহ-শিক্ষা, ১.১.৫৭, ১.৭.৭৬), (৫) ফরিদপুর জাতীয় উচ্চবিদ্যালয় (মা. ১.১.৮৬), (৬) হাটগোবিন্দপুর এম.সি. হাইস্কুল (উ.মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৪৬, ১.৭.৭৬), (৭) জগদাবাদ এস.বি.হাই (মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৬৩), (৮) জোতরাম বিদ্যাপীঠ (মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৬২), (৯) রায়পুর কাশিয়াড়া হাই (মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৫৭), (১০) সড্ড্যা হাই (উ.মা. সহ-শিক্ষা, ১ ১.৪৪, ১.৭.৮৫), (১১) সামন্তী হাই (মা-সহ-শিক্ষা ১.১.৬৬), (১২) শক্তিগড় গার্লস হাই (মা. ১.৫.৯৬)।

জুনিয়র হাই ঃ ছেলেদের, মেয়েদের ও সহ-শিক্ষা মূলক ঃ

(১) আমড়া জুনিয়র হাই (সহ-শিক্ষা, ১.১.৮৬), (২) শ্রীরামপুর জুনিয়র হাই (সহ-শিক্ষা, ১.১.৮৩) (৩) রায়পুর কাশিয়াড়া এম.এস.ডি.এস. বালিকা বিদ্যালয় (১.১.৬১)।

আউসগ্রাম ব্লক–১

ছেলেদের / সহ-শিক্ষামূলক স্কুল ঃ

(১) আউসগ্রাম হাই (উ.মা. সহ-শিক্ষা, ২৯.১২.৫৪), (২) বননবগ্রাম হাই (মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৭১), (৩) বিল্বগ্রাম হাই (মা. সহ-শিক্ষা, ১৯৬৩), (৪) দিয়াশালিগ্রাম বি. বি. এস, ইউ বিদ্যালয় (মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৬৭) (৫) দিগনগর এইচ.এস. জে ইনস্‌টিটিউশন, (৬)

গুসকরা পি. পি. ইনস্‌টিটিউশন (উ.মা. ১.১.৩৪), (৭) কেলেটি জি.এ. বিদ্যাপীঠ (মা. ১.১.৭২), (৮) সুশীলা জে পাবলিক ইনস্‌টিটিউশন (মা. ১.১.৮৪), (৯) উক্তা পিচকুরি হাই (মা. ১.১.৬৭), (১০) কুরুম্বা হাই স্কুল (মা. ১.৫.৯৬), (১১) সিলুট বসন্তপুর হাইস্কুল (মা. ১.৫.৯৬)

মেয়েদের হাইস্কুল ঃ

(১) গুসকরা বালিকা বিদ্যালয় (মা. ১.৪.৫৮), (২) হাট কীর্তিনগর বালিকা বিদ্যালয় (মা. ১.১.৭৩)।

জুনিয়র হাই স্কুল ঃ ছেলেদের / সহ-শিক্ষা মূলক ঃ

(১) বেলাড়ি জুনিয়র হাই স্কুল (১.১.৭৪), (২) ভোড়াছোড়া ডি. এন. জুনিয়র হাই (১.১.৮৪), (৩) দিগ্‌নগর আর সি দে পাবলিক একাডেমি (১.১.৬৯), (৪) গলিগ্রাম জুনিয়র হাই (১.১.৮৬), (৫) মৌক্ষিরা পি কে জুনিয়র হাই (১.১.৮৬), (৬) নৃসিংহপুর জুনিয়র হাই (১.১.৭৯), (৭) পূবার আঞ্চলিক জুনিয়র হাই মাদ্রাসা (১.১.৮৩), (৮) যাদবগঞ্জ আদিবাসী জুনিয়র হাই (১.৫.৯৩), (৯) বটগ্রাম এম. এম. জুনিয়র হাই, (১.৫.৯৫)

আউসগ্রাম ব্লক — ২ (সবস্কুলই সহ-শিক্ষামূলক) ঃ

(১) অমরারগড় হাইস্কুল (মা. ১.১.৬৩), (২) ভেদিয়া হাই (উ.মা. ১.১.৫৪), (৩) এড়াল আঞ্চলিক হাই (মা. ১.১.৫৬), (৪) গেঁড়াই হাই (মা. ১.১.৬৭), (৫) জামতারা হাই (উ.মা. ১.১.৬৪), (৬) পূবার পাণ্ডুক ডি. হাই (১.১.৬৪), (৭) রামনগর হাই (মা. ১.১.৬৪), (৮) প্রতাপপুর ডাঙাপাড়া হাই (মা. —)

মেয়েদের হাইস্কুল ঃ

(১) ভেদিয়া গার্লস হাই (মা. ১.১.৭৯)

জুনিয়র হাই স্কুল (সব স্কুলই সহ-শিক্ষা মূলক) ঃ

(১) ভালকিপটি আশুতোষ জুনিয়র হাই (১.১.৬৮), (২) দিবাকর জুনিয়র হাই (১.৩.৬১), (৩) চিন্তাহরণ মুখার্জি স্মৃতি বিদ্যামন্দির (১.১.৮৬)

ভাতার ব্লক

ছেলেদের হাইস্কুল (সহ-শিক্ষা মূলক) ঃ

(১) আমারুন স্টেশন শিক্ষানিকেতন (মা. ১.১.৬২), (২) এড়ুয়ার বি.এম.ডি.পি.

ইনসটিটিউশন (উ.মা. ১.১.৪৬), (৩) বামশোর হাই (মা. ১.১.৬৭), (৪) বামুনাড়া এল.সি.ডি.পি. ইনসটিটিউশন (মা. ১.১.৬৬), (৫) বড়বেলুন এম.এম. বিদ্যা মন্দির (উ.মা. ১.১.৪৮), (৬) বাসুদা শ্রী শ্রী আর কে বিদ্যাপীঠ (মা. ১.১.৬৫), (৭) ভাটাকুল স্বর্ণময়ী হাই (মা. ১.১.৮৬), (৮) ভাতার এম. পি. হাই (উ.মা. ১৯৪০), (৯) বিজয়পুর পলসোনা হাই (১.১.৬৪), (১০) বনপাস শিক্ষানিকেতন (উ.মা. ১৯৫০), (১১) ঝিকরডাঙা এস. এস. আর. কে. হাই (মা. ১.১.৮৪), (১২) মাহাচান্দা ভি. এস. শিক্ষানিকেতন (মা. ১.১.৮৪), (১৩) মাহাতা হাই (মা. ১৯৬৫), (১৪) মোহনপুর হাই (মা. ১.১.৬৬), (১৫) মঞ্জুলা টি.পি.সি. বিদ্যানিকেতন (মা. ১.১.৭৩), (১৬) নাসিগ্রাম হাই (উ.মা. ১.১.৮৪), (১৭) ওরগ্রাম হাই (মা. ১.১.৮৬), (১৮) রায়রামচন্দ্রপুর এন.বি. বিদ্যাপীঠ (মা. ১.১.৮৬), (১৯) সাহেবগঞ্জ হাই (মা. ১.১.৬৫), (২০) শুশুনদীঘি এইচ. পি. হাই (মা. ১.১.৪৮), (২১) বিজিপুর হাই (মা. –)

মেয়েদর হাইস্কুল ঃ

(১) এড়ুয়ার হংসেশ্বরীদেবী এস. বি. বিদ্যালয় (মা. ২৯.২.৬৪), (২) বড়বেলুন দেবীবালা বালিকা বিদ্যালয় (মা. ৩.২.৭৫), (৩) ভাতাড় গার্লস হাই(মা. ১.১.৭৪), (৪) নাসিগ্রাম গার্লস হাই (মা. ১.১.৬৭)।

জুনিয়র হাইস্কুল ঃ (সহ-শিক্ষা মূলক)

(১) ভোতা জুনিয়র হাই (১.১.৮৪), (২) গ্রামডিহি কে.পি. জুনিয়র হাই (১.১.৭৪), (৩) হাড়গ্রাম ইউ.পি. জুনিয়র হাই (১.১.৭৪), (৪) ঝারুর জুনিয়র হাই (১.১.৭৪), (৫) কয়নাপুর ভি. ভি. জুনিয়র হাই (১.১.৮৪), (৬) খেড়ুর ছাদনি জুনিয়র হাই (১.১.৬৬), (৭) কুবাজপুর জুনিয়র হাই (–), (৮) নারায়ণপুর জুনিয়র হাই (১.১.৭৪), (৯) ওড়গ্রাম চতুষ্পল্লী জুনিয়র হাই মাদ্রাসা (সহ-শিক্ষা নয়, ১.১.৮০), (৯) শুনুর জুনিয়র হাই (১.১.৮৬)

মেয়েদের জুনিয়র হাইস্কুল ঃ

(১) সারদামনি বালিকা বিদ্যালয় (১.১.৬৮)

গলসি ব্লক – ১ (সহশিক্ষা মূলক)

(১) লোয়া দিবাকর বিদ্যা মন্দির (মা. ১.১.৮৪), (২) পারাজ হাই মাদ্রাসা (মা. ১.১.৭১) (৩) পারাজ হিতলাল বাণী মন্দির (১.১.৫৬), (৪) পুরসা হাই (মা. ১.১.৬৩), (৫) রামগোপালপুর হাই (উ.মা. ১.৫.৯৬), (৬) সিরোরাই এ.এম. হাই (মা. ১.১.৮৭), (৭) উচ্চগ্রাম হাই (মা. ১.১.৮০), (৮) বনসুজাপুর হাই (মা. ১.৫.৯৩), (৯) রামপুর হাই (মা. ১.৫.৯৬)

জুনিয়র হাই (সহ-শিক্ষা মূলক) ঃ
(১) বনদুতিয়া জুনিয়র হাই মাদ্রাসা (১.১.৮২), (২) ঝাড়ুলিয়া জুনিয়র হাই (১.১.৭৯), (৩) পানাগড় আদর্শ বিদ্যালয় (১.১.৬০), (৪) পুরাতনগ্রাম জুনিয়র হাই (১.১.৮০)

গলসি ব্লক — ২

(১) আদরাহাটি বি.এস.শিক্ষা নিকেতন (মা. সহ-শিক্ষা ১.১.৫৬), (২) বেলান বিশ্বেশ্বর হাই (মা. ১.১.৮০), (৩) ভুড়ি ডি.পি.জে.এম. হাই (মা. ১.১.৭৯), (৪) বি.এম.এস. পাবলিক ইনস্‌টিটিউশন (মা. ১.১.৭৪), (৫) দীঘির পাড় হাই মাদ্রাসা (মা. ১.১.৮৭), (৬) গলসি হাই স্কুল (উ.মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৩৭), (৭) গলসি কালীমাতা দেবীহাই (মা. ১.১.৮৪, সহ-শিক্ষা), (৮) ইরকোণা বি. কে. এ. বিদ্যাপীঠ (মা. ১.১.৭৪), (৯) খানো হাই স্কুল (মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৬৫), (১০) কিশোরকোণা এন.এ. বিদ্যালয় (মা. সহ-শিক্ষা ১.১.৫০), (১১) কুলগড়িয়া হাই মাদ্রাসা (মা. ১.৪.৫৫), (১২) মিঠাপুর এস.ডি.হাই (মা. ১.১.৬৮), (১৩) সাঁকো সি.এস.হাই (উ.মা. সহ-শিক্ষা ১.১.৪৪), (১৪) সাটিনন্দী বিদ্যায়তন (মা. সহ-শিক্ষা ১.১.৭২), (১৫) তেঁতলমুড়ি হাই মাদ্রাসা (মা. ১.১.৭৫), (১৬) জয়কৃষ্ণপুর হাই (মা. –),

মেয়েদের হাইস্কুল ঃ
(১) গলসি সারদা বিদ্যাপীঠ (মা. ১.১.৬৬), (২) কুলগড়িয়া হাই মাদ্রাসা (মা. ১.১.৭৮)

জুনিয়র হাই ঃ
(১) নুরকোনা জুনিয়র হাই স্কুল (সহ-শিক্ষা মূলক — ১.১.৮৬)

জামালপুর ব্লক

(১) আঝাপুর হাই (উ.মা. ১.১.৩১/১.৭.৭১), (২) অমরপুর বি. এ. ইনস্‌টিটিউশন (উ.মা. সহ-শিক্ষা মূলক, ১.১.২১/১.৭.৭৬), (৩) বেড়ুগ্রাম এ.জি.সি.বি. বিদ্যাপীঠ (মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৭৩), (৪) চকদীঘি এম. পি. উনস্‌টিটিউশন (উ.মা. ১৮৫৭/১৯৮৩), (৫) চক্ষণজাদি ভি. এম. ইনস্‌টিটিউশন (মা. সহ-শিক্ষা, ১৯৪৫), (৬) দত্তপাড়া বি. এস. হাই (মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৭০), (৭) গোপালপুর এম. কে. বিদ্যালয় (উ.মা. ১.১.২৫), (৮) ইরসোরা এস. এন হাই (মা. ১.১.৬৭) (৯) জামালপুর হাই (উ.মা. ১.১.৪৯/১.৭.৭৬), (১১) জৌগ্রাম হাই স্কুল (মা. ১.১.৬৬), (১১) জ্যোশ্রীরাম হাই (মা.১.১.৮৭), (১২) কালনা কাসরা হাই স্কুল (মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৬২), (১৩) কেরিলি এম. হাই মাদ্রাসা (মা. ১.১.৮৪), (১৪) নবগ্রাম এম. পি. বি. হাই (মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৬১), (১৫) পাঁচড়া এস. সি. আর. এস. বিদ্যামন্দির (মা. ১.১.৫৩), (১৬) পর্বতপুর (উ.মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৫১,

১.৭.৭৬),(১৭) পরেশনাথ বিদ্যামন্দির, ঝাঁপান ডাঙ্গা (মা. সহ-শিক্ষা, ১.৪.৬০), (১৮) সাদিপুর বিদ্যানিকেতন হাই (মা, সহ-শিক্ষা, ১.৪. –), (১৯) সিপতাই মহুলা এস. আর ইনস্‌টিটিউশন (মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৬৯), (২০) শুড়ে কালীতলা হাই (মা. সহ -শিক্ষা ১.৫.৯৬), (২১) সঞ্চারা হাই (মা. সহ-শিক্ষা, ১.৫.৯৬)

মেয়েদের হাইস্কুল ঃ

(১) চকদীঘি গার্লস হাই (মা. ১.১.৭৩), (২) জামালপুর গার্লস হাই (মা. ১.১.৬৮) (৩) ঝাঁপানডাঙ্গা এস. ডি.বালিকা বিদ্যালয় (মা. ১.১.৭৩)

জুনিয়র হাই (সহশিক্ষা মূলক) ঃ

(১) বানীনিকেতন রুক্মিনী মহল্লা জুনিয়র হাই (১.১.৭৯), (২) বানীবিদ্যাপীঠ জুনিয়র হাই (১.১.৭৪), (৩) বনবিবিতলা জুনিয়র হাই (১.১.৭৪), (৪) গুড়েঘর জুনিয়র হাই স্কুল (১.১.৭১), (৫) কুলীনগ্রাম জুনিয়র হাই (১.১.৭৪), (৬) মসাগ্রাম জুনিয়র হাই (১.১.৫৫), (৭) সাহা হোসেনপুর জুনিয়র হাই (১.১.৬৩), (৮) সেলিমাবাদ জুনিয়র হাই (১.১.৮২), (৯) সোনার গড়িয়া ফ্রি বিদ্যাপীঠ (১.১.৮৪), (১৪) জাড়গ্রাম জুনিয়র হাই (১.৫.৯৩), (১১) পল্লীমঙ্গল জুনিয়র হাই মাদ্রাসা (১.৫.৯৫)

মেয়েদের জুনিয়র ঃ

(১) আঝাপুর বালিকা (১.১.৬১), (২) অমরপুর বিমলা এগ্রিকালচারাল গার্লস জুনিয়র (১.১.৬৯), (৩) পর্বতপুর গার্লস জুনিয়র (১.১.৭০)

খণ্ডঘোষ (সহ-শিক্ষামূলক)

(১) বোঁয়াই হাই স্কুল (মা. ১.১.৬৬), (২) চাগ্রাম হাই স্কুল (মা. ১.১.৭৩), (৩) দুবরাজহাট বেড়ুগ্রাম হাই (মা. ১.১.৮৫), (৪) গোপালবেড়া হাই (মা. ১.১.৬৭), (৫) গুয়ির কানিজা এম. এম. হাই মাদ্রাসা (মা. ১.১.৭৯), (৬) হুড়িয়া পাবলিক হাই (মা. ১.১.৭০), (৭) কেন্দুর হাই (মা. ১.১.৬৩), (৮) খণ্ডঘোষ হাই (উ.মা. ১.৫.৯৬), (৯) নিশ্চিন্তপুর হাই মাদ্রাসা (মা. ১.১.৭৩), (১০) ওয়াড়ি হাইস্কুল (মা. ১.১.৬৮), (১১) শাঁখারি হাই স্কুল (মা. ১৯১০), (১২) শরঙ্গা হাইস্কুল (উ.মা. ১.১.৬৫), (১৩) শশঙ্গা হাই (মা. ১.১.৬৬), (১৪) তোড়কনা জে. বি. হাই (মা. ১.১.১৮৯৯), (১৫) উখরিদ হাই স্কুল (মা. ১.১.৭১) (১৬) কুমীরকোলা পি. এম. হাই (মা. ১.৫.৯৩), (১৭) জুবিলা প্রগতি বিদ্যানিকেতন (মা. ১.৫.৯৬)

জুনিয়র হাই (সহ-শিক্ষামূলক) ঃ

(১) আমবাল জুনিয়র হাই (১.১.৭৪), (২) বারিশালি জুনিয়র হাই (১.১.৭৯), (৩)

বাওড়া পঞ্চানন জুনিয়র হাই (১৫.১.৮৭), (৪) আলুন জুনিয়র হাই (১.১.৭০)

মেয়েদের জুনিয়র ঃ
(১) খণ্ডঘোষ গার্লস জুনিয়র হাই (১.১.৮৭), (২) গয়েসপুর এস. এ. এইচ গার্লস জুনিয়র হাই (১.৫.৯৫)

মেমারি পৌর এলাকা ঃ

(১) মেমারি ভি. এম. ইনস্‌টিটিউশন, ইউনিট-১ (মা. ১৯৮৭), (২) মেমারি ভি. এম. ইনস্‌টিটিউশন, ইউনিট-২ (উ.মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.১৯০০, ১.১.৭৬)

জুনিয়র হাই স্কুল ঃ
(১) মেমারি জুনিয়র হাইমাদ্রাসা (১.১.৮৬)

মেয়েদের স্কুল ঃ
(১) মেমারী আর.এস. বালিকা বিদ্যালয় (মা. ১.৫.৯৫)

মেমারি ব্লক — ১

(১) আমাদপুর হাইস্কুল (মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৫৭), (২) বাগিলা পি. সি. বিদ্যামন্দির (মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৭৩), (৩) দেবীপুর আদর্শ হাই (মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৬৮), (৪) দেবীপুর ষ্টেশন হাই (উ.মা. সহ-শিক্ষা, ১.৪.৫৩ / ১.৭.৭৬), (৫) গোবিন্দপুর হাই (মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৮৪), (৬) গন্তার হাই (মা. ১.১.৬৫), (৭) কাশিয়াড়া হাই মাদ্রাসা (মা. ১.১.৮৬), (৮) পাল্লা এ.সি.এন.এস. বিদ্যাপীঠ (মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৭৩) (৯) রাধাকান্তপুর হাই (মা. সহ-শিক্ষা ১.১.৭৬), (১০) রসুলপুর বি.এম.হাই (উ.মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.২৭/১.৭.৭৬), (১১) শশীনাড়া হাই (মা. সহ-শিক্ষা ১.১.৭০), (১২) নুদিপুর বি.এস. বিদ্যামন্দির (মা. সহ শিক্ষা, ১.৫.৯২), (১৩) চকবলরাম কে. পি. হাই (মা. সহ-শিক্ষা, ১.৫.৯৬)

জুনিয়র হাই ঃ
(১) অরবিন্দ প্রকাশ বিদ্যালয় শিক্ষা নিকেতন (সহ-শিক্ষা, ২৭.৩.৮৩), (২) মোহিনী মোহন বসু জুনিয়র হাই, (সহ শিক্ষা, ১.১.৬৯), (৩) কোলেপাড়া কাঁঠালগাছি (সহ-শিক্ষা ১.১.৮৬),

মেয়েদের হাইস্কুল ঃ
(১) আমাদপুর গার্লস হাই (মা. ১.১.৭১) (২) বদ্যিডাঙ্গা গার্লস হাই (মা. ১.৪.৫৮) (৩) দেবীপুর ষ্টেশন গার্লস হাই (মা. ১.১.৭১), (৪) পাল্লারোড গার্লস হাই (মা. ১.১.৯৬)

মেমারি ব্লক—২

<u>ছেলেদের স্কুল</u> ঃ

(১) বড়পলাশন হাই (মা. সহ শিক্ষা ১.১.৪৯), (২) বেগুট জাহ্নবী হাই (মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৫৬), (৩) ভৈটা এইচ ডি. কর হাই (মা. সহ-শিক্ষা, ১৮৭৮), (৪) বিটরা হাই (মা সহ-শিক্ষা, ১.১.৬৪), (৫) বোহার হাই (মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৭০), (৬) খোরদ আমিনা হাই (মা. ১.১.৮৭), (৭) কুচুট পি.সি.হাই (উ.মা. ১.১.৬৩), (৮) মোহনপুর নোয়াহাটি এস.আর.এস বিদ্যালয় (মা. সহ-শিক্ষা ১.১.৭০), (৯) মণ্ডলগ্রাম হাই স্কুল (মা. সহ শিক্ষা, ১.১.২৬), (১০) পাহাড়হাটী জি.এম. হাই (উ.মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৩৭), (১১) সাতগাছিয়া হাই (মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৭৩), (১২) সাতগাছিয়া শ্রীধরপুর এ. ইনসটিটিউশন (উ.মা. সহ-শিক্ষা ১.১.২২ / ১.৭.৭৬), (১৩) সোঁতলা মহিষডাঙ্গা হাই (মা. সহ-শিক্ষা ১.১.৭৯) (১৪) নবস্থা হাই (মা. সহ-শিক্ষা ১.৫.৯৩), (১৫) চাঁচাইপল্লী টি.এ.হাই (মা সহ-শিক্ষা ১.৫.৯৬)

<u>জুনিয়র হাই স্কুল</u> ঃ

(১) আশাপুর আনন্দময়ী জুনিয়র হাই (সহ-শিক্ষা, ১.১.৭৪), (২) আটাগড় জুনিয়র হাই মাদ্রাসা (১.৫.৮৬) (৩) বারাবি ডিহি পলাসন (সহ-শিক্ষা ১.১.৮০) (৪) বড়োয়া পাঁচকড়ি বিদ্যামন্দির (সহ-শিক্ষা, ১.১.৮০) (৫) চাকুন্দি শ্রী আর. কে. বিদ্যালয় (সহ-শিক্ষা, ১.১.৮৪), (৬) গয়েশপুর জুনিয়র হাই মাদ্রাসা (সহ-শিক্ষা, ১.১.৭৪)

<u>মেয়েদের স্কুল</u> ঃ

(১) বড়পলাসন গার্লস হাই (মা. ১.১.৬৭), (২) বোহার গার্লস হাই (মা. ১.১.৮৫), (৩) পাহাড়হাটী বাবুরাম গার্লস হাই (মা. ১.১.৬৭)

রায়না ব্লক—১

<u>ছেলেদের হাইস্কুল</u> ঃ

(১) আনগুনা বি.এম.হাই (মা. সহ-শিক্ষা ১.১.৬৫), (২) বামুনিয়া হাই (মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৬৭), (৩) বড়োবলরাম এল.বি. বিদ্যামন্দির, (মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৫১) (৪) বুজরুগদীঘি হাই (মা. সহ-শিক্ষা ১.১.৭৮), (৫) গোলগ্রাম গোলাম ইমাম হাই (মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৭১), (৬) কুকুড়া অনিলাবালা হাই (মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৬৭), (৭) মাছখান্দা হাই (মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৬৯), (৮) মেরাল এস.সি.পি. ইনস্‌টিটিউশন (মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৫০) (৯) নাড়ুগ্রাম হাই, (মা. সহ-শিক্ষা ১৯৮৪), (১০) পলাসন এম.এম. হাই (মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৬৬), (১১) রায়না এস.বি. বিদ্যায়তন (উ.মা. ১৮৯৪/১৯৭৬), (১২) রামলাল আদর্শ বিদ্যালয় (গভঃ স্পনসর্ড (মা. ১৯৪৫), (১৩) শাকনাড়া হাই (মা. সহ-শিক্ষা ১.১.৬৯), (১৪) সাঁকটিয়া হাই (মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৬৫), (১৫) সেহারা বাজার

সি. কে ইনস্‌টিটিউশন (উ. মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৫০/১.৭.৭৭), (১৬) জোৎসাদি (মা. সহ-শিক্ষা ১.৫.৯৬)।

জুনিয়র হাই ঃ

(১) আউশাড়া উদগারা (সহ-শিক্ষা, ১.১.৭৯), (২) রসুই খান্দা এম.এ. পাবলিক জুনিয়র (সহ-শিক্ষা, ১.১.৮০), (৩) সুমসপুর দাতা এম.এস. জুনিয়র হাই মাদ্রাসা (১.১.৮২), (৪) সুকুর এইচ. পি. জুনিয়র হাই (সহ-শিক্ষা, ১.১.৭৪)

মেয়েদের জুনিয়র হাই ঃ

(১) আদর্শ বালিকা বিদ্যালয় (১.১.৭৪)

মেয়েদের হাইস্কুল ঃ

(১) রায়না জগৎমাতা এ. বালিকা বিদ্যালয় (মা. ১.১.৮২), (২) সেয়ারা বাজার আর আর বালিকা বিদ্যালয় (মা. ১.৫.৯৫)

রায়না ব্লক —২

ছেলেদের হাইস্কুল ঃ

(১) একলক্ষ্মী হাই (উ.মা. সহ-শিক্ষা, ১.৫.৯৭), (২) আরুই আঞ্চলিক এ বিদ্যাপীঠ (মা. সহ-শিক্ষা ১.১.৬৭), (৩) বাজে কুমারপুর হাই (মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৭৩), (৪) বড়োবইনান ইউ.এস.কে.এস. শিক্ষানিকেতন (উ.মা. সহ-শিক্ষা ১.৪.৫৯/১.৭.৭৬), (৫) বাতাসপুর হাই (মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৬৯), (৬) বরজপোতা হাই মাদ্রাসা (মা. সহ-শিক্ষা ১.১.৬৬, (৭) চকচন্দন দুর্গাদাস হাই (মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৭৩), (৮) ছোটবইনান হাই (মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৬৬), (৯) গোতান এম.এম. হাই (মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৫৬), (১০) কাইতি এন. সি. হাই (উ. মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৩৯ / ১.১.৭৮), (১১) কামারহাটি শিক্ষানিকেতন (মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৭১), (১২) লোহাই সম্মিলনী বিদ্যানিকেতন (উ.মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৬৬), (১৩) পহলানপুর হাই (মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৬৫), (১৪) পাঁইটা জে. এম. হাই (উ.মা. সহ-শিক্ষা, ৩১.৫.৭৬), (১৫) উচালন হাই (মা. সহ-শিক্ষা ১.১.৬৬)

জুনিয়র হাই (সহ-শিক্ষা মূলক) ঃ

(১) বড়পুর পাষণ্ডা জুনিয়র হাই (১.১.৫৫), (২) বেলার ভুরকুণ্ডা জুনিয়র হাই (১.১.৭৪), (৩) দামিন্যা কে কে এম জুনিয়র হাই (১.১.৫২), (৪) ঘুষ্টিয়া - নন্দপুর জুনিয়র হাই (১.১.৭২), (৫) কামার গড়িয়া আর. বি. শিক্ষানিকেতন (১.১.৬৮), (৬) কান্তা জুনিয়র হাই (১.১.৭৪), (৭) কোটসিমুল পল্লীশ্রী জুনিয়র হাই (১.১.৭৪), (৮)

মোহনপুর বিনোদপুর জুনিয়র হাই (১.১.৭৪), (৯) নরোত্তমবাটি জুনিয়র হাই (১.১.৮৪), (১০) ডেনো শচীনন্দন বিদ্যাভবন (১.১.৮৬)

মেয়েদের জুনিয়র হাই ঃ

(১) বড়বইনান বালিকা বিদ্যালয় (১.১.৭৯), (২) কাইতি এম. বালিকা বিদ্যালয় (১.১২.৭৪), (৩) পাঁইটা পি. বালিকা বিদ্যালয় (১.১.৭১)

আসানসোল মহকুমা

আসানসোল পৌর এলাকা ঃ

(১) আসানসোল অরুণোদয় হাই (মা. ১.১.৭৮), (২) আসানসোল চেলিডাঙ্গা হাই (উ. মা. ১.১.৬০), (৩) আসানসোল দয়ানন্দ বিদ্যালয় (হিন্দি মাধ্যম উ.মা. ১.৫.৯৭), (৪) আসানসোল ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ বিদ্যালয় (মা. ১.১.৮৪), (৫) আসানসোল গুরুনানক মিশন হাই (হিন্দি মাধ্যম, মা. ৪.৭.৬৬), (৬) আসানসোল ইদ্‌গা হাই (উর্দু মাধ্যম, মা. ১.১.৬৭), (৭) আসানসোল জে. জে. ইনস্‌টিটিউশন (বাংলা ও হিন্দি মাধ্যম, উ.মা. ১৯৪৩), (৮) আসানসোল ওল্ড ষ্টেশন হাই (মা. ১৯৬৫), (৯) আসানসোল আর. কে. মিশন হাই (মা. ১.১.৪৫), (১০) আসানসোল সেন্ট জোসেফ হাই (হিন্দি মাধ্যম, ১.২.৭২), (১১) দয়ানন্দ এ্যাংলো বৈদিক হাই (হিন্দি মাধ্যম, উ.মা. ১.১.৪৭) (১২) ধাতকা এন.সি.লাহিড়ি বিদ্যামন্দির (উ.মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৫৬), (১৩) কাললা হরিপদ হাই (মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৬৭), (১৪) মহীশিলা গভঃ কলোনী হাই (মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৬২), (১৫) নরসমুদা জে.এস.হাই (মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৮০), (১৬) রহমনিয়া হাই (উর্দু মাধ্যম, উ.মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৫৩), (১৭) উষাগ্রাম বয়েজ হাই (মা. ১.১.৩২), (১৮) বিধানস্মৃতি শিক্ষা নিকেতন (মা. ১.৫.৯৫), (১৯) হাজি কিউ রসুল হাই (উর্দু মাধ্যম, মা. ১.৫.৯৬), (২০) রহমতনগর হাই (উর্দু মাধ্যম, মা. ১.৫.৯৫), (২১) বারিবিদ্যালয় হাই (হিন্দি মাধ্যম, সহ-শিক্ষা, ১.৫.৯৬), (২২) বার্নপুর আদর্শ বিদ্যালয়, রামবাঁধ (হিন্দি মাধ্যম, মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৬৬), (২৩) ঢাকেশ্বরী হাই (মা. সহ-শিক্ষা, ১৯৫৮), (২৪) হীরাপুর এম সি.টি. ইনস্‌টিটিউশন (মা. সহ শিক্ষা, ১.১.৫১), (২৫) ইকরা বি. বি. হাই (মা. সহ-শিক্ষা, ১৯১১), (২৬) সাঁতা হাই (মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৬৬), (২৭) শান্তিনগর বিদ্যামন্দির (উ.মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৬৯), (২৮) সুভাষপল্লী বিদ্যানিকেতন (উ.মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৬৯)

মেয়েদের হাইস্কুল ঃ

(১) আসানসোল আর্যকন্যা ইউ. বিদ্যালয় (হিন্দি মাধ্যম, মা. ১.১.৬৭), (২) আসানসোল রকবানিয়া গার্লস হাই (উর্দু মাধ্যম, মা. ১.১.৭৮), (৩) আসানসোল শিশু ভারতী বিদ্যামন্দির গার্লস (মা. ১.১.৬৯), (৪) আসানসোল তুলসীরাণী বালিকা শিক্ষাসদন (উ.মা. ৯.১১.৫৫), (৫) মণিমালা গার্লস হাই (উ.মা. ১.৭.৭৬), (৬) মহীশিলা এন. আর এস.

বালিকা বিদ্যানিকেতন (মা. ১.১.৬৫), (৭) পাঁচগাছিয়া এন. বি.কে.গার্লস (মা. ১.১.৬৮), (৮) সেন্টমেরী গোরেটি গার্লস হাই (উ.মা. ১.৫.৯৫), (৯) উমারাণী গড়াই এম. কে. গার্লস হাই (উ.মা. ১.১.৪১), (১০) ঊষাগ্রাম গার্লস হাই (মা. ১৯.১.৪০), (১১) বার্ণপুর শ্রীগুরুনানক গার্লস হাই (হিন্দি মাধ্যম, মা. ১.১.৭৮), (১২) বার্ণপুর সুভাষপল্লী বিদ্যানিকেতন গার্লস (হিন্দি মাধ্যম, মা. ১.১.৮০), (১৩) হীরাপুর এম.সি.টি. গার্লস হাই (মা. ১.১.৬৭), (১৪) রামবাঁধ আদর্শ বিদ্যালয় ফর গার্লস (মা. ২.৪.৭৫), (১৫) শান্তিনগর বিদ্যামন্দির ফর গার্লস হাই (মা. ১.১.৮৪)

<u>জুনিয়র হাই স্কুল</u> ঃ

<u>ছেলেদের জুনিয়র হাই স্কুল</u> ঃ

(১) আসানসোল শিশুকল্যাণ পাঠশালা জুনিয়র হাই (১.১.৭৯), (২) বালবোধন বিদ্যালয় (হিন্দি মাধ্যম, ১.১.৬৬), (৩) চুয়ালাল মাধ্যমিক বিদ্যালয় জুনিয়র হাই (হিন্দি মাধ্যম, ২৮.৮.৭৪), (৪) কাংখা শ্রী অরবিন্দ বিদ্যামন্দির (সহ-শিক্ষা, ১.১.৮৬), (৫) ডিহিকা জুনিয়র হাই (১.১.৬৯), (৬) মহাত্মাগান্ধী, জুনিয়র হাই, বার্ণপুর (হিন্দি মাধ্যম, সহ-শিক্ষা, ১.১.৮২), (৭) নরসিং বাঁধ বীনাপাণি জুনিয়র হাই (সহ-শিক্ষা ১.১.৫২), (৮) নরসিং বাঁধ হিন্দি জুনিয়র হাই (সহ-শিক্ষা, ১.১.৬৬)

<u>মেয়েদের জুনিয়র হাই</u> ঃ

(১) আসানসোল বেঙ্গলী গার্লস ডে স্কুল (১.১.৮০), (২) গুরু নানক মিশন জুনিয়র হাই (হিন্দি মাধ্যম, ১.১.৭৯)

<u>বারাবনি ব্লক</u>ঃ

ছেলেদের হাইস্কুল (সহ-শিক্ষা মূলক)

(১) দো মোহানি কেলে-কোড়া হাই (মা. ১.১.৪১), (২) গৌরানডি আর. কে. এস. ইনস্‌টিটিউশন (উ.মা. ১.৫.৯৪), (৩) পাঁচগাছিয়া এম.ভি. বিদ্যানিকেতন (মা. ১.১.৬৫)

<u>মেয়েদের হাই স্কুল</u> ঃ

(১) দো মোহানি কেলে-মোড়া গার্লস হাই (মা. ১.৫.৯৬)

<u>জুনিয়র হাই স্কুল – ছেলেদের, সহ-শিক্ষামূলক</u> ঃ

(১) বালিয়াপুর তারাপদ বিদ্যাপীঠ (১.১.৮৩), (২) পাঁচগাছিয়া, আদর্শ হিন্দি বিদ্যালয় (হিন্দি মাধ্যম, ১.১.৬৯), পাঁছড়া ভগবান মহাবীর (দিগম্বর) জৈন সড়ক জুনিয়র হাই (১.১.৮৬), (৪) জামগ্রাম আঞ্চলিক জুনিয়র হাই (১.৫.৯৫)

জামুরিয়া পৌর এলাকা

<u>ছেলেদের (সহ শিক্ষামূলক হাই স্কুল)</u> ঃ

(১) বীজপুর নেতাজী শিক্ষানিকেতন (মা. ১.১.৭৪) (২) বোগড়া ভি.এম.হাই (মা. ১.১.৬৫) (৩) চুরুলিয়া এন. কে. হাই (উ.মা. ১.১.৪৭), (৪) জামুরিয়া হিন্দি হাই (হিন্দি মাধ্যম, মা. ১.১.৬৭) (৫) কেঁদা হাই (মা. ১.১.৬৬), (৬) রাজপুরনন্দী হাই (উ.মা. ১.১.৫১), (৭) শ্রীপুর হাই (মা. ১.১.৫৮), (৮) সাত্তোর হাই (মা. ১.১.৮৯), (৯) শ্রীপুর হাট হাই (হিন্দি মাধ্যম, মা. ১.৫.৯৬)

<u>মেয়েদের হাই স্কুল</u> ঃ

(১) শ্রীপুর গার্লস হাই (মা. ১.১.৮৪)

<u>ছেলেদের জুনিয়র হাই স্কুল (সহ-শিক্ষা মূলক)</u> ঃ

(১) বোরিংডাঙ্গা জুনিয়র হাই (১.১.৭৯), (২) কবিতীর্থ চুরুলিয়া বিদ্যাপীঠ (১.১.৮৬), (৩) শ্রী চান্দনমল কে.সি.টি. জুনিয়র হাই (১.১.৭৪), (৪) বাঁকসিমুলিয়া গুরুপ জুনিয়র হাই (১.১.৬২)

<u>মেয়েদের জুনিয়র হাই স্কুল</u> ঃ

(১) জামুরিয়া বালিকা বিদ্যালয় (হিন্দি মাধ্যম, ১.১.৭৮)

জামুরিয়া ব্লক – ২

<u>ছেলেদের হাইস্কুল – (সহ শিক্ষা মূলক)</u> ঃ

(১) বাহাদুরপুর হাই (মা. ১.১.৬৯), (২) বীরকুলটি এন.জি.এম. হাই (মা. ১.১.৪৯), (৩) চিন্ চুরিয়া ইউ.এন.হাই (মা. ১৯৭৬), (৪) নিমসা-আলিনগর খোট্টাডিহি (মা. ১.৫.৯৩), (৫) পারাসিয়া কোলিয়ারী হাই (মা. ১.৫.৯৬)

<u>মেয়েদের হাই স্কুল</u> ঃ

(১) শৈলবালা বালিকা বিদ্যালয় (মা. ১.১.৬৫),

<u>ছেলেদের জুনিয়র হাই (সহ-শিক্ষা মূলক)</u> ঃ

(১) বগডিহা সিদ্ধাপুর বিদ্যাপীঠ (১.১.৬৫)

কুলটি পৌর এলাকা

ছেলেদের হাইস্কুল – (সহ শিক্ষামূলক) ঃ

(১) বরাকর আদর্শ বিদ্যালয় (হিন্দি মাধ্যম, মা. ১.১.৬৯), (২) বরাকর শ্রী মাড়োয়ারী বিদ্যালয় (হিন্দি ও বাংলা মাধ্যম, উ.মা. ১৯৫০), (৩) বেলরুই এন.জি. ইনস্‌টিটিউশন (উ.মা. ১.১.২৮), (৪) ডিসেরগড় এ.সি. ইনস্‌টিটিউশন (উ.মা. ১৮৯৫), (৫) কন্যাপুর হাই (মা, ১.১.৬৭), (৬) কেঁদা হাই (হিন্দি মাধ্যম, মা. ১০.১২.৫২), (৭) কুলটি হাই (উ.মা. ১৯৩০), (৮) কুলটি হাই (মর্নিং, মা. ১.১.৬৯), (৯) মিঠানি হাই (উ. মা. ১.১.৫১), (১০) সোদপুর কোলিয়ারি হাই (মা. ১.১.৬২), (১১) সোদপুর ভিলেজ হাই (মা. ১.১.৫২), (১২) নারায়ন ড্যাঙর আর ভি. হাই (হিন্দি মাধ্যম, ১.৫.৯৬), (১৩) ছোট দিঘারী বিদ্যাপীঠ (উ.মা. ১.৫.৯৭)

মেয়েদের হাইস্কুল ঃ

(১) জলধি কুমারীদেবী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় (মা. ১.১.৬৫), (২) কুলটি গার্লস হাই (উ.মা. ১.১.৫৩), (৩) সাকতোড়িয়া – ডিসেরগড় গার্লস হাই (মা. ১.১.৫৭), (৪) শ্রীমতী জড়োয়া দেবী বালিকা বিদ্যালয় (মা. ১.১.৭৮), (৫) কুলটি হিন্দি বালিকা বিদ্যালয় (হিন্দি মাধ্যম মা ১.৫.৯২)

জুনিয়র হাই – ছেলেদের (সহ–শিক্ষা মূলক) ঃ

(১) বেগুনিয়া জুনিয়র হাই (১৭.৪.৮৪), (২) সাকতোড়িয়া জুনিয়র হাই (১.১.৬৩) (৩) সোদপুর কোলিয়ারি জুনিয়র হাই (বাংলা ও হিন্দি মাধ্যম, ১.১.৮৬)

জুনিয়র হাই–মেয়েদের ঃ

(১) কুলটি মিলাট উর্দু গার্লস জুনিয়র হাই (উর্দু মাধ্যম, ১.৫.৯৩)

রাণীগঞ্জ পৌর এলাকা

ছেলেদের হাইস্কুল ঃ

(১) মাড়য়ারী সনাতন বিদ্যালয় (হিন্দি মাধ্যম, উ.মা. সহ-শিক্ষা, ৯.২.৩৪), (২) রাণীগঞ্জ হাই (উ.মা. সহ-শিক্ষা ১৮৯১), (৩) রাণীগঞ্জ শ্রীদুর্গা বিদ্যালয় (হিন্দি মাধ্যম, মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৬৬), (৪) রাণীগঞ্জ উর্দু হাই (উর্দু মাধ্যম, মা. ১.১.৭৮), (৫) সিয়ারসোল রাজ হাই (উ.মা. ১৮৫৬)

মেয়েদের হাই স্কুল ঃ

(১) আঞ্জুমান উর্দু গার্লস হাই (উর্দু মাধ্যম, মা. ১.১.৮২), (২) বাসন্তীদেবী গোয়েঙ্কা

বিদ্যামন্দির (মা. হিন্দি মাধ্যম, ১.১.৬৩), (৩) গান্ধী মেমোরিয়াল গার্লস হাই (উ.মা. ১.৫.৯৫), (৪) রাণীগঞ্জ যমুনাময়ী বালিকা বিদ্যালয় (মা. ১.১.৮৪), (৫) সিয়ারসোল গার্লস হাই (মা. ১.১.৮৪)

জুনিয়ার হাই ছেলেদের (সহ-শিক্ষামূলক) ঃ

(১) গুরুনানক জুনিয়র হাই (হিন্দি মাধ্যম, ১.১.৬৮)

ছেলেদের (সহ-শিক্ষা মূলক)

(১) বল্লভপুর আর. জি. এস. বিদ্যাপীঠ (মা. ১.১.৬৯), (২) জে. কে. নগর হাই (বাংলা, হিন্দি মাধ্যম, মা. ১.১.৬৮), (৩) চেলোড হাই (মা. ১.৫.৯২), (৪) বক্তার নগর হাই (মা. ১.৫.৯৫)

সালানপুর ব্লক ঃ

ছেলেদের হাইস্কুল

(১) আছড়া যজ্ঞেশ্বর হাই (মা. ১.৩.৩৯), (২) চিত্তরঞ্জন দশ ক্লাস হাই (মা. ১৯৬৪), (৩) ইথোরা এস.সি.ইনসটিটিউশন (মা. সহ-শিক্ষা, ১৯১০), (৪) পঞ্চমপল্লী বিদ্যালয় (চিত্তরঞ্জন, মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৬৬), (৫) কল্যাণেশ্বরী হাই (মা. ১.৫.৯৬, সহ-শিক্ষা)

মেয়েদের হাইস্কুল ঃ

(১) চিত্তরঞ্জন হাই স্কুল ফর গার্লস (মা. ১.১.৬৬), (২) চিত্তরঞ্জন এম.এস. গার্লস হাই (মা. ১.১.৬৭), (৩) আছড়া রায় বলরাম গার্লস হাই (মা. ১.৫.৯৩)

জুনিয়র হাইস্কুল (সহ-শিক্ষা মূলক) ঃ

(১) চিত্তরঞ্জন কস্তুরবা গান্ধী বিদ্যালয় (হিন্দি মাধ্যম, ১.১.৮২)

দুর্গাপুর মহকুমা

দুর্গাপুর পৌর এলাকা

ছেলেদের হাই স্কুল ঃ

(১) অঙ্গদপুর হাই (মা. ১.১.৮০), (২) বেনাচিতি ভারতীয় হিন্দি হাই (উ.মা. ১.১.৭৯ / ১.৫.৯৫), (৩) বেনাচিতি নেতাজী বিদ্যালয় হাই (মা. ১.১.৮৩), (৪) বেনাচিতি হাই (মা. ১৪.১.৮৪), (৫) ভিড়িঙ্গি টি.এন. ইনস্টিটিউশন (উ.মা. সহ-শিক্ষা, ১৯৩৩), (৬) বিধান নগর গভঃ স্পনসর্ড বয়েজ হাই (মা. ১.১.৮৭), (৭) দুর্গাপুর এ.ভি.বি. হাই (উ.মা.

১.১.৭৩/১.৫.৯৬), (৮) দুর্গাপুর টি.এন. হাই (উ.মা. সহ-শিক্ষা, ১৯৪৩) (৯) দুর্গাপুর প্রোজেক্ট বয়েজ হাই ইউনিট-১ গভঃ স্পনসর্ড, (উ.মা. ১৯৬৩), (১০) দুর্গাপুর প্রোজেক্ট বয়েজ হাই ইউনিট-২, গভঃ স্পনসর্ড (মা. ১.১.৮৭), (১১) দুর্গাপুর আর.ই.কলেজ মডেল হাই – গভঃ স্পনসর্ড (উ.মা. ১.৯.৬৪), (১২) ইছাপুর এন.সি. হাই (১.১.৮৭), (১৩) পলাশডিহি হাই (মা. ১.১.৮৭), (১৪) রামকৃষ্ণপল্লী ভি. বিদ্যাপীঠ, (মা. ১.১.৬৮), (১৫) সাগরভাঙ্গা হাই গভঃ স্পনসর্ড (মা. ১৯৮০), (১৬) আমড়াই হাই (মা. ১.৫.৯৬), (১৭) দুর্গাপুর কেমিকেল এস.ই (মা. ১.১.৮৪), (১৮) জেমুয়া বি. বিদ্যাপীঠ (মা. ১.৫.৯৬), (১৯) দুর্গাপুর প্রোজেক্ট টাউনশিপ বয়েজ হাই (মা. ১.৫.৯৩)

মেয়েদের হাই স্কুল ঃ

(১) বিধাননগর গভঃ স্পনসর্ড গার্লস হাই (মা. ১.১.৮৭), (২) দুর্গাপুর গার্লস হাই – গভঃ স্পনসর্ড (উ.মা. ১.৩.৬১), (৩) দুর্গাপুর গার্লস হাই (মা. ১.১.৮৬), (৪) দুর্গাপুর প্রোজেক্ট টাউনশিপ গার্লস হাই (মা. ১.১.৮৬), (৫) ভিড়িঙ্গি গার্লস হাই (মা.)

জুনিয়র হাই স্কুল – সহশিক্ষা মূলক ঃ

(১) নেপালীপাড়া হিন্দি জুনিয়র হাই (১.১.৮৭), (২) নেতাজীনগর কলোনী জুনিয়র হাই (১.১.৮৬),

মেয়েদের জুনিয়র হাইস্কুল ঃ

(১) গোপাল মাঠ জুনিয়র হাই (১.১.৮৬)

অণ্ডাল ব্লক

ছেলেদের হাইস্কুল ঃ

(১) অণ্ডাল হাইস্কুল (উ.মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৫০), (২) অণ্ডাল এইচ. এইচ. বিদ্যালয় (উ.মা. ১.১.৫৯/১.৫.৯৭), (৩) বহুলা এস.এস. হাই (মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৫৭), (৪) বৈদ্যনাথপুর হাই (মা. ১.১.৬৩), (৫) কাজোড়া হাই (মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৫৭), (৬) খাঁন্দরা হাই (মা. ১.১.৮০), (৭) খাস কাজোড়া হাই (মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৮০), (৮) মদনপুর মহেশ হাই (মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৬৭), (৯) অণ্ডাল ভিলেজ হাই (মা. ১.১.৮৬), (১০) শ্রী জয়পুরিয়া হাই (উ.মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৫৭/১.৫.৯৬), (১১) উখড়া কে. বি. ইনস্‌টিটিউশন (উ.মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.১৯০১), (১২) উখড়া নেহেরু বিদ্যাপীঠ (হাই) (মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৮৫), (১৩) দক্ষিণখণ্ড হাই (মা. ১.৫.৯৩), (১৪) ট্রাফিক কলোনী নেতাজী বিদ্যাপীঠ (মা. সহ-শিক্ষা, ১.৫.৯৫)

মেয়েদের হাইস্কুল ঃ

(১) অণ্ডাল গার্লস হাইস্কুল (মা. ১.১.৬৫), (২) পুলিন বিহারী - গোষ্ঠ বিহারী বালিকা বিদ্যালয় (মা. ১৯৬৪), (৩) পাণ্ডবেশ্বর আর.জি.বালিকা বিদ্যালয় (মা)

<u>ছেলেদের জুনিয়র স্কুল – সহ-শিক্ষামূলক</u> ঃ

(১) বহুলা জি.সি.বিদ্যামন্দির জুনিয়র হাই (১.১.৬২), (২) মহাবীর জুনিয়র হাই (হিন্দি মাধ্যম, ১.১.৮৭), (৩) রহমত নগর ইকবাল একাডেমি (১.৫.৮৫), (৪) উখড়া আদর্শ হিন্দি জুনিয়র হাই (১.১.৭১), (৫) উখড়া কে. বি. জুনিয়র হাই (১.১.৮৪), (৬) কুমার ডিহি উদ্যান জুনিয়র হাই (১.৫.৯৬)

আউসগ্রাম ব্লক – ২

<u>ছেলেদের হাইস্কুল</u> ঃ

(১) জিজিরা হাইস্কুল (মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৭১), (২) ভাতকুণ্ডা হাই (মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৮৪), (৩) কোটা চণ্ডীপুর হাই (মা. ১.৫.৯৬)

ফরিদপুর ব্লক

<u>ছেলেদের হাইস্কুল</u> ঃ

(১) গোপালমাঠ হাই (উ.মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৬২), (২) গৌরবাজার রামপদ হাই (মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৬৬), (৩) লাউদহ কে. টি. বি. ইনস্‌টিটিউশন (মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৬৩), (৪) নডিয়া হাই (মা. ১.১.৮২), (৫) পানশিউলি হাই (মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৭০), (৬) সামলা মাদারবনি কোলিয়ারি হাই (মা. ১.১.৮২), (৭) কালীপুর হাই (মা. ১.৫.৯৩), (৮) প্রতাপপুর কালিকাপুর তপোবন বিদ্যাপীঠ (মা. ১.৫.৯৬)

<u>ছেলেদের জুনিয়র হাই – সহ-শিক্ষা মূলক</u> ঃ

(১) ভুরকুণ্ডা এন.সি. জুনিয়র হাই (১.১.৬০), (২) নডিয়া বীরভানপুর জুনিয়র হাই (১.১.৮৫), (৩) বিজরা জুনিয়র হাই (১.৫.৯৩)।

গলসি ব্লক –১

<u>ছেলেদের হাহস্কুল</u> ঃ

(১) বুদবুদ চটি হিন্দি হাই (মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৮২), (২) বুদবুদ মহাকালী হাই (মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৬৮), (৩) চকতেঁতুল আর. কে. হাই (মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৬৭), (৪) দেবশালা হাই (মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৮৬), (৫) কৃষ্ণরামপুর হাই (মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৬৬), (৬) মানকর হাই (উ.মা. ১.১.৫৫ / ১৯৭৬), (৭) শালডাঙ্গা নেতাজী হাই (মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৬৭), (৮) কসবা রাধারাণী বিদ্যামন্দির (মা. ১.৫.৯৬)।

মেয়েদের হাইস্কুল ঃ
(১) মানকর গার্লস হাই (মা. ১.১.৬৯)

কাঁকসা ব্লক

ছেলেদের হাইস্কুল – সহ-শিক্ষা মূলক ঃ
(১) অযোধ্যা হাই (মা. ১.১.৮২), (২) আমলাজোড়া হাই (মা. ১.১.৭৮), (৩) দুর্গাদাস বিদ্যামন্দির (মা. ১.১.৬৬), (৪) গোপালপুর হাই (উ.মা. ১৮.৭.২৭), (৫) কাঁকসা হাই (উ.মা. ১৯৫১), (৬) পানাগড় বাজার হিন্দি হাই (মা. ১.১.৬৭), (৭) শিলামপুর হাই (মা. ১.১.৬৬), (৮) ত্রিলোক চাঁদপুর জে. এস. হাই (মা. ১.১.৮৭), (৯) বিড়ুডিয়া হাই (মা. ১.৫.৯২), (১০) জামদহ হাই (মা. ১.১.৯৩)।

মেয়েদের হাই-স্কুল ঃ
(১) কাঁকসা গার্লস হাই (মা. ১.১.৬৯), (২) গোপালপুর গার্লস হাই (মা. ১.৫.৯৬)।

ছেলেদের জুনিয়র হাইস্কুল – সহ-শিক্ষা মূলক
(১) গড়াই সরস্বতী মন্দির শিক্ষা নিকেতন (১.১.৮৬), (২) পানাগড় বাজার জুনিয়র হাই (১.১.৮৪), (৩) পানাগড় রেলওয়ে কলোনী জুনিয়র হাই (১.১.৭৯), (৪) পিয়ারীগঞ্জ চারুচন্দ্র জুনিয়র হাই (১.১.৮৬), (৫) রক্ষিতপুর জুনিয়র হাই (৮.১.৬৯), (৬) শোকনা নতুনগ্রাম সাগরবালা জুনিয়র হাই (১.১.৭১), (৭) লেবনাপাড়া জুনিয়র হাই (১.৫.৯৬)

কালনা মহকুমা

কালনা পৌর এলাকা

ছেলেদের হাইস্কুল ঃ
(১) কালনা এ.এম.এম.হাই (উ.মা. ১৯৪৮), (২) কালনা মহারাজা হাই (মা. ১৯৫৫), (৩) কালনা এম.এম. ইনস্‌টিটিউশন (মা. সহ-শিক্ষা ১.১২.৪৭), (৪) কালনা শ্রী শ্রী নিগমানন্দ বিদ্যামন্দির (মা. ১.১.৮৬)।

মেয়েদের হাই-স্কুল ঃ
(১) কালনা হিন্দু গার্লস হাই (উ.মা. ১.৪.৪৮), (২) কালনা এম.এম. গার্লস ইনস্‌টিটিউশন (মা. ১.৩.৬১), (৩) কালনা শশীবালা গার্লস হাই (মা. ১.১.৮০)।

ছেলেদের জুনিয়র হাই-স্কুল ঃ
(১) কালনা জুনিয়র হাই (১.৪.৫৯)

কালনা ব্লক –১

ছেলেদের হাইস্কুল ঃ

(১) বাগনাপাড়া হাই (মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৫২), (২) বেগপুর ইউনিয়ন ইনস্টিটিউশন (মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৪৯), (৩) ভৈরবনালা এস. কে. ইউ. এস. হাই (মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৭৩) (৪) ধাত্রীগ্রাম হাই (উ.মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৫০), (৫) কৃষ্ণদেবপুর হাই (মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৬৩), (৬) মেদগাছি হাই (মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৬৮), (৭) সিমলন এ. কে. বিদ্যামন্দির (উ.মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৩৯), (৮) সুলতানপুর টি.ডি. বিদ্যামন্দির (উ.মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৩৮), (৯) হাটকালনা জি. এল. হাই (মা. ১.৫.৯৩), (১০) সোঁদরপুর বি.ডি. বিদ্যামন্দির (মা. ১.৫.৯৯)

মেয়েদের হাইস্কুল ঃ

(১) বাগনাপাড়া সি. কে. ডি. গার্লস হাই (মা. ১.১.৬৮), (২) ধাত্রীগ্রাম বালিকা বিদ্যালয় (মা. ১.১.৮৭), (৩) মছলন্দপুর সিমলন এম.এস. বালিকা বিদ্যামন্দির (মা. ১.১.৬৬)

ছেলেদের জুনিয়র হাই স্কুল – সহ শিক্ষা মূলক ঃ

(১) বৃদ্ধপাড়া জনকল্যাণ বিদ্যাপীঠ (১.১.৫৮), (২) হাটগাছা জুনিয়র হাই (১.১.৭৯), (৩) কাঁকুরিয়া দেশবন্ধু জুনিয়র হাই (১.১.৮২), (৪) খড়িনান জুনিয়র হাই (১.১.৬৩), (৫) নতুনগ্রাম জুনিয়র হাই (১.১.৭৪), (৬) সর্বপল্লী জুনিয়র হাই (১.১.৭৪), (৭) মসলিমাবাদ জুনিয়র হাই মাদ্রাসা (১.৫.৯৫)।

মেয়েদের জুনিয়র হাইস্কুল ঃ

(১) কৃষ্ণদেবপুর জুনিয়র হাই (১.১.৬৭)

কালনা ব্লক – ২

ছেলেদের হাইস্কুল – সহশিক্ষা মূলক ঃ

(১) অকালপৌষ এ.পি.ডি. হাই (মা. ১.১.৮৪), (২) অঙ্গারসন এম. এম. হাই (মা. ১.১.৬৮), (৩) আনুখাল হাই (মা. ১.১.৬৫), (৪) বাদলা হাই (উ.মা. ১.৮.৫৬), (৫) বৈদ্যপুর আর কে বিদ্যাপীঠ (উ.মা. ১.১.১৩), (৬) বীরুহা এস. সি. উচ্চবিদ্যালয় (মা. ১.১.৬৭), (৭) ইছাপুর শ্রী গদাধর হাই (মা. ১.৩.৬১), (৮) সাতগাছিয়া হাই (মা. ৩০.১২.৫২)

মেয়েদের হাইস্কুল ঃ

(১) বাদলা গার্লস হাই (মা. ১.১১.৭১), (২) বৈদ্যপুর আর. আর. বালিকা বিদ্যালয় (মা. ১.১.৬৬) (৩) দত্ত দেড়িয়াটন এস. ডি. বালিকা বিদ্যালয় (মা. ১.৫.৯৬)

ছেলেদের জুনিয়র হাই – সহ-শিক্ষা মূলকঃ

(১) পাথরঘাটি জুনিয়র হাই (১.১.৭৪), (২) সেনেরডাঙ্গা রামকৃষ্ণ বিদ্যালয় (১.১.৭০), (৩) তেহাটা জুনিয়র হাই (১.১.৮৪), (৪) পূর্ব সাহাপুর জুনিয়র হাই (১.৫.৯৫)

মেয়েদের জুনিয়র হাইস্কুল ঃ

(১) সাতগাছিয়া বালিকা বিদ্যালয় (১.১.৬৮)

মন্তেশ্বর ব্লক

ছেলেদের হাইস্কুল – সহশিক্ষা মূলক ঃ

(১) বৈষ্ণবডাঙ্গা এস. জি. বিদ্যাপীঠ (মা. ১.৪.৫৯), (২) বাঁউই পি. পি. বিদ্যামন্দির (মা. ১.১.৭৬), (৩) বসন্তপুর এস. এস. শিক্ষানিকেতন (মা. ১.১.৬৬), (৪) ভাগড়া হাই (মা. ১.১.৭১), (৫) ভুরকুণ্ডা বি. এম. ইনস্‌টিটিউশন (মা. ১.১.৮৭), (৬) দেবপুর হাই (উ.মা. ১.৫.৯৭), (৭) জামনা হাই (মা. ১.১.৬৭), (৮) কাইগ্রাম হাই (মা. ১.১.৬৩), (৯) কাটশিহি হাই (মা. ১.১.৬৬), (১০) কুসুমগ্রাম টি. ইনস্‌টিটিউশন (মা. ১.১.২৪), (১১) মধ্যমগ্রাম পি. এম. হাই (উ.মা. ১.১.৫০), (১২) মালডাঙ্গা আর. এম. ইনস্‌টিটিউশন (উ.মা. ১.১.৪৯), (১৩) মন্তেশ্বর সাগরবালা হাই (উ.মা.), (১৪) পুটসুড়ি আই. পি. ইনস্‌টিটিউশন (উ.মা. ১৯০৩), (১৫) শুশুনিয়া রানীবালা বিদ্যামন্দির (উ.মা. ১.৪.৪৮), (১৬) সুটরা মুক্তেশ্বর বিদ্যানিকেতন (মা. ১.১.৬৫), (১৭) ত্রিপল্লী হাই (মা. ১.১.৮২), (১৮) ভেলিয়া পি. পি. হাই (মা. ১.৫.৯৬)

মেয়েদের হাইস্কুল ঃ

(১) ধান্য খেড়ুর জে. এম. বালিকা বিদ্যামন্দির (মা. ১.১.৬৮), (২) সতীকৃষ্ণমণি গার্লস হাই (মা. ১.১.৮৬)।

ছেলেদের জুনিয়র হাইস্কুল – সহ-শিক্ষামূলক ঃ

(১) আমাতিয়া জুনিয়র হাই (১.১.৭১), (২) বাঘাসন জুনিয়র হাই (১.১.৭৪), (৩) বেলেগুা আদর্শ জুনিয়র হাই (১.১.৫৫), (৪) দোয়ারি মন্দাকিনী জুনিয়র হাই (১.১.৭৯), (৫) গৌতমডাঙ্গা জুনিয়র হাই (১.১.৮৪), (৬) কামড়া-তাজপুর জুনিয়র হাই (১.১.৬৭), (৭) কুলুট নীহারুদ্দিন জুনিয়র হাই (১.১.৭৩), (৮) ন'পাড়া জুনিয়র হাই (১.১.৭০), (৯) পিপলন জুনিয়র হাই (১.১.৮৪), (১০) রায়গ্রাম জুনিয়র হাই (১.১.৭১), (১১) সিজনা উজনা পাঁচপাড়া জুনিয়র হাই (১.১.৭৪), (১২) সিংহলি উমাপদ জুনিয়র হাই (১.১.৭০), (১৩) সুসুনা তারামাতা জুনিয়র হাই (১.১.৭১), (১৪) বামুনপাড়া আঞ্চলিক জুনিয়র হাই (১.৫.৯৭)।

মেয়েদের জুনিয়র হাইস্কুল ঃ

(১) হাটগাছা বালিকা জুনিয়র হাই (১.১.৮০), (২) মালডাঙ্গা কাদম্বিনী গার্লস জুনিয়র (১.১.৭০), (৩) জলুইডাঙ্গা জি.সি.পাল জুনিয়র হাই (১.১.৮৬), (৪) পুটসুড়ি গার্লস জুনিয়র হাই (১.৫.৫৯)

পূর্বস্থলী ব্লক – ১

ছেলেদের হাই–স্কুল ঃ

(১) দীর্ঘপাড়া ভি. এম. বিদ্যাপীঠ (মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৭৪), (২) জাহান নগর কে. হাই (মা. ১.১.৫১), (৩) খরসগ্রাম কালীবালা হাই (মা. ১.১.৮২), (৪) নাদনঘাট আর পি. হাই (উ.মা. ১.৫.৯৬), (৫) পারুলডাঙ্গা নসরতপুর হাই (মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৬৮), (৬) রায় দো গাছিয়া হাই (মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৬৬), (৭) সমুদ্রগড় হাই (উ.মা. সহ-শিক্ষা, ১.১.৫১), (৮) শ্রীরামপুর ইউনাইটেড হাই (মা. ১.১.৬৩)

মেয়েদের হাইস্কুল ঃ

(১) শ্রীরামপুর ভবতারিনী রায় গার্লস হাই (মা. ১.১.৬৫)

ছেলেদের জুনিয়র হাইস্কুল – সহ-শিক্ষা ঃ

(১) অবাকপুর জুনিয়র হাই (১.১.৮০), (২) চম্পাহাটি জুনিয়র হাই (১.১.৭৯), (৩) কুরিচা টি.ডি. জুনিয়র হাই (১.১.৬৬), (৪) রাজাপুর ভাতছালা ডি জুনিয়র হাই (১.১.৮৪), (৫) রাজীবপুর শিক্ষাশ্রী বিদ্যায়তন (১.১.৭৪), (৬) দামোদরপাড়া সপ্তপল্লী জুনিয়র হাই (১.৫.৯৩)

মেয়েদের জুনিয়র স্কুল ঃ

(১) নাদনঘাট অন্নপূর্ণা বালিকা বিদ্যালয় (১.১.৬৯)

পূর্বস্থলী ব্লক – ২

ছেলেদের হাইস্কুল – সহশিক্ষা মূলক ঃ

(১) বিশ্বরম্ভা বিদ্যাপীঠ (মা. ১.১.৬৭), (২) হাপানিয়া এস. এম.হাই (মা. ১.১.৭৮), (৩) হলদিপাড়া আর. সি. হাই (মা. ১.১.৬৫), (৪) কাষ্ঠশিলা নিভাননী হাই (মা. ১.১.৭৩), (৫) লক্ষ্মীপুর হাই (মা. ১.১.৮৪), (৬) মাজিদা জ্ঞান বিদ্যাভবন (মা. ১.৪.৫৯), (৭) মহাদেবপুর হাই (মা. ১.১.৬৯), (৮) পাটুলি কে. কে. হাই (উ.মা. ১.৭.৭৮), (৯) পারুলিয়া কে কে হাই (মা. ১.১.৭৩), (১০) পূর্বস্থলী এন. বি. ইনস্টিটিউশন (উ.মা. ১৯৪৮), (১১) শ্রীরামপুর ভারতীভবন হাই (মা. ১.১.৭৩), (১২) উখুরা এন. এন. হাই (মা. ১.১.৭৩), (১৩) বিদ্যানগর জি. ডি. বিদ্যামন্দির (উ.মা. ১.১.৫৫), (১৪) মেড়তলা দেশবন্ধু হাই (মা. ১.৫.৯৬)।

মেয়েদের হাইস্কুল ঃ

(১) পাটুলী গার্লস হাই (মা. ১.১.৬৭) (২) পূর্বস্থলী এস. বালিকা বিদ্যালয় (মা. ১.৪.৬০)

ছেলেদের জুনিয়র হাই – সহ-শিক্ষামূলক ঃ

(১) আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বিদ্যামন্দির (১.৪.৫৯), (২) বেলেরহাট বৈদ্যনাথ জুনিয়র হাই (১.১.৬৫), (৩) গোবিন্দপুর জুনিয়র হাই (১.১.৫৯)

কাটোয়া মহকুমা

কাটোয়া পৌর এলাকা

ছেলেদের হাইস্কুল ঃ

(১) কাটোয়া জানকীলাল শিক্ষাসদন (মা. ১.১.৬৫), (২) কাটোয়া ভারতীভবন হাই (উ.মা. ১.১.৪৯), (৩) কাটোয়া কে. ডি. ইনস্‌টিটিউশন (উ.মা. ১৮৫৭), (৪) কাটোয়া শ্রী আর. কে. বিদ্যাপীঠ (উ.মা. সহশিক্ষা ১.১.৬৫)

মেয়েদের হাইস্কুল ঃ

(১) কাটোয়া ডি.ডি.সি. গার্লস হাই (উ.মা. ১.১.৫২), (২) কাটোয়া কাশীশ্বরী বিদ্যালয় (মা. ১.১.৮২), (৩) কাটোয়া বালিকা বিদ্যালয় (মা. ১.৫.৯৫)

কাটোয়া ব্লক – ১

ছেলেদের হাইস্কুল – সহ-শিক্ষামূলকঃ

(১) আলমপুর এইচ. এম. হাই (মা. ১.১.৬৭), (২) চন্দ্রপুর সেন্ট্রাল হাই (উ.মা. ১.১.৪৯), (৩) করজগ্রাম হাই (মা.১.১.৬৪), (৪) কোশিগ্রাম ইউনিয়ন ইনস্‌টিটিউশন (মা. ১.১.৭০), (৫) পঞ্চাননতলা হাই (মা. ১৯৪২), (৬) পানুহাট রাজ মহিষীদেবী হাই (মা. ১.১.৭৪), (৭) রাজুয়া চুড়কুনি কে. বিদ্যাপীঠ (মা. ১.১.৬৯), (৮) শ্রীখণ্ড হাই (মা. ১৯০৮), সুদপুর হাই (মা. ১.১.৬২), (১০) কদম পুকুর সিনিয়র মাদ্রাসা (মা. ১.৫.৮৫)

মেয়েদের হাইস্কুল ঃ

(১) শ্রীখণ্ড উষাঙ্গিনী গার্লস হাই (মা. ১.১.৭৩)

ছেলেদের জুনিয়র হাই – সহ-শিক্ষামূলক ঃ

(১) আরশাপল্লী জুনিয়র হাই (৯.৭.৮১), (২) দেবগ্রাম বারামপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় (১.১.৮৩), (৩) গৃধগ্রাম জি. বিদ্যানিকেতন জুনিয়র হাই (১.১.৬৫), (৪) কইথন জুনিয়র হাই (১.১.৭০), (৫) করজগ্রাম জুনিয়র হাই মাদ্রাসা (১.১.২৫), (৬) পাণ্ডুগ্রাম জুনিয়র হাই (১.১.৮৪) (৭) পুইনি আইডিয়াল ইনস্‌টিটিউশন জুনিয়র হাই (–)

দাঁইহাট পৌর এলাকা

ছেলেদের হাইস্কুল – সহ - শিক্ষা মূলক ঃ

(১) দাঁইহাট হাই (উ.মা. ১৮৮৭)

মেয়েদের হাই স্কুল ঃ

(১) দাঁইহাট গার্লস হাইস্কুল (মা. ১.১.৬৬)

ছেলেদের জুনিয়র হাইস্কুল – সহ শিক্ষামূলক ঃ

(১) আখড়া জুনিয়র হাই (১.১.৭৪), (২) দাঁইহাট ডাক্তার সুধাময় চন্দ্র জুনিয়র হাই (১.১.৭১)।

কাটোয়া ব্লক – ২

ছেলেদের হাইস্কুল – সহ - শিক্ষামূলক ঃ

(১) অগ্রদ্বীপ ইউ. ইউ. এম. বিদ্যালয় (মা. ১.১.৬৫), (২) আউড়িয়া সি.সি. দত্ত বিদ্যানিকেতন (মা. ১.১.৭৩), (৩) চাণ্ডুলি হাই (মা. ১.১.৫৪), (৪) ঘোড়ানাস হাই (মা. ১.১.৬৬), (৫) ইসলামপুর জি. এন. বাল ইনস্‌টিটিউশন (মা. ১.১.৭৪), (৬) কোরুই হাই (মা. ১.১.৫৩), (৭) মাকালতোড় মাধ্যমিক বিদ্যালয় (মা. ১.১.৭৯), (৮) মেজিয়ারি এস. সি. হাই (উ. মা. ১.১.৬২), (৯) ওকোড়সা হাই (মা. ১৫.৩.১৯০১), (১০) শ্রীবাটী জি.কে. হাই (মা. ১.১.৮৬), (১১) চরপাতাইহাট হাই (মা. ১.৫.৯২), (১২) দেয়াসিন বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠ (মা. ১.৫.৯৬)

মেয়েদের হাইস্কুল ঃ

(১) মেজিয়ারি চঞ্চলাবালা বালিকা বিদ্যালয় (মা. ১.১.৭৩)

ছেলেদের জুনিয়র হাই – সহ-শিক্ষা মূলক ঃ

(১) অগ্রদ্বীপ এস.সি. শিক্ষানিকেতন, (১.১.৮৪), (২) পাঁচপাড়া জুনিয়র হাই মাদ্রাসা (১.১.৮২)।

কেতুগ্রাম ব্লক –১

ছেলেদের হাই স্কুল – সহ-শিক্ষা মূলক ঃ

(১) আমগোড়িয়া গোপালপুর আর. ডি. এম. হাই (উ.মা. ১৯২৭), (২) আনখোনা হাই (মা. ১.১.৬৬), (৩) বেড়ুগ্রাম বান্ধব বিদ্যাপীঠ (মা. ১.১.৬৩), (৪) দধিয়া গোপালদাস হাই (মা.১.১.৮৬), (৫) গোমা সারেণ্ডি হাই (মা. ১.১.৬৫), (৬) কাঁদরা জে. এম. হাই (উ.মা. ১.৫.৯৪), (৭) খাঞ্জি কিউ. এ. আজিম হাই (মা. ১.১.৭৩), (৮) খাটুণ্ডি হাই (মা. ১.১.৬৭), (৯) কুল্লা হাই (মা.১.১.৬৭), (১০) নিরোল হাই (মা. ১.১.৭১), (১১)

পালিটা হাই (মা. ১.১.৬৫), (১২) রাজুর বান্ধব হাই (উ.মা. ১.১.২৮), (১৩) শ্রীগ্রাম জি. সি. বিদ্যামন্দির (মা. ১.১.৬৫), (১৪) মোলগ্রাম ডক্টর জাকির হোসেন হাই মাদ্রাসা (মা. ১.৫.৯৫), (১৫) কান্টারি হাই মাদ্রাসা (মা. ১.৫.৯৫), (১৬) কালীপুর সিনিয়র মাদ্রাসা (মা. সহ-শিক্ষা, ১.৭.৬৭), (সিরিয়র মাদ্রাসায় সহ-শিক্ষা আছে অথচ ১৪ এবং ১৫ নম্বর মাদ্রাসা দুটিতে সহ-শিক্ষা নেই)

মেয়েদের হাইস্কুল ঃ

(১) ললিতা সুন্দরী গার্লস হাই (মা. ১.১.৬৮)

ছেলেদের জুনিয়র হাই (সহ-শিক্ষা মূলক)

(১) আগরডাঙ্গা জুনিয়র হাই মাদ্রাসা (২.১.২৫), (২) চাকতা আদর্শ এস. বিদ্যাপীঠ জুনিয়র হাই (১.১.৭৪), (৩) চিনিশপুর ইউ. এম. জুনিয়র হাই মাদ্রাসা (১.১.৭৫)।

মেয়েদের জুনিয়র হাইস্কুল ঃ

(১) কান্দরা জ্ঞানদাস গার্লস জুনিয়র হাই (১.১.৭৮), (২) রাজুরবান্ধব বালিকা বিদ্যালয় (১.১.৭৮)

কেতুগ্রাম ব্লক — ২

ছেলেদের হাইস্কুল — সহ - শিক্ষামূলক ঃ

(১) বাহারান জে. ডি. হাই (মা. ১.১.৪৮), (২) বিল্বেশ্বর হাই (উ.মা. ১.১.৫৪), (৩) গঙ্গাটিকুরি এ. এন. বিদ্যামন্দির (মা. ১.১.৫৫), (৪) কেতুগ্রাম এম. এ. এম. ইনস্‌টিটিউশন (১৯২৪), (৫) মৌগ্রাম হাই (মা. ১.১.৬৯), (৬) পারুলিয়া এম. বিদ্যাপীঠ হাই (মা. ১.১.৮৫), (৭) শিবলুন এ. সি. এম. হাই (মা. ১.১.৭১), (৮) শ্রীবাটী হাই (মা. ১.১.৬৭),

ছেলেদের জুনিয়র হাইস্কুল — সহ-শিক্ষামূলক ঃ

(১) গুড়পাড়া জুনিয়র হাই (১.১.৮৬), (২) কেনগুড়ি জুনিয়র হাই (১.১.৭৪), (৩) খোনাইবান্ধা জি. বিদ্যামন্দির জুনিয়র হাই (১.১.৭৪), (৪) রাউণ্ডি সুরেন্দ্রনাথ জুনিয়র হাই (১.১.৭৪)

মেয়েদের জুনিয়র হাইস্কুল ঃ

(১) বিল্বেশর বি. বালিকা বিদ্যালয় (১.১.৭০)

মঙ্গলকোট ব্লক

ছেলেদের হাইস্কুল — সহ-শিক্ষামূলক ঃ

(১) বাজার বনকাপাশি এস. এম. হাই (মা. ১.১.৬৫), (২) বেলগ্রাম এন. আর. বিদ্যামন্দির (মা. ১.১.৭০), (৩) গণপুর হাই (মা. ১.১.৬৩), (৪) যবগ্রাম এম কে. ইনস্‌টিটিউশন (মা.

১৯২১), (৫) কাসেমনগর এন. এ. জে. হাই (উ.মা. ১৯৩৩), (৬) কোগুরপুর হাই (মা. ১.১.৪৬), (৭) কৃষ্ণবাটী হাই (মা. ১.১.৭১), (৮) ক্ষীরগ্রাম এস. জে. বানীপীঠ হাই (মা. ১.১.৫০), (৯) লাখুরিয়া জে. এন. জি. হাই (মা. ১.১.৬৮), (১০) মাজিগ্রাম বি. হাই (উ.মা. ১.৫.৯৫), (১১) মাথরুন এন.সি. ইনস্‌টিটিউশন (উ.মা. ১৯০০), (১২) মঙ্গলকোট এ. কে. এম. হাই (উ.মা. ১.১.৪৬), (১৩) মঙ্গলকোট হাই মাদ্রাসা (মা. ১.১.৭৫), (১৪) নিগন ডি. বি. বিদ্যামন্দির (মা. ১.১.৬৭), (১৫) নোয়াপাড়া ডাক্তার গুনেন্দ্র বিদ্যাপীঠ (মা. ১.১.৭১), (১৬) পালিগ্রাম বি. এস. বিদ্যামন্দির (মা. ১.১.৬৬), (১৭) পশ্চিম মঙ্গলকোট জাতীয় শিক্ষানিকেতন হাই (মা. ১.১.৮২)।

<u>মেয়েদের হাই স্কুল</u> ঃ

(১) কৈচর এস. বালিকা বিদ্যামন্দির (মা. ১.১.৮৬), (২) কাসেমনগর বি. এন. টি. পি. গার্লস হাই (মা. ১.১.৭৪)

<u>ছেলেদের জুনিয়র হাইস্কুল – সহ-শিক্ষা-মূলক</u> ঃ

(১) চাকুলিয়া জুনিয়র হাই (১.১.৭১), (২) ইটলা হাই (১.১.৭৪), (৩) ঝিলু আলি হোসেন মেমোরিয়েল ইনস্‌টিটিউশন জুনিয়র হাই (১.১.৭৪), (৪) কুমারপুর জি.সি. জুনিয়র হাই (১.৫.৯৫)।

<u>মেয়েদের জুনিয়র হাইস্কুল</u> ঃ

(১) শিমুলিয়া ইউ. গার্লস জুনিয়র হাই (১.১.৭১)

বর্ধমান জেলায় মধ্য শিক্ষা পর্ষদ অনুমোদিত সরকারী অর্থ সাহায্য বিহীন বিদ্যালয় সমূহ

বর্ধমান সদর মহকুমা

(১) সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল, কানাইনাটশাল, (হাইস্কুল), (২) হোলিরক স্কুল (হাইস্কুল), (৩) কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, (হাইস্কুল)

আসানসোল মহকুমা

(১) ইস্টার্ন রেলওয়ে বয়েজ হাই, (এইচ. এস), (২) ইস্টার্ন রেলওয়ে গার্লস হাই (হাইস্কুল), (৩) বার্ণপুর বয়েজ হাইস্কুল (ইস্‌কো পরিচালিত, এইচ, এস.), (৪) বার্ণপুর গার্লস হাইস্কুল (ইসকো পরিচালিত, এইচ. এস), (৫) হিন্দুস্তান কেবল্‌স্ বয়েজ হাই (এইচ এস.), (৬) হিন্দুস্তান কেবল্‌স্ গার্লস হাই (হাইস্কুল), (৭) ডি.ভি.সি. হাইস্কুল – লেফ্‌ট ব্যাঙ্ক কল্যাণেশ্বরী (এইচ.এস.), (৮) দেশবন্ধু বয়েজ হাইস্কুল (রেলওয়ে পরিচালিত, চিত্তরঞ্জন, এইচ, এস.), (৯) দেশবন্ধু, গার্লস হাইস্কুল (রেলওয়ে পরিচালিত, চিত্তরঞ্জন,

হাইস্কুল), (১০) দেশবন্ধু গার্লস হাইস্কুল (হিন্দি মাধ্যম, চিত্তরঞ্জনে অবস্থিত, হাইস্কুল), (১১) সেন্ট ভিনসেন্ট হাইস্কুল (হাইস্কুল), (১২) সেন্ট পলস্ হাইস্কুল (হাইস্কুল), (১৩) লরেটো হাইস্কুল (হাইস্কুল), (১৪) এ. জি. চার্চ স্কুল (হাইস্কুল), (১৫) কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় - আসানসোল (হাইস্কুল), (১৬) কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় – বাহাদুরপুর (হাইস্কুল), (১৭) জ্ঞানভারতী বিদ্যালয় - রাণীগঞ্জ (হাইস্কুল), (১৮) রিভার সাইড হাইস্কুল - বার্ণপুর (হাইস্কুল) (১৯) চিত্তরঞ্জন হাইস্কুল (ইংরাজি মাধ্যম, হাইস্কুল)।

দুর্গাপুর মহকুমা

(১) ডি.ভি.সি., ডি.টি.পি. এস. (দুর্গাপুর -১৫, এইচ. এস.), (২) এম.এ.এম.সি. বয়েজ হাইস্কুল (দুর্গাপুর-১০, এইচ.এস.), (৩) বি.ও.জি.এল. হাইস্কুল (দুর্গাপুর-১০, হাইস্কুল), (৪) মডার্ণ হাইস্কুল (এম.এ.এম.সি., দুর্গাপুর-১০, হাইস্কুল), (৫) দুর্গাপুর-ফার্টিলাইজার হাইস্কুল (দুর্গাপুর-১২, এইচ.এস), (৬) কে.ডি.রোড বয়েজ হাইস্কুল (ডি.এস.পি., দুর্গাপুর-৫, এইচ. এস.), (৭) বি-জোন মাল্‌টিপারপাস হাইস্কুল (দুর্গাপুর-৫, এইচ.এস.), (৮) জয়দেব রোড বয়েজ হাইস্কুল (দুর্গাপুর-৪, এইচ.এস), (৯) এ-জোন বয়েজ হাইস্কুল (দুর্গাপুর-৪, এইচ.এস), (১০) শিবাজী রোড বয়েজ হাইস্কুল (দুর্গাপুর-৪, এইচ.এস.) (১১) এম.এ.এম.সি. গার্লস হাইস্কুল (দুর্গাপুর-১০, এইচ.এস), (১২) বি-জোন গার্লস হাই (দুর্গাপুর-৫, হাইস্কুল), (১৩) জয়দেব রোড গার্লস হাই (দুর্গাপুর-৫, হাইস্কুল), (১৪) আকবর রোড গার্লস হাই, (দুর্গাপুর-৪, হাইস্কুল) (১৫) সেন্টপলস্ গার্লস হাইস্কুল (দুর্গাপুর-৪, হাইস্কুল), (১৬) বেলতলা গার্লস হাইস্কুল (দুর্গাপুর-৫, হাইস্কুল), (১৭) সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল (দুর্গাপুর-৬, হাইস্কুল) (১৮) কারমেল কনভেন্ট (দুর্গাপুর-১০, হাইস্কুল), (১৯) পরমানন্দ বিদ্যামন্দির, চৈতন্য এভিনিউ (দুর্গাপুর-৫, হাইস্কুল), (২০) সেন্ট মাইকেলস্ হাইস্কুল (দুর্গাপুর-১২, হাইস্কুল), (২১) এসেম্লি অব গড চার্চ, (উখরা, হাইস্কুল), (২২) কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় (পানাগড় বেস. হাইস্কুল), (২৩) ফার্টিলাইজার হাইস্কুল (দুর্গাপুর, হাইস্কুল), (২৪) বিধাননগর ইনস্টিটিউশন (দুর্গাপুর-৬, এইচ.এস.) যেহেতু আসানসোল, দুর্গাপুর মূলতঃ শিল্পাঞ্চল, তাই বিভিন্ন শিল্পে কর্মরত ব্যক্তিদের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার জন্য শিল্প সংস্থাগুলি সরকারী অর্থ সাহায্য ছাড়াও শুধুমাত্র মধ্য শিক্ষা পর্ষদের অনুমোদন নিয়ে বিভিন্ন ধরনের স্কুল স্থাপন করেছে। আসানসোল ও দুর্গাপুর অঞ্চলে বিভিন্ন ভাষাবাসী লোক বাস করে। তাই এই দুই মহকুমার অনেক স্কুলেই বাংলা মাধ্যম ছাড়াও ইংরাজি, হিন্দি ও উর্দু ভাষার স্কুল রয়েছে। সদর মহকুমার ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে উল্লিখিত তিনটি স্কুল ছাড়াও বেসরকারী (কোন কোনটি দিল্লী বোর্ডের অনুমোদিত) স্কুল বিভিন্ন স্তরে রয়েছে। বর্তমানে ভারত সরকারের বেসরকাবীকরণ নীতির ফলে শুধু সদর মহকুমায় নয় কালনা ও কাটোয়াতেও ক্রমে ক্রমে এই ধরণের স্কুল গড়ে উঠবে। প্রাসঙ্গিক ক্রমে বলা যায় যে সরকারের আর্থিক সংকট ও পরিকাঠামোর দুর্বলতার জন্য এ ধরণের বেসরকারী স্কুল আরও ব্যাপকভাবে গড়ে ওঠার সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা যাবে না।

বর্ধমান জেলা সাহায্যপ্রাপ্ত বেসরকারী স্কুলের সংখ্যা (৩১.৮.৯৮)

(সারণী ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫)

সারণী - ১০

সাহায্যপ্রাপ্ত বেসরকারী স্কুলের সংখ্যা (৩১.০৮.৯৮ পর্যন্ত)

মহকুমা	উচ্চ মাধ্যমিক		মাধ্যমিক		জুনিয়র হাই		হাইমাদ্রাসা		জুনিয়র হাইমাদ্রাসা		সিনিয়র মাদ্রাসা		মোট স্কুলের সংখ্যা
	ছেলেদের	মেয়েদেব	ছেলেদেব	মেয়েদের	ছেলেদের	মেয়েদের	ছেলেদের	মেয়েদের	ছেলেদের	মেয়েদের	ছেলেদের	মেয়েদের	
সদব	৪৪	৪	১৫৩	২৮	৬৮	১৫	১০	১	৯	১	১	–	৩৩৪
আসানসোল	২১	৬	৫১	২৫	২২	৪	–	–	–	–	–	–	১২৯
দুর্গাপুর	১৬	১	৪৬	১০	১৮	১	–	–	–	–	–	–	৯২
কালনা	১৯	১	৪৩	১৩	৩৪	৭	–	–	১	–	–	–	১১৮
কাটোয়া	১৪	১	৫৪	৮	১৮	৪	৪	–	৩	–	২	–	১০৮
	১১৪	১৩	৩৪৭	৮৪	১৬০	৩১	১৪	১	১৩	১	৩	–	৭৮১

উচ্চ মাধ্যমিক - ১২৭ ○ মাধ্যমিক-৪৩১ ○ জুনিয়র হাই-১৯১ ○ হাই মাদ্রাসা- ১৫

জুনিয়র হাই মাদ্রাসা- ১৪ ○ সিনিয়র হাই মাদ্রাসা-১৪ ○ মোট-৭৮১

সারণী - ১১

বর্ধমান সদর মহকুমার ব্লক / পৌরসভা ভিত্তিক স্কুলের সংখ্যা

ক্রমিক নং	মিউনিসিপ্যালিটি / ব্লক	উচ্চ মাধ্যমিক			মাধ্যমিক			জুনিয়র হাই			হাই মাদ্রাসা			জুনিয়র হাই মাদ্রাসা			সিনিয়র হাই মাদ্রাসা			মোট
১	২	৩ক	৩খ	৩গ	৪ক	৪খ	৪গ	৫ক	৫খ	৫গ	৬ক	৬খ	৬গ	৭ক	৭খ	৭গ	৮ক	৮খ	৮গ	
১	বর্ধমান মিউনিসিপ্যালিটি	৫	৩	৮	১৬	৭	২৩	৫	৪	৯	১	–	১	–	–	–	–	–	–	৪১
২	বর্ধমান ব্লক –১	১	–	১	৯	–	৯	৩	১	৪	–	–	–	১	–	১	১	–	১	১৬
৩	বর্ধমান ব্লক - ২	৪	–	৪	৭	১	৮	২	১	৩	-	–	–	–	–	-	–	–	–	১৫
৪	আউসগ্রাম ব্লক–১	১	–	১	৮	১	৯	৮	-	৮	–	–	–	১	–	১	–	–	–	১৯
৫	গুসকরা মিউনিসিপ্যালিটি	১	–	১	১	১	২	–	–	–	–	-	–	–	–	–	–	–	–	৩
৬	আউসগ্রাম ব্লক –২	২	–	২	৬	১	৭	৩	–	৩	-	–	–	–	–	–	–	–	–	১২
৭	ভাতার ব্লক	৫	-	৫	১৬	৪	২০	৯	১	১০	–	–	–	১	–	১	–	–	-	৩৬
৮	গলসি ব্লক – ১	১	–	১	৭	–	৭	৩	-	৩	১	–	১	১	–	১	–	–	–	১৩
৯	গলসি ব্লক – ২	২	–	২	১১	১	১২	১	-	১	৩	১	৪	–	–	–	–	–	–	১৯
১০	জামালপুর ব্লক	৬	-	৬	১৪	৩	১৭	১০	৩	১৩	১	–	১	১	–	১	–	–	–	৩৮
১১	মেমারি ব্লক –১	২	–	২	১০	৪	১৪	৩	–	৩	১	–	১	–	–	–	১	–	১	২০
১২	মেমারি মিউনিসিপ্যালিটি	১	১	২	১	–	১	–	-	–	-	–	-	১	–	১	–	-	–	৪
১৩	মেমারি ব্লক - ২	৩	–	৩	১২	৩	১৫	৪	-	৪	–	–	–	২	–	২	–	–	–	২৪
১৪	খণ্ডঘোষ ব্লক	২	–	২	১৩	–	১৩	৪	১	৫	২	-	২	–	১	১	–	–	–	২৩
১৫	রায়না ব্লক – ১	৩	–	৩	১৩	২	১৫	৩	১	৪	–	–	-	১	–	১	–	–	–	২৩
১৬	রায়না ব্লক - ২	৫	–	৫	৯	–	৯	১০	৩	১৩	১	–	১	–		–	–	–	-	২৮
		৪৪	৪	৪৮	১৫৩	২৮	১৮১	৬৮	১৫	৮৩	১০	১	১১	৯	১	১০	১	-	১	৩৩৪

উচ্চমাধ্যমিক - ৪৮
মাধ্যমিক - ১৮১
জুনিয়র হাই - ৮৩
হাই মাদ্রাসা - ১১
জুনিয়র হাই মাদ্রাসা - ১০
সিনিয়র হাই মাদ্রাসা - ১
মোট - ৩৩৪

ক - ছেলেদের
খ - মেয়েদের
গ - মোট

সারণী - ১২

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা (আসানসোল মহকুমা)

ক্রমি নং	মিউনিসিপ্যালিটি / ব্লক	উচ্চ মাধ্যমিক			মাধ্যমিক			জুনিয়র হাই			হাই মাদ্রাসা			জুনিয়র হাই মাদ্রাসা			সিনিয়র হাই মাদ্রাসা			মোট
১	২	৩ক	৩খ	৩গ	৪ক	৪খ	৪গ	৫ক	৫খ	৫গ	৬ক	৬খ	৬গ	৭ক	৭খ	৭গ	৮ক	৮খ	৮গ	
১	আসানসোল মিউনিসিপ্যালিটি	৯	৪	১৩	১৯	১১	৩০	৮	২	১০	–	–	–	–	–	–	–	–	–	৫৩
২	বারাবনি ব্লক	১	–	১	২	১	৩	৪	–	৪	–	–	–	–	–	–	–	–	–	৮
৩	জামুরিয়া মিউনিসিপ্যালিটি	২	–	২	৭	১	৮	৪	১	৫	–	–	–	–	–	–	–	–	–	১৫
৪	জামুরিয়া ব্লক–২	–	–	–	৫	১	৬	১	–	১	–	–	–	–	–	–	–	–	–	৭
৫	কুলটি মিউনিসিপ্যালিটি	৬	১	৭	৭	৪	১১	৩	১	৪	–	–	–	–	–	–	–	–	–	২২
৬	রাণীগঞ্জ ব্লক	–	–	–	৪	–	৪	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	৪
৭	রাণীগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটি	৩	১	৪	২	৪	৬	১	–	১	–	–	–	–	–	–	–	–	–	১১
৮	সালানপুর	–	–	–	৫	৩	৮	১	–	১	–	–	–	–	–	–	–	–	–	৯
		২১	৬	২৭	৫১	২৫	৭৬	২২	৪	২৬										১২৯

ক - ছেলেদের
খ - মেয়েদের
গ - মোট

উচ্চ মাধ্যমিক ২৭
মাধ্যমিক ৭৬
জুনিয় হাই ২৬
মোট ১২৯

সারণী - ১৩

মাধ্যমিক / জুনিয়র হাই / সিনিয়র মাদ্রাসা																				
ঃ দুর্গাপুর মহকুমা ঃ																				
ক্রমি নং	মিউনিসিপ্যালিটি / ব্লক	উচ্চ মাধ্যমিক			মাধ্যমিক			জুনিয়র হাই			হাই মাদ্রাসা			জুনিয়র হাই মাদ্রাসা			সিনিয়র হাই মাদ্রাসা			মোট
১	২	৩ক	৩খ	৩গ	৪ক	৪খ	৪গ	৫ক	৫খ	৫গ	৬ক	৬খ	৬গ	৭ক	৭খ	৭গ	৮ক	৮খ	৮গ	
১	দুর্গাপুর মিউনিসিপ্যালিটি	৭	১	৮	১২	৪	১৬	২	১	৩	–	–	–	–	–	–	–	–	–	২৭
২	অণ্ডাল ব্লক	৪	–	৪	১০	৩	১৩	৬	–	৬	–	–	–	–	–	–	–	–	–	২৩
৩	আউসগ্রাম ব্লক-২	–	–	–	৩	–	৩	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	-	৩
৪	দুর্গাপুর – ফরিদপুর	২	–	২	৬	–	৬	৩	–	৩	–	–	–	–	–	–	–	–	–	১১
৫	গলসি ব্লক –১	১	–	১	৭	১	৮	–	-	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	৯
৬	কাঁকসা	২	–	২	৮	২	১০	৭	–	৭	–	–	–	–	–	–	–	–	–	১৯
		১৬	১	১৭	৪৬	১০	৫৬	১৮	১	১৯	–	–	–	–	–	–	–	–	–	৯২

ক - ছেলেদের
খ - মেয়েদের
গ - মোট

উচ্চ মাধ্যমিক ১৭
মাধ্যমিক ৫৬
জুনিয় হাই ১৯
মোট ৯২

সারণী - ১৪

কালনা মহকুমা																				
স্কুলের সংখ্যা																				
ক্রমি নং	মিউনিসিপ্যালিটি / ব্লক	উচ্চ মাধ্যমিক			মাধ্যমিক			জুনিয়র হাই			হাই মাদ্রাসা			জুনিয়র হাই মাদ্রাসা			সিনিয়র হাই মাদ্রাসা			মোট
১	২	৩ক	৩খ	৩গ	৪ক	৪খ	৪গ	৫ক	৫খ	৫গ	৬ক	৬খ	৬গ	৭ক	৭খ	৭গ	৮ক	৮খ	৮গ	
১	কালনা মিউনিসিপ্যালিটি	২	১	৩	২	২	৪	১	–	১	–	–	–	–	–	–	–	–	–	৮
২	কালনা ব্লক - ১	৪	–	৪	৬	৩	৯	৬	১	৭	–	–	–	১	–	১	–	–	–	২১
৩	কালনা ব্লক - ২	২	–	২	৬	৩	৯	৪	১	৫	–	–	–	–	–	–	–	–	–	১৬
৪	মন্তেশ্বর ব্লক	৬	–	৬	১২	২	১৪	১৪	৪	১৮	–	–	–	–	–	–	–	–	–	৩৮
৫	পূর্বস্থলী ব্লক - ১	২	–	২	৬	১	৭	৬	১	৭	–	–	–	–	–	–	–	–	–	১৬
৬	পূর্বস্থলী ব্লক - ২	৩	-	৩	১১	২	১৩	৩	–	৩	–	–	–	–	–	–	–	–	–	১৯
		১৯	১	২০	৪৩	১৩	৫৬	৩৪	৭	৪১	–	–	–	১	–	১	–	–	–	১১৮

ক - ছেলেদের
খ - মেয়েদের
গ - মোট

উচ্চ মাধ্যমিক	২০
মাধ্যমিক	৫৬
জুনিয় হাই	৪১
জুনিয়র মাদ্রাসা	১
মোট	১১৮

সারণী-১৫

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা (কাটোয়া মহকুমা)

ক্রমি নং	মিউনিসিপ্যালিটি / ব্লক	উচ্চ মাধ্যমিক			মাধ্যমিক			জুনিয়র হাই			হাই মাদ্রাসা			জুনিয়র হাই মাদ্রাসা			সিনিয়র হাই মাদ্রাসা			মোট
১	২	৩ক	৩খ	৩গ	৪ক	৪খ	৪গ	৫ক	৫খ	৫গ	৬ক	৬খ	৬গ	৭ক	৭খ	৭গ	৮ক	৮খ	৮গ	
১	কাটোয়া মিউনিসিপ্যালিটি	৩	১	৪	১	২	৩	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	৭
২	কাটোয়া ব্লক –১	১	–	১	৮	১	৯	৬	–	৬	–	–	–	–	–	–	১	–	১	১৭
৩	কাটোয়া ব্লক –২	১	–	১	১১	১	১২	১	–	১	১	–	১	১	–	১	–	–	–	১৬
৪	দাঁইহাট মিউনিসিপ্যালিটি	১	–	১	১	১	২	২	–	২	–	–	–	–	–	–	–	–	–	৫
৫	কেতুগ্রাম ব্লক –১	৩	–	৩	১০	১	১১	১	২	৩	২	–	২	২	–	২	১	–	১	২২
৬	কেতুগ্রাম –২	১	–	১	৭	–	৭	৪	১	৫	–	–	–	–	–	–	–	–	–	১৩
৭	মঙ্গলকোট ব্লক	৪	–	৪	১৭	২	১৯	৪	১	৫	১	–	১	–	–	–	–	–	–	২৯
		১৪	১	১৫	৫৪	৮	৬৩	১৮	৪	২২	৪	–	৪	৩	–	৩	২	–	২	১০৯

ক - ছেলেদের
খ - মেয়েদের
গ - মোট

উচ্চ মাধ্যমিক	১৫
মাধ্যমিক	৬৩
জুনিয় হাই	২২
হাই মাদ্রাসা	৪
জুনি. হাই মাদ্রাস	৩
সিনি. হাই মাদ্রাস	২
মোট	১০৮

বিঃ দ্রঃ ২০০০ সালে ২৭টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, উচ্চমাধ্যমিকে পরিণত হয়েছে। এর ৩৪টি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় উচ্চমাধ্যমিকে উন্নীত হয়েছে।

জেলায় যে সব হাই স্কুল শতবর্ষ পূর্ণ করেছে

	থানা	স্কুল	প্রতিষ্ঠার তারিখ
১।	মেমারী	মেমারী বিদ্যাসাগর মেমোরিয়াল ইনস্‌টিটিউশন	১৬.১২.১৮১৮
২।	বর্ধমান	বর্ধমান রাজ কলেজিয়েট স্কুল	১৮৫৪
৩।	কাঁকসা	গোপালপুর উচ্চ বিদ্যালয়	১৮৫৪
৪।	কাটোয়া	ওকরসা উচ্চ বিদ্যালয়	১৮৫৬
৫।	গলসী	গলসী উচ্চ বিদ্যালয়	১৮৫৬
৬।	কালনা	বাদলা উচ্চবিদ্যালয়	১৮৫৬
৭।	রাণীগঞ্জ	শিয়ারসোল রাজ স্কুল	১৮৫৬
৮।	জামালপুর	সারদাপ্রসাদ ইনস্‌টিটিউশন, চকদীঘি	১৮৫৭
৯।	মেমারী	মধ্যমগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়	জানুয়ারী, ১৮৫৭
১০।	কাটোয়া	কাশীরামদাস ইনস্‌টিটিউশন	১৮৫৮
১১।	অণ্ডাল	উখড়া কুঞ্জবিহারী ইনস্‌টিটিউশন	১৮৫৯
১২।	রাণীগঞ্জ	রাণীগঞ্জ উচ্চবিদ্যালয়	১৮৬৭
১৩।	কালনা	মহারাজা উচ্চবিদ্যালয়	১৮৬৮
১৪।	মেমারী	রসুলপুর উচ্চবিদ্যালয়	১৮৭৬
১৫।	মেমারী	ভৈটা হরিদাস কর উচ্চবিদ্যালয়	১৮৭৮
১৬।	গলসী	মানকর উচ্চ বিদ্যালয়	১৮৮০
১৭।	কুলটি	কুলটি উচ্চ বিদ্যালয়	১৮৮৩
১৮।	বর্ধমান	মিউনিসিপ্যাল উচ্চ বিদ্যালয়	১৮৮৩
১৯।	ভাতার	নাসিগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়	১৮৮৪
২০।	জামালপুর	আঝাপুর উচ্চবিদ্যালয়	১৮৮৫
২১।	জামালপুর	জামালপুর উচ্চ বিদ্যালয়	১৮৮৫
২২।	কাটোয়া	দাঁইহাট উচ্চ বিদ্যালয়	১৮৮৭
২৩।	ভাতার	বনপাশ শিক্ষানিকেতন	১৮৮৭
২৪।	পূর্বস্থলী	পূর্বস্থলী ব্রতচারী ইনস্‌টিটিউশন	অজ্ঞাত
২৫।	কুলটি	ডিসেরগড় অম্বিকা চরণ ইনস্‌টিটিউশন	১৮৯০
২৬।	রায়না	মেরাল উচ্চ বিদ্যালয়	১৮৯০
২৭।	মন্তেশ্বর	পুটশুরী ঈশ্বর প্রসন্ন উচ্চ বিদ্যালয়	১৮৯১
২৮।	খণ্ডঘোষ	তোড়কোনা জগবাবু উচ্চ বিদ্যালয়	১৮৯৪
২৯।	রায়না	রায়না উচ্চ বিদ্যালয়	১৮৯৪
৩০।	খণ্ডঘোষ	শাঁখারি উচ্চ বিদ্যালয়	১৮৯৬
৩১।	পূর্বস্থলী	পাটুলী উচ্চ বিদ্যালয়	১৮৯৮
৩২।	আসানসোল	আসানসোল ই.আই.আর. উচ্চ বিদ্যালয়	১৮৯৮

৩৩।	ভাতার	শুসুনদীঘি এইচ.পি. উচ্চ বিদ্যালয়	১৮৯৮
৩৪।	জামালপুর	চকদীঘি এস.পি. ইনসিটিউশন	১৮৫৭
৩৫।	কুলটি	ডিসেরগড় এ.সি. ইনস্‌টিটিউশন	১৮৯৫
৩৬।		উখড়া কে.বি. ইনস্‌টিটিউশন	১.১.১৯০১
৩৭।	কাটোয়া	ওকারসা হাই স্কুল	১৫.৩.১৯০১
৩৮।	মঙ্গলকোট	মাথরুন এন.সি. ইনস্‌টিটিউশন	১৯০০

অনেক স্কুলের প্রতিষ্ঠার তারিখ ও সরকারী অনুমোদনের তারিখ এক নয় এবং অনুমোদনের ব্যাপারটিও বিভিন্নস্তরে হওয়ায় এখানে হয়তো কিছু স্কুলের উল্লেখ নেই।

উচ্চ শিক্ষা ঃ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়

বর্ধমানের মহারাজার অসামান্য দান — মূল প্রাসাদ, গোলাপবাগ, তারাবাগের মত অপরূপ সুসজ্জিত সুদৃশ অঞ্চল — যেখানে গড়ে উঠেছে আজকের বর্ধমানের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়। মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে গড়ে ওঠা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মকাল ১৯৬০ এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন শ্রী সুকুমার সেন।

উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বর্ধমান জেলায় বর্ধমান রাজ প্রতিষ্ঠিত বর্ধমান রাজ কলেজ প্রাচীনতম কলেজ। শুধু তাই নয়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত কলেজগুলির মধ্যেও অন্যতম প্রাচীন কলেজ। বর্ধমান রাজ কলেজের আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত তিনটি মাত্র কলেজ ছিল — হুগলী কলেজ, শ্রীরামপুর কলেজ আর মেদিনীপুর কলেজ।

১৮১৭ সালে বর্ধমানের রাজা তেজ চাঁদ বাহাদুর প্রতিষ্ঠিত অ্যাংলো ভার্নাকুলার স্কুলটি ১৮৬৮ সালে উচ্চ বিদ্যালয় এবং ১৮৮১ সালে আবচাঁদ বাহাদুরের আমলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ইন্টার মিডিয়েট কলেজ হয় এবং ওই কলেজ ১৮৮২ সালে অনুমোদন পায়। বর্ধমান মহারাজা ১৯৫৬ সাল পর্য্যন্ত এই কলেজের সমস্ত দায় ভাগ গ্রহণ করেন। তারপর ওই বছরই কলেজটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্পনসর্ড কলেজ রূপে পরিগণিত হয়। ১৯৬০ সালে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর এই কলেজটি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত কলেজ রূপে পরিগণিত হয়। বর্ধমান রাজ পরিবারের আনুকূল্যে এই কলেজে সেই সময়ে বাংলাদেশ, বিহার, আসামের বহু মেধাবী ছাত্র বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ পেত। ১৯২৭ সালে কলা বিভাগে স্নাতক পর্য্যায়ে পঠন পাঠন সুরু হয়। ১৯৩৬ সালে আই. এস. সি ও ১৯৩৭ সালে বি.এস.সি. পড়ান সুরু হয়।

এই কলেজটি সহ-শিক্ষা মূলক। ছেলেদের জন্য তিনটি ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু মেয়েদের জন্য তা-ও ছিলনা। স্বাধীনতার আগে আরও দুটি কলেজ স্থাপিত হয়েছিল। ১৯৪৩ সালে স্থানীয় জনসাধারণের প্রচেষ্টায় কালনা কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়। আসানসোলে বনোয়ারীলাল ভালোটিয়া কলেজ ১৯৪৪-৪৫ সালে স্থানীয় জনসাধারণের সক্রিয় ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় এবং আসানসোল পৌরসভার তৎকালীন সভাপতি জে.এন. রায়ের

নেতৃত্বে কলেজটি স্থাপিত হয়।

এই পরিসংখ্যান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময় বর্ধমান জেলায় তিনটি কলেজ রয়েছে – বর্ধমান রাজ কলেজ, কাটোয়া কলেজ, আসানসোল বি.বি. কলেজ। ১৯৫০-৫১ সালে জেলায় কলেজের সংখ্যা দাঁড়ায় ৬, এর মধ্যে ৫টি ছেলেদের, ১টি মেয়েদের। এই নতুন কলেজগুলি হচ্ছে রায়না থানায় (১) শ্যামসুন্দর কলেজ (১৯৪৮), (২) কাটোয়া কলেজ, (১৯৪৮), (৩) মণিমালা গার্লস কলেজ (১৯৫০) - -আসানসোলে। বর্তমানে এই কলেজটির নাম আসানসোল গার্লস কলেজ। এই তিনটি কলেজও আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছিল এবং পরে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আসে। ১৯৭১ সালে বর্ধমান জেলায় বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় অধীনস্থ ১২টি কলেজ ছিল। এইসব ডিগ্রী কলেজে কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগ ছিল। এই ১২টি কলেজের মধ্যে বর্ধমান শহরে তিনটি – ২টি ছাত্রদের (রাজ কলেজ, বিবেকানন্দ কলেজ, ১টি মহিলাদের কলেজ (এম.ইউ.সি. মহিলা কলেজ)। আসানসোল শহরে তিনটি কলেজ ছিল তার মধ্যে একটি মহিলা কলেজ। অন্য কলেজগুলি হচ্ছে, কালনায় ১টি, কাটোয়ায় ১টি, রাণীগঞ্জে ১টি, দুর্গাপুরে ১টি, শ্যামসুন্দরে ১টি, গুসকরায় ১টি। এই কলেজগুলির মধ্যে দুর্গাপুরের কলেজটি সরকারী কলেজ। বাকিগুলি সরকার অনুমোদিত। ছাত্রছাত্রী বৃদ্ধির জন্য এই কলেজগুলির কয়েকটিতে সকাল এবং সান্ধ্য ক্লাসও খোলা হয়।

পরবর্তীকালে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যেসব কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেগুলি হলো (১) আসানসোল বিধানচন্দ্র কলেজ, (২) মেমারি কলেজ, (৩) হাটগোবিন্দপুর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত কলেজ, (৪) চন্দ্রপুর কলেজ (৫) চিত্তরঞ্জনে দেশবন্ধু মহাবিদ্যালয় (৬) দুর্গাপুরে মাইকেল মধুসূদন দত্ত কলেজ, (৭) মানকর কলেজ, (৮) নজরুল মহাবিদ্যালয় (৯) রাণীগঞ্জ গার্লস কলেজ, (১০) খান্দরা কলেজ।

বর্ধমানের কলেজগুলি হল (১) আসানসোল গার্লস কলেজ, (২) আসানসোল বি.বি. কলেজ, (৩) আসানসোল বি.সি. কলেজ, (৪) আসানসোল পলিটেকনিক, (৫) আসানসোল হোমিওপ্যাথী কলেজ (৬) বর্ধমান রাজ কলেজ (৭) বর্ধমান হোমিওপ্যাথী কলেজ (৮) ভূপেন্দ্রদত্ত কলেজ – হাটগোবিন্দপুর (৯) বর্ধমান মেডিকেল কলেজ (১০) চন্দ্রপুর কলেজ (১১) দেশবন্ধু মহাবিদ্যালয় – চিত্তরঞ্জন (১২) দুর্গাপুর গভঃ কলেজ (১৩) গুসকরা মহাবিদ্যালয় (১৪) আই. টি. আই – দুর্গাপুর (১৫) কালনা কলেজ (১৬) কাটোয়া কলেজ (১৭) কন্যাপুর পলিটেকনিক (১৮) মাইকেল মধুসূদন দত্ত কলেজ- -দুর্গাপুর, (১৯) মানকর কলেজ (২০) এম.বি.সি. ইনস্‌টিটিউট অব্ টেকনোলজি, বর্ধমান (২১) মেমারি কলেজ (২২) নজরুল মহাবিদ্যালয় (২৩) পদ্মজা নাইডু কলেজ অব মিউজিক, বর্ধমান (২৪) রাণীগঞ্জ গার্লস কলেজ (২৫) আর.ই. কলেজ – দুর্গাপুর (২৬) শ্যামসুন্দর কলেজ (২৭) টি.ডি.বি. কলেজ, রাণীগঞ্জ (২৮) উদয়চাঁদ উইমেন্স কলেজ, বর্ধমান (২৯) বিবেকানন্দ কলেজ, বর্ধমান (৩০) খাঁন্দরা কলেজ। ২০০০ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে আরও ৮০টি কলেজ অনুমোদন পেয়েছে।

১৯৬০ সালে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর বর্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলী, পুরুলিয়া এবং বীরভূমের (বিশ্বভারতী এলাকা ছাড়া) সমস্ত কলেজ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আসে। ১৯৬৪ সালের মধ্যে ৩টি বৃত্তি শিক্ষার কলেজ

(১) রিজিওনাল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ-দুর্গাপুর, (২) কলেজ অব টেকস্‌টাইল টেকনোলজি - শ্রীরামপুর, (৩) গভঃ ট্রেনিং কলেজ – এই সব নিয়ে সংখ্যাটি ৩৫-এ দাঁড়ায়। ১৯৬৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট (১৯৫৯) সংশোধনের ফলে হুগলী জেলার শ্রীরামপুর মহকুমার কলেজগুলি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভূক্ত করে দেওয়া হয়।

১৯৭১ সালে পরিসংখ্যানে দেখা যায় এই বছর ১লা এপ্রিল বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় অধীন সাধারণ শিক্ষার (কলা ও বিজ্ঞান) জন্য অনুমোদিত ৩৯টি কলেজ এবং ৬টি বি.টি. কলেজ রয়েছে। এর মধ্যে ১২টি সাধারণ শিক্ষার কলেজ এবং ১টি বি.টি. কলেজ বর্ধমান জেলার। পরবর্তী কালে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কাটোয়া এবং কালনা কলেজকে বি.টি. পড়ানোর অনুমতি দেয়।

সাধারণ শিক্ষার জন্য স্নাতক কলেজ এবং শিক্ষক শিক্ষণ কলেজ ছাড়া বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় পরবর্তীকালে ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, ল-কলেজ, মেডিকেল কলেজ এবং পদ্মজা নাইডু মিউজিক কলেজের অনুমোদন দেয়।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত কলেজের সর্বশেষ তথ্য যা পাওয়া গেছে (২০০১ সালের প্রথম দিকের) তা এই রকম ঃ

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত কলেজের সংখ্যা ১০১টি। এর মধ্যে বর্ধমান জেলার কলেজ সংখ্যা ৩৮টি।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত ১০১টি কলেজগুলির অবস্থান ঃ

বর্ধমান – ৩৮ হুগলী –২১
বীরভূম – ১২ পুরুলিয়া – ১৪
বাঁকুড়া – ১৫ মেদিনীপুর – ১

এই সব কলেজগুলির মধ্যে ডিগ্রী কলেজ ৮২টি, বি.এড. কলেজ ৬টি, পি.এড কলেজ ১টি, মেডিকেল কলেজ ২টি, ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ ৬টি, মিউজিক কলেজ ১টি হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ৪টি।

১৯৬৩-৬৪ সালের মধ্যে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ১০টি বিষয়ে স্নাতকোত্তর বিভাগ চালু করে এবং বিজ্ঞান ও সাহিত্যের গবেষণারও সুযোগ এনে দেয়। ১৯৬০-৬১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীগুলিতে কেবল ১৯৩ জন ছাত্রছাত্রী কলাবিভাগে পড়াশোনা করতো। ১৯৬১-৬২ সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৪১৪ যার মধ্যে ৩৭৬ জন কলা বিভাগে ও ৩৯ জন বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রী। ১৯৬৩-৬৪ সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৭৪ এর মধ্যে ৪৪৫ জন কলা বিভাগে, ১৬০ জন বিজ্ঞান বিভাগে এবং ৬৯

জন বাণিজ্য বিভাগের ছাত্রছাত্রী ছিল।

নবযুগের সঙ্গে তাল রাখতে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ও অন্যান্য উন্নতমানের বিশ্ববিদ্যালয়ের মত নতুন নতুন কোর্স চালু করে চলেছে। সেপ্টেম্বর (২০০০) মাসে বর্ধমান কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তায় সমবায় সংস্থা "দিশারী" সাইবার রিসার্চ এ্যাণ্ড ট্রেনিং ইনস্‌টিটিউট চালু করলো। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় এই ইনস্‌টিটিউটকে ব্যাচিলার অব কম্প্যুটার এপ্লিকেশন (বি.সি.এ.) কোর্স পড়ানোর অনুমোদন দিয়েছে। ব্যাঙ্কের সহায়তায় কম্প্যুটার কলেজ গড়ে ওঠা এবং বিশ্ববিদ্যালয় তাকে অনুমোদন দেওয়া পশ্চিমবঙ্গে এই প্রথম। এছাড়া এবছর (২০০০ সাল) ব্যাচিলার অব বিজনেস এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন (বি.বি.এ.) কোর্স চালু হয়েছে। এগুলি বর্ধমানে ভাঙাকুঠি, রাজ কলেজে, আসানসোলে বি.বি. কলেজে, দুর্গাপুরে মাইকেল মধুসূদন কলেজে এবং দুর্গাপুরে 'প্রাইভেট' -এ পড়ান হচ্ছে ।

বর্ধমান জেলায় নেতাজী মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও ইন্দিরাগান্ধী মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানগুলিতেও ছাত্রছাত্রীরা উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে বিশদ তথ্যাবলি

স্নাতকোত্তর বিভাগ

কলাবিভাগ সমূহ (এম.এ, এম.কম, এম.বি.এ, এল.এল.এম. এবং এল.আই.এস)

বাংলা, ব্যবসা প্রশাসন, বাণিজ্য, অর্থনীতি, ইংরাজী, হিন্দি, ইতিহাস, আইন, গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান, দর্শন, রাষ্ট্রনীতি, সংস্কৃত, সমাজ বিদ্যা। সাংবাদিকতা ও জন সংযোগ।

বিজ্ঞান শাখা সমূহ (এম.এস.সি.)

উদ্ভিদ বিদ্যা, জীববিদ্যা, রসায়ন, ভূগোল, গণিত, পদার্থ বিদ্যা, পরিসংখ্যান বিদ্যা, ভূ-বিদ্যা, ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগ সমূহ (বি.ই. এম. টেক) কম্প্যুটার সায়েন্স।

বি.ই.

(সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, কেমিক্যাল, ইলেক্‌ট্রোনিকস্‌ কমিউনিকেশন)

এম.টেক.

(দুর্গাপুর আর.ই. কলেজে) বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত আসানসোল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ ও বাঁকুড়া উন্নয়নী ইনস্‌টিটিউটে ইঞ্জিনীয়ারিং-এর বিভিন্ন বিষয় পড়ান হয়।

চিকিৎসা

(এম.বি.বি.এস, এম.ডি.এম.এস) পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট ডি.জি.ও এবং পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট জি.ও. 'চক্ষু' বিভাগে ডিপ্লোমা, অ্যানাটমি, এবং বায়ো কেমিষ্ট্রিতে এম.ডি.

বিভিন্ন কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে ভোকেশনাল কোর্সে পড়ান হয়

(১) সেরিকালচার, (২) ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ফিশ এ্যাণ্ড ফিশারিশ, বায়োলজিক্যাল টেকনিক এ্যাণ্ড স্পেশিমেন প্রিপারেশন, কম্প্যুটার এ্যাপ্লিকেশন, সীড টেকনোলজি।

কলা বিভাগ - ফাংশনাল ইংলিশ

কলা ও বাণিজ্য বিভাগ - অফিস ম্যানেজমেন্ট, এ্যাডভাটাইজমেন্ট সেল্‌স্ ও প্রমোশন।

বিদেশী ভাষা – ফরাসি, রাশিয়ান ও জার্মানি

প্রশিক্ষণ ঃ (ডব্লু, বি.সি.এস., ইন্ডাষ্ট্রিয়াল রিলেসন্‌স্ এ্যাণ্ড পারসোনাল ম্যানেজমেন্ট)

বি.এড. (সায়েন্স)

বি.পি.এড.

বি.এল.আই.এস.

কম্প্যুটার এপ্লিকেশন ও অফিস ম্যানেজমেন্ট (বেকার মহিলাদের জন্য)।

এছাড়াও বহিরাগত পরীক্ষার্থী হিসাবে বিভিন্ন বিষয়ে স্নাতকোত্তর পরীক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে। তেমনি করস্‌পণ্ডেন্স কোর্সে পরীক্ষা দেওয়া যায় (ইংরাজি, বাংলা, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন ও বাণিজ্য শাখায়)

১ বছরের ব্রীজ কোর্স ঃ (১০+২+২) – কলা বিভাগ অর্থনীতি সংস্কৃত বাদে বাণিজ্য, গণিত, সমাজ বিজ্ঞান, প্রকৃতিবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান। (এই কোর্সটি সারা ভারতবর্ষে প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থা (১০+২+২) এর উপযোগী করার জন্য।

<u>এছাড়াও আছে, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় গ্রামীণ কারিগরী কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ</u>

যেমন,

(১) বিজ্ঞান ভিত্তিক হাঁসচাষ (খাঁকি ক্যাম্পবেল / ডিনোভা সুপার এম/সাদা পেকিং)
– সপ্তাহে ৩দিন ৩ মাস। কোর্স ফি ৫০০ টাকা

(২) মাসরুম চাষ – সপ্তাহে ২দিন ২ মাস

(৩) ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কম্যান পারমিট পার্ট ১(বি) – ৩ মাস

(৪) ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্‌স যন্ত্রাবলীর রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতি – ৩ মাস

(৫) ডেস্ক টপ প্রিন্টিং (বাংলা অক্ষরে) – ৬ মাস

(৬) কম্পিউটার ('০' স্তর থেকে উচ্চতর) – ৬ মাস
(৭) মাছ চাষ (বর্ষাকালে) – ৩ মাস
(৮) বায়োফার্টিলাইজার (কেঁচো, জীবাণু, অ্যাজোলা ও নীল সবুজ শ্যাওলা) – ১ মাস

এছাড়া রেশমচাষ, ওষধি বৃক্ষ / লতা, অপ্রচলিত শক্তি (সৌরশক্তি ইত্যাদি) বিষয়ে প্রশিক্ষণের প্রস্তুতি চলছে।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিভাগে কতগুলি করে ছাত্রছাত্রী ভর্তি হতে পারে তার একটি পরিসংখ্যান যতটুকু সংগ্রহ করতে চেষ্টা করেছি তা নিচে দেওয়া হল ঃ

এম. এ. (পার্ট I, পার্ট II) –
বাংলা, ইংরাজি, ইতিহাস, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, দর্শন – ৮০X২ = ১৬০X৫ = মোট ৮০০ ছাত্রছাত্রী
সংস্কৃত ৬০ X ২ = ১২০
সমাজ বিজ্ঞান ৪০ X ২ = ৮০
অর্থনীতি ৬০ X ২ = ১২০
এম. কম. (পার্ট I পার্ট II) ৮০ X ২ = ১৬০
এম.এস.সি. (পার্ট I পার্ট II)
পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, উদ্ভিদবিদ্যা, জীববিদ্যা, ভূগোল ৩৬X২=৭২X৫= মোট ৩৬০ জন
গণিত ৮০ X ২ = ১৬০
পরিসংখ্যান বিভাগ ২০ X ২ = ৪০
ভূ-বিদ্যা (দুর্গাপুর গভঃ কলেজ) ১০ X ২ = ২০
ফিজিওলজি (হুগলী মহসিন কলেজে পড়ান হয়) ১৫ X ২ = ৩০
এম.এ. রাষ্ট্রবিজ্ঞান (হুগলী মহসিন কলেজ) ৪০ X ২ = ৮০
এল.এল.বি. (হুগলী মহসিন কলেজে) ৪০ X ৩ = ১২০ জন (৩ বছরের জন্য)
এল.এল.বি. (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়) ৮০ X ৩ = ২৪০ জন (৩ বছরের কোর্স)
এল.এল.এম. (পার্ট I পার্ট II) ১০ X ২ = ২০
বি.এল.আই.এস – ৪০
এম.এল.আই.এস.– ১০ টি
এম.বি.এ.– ২৫ X ২ = ৫০
সাংবাদিকতা – ২৫
এম.ফিল (জীববিদ্যা, পরিবেশ বিজ্ঞান, বাংলা, ইংরাজি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, বাণিজ্য) ১০ X ৮ = ৮০
এম. টেক (মাইক্রোওয়েভ) ১০
এম. সি. এ. – ২০
চিকিৎসা – এখানে ৫০টি সিট ছিল এ বছর (২০০০ সাল) সম্প্রতি এম.সি.আই পরিদর্শনের পর আরও ৫০টি সিট বেড়ে ৫০+৫০=১০০ টি সিট হয়েছে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করতে পারি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আরও একটি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ চালু হয়েছে ২০০০ সালেই।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত কলেজ সমূহের সংখ্যা ঃ (১৯৯১)

ডিগ্রী কলেজ – ৭৪, বি. এড. কলেজ – ৬, পি. এড. কলেজ – ১, মেডিকেল কলেজ -২, ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ – ৩ +১ (১টি '৯১ সালের পর), মিউজিক কলেজ ১, হোমিওপ্যাথী কলেজ – ২ +২ (শেষের দু'টি পুরুলিয়া ও খড়গপুরে সম্প্রতি অনুমোদিত)

জেলা ভিত্তিক অবস্থান

বর্ধমান - ৩১, বীরভূম-১২, বাঁকুড়া-১৪, হুগলী - ২১, পুরুলিয়া - ১২, মেদিনীপুর-১

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত কলেজের সর্বশেষ তথ্য যা পাওয়া গেছে (২০০১ সালের প্রথম দিকের) তা এই রকম ঃ

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত কলেজের সংখ্যা ১০১টি। এর মধ্যে বর্ধমান জেলার কলেজ সংখ্যা ৩৮।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত ১০১টি কলেজগুলির অবস্থান

বর্ধমান – ৩৮	হুগলী –২১
বীরভূম – ১২	পুরুলিয়া – ১৪
বাঁকুড়া – ১৫	মেদিনীপুর – ১

এই সব কলেজগুলির মধ্যে ডিগ্রী কলেজ ৮২টি, বি. এড. কলেজ ৬টি, পি.এড. কলেজ ১টি, মেডিকেল কলেজ – ২টি, ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ – ৬টি, মিউজিক কলেজ –১টি, হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ – ৪টি।

নুতন শতাব্দীর প্রথম বছরে (২০০০ সালে) স্নাতকস্তরের মোট পরীক্ষার্থীর ও উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা নিচে দেওয়া হল

বি.এস.সি. (পার্ট-১)	মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	উত্তীর্ণদের সংখ্যা
৩ বছরের সাধারণ পার্ট-১ (২০০০, নতুন কোর্সে)	২৮৬৯	১৩৮৯
২ বছরের পাস (২০০০, পুরনো কোর্স)	১২০৩	৫২৪
৩ বছরের (অনার্স) পার্ট-১ (নতুন কোর্স)	২০৭৯	১১৭০
৩ বছরের (অনার্স) পার্ট-১ (পুরনো কোর্স)	৮৭৪	৬০৪
বি.কম. (পার্ট – ১)		
৩ বছরের পার্ট-১ (২০০০, নতুন কোর্স সাধারণ)	৫৫০০	২৭৮৬
২ বছরের পাসকোর্স (২০০০, পুরনো কোর্স)	১৯৩২	৭৮৭
৩ বছরের পার্ট-১ (অনার্স) (নতুন কোর্স)	১৭০৭	১৩৭১
৩ বছরের পার্ট-১ (অনার্স) (পুরনো কোর্স)	৩১৯	২০৪

বি.এ. পার্ট – ১

অনার্স-পার্ট-১ (২০০০, পুরনো কোর্স)	১২৯৪	৭৯৫
বি.এ.পাস (২ বছর) (২০০০, পুরনো কোর্স)	৪৭৯২	১৯০৬
৩ বছরের ডিগ্রী অনার্স (২০০০, নতুন কোর্স)	৭৬১৪	৬৩৬১
৩ বছরের ডিগ্রী সাধারণ (২০০০, নতুন কোর্স)	১৪৮৬৭	৮১৫২

বি.এস.সি. (পার্ট–২)	মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	উত্তীর্ণদের প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	মোট
	১৬৪২	২০১	১০৭৫	১২৭৬
বি.কম (পার্ট–২)	১২৯৭	৩৩	৭৮৯	৮২২
বি.এ. (পার্ট–২)	৫৭৫৭	১৯২	৪৬৯৬	৪৮৮৮

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে জন্মলগ্নে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ গতানুগতিক পাঠ্যক্রমের বাইরে গ্রামীণ স্থানীয় অঞ্চলের উৎপাদন ও উন্নয়নের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন বিষয়ে পাঠ্যসূচী প্রবর্তন করা হবে।

কোন কোন ক্ষেত্রে পাঠ্য তালিকা পরিবর্তনের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এখনও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ কোর্সই গতানুগতিক খাঁচে চলছে। এমনকি বর্ধমান জেলার সামগ্রিক ইতিহাস রচনাতেও বিশ্ববিদ্যালয় পিছিয়ে রয়েছে।

এসব সত্ত্বেও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে আমরা অহংকার করতে পারি। কারণ ২০০১ সালে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ''ন্যাক' এব নির্ধারিত মূল্যায়নে ''চারতারা'' আখ্যা পেয়েছে। এ-ও কম গৌরবের নয়।

প্রবন্ধের উপসংহারে ১৯৯৮ সালে বর্ধমান জেলার বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা ও শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যার একটি পরিসংখ্যান নিচের সারণীতে তুলে ধরা হল। পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে বর্ধমান জেলার জনসংখ্যার তুলনায় সবধরনেরই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আরও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক শিক্ষিকার অনুপাতে দেখা যাচ্ছে আরও বেশি সংখ্যায় শিক্ষক শিক্ষিকা পদের অনুমোদন আশু প্রয়োজন। যুগের প্রয়োজনের তুলনায় বৃত্তিমূলক ও কারীগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা খুবই অপ্রতুল। অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানের অভাবে তার বিভাজন দেওয়া সম্ভব হলোনা। এমন কি ১৯৯৭-৯৮ সালে অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা কত ছিল তা-ও উল্লেখ করা গেল না। তথ্যসূত্রে কোন ভুল থাকলে তার দায় প্রবন্ধকারের উপর বর্তাবে না এই আশা রাখছি।

(সারণী - ১৬, ১৭)

সারণী - ১৬

বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান		ছাত্র ছাত্রী		শিক্ষকবৃন্দ	
	১৯৯৬-'৯৭	১৯৯৭-'৯৮	১৯৯৬-'৯৭	১৯৯৭-'৯৮	১৯৯৬-'৯৭	১৯৯৭-'৯৮
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১। প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৭৪১	৩৭৬৬	৫৮১৩৭১	৬১৭৯৩৭	১৩০৪০	১২৬৮৬
২। মিড্‌ল	১৯২	২০৫	৪৫৫১৬	৫৩৮০৩	১২৬৭	১২৪৫
৩। মাধ্যমিক	৪৭৮ (পি)	৪৪৯	২৭২২১০	২৯৯৮০৯	৬৯২৮	৬১১৩
৪। উচ্চমাধ্যমিক	১২৭	১২৭	১৩১৭২৭	১৪৬৭০৬	৪২৬০	৩৫১৬
৫। কলেজ (ডিগ্রী)	২৫	২৭	৩২৮০৭	৪০৩৯৯	১০৪০ (পি)	১৫২৩
৬। বৃত্তিমূলক ও কারীগরী শিক্ষা কেন্দ্র	১৮	১৮	৩৩৯৯	৩৮২৫	২৯৮	২৯৬
৭। অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	৯১০২	১৯৯৫	৫৪৯৭৯১	—	৯১০২	৩৯৯০

তথ্যসূত্র ঃ জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক অফিস (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক), সমাজ শিক্ষা দপ্তর বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সারণী - ১৭

কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সমূহের মোট বাজেট বরাদ্দ ও শিক্ষাখাতে ব্যয়ের খতিয়ান (১৯৫১-৫২ থেকে ১৯৯৬-৯৭) (কোটি টাকার হিসাবে)

	কেন্দ্রীয় সরকার			রাজ্য / কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চল সমূহ			কেন্দ্র রাজ্যসমূহ ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সমূহের মোট ব্যয়		
বছর	শিক্ষা খাতে ব্যয়	মোট বাজেট ব্যয়	শতাংশে হিসাব	শিক্ষা খাতে ব্যয়	মোট বাজেট ব্যয়	শতাংশের হিসাব	শিক্ষা খাতে মোট ব্যয়	মোট বাজেট ব্যয়	শতাংশের হিসাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১৯৫১ থেকে ৫২	৪.১০	৪০৪.৮০	১.০১	৬০.৪০	৪০৯ ৩০	১৪.৭৬	৬৪.৫০	৮১৪.১০	৭.৯২
১৯৬১ থেকে ৬২	২৬.০০	১,০৫১.৫০	২.৪৭	২৩৪.৩০	১,১৭৩ ৯০	১৯ ৯৬	২৬০.৩০	২,২২৫.৪০	১১.৭০
১৯৭১ থেকে ৭২	৭২.৩০	৬,০৬৮.৩০	১.১৯	৯২২ ৫০	৪,৫৪২.৬০	২০.৩১	৯৯৪.৮০	১০,৬১০.৯০	৯.৩৮
১৯৮১ থেকে ৮২	২৪০.৭০	২৩,৯৯৬.৪০	১.০০	৩ ৫৪৯.৪০	১৭,৭১৯ ৩০	২০.০৩	৩,৭৯০ ১০	৪১,৭১৫.৭০	৯.০৯
১৯৮৬ থেকে ৮৭	৬৪৮.২০	৪১,০৮৬.১০	১.৫৮	৭,৮০২.১০	৩৯,৩৬৮.৫০	১৯.৮২	৮,৪৫০.৩০	৮০,৪৫৪.৬০	১০.৫০
১৯৮৭ থেকে ৮৮	১,২০১.৮০	৪৬,৩৬৩ ০০	২.৫৯	৯,২২৮ ৪০	৪৬,১৫৫.৪০	১৯ ৯৯	১০,৪৩০.২০	৯২,৫১৮.৪০	১১.২৭
১৯৯১ থেকে ৯২	১,৭১৪.১০	৮২,৩০৮.০০	২.০৮	১৭,০৪৩.৫০	৮৮,০৬২.৪০	১৯.৩৫	১৮,৭৫৭.৬০	১৭০,৩৭০.৪০	১১.০১
১৯৯২ থেকে ৯৩	১,৭৯৭.৩০	৯২,৭০২.০০	১ ৯৪	১৯,১৫৫ ৭০	৯৭,৬২৫ ৫০	১৯.৬২	২০,৯৫৩.০০	১৯০,৩২৭.৫০	১১.০১
১৯৯৩ থেকে ৯৪	২,০৯৬.৩০	১০৮,১৬৯.০০	১ ৯৪	২১,৩১৬.৮০	১১০,৩৫৫.১০	১৯.৩২	২৩,৪১৩.১০	২১৮,৫২৪.১০	১০.৭১
১৯৯৪ থেকে ৯৫	২,৫৬৩.০১	১২২,১১২ ০০	২.১০	২৪,৬৬৭ ১৪	১২৯,৫৭৯.৯২	১৯ ০৪	২৭,২৩০.১৫	২৫১,৬৯১.৯২	১০.৮২
১৯৯৫ থেকে ৯৬	৩,৬৪৭.৯১	১৪৩,৫২২.০০	২.৫৪	২৮,৮১০.৭৭	১৪৯,৭৪৯.৪৮	১৯.২৪	৩২,৪৫৮.৬৮	২৯৩,২৭১.৪৮	১১.০৭
১৯৯৬ থেকে ৯৭	৪,৪৭৮.৪২	১৬১,৮২০.০০	২.৭৭	৩২,০৫০ ৮৭	১৬৩,৪৮৩.৮৪	১৯.৬০	৩৬,৫২৯.২৯	৩২৫,৩০৩.৮৪	১১.২৩

তথ্য : 'নীড ইনেশিয়েটিভ-১', এন. সি. সি. আই, নবাদিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত

উপসংহারে আমরা ১৯৫১-৫২ থেকে ১৯৯৬-৯৭ সাল পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চল সমূহের মোট বাজেট এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যয়ের একটি সারণী প্রকাশ করা হ'ল। এই সারণীতে দেখা যাচ্ছে শিক্ষার ব্যয় বেড়েছে ঠিকই কিন্তু দেশের জন সংখ্যার নিরিখে সকলের কাছে শিক্ষা পৌঁছে দেবার এবং উন্নততর শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য এই ব্যয় অত্যন্ত নগণ্য। পৃথিবীর মধ্যে নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা গরিষ্ঠ দেশগুলির মধ্যে ভারত অন্যতম দেশ বলে চিহ্নিত। আমাদের এই দেশে শিক্ষার আলোক বিস্তারের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার উভয়কেই শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যয় বরাদ্দকে সর্বাগ্রে এবং সর্ব্বোচ্চ প্রাধান্য দিতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে শিক্ষার বাজেটে অন্য রাজ্যের তুলনায় বেশি অর্থ বরাদ্দ থাকলেও বরাদ্দ অর্থের ৯৬ শতাংশ শিক্ষক, অশিক্ষক কর্মীদের বেতন বাবদ ব্যয় হয়ে যাচ্ছে, মাত্র ৪ শতাংশ প্রশাসনিক ও স্কুলের উন্নয়নের খাতে ব্যয় হয়। এর ফলে 'প্রশাসনিক উন্নতি ও শিক্ষার উন্নয়ন দুই-ই ব্যাহত হচ্ছে যা বর্ধমান জেলার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এছাড়া শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের জন্য যে পরিকাঠামো প্রয়োজন এ রাজ্যে তা ভীষণভাবে অবহেলিত। পরিকাঠামোগত দুরবস্থার কথা অশোকমিত্র কমিশনেও স্বীকার করা হয়েছে। ক্যাগ রিপোর্টেও একথা উল্লেখিত হয়েছে।

অধিকাংশ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক স্কুলেও না আছে প্রয়োজনীয় শ্রেণীকক্ষ, পাঠাগার, ল্যাবরেটরি, খেলার মাঠ, শৌচাগার, পানীয় জল এমন কি প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক। প্রাথমিকে সরকারী বই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পৌঁছায় না। প্রাথমিকের মূল্যায়ন এবং মাধ্যমিকের পরীক্ষা ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ। প্রাথমিকের সঙ্গে মাধ্যমিকের এবং মাধ্যমিকের সঙ্গে উচ্চমাধ্যমিকের পাঠ্যসূচীর অসঙ্গতি, জনসংখ্যাবৃদ্ধির সমহারে স্কুলের সংখ্যা না বাড়া – এর ফলে প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার এই তিনটি ধাপই দুর্বল হয়ে গেছে। জানা যায় বিশ্বব্যাঙ্কও মাধ্যমিক স্কুলগুলির উন্নয়নের জন্য সাহায্য দেবে।

উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে স্নাতকোত্তর সাধারণ শিক্ষা (এম.এ., এম. এস. সি., এম. কম) সারা ভারতের মধ্যে মাত্র ৫ শতাংশ অথচ ভারতের মোট জনসংখ্যার ৮ শতাংশের বাস এই পশ্চিম বাংলায়। ডাক্তারী, ইঞ্জিনীয়ারিং-এর আসন সংখ্যাও পশ্চিমবঙ্গে অন্য কয়েকটি রাজ্যের তুলনায় কম। ১৯৯৪ সালের একটি পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে সারা দেশে মোট ডাক্তারী আসনের মাত্র ৬.৬৭ শতাংশ পশ্চিমবঙ্গে এবং ইঞ্জিনীয়ারিং-এ আসনের সংখ্যা ৩.১৮ শতাংশ মাত্র। বর্ধমান জেলায় এ বছর (২০০০-২০০১) মেডিকেল আসন সংখ্যা ৫০টি বৃদ্ধি হলেও জেলার বিজ্ঞান শাখায় ছাত্রছাত্রীদের তুলনায় এই বৃদ্ধি যথেষ্ট নয়। অনুরূপভাবে জেলায় যে ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ ও বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা আছে তাও প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম।

তবে সবশেষে একটা কথা বলা যায় যে শিক্ষার সামগ্রিক এই যে চিত্র তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল হলেও যা আছে তাকে ইতিবাচক করান সামগ্রিক দায়ভাগ কিন্তু আজ

সবার। কেবল শিক্ষক-ছাত্র-অভিভাবক ও প্রশাসন – এই নিয়েই যদি শিক্ষার জগতের অস্তিত্ব নির্ভর করে তবে তা সমাজ জীবনে সামগ্রিকভাবে ব্যর্থ হতে বাধ্য। সর্বশ্রেণীর মানুষের আরও অনেক বেশী সজাগ ও সচেতন হওয়ার প্রয়োজন আছে। আজকে শৃঙ্খলার নামে শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্ক ক্রেতা সুরক্ষা আইনের দাঁড়ি পাল্লায় ওঠা নামা করে কিম্বা অসুস্থ প্রতিযোগিতা, রাজনৈতিক দাবা খেলা কিম্বা শিক্ষকের বাণিজ্য সত্তার বিস্তার যদি চলতেই থাকে তাহলে শিক্ষার বিপুল আয়োজন সত্ত্বেও তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। আজ রুগ্ন দুঃস্থ ছাত্রের জন্য কিম্বা স্কুলের জন্য হয়তো সহানুভূতির হাত বাড়ানোর খবর ক্বচিৎ কদাচিৎ চোখে পড়ে -- কিন্তু এই নৈতিক দায় ভাগ সমাজের সবাইকেই গ্রহণ করতে হবে। এ ব্যাপারে সর্বাগ্রে সরকারকেই এগিয়ে আসতে হবে সক্রিয়ভাবে প্রধান ভূমিকা নিয়ে, সেই সঙ্গে সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলি ও সর্বসাধারণ, বিশেষ করে শিক্ষিত মানুষকেই এগিয়ে আসতে হবে। ব্যক্তিগত উদ্যোগ কিম্বা যৌথ উদ্যোগ নিয়ে ক্ষয় গ্রস্ত সর্বস্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশে দাঁড়াতে হবে আমাদেরই। আজকে আমরা বিশ্বনাগরিকত্বের স্বপ্ন দেখছি কিন্তু এই উদ্দেশ্য তখনই সফল হবে যখন আমরাও এগিয়ে আসবো আন্তরিক প্রয়াস নিয়ে, পূর্ণ মানুষ গড়ার গুরু দায়িত্ব নিয়ে। নতুন প্রজন্মের কাছে এই মানবিক দায়বদ্ধতা আমরা ঝেড়ে ফেলতে পারিনা। কারণ এ আমার এ তোমার পাপ। ভারতবর্ষকে তৃতীয় বিশ্বের গ্লানি থেকে মুক্ত করার শপথ নিতে হবে আজ সবাইকেই।

তথ্যসূত্র

১) ডিষ্ট্রিকট্ গেজেটিয়ার – জে.সি.কে. পিটারসন
২) পশ্চিমবঙ্গ – বর্ধমান জেলা সংখ্যা, ১৪০৩
৩) পশ্চিমবঙ্গ প্রধান শিক্ষক সমিতির ৩৯তম রাজ্য সম্মেলনের স্মারকগ্রন্থ (১৯৯৮)
৪) বর্ধমান রাজ কলেজ শতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ ১৯৮১
৫) বর্ধমান জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক)-এর প্রকাশিত বিভিন্ন পুস্তিকা
৬) 'বুলেটিন' – পশ্চিমবঙ্গ প্রধান শিক্ষক সমিতি
৭) 'অভিযান সাময়িকী' – প্রবন্ধ সংখ্যা (শিক্ষা)
৮) জেলা ডি.পি.ই.পি. প্রকাশিত তথ্য পুস্তিকা
৯) **Key statistics of the District of Burdwan - 1998**
১০) 'লায়ন্স ডিষ্ট্রিক্ট গাইড' – সুধীর অধিকারী সম্পাদিত
১১) আনন্দ বাজার পত্রিকা ও বর্তমান পত্রিকার দু'একটি সংখ্যা
১২) **New Initiative -- L.C.C.I. -- New Delhi**
১৩) **Moments to Remember -- Burdwan Zilla Saksharata Samity**
১৪) স্মরণিকা ঃ বর্ধমান উৎসব – ১৪০৭

বর্ধমানের লোকায়ত সংস্কৃতি ঃ সেকাল - একাল

তুষার পণ্ডিত

শুরুর কথা

'লোকসংস্কৃতি' কথাটির আত্মপ্রকাশ খুব প্রাচীন নয়। 'Folklore' এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে কথাটি পেয়েছি। অবশ্য লোকশ্রুতি, লোকচর্চা, লোকবৃত্ত, লোককৃতি, লোকায়ন এসব নামেও তাকে চেনান হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'লোকযাত্রা'। 'Folk' কথাটির মান্য বাংলা 'লোক'। তথাকথিত ভদ্র সমাজের বিভাজিত সমাজ কাঠামোর তলানিতে যাদের কুণ্ঠিত অবস্থান - তারাই তো 'লোক'। এদের জীবনযাপন, জীবনচর্চা, লোকাচার, সৃজনকর্মকে বরাবরই দেখা হয়েছে টেরা চোখে। সংহত লোকায়ত সমাজের সমষ্টিগত জীবনাচরণের প্রেক্ষায় নিজস্ব প্রবাহে এই সংস্কৃতির জন্ম ও বেড়ে ওঠা। এককথায় নিরক্ষর লোকসমাজের অপরিশীলিত মননের গর্ভই তার উৎস। সমাজের তথাকথিত উচ্চকোটির মানুষের তথাকথিত উচ্চ-সংস্কৃতি থেকে তা স্বভাবত আলাদা। আবার একথাও ঠিক যে, দু'জাতীয় সংস্কৃতি কর্মের মধ্যে জল-অচল বিভাজন কখনো কষ্টকল্পিত মনে হয়। মনে রাখা প্রয়োজন, এখন যাকে লোকসংস্কৃতি নামে চিহ্নিত করা হচ্ছে, তার আত্মপ্রকাশ উচ্চ মার্গের শিল্প কর্মের জন্মেরও অনেক আগে। ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে বলা যেতে পারে, দুই রীতিই পরস্পরের কাছে ঋণী।

আদিম মানব সমাজ যেদিন বহুগোষ্ঠীর মিশ্রণে এক সংহত জীবিকাভিত্তিক জীবনযাপন পদ্ধতি গড়ে তুলেছিল, তাকে আমরা লোকসমাজ (Folk-Society) এর স্বীকৃতি দিয়েছি। সেদিন মানুষ বেঁচে থাকার তাগিদে যে সংস্কৃতির জন্ম দিল, সেই লোকসংস্কৃতির ভিত্তিস্থানে প্রোথিত হয়েছিল দুটি আকাঙ্ক্ষা। এক. অধিক শস্যফলন, দুই. প্রকৃতির সন্তুষ্টি বিধানের জন্যে আচার-অনুষ্ঠান। কিভাবে লোকায়ত মৌল আকাঙ্ক্ষা উৎসব-অনুষ্ঠানের রূপ ধরে লোকসংস্কৃতির প্রকাশ ঘটায়, সেটা একটি উদাহরণে প্রতিপন্ন হতে পারে। 'গাজন' বাংলাদেশের এমন একটি লোকায়ত জাতীয় উৎসব, যা ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে নানা নামে পরিচিত। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এটি হল কৃষিজীবি মানুষের বর্ষাবোধন উৎসব। অধিকতম শস্যফলনের আকাঙ্ক্ষা ও প্রার্থনায় মানুষ লালন করে চলেছে এই উৎসব। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, লোক-মানুষের মৌল বাসনাগুলির পরিপূর্ণতার জন্যে নানা উৎসব আচার-বিচারের পথ ধরে জন্ম নিয়েছে ছড়া, গান, ধাঁধা। এগুলিই পরবর্তীযুগে নৃত্যে, নাট্যে, কারুশিল্পে বিভিন্নরূপে প্রচলিত হয়েছে লোকসংস্কৃতির উপাদানরূপে। অর্থাৎ লোকাচার ও জীবনচর্চা প্রণালীর বিশিষ্টতাগুলি একত্রিত হয়ে নতুন চেহারা পেল লোকসংস্কৃতি। বলা ভালো, নিপীড়িত সমাজে লোকমানুষের শ্রমপ্রক্রিয়া, জীবন সংগ্রাম ও আশা-আকাঙ্ক্ষাই সুপ্রাচীনকাল থেকে লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির ধারায় বাহিত হয়ে আসছে। শুধু প্রাচীন ঐতিহ্যকে আত্মসাৎ করেই লোকসংস্কৃতি গড়ে ওঠে না; বরং সময়, সমাজ ও সমকালের উপাদানের মিথস্ক্রিয়ায় লোকসংস্কৃতি গড়ে ওঠে, সঞ্জীবিত হয়।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় দেখিয়েছিলেন যে, বাংলার সংস্কৃতি মূলত পরিপুষ্টি লাভ করেছে গ্রামজীবনকে আশ্রয় করে। রবীন্দ্রনাথও মনে করতেন, 'আমাদের জীবনের ভিত্তি রয়েছে পল্লীতে' । লোকসংস্কৃতি প্রধানত এই পল্লীবাংলার নিজস্ব সংস্কৃতি। পশ্চিমবাংলার অন্য জেলাগুলির মত নিজস্ব কিছু বিশিষ্টতা নিয়ে গড়ে উঠেছে বর্ধমানের লোকসংস্কৃতি। মূলগত চরিত্রে এক হলেও এ জেলায় এমন কিছু উপাদান রয়েছে, অন্যত্র যার অস্তিত্ব দুর্লভ। আবার সময়ের বিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে পাল্টে যাচ্ছে তার চরিত্রও। একে মোটামুটিভাবে স্থূল দুটি ভাগে বিভাজিত করা চলে। এক, বস্তু-আশ্রয়ী সংস্কৃতি (Material Folklore), দুই, নৃত্য, সংগীতনির্ভর সংস্কৃতি (Non-Material Folklore), যা লোকজীবনকে করে তোলে সুন্দর এবং কিছুটা বিনোদনের চাহিদাও মেটায়। প্রথম পর্যায়ে অর্ন্তভুক্ত করা চলে লোকশিল্প অর্থাৎ হস্ত ও কারুশিল্পকে ; যেমন সোলা, মৃৎ, পট চিত্র, সূচি শিল্প, ভাস্কর্য, কাঠের কাজ, ডোকরা শিল্প। এছাড়া বর্ধমান জেলার বিস্তীর্ণ কৃষি অঞ্চল থেকে শিল্পাঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে বাউল-ফকিরি, ভাদুতুসু, বোলান, গাজন, রণপা, রায়বেঁশে, যাত্রা, কবিগান, পাঁচালি, লেটো, ঝুমুর ইত্যাদি বিচিত্র লোক-উপাদান, যা নিঃসন্দেহে গণ-মানুষের বেঁচে থাকার উল্লাসের প্রকাশক। এই দ্বিতীয় পর্যায়ের তিনটি উপবিভাগ কল্পনা করা যেতে পারে। এক, লোকশিল্প। দুই, লোকসঙ্গীত ও লোকনাট্য। তিন, লোকনৃত্য।

লোকশিল্প

সোলা - বাংলার কারুশিল্পের বিশেষ খ্যাতি একসময় জগৎজয়ী হয়েছিল। বর্ধমানের সোলা শিল্প আজও তার অতীত ঐতিহ্যকে বহন করে চলেছে সুযোগ্যতার সঙ্গে। সোলা একপ্রকার জলজ উদ্ভিদ, যা জন্মায় বাংলাদেশের পুকুরে এবং জলাভূমিতে। চাঁদমালা, টোপর, ডাকের সাজ, ফুল - নানা অলংকারে। সোলা এতকাল ধরে সমাদৃত হয়ে আসছে মানুষের প্রয়োজনে। অর্থাৎ যে কোন ধরনের শুভকাজে সোলার ব্যবহার প্রায় অনিবার্য। বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট থানার বনকাপাসী গ্রামটি প্রকৃতপক্ষে সোলাশিল্পের জন্যই খ্যাতিমান হয়ে উঠেছে। মূলত 'মালাকর' বা 'চিত্রকর' সম্প্রদায় এই লোকশিল্পের সৃজনকর্মী। প্রায় সত্তর বছর বয়সী কাত্যায়নী দেবী পঞ্চাশ বছরের বেশি সময় এ শিল্পে নিযুক্ত রয়েছেন। তাঁর পরিবারের আদিত্য মালাকর, অনন্ত মালাকর, রঞ্জন মালাকর প্রমুখ সোলার কাজে নৈপুণ্যের স্বীকৃতিরূপে নানা সরকারি-বেসরকারি তরফে পুরস্কৃত হয়েছেন। এখন নানা বর্ণ ও জাতির মানুষ একে জীবিকারূপে গ্রহণ করেছেন। শহর কাটোয়াতেও কয়েকঘর সোলাশিল্পী কাজ করছেন। এঁদের মধ্যে ঝন্টু মালাকার, মলয় বৈরাগ্য , ধীরেন কর্মকার, রতন মালাকর প্রমুখের নাম আলাদা করে উল্লেখ করা যায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে নেওয়া হয়েছে প্রশিক্ষণের প্রক্রিয়া। হালকা, নরম, ইচ্ছেমতো ব্যবহারযোগ্য ও সহজলভ্য - এ সমস্ত কারণেই সোলার জনপ্রিয়তা আজও ক্ষুণ্ণ হয়নি। এ অঞ্চলের তৈরী সোলার কাজ বিশেষত কলকাতা, চন্দননগর, এমনকি বিদেশেও দেবীমূর্তির অলংকরণে শোভা পায়। চলতি কথায় এর নাম 'ডাকের সাজ'। বিভিন্ন মেলা, উৎসবেও সোলার তৈরী উপকরণের চাহিদা লক্ষ্য করা যায়। তরুণ প্রজন্ম মূলত লাভ লোকসানের

কথা মাথায় রেখেই সোলা শিল্পের সঙ্গে নিজেদের জড়িয়ে ফেলতে তেমন আগ্রহী হচ্ছে না। তবুও বংশানুক্রমিক অভ্যাসের ফলে সোলা শিল্পীরা কি অসীম দক্ষতায় বাংলার অপরূপ লোকশিল্পটিকে অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করে চলেছেন, তা পরম শ্রদ্ধার বিষয়।

পোড়ামাটি

পোড়ামাটির শিল্পকর্মের ঐতিহ্য বাংলাদেশে অত্যন্ত প্রাচীন। কেননা গাঙ্গেয় সমভূমিতে পাথর সুলভ না হলেও কাদামাটির অভাব নেই। তাই স্থায়িত্বের জন্যে কাঁচামাটির দ্রব্যকে পুড়িয়ে টেকসই করার প্রথা এদেশে বহুকালের। পোড়ামাটির ভাস্কর্য ফলকের ব্যবহার আমরা দেখেছি মন্দির ও মসজিদের গায়ে অলঙ্কার হিসেবে। পালরাজাদের আমলে মার্গ সংস্কৃতি ও লোকসংস্কৃতির সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল বাংলার নিজস্ব আঞ্চলিক সংস্কৃতি। বর্ধমানের সাত-দেউলিয়ায় ইঁটের তৈরী প্রাচীন মন্দিরের গায়ে 'টেরাকোটা' ফলকে ভাস্কর্যের ছাপ রয়েছে। তুর্কী-আফগান শাসন প্রতিষ্ঠার পরবর্তীকালে মুসলিম স্থাপত্য সজ্জার নমুনা ফুটে উঠেছে কালনার শাসপুরের মসজিদ, রায়নার মসজিদপুরের মসজিদ প্রভৃতি ধর্মস্থানের অলংকরণে। এ প্রসঙ্গে গৌরাঙ্গপুরের ইছাই ঘোষের মন্দিরের উল্লেখ অপ্রয়োজনীয় হবে না। বস্তুতপক্ষে পশ্চিমবাংলার অন্যান্য স্থানের মত বর্ধমান জেলাতেও পোড়ামাটির ফলকযুক্ত মন্দির মসজিদের সংখ্যা কম নয়। আসলে সেকালের শিল্পীরা পোড়ামাটির অলঙ্করণ সজ্জার মধ্যে খুঁজতে চাইতেন তাঁদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শের উজ্জীবন। যে সমস্ত মন্দিরের দেয়ালে 'টেরাকোটা' শিল্পকর্ম বিশেষ মাত্রা পেয়েছে, তাদের মধ্যে বনপাস কামারপাড়ার মন্দির, হাটগোবিন্দপুরের শ্রীধর জীউর মন্দির, কালনার প্রতাপেশ্বর শিবমন্দির, শ্রীবাটির শঙ্করশিব মন্দির, দেবীপুরের লক্ষ্মী জনার্দন মন্দির, সুহাড়ী গ্রামের আটচালা মন্দির প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এতে যেমন একদিকে রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী ও দেবদেবী প্রসঙ্গ আছে, তেমনি একটা বড় জায়গা পেয়েছে সাধারণ মানুষের মৌলিক জীবনযাত্রা; এমনকি অন্তঃপুরবাসিনী নারীর জীবন ছবিও । ভাস্কর্য-শিল্পীরা আঙ্গিকের ক্ষেত্রে নৈপুণ্য দেখালেও রূপসৃষ্টির ক্ষেত্রে লোকশিল্পের গণ্ডীতে আবদ্ধ থেকেছেন।

বাংলার সুমহান সংস্কৃতির এই রত্নভাণ্ডারটি আজ ভাঙনের পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে, একথা বললে বোধহয় ভুল হয় না। তবু এমন কিছু শিল্পী বর্ধমান জেলায় রয়েছেন, যাঁদের প্রয়োগে অতি-সম্প্রতি শিল্পটির উজ্জীবন ঘটতে চলেছে। সংখ্যায় বেশী না হলেও গুণগত উৎকর্ষে এঁরা যশস্বী। দীর্ঘকাল 'টেরাকোটা' সৃজনশীলতায় মগ্ন থেকে প্রায় একক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছেন বর্ধমান শহরের হরিহর দে। তিনি ছাড়াও দোলন কুণ্ডু, সঞ্চয়িতা কুণ্ডু, মমতারানী শীল, ভক্তিপদ পাল, সোমনাথ গোস্বামী প্রমুখ শিল্পীরা এই মৃৎশিল্পটিকে দিয়েছেন ঐশ্বর্য ও বিচিত্রতা। প্রথাগত ঐতিহ্যে অনুগত থেকেও পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়াস চোখে পড়ে এঁদের শিল্পকর্মে। স্বভাবত তার চাহিদাও এখন বেড়েছে আগের তুলনায় অনেক বেশী।

পটচিত্র

বাংলার নিজস্ব অঙ্কন শিল্পের সর্বোত্তম অভিব্যক্তি ঘটেছে পটচিত্রে। 'পট' সংস্কৃত শব্দ। এ থেকে বোঝা যায় যে পটচিত্র বিদ্যার অতীত যথেষ্ট প্রাচীন। দ্বাদশ শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যে পটুয়ারা বিশেষ সক্রিয় ছিলেন, তা প্রমাণিত। বর্ধমান জেলাতেও পটচিত্র-শিল্পীরা সুদীর্ঘকাল বংশগত পেশায় নিযুক্ত থেকে প্রাচীনতর শৈলীর ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছেন। তবে পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে ও দারিদ্র্যের পীড়নে তাঁদের প্রায় সকলকেই গ্রহণ করতে হয়েছে বিকল্প জীবিকা। একদা মেদিনীপুর, বীরভূম, বর্ধমান প্রভৃতি জেলায় পটুয়াদের প্রবলরূপে অস্তিত্ব ছিল। বর্ধমান জেলায় চিত্রকর, মাল ইত্যাদি সম্প্রদায়ের মানুষ একদিন পটচিত্রকে জীবিকারূপে গ্রহণ করেছিল। কাটোয়ার গোপীনাথ চিত্রকর(দাসবৈরাগ্য) এখনও সেই ধারাটিকে কোনক্রমে বহন করে চলেছেন। কাটোয়ার দুগো-বাঁধমুড়ো, কেতুগ্রামের তরালসেন পাড়া, ভুলকুড়ি গ্রামে এই সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষেরা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে তাঁদের আঁকা পটের ছবি দেখিয়ে বেড়াতেন এবং ছড়া, গান, কথকতার সাহায্যে সেগুলির তাৎপর্য শ্রোতাদের বুঝিয়ে বলতেন। সত্তরোর্ধ গোপীনাথ বাবুর আঁকা পট জেলা ও রাজ্যস্তরের বহু সরকারি পুরস্কার অর্জনে সমর্থ হয়েছে। এখনো তাঁর কণ্ঠস্থ রয়েছে অজস্র পটের গান, যেগুলির রচয়িতা অজ্ঞাত। এমন একটি গানের কয়েক পংক্তি তুলে আনা গেল ঃ

'রাম রাম প্রভু রাম কমললোচন।
দুর্বাদল শ্যাম রাম জানকীই জীবন।।
বামে সীতা বন্দিল ডাইনে লক্ষ্মণ।
রক্ত সিংহাসনে বসে প্রভু নারায়ণ।।'

তুলট কাগজ বা মোটা কাগজ শুধু নয়, তালপাতার পটের ওপর কাহিনী চিত্র এঁকে এই পটশিল্পীরা নিপুণতার স্বাক্ষর রেখেছেন।

লৌকিক ধারায় পটচিত্র আসলে আলেখ্য-চিত্র। পট দু-রকমের - চৌকো ও দীঘল। অনেকগুলি চিত্রের সমন্বয়ে একটা কাহিনীর ধারাবাহিকতা প্রকাশ পায় দীঘল পটে। তার দৈর্ঘ্য ৮ হাত থেকে ২৫ হাত পর্যন্ত হতে পারে। রঙ ও তুলির টানে পটচিত্রের অঙ্কন পদ্ধতি মোটা দাগের। একসময় পোড়া মাটি, হরতেল লালমাটি, সিঁদুর, কাজলকালি,পাতার রস এসব দিয়ে পট আঁকা হত। এখন অনেকেই ব্যবহার করছেন বাজারের কেনা রং। একটা পটের ওপর থেকে নীচের দিকে কাহিনী সাজানো হয়। পটুয়া বা চিত্রকর আঙ্গুল বা কাঠি নির্দেশ করে বিশেষ সুরে গান বাঁধেন। উত্তরাধিকার সূত্রে বাড়িতে বসেই চলে পট আঁকার শিক্ষা। লোক চিত্রকলারূপে পটের গুরুত্ব কখনই অস্বীকার করা যায় না।

ডোকরা

পশ্চিমবাংলার বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া প্রভৃতি জেলায় যে সম্প্রদায়টি 'ডোকরা কামার'

নামে পরিচিত, তাদের তৈরী অপরূপ ধাতুমূর্তিগুলি নিঃসন্দেহে উন্নত হস্তশিল্পের পরিচায়ক। দূর অতীতে কোন এক সময়ে বাঁশ বা বেতের উপকরণের পরিবর্তে এই কারিগরেরা ধাতুর ব্যবহার শুরু করেছিল। তাদের হাতে তৈরী শিল্পকর্ম দেশের সীমা পেরিয়ে বিদেশেও খ্যাতি পেয়েছে। বর্ধমান জেলার দুটি স্থান 'দরিয়াপুর' ও 'একলক্ষী' তে এই যাযাবর শ্রেণীর শিল্পীরা বাসা বেঁধেছে, যদিও সংখ্যায় খুবই অল্প। এদের ধাতুশিল্পে আদিবাসী ধ্যানধারণার প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এ শিল্পের প্রয়োজনীয় উপকরণ হলো - মোম বা ধুনো ও সরষের তেল, উপযোগী মাটি ও পিতল। প্রত্নগবেষকরা এ শিল্পের ঐতিহ্যকে সিন্ধু সভ্যতার সমকালীন মনে করেছেন। হাতি, ঘোড়া, ময়ূর, হরিণ, মাছ, পেঁচা প্রভৃতি মানবেতর প্রাণীর মূর্তি, লক্ষ্মী-নারায়ণ প্রভৃতি দেবদেবীর প্রতিমা, প্রদীপ, পিলসুজ, কাজললতা, ঝাঁপি, পেতলের বাটি প্রভৃতি তৈজসপত্র নির্মাণে ডোকরাদের কৃতিত্ব সুবিদিত। গ্রামীণ লোকশিল্পের, বিশেষত আদিবাসী শিল্পকলার অকৃত্রিম সরলতা মাখানো বৈশিষ্ট্যটি এখানে প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়। পশ্চিমবাংলায় বাস রত ডোকরা সম্প্রদায়ের মধ্যে দরিয়াপুর নিবাসী শম্ভু কর্মকারই প্রথম জাতীয় পুরস্কার বিজয়ী শিল্পী। লোকশিল্প বিশেষজ্ঞদের মতে, দরিয়াপুরের শিল্পীদের কাজের মান ও উৎকর্ষ অনায়াসে বস্তার বা ওড়িষ্যার শিল্পকর্মের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে।

কাঠ

বাংলাদেশের কাঠ-শিল্পের ঐতিহ্য প্রাচীনতর। বাঙালী দারুশিল্পীর সর্বোত্তম প্রতিভা একদিন ধনী ভূস্বামীর পৃষ্ঠপোষকতায় বাসগৃহ, মন্দির ও চণ্ডীমণ্ডপের বিভিন্ন অলংকরণ রচনায় নিয়োজিত হয়েছিল। তাঁদের প্রশংসায় ৬০ বছর আগেও লোকসংস্কৃতিবিদ গুরুসদয় দত্ত এক প্রবন্ধে বলেছিলেন - 'পরিকল্পনার নিখুঁত নির্মলতায় ও গৌরবে, ভাবের ও রসের নিবিড় অভিব্যঞ্জনায়, কারুকার্যের সুনিপুন ছন্দে এবং স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে মানবদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সৌন্দর্য ও লালিত্যের রূপসৃষ্টিতে এই দারুসৃষ্টিগুলি জগতের ভাস্কর্যশিল্পে যে অতি উচ্চস্থান অর্জন করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই''(প্রবাসী, বৈশাখ,১৩৩৯)। বর্ধমান জেলার দারুশিল্পীরা কাঠের বিগ্রহ তৈরী করে এসেছেন দীর্ঘকাল। এ প্রসঙ্গে দাঁইহাট ও কাষ্ঠশালীর কথা প্রথমেই মনে পড়বে। সময়ের বিবর্তনে এ শিল্পের আকাশ বর্তমানে অনেকখানি সঙ্কুচিত হয়েছে। অবশ্য বর্ধমান জেলার স্বল্পখ্যাত এক গ্রাম 'নতুন গ্রাম' বর্তমানে কাঠ ভাস্কর্যে খ্যাতিমান হয়ে উঠেছে। ভক্ত ভাস্করের শিল্পকর্ম রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতায় সপ্রশংস স্বীকৃতি পেয়েছে। 'সূত্রধর' অথবা 'ভাস্কর' পদবীভুক্ত নতুনগ্রামের শিল্পীরা চিরাচরিতভাবে কাঠের উপাদানে লক্ষ্মীপেঁচা, মেয়ে পুতুল, শ্রীগৌরাঙ্গ, রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, রাবণ প্রভৃতির মূর্তি তৈরী করেন। একথা মনে করা অসঙ্গত হবে না যে, বৈষ্ণবতীর্থ অগ্রদ্বীপের নিকটবর্তী হওয়ার কারণেই নতুনগ্রামের লোক-শিল্পকর্মে ধর্মীয় প্রভাব এতখানি রয়ে গেছে। এখানে তৈরী মেয়ে-পুতুল একসময়ে কলকাতার কালীঘাটের দোকানে বিক্রি হত প্রচুর। ইদানিংকালে গোরুর গাড়ির চাকা প্রভৃতিও তৈরী হচ্ছে এখানে। সব মিলিয়ে বলা যেতে পারে, ভারতীয় লোকশিল্পের চিরায়ত বিশিষ্টতাগুলি নতুন

গ্রামের কাঠের পুতুলেও খুঁজে পাওয়া যাবে। এর সমস্ত শিল্পকর্মই এক অনলংকৃত সরলতা ও সহজ বলিষ্ঠতায় বিন্যস্ত। এই খাঁটি লোকশিল্পের আন্তর্জাতিক আবেদন আজও ক্ষুণ্ণ হয় নি। বর্ধমানের ধ্রুব শীল, কাটোয়ার রাধেশ্যাম দাস জাতীয় ও রাজ্যস্তরে সম্মানিত হয়েছেন।

সূচিশিল্প

বাংলার এই লোকপ্রিয় চারুশিল্পটি আদ্যন্ত গ্রামীণ মহিলাদের পরিচর্যায় পরিপুষ্ট হয়েছে। অখণ্ড বাংলাদেশের প্রায় সব জেলাতেই এই জীবনঘনিষ্ঠ শিল্পের চর্চা অব্যাহত ছিল। বর্ধমান জেলায় কোথাও কোথাও নকশী কাঁথা তৈরীর প্রয়াস এখনো খুঁজে পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণপুর, হরিপুর, মুরাতিপুর, মঙ্গলকোট, চাণ্ডুলী প্রভৃতি গ্রামের মূলত মহিলা শিল্পীদের অসামান্য দক্ষতা ও ক্লান্তিহীন পরিশ্রমের যুগলবন্দিতে বহমান রয়েছে এই ক্রমক্ষয়িষ্ণু হস্তশিল্প মাধ্যমটি। কৃতি শিল্পীদের মধ্যে তকদিরা বেগম, হাবিবা খাতুন, রাধারাণী দাস (প্রয়াত) প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একথা মেনে নেওয়াই ভালো যে, পূর্বের মতো সংখ্যায় মহিলারা বয়ন শিল্পে তেমন আগ্রহী নন আর্থিক কারণে ; তবে গুণগত দিক থেকে এই শিল্পের মান ক্রমশই উন্নতমুখী।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বর্ধমান শহরের অদূরে মালকিতা গ্রামে জেলা পরিষদের আয়োজনে গড়ে উঠেছে হস্তশিল্পের গ্রাম - 'কারুজ'। গ্রাম গ্রামান্তরের কারিগররা এই শিল্পগ্রামে এসে অংশ নেবে পোড়ামাটির মূর্তি, পেতলের বস্তু, চটের নানা জিনিস ও কাঁথা সেলাইয়ের কাজে। এছাড়া থাকবে হস্তশিল্পের সংগ্রহশালা।

লোকসঙ্গীত ও লোকনাট্য

বাউল - ফকিরি

'বাউল' কাকে বলা যাবে , তা বিতর্কাতীত নয়। এমনকি বাউল সঙ্গীতের প্রকৃত সংজ্ঞা নিয়েও নানা মুনির নানা মত। প্রকৃত প্রস্তাবে বাউল একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনচর্চা, একটি স্বতন্ত্র সাধন পদ্ধতি। বাউল গান সেই জীবনচর্যারই অবিচ্ছেদ্য অংশ। এ গানেই ছড়িয়ে রয়েছে বাউল জীবনের তত্ত্বকথা। আবার তত্ত্বসংপৃক্ত বলেও কেউ কেউ বাউল গানকে লোকসঙ্গীতের অর্ন্তভুক্তি বিষয়ে আপত্তি তুলেছেন। কিন্তু জেনে রাখা ভালো যে, এ ধর্ম মানবতার প্রকাশে গড়ে তোলেনি কোন বাধার প্রাচীর। বাউলসাধনা মানব দেহের অভ্যন্তরেই কল্পনা করেছে ভগবানের পূর্ণশক্তি। যেমন, রামপ্রসাদী এ গানে - " এমন মানব জমিন রইল পতিত, আবাদ করলে ফলত সোনা।" প্রকৃত বাউল 'মনের মানুষে'র অন্বেষণকেই সাধনার চরম পরাকাষ্ঠা ভাবতে ভালোবাসে। বাউল গান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিক আলোচনাটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে - " ভাষার সরলতায় ভাবের গভীরতায়, সুরের দরদে যার তুলনা মেলে না। তাতে যেমন জ্ঞানের তত্ত্ব, তেমনি কাব্য রচনা, তেমনি ভক্তির রস মিশেছে। লোকসাহিত্যে এমন অপূর্বতা আর কোথাও পাওয়া যায় বলে বিশ্বাস

করি নে'' (হারামনি, ভূমিকা)। হিন্দু-মুসলিম সর্বধর্মের মানুষই বাউল ধর্ম গ্রহণ করেন অবলীলায়। সেকারণেই জাতপাতের ক্ষুদ্রতার গণ্ডীতে আবদ্ধ সমাজে লালনের মতো বাউলেরা অচ্ছ্যুৎ হয়ে যান।

একথা সত্য যে, রূপের মধ্য দিয়ে স্বরূপে উত্তীর্ণ হওয়াই বাউলের একমাত্র সাধ্য সাধনা। তাই আহারে, পোশাকে, জীবনচর্যায় স্বতন্ত্র ; সাধারণের মধ্যে থেকেও অ-সাধারণ। গুরুবাদী এ ধর্মমতের মানুষ বাউল গান গেয়েই জীবিকা নির্বাহ করে। বাউলের মৌলিক সাধন পদ্ধতির মধ্যে একটা ঐক্যসূত্র থাকলেও কোন কোন ক্ষেত্রে আঞ্চলিক পার্থক্যও চোখে পড়ে। 'মুসলমান বাউল', 'বৈষ্ণব বাউল' এ সব নামেও কেউ কেউ পরিচিতি হয়ে পড়েন। সে অর্থে 'বাউল' বা 'ফকিরের' মধ্যে খুব জল-অচল পার্থক্য নেই। বৈষ্ণব বাউলের মধ্যে আবার 'নবদ্বীপ' কেন্দ্রিকতা বা 'রাঢ়' কেন্দ্রিকতা কখনো বড় হয়ে দেখা দেয়। চৈতন্য প্রভাবিত বাউল হল লৌকিক বাউল। উত্তর-রাঢ়ের অর্ন্তভুক্ত বর্ধমান জেলাতেও বাউল গানের চর্চা যে দীর্ঘকাল বহমান, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশই থাকে না। তবে বীরভূম বা মুর্শিদাবাদ জেলার মত বর্ধমানের বাউল শিল্পীরা তেমন বিশিষ্টতায় স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত হয়ে উঠতে পারেন নি। এখনো গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, গাছের ছায়ায়, মাটির দাওয়ায়, আশ্রমে আর আস্তানায়, রেলের কামরায় বাউল শিল্পীর দেখা মেলে। মাথায় চূড়া করা চুল, পরনে গেরুয়া আলখাল্লা, আর হাতে একতারা বা গুবগুবা। কখনো তার গলায় সুর মেলায় সঙ্গিনী। এদের সকলেই যে গতানুগতিক সংসার জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আখড়াধারী জীবনযাপন করে,এমনটা নয়! বরং অনেকেই বাউল গান শিখে একে আত্মপ্রতিষ্ঠা অথবা জীবিকার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছে। দেহ বিষয়ক তত্ত্বের গানে সাধক বাউল তার সাধনায় মগ্ন থাকে ; সে কারণে এর আরেক নাম 'দেহতত্ত্বের গান'। তবে দেহতত্ত্ব ছাড়াও ইদানিংকালে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, সাক্ষরতা আন্দোলন, ভূমি সংস্কার ইত্যাদি সামাজিক বিষয়গুলিও ঢুকে পড়েছে বাউল গানের বৃত্তে। ফলে তথাকথিত বিশুদ্ধতা কিছুটা ক্ষুণ্ণ হলেও বিচিত্রতা বেড়েছে অনেকখানি। জেলার বিশিষ্ট বাউল শিল্পীদের মধ্যে জগন্নাথ মাঝি, মনোজ ফকির, রমজান সাহ, শুকদেব দাস, কালাচাঁদ হালদার, এদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়।

বাউলের মতো ফকিরি গানও আধ্যাত্মমূলক , গুরুবাদী ও দেহতত্ত্ব নির্ভর। এ জেলার গ্রামাঞ্চলে পীরের আস্তানায় ফকিরের দেখা মেলে; পরণে রঙ-বেরঙের আলখাল্লা, গলায় তসবী, হাতে ডুবকি, একতারা। বিচিত্র সুর করে পথে প্রান্তরে গৃহস্থের আঙিনায় ফকিরের জং নামে। অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন - 'মুসলমান দরবেশ এবং পীর ফকিরের নামে প্রচলিত এক শ্রেণীর দেহতত্ত্ব, বৈরাগ্য বা আধ্যাত্মমূলক গানের নাম ফকিরি গান।' প্রায়শ স্বধর্মের কারণেই বাউল আর ফকিরি গানের বিষয়ের ভেদরেখা মুছে যায়। ফকিরের কণ্ঠে উচ্চারিত হয় অসাম্প্রদায়িক মিলনের সুর —

'প্রভু তোমারি নামেতে তরী হালেতে মনেতে আমারি বাসনা।
আজ ঘেরো ঘেরো ঘেরো ঠাকুর ঘেরো বৃন্দাবন।

বৃন্দাবন ঘেরিলে পাবি কিষ্ট দরশন।।
সত্যপীর আর সত্যনারায়ণ সত্য যাহার নাম।
বিপদ কালেতে ডাকে স্বয়ং ভগবান।'

ফকিরি গানের আরেক নাম 'মুর্শিদী গান'। 'মুর্শিদ ' বলতে বোঝানো হয়েছে গুরুকে। জীবনের রহস্য মোচনের গভীর জিজ্ঞাসা আত্মপ্রকাশ করেছে এ রকম ফকিরি গানে –

'একবার দয়া করে ওগো মুর্শিদ, বলে দাও মোরে
কোরাণ মাঝে তিরিশ সে পারা
এর কোন কোন পাতে কয়েক সুর বলে দাও তোমরা।'

বর্ধমানে ফকিরি গানের বিশেষ প্রচলন দেখা যায় দক্ষিণ দামোদর, গাজীপুর, কেতুগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে। কাদের সাঁই, মজেহর ফকির প্রমুখ সাধক-শিল্পীদের ফকিরি গানের কলি আজও উচ্চারিত হয় লোক-মানুষের মুখে –

'মন আপন আপন বল কারে।
এসে এই সংসারে
পড়লি মায়ের ফেরে
রেখো ছজন চোরে খুব হুঁশিয়ারে।'

পরিবর্তমান সময়ের অনিবার্যতা মেনেও বাউল-ফকিরের দল নিজস্ব সংস্কৃতির প্রবাহটিকে বহমান রেখে চলেছেন লোকায়ত সুর ও ভঙ্গিতে। জীবনচর্চায় 'বাউল' না হয়েও তাঁদের অনেকে বাউল শিল্পী।

পাঁচালি

পাঁচালি এক লৌকিক নাট্যরীতি। প্রাচীনকাল থেকে আমাদের দেশে প্রবাহিত পাঁচালির ধারা। এই পাঁচালি মূলতঃ দেবমাহাত্ম্যমূলক আখ্যানগীতি। ছড়া ও প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে গীতিসহযোগে কোন পৌরাণিক কাহিনী গানের আশ্রয়ে লোকসাধারণের সামনে উপস্থাপিত হয়। মঙ্গলকাব্য কাহিনীমূলক বলেই তা 'পাঁচালি' নামে কথিত হতো। তবে ঊনবিংশ শতাব্দীতেই আঙ্গিকের দিক থেকে নতুন চেহারা পেয়েছে পাঁচালি। বিষয়ে নয়, প্রকাশভঙ্গি র অভিনবত্ব তাকে দিয়েছে অসামান্য লোকপ্রিয়তা। পাঁচালি গানে কথকতার ধারার সঙ্গে পুরনো মঙ্গলগান এবং সমকালীন কবিগানের রীতি কিছুটা মিশে গিয়েছিল। মূল গায়েনের সঙ্গে একাধিক দোহার যেমন থাকত, বাজনদারেরাও গানের ধুয়ো ধরত, বহু চরিত্রের সংলাপে অংশ নিত প্রয়োজন মতো। পাঁচালির বড় দলগুলি গড়ে উঠতো মূলত রচয়িতাকে ঘিরে।

'পাঁচালি' বললেই আমাদের চোখেব সামনে জেগে ওঠে যে মানুষটির ছবি, তিনি বর্ধমান জেলারই দাশরথি রায়। ত্রয়োদশ বঙ্গাব্দের প্রথম পর্বে আত্মপ্রকাশ করে দুই দশকের বেশি

সময় তিনি বাংলাদেশ মাতিয়ে রেখেছিলেন পাঁচালির সুরে। বিষয়ের দিক থেকে দাশরথি রায় তেমন বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনেন নি। রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদভাগবতসহ পুরাণের নানা আখ্যানের উপস্থাপনা সন্দেহাতীতভাবে সেকালে চিত্তজয়ী হতে পেরেছিল। উনিশ শতকের 'নতুন পাঁচালি'র উপর যাত্রার প্রভাবও দূর্লক্ষ্য নয়। প্রাচীন লৌকিক পাঁচালির সঙ্গে তার পার্থক্য মূলত আঙ্গিকে। লোকশিক্ষার কবি দাশরথি রায়ের পাঁচালি প্রথমত কবিতাবদ্ধ ও গান সম্বলিত খণ্ডকাব্য। দ্বিতীয়ত এই কাহিনীভুক্ত গীতিসমৃদ্ধ কাব্যগুলি 'পালারূপে' অভিহিত। এ পালা নিছক বর্ণনাত্মক নয়, ভাবাত্মকও। কথোপকথনের মাধ্যমে নাটকীয়তা সৃষ্টির ফলে এগিয়ে গেছে এর কাহিনীগুলি। যেমন, লক্ষ্মণের শক্তি শেলে পতনের পর হনুমান বিশল্যকরণীর সন্ধানে গন্ধমাদন পর্বতে যাত্রা করলে রাবণ কালানেমিকে ব্যবহার করেছেন হনুমান - নিধনের উদ্দেশ্যে। দাশরথি রায়ের পাঁচালিতে কালনেমি - রাবণের সংলাপ এমন নাটকীয় ভঙ্গিতে আত্মপ্রকাশ করেছে –

' করি মামা নিবেদন কর আমায় নিবেদন
গিয়ে পর্বত গন্ধমাদন গিরি।
মারিলে পবন কুমারে লঙ্কার অর্ধেক তোমারে
দিব ভাগ অর্ধেক রমণী।'

পরবর্তীযুগের অনেক নাট্যকার বহন করেছেন এ রীতিকে। বর্ধমান জেলার গণ্ডীকে অতি ক্রম করে বৃহৎ বঙ্গ জুড়ে 'দাশু রায়ের পাঁচালি' খ্যাতির চূড়ান্তে পৌঁছেছিল। রবীন্দ্রনাথের বালক বয়সের স্মৃতিচারণার একটি অংশ এখানে তুলে দেওয়া গেল ঃ 'সেদিনকার সন্ধ্যাবেলার সেই অস্ফুট আলোকের সভা নিস্তব্ধ-উৎসুক্যের নিবিড়তায় যে কিরূপে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল তাহা এখনও মনে পড়ে। এ দিকে রাত হইতেছে, আমাদের জাগরণকালের মেয়াদ ফুরাইয়া আসিতেছে, কিন্তু পরিণামের অনেক বাকি। এ হেন সংকটের সময় হঠাৎ আমাদের পিতার অনুচর কিশোরী চাটুজ্জে আসিয়া দাশু রায়ের পাঁচালি গাহিয়া অতি দ্রুতগতিতে বাকি অংশটুকু পূরণ করিয়া গেল' (জীবনস্মৃতি)। এই লোক কবির জন্মভূমি কাটোয়া মহকুমার বাঁধমুড়ো গ্রামের অশীতিপর শিল্পী নিত্যহরি দাস আজও পাঁচালি গানের ঐতিহ্যের শেষ আলোটুকু বহন করে চলেছেন। এ পথে তিনি একক পথিক। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আর্থিক আনুকূল্য ছাড়াও অজস্র লোকসংস্কৃতি পিপাসু মানুষের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা তাঁর অমূল্য প্রেরণা।

কবিগান

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধ জুড়ে 'কবিওয়ালা' নামের এক শ্রেণীর গীতি ব্যবসায়ী যে সঙ্গীতের মাধ্যমে বাংলাদেশের শিক্ষিত-অশিক্ষিত জনগণের কৌতূহল আকর্ষণ করেছিলেন, তা-ই 'কবিগান'। একথা বললে ভুল হয় না যে, প্রাচীনকাল থেকে কবিগানের একটি ধারা প্রবাহিত হয়ে এসেছিল লোকসাহিত্যে। পরবর্তীকালে জমিদার, মুৎসুদ্দি প্রমুখ 'হঠাৎ বাবু' সম্প্রদায়ের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায়

কবিগানের প্রবাহ পরিপুষ্টি লাভ করেছিল; তার গায়ে লেগেছিল আদিরস ও মোটা রুচির ছাপ। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন, 'অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব হইতেই ছড়া কাটিয়া ঢোলকাঁসির সঙ্গতে গান করার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। পরে এই রূপে বাঁধা ছড়ার সাহায্যে আসরে উত্তরে-প্রত্যুত্তরে বাকোবাক্য পদ্ধতি প্রচলিত হয়। ইহাই দাঁড়া কবি। 'দাঁড়া' শব্দের অর্থ হইতেছে বাঁধা গীত।' অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে পশ্চিমবঙ্গে ভাগীরথীর তীরভূমিতে দাঁড়া কবির গান জনসাধারণের চিত্তবিনোদনের অন্যতম প্রধান উপায় ছিল। কবিগানই পরবর্তী যুগে অতিরিক্ত প্রশ্নোত্তরমূলক হওয়ার ফলে তর্জা গানে রূপান্তরিত হয়েছে। বাংলার ঝুমুর গানের মধ্যে কবিগানের বীজ ছিল, এরকম ভেবেছেন কেউ কেউ। বিখ্যাত কবিয়ালদের মধ্যে গোঁজলা গুঁই, হরু ঠাকুর, নিতাই বৈরাগী, রাম বসু, ভোলা ময়রা, অ্যান্টনী ফিরিঙ্গি প্রমুখের নাম করতেই হয়।

বাংলায় কবিগানের সূচনা ও বিকাশ ঘটেছে নগরে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে শহরে কবিয়ালদের রমরমা শেষ হয়ে গেলে গ্রামাঞ্চলে তা বিস্তার লাভ করে। পূর্ববাংলার যশোহর, চট্টগ্রাম, পশ্চিমবাংলার বীরভূম, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদে কবিগানের প্রসারতা বাড়ে। বর্ধমান জেলার জনপ্রিয় কবিয়ালদের মধ্যে গুসকরার শচীনন্দন দাস, দাঁইহাটের আবদুল গফুর, মাঝিগ্রামের বংশধর মণ্ডল প্রমুখেরা একদা বিশেষ স্বভাব কবিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। শ্রোতামনের রুচির চাপে ও ইতিহাসের প্রয়োজনে কবিগান এখন অনেকাংশে সাহিত্যধর্মী। কবিগানের উৎসে আছে বিভিন্ন পুরাণ, উপপুরাণ, মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলী ও মালসী গান। সখী সংবাদ, মালসী, তরজা, খেউড়, হাফ-আখড়াই প্রভৃতি বিভিন্ন ধারায় সম্মিলিত লোকসাহিত্য বলে কবিগান 'ষড়ঙ্গ রূপে' কল্পিত। সখী সংবাদ থেকে হাফ আখড়াই পর্যন্ত, এর প্রাচীন ঐতিহ্যের দিক। আধুনিক ধারায় এসেছে বিচিত্র প্রসঙ্গ ও বিবিধ বিষয়।

যে কোন কবিসঙ্গীতে কবিয়ালই হল মূল গায়েন। গায়ে চাদর জড়িয়ে, কখনো চাদর কোমরে বেঁধে আসরে নামেন কবিয়াল। অত্যন্ত বিনীত, শ্রদ্ধাসহকারে শুরু করেন বন্দনাগীতি। তারপরই আসরের শ্রোতাদের দেওয়া নিজের ভূমিকাটি উপস্থাপিত করেন। তাঁর সেই উপস্থাপনার সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র তালে বেজে ওঠে ঢোলবাদ্য। যিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করে আসরে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে চান, প্রতিপক্ষকে উপহাস ও হেয় করাই তাঁর উদ্দেশ্য। অন্যদিকে প্রতিপক্ষও সমস্ত যুক্তি খণ্ডন করে নিজের বক্তব্যের সারবত্তা প্রতিপন্ন করতে আগ্রহী হয়ে পড়েন। অর্থাৎ একটানা কাহিনী বর্ণনা না করে বাদ-প্রতিবাদ ও প্রশ্ন-উত্তরের দ্বারা কবিগানে সর্বদাই একটা নাটকীয়তা সৃষ্টির ঝোঁক দেখা যায়। একে 'বোল কাটাকাটি বলে। এ কালের কবিগান সামাজিক, আধ্যাত্মিক, অর্থনৈতিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি নানা বিষয়ের জগতে ঢুকে পড়েছে। প্রচলিত পালাগুলির মধ্যে ধর্ম-অধর্ম, অদৃষ্ট-পুরুষকার, গ্রাম-শহর, নারী-পুরুষ, রাম-রাবণ, অতীত-বর্তমান ইত্যাদি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এই ধরনের দ্বন্দ্বযুদ্ধে অতীতের ভূমিকায় অবতীর্ণ কবিয়াল অনায়াসে আধুনিক বাবুদের ব্যঙ্গ করে বলেন –

'কলিকালে বাবু অবতার, আমি জানাব মহিমা তাহার।
সেই বাবুদের গুণগরিমা, আমি করিব বিস্তার।।
যাঁরা বাক্যে অজেয় পরভাষাপ্রিয়, মাতৃভাষা তাদের কাছে অতিশয় হেয়
তাদেরই বাবু জানিও সবিশেষ কহি তা এবার।।'

সাম্প্রতিক জেলার বন্যা পরিস্থিতি নিয়েও কবিয়ালরা গান বেঁধেছেন। কেতুগ্রাম থানার আমগড়িয়ার সনৎ বিশ্বাস কবিয়াল সমাবেশের উদ্যোক্তা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগেও কবিয়ালদের প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস প্রশংসার যোগ্য। বর্ধমানের কমবেশি সব ব্লকেই কবিগানের প্রচলন রয়েছে। ঐ লোকগান অনেক শিল্পীরই জীবিকা। মহিলা কবিয়ালদের মধ্যে অগ্রদ্বীপের প্রতিমা বৈরাগ্য খ্যাতি পেয়েছেন।

ভাদু ও ভাঁজো

পশ্চিম-সীমান্ত বাংলার লোকসংস্কৃতি ভাদুগান সম্পূর্ণরূপে যৌথ সঙ্গীত ও নারীসমাজের সম্পত্তি। অধিকাংশ ভাদুগান নারীদেরই রচনা। এ সম্পর্কে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য 'বাঙলার লোকসাহিত্য' গ্রন্থে বলেছেন - 'ভাদ্রমাসের সমস্ত রাত্রি জাগিয়া ওই অঞ্চলের সকল শ্রেণীরই প্রধানত কুমারী মেয়েরা ভাদু নামক দেবীর প্রতিমা সম্মুখে রাখিয়া এই লোকসঙ্গীত গাহিয়া থাকে। এই সঙ্গীতের ভিতর দিয়া ভাদ্রের ভরা প্রকৃতির পটভূমিকায় কুমারী হৃদয়ের বিচিত্র সুখ-দুঃখের অনুভূতি ব্যক্ত হয়।' ভাদুকে পঞ্চকোটের রাজকন্যা হিসেবে দেখা হয়ে থাকে। ভাদ্রমাসে এই রাজকন্যার জন্ম তাই নাম হয়েছে 'ভাদু'। বর্ধমান জেলার বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে ভাদুগানের অধিক প্রচলন। বাউরি ও অন্যান্য অন্ত্যজ শ্রেণীর মধ্যে ওই উৎসব বহুল প্রচলিত। প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রপূজা, 'করম' পরব, ভাঁজো উৎসব ও ভাদু পূজা সবগুলিই অনুষ্ঠিত হয় বর্ষা ঋতুর 'ভরা ভাদরে'। তাই এক সংস্কৃতির ওপর অন্য সংস্কৃতির প্রভাব এসে পড়েছে। যেমন আদিবাসী সমাজের 'করম' উৎসবের প্রভাব নিম্নবর্গের হিন্দুসমাজের মধ্যে প্রচলিত 'ভাঁজো' ও 'ভাদ্র' উৎসবে প্রকট হয়ে ওঠে।

সারা ভাদ্র মাসের প্রতি সন্ধ্যায় কুমারী মেয়েরা ভাদু গান গায়। ভাদু সম্পর্কে জনশ্রুতি এই যে, ভাদু মারা গেছে কুমারী অবস্থায়। তাই ভাদুর অধিকাংশ গান বিবাহ সম্পর্কিত। যেমন

'ভাদুর আমার বিয়ে দোব ইষ্টিশনের বাবুকে
আসতে যেতে ভাল হবে যাবে রেলের গাড়িতে।
বৰ্দ্ধমানের বাণ্ডিল সুতো চালে চালে লাগাবো
রায়পুরের ঐ ছোকরা দিকে তানমানে নাচাবো।।'

ভাদু আসার পর মাঠঘাট জলে ভরে ওঠে। মনের আনন্দে চাষী নেমে পড়ে কৃষিকাজে। তাদের সেই আনন্দের প্রকাশ ঘটে ভাদুর সুরে –

'বৰ্দ্ধমানে দেখে এলাম গো মাঝের কাঁটার মাকড়ী
কোন মাকড়ী নেবে বল খোল গলার মাদুলী।'

আবার সংকীর্ণ সীমায় দলবদ্ধ কুমারী মন যখন ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে চায় বাইরের মুক্ত জগতে, সে আকাঙ্ক্ষাও ধরা পড়ে এই লোকগানে —

'চল ভাদু চল খেলতে যাবো রাণীগঞ্জে বেলতলা
আসবার সময় দেখিয়ে আনবো কয়লাখাদের জল তোলা।'

ভাদ্র মাসে ভাদু গানের দল গ্রামে গ্রামে ঘুরে ভাদু শোনায়। একটি দলে থাকে চার-পাঁচজন। একটি ছোট ছেলেকে মেয়ে সাজানো হয়। সে নাচে। একজনের ঝুড়িতে থাকে ভাদুমূর্তি। গ্রামের দলগুলি প্রধানত শহরে ঘুরে ঘুরে পারিশ্রমিক আদায় করে। বর্ধমানে পাণ্ডবেশ্বর নিকটবর্তী বালিজুড়ী গ্রামে ব্রাহ্মণদের মধ্যেও ভাদু উৎসব পালিত হয়। কেতুগ্রাম থানার নলিয়া-পুলিয়ার গঙ্গার ঘাটে ভাদ্র সংক্রান্তিতে ভাদু বিসর্জনের অনুষ্ঠান আজও দেখা যায়।

ভাদ্র মাসে বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চলে কৃষিদেবতা ভাঁজোর পূজা হয়। 'ভাঁজো' কথাটি ভাদ্র শস্যের পরিবর্তিত রূপ। বর্ধমান ও বীরভূম জেলায় এর জনপ্রিয়তা বেশী। ভাদ্র মাসের ঘেঁটু ষষ্ঠীতে ভাঁজোর বোধন সম্পন্ন হয়। ঐ দিন ভাঁজো পূজার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারিণীরা শুচি বস্ত্র নতুন বালি ও মাটি দিয়ে তাতে কলাই, সরষে, শনের বীজ, পোস্ত দানা, ধান ইত্যাদি যোগে 'শেষ' পাতেন। 'শেষ' কথাটি এসেছে সম্ভবত 'শস্য' থেকে। রাত্রিবেলায় অনুষ্ঠিত হয় ভাঁজো গান। অংশ নেয় বিভিন্ন বয়সের মেয়েরা, গানের সঙ্গে চলে নৃত্য আর বাজনা। প্রেমের গান, দেহতত্ত্বের গান, রাধাকৃষ্ণের গানে যোগ দেয় বহু সংখ্যক মহিলা। একটি ভাঁজো গানের উদাহরণ –

'ভাঁজুই লো সুন্দরী, মাটি লো সরা
কালি ভাজুর বিয়ে দেবো
গেঁথে দেবো মালা।'

অনেকে বলেন যে, ভাঁজো আসলে ইন্দ্র পূজারই লৌকিক সংস্করণ। আবার কোথাও কোথাও শুধু এক নারী মূর্তিকে ভাঁজো বলা হয়। ভাঁজো অনুষ্ঠানে অনেক মজাদার ছড়া বলা হয়

'আমার বাড়ি বর্ধমান, তোমার বাড়ি খানা
রাস্তা বাঁধিয়ে দেবো বঁধূ, করবে আনাগোনা।'

ঐ রং ছড়া ও গানের ভেতর ভাঁজোকে ঘিরে চলে নাচ। অনেক সময় বয়স্ক পুরুষেরাও নাচ-গানে অংশ নেন, কেউ কেউ মেয়েদের পোশাক পরেন। তবে ভাঁজো গানের ভাব ও ভাষা মূলত মেয়েলি। অধিকাংশ গানেই ফুটে ওঠে পরিবারের সহজ সরল গার্হস্থ্য চিত্র এবং নারীর অন্তরের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা।

ময়ূরপঙ্খী গান

মূলত অন্ত্যজ শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যেই ময়ূরপঙ্খী গানের উৎসব সীমায়িত। বর্ধমানের বিশিষ্ট লোক উৎসব এ গানের উপলক্ষ পৌষ সংক্রান্তি অথবা মকর সংক্রান্তি। তবে

ব্যতিক্রমও রয়েছে। শিবের গাজন কিংবা অন্য পূজার পরিপ্রেক্ষিতে 'ময়ূরপঙ্খী' গানের লড়াইয়ের আয়োজন ঘটে। এ প্রসঙ্গে রায়না থানার অন্তর্গত নারু গ্রামের কথা মনে পড়বে প্রথমেই। 'ময়ূরপঙ্খী' কথাটির অনুষঙ্গে সাধারণভাবে কোন সজ্জিত নৌকার ছবিই ভেসে ওঠে আমাদের চোখের সামনে। কিন্তু এক্ষেত্রে নৌকার স্থান নেয় গোরুর গাড়ি। গ্রামীণ এই যানটিতে বাঁশ, খড়, কাপড় ও রঙিন কাগজের সমন্বয়ে তৈরী হয় ময়ূরপঙ্খী নৌকার আদল। গায়ক ও বাদকেরা বসেন সেই গাড়িতে। দু-টি দলে বিভক্ত হয়ে শুরু করেন ময়ূরপঙ্খী গান। পালার বিষয়রূপে উঠে আসে রাধা ও কৃষ্ণের পারস্পরিক কথোপকথন। কিছুটা কবিগানের ঢঙে উপস্থাপিত এ গানের পূর্ব রচিত বিষয়বস্তু ছাড়াও তাৎক্ষণিক রচনার সুযোগ ঘটে। সব মিলিয়ে জমে ওঠে অনুষ্ঠান। প্রধানত দামোদর নদের তীরবর্তী পলেমপুর, কামালপুর, মূলকাটি, বাঁধগাছা, নতু, সাদিপুর প্রভৃতি গ্রাম ময়ূরপঙ্খী গানের জন্য খ্যাতিমান। তাছাড়া দামোদর তীরবর্তী সদরঘাট থেকে শুরু করে নিম্ন ও দক্ষিণ দামোদর অঞ্চলের রায়না, জামালপুর, খণ্ডঘোষ ইত্যাদি অঞ্চলে ময়ূরপঙ্খী গানের চল আছে। বর্ধমানের ময়ূরপঙ্খী গানের একটি উদাহরণ

'একবার এসো জগৎজননী
মকর-চানে বেরিয়েছে মা, রক্ষা করো তুমি।
মকর-চানে মাগো যেন ঘটে নাকো জ্বালা
মনের আনন্দে হেসে খেলে করি যেন খেলা।'

সাধারণত নদীর চরেই এ গানের আয়োজন করা হয়।

হাপু গান

'হাপু গান' বা 'হাবুগান' রাঢ় বাংলার বিলুপ্তপ্রায় এক শ্রেণীর গান। বর্ধমান জেলার বাজিকর, মাল, বাইতি, কাকমারা, বেদে বা পটুয়া সম্প্রদায়ের মানুষ এ গান গেয়ে বাঙালি গৃহস্থকে আনন্দ দেয়। এদের গান গাওয়ার রীতি বা ভঙ্গি যথেষ্ট পরিমাণে আকর্ষক। অন্ত্যজ শ্রেণীর মহিলা বা ছোট ছেলে মেয়েরা তাদের বগল বাজিয়ে বিচিত্র শব্দ করে অথবা পুরুষ একটি শব্দ করে হাপু গান গায়। শব্দের তালে তালে চলে গান। সে গানের বক্তব্য কখনো অর্থহীন বলে মনে হয় –

'হাপু আতাপাতা লো
হাপু সর্ষেপাতা লো,
হাপু আম খাবি, জাম খাবি,তেঁতুল খাবি লো?'

কোন কোন লোকসংস্কৃতিবিদ মনে করেন যে, 'হা' অর্থে হাহাকার বা দুঃখ বোঝায়। 'পু' শব্দটির অর্থ পূরণ করা। অর্থাৎ 'হাপু' হল দুঃখ বা হাহাকার বর্ণনা। গান গাওয়ার সময় গায়ক 'হাপু' শব্দ করে। যেমন –

'মাই গো মাই, বিহা দিলি নাই -

র‍্যাল গাড়িতে চাপ্যে যাব দেইখতে পাবি নাই -
হা-ফুঃ কদম ফুঃ'।

বাজিকর মেয়েরা একসময়ে গানের সঙ্গে নাচ দেখিয়ে অন্দরমহলেও পৌঁছে যেত। ইদানিংকালে এদের অস্তিত্ব প্রায় বিলোপের মুখে।

ঝাঁপান

বর্ধমান জেলার লোকমানসে অনার্যদেবী মনসা বিশেষ প্রতিপত্তিসহ প্রতিষ্ঠিত। এর অন্তর্গত খুব কম গ্রামই রয়েছে, যেখানে মনসা পূজার স্থায়ী 'থান' নেই। প্রধানত নিম্নবর্ণের লোকায়ত মানুষই এ পূজার আয়োজক। মনসার বন্দনামূলক গানই 'ঝাঁপান' নামে পরিচিতি পেয়েছে। বগাপঞ্চমীর দিন ভক্তের দল মনসার 'বারি' নিয়ে আসে, ঘট প্রতিষ্ঠা করে, পূজা শুরু হয় মায়ের আবাহনে।

'মাকে আনতে চল যাই ক্ষীর নদীর কূল
হাতে দেব হাতবালা, চরণে জবার ফুল।'

পূজার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তের দল ঢাক -কাঁসরের বাজনা সহযোগে গেয়ে ওঠে ঝাঁপান গান। যৌথ কণ্ঠে শোনা যায় মাতৃবন্দনা –

'উত্তরে বন্দি করি আমি কামিখ্যার চরণ।
তার পরে বন্দি করি আমি মা মনসার চরণ'।

ঝাঁপানের মূল বিষয় মনসার উৎপত্তি, বেহুলা-লখিন্দর-চাঁদ সদাগর প্রসঙ্গ এবং অবশেষে মনসার জয়গান। সারারাত ধরে চলে নাচ গানের পালা। আউসগ্রাম থানার কানসা, মেমারী থানার কেজা, চোতখণ্ড, অণ্ডাল থানার মইল প্রভৃতি গ্রামে মনসা পূজা উপলক্ষে ঝাঁপান প্রসিদ্ধি পেয়েছে।

পটের গান

পটচিত্রের সঙ্গে পটের গান অঙ্গাঙ্গি সম্পর্কে আবদ্ধ। আবার পটচিত্র বিচ্ছিন্ন পটুয়া গানের আলাদা কোন মূল্য নেই। প্রকৃতপক্ষে পটচিত্র ও পটের গান উভয়ে মিলিয়েই পটের পূর্ণতা। নিষ্প্রাণ চিত্রকে পটুয়ারা গানের সুরে করে তোলেন প্রাণময়। পটের গানে উন্নত রচনা শক্তির অভাব থাকলেও গায়ন ভঙ্গির আন্তরিকতায় ও লোক সমাজের উপযোগী মনোরঞ্জনের উপকরণ থাকায় গ্রাম জীবনে এর ব্যাপক জনপ্রিয়তা আছে। পৌরাণিক দেব-দেবী পটের বিষয়বস্তু হলেও গানের সুরে দেবদেবীর লৌকিক রূপই প্রাধান্য পায়। অনার্য মানসিকতার উত্তরাধিকার বলে একে গ্রহণ করা যায়। একদিন বর্ধমান জেলার প্রান্তিক মানুষ পটুয়াদের প্রধান জীবিকা ছিল পটের গান গাওয়া। অথচ আজ এই শিল্প এসে দাঁড়িয়েছে মৃত্যুর কিনার ঘেঁষে। ছবি ও গানের যুগল বন্দিতে উপস্থাপিত হয় লোকশিল্পীদের লোকশিক্ষা মূলক কাহিনী। দীঘল পটের প্রথম চিত্রের বর্ণনার পর শুরু হয় দ্বিতীয় এবং

তারপর অন্যান্য চিত্রের বর্ণনা। একদা গৃহস্থের বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে পটুয়া বা চিত্রকরেরা বাদ্যগীতি সহযোগে খণ্ডখণ্ড চিত্রগুলি ব্যাখ্যা করতেন। ফলে একটি অখণ্ড ভাবব্যঞ্জনাময় আখ্যায়িকার সৃষ্টি হত। পটচিত্র যেমন লোকচিত্রকলা, পটের গানও তেমনি লোকায়ত সঙ্গীতের মর্যাদা পেয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে পটুয়াদের দৈনন্দিন জীবনযাপনে হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির সমন্বিত রূপ প্রকাশিত। ফলে দশরথ কাহিনীর পাশে সাজীরপটের গান তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

যাত্রা

যাত্রা লোকাভিনয়ের এক যথার্থ নিদর্শন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, ঢপকীর্তন, মঙ্গলকাব্য, ঝুমুর, কবিগান ইত্যাদি বাংলা নাট্য ঐতিহ্যের মধ্য দিয়ে লোকনাট্যের যে ধারা প্রবাহিত হয়ে আসছিল, যাত্রা তার পরিণত শিল্পরূপ। বর্ধমানের লোকায়ত সংস্কৃতির বিকাশে যাত্রার দান অসামান্য। বাংলা যাত্রাভিনয়কে মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় – কৃষ্ণযাত্রা, গীতাভিনয় ও পৌরাণিক যাত্রা। বর্ধমানের নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় কৃষ্ণযাত্রা পরিবেশনে নতুন যুগের জন্ম দেন। প্রাচীন কৃষ্ণযাত্রা বা কালীয়দমন যাত্রার সঙ্গে বাংলা নাট্যশালার অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র আছে। বীরভূমের শিশুরাম অধিকারী কালীয়দমন যাত্রার প্রবর্তন করেন। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মনে করেছেন - 'কীর্তনের স্রোত মন্দীভূত হইয়া আসিলে প্রাচীন ঝুমুর ও কীর্তন মিলিয়া যাত্রার সৃষ্টি হয়।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে কালীয়দমন যাত্রার প্রভাবে কালক্রমে রামযাত্রার ও গৌরাঙ্গ যাত্রার প্রচলন ঘটে। কাটোয়ার পাতাইহাটের প্রেমচাঁদ অধিকারী রামযাত্রা পরিবেশনে খ্যাতিমান হয়ে উঠেছিলেন। একইভাবে পীতাম্বর অধিকারীর একটি নিজস্ব যাত্রার দল ছিল। পরবর্তীকালে কালনার ভাতছালার মতিলাল রায় পৌরাণিক যাত্রাপালায় বিশিষ্টতা অর্জন করেন। মতিলালের যাত্রার নাম ছিল সখের যাত্রা। গোবিন্দ অধিকারীর শিষ্য নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের হাতে কালীয়দমন যাত্রা নতুন আকার ধারণ করে। কবিত্বে, লোকরঞ্জনে ও জনপ্রিয়তায় তিনি অতিক্রম করেছিলেন পূর্ববর্তী অধিকারীদের। কৃষ্ণযাত্রায় সংলাপের চেয়ে গানের আধিক্য দেখা যায়। নীলকণ্ঠ যেমন কয়েকটি পুরোনো পালা নতুনভাবে নির্মাণ করেছিলেন, তেমনি নিজেও কিছু পালা সৃষ্টি করেন। বস্তুতপক্ষে সেকালে নীলকণ্ঠের খ্যাতি সর্বব্যাপী হয়ে উঠেছিল। একটি গানের উদাহরণ –

'শ্যামের বাঁশি যদি আমি পেতাম
মোহন মুরলী স্বরে সবার মন হরে
মনোহরের মন ভুলাইতাম।
উচ্চবেণী বেঁধে দিতিস বাঁকা
পীতাম্বর দিয়ে সর্ব অঙ্গ ঢাকা
বাঁকা হয়ে না হয় দাঁড়াইতাম।'

তবে একথাও ঠিক যে বৈষ্ণবীয় ভক্তিরস অপেক্ষা লোকনাট্য রসের আস্বাদই কৃষ্ণযাত্রার

প্রাণ। এখনো জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ছোট ছোট আকারে কৃষ্ণযাত্রার দল খুঁজে পাওয়া যায়। পালা চলাকালীন অভিনেতা ও গায়কেরা অর্থ সংগ্রহ করে শ্রোতাদের কাছ থেকে। দক্ষিণ-দামোদর অঞ্চলে এক মুসলমান লোকশিল্পীর যাত্রাদলের অস্তিত্ব ছিল বলে জানা যায়।

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কালীয়দমন যাত্রার বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যহীনতার প্রতিক্রিয়ায় বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী নিয়ে নতুন শখের যাত্রার উদ্ভব ঘটে। সে কালের জনরুচি দেবকাহিনী বর্জন করে অশ্লীল বিদ্যাসুন্দর যাত্রার রসে মগ্ন থাকতে চেয়েছিল। অবশ্য এই বিদ্যাসুন্দর-যাত্রা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ধর্মপ্রাণ বাঙালির ধর্ম পিপাসা চরিতার্থ করার লক্ষ্যে পুনরায় ধর্মভাবমূলক যাত্রা গীতাভিনয়ের উদ্ভব ঘটল। এতে সংলাপ ও সঙ্গীতের সমান গুরুত্ব মেনে নেওয়া হল। এ জেলার বিখ্যাত যাত্রাওয়ালা মতিলাল রায় গীতাভিনয়ের মধ্যে আনলেন নতুনত্ব। ড. হংস নারায়ণ ভট্টাচার্য লিখেছেন - 'অনেকটা প্রশস্ত জায়গা নিয়ে তৈরী হত যাত্রার আসর। আসরের চারিদিকে বসতেন বাদ্যকারগণ। বাদ্যকরের সামনে বসে থাকত ছেলের দল। তারপরে জুড়ি। জুড়ি বা বালকেরা সাধারণত বসেই থাকতেন। প্রয়োজন মতো উঠে দাঁড়িয়ে গান করতেন। অবশ্য কখনও কখনও উঠে এঁরা বাইরেও যেতেন'। (যাত্রাগানে মতিলাল রায়)। জুড়ির গানের পরে নারদ বা কোন মুনি-ঋষির বেশ ধরে মতিলাল রায় আত্মপ্রকাশ করতেন। কথকতার ঢঙে তিনি নীতিমূলক বক্তৃতাদানের পর শুরু হত যাত্রাপালা। নৃত্য,গীত, বাদ্য বক্তৃতা - সব মিলিয়ে মতিলালের যাত্রা সাফল্যের গণ্ডী অতিক্রম করেছিল।

জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত হবার ফলে স্বাধীনতা - উত্তরকালের গ্রামীণ যাত্রার সংকট উপস্থিত হয়েছিল। চিরন্তন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পটভূমি থেকে যাত্রা ছিটকে পড়ল এক আত্ম-অবলুপ্তির লোভনীয় জগতে। সন্দেহ নেই, এই নতুন যাত্রার বিষয়ে ও ভঙ্গিতে এসেছে আধুনিকতা। পৌরাণিক বিষয়ের পাশাপাশি সামাজিক, রাজনৈতিক বিষয়গুলিও সমান গুরুত্ব পেয়েছে। বর্ধমান জেলার বিশিষ্ট অভিনেতা ও পালাকারদের মধ্যে ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল চৌধুরী, রণজিৎ চট্টোপাধ্যায়, অসীম মুখার্জ্জী, রাখাল সিংহ প্রমুখের নাম বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। ইদানীংকালে যাত্রার মঞ্চে আধুনিক আলোক সম্পাত, মঞ্চ সজ্জা, চমকপ্রদ উপস্থাপনা ইত্যাদির ফলে যাত্রার চরিত্র যেভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে, তা নিঃসন্দেহে উদ্বেগের বিষয়।

লেটো

উত্তর-রাঢ় এলাকায় লেটো বা লোটো খুবই জনপ্রিয় লোকসঙ্গীত। পরিবেশনের রীতি বা বিষয়বস্তুর দিক থেকে এই গান অনেকাংশে আলকাপ ধর্মী। সেই অর্থে লেটো এক ধরনের লোকনাট্য, যার লক্ষ্য হল নাট্যরস পরিবেশন। মণিবর্ধন লিখেছেন - 'নাট্যের অপভ্রংশ শব্দ হচ্ছে লাট্য। লাট্যের সংক্ষিপ্ত নাম লেটো।' লেটো গানকে তর্জা, খেউর ও যাত্রাগানের সংমিশ্রণ বলেই মনে করা হয়। সাধারণত মুসলমান সমাজের অধিবাসীরা এই গানের গায়কের দল গঠন করে। শ্রোতাদের মধ্যে মূলত হাড়ি, বাগদি, বাউরি ইত্যাদি সম্প্রদায়

এবং অশিক্ষিত মুসলমানদের বেশী দেখা যায়। সে কারণেই এই গানের পালাও হয়ে ওঠে গ্রামীণ লোকসমাজের উপযোগী। বর্ধমান জেলায় প্রাক্ স্বাধীনতা কাল থেকেই লেটো গানের অস্তিত্ব রয়েছে। অভাবের তাড়নায় নজরুল ইসলাম কিশোর বয়সে লেটোর দলে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি বেশ কয়েকটি পালা রচনা করে তাতে উপযুক্ত সুর সংযোজন করেছেন। যেমন শকুনি বধ, চাষার সঙ্‌, রাজপুত্র, আকবর বাদশা, মেঘনাদ বধ, দাতা কর্ণ, কবি কালিদাস ইত্যাদি। 'শকুনি বধ' পালার একটি গান দৃষ্টান্ত রূপে এখানে তুলে ধরা যেতে পারে –

'শিবা হয়ে পরাজিতে পশুরাজে সাধ
জ্ঞান নাই কি তোর কান্ডাকান্ড
হয়েছিস উন্মাদ!
অজা হয়ে কোন সাহসেতে
বাদ সাধিস মহাবলী বাঘের সাথে,
ভেক হয়ে ফণীর সাথে বাদ।'

সংলাপ ও সঙ্গীতের আশ্রয়ে পরিবেশিত হয় লেটো গান। গায়ক ও শ্রোতাদের রুচি অনুযায়ী মোটা দাগের নাচও পরিবেশিত হয়। এমন কি পালাগান ও তর্জাগানের মাঝে অশ্লীল বিষয়বস্তুও এসে পড়ে। অভিনেতারা সাজসজ্জায় সজ্জিত হয়ে অংশ নেন অভিনয়ে। লেটোর শিল্পীরা প্রতিটি আসরেই শ্রোতাদের নতুন কিছু শোনাবার চেষ্টা করেন। ফলে একই পালায় বিভিন্ন সময়ে শিল্পীদের কথোপকথন বদলে যায়। এ শিল্পের বড় বৈশিষ্ট্য হল, বহুদিন থেকেই একই লেটোর দলে হিন্দু ও মুসলমান শিল্পীরা একসঙ্গে থাকা-খাওয়া করেন। তাদের পালাতেও উঠে আসে সাম্প্রদায়িকতা ও জাতপাতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী উচ্চারণ। বেশ কিছুদিন আগেও আসানসোল কয়লাখনি এলাকায় অনেক লেটোর দলের অস্তিত্ব ছিল। কেষ্ট মুচি, কেষ্ট হাড়ি, ধর্মদাস বাউরির দল সেকালে যথেষ্ট নাম করেছিল। তখন পুরুষ শিল্পীরাই মহিলা চরিত্রে অভিনয় করতেন। সাম্প্রতিককালে অবশ্য লেটোর দলে মেয়েরাও যোগ দিয়েছে। বর্ধমান জেলায় এ সময়ে বিশিষ্ট লেটোগানের ওস্তাদদের মধ্যে জীও জান, কেয়ামত আলি, মানিক খান, শেখ আবু বক্কর প্রমুখের মুন্সীয়ানা সর্বজন স্বীকৃত।

ঝুমুর গান

এক বিশেষ পর্যায়ে সীমান্ত বাংলার লোকসঙ্গীত লোক চরিত্রের আদিম বেষ্টনী থেকে মুক্তিলাভ পল্লীগীতির মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই পর্যায়ের লোকসঙ্গীতের নাম ঝুমুর। বস্তুতপক্ষে ছোটনাগপুরের পূর্ব সীমান্তবর্তী যে অঞ্চল ক্রমশ পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী অঞ্চলের সঙ্গে এসে মিশেছে, সেই সমাজের প্রান্তবাসী আদিবাসী মানুষের লৌকিক প্রেম সঙ্গীত হল ঝুমুর। এই গানে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। বর্ধমান জেলার আসানসোল, রানীগঞ্জ, দুর্গাপুর অঞ্চলে ঝুমুর দলের অস্তিত্ব রয়েছে।

মূলত তারই প্রভাবে বর্ধমানের গ্রামাঞ্চলেও ঝুমুর দল গড়ে উঠেছে। জেলার প্রান্তিক এলাকায় যে সব উপজাতির বসবাস, তারা বর্তমানে দোভাষী হয়ে পড়েছে। অর্থাৎ ব্যবসায়িক প্রয়োজনে এরা নিজস্ব ভাষার সঙ্গে গ্রহণ করেছে বাংলা ভাষাকেও। তাই বিভিন্ন উপজাতি ও অন্ত্যজ শ্রেণীর মধ্যে বাংলা ঝুমুর গানের প্রচলন দেখা যায়। একদা ধনী জমিদার রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ঝুমুরের উদ্ভব ঘটলেও বর্তমানে তা বেঁচে রয়েছে জনসাধারণের অন্তরের তাগিদে। সীমান্ত বাংলার রাধাকৃষ্ণ সম্পর্কিত এই ঝুমুর মোটেই ভক্তি রসাশ্রিত নয়। তা একান্তভাবেই লৌকিক –

'লাল শালুকের ফুল ফুটে আঁধারাতে
যার সঙ্গে যার ভাব বন্ধু মরিলে কি টুটে
বঁধু এত রাত কীসে'।

জেলার বিভিন্ন ঝুমুর দলগুলি রাধা-কৃষ্ণের কাহিনীকে লৌকিক প্রেমের দৃষ্টিতে নৃত্য-গীতের মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকে। এ সমস্ত ঝুমুর কখনো পালার আকারে , কখনো বা এককভাবে গাওয়া হয়। বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী অঞ্চল চুরুলিয়ার সন্তান নজরুল ইসলামের অনেক গানে ঝুমুরের প্রভাব লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। একটি উদাহরণ–

'কুনুর নদীর ধারে ঝুনুর ঝুনুর বাজে
বাজে বাজে লো ঘুঙুর কাহার পায়ে।
হাতে তলতা বাঁশের বাঁশী
মুখে জঙলা হাসি
কে ওই বুনোগো বেড়ায় আদুল গায়ে।'

বাংলার লোকগীতির সুপরিচিত নায়ক কৃষ্ণই এ গানের লক্ষ্য। একথা ঠিক যে ইদানিংকালে কোথাও ঝুমুরে হিন্দি গানের বিকৃত সুরের অনুকরণ প্রবণতা চোখে পড়েছে। তবু জেলার অধিকাংশ ঝুমুর দলই তাদের আদি ও অকৃত্রিম লোকশিল্পটির চর্চায় তন্নিষ্ঠ রয়েছেন।

গাজন গান

গাজন হল রাঢ় বাংলার সবচেয়ে জনপ্রিয় ও বিখ্যাত লোক উৎসব। শিব ধর্মরাজ পূজার প্রধানতম অনুষ্ঠানরূপে গাজনের পরিচিতি থাকলেও গাজনের মূল উৎস নিহিত রয়েছে ঐতিহ্যের মধ্যে। পুরাণ কথায় জানা যায় যে, চৈত্র মাস হল হর-পার্বতীর বিবাহের মাস; সে কারণে এই মাসটিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করে আসে বর্ধমান জেলার মানুষ। এই পালন উৎসবেরই নাম গাজন উৎসব। অতীতে গাজনের মূল অঙ্গ ছিল নৃত্য। বর্তমানে নৃত্যের প্রাধান্য কমে সেখানে এসেছে নানা বিষয়মুখী গানের আয়োজন। বিচিত্র সাজ-পোষাকে ও বিশিষ্ট রীতিতে নাচের মাধ্যমে গাজন তলায় যে গান পরিবেশিত হয়, তাই হল গাজনতলার গান। চৈত্র সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত হয় শিবের গাজন। অন্যদিকে ধর্মরাজের গাজন সম্পন্ন হয় প্রতি বছরে 'বৈশাখী' বা 'বুদ্ধ' পূর্ণিমায়। যোগেশ বিদ্যানিধির অভিমতটি প্রসঙ্গত

স্মরণযোগ্য — 'শিবের গাজনের প্রকৃত ব্যাপার হল হরকালীর বিবাহ। সন্ন্যাসীরা বরযাত্রী। তাহাদের 'গর্জন' হেতু 'গাজন' শব্দটি আসিয়াছে। ধর্মের গাজনে মুক্তির সহিত ধর্মের বিবাহ হয়। এই দুই বিবাহই 'প্রচ্ছন্ন'। এ উপলক্ষে যে গান হয় তাকে মঙ্গলগানের সমগোত্রীয় বলা যেতে পারে। ক্রমক্ষীয়মান হলেও বর্ধমান জেলায় কমবেশি গাজন গানের আসর চোখে পড়ে। এ গানে চাপান-উতোর নাটকীয় পরিবেশের জন্ম দেয়।

বিয়ের গান

মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বিরহের যে অনুষ্ঠান, তার প্রতিটি ক্ষেত্রেই মেয়েদের নিজস্ব আচার চলে আসছে যুগাতীতকাল থেকে। আদিম কোমবদ্ধ জীবনধারায় যে স্ত্রী আচার প্রচলিত ছিল, ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রবল পরাক্রম সত্ত্বেও তা আজও উচ্চবর্ণের অন্দরমহল থেকে মুছে যায় নি। একারণেই লোকাচারের জগতে নিম্নবর্গের নারীর সঙ্গে গ্রামের উচ্চ বর্ণের নারীর পরম একাত্মতা। এমনকি এই সূত্রেই রচিত হয়ে যায় হিন্দু ও মুসলমান নারীর অদৃশ্য যোগাযোগ। বিয়েতে লৌকিক আচার ও গান নারী সমাজের সম্পত্তি। আসলে স্ত্রী-আচার ছাড়া কোন বিয়েই পূর্ণতা পায় না। প্রবীণা মহিলার দল কখনো রসাত্মক ছড়ায়, কখনো বা বিবাহিত মেয়েদের সঙ্গে প্রেম সঙ্গীতের মাঝখানে লৌকিক আচারগুলি সুন্দরভাবে সম্পন্ন করে। অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রসঙ্গত বলেছেন — 'বিয়ের গান প্রত্যেক জাতিরই লোকসঙ্গীতের সর্বাধিক মূল্যবান অংশ।' মোটামুটিভাবে একে তিনটি পর্বে বিভাজিত করা চলে - আয়োজন, অনুষ্ঠান এবং সমাপন। সারা বাংলাদেশ জুড়ে বিয়ের গান একদা বহুল প্রচলিত ছিল 'অশিক্ষিত' নারীমহলে। ইদানিং তথাকথিত আধুনিকীকরণের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রসার কমলেও সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয়নি। বর্ধমান জেলার বাউরি, বাগদি, মুসলিম ও সাঁওতাল সমাজ এখনও এ গানের ধারাকে বয়ে চলেছে অন্তঃসলিলা ফল্গু নদীর ছন্দে। বাউরিদের বিয়ে নাচ - গান ছাড়া কল্পনাই করা যায় না। বাউরি মেয়েদের গান কখনও বা তর্জার চেহারা নেয় —

'ও মাসি মেসে নি
ফুল বাগানে গো মাঝে দুলেনি
ও দোকানি দোকান খোল
ওর গাঁয়ে মিলন হবে তুর।'

অথবা বরকে গাড়ি থেকে নামানোর সময় পাড়া প্রতিবেশী মহিলাদের রঙ্গরসিকতা পূর্ণ গান

'তোর জামাই এলো ভাঙ্গা ফুটো
গাড়িতে গো গাড়িতে
জল দোব না ভাল ঘটিতে।'

এ ধরনের বিয়ের গান কখনো লঘুতার স্তরকে অতিক্রম করে বৃহত্তর সামাজিক ক্যানভাসটিকে প্রতীয়মান করে তোলে। রফিকুল ইসলামের সংগৃহীত এরকম একটি গানের উদাহরণ -

'এ মালা পরলে গলে
থাকবে লো তোর পতি ভুলে
রাঁড়ের গলায় লাথি মেরে
থাকবে লো তোর সাথেতে।'

মুসলমান মেয়েদের বিয়ের গানের প্রতিটি পাতা জুড়ে রয়েছে লড়াকু জীবন সংগ্রামের কাহিনী। এক্ষেত্রে গানের সঙ্গে নাটকের অভিনয়ও মেয়েরা করে থাকে। সবচেয়ে বড় কথা, বিবাহের প্রসঙ্গ ছাড়াও অন্য সামাজিক বিষয়ও বিয়ের গানে ঢুকে পড়ে অবলীলায়। হিন্দু ও মুসলমান মেয়েদের গানে রাধাকৃষ্ণের প্রেম লীলার পরোক্ষ প্রভাব টের পাওয়া যায়। সাঁওতালদের বিয়ের গানের রীতিনীতি বা আচার আলাদা হলেও বিষয়বস্তু এক ছকে বাঁধা।

টুসু

টুসু গল্পপ্রধান উৎসব। গান বাদ দিলে টুসুর কোন অস্তিত্ব নেই। অগ্রাণ সংক্রান্তি বা পয়লা পৌষ থেকে শুরু করে পৌষ-সংক্রান্তি পর্যন্ত এই এক মাসের স্থানীয় উৎসব টুসু। এটা কৃষি-নির্ভর বাঙালির সারা বছরের অন্ন সংস্থানের, জীবন রক্ষার মূল উপাদান ধান সংগ্রহ করার সময়। সে কারণেই অনেকে টুসুকে বলতে চান 'শস্যোৎসব'। এ উৎসবকে কেন্দ্র করে লেখা গানই টুসুগান। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবশ্রেণীর মহিলারাই টুসু গানের রচয়িতা, সুরকার ও গায়িকা। টুসুতে একক মিল্লার বিশেষ কোন মর্যাদা নেই। নিরক্ষর সমাজে লোকসঙ্গীত যে কতশক্তিশালী, তার প্রমাণ এই গান। পৌষ পরবের টানে ঐ সময়ে যে গানগুলি স্বতঃস্ফূর্তভাবে জন্ম লাভ করে এবং একমাত্র ঐ সময়েই গাওয়া হয় — কেবল তাকেই টুসু সঙ্গীত বলে গ্রহণ করতে পারি। এ গান কখনো আনন্দে উদ্বেল, কখনও বা দুঃখের যন্ত্রণায় নীল অথবা দারিদ্র-বঞ্চনার দীনতায় কালো। টুসুর বানীরূপের অন্তস্থল থেকে লোকসমাজ যেন কথা বলে ওঠে, সর্বস্তরের জীবন ভাষা পেতে চায়।

মূলত ছোটনাগপুর, সিংভূম, মানভূম অঞ্চলে, পশ্চিমবাংলার পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বর্ধমান জেলার একাংশে টুসু পরব ও টুসুগানকে ঘিরে অনবদ্য লৌকিক মানসিকতার পরিচয় আমরা পেয়েছি। অনেক সময় ভাদু, টুসু আর ঝুমুরের গান একাকার হয়ে গেছে। নারী মনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা সবই প্রতিফলিত হয় টুসুতে। সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে এ গানের মূল্য অসীম। টুসু লৌকিক দেবী বলেই তার পুজো আর গানে বাংলার লোকজীবনের বাস্তব চিত্র আভাসিত হয়। জীবনের রঙে রঙিন, অভিজ্ঞতার তানে নমনীয় টুসু গানের ভাণ্ডারে এমন অনেক মণি-মাণিক্যের সন্ধান মেলে, যা নিঃসন্দেহে বঙ্গ সংস্কৃতির কণ্ঠে লগ্ন শ্রেষ্ঠ রত্নহার হিসেবে মর্যাদা পেতে পারে। এমনই একটি গান—

'রাত ফুরাল, মকর গেল
বাঁধ গ মাথা জননী।
আর তো টুসু কাঁদিস না গ
বিদায় দুব না আমি।'

এ জাতীয় গানকে বাঙালির আগমনী-বিদায় গানের আদি লৌকিক রূপ বলা যায় অনায়াসেই। গরীব ঘরের মেয়ে টুসু সর্বত্র গামিনী। কখনো সে শ্রমজীবি কামিন, কখনও বা গৃহনন্দিনী। রানীগঞ্জের বটতলায়, কয়লার খাদে, ধানবাদে, কাঁসাই নদীর তীরে এই টুসু বিরাজমান। শিল্পাঞ্চলে বহুল প্রচলিত একটি টুসুর নমুনা –

'চল টুসু চল্ খেলতে যাব রানীগঞ্জের শহরে
ঐ পথে চল্ দেখে আসব কয়লা খাদের মহরে,
কয়লাখাদের ময়লাবাবু সে করে টুসু পূজা
সন্ধ্যা হলে শীতল লাউমা কলিকাতার ফুল বাতাসা।'

টুসু গানে সমাজ মনের জীবনযন্ত্রণা ও প্রতিবাদ আত্মপ্রকাশের ভাষা খুঁজে পেয়েছে। ভূমিহীন কৃষক ও প্রান্তিক চাষীর সংগ্রামী মেজাজ দর্পণের মতো প্রতিফলিত করেছে কিন্তু টুসু গান –

'টুসু ইবার জ্যাগছে চাষী
কাস্তেতে দ্যাখ দিচ্ছে সান —
রক্তে রুয়া ফসল তুলে
খামারে আজ গাইছে গান।'

এই ধরনের সময় সচেতনতা টুসুতে এলেও এরফলে লোকসঙ্গীতের ধর্ম ব্যাহত হয়নি।

বোলান

'বোলানগান' কথাটি সাধারণের মধ্যে প্রচলিত থাকলেও বোলান বাংলাদেশের লৌকিক নাট্যের বিশিষ্ট রূপ। চৈত্র সংক্রান্তির সময় গাজন উপলক্ষে বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ জেলার 'সন্ন্যাসী'রা সারা রাত ধরে গান-পাঁচালিতে অংশ নেয়। এ ধরনের গানই বোলান। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে দলবদ্ধভাবে নাট্যধর্মী ও শিল্পরীতি পরিবেশন করে অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ। নৃত্যমূলক এই রীতিতে লোকশ্রুতিমূলক কোন পৌরাণিক কাহিনীকে পালাবদ্ধরূপে লৌকিক সুরে, মৌখিকভাবে উপস্থাপিত করে। সীতার বনবাস, লবকুশ, রাজা হরিশচন্দ্র, দাতা কর্ণ, শ্রীকৃষ্ণের নৌকা বিলাস, সাবিত্রী সত্যবান প্রভৃতি প্রসঙ্গ ঘুরে-ফিরে আসে। 'বোলান' শব্দের উৎস বিতর্কিত। অনেকে মনে করেন যে, 'বোল' শব্দের প্রভাবে বোলান কথাটি এসেছে। যে গানে দুই ব্যক্তির বোল কাটাকাটি অর্থাৎ উক্তি-প্রত্যুক্তি চলে, তাই বোলান। অবশ্য অন্য একটি অর্থও করা যায়। 'বুল' ধাতু থেকে এসেছে 'বোল'। তার মানে হল চলা বা ভ্রমণ করা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, প্রধানত রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকেই পালাবদ্ধরূপে লৌকিক সুরে শৌখিনভাবে পরিবেশন করা হয়। অন্য কোন উচ্চ আদর্শের সন্ধান এখানে নিরর্থক। পৌরাণিক উপাখ্যানের লৌকিক অন্তরঙ্গরূপে আরোপিত হয় মাত্র।

বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমা বোলানের জন্যে বিখ্যাত। মুর্শিদাবাদ ও নদীয়ার সংলগ্ন

হওয়ার কারণেই এখানে বোলানের বিস্তার। চৈত্র মাসের যে কোন সন্ধ্যায় গ্রামে গ্রামে শোনা যায় বোলানের গান। প্রায় এক মাস ধরে চলে 'রিহার্সাল'। খাজুরডিহি গ্রামে মধুসূদন ঘোষাল, কেতুগ্রামের ভবতারণ সিংহ, সুভাষ ঘোষ, মানিক ঘোষ প্রমুখের লেখা পালার চাহিদা বেশী। ধর্মীয় বিষয়বস্তু ছাড়াও সামাজিক-রাজনৈতিক প্রসঙ্গ সরাসরি বোলানের গানে ঠাঁই পেয়েছে। বোলানের উপস্থাপনায় রয়েছে একটি দীর্ঘ কাহিনী-গীতি। সূচনায় থাকে গণেশ অথবা সরস্বতীর বন্দনা। তারপর শুরু হয় আসল গীতিনাট্যের কাহিনী। দৃশ্যের পর দৃশ্যে ঘনীভূত হয় নাটকীয়তা। মূল গায়েন একটি পদ বলে আর দোহারীরা যৌথকণ্ঠে তার পুনরাবৃত্তি করে। বোলানের চারটি প্রকারভেদ দেখা যায় - পোড়ো, ডাক, সাঁওতেলে আর পালাবন্দী।

পোড়ো বা শ্মশান বোলানের প্রধান বিশেষত্ব হল, মড়ার মাথাকে সামনে রেখে সঙ্গীত সহযোগে গৃধিনী নৃত্য। দশ বারোটি মড়ার খুলি মাঝে রেখে নৃত্যশিল্পীরা প্রথমে গোলাকৃতি হয়ে বসে। বীভৎস তাদের সাজ, মুখে ভয়াবহ চিৎকার। সমগ্র পরিবেশে ফুটে ওঠে তন্ত্র মন্ত্রের আচ্ছন্নতা। ঢাক আর কাঁসি বাজনার সঙ্গে চলে গান –

' আমার কোল ভরা ধন
কোলের মাণিক কে কেড়ে নিল।
যার মরে কোলের ছেলে
সে কি থাকবে নারে ধৈর্য্য ধরে' ইত্যাদি।

কবি গানের সঙ্গে ডাক বোলানের প্রধান গায়ক চরিত্রের বেশ মিল। তার সঙ্গে থাকে দোহারী – তারা শুধু অনুসরণ করে মূল গায়ককে। সীতার অগ্নিপরীক্ষা, সীতার বনবাস, মহিষাসুর মর্দিনী, নৌকাবিলাস, মান ভঞ্জন প্রভৃতি কাহিনী ডাক বোলানে জনপ্রিয়। ইদানিং এসে যাচ্ছে সামাজিক সমস্যা ও রাজনৈতিক প্রসঙ্গ। সাধারণ পোশাকেই গাজন তলায় প্রবেশ করে গায়কের দল। এই বিবরণধর্মী গানের সঙ্গে গাথামূলক গান বা গীতিকার সাদৃশ্য স্পষ্ট। পনেরো-কুড়ি জনের বোলান দল লাঠি হাতে সারবন্দী দাঁড়িয়ে পরিবেশন করে গান, সাঁওতেলে বোলানের প্রধান বিশেষত্ব হল যৌথ নৃত্যের উদ্দামতা। অবশ্য এর নৃত্য ভঙ্গিতে সাঁওতালী নাচের বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই। ঢোল, বাঁশি, মাদল, করতাল, জয়ঢাকের বাজনা সহ বোলানের দল কালো জাঙ্গিয়া, কালো গেঞ্জি পরে, মাথায় হাঁস-মুরগীর পালক বেঁধে নৃত্যগীতে জমিয়ে তোলে আসর। অংশগ্রহণকারীরা সংখ্যায় কুড়ি-পঁচিশ থেকে একশো জন পর্যন্ত হয়ে থাকে। পালাবন্দী বোলানের প্রকরণটি অনেকটা সংক্ষিপ্ত যাত্রার মতই। এর বিষয়বস্তু ডাক বোলানের মতোই। তবে একজন গায়কই একাধিক চরিত্রের সংলাপ গায় না, বরং বিভিন্ন ব্যক্তি সেটা অভিনয়ের মাধ্যমে দেখায়। অবশ্য গানের অংশই বেশী, গদ্য সংলাপ প্রায় থাকে না। ডাক বোলান বা পালা বোলান উভয় ক্ষেত্রেই নারীর ভূমিকায় থাকে পুরুষেরা। তারা চোখে পরে নীল চশমা।

বোলানের রচয়িতারা অনেক সময়ই উঠে আসেন নিরক্ষর শ্রমজীবি অংশ থেকে। এদের

স্বভাবকবি বললে ভুল হবে না। কেতুগ্রামের ক্ষ্যাপারাম মাঝি বা রঘু মাঝি অক্ষরজ্ঞানহীন হয়েও বোলানের নানা রচনায় বিস্ময়কর প্রতিভার ছাপ রেখেছেন। নাগরিক প্রভাবে ইদানিং বোলানের বিষয়ে ও ভঙ্গিতে এসেছে আধুনিকতা।

সত্যপীরের গান

সত্যপীরের গান বা পাঁচালি বর্ধমান জেলার অসাম্প্রদায়িক সংস্কৃতির একটি প্রতীকি উপস্থাপনা। হিন্দুর বাড়িতে সত্যনারায়ণ পুজোয় যে পাঁচালি পড়া হয়, তা তাৎপর্য বিহীন। কিন্তু দরগার সামনে, মেলায় বা আসরে মুসলমান গায়েন সত্যপীরের পাঁচালি নামে যে সব কাহিনী পরিবেশন করে, তা যেমন চিত্তাকর্ষক, তেমনি সম্প্রদায় নিরপেক্ষ। হিন্দুর নারায়ণ আর মুসলমানের পীর একাকার হয়ে যান ফয়জুল্লার সত্যপীরের এ গানে –

'হিন্দুর দেবতা আমি মুসলমানের পীর।
দুই কুলেতে পূজা লই দুই কূলে জাহির।।'

রয়ানি - অষ্টমঙ্গলার পরিবেশন রীতির সঙ্গে সত্যপীরের গানের মিল অনেকখানি। চারপাশের দর্শক ও শ্রোতাদের ভিড়ের মাঝে একজন গায়েন তাঁর সহযোগী জনাদুয়েক দোহারসহ আত্মপ্রকাশ করেন। সঙ্গে থাকে ঢোল-কাঁসির বাজনাদার। গায়েনের হাতে থাকে কালো চামর অথবা রুমাল। গায়েনও দোহারের সংলাপের ফলে কখনো নাটকীয়তা জন্ম নেয়। তাদের অঙ্গভঙ্গিও বাড়তি দৃশ্যময়তা সৃষ্টি করে। আরব্য বা পারস্য রজনীর ঢঙে রোমান্টিক প্রেম ও অ্যাডভেঞ্চারের মিশ্রণ থাকে সত্যপীরের গানে। ফলে শ্রোতাদের আকৃষ্ট ও উত্তেজিত করে। জিন, পরী, রাজপুত্র, রাজকন্যা, উড়ন্ত ঘোড়া, পুরুষ থেকে নারীতে রূপান্তর ইত্যাদি আজগুবি বিষয় এ গানে জায়গা পায়। কখনো শ্রোতাদের দাবি অনুযায়ী গান বাঁধা হয়। গাজীর গানের তুলনায় সত্যপীরের পাঁচালি লোকশিল্প হিসেবে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্যতা পেয়ে থাকে।

বহুরূপী

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'শ্রীকান্ত' গ্রন্থে ছিনাথ বহুরূপীর প্রসঙ্গ এনেছিলেন। সে বাঘ সেজে ভয় দেখিয়ে আনন্দ দিতে চেয়েছিল। বস্তুতপক্ষে এই বহুরূপী বিলোপমুখী একটি বহু প্রাচীন লোকনাট্য। ঠিক কোন সময়ে এর উদ্ভব ঘটেছিল, তা নিশ্চিত বলা কঠিন। বহুরূপীর মধ্যে রয়েছে দু'টি শ্রেণী - একক অভিনয়ের এবং যৌথ অভিনয়ের। অনেকের ধারণা, একক-অভিনয়ই বহুরূপীর আদি রূপ ধরে যাত্রার প্রভাবে যৌথ অভিনয়ে পর্যবসিত হয়েছে। একক বহুরূপীই প্রাচীনতর। বাঘ-সিংহ ভালুক সেজে ভয় দেখানো এবং শেষ পর্যন্ত মুখোস খুলে শিশুর কান্না থামানো একক বহুরূপীর একটি জনপ্রিয় বিষয়। একক বহুরূপী প্রদর্শনী বাংলার লোকায়ত অনুষ্ঠানে বহু ব্যবহৃত রীতির আদর্শে গড়ে উঠেছিল। এর শিল্পীরা বলাবাহুল্য দরিদ্র, শ্রমজীবি অংশের মানুষ। বছরভোর অন্য কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে কাছাকাছি গাঁ-গঞ্জে বা শহরে অভিনয় করে বেড়ায় পেটের তাগিদে। কখনো এরা

রাধা, কৃষ্ণ, রামচন্দ্র বা রাবণের মুখোস পরেও অভিনয় করে। একক অভিনয় বলেই ঘটনা বা সংলাপে দর্শককে আকৃষ্ট করার সুযোগ থাকে কম। চলতি সংস্কৃতির চটকদারি উত্তেজক চেহারার নামে বহুরূপীর বিবর্ণ সাজ এখন মনোরঞ্জনের ক্ষমতা হারিয়েছে। তবুও দারিদ্রক্লিষ্ট মানুষের নিজস্ব সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখার নিয়ত প্রয়াসকে অভিনন্দিত করতেই হয়।

লোক নৃত্য

রায়বেঁশে

জমিদার ও সামন্ত প্রভুদের মনোরঞ্জনের জন্যে, তাদের পারিবারিক উৎসবের অঙ্গ হিসেবে একদা যে 'রায়বেঁশে' নামক নৃত্য গীতের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল, আজ তা কালের বিবর্তনে লোক নৃত্যের শিরোপা পেয়েছে। অনেকে মনে করেন, 'রায়ঁবেশে' কথাটি এসেছে 'বিটা' থেকে (বিটা>বিশ >বেশে)। 'বিটা' শব্দের মানে হল শক্তিশালী জনগোষ্ঠী। তাদের আচরণীয় কৌশলকে বলা হয় 'বিশ' বা 'বেশে'। এই 'রায়' অর্থাৎ জমিদারদের আশ্রিত জনগোষ্ঠীই খ্যাত 'রায়বেঁশে' নামে। বর্ধমান জেলাতেও এক সময় শক্তিশালী 'রায়বেঁশে' গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটেছিল। মূলত ভল্লা, বাউড়ি,বাগদি সম্প্রদায়ের মানুষ এতে অংশ নেয়। নৃত্যপ্রধান গীতের সঙ্গে দেখানো হয় ব্যায়াম কৌশল। আধুনিক কালেও পারিবারিক অনুষ্ঠানে 'রায়বেঁশে' শিল্পীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়।

'দাদার বিয়ে যেমন তেমন
দিদির বিয়ে রায়বেসে
আয় ঢকাঢক মদ খেসে।'

বলিষ্ঠ উদ্দাম নাচের সঙ্গে সঙ্গে এই ধরনের লোকগান এক মোহময় পরিবেশ রচনা করে। তবে সাম্প্রতিককালে গান ছাড়াই শুধু ব্যায়াম ও শারীরিক কসরত পরিবেশনে এ লোকনৃত্যটি তার ক্ষীয়মান অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার আয়োজনে ব্যপ্ত রয়েছে। বাংলার ব্রতচারী আন্দোলনের প্রবাদপুরুষ গুরুসদয় দত্ত রায়বেঁশেকে অবলুপ্তির হাত থেকে বাঁচাতে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। উন্নত প্রশিক্ষক ছাড়াই এদের শরীর-প্রদর্শনের সূক্ষ্ম উপস্থাপনা বিস্ময়কর মনে হয়। কাটোয়া থানার কোশিগ্রামের অনিল ধর্মপণ্ডিত, দুঃখহরণ ধর্মপণ্ডিত প্রমুখের চালনায় রায়বেঁশে দলটির নৈপুণ্য অসাধারণ। কেতুগ্রামের গঙ্গাটিকুরীতেও রায়বেঁশে চর্চা প্রশংসার যোগ্য।

রণপা ও লাঠি নাচ

'রণপা' শব্দটির সঙ্গে আমরা পরিচিত আশৈশব। প্রধানত ডাকাতির প্রসঙ্গে রণপার কথা আমাদের জানা। শোনা যায়, এক সময় রণপা ছিল ডাকাতদের দ্রুতগামী বাহন, যার অবলম্বনে স্থান থেকে স্থানান্তরে গমন ছিল সহজসাধ্য। রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলার

রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতায় 'রণপা'র ছবিটি এরকম - 'খুব বড়ো একজোড়া লাঠির মাঝখানে আড়-করা একটা করে পা রাখবার কাঠের টুকরো বাঁধা। এই লাঠিকে বলে রণ্পা। দুই হাতে দুই লাঠির আগা ধরে সেই নাদানের উপর পা রেখে চললে এক পা ফেলা দশ পা ফেলার সামিল হবে, ঘোড়ার চেয়ে দৌড় হত বেশী। ডাকাতি করবার মতলব যদিও মাথায় ছিলনা, তবু এক সময়ে এই রণ্পায় চলার অভ্যাস তখনকার শান্তিনিকেতনে ছেলেদের মধ্যে চালাবার চেষ্টা করেছিলুম' (ছেলেবেলা)। সেই রণপা আজ লোকসংস্কৃতির অঙ্গনে প্রবেশ করেছে লোকনৃত্যের পোশাকে। কাটোয়া মহকুমার সুদপুর গ্রামের রণপা দলের খ্যাতি এখন রাজ্যের গণ্ডী ছাড়িয়ে সর্বভারতীয়। গরীব-ক্ষেতমজুর শ্রেণীর মানুষেরাই এ লোকনৃত্যের প্রধান কুশীলব। কুড়ি - পঁচিশ জনের দলে নৃত্যকারীদের সঙ্গে থাকে বাজনাদার। দলবদ্ধ শিল্পীরা কখনো গোল হয়ে, কখনো বা সারিবদ্ধভাবে বাজনার তালে তালে নৃত্য করে। বলাবাহুল্য, এ নৃত্য যথেষ্ট শ্রমসাধ্য। পঞ্চাশ বছর আগে সুধানন্দ বৈরাগ্য জন্ম দেন রণপা নৃত্যের। পরবর্তীকালে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের যোগ্য নেতৃত্বে সুদপুর বান্ধব নাট্য সমিতির রণপা শিল্পীরা সৎ বিনোদনের ধারাকে বহন করেছেন। একটা সময়ে বোলান গানের আগে রণপা নৃত্য প্রদর্শিত হতো। এখন বোলান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রণপা নৃত্য একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ লোকনৃত্যকলা রূপে বিশিষ্টতা পেয়েছে।

কাঠি নাচকে ব্রতচারীর এক সংস্করণ বললে অত্যুক্তি হয় না। এটিও যৌথনৃত্য। কুড়ি থেকে তিরিশ জনের নারীপুরুষ একসঙ্গে দাঁড়িয়ে, বসে অথবা আধ-শোয়া অবস্থায় কাঠির আঘাতে নৃত্যের তরঙ্গ তোলে। প্রত্যেকের হাতে থাকে ছোট ছোট কাঠি। বাজনার সহযোগ এই লোকনৃত্যকে করে তোলে ছন্দময় ও শ্রীমণ্ডিত। বর্ধমান জেলার সব মহকুমাতেই কম বেশি কাঠি নাচের দল রয়েছে। তবে কাটোয়ার নারায়ণপুর গ্রামের নিশাই প্রধান পরিচালিত দলটির প্রযোজনার মান সবচেয়ে উৎকৃষ্ট। রণপা ও কাঠি নাচ উভয় লোকনৃত্যের শিল্পীরাই বর্ণময় সাজে নিজেদের সজ্জিত করে।

বাঘনাচ

বিলুপ্তমুখী বাঘনাচ বর্ধমানের একটা লৌকিক উৎসব। বাঘের মুখোশ পরে অথবা বাঘছাপ -পোশাক পরে পালন করা হয় এই উৎসব। নাচের সঙ্গে সঙ্গে উপস্থাপিত হয় গানও। এর নাম বাঘনাচের গান। ছড়াধর্মী এ গান শোনায় বাঘরূপী কোন শিল্পী। আশুতোষ ভট্টাচার্য সংগৃহীত বাঘনাচের একটি গান —

'ঝাড়লাম ঝুড়লাম খেয়ে একটি আতা,
নেড়ে চেড়ে দেখ্‌রে খোঁড়ার খেয়ে ফেলেছে মাথা।
ঝাড়লাম ঝুড়লাম খেয়ে একটি পান,
নেড়ে চেড়ে দেখ্‌রে খোঁড়ার খেয়ে ফেলেছে কান !'

বর্ধমান সদর মহকুমার নবস্থা অঞ্চলে এখনো বাঘনাচের সন্ধান পাওয়া যাবে।

শেষের কথা

সমগ্র বাংলার লোকসংস্কৃতিতে তথা সাংস্কৃতিক জীবনে একটি মূলগত ঐক্য আছে। বিশেষ করে ভূমি ব্যবস্থা - যার ওপর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চেতনা অনেকাংশে নির্ভরশীল - তার পরিকাঠামো ও চরিত্র বাংলার প্রায় সর্বত্র সমান। তাই ভূমিব্যবস্থার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় সুখ দুঃখের যে অনিবার্য ইঙ্গিত, তা নাড়া দিয়েছে সমানভাবে। ঠিক সেই কারণেই ভাবনার ক্ষেত্রে সুদূর দক্ষিণবঙ্গ বা পূর্ববঙ্গের লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলির সঙ্গে রাঢ়বাংলার লোকসংস্কৃতির মূলগত কোন তফাৎ নেই। আবার এটাও অস্বীকার করা যায় না যে, বর্ধমান জেলার একটি বিশেষ ভৌগোলিক সত্তা, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সমাজ জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে তার লোক সংস্কৃতির উপকরণে নিজস্ব একটি রূপ গড়ে উঠেছে। ভাষা, সুর, ছন্দ, প্রকাশভঙ্গিতে সে অনন্য; তার শরীরে লেগেছে আঞ্চলিক বিশেষত্বের ঢেউ। সেই বিশেষত্বগুলিকে চিনিয়ে দেবার উদ্দেশ্য থেকেই এই আলোচনার সূত্রপাত। বলাই বাহুল্য যে, এত সংক্ষিপ্ত পরিসরে বর্ধমানের মতো বিস্তৃত জেলার লোক সংস্কৃতির চরিত্রকে তুলে ধরার প্রয়াস কখনোই সম্পূর্ণতার দাবি রাখে না। একে প্রাথমিক রূপরেখা বা প্রস্তাবনা হিসেবে দেখাই সঙ্গত।

বাংলা সাহিত্যে বর্ধমানের দান

ড. বারিদবরণ ঘোষ

।।১।। প্রত্যেক দেশেই স্থানীয় সাহিত্য বলে একটা ব্যাপার থাকেই। এই স্থানীয় সাহিত্য একদিকে যেমন একটি বিশেষ অঞ্চলের ভৌগোলিক বিবরণের তৎকালীন দলিল হয়ে থাকে, তেমনি সমসাময়িক ভাষাবৈশিষ্ট্য, আচার-আচরণ এবং কিছু বাস্তব কাহিনীরও তারা আকর হয়ে থাকে। জেলাভিত্তিক সাহিত্য চর্চায় এই বৈশিষ্ট্যকে বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়ে থাকে। তবে রচনার বহুজনগ্রাহ্যতা এবং চিরন্তনতা অচিরে স্থানিক সাহিত্যকে সার্বজনীন সাহিত্যে পরিণত করে। তখন তাকে আর স্থানীয় গণ্ডীর মধ্যে বেঁধে রাখা যায় না। কাশীরাম দাস জন্মসূত্রে বর্ধমানের অধিবাসী হতে পারেন, কিন্তু তাঁর মহাভারত এখন বঙ্গালী কেন, সমগ্র ভারতেরই জাতীয় সম্পদ। তবুও মানুষ গৌরব করেন তাঁর কাছের মানুষকে নিয়েই। স্বভাবতই বর্ধমানের মানুষের কাছে বর্ধমানের সাহিত্যিকরা, মনীষীরা আপনজন। লোকজীবনে যদি এই স্থানিক গুরুত্ব না থাকতো তবে জাতীয়তাবোধ ধীরে আর্ন্তজাতিকতায় পরিণত হতে পারতো না।

পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে বর্ধমান জেলা বিস্তারে এবং প্রাচীনত্বে গৌরবজনক স্থানাধিকারী। এর জন্মের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ভারতীয় ধর্ম বিস্তারের ইতিহাস, এর মৃত্তিকাগঠনে আছে প্রাচীন পৃথিবীর স্তর বৈশিষ্ট্য, এর মাটির উর্বরতা একে পরিচিত করেছে রাঢ়ের শষ্যভাণ্ডার রূপে। যেখানে আর্থিক প্রাচুর্য্য থাকে সেখানে সংস্কৃতির নানা বিকাশ সহজসাধ্য হয়। অবশ্য সাহিত্যিকের মধ্য সংগ্রাম না থাকলে সাহিত্যের সৃষ্টি হয় না। শিশু যদি 'ওদনের' জন্য না কাঁদত, তবে মুকুন্দরাম ব্যর্থ হতেন। অনেক লাঞ্ছনা-কারাবাস ভারতচন্দ্রের কাব্যের 'রাজকণ্ঠের মনিমালা' নির্মাণ করেছেন।

।।২।। বাংলা সাহিত্যের সূচনা যখন হল, তখন সিদ্ধাচার্যদের মধ্যে কেউ বর্ধমানের অধিবাসী ছিলেন কিনা জানি না। তবে বাংলা সাহিত্যের আদি মধ্যযুগ থেকেই বাংলা সাহিত্যের ভুগোলে বর্ধমান তার একটা নিজস্ব স্থান করে নিয়েছে। আমরা বিতর্কমূলক প্রশ্ন পারতপক্ষে এড়িয়ে যেতে চাইছি। নইলে হয়ত প্রবল উৎসাহে কোন এক চণ্ডীদাসকে বর্ধমানের কেতুগ্রাম থেকে বীরভূমের নানুরে পাঠিয়ে দিতাম। কিন্তু কবি মালাধর বসুকে নিয়ে বিতর্কের কোন স্থান নেই। তাঁর 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' কাব্য আদি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন হয়ে আজও জীবিত। এর রচনাকাল তেরশ পঁচানব্বই শকে গ্রন্থ আরম্ভন। চতুর্দশ দুই শকে হৈল সমাপন।। কোন হেঁয়ালী নেই, অঙ্কস্য বামাগতির কোন হিসাব নিকাশ নেই- একেবারে সোজাসুজি রচনা সমাপ্তকাল ১৪৮০ খৃষ্টাব্দ। মালাধরের জন্মস্থান কুলীন গ্রাম মেমারীর সন্নিকটে। কুলীন গ্রাম সম্পর্কে চৈতন্যদেব মন্তব্য করেছিলেন ঃ কুলীন গ্রামের ভাগ্য কহনে না যায়। শূকর চড়ায় ডোম সেহো কৃষ্ণ গায়।। মালাধর বসুর বংশজকে তিনি বলেছিলেন - তোমার কা কথা তোমার গ্রামের কুক্কুর। সেহ

মোর প্রিয় অন্যজন রহু দূর।। মালাধরই বর্ধমান জেলাকে প্রথম সাহিত্যের জয়মাল্যটি পড়িয়ে গেছেন।

তাঁর সমসাময়িক কালেই বাংলা সাহিত্যের দুটি ধারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হতে শুরু করেছিল মঙ্গলকাব্যের ধারা এবং বৈষ্ণব কাব্যের প্রবাহ। মনসামঙ্গল কাব্যের রচয়িতা কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ সম্ভবত বর্ধমানেরই অধিবাসী ছিলেন। তিনি তাঁর কাব্যে বেহুলার যাত্রাপথে যেসব স্থানের উল্লেখ করেছেন তা সবই আধুনিক বর্ধমান জেলার মধ্যে পড়ে - যেমন পুরনো দামোদরের খাত বেয়ে বেহুলার ভেলা ভেসে যাচ্ছে - বাঁকা - বেহুলা - বল্লুকা - গাঙ্গুরের তীরে তীরে।

মঙ্গল কাব্যের আর কবি (তাঁর কাব্যের নাম তিনি জগতীমঙ্গলও বলেছেন) রসিক মিশ্রের বাড়ি ছিল আধুনিক বর্ধমান জেলার উত্তর পশ্চিমে সেনভূম পরগণার কাঁকুটিনন্দপুর গ্রামে। পরে অবশ্য তিনি বাঁকুড়ায় গিয়ে বসবাস করেন।

চণ্ডীমঙ্গলের সুখ্যাতকবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীও বর্ধমান জেলার অধিবাসী ছিলেন। বর্ধমানের রত্নানদীর কূলে দামুন্যা বা দামিন্যা গ্রামে তার বাস ছিল। কবি নিজেই বলেছেন দামুন্যায় করি কৃষি। দামিন্যা যাঁর তালুক ছিল সেই গোপীনাথ নন্দী বাস করতেন দামোদরের পূর্বতীরে জামালপুর থানার অন্তর্গত সেলিমাবাদ শহরে। অনেকে মনে করেন বর্ধমান ছেড়ে বাঁকুড়ায় যাবার পর তিনি চণ্ডীমঙ্গল কাব্য লিখেছেন। তা ঠিক নয়। তাঁর এই বিখ্যাত কাব্যটির প্রথম অংশ লিখিত হয়েছিল এই দামিন্যাতেই। ১৫৪৪ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে তাঁর কাব্য রচিত হয়।

বর্ধমান জেলার দুই প্রধান কবি রূপরাম চক্রবর্ত্তী এবং ঘনরাম চক্রবর্ত্তী বর্ধমান জেলার মানুষ ছিলেন। রূপরামের পৈতৃক নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার দক্ষিণে কাইতির পাশে শ্রীরামপুরে - দামিন্যা থেকে প্রায় নয় কিলোমিটার উত্তর পশ্চিমে। সেখানে তাঁর পিতা শ্রীরাম চক্রবর্ত্তীর একটি টোল ছিল। পাসণ্ডা, আড়ুই প্রভৃতি গ্রাম কাছেই। পলাশনও খুব দূরবর্ত্তী নয়। পলাশনের বিলেই ধর্মঠাকুরের আদেশ পেয়ে তিনি ধর্মমঙ্গল কাব্য লেখেন। পরে তিনি উচালন কাজীপাড়ায় বাস করতেন। পড়তে যেতেন চার কি. মি. দূরে শাকনারা গ্রামে। শোনা যায় পাঠ্য অবস্থাতেই তিনি এক হড়ডিপ তনয়ার প্রতি আসক্ত হন। রূপরামের কাব্য সমস্ত বর্ধমান জেলাজুরে মিলেছে।

আর ধর্মমঙ্গল কাব্যের সবচেয়ে শিক্ষিত কবি ঘনরাম চক্রবর্ত্তীর বাড়ি ছিল কৈয়ড় পরগণায় কৃষ্ণপুর গ্রামে দামোদরের দক্ষিণ তীরে বর্ধমান শহর থেকে প্রায় ১১ কিলোমিটার দক্ষিণে। মামার বাড়ি রায়না। ঘনরাম নিজে বর্ধমান মহারাজার বৃত্তিভোগী ছিলেন।

জগৎ রায় পূর্ণব্যস্ত পূণ্যের প্রভায়
মহারাজ চক্রবর্ত্তী কীর্তিচন্দ্র রায়।
আর্শীবাদ করি তার বসিয়া বারামে

কইয়ড় পরগণা বাটি কৃষ্ণপুর গ্রামে।

মহারাজার প্রতি কৃতজ্ঞতা বশতই সম্ভবত তিনি লিখেছিলেন 'রাজার মঙ্গল চিন্তি দেশের কল্যাণ'।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের অপর এক কবি নরসিংহ বসুর পৈতৃক বাড়ি ছিল বসুধা পানাগড় থেকে ইলামবাজার যাবার পথে অজয়ের উপর সেতুর কাছে। বসুধা থেকে তাঁর পিতামহ এসে বাস করেন বর্ধমান শহরের ৮ কিমি দক্ষিণে শাঁখারিতে - ঘনরামের বাসস্থান কৃষ্ণপুরের কাছে। তিনিও প্রথমে শাঁকারির জমিদার এবং পরে বর্ধমান মহারাজার প্রশংসা করেছেন।

অধিকারী দেশের শ্রীকীর্তিচন্দ্র রায়
জগজনে যাহার যশের গুণ গায়।

তিনিও দামিন্যায় গিয়েছিলেন। ১৬১৪ খৃষ্টাব্দে তাঁর কাব্য রচনা আরম্ভ হয়। কবি হৃদয়রাম সাউও ধর্মলেখা শেষ করেন ১১৪৬ বঙ্গাব্দে। তাঁর বাড়ি ছিল বনপাশ স্টেশনের কাছে খুরুল গ্রামে –

নিরঞ্জনচরণে সদাই অভিলাষ
ইহা গাইল হৃদয় সৌ খুরুলে যার বাস।।

ঘনরামের বাড়ি কৃষ্ণপুরের কাছে সেহেরা গ্রামে বাস করতেন ধর্মমঙ্গলের আর এক কবি রামাকান্ত রায়। তাঁর আত্মোৎকাহিনীতে দক্ষিণরাঢ়ের চাষী পরিবারের ১৮ শতকের ছবি দেখতে পাওয়া যায়। মহারাজা তেজচন্দ্রের জমিদারি এই গ্রামে। পিতা বেকার রামাকান্তকে চাষের কাজে যেতে বললে তিনি নারাজ হয়ে শেষে মাঠে চাষ দেখতে গেলেন। সেখানেই তাঁর ধর্মঠাকুরের দর্শন ঘটে।

।।৩।। অনুবাদ কাব্যের মধ্য যুগের সেরা অনুবাদ ছিল দুটি কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত। কাশীরাম দাস বর্ধমানেরই কবি ছিলেন বলে একাংশেরা দাবী করেন। কাশীরাম এবং গদাধর দাস দুজনেই 'সিদ্ধি' বা 'সিঙ্গি' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন বলেছেন। কাটোয়ার অনতিদুরে সিঙ্গিগ্রামে কেশেপুকুর এবং 'কাশীরামের ভিটা' আবিষ্কৃত হলে সিঙ্গি গ্রামেই কাশীরামের বসতি ছিল বলে দাবী উঠল। আর 'সিদ্ধি' - পন্থিরা দাবী করলেন অগ্রদ্বীপের কাছের সিদ্ধিতে কাশীরাম জন্মেছিলেন। আমরা বিতর্কে যেতে চাইছি না। যদি তিনি সিঙ্গির লোক হয়ে থাকেন তাহলে বর্ধমান সাহিত্য চর্চায় তাঁর গৌরবজনক ভূমিকার কথা স্বীকার করতেই হবে।

কাশীরাম পুত্র দ্বৈপায়ন দাস এবং ভ্রাতুষ্পুত্র (কেউ কেউ এঁকেও পুত্রই বলেছেন) নন্দরাম দাসও মহাভারতের অংশ বিশেষ অনুবাদ করেছিলেন। বর্ধমান মহারাজা মহাতাবচাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় মহাভারতের নারীপর্ব অনুবাদ করেছিলেন বর্ধমানেরই আর এক কবি রামলোচন। রামায়ণ ও দুর্গাপঞ্চরাত্রের অনুবাদক জগদ্রাম রায় এবং রামপ্রসাদ রায় ছিলেন পিতা ও পুত্র এবং দামোদর তীরবর্তী ভুলুই গ্রামের অধিবাসী। আর সমসাময়িক সংস্কৃত

পণ্ডিত এবং সংস্কৃত ও বাংলা লেখকদের মধ্যে গ্রন্থসংখ্যায় যিনি সর্বাগ্রগণ্য ছিলেন সেই রঘুনন্দন গোস্বামীর বাড়ি ছিল মানকর স্টেশনের কাছে মাড়ো গ্রামে। তাঁর লেখা বিখ্যাত বইটির নাম 'রাম রসায়ন' (রচনাকাল ১৮৩১ খৃষ্টাব্দ নাগাদ)।

।।৪।। বৈষ্ণব কবিদের এক বৃহত্তর অংশের বসবাস ছিল বর্ধমান জেলার নানা গ্রামে। চৈতন্য চরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ যদিও ঝামটপুরের অধিবাসী ছিলেন তবুও তাঁর বিখ্যাত চৈতন্য জীবনীটি বর্ধমানে বসে লেখা হয়নি। তবে তাঁর জীবনের শিক্ষা দীক্ষার সূচনা এই গ্রামেই হয়েছিল। বাংলা চৈতন্য জীবনীর প্রথম রচয়িতা বৃন্দাবন দাস জন্মসূত্রে বর্ধমানের মানুষ না হলেও গুরু নিত্যানন্দের তিরোধানের পর তিনি বর্ধমান জেলার কালনা মহকুমার অন্তর্গত দেনুড়ে এসে বসবাস করেছিলেন। দেনুড়ে বৃন্দাবন দাসের পাট রয়েছে এখনও।

অবশ্য চৈতন্য মঙ্গলের দুই কবি জয়ানন্দ দাস এবং লোচন দাস দুজনেই বর্ধমানের অধিবাসী ছিলেন। লোচন দাসের পিতৃকুল এবং মাতৃকুল দুই-এরই নিবাস ছিল কোগ্রামে। আধুনিক মঙ্গলকোটের কাছে। তাঁর 'প্রেমভক্তিদাতা গুরু' নরহরি দাসের বাড়িও বর্ধমানের শ্রীখণ্ডে। এই গুরু সম্পর্কে নানা উচ্ছসিত মন্তব্য তাঁর চৈতন্যমঙ্গল কাব্যে যত্রতত্র। নরহরি চৈতন্যের জীবৎকালেই তাঁকে উপাস্য হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।

জয়ানন্দের বাড়ি ছিল মধ্যরাঢ়ে আমাইপুরা গ্রামে। ডঃ সুকুমার সেন অনুমান করেছেন এটি সাতগেছে থানার অন্তর্গত বড়োয়াঁ গ্রামের কাছেই ছিল। তাঁর কাব্যেও আছে - চৈতন্য বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে নীলাচল হয়ে গৌড়যাত্রাকালে জলেশ্বর হয়ে মান্দারনে ঢুকে বর্ধমানে দেখা দিলেন (এই বর্ধমান - আধুনিক বর্ধমান শহর অবশ্য নয়)।

বর্ধমান সন্নিকটে ক্ষুদ্র এক গ্রাম বটে
আমাইপুরা তার নাম
তাহে সুবুদ্ধি মিশ্র গোসাঞির পূর্ব শিষ্য
তার ঘরে করিল বিশ্রাম।

শুধু বিশ্রাম করলেন না - সুবুদ্ধি মিশ্রের ছেলের ডাক নাম ছিল গুয়ে। চৈতন্য মানুষের অমর্যাদা সইতে পারতেন না, তাই গুয়ে নাম বদল করে নাম দিলেন জয়ানন্দ। আর জয়ানন্দের মা রোদনী রান্না করে দিলে চৈতন্য পরমানন্দে খেয়ে যান।

গোবিন্দ দাস কর্মকার - যাঁর নামে গোবিন্দ দাসের কড়চা - তাঁর বাড়ি ছিল ছুরি-কাঁচি-খ্যাত কাঞ্চননগরে। তবে কড়চার প্রামাণিকতা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

শ্রীখণ্ডের বৈষ্ণব মহাজনেরা বর্ধমানের গর্ব নরহরিদাস ও তাঁর পুত্র রঘুনন্দন, গোবিন্দ দাস কবিরাজ ও পুত্র দিব্যসিংহ, কবি শেখর, বলরাম দাস প্রভৃতি প্রণম্য। পূর্বস্থলী দোগাছিয়া গ্রামের বলরাম দাস, কান্দড়া গ্রামের দণ্ডীদাস-ভাবশিষ্য জ্ঞানদাস এবং শশিশেখর এবং চন্দ্রশেখর, পাটুলি গ্রামের বংশীবদন চট্ট, অম্বিকা কালনার কৃষ্ণদাস, ঘনশ্যাম দাস,

কাউগ্রামের পরমেশ্বরী দাস, পরাণ গ্রামের রায়শেখর, মালিহাটি গ্রামের যদুনন্দন দাস - প্রত্যেকে বাংলা সাহিত্যে বর্ধমানের গৌরব সৃষ্টি করেছেন।

।।৫।। বৈষ্ণব সাহিত্যের পর বাংলা সাহিত্যের শাক্ত কবিগণ আর্বিভূত হন। সেই শাক্ত সাহিত্যেও বর্ধমান অগ্রনী স্থান নিয়ে আছে। হালিশহরের রামপ্রসাদের মতই খ্যাতি নিয়ে বেঁচে আছেন অম্বিকা কালনার কমলাকান্ত ভট্টাচার্য। তিনি বর্ধমানের মহারাজ তেজচন্দ্রের আশ্রিত ছিলেন। পরে মহারাজ মহতাব চাঁদ তাঁর পদাবলী ছাপিয়ে প্রকাশ করেন ১২৬৪ বঙ্গাব্দে। এখনও বর্ধমানে কমলাকান্ত কালীবাড়ি দ্রষ্টব্য স্থান। বর্ধমান রাজের দেওয়ান ব্রজকিশোর রায়ের পুত্র রঘুনন্দন রায়ও শাক্তপদকারদের মধ্যে অন্যতম। স্বয়ং মহতাবচাঁদ বহু শাক্তগীতি রচনা করেছিলেন।

বর্ধমান-ব্যাণ্ডেল মেন লাইনে দেবীপুর স্টেশনের অনতিদূরে আছে আলিপুর গ্রাম। সেখানে বাস করতেন নীলাম্বর চক্রবর্তী। তিনি প্রায় চারশো শাক্তপদের রচয়িতা। আর পাঁচালী -খ্যাত দাশরথি রায় (বাদমুড়া নিবাসী), কৃষ্ণযাত্রাকার নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় (ধরণীগ্রাম জাত) এবং যাত্রাপালাকার মতিলাল রায় (ভাতশালার অধিবাসী) বর্ধমানের ত্রিরত্ন। বাংলা লোক সাহিত্যে তাঁরা স্থায়ী আসনের অধিকারী। অনেক পরে ব্রহ্মসঙ্গীতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচয়িতা হিসাবে যিনি আত্মপ্রকাশ করেন সেই ভাই ত্রৈলোক্য নাথ সান্যাল (চিরঞ্জীব শর্মা) চক ব্রাহ্মণ গড়িয়ার অধিবাসী। প্রকৃতপক্ষে আরও বহু নাম আমরা করতে পারিনি। তবুও প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের পুষ্টিসাধনে বর্ধমান যে একটি বিশেষ স্থানের অধিকারী সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই।

।।৬।। এবার আমরা প্রবেশ করতে চাইছি আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যের পরিধির মধ্যে। স্বভাবতই বর্ধমানের মৃত এবং জীবিত লেখকদের সাহিত্য চর্চার কথা আমাকে উল্লেখ করতে হবে। মৃত সব লেখকদের সাহিত্য চর্চার উল্লেখ করা যেমন সম্ভব নয়, তেমন জীবিত লেখকদের উল্লেখেও কিছু নির্বাচন আমাকে করে নিতে হয়েছে। যাঁদের উল্লেখ করছি না তার অর্থ এই নয় যে তাঁদের অবহেলা করছি। আগামী যুগ তাঁদের মূল্যায়ন করবে। তা ছাড়া একটি প্রবন্ধের পরিসরে সকলকে কখনই উল্লেখ করা যায় না। সেজন্য আগেভাগেই মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি।

ইংরেজি শিক্ষার সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে জাতীয়চেতনার একটা নবভাব বিকশিত হতে থাকে। বর্ধমান জেলার কালনার নিকটবর্তী বাকুলিয়া গ্রামের রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যেই প্রথম স্বাধীনতার আকাঙ্খা স্ফুটবাক হয়েছিল। তাঁর পদ্মিনী উপাখ্যান কাব্যে 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে কে বাঁচিতে চায়। দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে কে পরিবে পায়' পঙ্‌ক্তিনিচয় এখন প্রবাদ বাক্যে পরিণত। রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্য রচনা যাদের রচনাবলীকে ঘিরে রচিত হয়েছিল তাঁদের মধ্যে ছিলেন 'ভুবন মোহিনী প্রতিভা' রচয়িতা নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। বধ্যমান বড়ুয়া গ্রামের অধিবাসী একদা 'ভুবনমোহিনী দেবী' ছদ্মনাম নিয়ে সাহিত্যের জগতে একটা ধাঁধাঁ সৃষ্টি

করে বসেছিলেন। তাঁর ম্যালেরিয়া-নাশক 'লৌহসার'-ও তাঁকে বিখ্যাত করে তুলেছিলেন।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পিতামহ অক্ষয়কুমার দত্তের বাড়ি ছিল পূর্বস্থলীর নিকটবর্তী চুপী গ্রামে। 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' রচনা করে এই অক্ষয় কুমার দত্ত জগদ্বিখ্যাত হয়ে আছেন। একদা ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র তত্ত্ববোধীনি পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক অক্ষয়কুমার বিখ্যাত ছিলেন তাঁর স্বচ্ছ বিজ্ঞানবুদ্ধি ও যুক্তিবাদের জন্য। আর ব্যঙ্গপ্রবণতা এবং সমাজবোধ সম্পন্ন কবি হিসাবে খ্যাত হয়ে আছেন কাটোয়ার নিকটবর্তী গঙ্গাটিকুরির (জন্মও মাতুলালয় বর্ধমানের পাণ্ডুগ্রামে) ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে 'পাঁচু ঠাকুর'। একদা বর্ধমানের ওকড়সা গ্রামের প্রধান শিক্ষক ইন্দ্রনাথ শেষ কালে বর্ধমানেই ওকালতি করে গেছেন। 'তাঁর ভারত উদ্ধার কাব্যে'র কোন তুলনা নেই। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে বলেছিলেন 'হেলীর ধুমকেতু'।

বর্ধমানের যে সব মনীষী ইতিহাস চর্চা করে খ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁদের মধ্যে মধ্যযুগের বাংলা সর্বশ্রেষ্ঠ ইতিহাস-লেখক কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বাগ্রগণ্য। দুঃখের বিষয় 'মধ্যযুগে বাংলা' নামক বিখ্যাত গ্রন্থের এই লেখক বাঙালী চরিতাভিধানে স্থান পাননি। আর এক ঐতিহাসিক দূর্গাদাস লাহিড়ী জন্মসূত্রে নদীয়ার হলেও ইনি মুখ্যত কাটোয়া মহকুমারই অধিবাসী ছিলেন। কানিংহামের বিখ্যাত শিখগ্রন্থের অনুবাদ 'শিখ ইতিহাস', পৃথিবীর ইতিহাস, বেদ অনুবাদ, তাঁকে সুপরিচিত করে রেখেছে। বঙ্গবাসী পত্রিকার সঙ্গে ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার মুখ্য সম্পাদক যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু-র বাড়ি ছিল বর্ধমানের ইলসবা গ্রামে। দুষ্প্রাপ্য ইংরাজি গ্রন্থের প্রকাশ ও সুলভমুল্যে তার প্রচারে এবং মডেল ভগিনী, বাঙালী চরিত, কালাচাঁদ প্রভৃতি রচনার দ্বারা তিনি দেশের সাহিত্যবোধকে উদ্দীপিত করেছিলেন। বঙ্গবাসী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা গিরীশচন্দ্র বসু ছিলেন তাঁরই জ্ঞাতি ভ্রাতা। বর্ধমানের আর এক প্রখ্যাত সাংবাদিক, ভারতের প্রথম বাংলা সংবাদপত্রের জনক ও সম্পাদক গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ছিলেন বহড়ু গ্রামের অধিবাসী।

বর্ধমানের মহারাজা মহতাব চন্দের মতই মহারাজা বিজয়চন্দ্রও সাহিত্য প্রিয় মানুষ ছিলেন। যৌবনে তিনি কাব্য রচনা ছাড়া Studies, Meditations, Impressions ইত্যাদি ইংরাজি গ্রন্থও রচনা করেন। তিনি খ্যাত হন 'বিজয় গীতিকা' কাব্য লিখে। মাসিক পত্রে প্রকাশিত তাঁর ইউরোপ ভ্রমণ বৃত্তান্ত খুবই সুখপাঠ্য। তাঁরই উদ্যোগে ১৩২০ বঙ্গাব্দে শহরে অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বর্ধমানে এতো বড়ো সাহিত্য অধিবেশন সম্ভবত আর হয়নি। মূল সভাপতি ছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়। দুর্ভাগ্যক্রমে রবীন্দ্রনাথ তাতে উপস্থিত ছিলেন না। ব্যক্তিগত প্রয়োজনে একাধিকবার বর্ধমানে এলেও রবীন্দ্রনাথ বর্ধমানে সাহিত্য সম্পর্কে আসেননি কখনও। যদিও তাঁর 'রবিচ্ছায়া' গীতসংকলনে বর্ধমানের দুর্ভিক্ষ বিষয়ে একটি সুন্দর গান রয়েছে - 'সৎকারে ঐ কাঁদিছে, শীর্ষক। অবশ্য ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বগ্রামে এবং বর্ধমান শহরে প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলনের সময় একবার প্রাদেশিক সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য বিশিষ্ট নাট্যকার ও উপন্যাস লেখক রাজকৃষ্ণ রায়ও বর্ধমানের রামচন্দ্রপুরের মানুষ। বর্ধমানের

এই মানুষটিই ছিলেন বাংলা সাহিত্যের প্রথম ফুল - টাইমার। তিনিই সাহিত্যকে প্রথম পেশা রূপে নেন।

।।৭।। আমরা এবারে আমাদের কালের আরও একটু বেশী সংলগ্ন হলে পাবো চুরুলিয়ার বিদ্রোহী কবি নজরুলকে। তাঁকে নিয়ে বেশী কথা লেখার প্রয়োজন নেই। তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ছিলেন রুপসা গ্রামের মানুষ। তাঁর কয়লা কুঠির দেশ - এর পটভূমিকায় বর্ধমান জেলার রানীগঞ্জের কয়লাখনি ক্ষেত্র। তাঁর চেয়ে একটু প্রবীণ ছিলেন 'দন্তলিকা' আনন্তরী প্রভৃতি কাব্যের লেখক ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (যাঁর স্মৃতি রয়েছে বর্ধমান শহরের কালনা রোডের উপর বিশ্বেশ্বরী যোগাশ্রমে), কবি বিশালাক্ষ বসু, বর্ধমান সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা দেবেন্দ্রবিজয় বসু, রায়ান - নিবাসী নাট্যরসিক ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী, বর্ধমান রাজসভার কবি সিদ্ধেশ্বর সিংহ ন'পাড়ার' ফুলদানি'র লেখক শ্রীশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখেরা।

এককালে 'নিরক্ষর' নামে উপন্যাস লিখে যিনি বাংলা সাহিত্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন সেই চরণদাস ঘোষের বাড়ি ছিল বাইতি পাড়ায়। 'দিপালি' পত্রিকাখ্যাত এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতির বিখ্যাত প্রতিলেখক স্বয়ংকবি বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ছিলেন কাটোয়ার মানুষ। কবি কালিদাস রায় ও কুমুদরঞ্জন মল্লিক শুধু সাহিত্য লিখে খ্যাত হন নি - বর্ধমানকে পরিচিত করেছেন তাঁদের সাহিত্য রচনায়। অনেকেই জানেন না রবীন্দ্রোত্তর যুগের শ্রেষ্ঠ 'দুঃখবাদী' কবি ইঞ্জিনিয়ার যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তেরও বাড়ি ছিল বর্ধমান জেলার পাতিল পাড়া গ্রামে। এই পাতিল পাড়াতেই জন্মেছিলেন 'মন্দিরের চাবি' কাব্য-খ্যাত কবি, বর্ধমান সম্মিলনীর সদ্যপ্রয়াত সভাপতি ডাঃ কালীকিংকর সেনগুপ্ত। বর্ধমানের গৌরবকে স্বদেশে প্রচার করা তাঁর ব্রত স্বরূপ ছিল। তিনি লিখেছেন।

বর্ধমান বন্দনায় আমি এক হ্রস্বমেধা কবি
তবু অশ্বমেধে ব্রতী, - যথাশক্তি আঁকি তার ছবি
যথাভক্তি করি ধ্যান, সেই মোর রাঙ্গামাটি মা-টি
যে মোরে করেছে ক্রোড়ে পালিয়াছে মলিনতা ঘাঁটি
আবাল্য - যৌবন - জরা।

গল্পে-উপন্যাসে একদা মাতিয়েছিলেন কবিকঙ্কণের দামিন্যার লেখক অম্বিকাচরণ গুপ্ত। বর্ধমানেরই কৃষক জীবনের ছবি এঁকেছিলেন 'গোবিন্দ সামন্ত' বইতে যে পাদ্রী লালবিহারী দে, যাঁর ফোক টেলস্ অফ্ বেঙ্গল আজও আমাদেরকে মাতায় - তাঁর বাড়ি ছিল সোনাপলাশী গ্রামে।

।।৮।। সাহিত্য সাধনায় বর্ধমানের মেয়েরা কোনো কালেই পিছিয়ে ছিলেন না। সাহিত্যপ্রিয় ব্যবহারজীবী দেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়-এর মাতা সুরথকুমারী দেবী, নীরোদমোহিনী দেবী প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে স্মরণযোগ্য দান রেখে গেছেন। বর্ধমান শহরের মেয়েই ছিলেন প্রখ্যাত মহিলা - সাহিত্যিক শৈলবালা ঘোষজায়া। তাঁর বিয়ে

হয়েছিল মেমারীতেই। তাঁর উপন্যাসের বহু স্থানেই বর্ধমান সঞ্জীবিত।

মহিলাদের মতই বহু মুসলমান সাহিত্যসেবীর জন্মস্থানও বর্ধমান। গোলাম আহম্মদ নিজেই বর্ধমানের অধিবাসী ছিলেন। 'ইসলাম ইতিহাস' লিখে তিনি মুসলমান সংস্কৃতিকে ঋদ্ধ করে গেছেন। 'জেবন্নেসা' গ্রন্থের লেখক আবদুল লতিব ছিলেন জামতাড়ার অধিবাসী। 'কাঁচ ও মণি' এবং 'রবীন্দ্র প্রতিভা' রচনা করে খ্যাত হয়েছিলেন একরামউদ্দীন। আনোয়ার হোসেন এবং আবদুল গণিও বর্ধমানেরই কবি। কালনা থানার বোহার গ্রামের মুন্সী মহম্মদ আবদুল্লা সাহেব তাঁর বিশাল গ্রন্থাগার জাতির উদ্দেশ্যে দান করে গেছেন - তা এখন জাতীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত রয়েছে।

।।৯।। বর্ধমানের ইতিহাস রচনায় যাঁরা আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সত্যকিংকর মুখোপাধ্যায়, বিপ্লবী বলাই দেবশর্মা, অনুকুলচন্দ্র সেন, নারায়ণ চৌধুরী, গোতান গ্রামের সুকুমার সেন প্রমুখের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য। বর্ধমানের কৃতি সন্তান অনিলবরণ রায়ের অধ্যাত্মজীবন সাহিত্যের সঙ্গে সংযুক্ত। কথা সাহিত্যিক রমাপদ চৌধুরী, গল্পলেখক রামেন্দু দত্ত ও মানবেন্দ্র পাল, যাত্রা পালাকার শম্ভু বাগ, পঞ্চানন মণ্ডল, সুবোধ মুখোপাধ্যায়, কালীপদ সিংহ, চিত্ত ভট্টাচার্য, কামাখ্যাচরণ মুখোপাধ্যায়, কমল কৃষ্ণ ঘোষ প্রমুখেরা রয়েছেন। এখন বর্ধমানের গ্রামে গঞ্জে সাহিত্য চর্চা হয়ে চলেছে। রাণীগঞ্জ, দুর্গাপুর, আসানসোল প্রভৃতি শিল্পনগরী থেকে শুরু করে সর্বত্র অসংখ্য লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়ে বর্ধমানের সাহিত্য চর্চার দিগন্ত বিস্তৃত করে চলেছে। নামোল্লেখ না করলেও তাঁরা সকলেই অগৌণে একই প্রবন্ধে উপস্থিত রইলেন।

।।১০।। বর্ধমানের গৌরব শুধু মাত্র বধ্যমানের সন্তানেরাই বাড়িয়ে তোলেন নি। বহু সাহিত্যিকই বর্ধমানকে তাঁদের সাহিত্য চর্চার পটভূমি করে তুলেছেন। রবীন্দ্রনাথ-কৃত কবিতার কথা আগেই উল্লেখ করছি। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'পঞ্চপুত্তলী' উপন্যাসে গোলাপবাগের উল্লেখ করেছেন। নায়িকা টিয়া 'কাটোয়া' থেকে এসেছিল বর্ধমান। বর্ধমান গোলাপবাগ তার মনোহরণ করেছিল। মহারাজার গেস্ট হাউসের সামনে সাদা মেঘের মত মার্বেল-গড়া কি অপরূপ নারীমূর্তি। .... গ্রীষ্মের সময় সে রোজ যেত গোলাপবাগে। এ সময়টার রাজবাড়ীর সকলেই চলে যেতেন পাহাড়ে, দার্জিলিং - ঠাণ্ডার দেশে। এ সময়ে গোলাপবাগে বেড়াতে কোন বাধা হয়নি। গাছে গাছে নতুন পাতায় কচি সবুজের বাহারে চোখে একটা নেশা লাগাত। প্রচণ্ড রোদের মধ্যেও গোলাপবাগের ঘন সারিবন্দী গাছের তলায় তলায় নিরবচ্ছিন্ন একটি ছায়ার রাজ্য থমথম করত। বাতাস শুধু খেলাকরে বেড়াতো শুকনো পাতা নিয়ে দুরন্ত ছেলের মত। ওদিকে গোলাপবাগের চিড়িয়াখানায় খাঁচার মধ্যে বসে বসে বাঘগুলো ঝিমুত, হাঁপাত। ভাল্লুকে থাবা ঘষত। বাঁদরগুলো ঢুলত। পাখিগুলো চোখ বুজে এক পা তুলে বসে থাকত দাঁড়ের উপর।'

'রূপের হাট মহাজনটুলি' ও তারাশঙ্করের দাক্ষিণ্য হারায়নি। শৈলজানন্দের 'কয়লা কুঠির দেশে', শৈলবালার উপন্যাসে, আরও বহুজন রচনায় বর্ধমানের উল্লেখ রয়েছে। সেকথা গুণীজনে জানেন। আমি এখানেই ইতিরেখা টানছি।

বর্ধমানে নাট্যচর্চার প্রাক্ - কথন ঃ 'নাট্যকলা'ঃ প্রথম চলচ্চিত্র নির্মাণের ইতিকথা

দেবেশ ঠাকুর

।। এক ।।

রাঢ় বাংলার নাভি দেশ হিসাবে বর্ধমান চিহ্নিত। অনন্ত শয্যায় শায়িত নারায়ণের নাভিপদ্ম থেকে ব্রহ্মার উদ্ভব। কিন্তু বর্ধমানের নাভিদেশ থেকে ঠিক কোন সংস্কৃতি - পদ্ম উদ্ভূত এবং বিকশিত তার তত্ত্ব চর্চা-বিদ্‌গণ দিতে পারেন। সংস্কৃতির বিশেষত্ব অনুযায়ী বর্ধমান জেলাকে চারটি খণ্ডে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমতঃ কাটোয়া - কালনাকে ধরে পূর্ব-বর্ধমান। চৈতন্যাশ্রয়ী সংস্কৃতির পীঠভূমি। বৈষ্ণবীয় লোকসংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। নানাভাবে নানা আঙ্গিকে বিভিন্ন নাট্য মঞ্চে লোকযাত্রা, কীর্তন, পাঁচালী, কৃষ্ণযাত্রা ইত্যাদি বিকশিত হয়। ঈশাননাগর ঠাকুর রচিত 'অদ্বৈতপ্রকাশ' গ্রন্থে বিধৃত ঃ

'শ্রীনাট মন্দিরে দেখি চৈতন্যের লীলা
অশ্রুনীরে ভাসি দেবী হইলা উতলা'।

('দেবী ' অর্থে অদ্বৈত গৃহিনী সীতাদেবী)। চৈতন্যোত্তর কালে ধনী ঘরের বহু নাট মঞ্চে কীর্তনাদি লীলাগাথা উপস্থাপিত হত। বর্ধমান জেলার দক্ষিণাংশ তথা দক্ষিণ দামোদর এলাকায় ধর্মমঙ্গল কাব্যের প্রধান দুই স্রষ্টা রূপরাম চক্রবর্তী এবং ঘনরাম চক্রবর্তী এবং চণ্ডীমঙ্গলের কবি মুকুন্দরামের উদ্ভবের ফলে চণ্ডী ও ধর্মঠাকুর বিষয়ক সাংস্কৃতিক প্রকরণ বিকশিত হয়। তবে মঙ্গলকাব্য বাদ দিলে দক্ষিণ দামোদরের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে সংস্কৃতি দারুণ বিকশিত একথা বলা যাবে না। ময়ূরপঙ্খী সহ কিছু লোকসংস্কৃতির বিস্তার অবশ্য স্বমহিমায় ছিল। অধুনা তা অবলুপ্তপ্রায়। বর্ধমান জেলার পশ্চিমাঞ্চলের রাঢ় ভূমিতে বাঁকুড়া-পুরুলিয়া-বিহারের আদিবাসী তথা উপেক্ষিত জনজীবনের প্রভাব এক মিশ্র সংস্কৃতির জন্ম দেয়। খনি সহ বেশ কিছু শিল্পের বিকাশে মানুষের হাতে আসে কাঁচা পয়সা।

পয়সার বাহুল্য প্রমোদ বৈচিত্র্যের জন্ম দেয়। তারাশঙ্করের লেখায় কলকাতার নাট্যদলগুলির রাণীগঞ্জ - আসানসোল সম্পর্কে আগ্রহের কথা পাই। কালে খনির মালিক প্রভৃতি আধা জমিদারদের ভূমিকায় এইসব অঞ্চলে নাট্য দল গড়ে উঠতে থাকে ।

বর্ধমান জেলার লোক সংস্কৃতির ঐতিহ্য এক ধারাবাহিক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলে। কাটোয়া অঞ্চলের বোলান, মধ্য বর্ধমানের ভাদু-টুসু, উত্তর বর্ধমানের ফকিরি-হাপুগান, ঝুমুর, দক্ষিণ দামোদরের ময়ূরপঙ্খী, পশ্চিম বর্ধমানের লেটোগান দীর্ঘদিন সম্পদ হয়ে আসরের সমৃদ্ধি বাড়িয়েছে। এর বেশিরভাগ উপাদানের সঙ্গে জুড়ে ছিল পালা তথা কাহিনীর উপকরণ। নজরুল ইসলাম লেটোর দলে সৃজনের অঙ্কুর খুঁজে পান। তাঁর দু-একটি নাটক বা গীতিনাট্যের মধ্যে লেটোর প্রভাব আছে। পাঁচালীর মধ্যেও নাট্য উপাদান সম্যকরূপেই বিরাজিত ছিল। দাশুরায়ের পাঁচালীর সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা জানেন নাট্য আবর্ত নির্মাণে তাঁর অপরিসীম পটুত্ব। ধবনির নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় কৃষ্ণযাত্রার পালা লিখতেন। কণ্ঠমশাই এর ভাষা, নাট্যজ্ঞান এবং অনুভব মাতিয়ে

রাখতো বাংলার আসরকে। শব্দ প্রয়োগে কণ্ঠ মশাই-এর নৈপুণ্যের সামান্য পরিচয় দেওয়া যাক ঃ

'আর কেন মন শুধু অকারণ
বিবাহের কারণ হতেছ উতলা
যখন চারিজনার স্কন্ধে বিধির নির্বন্ধে
কাঁচা বাঁশে তোমার হবে গো চৌদলা।

অষ্টজনা তোমার বরযাত্রী যাবে
ঘরে ফিরে তারা নিমজল খাবে
শকুনে তোমার বাসর সাজাবে
শেয়ালে - কুকুরে দিবে উলু আলা।'

এই সমস্ত লোক সংস্কৃতির হাত ধরে বর্ধমান জেলায় যাত্রার সুশোভন বিকাশ ঘটে। চারদিক খোলা মঞ্চে হ্যাজাক- ডেলাইটের আলোয় মেতে উঠতো আসর। যাত্রায় গড়ে উঠতো দর্শকের-শ্রোতার সঙ্গে নিবিড় সেতুবন্ধন। প্রায় সারারাত্রি ধরে চলতো পঞ্চমাঙ্কের পালা। ভাতছালার বিখ্যাত মতিলাল রায় যাত্রার অনন্য প্রাণপুরুষ। টোগো সরকারের নাম একসময় বাংলার সুধীসমাজে মুখে মুখে ফিরত। ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী একজন স্বনামখ্যাত পালাকার। এঁদের সঙ্গে অনিবার্যভাবে নাম আসে নবদ্বীপ হালদারের। রস ও কৌতুকের ক্ষেত্রে হালদার মহোদয় স্বয়ং একটি ধারা। পালাকার ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়-এর জন্য বর্ধমান জেলা গর্ববোধ করতে পারে। কোলকাতার পেশাদারী অপেরায় ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়, শম্ভু বাগের রচিত যাত্রাপালা সম্পদ স্বরূপ। শম্ভুবাগের তরুণ অপেরায় অভিনীত ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বকে নিয়ে রচিত পালাগুলি সাতের দশকের রত্নমণ্ডিত অলঙ্কার। রাখাল সিংহও একজন গুণী অভিনেতা। তিনি কয়েকটি পালাও লিখেছেন। শম্ভু বাগের উদ্যোগে 'যাত্রা জগৎ' নামে একটি মাসিক পত্রিকা দীর্ঘ দিন বর্ধমান থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

চারদিক খোলা আসর এ দেশের নিজস্ব সম্পদ। এই আসরের থিয়েটারে রূপায়ণ এক রুশ ভদ্রলোকের হাত ধরে। গেরাসিম লেবেদফ। গোলক বিহারীবাবুর হাত ধরে দু-খানি বাংলা নাটক লেখেন লেবেদফ – 'ছদ্মবেশ' এবং 'প্রেমই শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক'। ১৭৯৫-এ। বর্ধমানে প্রথম পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের সূত্রপাত হয় ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা পেশাদার রঙ্গমঞ্চের (ন্যাশনাল থিয়েটার, নাটক 'নীলদর্পন) মাত্র পনের বছরের মধ্যে।

এই রচনার প্রধান প্রতিপাদ্য মধ্য বর্ধমান তথা নগর বর্ধমান। বর্ধমানের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রসঙ্গে দুটি প্রাসঙ্গিক তথ্য এই প্রকার – বর্ধমানের রাজনীতিতে একটি পর্বে ঐস্লামিক শাসনের বিকাশ ঘটলেও তুর্ক আফগান সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে নি। দ্বিতীয়তঃ বর্ধমানে সামন্তবাদের চরম বিকাশ ঘটলেও সামন্তবাদী সংস্কৃতির তেমন বিকাশ ঘটেনি। বস্তুত মহারাজ বিজয়চন্দ - এর পূর্বে কোন রাজা এ দেশীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য আগ্রহ প্রদর্শন করেননি। তেজচন্দ্র মহতাব 'শিল্পী' কমলাকান্তকে নিয়োগ করার পূর্বে 'সাধক' কমলাকান্তকে বেশ কয়েকবার বাজিয়ে দেখেছিলেন। কলকাতা - কাশিমবাজার - কুচবিহার - মুর্শিদাবাদ - দিনাজপুর প্রভৃতি নগরকে ঘিরে সামন্তরাজা ও ভূস্বামীদের প্রচেষ্টায় নানাবিধ সাংস্কৃতিক জনজীবন বিস্তৃতি পায়। এবম্বিধ উদাহরণ বর্ধমানের

ক্ষেত্রে দুর্লভ। মূলত উনবিংশ শতকের প্রায় শেষ ভাগে রাজানুগ্রহে এষণার বেশ কিছু ক্ষেত্রের প্রসার ঘটে।

আগেই উল্লেখ করেছি, বর্ধমান শহরে সামন্তবাদকে ঘিরে সেই ধরনের সংস্কৃতির প্রকাশ ঘটে ওঠেনি। বিজয়চন্দ মহতাবের সময়ে তাঁর আনুকূল্য ও বদান্যতা শিল্প সংস্কৃতির বিকাশে বেশ কিছুটা গতি এনে দেয়। বলা বাহুল্য, এই সময়কালে অর্থাৎ উনবিংশ - এর শেষে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বঙ্গ সংস্কৃতি একটা নিজস্ব ধারা এবং খাতে প্রবাহিত হতে শুরু করেছে। নবজাগরণের প্রাক্ শর্তই হচ্ছে স্বকীয়তা। বাবুর লাখ টাকার বুলবুলির লড়াই নতুন সমাজের প্রবক্তাদের নতুন ভাবনায় ভাবতে শিখিয়েছিল। এলিজাবেথের স্যার জন ফলস্টাফ্ 'হেনরী ফোর্থ' থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছিল। কিম্বা ভারতচন্দ্র, 'বিদ্যাসুন্দর' থেকে। তেজচন্দ্রের সময়কালে বৈষ্ণবীয় ও শক্তি-সংস্কৃতির খানিকটা বিকাশ ঘটে পাঁচালী কীর্তন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে। বিজয়চাঁদ মহতাব ছিলেন আলোক প্রাপ্ত। ইয়োরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে অনুরাগ ছিল। রঙ্গমঞ্চ তথা থিয়েটারের হাল হকিকৎ সম্পর্কে সাম্প্রতিক খবরাখবর রাখতেন।

১৮৯৯-এ বর্ধমানে গড়ে ওঠে ভিক্টোরিয়া থিয়েটার। এই মঞ্চে প্রথম নাটক 'মহামুক্তি'। নির্দেশক বিনোদিলাল ধৌন। প্রায় একটা দশক এই মঞ্চে বেশ কিছু পেশাদারী নাটক প্রযোজিত হয়। প্রায় নিয়মিত অভিনয় করেছেন অর্দ্ধেন্দু শেখর মুস্তফি, প্রমোদীলাল ধৌন, অশ্বিনী চক্রবর্ত্তী, দুর্গাদাস নাগ, ক্ষেত্রনাথ সিংহ, শরৎ কুমার বর্মন। মহিলাদের মধ্যে ছিলেন রাঙাপুঁটি, রাণী সুন্দরী, ননীবালা, চঞ্চলাদেবী, বেদানা সুন্দরী দাসী, বিজন কুমারী প্রমুখ। ভিক্টোরিয়া থিয়েটারের পাশাপাশি উনিশ শতকের প্রথম দিকে বর্ধমানের বোরহাট (এখন যেখানে জলট্যাঙ্ক) অঞ্চলে গড়ে ওঠে বিজয় থিয়েটার। চৈতন্যপুরের মৃত্যুঞ্জয় কুণ্ডু মহাশয়ের অর্থানুকূল্যে নির্মিত এই রঙ্গমঞ্চ অল্পদিনেই বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে। নেহান তেওয়ারী এই মঞ্চের বেশ কিছু নাটকের পরিচালক। অগ্রগণ্য অভিনেতা অভিনেত্রীদের মধ্যে ছিলেন সুধেন্দু বাগচি, মধুসূদন উপাধ্যায় ভুবনমোহিনী, রমনীবালা দাসী, বিজয় বসন্ত প্রমুখ। প্রয়াত নাট্যামোদী - সাহিত্যিক পাঁচুগোপাল রায়-এর মুখে শুনেছি 'একসময় ভিক্টোরিয়া থিয়েটার - বিজয় থিয়েটারের প্রতিযোগিতায় বেশ কিছু ভাল নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল। মনে রাখতে হবে এই সময় কলকাতায় চলত গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটার এবং বেঙ্গল থিয়েটারের প্রতিযোগিতা। বর্ধমানেও তার ঢেউ ছিল।' পরবর্তিকালে মৃত্যুঞ্জয় কুণ্ডু ঐ ভিক্টোরিয়া থিয়েটার লিজ নিয়ে 'গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটার' নামকরণ করেন। ১৯০৭ এ বন্ধ হয় ভিক্টোরিয়া থিয়েটার, ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বরে বন্ধ হয় গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটার। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বর্ধমান শহরে গড়ে ওঠে অন্য একটি রঙ্গমঞ্চ। সাধারণ্যে এটি ব্রজেনবাবুর থিয়েটার নামে পরিচিত ছিল। পরবর্তী সময়ে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে বিভূতিচন্দ কাপুরের উদ্যোগে গড়ে ওঠে আর একটি রঙ্গমঞ্চ শ্যামবাজারের নিকট আমড়াতলা গলিতে। দেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই রঙ্গ মঞ্চের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। রাসবিহারী ভট্টাচার্যের রচিত স্বাদেশিকতার নাটক 'শান্তিজল' এই রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়ে প্রভূত সুনাম অর্জন করে। প্রসঙ্গত, এই সময় বর্ধমান থেকে 'শান্তিজল' নামে একটি সাহিত্য পত্র প্রকাশিত হত। এটিরও প্রকাশে দেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অগ্রগণ্য পৃষ্ঠপোষকতা ছিল। (এই প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখ না করে পারছি না। বর্ধমান শহরে দেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের কার্পণ্য নিয়ে নানা বাগধারা প্রচলিত আছে। কিন্তু সংস্কৃতি-সাহিত্যের ক্ষেত্র নিয়ে তত্ত্বতল্লাস করতে গিয়ে দেখেছি, বহু প্রতিষ্ঠানে, উদ্যোগে এবং চর্চায় দেবপ্রসন্নবাবু অকাতরে দান করে গেছেন। সন্তোষ বসু মহাশয়ের ডায়েরী পড়ে জেনেছি, তিনি

দানের নিনাদ পছন্দ করতেন না।)

গৌরাঙ্গ থিয়েটারেও (বর্তমানের বিচিত্রা) বেশ কিছু ভাল নাটক প্রযোজিত হয়েছে।

আলোকপ্রাপ্ত মহারাজ বিজয় চন্দ মহতাব রঙ্গমঞ্চের জন্য একসময় কলম ধরেন। তাঁর রচিত বেশ কয়েকটি নাটক রাসবিহারী ভট্টাচার্যের নির্দেশনায় মঞ্চায়িত হয়। এ কথাও উল্লেখযোগ্য, বিজয়চন্দের আবাহনে অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে (সভাপতি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী) নাট্যকলা প্রসঙ্গে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বর্ধমান শহরে নানা পেশার সঙ্গে যুক্ত থেকেও যাঁরা নাট্যচর্চা চালিয়েছেন তার মধ্যে অগ্রগণ্য হলেন বিভূতি কাপুর, ভবানী মেহেরা প্রমুখ। ডাঃ সুবোধ মুখোপাধ্যায় নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে একজন পুরোধা ব্যক্তিত্ব। তাঁর রচিত নাটকগুলির মধ্যে 'বুদ্ধ', 'কমলাকান্ত', 'জাল প্রতাপচাঁদ' উল্লেখযোগ্য। বর্ধমানের 'রবীন্দ্রভবন' তাঁর অনুভবের ফসল। সারা পশ্চিমবঙ্গে সব কটি রবীন্দ্রভবন সম্ভবতঃ সরকারের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান। ব্যতিক্রম বোধহয় বর্ধমানের রবীন্দ্রভবন।

অবশ্য এর পূর্বে বর্ধমানের বেড় অঞ্চলে বর্ধিষ্ণু প্রায় প্রত্যেক কামার বাড়িতে নাট মঞ্চ ছিল। একটি সাক্ষাৎকারে একথা জানিয়েছেন প্রয়াত পাঁচুগোপাল রায়। এঁরা বিভিন্ন দল এবং অপেরাকে দিয়ে যাত্রা, পালাগান, নাটক, কৃষ্ণযাত্রা মঞ্চস্থ করাতেন। প্রতিবেশীর মধ্যে গড়ে উঠতো একটা স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা।

উৎপল দত্তর বিখ্যাত 'টিনের তলোয়ার' নাটকে বেণীমাধব চাটুজ্জে নিজের ব্রাহ্মণত্ব অস্বীকার করে বলেন, 'আমি থিয়েটারওয়ালা'। অর্থাৎ জাতটাই থিয়েটারওয়ালা। নাটমঞ্চ তাই মন্দির হয়ে যায়। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের যুগদ্রষ্টা পূজক তাই স্টার থিয়েটারে 'চৈতন্যলীলা' দেখে বিহ্বল হয়ে পড়েন।

নাটকে যে 'লোকশিক্ষা' হয় সেই ভাবনার সঞ্জীবনী মন্ত্র বর্ধমানের যে মানুষটিকে সবচেয়ে নাড়া দিয়ে যায় তিনি প্রমোদীলাল ধৌন। সেইকালে (ঊনবিংশ শতকের শেষ পর্বে) কোন সঙ্গতিসম্পন্ন পরিবারের সন্তান ট্যুইশন রেখে নাটক শিখবে, এর নজির প্রায় নেই বললেই চলে। উপেন দাস, গোষ্ঠবিহারী দত্তকে এর জন্য খেসারত দিতে হয়েছে প্রচুর। এসেছে নাট্য নিরোধক আইন। একদা 'নীলদর্পনে' রোগ্ সাহেবের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বিদ্যাসাগরের চটি খেয়েছিলেন সেই অর্দ্ধেন্দুশেখর প্রমোদীলালের নাট্য চর্চার 'গৃহশিক্ষক' নিযুক্ত হন। কেমনভাবে সংযুক্ত হলেন, কিভাবে রচনা করলেন নাট্য প্রয়োগ বিষয়ক গ্রন্থে সে বিষয়ে দ্বিতীয় পর্বে আলোচনা করছি।'

প্রমোদীলালকে ঘিরে বর্ধমানে গড়ে ওঠে একটি নাট্যগোষ্ঠী। শহর ও জেলার বহু অগ্রগণ্য ব্যক্তি এই চর্চায় নিয়োজিত হন। পেশাদারী নয়, অবৈতনিক নাট্য চর্চাকে এঁরা বেছে নেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন কমল মিত্র (পরে চিত্রাভিনেতা / বর্ধমান পুরসভার দুই খ্যাতিনামা পৌরপতি নরেশ মিত্র ও জগবন্ধু মিত্রের পৌত্র ও পুত্র। পোষাকী নাম কমলবন্ধু মিত্র), শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, লালা বিভূতিচন্দ কাপুর, ডাঃ ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ দুর্গাকিঙ্কর বটব্যাল, শচিদুলাল মিত্র, বিমান বিহারী চট্টোপাধ্যায়, আব্দুল মজিদ প্রমুখ।

এই শতকের দুই এবং তিনের দশকে নাট্যচর্চার যে উত্তাল ঢেউ ওঠে তাতে সমন্বয়ের নৌকা ভাসান এইসব সুধীজনেরা। প্রমোদীলাল এঁদের কাপ্তান। আবদুল মজিদ (বর্তমানে প্রায় নয়-এর কোঠায়) একদিন কথায় কথায় জানিয়েছিলেন, 'সে এক সময়। প্রতিদিন সন্ধেতে মহলা চলতো।

প্রমোদীলালের পরিচালনায় 'প্রফুল্ল', 'কালিন্দী' খুব নাম করে'। সেই সময়ে এই গুরুপ্রতিম মজিদ সাহেবকে বিদ্রূপ সইতে হতো 'মজিদ ভট্‌চার্য' নামে। রামায়ণ-মহাভারতের চরিত্রে অবতীর্ণ হতেন। উদাত্ত কণ্ঠে সংস্কৃত শ্লোক বলতেন বলে হয়তো এই নাম বা বদনাম।

কমল মিত্র নাট্য জগতে একটা 'ক্লাস' আমদানি করেন। এটা তাঁর নিজস্ব ঘরাণা। পরে চলচ্চিত্রে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন বিশেষ একটি ধারায় অভিনয় করে। বিভূতিচাঁদ কর্পূর (কাপুর) প্রমোদীলাল ঘরাণার অন্যতম শিল্পী। অবৈতনিক নাট্যদল নিয়ে বহু রজনী মুগ্ধ করে রেখেছিলেন দর্শক শ্রোতাদের। বর্ধমানে নাট্যচর্চায় বিশেষভাবে নাম উল্লেখ করতে হয় দেবকী বসু এবং অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এঁরা প্রত্যেকেই বর্ধমান ভূখণ্ডের বাইরে বাংলা নাট্য জগতকে সমৃদ্ধতর করেছেন।

পরবর্তী সময়ে বর্ধমান নাট্য চর্চায় যাঁরা দিক দিশারী তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মঙ্গল চৌধুরী। বহু নাট্যদলও গড়ে উঠেছে, প্রশাখা হয়েছে, ভেঙেও গেছে। সরোজ রায় এই শহরের একজন দক্ষ নটযোদ্ধা। অমল বন্দ্যোপাধ্যায়ও বহুদিন ধরে চর্চা চালিয়ে যাচ্ছেন।

মার্জনা চাইছি, ছয়ের দশকের পরবর্তী পর্যায়ে নাট্য চর্চা ও নাট্য ব্যক্তিত্বদের নিয়ে আলোকপাত করা থেকে বিরত হতে হল। কেন, সে প্রসঙ্গে যাচ্ছি না।

জেলার অন্য প্রান্তে অগ্রগণ্য মানুষেরা —নাটকের প্রসঙ্গ এলেই যাঁরা স্মর্তব্য হয়ে ওঠেন, তারমধ্যে পুরোধা হলেন চিত্তরঞ্জন রূপনারায়ণপুরের সুনীল ভট্টাচার্য। সুনীলবাবু নিজেই নিজের ক্লাস। ঋত্বিক ঘটকের 'বগলার বঙ্গদর্শন' ছবির নায়ক সুনীলবাবু পশ্চিম বর্ধমানের একজন বিশিষ্ট রূপকার। যন্ত্রনগরী চিত্তরঞ্জনে 'অযান্ত্রিক' নাট্যদল নিয়ে ওঁর অপ্রতিরোধ্য গতি। দুর্গাপুরের গোপাল দাস একজন যশস্বী নাট্যকার। বেশ কিছু নাট্যদলের কাছে তিনি আকাঙ্ক্ষিত নাট্যকার। দক্ষিণ দামোদরে শক্তি ঘোষ নিজস্ব শৈলীতে চর্চা করেন। ইদানিংকালে কাটোয়ার মাণিক মণ্ডল বোলান গানকে নাটকে প্রয়োগ করে বেশ যশস্বী হয়েছেন।

বর্ধমান জেলায় বর্তমান সময়ে বেশ কিছু নাট্যদল ধারাবাহিকভাবে নাট্যচর্চা চালিয়ে যাচ্ছেন। এর পুরোভাগে আছে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ অর্থাৎ আই.পি.টি.এ.। চিত্তরঞ্জনের অযান্ত্রিক, আসানসোলের বলাকা, এছাড়া বার্ণপুর আসানসোলে গণনাট্য, দুর্গাপুরে স্মারক, বর্ধমানে গণনাট্য, দক্ষিণ দামোদরে সন্তোষ-যুগল দীর্ঘদিন নাটক করে আসছেন। বেশ কিছু মঞ্চও তৈরী হয়েছে সারা জেলায়। তবে এদের ভাড়া জোটানোর ক্ষমতা বেশিরভাগ গ্রুপ থিয়েটারের নেই। সরকারী আনুকূল্যে তথা নাট্য একাদেমির সহযোগিতায় নিদেনপক্ষে বছরে একবার জেলায় নাট্য কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। নাট্য বেত্তারা আসেন। ফল কতটা হয় সে বিচার করা বেশ কঠিন। এই মুহূর্তে বর্ধমান শহরে প্রায় পঁচিশটি নাট্যদল নিরলসভাবে নাটক চালিয়ে যাচ্ছে। মূলতঃ প্রতিযোগিতা মঞ্চের উপর নির্ভর করে এরা চর্চা চালান। স্বকীয় উদ্যোগেও কিছু প্রযোজনা হয়। কিন্তু প্রেক্ষাগৃহের দর্শনী, আলো-প্রেক্ষাশব্দ রূপসজ্জা মঞ্চসজ্জার ব্যয় বাহুল্য জোগাতে দলগুলির প্রাণান্ত হচ্ছে। এরই মধ্যে যে কিছু নাট্যদল প্রদীপের আলোটুকু জ্বালিয়ে রাখতে পেরেছে তার মধ্যে অন্যতম মৌলিক (ললিত কোনার, প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়), নটরাজ নাট্য ইউনিট (অজিত ঘোষ), ময়ূখ (নারায়ণচন্দ্র ঘোষ), অঙ্গীকার (অমিতাভ চন্দ্র), সেভেনস্টার (সুব্রত চক্রবর্তী), অনীক (দিলীপ বিশ্বাস), প্রমা (মৃদুল সেন), রঙ্গম (অমল বন্দ্যোপাধ্যায়), আজকের থিয়েটার (জয়ন্ত

ঘোষ), নাট্যভূমি (রাতুল চক্রবর্তী), অরিত্র (নীলেন্দু সেনগুপ্ত) সুকান্ত সাংস্কৃতিক সংস্থা (অমর গঙ্গে াপাধ্যায়), প্রয়াস (উদয় মুখোপাধ্যায়), সাগ্নিক (নিমাই দে), প্রমুখ। (বন্ধনীর মধ্যেকার নামটি দলের নির্দেশক / সম্পাদক তথা প্রধান ব্যবস্থাপকের) শক্তিগড়ের নাটকওয়ালা বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ ভাবনা নিয়ে নাটক করেন। এর নির্দেশক গৌতম বণিক। বর্ধমান শহরের নাট্যদলগুলির সমন্বয়কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠেছে মঙ্গল চৌধুরী নাট্যচর্চা কেন্দ্র। বর্ধমানের নাট্যচর্চার অন্যতম শিক্ষক মঙ্গল চৌধুরীর চিন্তাকে সামনে রেখে এই চর্চাকেন্দ্র নিয়মিত চর্চা, মনন, আলোচনা এবং যৌথ প্রযোজনার উদ্যোগ গ্রহণ করছে। এর বর্তমান যুগ্ম সম্পাদক প্রয়াত মঙ্গল চৌধুরীর সহ-ধর্মিনী বিশিষ্ট্য অভিনেত্রী গোপা চৌধুরী।

বর্ধমানের একমাত্র ড্রামা কলেজটিও বেশ সুচারুভাবে প্রতিবছর বিভিন্ন ছাত্রছাত্রীকে নাট্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছে। তবে যেহেতু জীবন জীবিকার জন্য প্রতিযোগিতার তীব্রতা প্রতিদিন বেড়ে চলছে, শিল্পকলা নিয়ে খুব বেশি ভাবতে কেউ চাইছেন না। এর জন্য টি ভিকে অনেকে দায়ী করছেন। বস্তুতঃ দায়ী যেই হোক না, দায়টা সমাজের। প্রমোদের উপকরণ এত বেশি ছড়ানো যে যাত্রা-থিয়েটার নিয়ে উৎসাহ অনেকটা কমে এসেছে। ভরসা একটাই, যে সব পাশ্চাত্যের দেশে টি ভি এসেছিলো বহুবছর আগে, তারা প্যাকিং বাক্সে পুরো টি ভিকে তুলে রাখছেন চিলেকোঠায়। লাইন দিচ্ছেন থিয়েটারের জন্যে। লণ্ডনের থিয়েটার হাউসে, নরওয়ের অপেরায়, ফ্রান্সে মহাভারত দেখার জন্য মাসাধিক কাল আগে টিকিট কাটতে হয়। আসুন সেই সুদিনের অপেক্ষায় থাকি।

।। দুই ।।

আগেই উল্লেখ করেছি, বর্ধমান জেলায় নাট্যচর্চার গুরুপ্রতিম ব্যক্তি প্রমোদীলাল যৌন। কৃতি শিষ্যমণ্ডলীর চর্চা তথা প্রয়োগের জন্য তিনি রচনা করেন 'নাট্যকলা' শীর্ষক একটি গ্রন্থ। নাট্যাচার্য অর্দ্ধেন্দু শেখর মুস্তফি প্রমোদীলালকে নাটকের কৃৎকৌশল শেখাতে গিয়ে যেসব উপদেশ দিতেন, 'নাট্যকলা'য় সেইসব তথ্য এবং তত্ত্বকে তুলে ধরেছেন লেখক। বইটি এখনও পাণ্ডুলিপি আকারে এবং অপ্রকাশিত। প্রমোদীলালের সুযোগ্য ছাত্র এবং শিষ্য কমল মিত্র বেশ কিছু সংযোজন বিয়োজন সহ গ্রন্থটি প্রকাশে প্রয়াসী হন। কিন্তু ব্যস্ততার কারণে পেরে ওঠেননি। গ্রন্থটির রচনাকাল বিশের দশকে। ভূমিকা লেখেন সাতচল্লিশ-এ।

কোন ভারতীয় ভাষায়, নাট্যতত্ত্ব সংক্রান্ত প্রথম গ্রন্থ ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র'। পরে ধনঞ্জয়ের 'দশরূপক', 'অবলোক' ইত্যাদি তত্ত প্রাক্-খ্রীষ্ট যুগে রচিত হয়। গ্রীস দেশে প্লেটো-এ্যারিস্টটল হোরেস নাট্যতত্ত্ব নিয়ে বহু তত্ত্বের দিশা দেন। ইতিহাস মূল্যের দিক দিয়ে দেখলে প্রমোদীলালের 'নাট্যকলা'র মূল্য-অপরিসীম। এই সময়কালে বাংলা ভাষায় যাঁরা নাট্যতত্ত্বমূলক গ্রন্থাদি রচনা করেছেন তার মধ্যে অগ্রগণ্য সাধন ভট্টাচার্য্যের 'নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা'। এছাড়া গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য, অজিত ঘোষ প্রমুখ বাংলা ভাষায় নাট্যতত্ত্বের অন্যতম প্রবক্তা। প্রাচীনত্বের দিক দিয়ে প্রমোদীলাল সম্ভবতঃ অগ্রগণ্য। কিভাবে এই তত্ত্ব গ্রন্থ 'নাট্যকলা' রচনায় প্রয়াসী হলেন এবিষয়ে ভূমিকা অংশটি এবং আরও দু-একটি অনুচ্ছেদ তুলে দিচ্ছি। পরিশেষে কমল মিত্রের সংযোজনাটাও পাঠকের জন্য হুবহু তুলে ধরছি।

'প্রতিবেশী ও হিতৈষী পরমাত্মীয় শ্রী কমল বন্ধু মিত্রর প্রগাঢ় অনুরোধ বাধ্য হইয়া এই দুঃসাহসিক কার্য্য করিতে বাধ্য ও প্রবৃত্ত হইলাম। এই বিষয়ে আমার প্রিয় শিষ্য ও পরমহিতৈষী শিবনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায় বি.এস.সি.বি.এল. বর্দ্ধমান ; রাজবংশীয় জমিদার লালা বিভূতিচন্দ্ কপূর, মান্যবর ডাক্তার শ্রীভোলানাথ চ্যাটার্জ্জী (L.M.F.), শ্রী দুর্গাকিঙ্কর বটব্যাল (L.M.F.), শ্রীশচিদুলাল মিত্র (L.M.F.) ও শ্রীবিমান বিহারী চট্টোপাধ্যায় এম.এ.বি.এল. আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় শিবনাথ এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি লেখা শেষ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই অকালে স্বর্গলাভ করিয়াছেন। নটকুল গৌরব স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী মহাশয়ের উপদেশ মত নিম্নলিখিত ইংরাজী পুস্তকগুলির নির্দ্দেশ অনুযায়ী সংস্কৃত গ্রন্থ 'রত্নকোষ' ও অমরটীকার বর্ণিত মত এবং আমার অভিনেতা জীবনের বিজ্ঞতা অনুসারে যাহা লাভ করিয়াছি তাহাই আমি আমার নাট্যকলা পুস্তকে প্রকাশ করিলাম।

ইংরাজী পুস্তকগুলির নাম যথা ঃ

1. Guide to the Stage
2. Art of Acting
3. Actors Art

এই পুস্তকগুলি আমি আমার অভিনেতা জীবনকালীন পাঠ করিয়াছিলাম।

4. Stage craft.
5. Acting improvised.
6. The art of the Actor.
7. Elocution.
8. Practical hints on training for the stage.
9. The Art of "make-up"

এই পুস্তকগুলি সম্প্রতি নাট্যকলা পুস্তক লিখিবার উদ্দেশ্যে পাঠ করিয়াছি। ইহাও আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে আমার পূর্ব্বতন গ্রন্থকার মান্যবর শ্রী ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃত 'অভিনয় শিক্ষা' পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া তন্মধ্য হইতে বহু উপদেশ সাদরে গ্রহণ করিয়াছি।

উক্ত ইংরাজী পুস্তকগুলি হইতে বুঝিতে পারিলাম যে, আমাদের দেশের অবৈতনিক নাট্য সম্প্রদায়ই শুধু কলঙ্কে কলুষিত নয়, পাশ্চাত্য দেশেরও অবৈতনিক নাট্য সম্প্রদায় সমবিষে বিষাক্ত। যেহেতু এসব পুস্তক পাশ্চাত্য দেশের অবৈতনিক নাট্য সম্প্রদায়কেই লক্ষ্য করিয়া লিখিত হইয়াছে, এই সব পুস্তকগুলিতে বহুবাক্যের ও শব্দের রূপান্তর হইলেও ভাবের বৈষম্য নাই। তন্মধ্যে একটি বাক্য সব পুস্তকেই একরূপ শব্দে প্রকাশ হইয়াছে, যাহার বাঙ্গলা –

'অধিকাংশ অবৈতনিক নাট্য সম্প্রদায়ের বক্তৃতা আগ্রহশূন্য ও কদর্য্য' নাট্যকলা বিদ্যা বিষয় লিখিবার পূর্ব্বে আমার নিজের নাট্য জীবনের বিষয় কিছু জানান আবশ্যক বুঝিয়া নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

১৩০৯ সালে যখন আমার বয়ঃক্রম ২৬ বৎসর, তখন বর্দ্ধমানে 'ভিক্টোরিয়া থিয়েটার' নামে একটি প্রাইভেট থিয়েটারে পৌরাণিক নাটক 'মহামুক্তি' অভিনীত হইয়াছিল। 'মহামুক্তি' নাটকে সেনাপতির (অতিক্ষুদ্র ভূমিকা) ভূমিকায় আমায় অভিনয় করিতে হইয়াছিল। এই ভিক্টোরিয়া থিয়েটার সভ্যগণের প্রবল চেষ্টায় অতি অল্প দিন মধ্যেই সাধারণ রঙ্গমঞ্চে পরিণত হইয়াছিল এবং কলিকাতার পূর্ব্ব প্রথানুযায়ী প্রত্যেক সপ্তাহে বুধ, শনি, রবি তিনদিন অভিনয় হইত।

ভিক্টোরিয়া থিয়েটার নাম লইয়া সাধারণ নাট্যমন্দির আমাদের বাটীর বহির্ভাগে নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং তাহার দ্বারা উদ্‌ঘাটিত হইয়াছিল স্বর্গীয় গিরিশবাবুর পৌরাণিক নাটক 'জনা' লইয়া। জনা নাটকে প্রবীরের ভূমিকা আমায় অভিনয় করিতে হইয়াছিল এবং ইহার পর হইতেই আমার অভিনেতৃ-জীবনের পরিবর্তনও হইয়াছিল।

অতঃপর একটি নূতন কথা বলিতে শুরু করিলাম। পাঠকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক ক্ষমা করিবেন। Modern Art কথাটি কেবলমাত্র আধুনিক যুগের নয়। আদি যুগেও ছিল, মধ্যযুগেও ছিল, এবং বর্ত্তমান যুগেও চলিতেছে।

Art অর্থাৎ সৃষ্টি। সুতরাং কোন বিদ্যাই আধুনিক সৃষ্টি হয় নাই। আমাদের চক্ষে কিছু নূতন দেখিলেই আমরা তাহা আধুনিক সৃষ্টি মনে করি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নয়। আধুনিক যে নাট্যকলাবিদ্যার আমরা অনুসরণ করি তাহার জন্মস্থান পাশ্চাত্য দেশ হইলেও আধুনিক নয়। বহুদিন পূর্ব্বে Shakespeare, Garrick, Newton, প্রভৃতি সুধী ও সুদক্ষ অভিনেতা সকলের দ্বারা তাই The Thespian Art পাশ্চাত্য দেশে প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, এবং আজও সেই সব উপদেশই বর্ণভেদে ও বাক্যভেদে নানাপুস্তকে নানা রকমে প্রকাশ হইতেছে। উক্ত কলাবিদ্যা বিষয় ইংরাজী পুস্তক পাঠ করিলে ইহাই বোঝা যায় যে Old Art এর ভাবের কোন ভাবান্তরই Modern Art-এ ঘটে নাই, কেবল শব্দের রূপান্তর হইয়াছে মাত্র।

অতএব বলিতে বাধ্য হইলাম যে Old Art কে অবজ্ঞা করিয়া Modern Art বলিয়া যাঁহারা চীৎকার করেন তাঁহারা কলাবিদ্যার বিষয় কিছুই অবগত নন। কেবল অন্ধতাকে ভিত্তিকরিয়া চীৎকার করিয়া থাকেন। এই অন্ধ বিশ্বাসের উৎপত্তি কলিকাতার পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে। যে যুগে যে কোন অভিনেতা পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে নায়কের ভূমিকায় এক ঘেয়ে আধিপত্য স্থাপন করেন, তিনি যে প্রথায় অভিনয় করিয়া থাকেন বা করেন (তাহা ভালই হোক আর মন্দই হোক) তাহাকেই অবলম্বন করিয়া তরলমতি যুবকগণ Modern Art, Modern Art বলিয়া চিৎকার করিয়া থাকেন। প্রকৃতই পূর্ব্বযুগে স্বর্গীয় গিরিশবাবু, মহেন্দ্রবাবু, অমৃতলাল বসু, অর্দ্ধেন্দুবাবু প্রভৃতি অভিনেতৃগণ যখন নাটকের শ্রেষ্ঠাংশে (নায়কের পদে) অবতীর্ণ হইতেন, যখন এই কলাবিদ্যা প্রকৃতত্ব লইয়া যথার্থ সাফল্য লাভ করিয়াছিল তখনও এই Modern Art শব্দটি সকলের মুখেই ধ্বনিত হইত। আবার মধ্যম যুগে সত্যই যখন কলাবিদ্যার ব্যাভিচার শুরু হইয়াছিল তখনও এই চীৎকার সমভাবে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান যুগে কোন কোন অভিনেতা আবার পূর্ব্বতন প্রথার পুনরাবর্ত্তন আনিয়া কলাবিদ্যার সজীবত্ব আনিলেও (যদিও সকলে নহেন) চীৎকার, বহুস্থানে অন্ধতা ও অজ্ঞতার উপরেই ধ্বনিত হইয়া থাকে। এই চীৎকারকারীরা বড়ই অনুকরণপ্রিয় হন। বলা বাহুল্য যে মধ্যযুগে আমিও প্রবীরের ভূমিকা অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। এবং বর্দ্ধমানে যুবক দলের মধ্যে এক খ্যাতনামা অভিনেতা হইয়া উঠিয়াছিলাম যাহার ফলে আত্মম্ভরিতায় পূর্ণ হইয়া সদাই মনে ভাবিতাম যে আমি 'এক জন হনু' আমি একজন হনুর পরিবর্তে আমি একটি হনু (হনুমান) ভাবলেই ভাল হইত। কারণ Royal Reader-III আমি একটি গল্প পড়িয়াছিলাম। যে একজন টুপী বিক্রেতা সাহেব এক পোঁটলা টুপী লইয়া টুপী বিক্রয়ে বাহির হয়। ক্লান্ত হইয়া এক বৃক্ষ তলায় শুইয়া নিদ্রা যায়। সেই বৃক্ষে কতকগুলি বানর ছিল। তাহারা সাহেবের মাথায় টুপি দেখিয়া টুপি পরিবার মতলবে গাছ হইতে নামিয়া, পোঁটলা হইতে টুপিকটি লইয়া নিজেদের মাথায় দিয়া গাছের উপর উঠিয়া বসে। নিদ্রাভঙ্গে সাহেব এই ব্যাপার দেখিয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া ভাবিতে থাকেন। অবশেষে ঠিক করেন যে তাঁর মাথার টুপি দেখিয়া তার অনুকরণে এই

বানরদল মাথায় টুপি দিয়াছে। তিনি মাথা হইতে টুপিটা খুলিয়া ফেলিলেন। হনুগণও তৎক্ষণাৎ ফেলিয়া দেয়। কারণ হনুদের মধ্যে অনুকরণ করা স্বভাব প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব আমি যখন সেই অনুকরণ প্রিয় হইয়াছিলাম তখন আমিও হনুর স্বভাব পাইয়াছিলাম। সুতরাং 'আমি কি হনুর' পরিবর্তে একটা হনু হইয়াছি ভাবাই আমার উচিৎ ছিল।

জনা অভিনয়কালীন একদিন আমার স্বর্গীয় পিতাঠাকুর মহাশয় অভিনয় দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। পরদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বুঝিলাম যে তিনি সন্তুষ্ট হইবার পরিবর্তে অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। এবং তিনি অভিনয় সম্বন্ধে আমাকে কতকগুলি উপদেশ দিয়াছিলেন। যাহা আমি Old Art জ্ঞানে অবহেলা করিয়াছিলাম। ফলে তিনি বুঝিতে পারিয়া অর্দ্ধেন্দুবাবুকে বর্দ্ধমানে আনাইয়া তাঁহার হাতে আমায় তুলিয়া দিয়াছিলেন। এইখান হইতেই আমার অভিনয় জীবনের পরিবর্তন শুরু হইয়াছিল এবং যথাসময়ে সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়াছিল।

পরে জ্ঞাত হইলাম যে অর্দ্ধেন্দুবাবু এবং অমৃতলাল বসু মহাশয় আমার পিতার পরম সুহৃদ ছিলেন। ইহাঁরা উভয়ে আমাদের বাড়ীতে আসিতেন। এবং অর্দ্ধেন্দুবাবু তাঁর পশ্চিমে ভ্রমণকালীন একবৎসর বর্দ্ধমানে আমাদের বাড়ীতে কাটাইয়া ছিলেন। সেই সময় আমার পিতা ঠাকুর ও তাঁর বন্ধু বান্ধব কর্তৃক অর্দ্ধেন্দুবাবুর পরিচালনায় এক অবৈতনিক নাট্য সমিতির সৃষ্টি হইয়াছিল যাতে 'নবীন তপস্বিনী' নাটক অভিনীত হইয়াছিল।

এই সময় কলিকাতার 'ষ্টার' রঙ্গমঞ্চে ক্ষীরোদবাবুর প্রণীত 'প্রতাপাদিত্য' নাটকে অর্দ্ধেন্দুবাবু 'বিক্রমাদিত্য' ও 'রড়ার' ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে আমি তাঁর অভিনয় দেখিয়াছিলাম। এবং তাঁর কৃতিত্বে মুগ্ধ হইয়াছিলাম। তারপর পূর্ব্ব হইতেই শোনা ছিল যে তিনিই সমগ্র বাঙ্গলার নাট্যকলা বিদ্যায় পিতৃস্থানীয় পূজনীয় - পরম নাট্যগুরু। এই দুই কারণে ও আমার শুভদৃষ্ট বশতঃ অর্দ্ধেন্দুবাবুর উপদেশ Old Art ধারণায় পরিত্যাগ না করিয়া কলাবিদ্যার পূর্ণ আলোকজ্ঞানে অবনত মস্তকে পালন করিয়াছিলাম এবং তাঁহারই উপদেশে প্রথমে তিনখানি ইংরাজী পুস্তকপাঠ করিয়াছিলাম।

অর্দ্ধেন্দুবাবুর দুইটি উপদেশ অদ্যাবধি ইষ্টমন্ত্রের ন্যায় জপ করিয়া আসিতেছি।

১ম উপদেশ ঃ অভিনয় কলাবিদ্যা শিক্ষালাভ করিতে হইলে তৎসম্বন্ধীয় উচ্চতর প্রবীণ ব্যক্তিদের (Higher Authority) গ্রন্থ পাঠ করা আবশ্যক।

২য় উপদেশ ঃ অনুকরণ করার অর্থ পরের উদ্‌গার উদ্‌গীরণ করা। ইহা কখনও উচিৎ নয়।

সত্য, ইহা বেদবাক্যের ন্যায় সত্য, ইহা ব্যতীত ইহার অন্য কোন প্রশংসাবাদ আমি জ্ঞাত নই।

অতঃপর অর্দ্ধেন্দুবাবু প্রত্যেক সপ্তাহে সোমবার দিন আসিতেন ও মঙ্গলবারে চলিয়া যাইতেন এবং এইরূপে একাদিক্রমে দুই বৎসর আসিয়াছিলেন। ইহার পর বর্দ্ধমানের ক্ষুদ্ররঙ্গমঞ্চে অর্দ্ধেন্দুবাবুর ব্যয় সরবরাহ করা দুঃসাধ্য হওয়ায় তাঁর আসা স্থগিত হইয়াছিল। কিন্তু আমার সহিত সম্বন্ধ তাঁর স্বর্গলাভের কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ছিল। তাঁর শ্রীচরণে স্থান পাইবার পর হইতে আমি সাধ্যমত কোন ভূমিকায়ই তাঁর উপদেশ ব্যতীত অভিনয় করি নাই। বিশেষ নিম্নলিখিত ভূমিকাগুলি অভিনয়ে আমি সম্পূর্ণরূপে তাঁরই হস্তে গঠিত হইয়াছিলাম।

যথা ঃ প্রতাপাদিত্যে প্রতাপ, প্রফুল্ল গ্রন্থে সুরেশ, নির্ম্মলা গীতনাট্যে কিশোর, বিল্বমঙ্গলে বিল্বমঙ্গ ল, সরলায় গদাধর, হারানিধিতে অঘোর, এবং রানা প্রতাপে শক্ত সিংহ।

ইহার পর আজ প্রায় ২০/২৫ বৎসরের অধিক হইল। বর্দ্ধমানের সাধারণ রঙ্গমঞ্চের অস্তিত্ব উঠিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে আমি অবৈতনিক নাট্য সম্প্রদায়ের অনুগ্রহে ও বর্দ্ধমানাধিপতির কৃপায় নিজের ভরণ পোষণ ও উপজীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছি। সত্যই আমি স্পর্দ্ধার সহিত লিখিতেছি যে আমি পূর্ব্বাপেক্ষা বর্তমানে নিজেকে অধিকতর গৌরবান্বিত মনে করি। যেহেতু পূর্ব্বে আমি কেবল কতকগুলি মূর্খের প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলাম কিন্তু এক্ষণে আমি শিক্ষিতদের শিক্ষক প্রভৃতির মধ্যে আদর ও সমাদর লাভ করিতেছি। মা সরস্বতীর শ্রীচরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক জানাইতেছি যেন জীবনের শেষ মুহূর্তটুকু মায়ের এই কৃপাহতে বঞ্চিত না হই।

বর্দ্ধমান শহরের এবং বহুগ্রামের অবৈতনিক নাট্য সমিতির অভিনয় দর্শনে বুঝিয়াছি যে সত্যই অবৈতনিক সম্প্রদায় মহাবিপদগ্রস্ত এবং এ বিপদের একমাত্র কারণ তাঁদের উৎকট পরিচালকগণ (অনেক স্থানে উহাদের master বলে)। বাস্তবিক সে শ্রেণীর প্রযোজকগণের কোন বিজ্ঞতা নাই। কেবল কতকগুলি সাধারণ রঙ্গমঞ্চের অভিনেতাদের গল্প আবৃত্তিকরা এবং পূর্ব্বতন শিক্ষকের শিক্ষা কিছুই হয় নাই বুঝাইয়া নিজের মতানুযায়ী শিক্ষাদানে ব্যাপৃত থাকাই তাঁদের একমাত্র কার্য্য। সুতরাং তাঁদের অধীন অভিনেতৃগণ প্রাণপণ চেষ্টায় শিক্ষা করিয়াও পরিবর্তনের ঠেলায় কখন শিক্ষালাভে সমর্থ হইলেন না। এক একজন আসেন আর এক একজন যান, আর শিথিল অভিনেতৃগণ মেষপালের মত তাঁহার অনুসরণ করেন। কাজেই অনুসরণের পালাও শেষ হয় না আর অগ্রসর হওয়াও হয় না।

নাট্যশিক্ষা বিভ্রাট বিষয় যদি অবগত হইবার কামনা থাকে তাহা হইলে কৃপা করিয়া মান্যবর ভূপেনবাবু প্রণীত অভিনয় শিক্ষা বই-এ অংশপাত করুন। তাহা হইলে সঠিক সমস্ত অবগত হইবেন। অভিনয় শিক্ষার একটা ছত্র এখানে প্রকাশ করিলাম। সত্যই ইহা নাট্যকলা বিদ্যার অযথা শিক্ষার মূলভিত্তি ও স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ। 'নাট্য শিক্ষা (বিশেষতঃ আমাদের বঙ্গদেশে আদর্শ অথবা standard বলিয়া কিছুই নাই।' সত্য, টকীর উর্দ্দু drama দেখিয়া বেশ বুঝিয়াছি যে ইংরাজী পুস্তকগুলির উপদেশ তাঁদের সম্পূর্ণ আয়ত্ত। আর প্রত্যেক অভিনেতাই সর্ব্বস্থলে পূর্ণমাত্রায় তাহা প্রতিফলিত করিতেছেন। অভিনেতাগণকেই আদর্শকে অগ্রাহ্য করিয়া যাহার যাহা ইচ্ছা তাঁহাকে তাহাই করিতে দেখা যায়। অবৈতনিক নাট্য সম্প্রদায়কে রক্ষা করিবার জন্য নাট্যকলাবিদ বিষয়ে উপদেশ সূচক বাঙ্গলা গ্রন্থ হওয়া আবশ্যক। যেহেতু সকল অবৈতনিক সমিতির অভিনেতাগণ ইংরাজী বিদ্যায় পারদর্শী নহেন। মাননীয় শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অভিনয় শিক্ষা পুস্তকখানি অতীব প্রয়োজনীয় পুস্তক হইয়া দাঁড়াইয়াছে কিন্তু তাহা সুদক্ষ অভিনেতার পক্ষে, অদক্ষ অভিনেতার পক্ষে নহে। কারণ তাঁহারা যাহা খোঁজেন তাহা তাহাতে পান না। মনোভাব প্রকাশ বিষয় যাহা guide to the stage হইতে অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন তাহা অমূল্য ও অনুগমনীয়। ইহা ব্যতীত আরও অনেক উপদেশ দান করিয়াছেন কিন্তু তাহাতে অপটু অবৈতনিক নাট্য সমিতির বিশেষ সুবিধা হয় না। যেহেতু তাঁহারা তাহার ভাবার্থ উপলব্ধি করিতে পারিলেও কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন না।

বহুদিন পূর্ব্ব হইতে আমার শুভানুধ্যায়ী আত্মীয়গণ আমায় একখানি নাট্যকলা বিদ্যা বিষয়ক পুস্তক লিখিবার জন্য অনুরোধ করিয়া আসিতেছেন কিন্তু উক্ত বিদ্যার গুরুত্ব বুঝিয়া আমার এতাবৎ সে

দুঃসাহসিক কার্য্য করিতে সাহস হয় নাই। অবশেষে কমলের অনুরোধ কিছুতেই এড়াইতে না পারিয়া সাদরে এই বোঝা মস্তকে তুলিয়া লইলাম। পাঠকগণের নিন্দার ও স্তুতির কোনটিরই আমি প্রার্থী নহি। আমি তাঁদের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষার্থী যাহাতে পরে সাফল্য লাভ করিতে পারি। আমার পুস্তক খানিক নাম দিলাম নাট্যকলা।

কুঠীবাড়ী, বর্দ্ধমান
৪৭/৭/২৩

অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী–
শ্রী প্রমোদীলাল ধৌন

তত্ত্বকে প্রয়োগের উপযোগী করে অবৈতনিক অভিনয়ের জন্য প্রমোদীলাল যে কয়টি মূল্যবান অনুচ্ছেদ রচনা করেন তার একটি তুলে ধরা হল।

প্রথমভাগ

প্রথম অধ্যায়

কদর্য্য অভিনয়ের কারণ

অবৈতনিক নাট্য সম্প্রদায় তাঁদের দায়িত্ব ও গুরুত্ব বোঝেন না বলিয়া তাঁদের অভিনয় কুৎসিত হইয়া থাকে। নতুবা বর্তমান যুগে আদর্শ অভিনেতাগণ শ্রীযুক্ত শিশির কুমার ভাদুড়ী, শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত অহীন্দ্রকুমার চৌধুরী, প্রভৃতি যাঁহারা জনে জনে কলিকাতার এক একটি সাধারণ রঙ্গমঞ্চের পরিচালক ও প্রযোজক পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া নাট্য জগতকে আজও পর্য্যন্ত আলোকিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই অবৈতনিক সম্প্রদায় হইতে আসিয়াছে। পূর্ব্বযুগে স্বর্গীয় শিশিরবাবু, অর্দ্ধেন্দুবাবু যাঁহারা কলিকাতার সাধারণ রঙ্গমঞ্চের সৃষ্টিকর্তা বা পিতৃস্থানীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহাদেরও অভ্যুত্থান প্রথমে অবৈতনিক নাট্য সম্প্রদায়ে। সুতরাং ইহা হইতে বুঝিয়া লউন যে প্রকৃতপক্ষে অবৈতনিক নাট্য সম্প্রদায়ের স্থান সাধারণ রঙ্গমঞ্চের বহু বহু উর্দ্ধে। বর্ত্তমান যুগের আদর্শ অভিনেতা শ্রী শিশির কুমার ভাদুড়ী মহাশয় যিনি মৃতনাট্যকলাবিদ্যার পুনর্জ্জীবন দান করিয়াছেন, যিনি বাঙ্গালীর সাধারণ রঙ্গমঞ্চের মলিনতা দূর করিয়া মৌলিকত্ব আনিয়াছেন, তিনি গত ২৬/৮/৪৭ ইংরাজী ১২/১২/৪০ তারিখে দিপালী পত্রিকায় সৌখিন সম্প্রদায়ের বিষয়ে যে উক্তি প্রচার করিয়াছেন তাহাতেই স্পষ্ট বুঝাইয়া দিয়াছেন যে সাধারণ রঙ্গমঞ্চের আসন সৌখিন রঙ্গমঞ্চের আসনের বহু নিম্নে।

শিশিরবাবু বলিয়াছেন, যে এতাবৎ তিনি যে সৌখিন সম্প্রদায়ের মধ্যে অবতরণ করেন নাই তার কারণ সৌখিন সম্প্রদায় মঞ্চকে অনুসরণ করে বলিয়া। সাগরপারে ঠিক ইহার উল্টা, সেখানে সৌখিন সম্প্রদায় আগে যেসব নাটক অভিনয় করেন সাধারণ রঙ্গমঞ্চ তাহারই অনুকরণ করে। ইহার পর আর সাধারণ রঙ্গমঞ্চের ও অবৈতনিক নাট্য সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য বোধহয় কাহারও বুঝিতে বাকী থাকিবে না।

অবৈতনিক নাট্য সম্প্রদায় তাঁদের মন্দ অভিনয়ের বিরুদ্ধে ওজর দেখান, যে তাঁরা অবৈতনিক, সুতরাং তাঁদের অভিনয়ে ভাল মন্দ কিছু যায় আসে না, কেহ কেহ আবার বলেন যে তাঁহারা যাহা করিয়াছেন, তাহার অধিক করিবার উপযুক্ত অর্থ তাঁদের নাই বলিয়া তাঁদের অভিনয় খারাপ

হইয়াছে, কিন্তু এ দুইটি ওজরই অমূলক। খারাপ অভিনয় হইবার মূল কারণ কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে আলস্য ও অক্ষমতা।

বহু অবৈতনিক সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায় যে পোষাকের প্রতি তাঁদের যেরূপ তীক্ষ্ণলক্ষ্য ভূমিকাভিনয়ের প্রতি তাঁদের সেরূপ দৃষ্টি নাই। দূত অবধি সুপরিচ্ছদ পরিবার জন্য যেরূপ ব্যগ্র নায়ক ও তদ্রূপ। কিন্তু কু-আবৃত্তি পরিবর্তনে কেহই সচেতন নন। ইহা একটি তাঁদের কু-সংস্কার। মলিন পরিচ্ছদ পরিয়া সু-আবৃত্তি করিলে সুখ্যাতি পাওয়া যায়। কিন্তু রয়েল ড্রেস পরিয়া কু-আবৃত্তি করিলে অখ্যাতি ও বিরক্তি ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া যায় না।

অন্য একটি মহাদোষ অবৈতনিক অভিনেতাদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় ; তাঁরা মনে করেন যে সুদীর্ঘ অংশ আবৃত্তি করিতে পারিলেই বোধ হয় অভিনেতার পরিচয় দেওয়া হয়। কেউ কেউ আবার বলেন যে একেতো আমরা অভিনয় করিতে জানিনা, তার উপর আবার বাদ দিলে থাকিবে কি ? কিন্তু এরূপ ভাব বা এ প্রকার উক্তি মুর্খতার পরিচয়। বোঝা যায় যে স্বর-সুর মনোভাব করায়ত্ব সুদক্ষ অভিনেতার আবৃত্তি মিষ্ট হইতে আরও মিষ্ট হইবে এবং স্বর, সুর মনোভাব বিরঞ্জিত অদক্ষ অভিনেতার আবৃত্তি শ্রুতিকটু হইতে আরও শ্রুতিকটু হইবে। এস্থলে সম্প্রদায়ের পরিচালকের কর্তব্য, যে, তাঁর অভিনেতা যতটুকু পর্যন্ত সহজে সুন্দরভাবে আবৃত্তি করিতে ও মনোভাব প্রকাশে সক্ষম হন, অংশের ততটুকু বজায় রাখিয়া অবশিষ্টাংশ পরিত্যাগ করিতে অভিনেতাদিগকে বাধ্য করা। কারণ অনর্থক বক বকানিতে একঘেয়ে সুর সৃষ্টি করিয়া নাটকের গতি ব্যাহত হয়।

বহু অবৈতনিক সম্প্রদায়ের কর্তৃপক্ষের মধ্যে একটি ভুল ধারণা বদ্ধমূল আছে। তাঁরা ভাবেন যে সাধারণ রঙ্গমঞ্চের অভিনীত কোন নাটক অভিনয় করিতে হইলে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে যাহা অভিনীত হইয়াছে আদ্যোপান্ত তাহাই বজায় রাখা উচিত। অধ্যায় বা অংশ পরিত্যাগ করা অসঙ্গত। ইহা বিকৃত মস্তিকের ধারণা। কারণ সুশিক্ষিত সুদক্ষ অভিনেতা ও অভিনেত্রী পরিবেষ্টিত নাটক যে সৌন্দর্য্য বিস্তারে সক্ষম হইবে কখনই এক ক্ষুদ্র সজ্জিত মঞ্চে অদক্ষ অভিনেতা ও অভিনেত্রী পরিবেষ্টিত নাটক সে সৌন্দর্য্য বিস্তারে সক্ষম হইবে না। অতএব যতটুকু বজায় রাখিলে তাঁহার অভিনেতাগণ সহজে ও সুশৃঙ্খল অভিনয় করিতে পারিবেন নাটকে ততটুকু রাখিয়া অতিরিক্ত অংশ ও অধ্যায় পরিত্যাগ করাই পরিচালকের কর্তব্য। তারপর তিন ঘন্টার অতিরিক্ত সময় অবৈতনিক সম্প্রদায়ের পক্ষে অভিনয় করা উচিত নয়। বরং নাটকেব পর একটা প্রহসন লইয়া অবশিষ্ট রাত্রি জাগরণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারেন। কিন্তু তিন ঘন্টার পরই নাটকের যবনিকা ফেলাই কর্তব্য। যেহেতু অনর্থক গাহনা সহানুভূতির পরিবর্তে বিরক্তি আনয়ন করে। Rehearsal (মহলায়) সময় সর্ব্বসাধারণকে প্রবেশ করিতে দেওয়া অবৈতনিক সম্প্রদায়ের একটি মহৎ দোষ। আগন্তুকের দল অভিনেতার দুর্ব্বলতা বুঝিয়া গিয়া লোকালয়ে প্রায়ই গল্প করিয়া থাকেন। অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে সেইগল্প ক্রমান্বয়ে এমন সজীবত্ব লাভ করিয়াছে, যে সেই অভিনেতা তাঁহার দোষ সম্পূর্ণ সংশোধন করিয়াও অভিনয় রজনীতে অনর্থক নিন্দাবাদ হইতে পরিত্রাণ পান নাই। অতএব rehearsal room -এ মহলার সময় সমিতির সভ্য ছাড়া অন্য কাহাকেও প্রবেশ করিতে দেওয়া উচিত নয়। অনবরত ভূমিকা পরিবর্তন করা অবৈতনিক সম্প্রদায়ের আর একটি দোষ। অনেক সমিতিতে দেখা গিয়াছে যে আগামীকল্য অভিনয় রজনী হইলেও তখনও এক আধটি ভূমিকা অনির্দিষ্ট রহিয়াছে। অদক্ষ অভিনেতার পক্ষে এতশীঘ্র মুখস্থ করা দুঃসাধ্য এবং prompter (স্মারক) এর সাহায্যে অভিনয় করাও অসাধ্য। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে অভিনয় আশানুযায়ী না হওয়া

অবশ্যম্ভাবী। অবৈতনিক নাট্য সম্প্রদায়ের পরিচালকের কর্তব্য, অভিনয় রজনীর অন্তত ৭দিন পূর্বে সমস্ত ভূমিকা নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখা এবং অভিনেতাদের ভূমিকা অভ্যাসের প্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখা।

অবৈতনিক নাট্য সম্প্রদায়ের অভিনেতাদের সকলের চেয়ে গুরুতর দোষ, তাঁদের অংশ কণ্ঠস্থ না করা। অবৈতনিক অভিনেতাগণ যদি কেবলমাত্র তাঁদের ভূমিকা কণ্ঠস্থ করিয়া বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও মিষ্ট ও উচ্চস্বরে আবৃত্তি করিতে পারেন তাহা হইলে সুখ্যাতি না পাইলেও নিঃসন্দেহ যে তিনি অখ্যাতি অর্জন করিবেন না। অবৈতনিক নাট্য সম্প্রদায়ের সমস্ত দোষগুলি খুঁটিয়া লিখিতে হইলে পাঠকগণ পড়িতে বিরক্ত হইবেন। অতএব এই বিষয় এইখানেই শেষ।

সক্ষম নাট্য সমিতির সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিৎ যে নাট্য সম্প্রদায় সাহিত্য সমালোচনা ও শিষ্টাচার শিক্ষার বিদ্যালয়। যথেচ্ছাচারের আড্ডা বা চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষার স্কুল নয়।

There are two stock excuses for this 'Stand still order in amature drama one being the rather pathetic piece of special pleading'. After all, we are only amatures and the other, 'We simple have not got the funds to do more'. As I hope to prove in the course of this book, lack of funds is not a valid excuse for lack of originality or for inartistic productions. The movement's real need is not funds but a new mental attitude to the theatre.

It should always be kept in mind that what was right for the professional production in a big theatre may be quite wrong in the village hall.

One tremendously disconcerting factor in the production of an amature play is the arrival of all sorts of stangers at rehearsal Chatting is not enough.

'Stage Craft'

Theatre is a school of manner not a school of medicine.

Long speeches are always inclind to make an audience restive and in amature theatre they become unbearable.

Practical Hint on Stage

নিম্নের সংযোজনটি কমল মিত্রের। তারতম্য লক্ষনীয়

'তবে ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায় যে ইঁহারা এক সময় খুব বলবান ও প্রতিভাশালী জাতিতে পরিণত হইয়াছিলেন। কাহারও কাহারও অনুমান আর্য্য জাতির দ্বারা বিতাড়িত অনার্য্য জাতিরাই পরে বিদ্যা বুদ্ধি ও জ্ঞান বলে এই প্রতিভাশালী জাতিতে পরিণত হইয়াছিলেন এবং এ অনুমানও একেবারে উপেক্ষার নিমিত্ত নয়। যাহা হউক, বর্তমান যুগে আদর্শ অভিনেতা অহীন্দ্রবাবু 'রাবণের' ভূমিকায় যে বর্ণে চিহ্নিত হইয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন উক্ত বর্ণে রঞ্জিত হওয়া শ্রেয় এবং আমার জ্ঞানে কর্তব্য।

Chocolate রং-এ রঞ্জিত হওয়া উচিত। ভাল গুম্ফ, ভালভাবে চাড়া দিয়া মুখে সংলগ্ন এবং টান থাকা বিধেয়। গালপাট্টা রাখা উচিত এবং উত্তম কৃষ্ণবর্ণের চুল ব্যবহার করা উচিত। ইহাদের রাজা মহারাজা প্রভৃতিতে উত্তম সাজে সজ্জিত করা উচিত। ইঁহাদের অলংকৃত থাকাই বিধেয় এবং

অলঙ্কারে রত্নাদির মধ্যে লাল কুঁচ বা লাল পলা ব্যবহার করা উচিত। ইহাদের দুই কর্ণে কর্ণ হইতে স্কন্ধ পর্যন্ত দুইটি দুলের ন্যায় অলঙ্কার ঝোলান উচিত।

বর্ণ ঃ জাতি অনুযায়ী হইয়া থাকে। সুতরাং একজাতীয় সব চরিত্রই এক বর্ণে রঞ্জিত হইবে এবং পদ মর্য্যাদা অনুসারে বেশভূষা হইবে।

অতঃপর আমি মেকআপ সম্বন্ধে আর একটি বিষয় লিখিয়া ক্ষান্ত হইব। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে সৌখীন সম্প্রদায়ের অভিনেতাগণের মুখের রং-এর সহিত অন্যান্য উন্মুক্ত অঙ্গের (হাত পা ইত্যাদি) রং-এর সামঞ্জস্য থাকে না। এমনকি মুখের রং-এর সহিত গলার রং-এর পার্থক্য উপলব্ধি হয়। ইহা অতীব দোষণীয় এবং বাহির হইতে অতি কদর্য্য দেখায়। এরূপ বিসদৃশ রূপে রঞ্জিত হইয়া আবির্ভূত হওয়া কখনও উচিত নয়। এরূপ অঘটনের কারণ প্রধানতঃ দুইটি — প্রথম - অভিনেতাকে স্বয়ং পেন্ট হইতে না জানা। দ্বিতীয় - কলিকাতার ভাড়া করা পেন্টার মুখটি পেন্ট করিয়া অনেক সময় হাত ও পা পেন্ট করিতে চাহেন না। কিন্তু এই দুইটি ব্যতিক্রম সহজেই অতিক্রম করিতে পারা যায়। পেন্ট শিক্ষা করাও যেমন সহজসাধ্য - তেমনি পয়সা লইয়া যাহারা পেন্ট করে তাহাদের প্রাপ্য কর্তন করিলেই দ্বিতীয়বার এ দুর্ঘটনা ঘটিবে না।

অবৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের প্রয়োগ গণের নিকট আমার অনুরোধ যে কখনই এরূপ বিসদৃশ রূপে নিজের অভিনেতাদিগকে আবির্ভূত হইতে দিবেন না। যেরূপ উপায়ে হউক এ বাধা দূর করিবেন। স্থির জানিবেন যে ইহা অতি দৃষ্টিকটু হইবে এবং শ্রদ্ধার পরিবর্তে অবজ্ঞার উৎপত্তি হওয়া আশ্চর্য্য নয়।

আমি আমার জ্ঞানমত শিক্ষা মত যাহা কিছু জানি তাহাই আপনাদিগকে নিবেদন করিলাম। অখ্যাতি যাহা কিছু তাহা আমার প্রাপ্য এবং প্রশংসা যদি কিছু পাই তাহা আমার গুরুর প্রাপ্য। ইতি-

শ্রী কমলবন্ধু মিত্র'
১লা বৈশাখ ১৩৪৯ সাল

।। তিন ।।

বর্ধমানের নাট্যচর্চার সঙ্গে চলচ্চিত্রচর্চাও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বেশ কিছু নাট্যমঞ্চের কুশীলব মঞ্চের মতই পর্দাকে বেছে নেন। বর্ধমানেই সম্ভবতঃ মফঃস্বল বাংলার প্রথম চলচ্চিত্রটি নির্মিত হয়। সালটি ১৯৩০। বর্ধমানের মহারাজ কুমার উদয় চাঁদ মহতাব বাহাদুরের অর্থানুকূল্যে 'দি স্টার অফ্ ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানি'র প্রযোজিত 'বরাতের ফের' ছবিটি মুক্তি পায় ১৯৩০-এ। নাগ স্টুডিও-র দুই কৃতি ব্যক্তি সূর্য্য কুমার নাগ এবং অরুণ কুমার নাগের চিন্তনে, মননে এবং নির্দেশনায় ছবিটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। পরবর্তী সময়ে বর্ধমান শহর তথা জেলা থেকে বহু মানুষ বাংলা চলচ্চিত্রে অংশগ্রহণ করে খ্যাতিলাভ করেন। 'বরাতের ফের' বোধহয় এই আগ্রহের একটি সিঁড়ি। ছবিটি নির্মাণের ব্যয়ভারের সিংহভাগ রাজপরিবার থেকে বরাদ্দীকৃত হয়। প্রথম দিকে মহারাজ বিজয়চন্দের বিশেষ আগ্রহ না থাকলেও তিনি পরে আগ্রহভরে ছবিটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। এবং উৎসাহ ভরে ছবিটির সার্থক রূপায়ণের জন্য রাজবাটিতে স্যুটিং করার অনুমতি দেন। শুধু তাই নয়, অভিনেতা অভিনেত্রীদের রাজ পরিচ্ছদ, অলঙ্কার পরতে দেওয়া হয়। রাজার হাতি ঘোড়াও ব্যবহার করা হয়। কলকাতার রিপন থিয়েটারে ছবিটি মুক্তি পায় ১৯৩০ এর ১৫ই নভেম্বর।

ছবির প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হন অহিভূষণ মুখোপাধ্যায় (ডাঃ সুবোধ মুখোপাধ্যায়-এর বাবা)। নাটকের অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অভিনয় করেন।

দুঃখের বিষয় ছবিটি বেশিদিন চলেনি। এর প্রায় এক সঙ্গে মুক্তি পায় বৃটিশ ডোমিনিয়ন-এর 'পঞ্চশর'। ধীরেন গাঙ্গুলী, দেবকী বোস প্রমুখ অভিনয় করেন। ঐ সময় আরও মুক্তি পায় ম্যাডান কোম্পানির 'মানিক জোড়'। ইংরাজি নাম Fortune Hunters. এই দিন রিপন থিয়েটারে মুক্তি পায় স্টার অফ্ ইণ্ডিয়ার 'বরাতের ফের'। ছ'রিলের এই ছবিটি সম্পর্কে অমৃত বাজার পত্রিকা লেখে '..... নাট্যচিত্র 'বরাতের ফের' তুলিয়া এই কোম্পানির বরাত সত্যই উলটা দিকে ফিরিয়া গেল। হাতি ঘোড়ার মেলা আর বিজ্ঞাপনের বহর ছাড়া এই ছবিখানির আর কিছুই নাই। ... ছবির পরিবেশক ম্যাডান কোম্পানি।'

সম্ভবতঃ এই সময় সবাক ছবির সূত্রপাতও ছবিটি বন্ধ হবার আর একটি কারণ। ছবিটি নির্বাক। কাহিনীতে ছিল রাজকীয় উত্থান পতন। অতিনাটকীয় সংলাপ ও বিষয়বস্তু প্রভূত পরিমানে ছিল। (অবশ্য সে সময়কার সব ছবিই ছিল পর্দায়িত নাটক) ছবিটি কলকাতায় পরিবেশন করে বিখ্যাত ম্যাডান এ্যাণ্ড কোং। (রাজ কুমার কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে ম্যাডান এই ঝুঁকি নিতে রাজি হয়) রিপন থিয়েটারে ছবিটি মুক্তি পাবার পর পরই 'বঙ্গবানী' (কলকাতা সংস্করণ ঃ বুধবার, ২৮শে ফাল্গুন ১৩৩৬ সাল) লিখেছিল
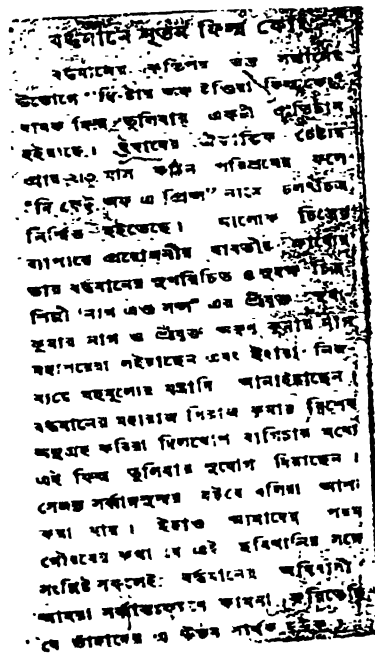
বর্দ্ধমান নূতন ফিল্ম কোং

'বর্দ্ধমানেব কতিপয ভদ্রসন্তানেব উদ্যোগে 'দি ষ্টার অফ ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোং' নামক ফিল্ম তুলিবার

একটি প্রতিষ্ঠান হইয়াছে। ইহাদের ঐকান্তিক চেষ্টায় প্রায় ২/৩ মাস কঠিন পরিশ্রমের ফলে 'দি ফেট অফ এ প্রিন্স' নামে চলচ্চিত্র নির্ম্মিত হইতেছে। আলোক চিত্রের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় যাবতীয় কার্য্যের ভার বর্দ্ধমানের সুপরিচিত ও সুদক্ষ চিত্র শিল্পী 'নাগ এণ্ড সন্স' এর শ্রীযুক্ত সূর্য্য কুমার নাগ ও শ্রীযুক্ত অরুণ কুমার নাগ মহাশয়েরা লইয়াছেন এবং ইহারা নিজব্যয়ে বহুমূল্যের যন্ত্রাদি আনাইয়াছেন। বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ কুমার বিশেষ অনুগ্রহ করিয়া দিলখোস বাগিচার মধ্যে এই ফিল্ম তুলিবার সুযোগ দিয়াছেন। সেজন্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ইহ ও আমাদের পরম গৌরবের কথা যে এই ছবিখানির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলেই বর্দ্ধমানের অধিবাসী। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করিতেছি যে তাঁহাদের এ উদ্যম সার্থক হউক।'

পাশাপাশি এই উদ্যোগ সম্পর্কে অন্য কলমে 'বঙ্গবানী'র সংযোজন ঃ
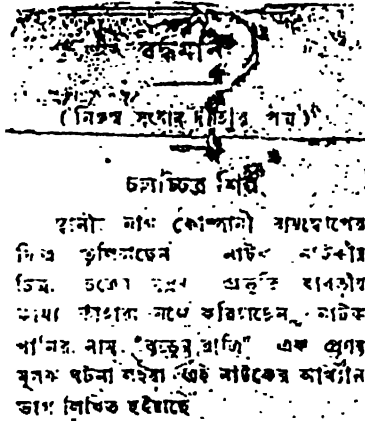
বর্ধমান

(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

চলচ্চিত্র শিল্প

'স্থানীয় নাগ কোম্পানী বায়োস্কোপের ফিল্ম তুলিয়াছেন নাটক নাটকীয় চিত্র চিত্রের মুদ্রন প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্য তাঁহারা নিজে করিয়াছেন নাটক খানির নাম 'ঝড়ের রাত্রি' এক প্রণয় মূলক ঘটনা লইয়া এই নাটকের আখ্যান ভাগ লিখিত হইয়াছে।'

বিজ্ঞাপনের হেরফের দেখা যাচ্ছে যথাক্রমে ১৫-১১-৩০ এবং ১৮-১১-৩০ তারিখে। 'অমৃতবাজার পত্রিকায় ১৫ই ও ১৮ই সেপ্টেম্বরের বিজ্ঞাপন দুটি নিম্নরূপ

লক্ষ্য করুন, ১৫ তারিখ বিজ্ঞাপনে 'AN UNIQUE' ১৮ তারিখ 'A UNIQUE' হয়ে গেল। শুধু ব্যাকরণ সংশোধনই নয়, দর্শকের আগ্রহ বাড়ানোর জন্য with all star cast এর সঙ্গে 'A gripping .... high adventures' জুড়ে দেওয়া হচ্ছে। মজার ব্যাপার, কাহিনী সংক্রান্ত কোন বাড়তি মাত্রা জোড়া হয়নি, যা জুড়েছে তা হল টেকনোলজি সংক্রান্ত। ১৯৩০ এও মানুষের আগ্রহের মাত্রাটি ভাবুন! আজকাল যারা যাত্রা-মার্কা-সিনেমা করছেন, তাঁদের একটু হায়া এলে হয়!

A SUPER INDIAN PRODUCTION
'A WHEEL OF FORTUNE
AT
Ripon Theatre
31, Machua Bazar St.
——:O:——
To-day, Tuesday, 18th November
At 6 and 9-30 p.m.
Madan Theatres Ltd. Present
The Star of Burdwan Film
Company's
Latest Indian Film:—
THE WHEEL OF
FORTUNE
OR
"BARATER FER"
With an all Star Cast.
A gripping story rich in colour,
Meteoric in its speedy development and crammed with
high adventures!
A UNIQUE FILM IN BEAUTY, I
DRAMA—AND IN GREAT HEART
APPEAL!
A hilarious drama with comedy
situations and tense in emotions
with a crashing climax!
A HEART-STIRRING STORY OF
DARING ACTIONS.
Also Several Other Films.

A SUPER INDIAN PRODUCTION:—
A WHEEL OF FORTUNE
AT
RIPON THEATRE
30, MECHUABAZAR STREET
Sat, 16th. Sunday 18th Nov.
At 6 and 9-30 P.M.
Madan Theatres Ltd. Present:—
The Star of Burdwan Film Company's
Latest Indian Film:—
A WHEEL OF FORTUNE
AND
BARATER-FER
With an all Star Cast.
AN UNIQUE FILM IN BEAUTY IN
DRAMA—AND IN GREAT
HEART APPEAL!
A hilarious drama with comedy
situations and tense in emotions with
a crashing climax!
A heart-stirring story of daring
Actions!
ALSO SEVERAL OTHER FILMS.

সূর্যকুমার নাগের ব্যক্তিগত ফাইল থেকে দেখেছি, তিনি নিজেই বিজ্ঞাপনের বয়ান ঠিক করে দিতেন। তাঁর একটা বিজ্ঞাপনের বয়ান ৬-১২-৩১-এ 'THE GUARDIAN'-এ 'issue' করা হয়। মুদ্রিত হয়েছিল কিনা জানি না।

১৯৩১ এর এই বিজ্ঞাপনটিতে লক্ষনীয় এই, কোন অভিনেতার নাম বিজ্ঞাপনে নেই। এইটি স্থিরচিত্র সন্নিবদ্ধ ছিল, সেটি একটি নর্তকীর। নামগুলি সবই অভিনেত্রীদের। এও দর্শক টানার একটা ব্যবসায়ী উদ্যোগ। অবশ্য মূল কাহিনীর আবর্তনে নারীর ভূমিকা আপাতঃ কম। তবু চার পাঁচ জন 'দেবী' সশরীরে উপস্থিত হচ্ছেন এ খুব কম কথা নয়। যদিও 'বাঙলা' (কলিকাতা) শুক্রবার, ১৪-১০-৩০-এ একটি গভীর সন্দেহ প্রকাশ করা হচ্ছে 'দেবী' দের সম্পর্কে।

'বরাতের ফের'

'আমাদের পাঠক-পাঠিকারা বোধ হয় বর্দ্ধমানের 'দি ষ্টার অব ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানী'র নাম শুনেছেন – বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ কুমার শ্রীমান্ উদয়চাঁদ মহতাব বাহাদুর এই কোম্পানীর পৃষ্ঠপোষক (লোকে বলে, শুধু 'পৃষ্ঠপোষক' নন, সম্পূর্ণ বা অনেকাংশের 'অধিকারী – আমরা সত্য-মিথ্যা জানি না) কোম্পানীর তোলা প্রথম ছবি ('অভিনব বাঙলা নাট্যচিত্র') 'বরাতের ফের' কাল থেকে ম্যাডানের 'রিপণ থিয়েটার' চিত্র-গৃহে দেখানো হবে। বিজ্ঞাপনের ভাষায় 'বর্দ্ধমান রাজের বিরাট প্রাসাদ, রাজোদ্যান, যান-বাহন ও সুসজ্জিত হস্তী, ঘোটক প্রভৃতির সহায়তা গ্রহণে এই চিত্র দৃশ্য-সম্পদে অতুলনীয় হইয়াছে। – বাঙ্গালীর অপ্রত্যাশিত অভিনয়-সাফল্য!' দেখা যাক, ছবি দেখিয়া দর্শক বিজ্ঞাপনের এই কথাগুলির সমর্থন করেন কিনা!'

বিজ্ঞাপনে আরো প্রকাশ যে এই ছবিতে 'শ্রেষ্ঠাংশে শ্রীমতী লতিকা দেবী, শ্রীমতী মীরা বাঈ, শ্রীমতী রেণু দেবী, ও শ্রীমতী বীণা দেবী প্রভৃতি' আছেন। এরা কি-রকম 'দেবী'? – 'সীতা দেবী' 'ললিতা দেবী' 'ইন্দিরা দেবী', 'উমা দেবী' ইত্যাদিরই মতো 'অ-বাঙালী' (বা 'ফেরঙ্গা') বা 'সুপ্রসিদ্ধ' অঞ্চলের অধিবাসিনী 'দেবী' নাকি ?

বিদ্যাসাগরের মত ব্যক্তিত্ব 'দেবী' দের থিয়েটার করা মেনে নিতে পারেন নি। তিনি বেঙ্গল থিয়েটারের কমিটি থেকে পদত্যাগ করেন। ১৯৩০-এও এঁদের অভিনয়ে অংশগ্রহণ নিয়ে রিভিয়্যু-তে প্রশ্ন উঠছে। মজিদদা – পরে এঁর প্রসঙ্গে বলব, অবশ্য বললেন, এঁরা সকলেই ভদ্রঘরের মেয়ে। এদের অভিনয় আহামরি কিছু না হলেও প্রথম উদ্যোগ হিসাবে যথেষ্ট প্রশংসনীয়। 'বাঙলায়' প্রকল্পিত এইরকম নেতিবাচক 'সমালোচনা' চলচ্চিত্রে মেয়েদের অংশগ্রহণকে আরও দীর্ঘায়িত করে তুলেছিল। সমালোচনার ভয়ে অনেক আগ্রহী মহিলা ছবিতে নামতে পারতেন না।

এই 'বাঙলা' পত্রিকাটি প্রথম থেকেই 'বরাতের ফের'কে তুলোধোনা করতে শুরু করেছিল। এদের আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দু রাজকুমার উদয়চাঁদ। (নথি থেকে বোঝা যাচ্ছে, এঁরা, এবং আরও অনেক 'সুধীজন' রাজকুমারকে এই অপব্যয় থেকে নিবৃত্ত করতে চেয়েছিলেন। রাজকুমার পিছিয়ে আসেননি। ছবিটি মুক্তি পায়, কিন্তু বাজার পায় না। 'বাঙলা' আবার স্ব-মূর্তি' ধারণ করে। ২৮শে নভেম্বর, শুক্রবার, ১৯৩০-এ ছবিটির সমালোচনা প্রকাশিত হয়

বর্ধমান রাজবাটীর (?) 'বরাতের ফের'

আমাদের পাঠক পাঠিকারা জানেন, কতখানি ঢাক ঢোল পিটিয়ে এখানে 'বরাতের ফের' ছবি শেখানো শুরু হয়েছিল – তাও আবার যে সে ছবি ঘরে নয়, একেবারে ''রিপনে'র মতো 'নামজাদা' বাড়ীতে। ছবিখানা এম্নি 'গ্র্যাণ্ড' (!) হোয়েছে এবং এমনি চমৎকার 'হাউস ড্র' কোরেছে যে, রিপন ছবিঘরের কর্তৃপক্ষ তাড়াতাড়ি (অর্থাৎ বুধবারই) ছবিখানা সরিয়ে নিয়ে নতুন ছবি নিতে বাধ্য হোয়েছেন। শুনতে পাই, বৰ্দ্ধমানের শ্রী মম্মহারাজাধিরাজ কুমার বাহাদুর এই নতুন ছবি কোম্পানির পৃষ্ঠপোষক বা অধিকারী – এখন জিজ্ঞাস্য এই, এই Still Born ছবিখানাতেই তাঁর (এবং কোম্পানীর) সখ বা খেয়াল মিটবে, না আরো কিছু অর্থের অপব্যয় করার ইচ্ছা আছে?' ছবিটি মুক্তি পায়, আগেই উল্লেখ করেছি, রিপন হল-এ। বর্ধমানের মানুষের প্রবল আশার মধ্য দিয়ে বর্ধমান সিনেমা হল-এ ছবিটি এলো ১২ই ডিসেম্বর ১৯৩০। বৰ্দ্ধমান বানীতে বিস্তৃত খবর প্রকাশিত হল।

বৰ্দ্ধমানে নূতন বায়োস্কোপের ছবি

'পাঠকগণ অবগত আছেন যে বৰ্দ্ধমানে ষ্টার অফ্ ইণ্ডিয়া নামক এক বায়োস্কোপ কোম্পানি 'বরাতের ফের' নামক এক নূতন ছবি প্রস্তুত করিয়াছেন। উক্ত ছবি সুবিখ্যাত ম্যাডান কোম্পানি কর্তৃক মনোনীত হইয়া কলিকাতায় প্রদর্শিত হইয়া গত শনিবার হইতে ৪দিন বৰ্দ্ধমান সিনেমা হাউসে দেখান হইয়াছে। ছবির গল্পটি বিশেষ চিত্তাকর্ষক নহে। তথাপি

উক্ত ৪দিন সিনেমাগৃহ দর্শকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। প্রথম দুইদিন অনেকে স্থান লাভ করিতে না পারিয়া ফিরিয়া গিয়াছিলেন। ছবি আমরা কয়েকবার দেখিয়াছি। দর্শকগণের অনেকের অভিমত শুনিয়াছি। সকলেই প্রায় একবাক্যে ছবির প্রশংসা করিয়াছেন। আমরাও ছবি বেশ ভাল হইয়াছে বলিয়া মনে করি। ছবি বর্দ্ধমানে আসিবার পূর্ব্বে কয়েকজন ভদ্রলোক ছবির বিশেষ নিন্দা প্রকাশ করিয়াছিলেন ও উক্ত মত নানা স্থানে প্রচার করিতেছিলেন। ইহার ফলে সহরবাসীগণের মধ্যে ছবি দেখিবার স্পৃহা জাগিয়া উঠে। ইহার ফলে সিনেমা হাউস লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠিয়াছিল। শেষ দিন মহারাজ কুমার সাহেব স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। কুমার সাহেব স্বয়ং এই কোম্পানির পৃষ্ঠপোষক। তিনি এই কোম্পানিকে রাজবাটীর দুষ্প্রাপ্য সাজ সরঞ্জাম হাতি ঘোড়া ঘোড়সওয়ারআদি দিয়া বিশেষ উৎসাহিত করিয়াছিলেন। ছবি দেখার পর তিনিও অতিশয় তুষ্ট হইয়াছেন এই কথা প্রকাশ করিয়াছেন। অভিনেতাগণের মধ্যে অনেকেই অতি সুন্দর অভিনয় করিয়াছেন। মিঃ আর.সি. বোস অনিলবাবু প্রভৃতি অনেকেই বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। আমাদের সুবিখ্যাত ডাক্তার শ্রীঅহিভূষণ মুখোপাধ্যায় রাজা সাজিয়া মুখের ভঙ্গীতে সকলকেই প্রীত ও চমৎকৃত করিয়াছেন। সিনেমার হিসাবে অহিভূষণবাবুর অভিনয় সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হইয়াছে বলিয়া অনেকে প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা শুনিতেছি যে এই কোম্পানি আর একটি ছবি তুলিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। আমরা আশা করি বর্দ্ধমানের সকলেই কোম্পানিকে অর্থ ও লোক দিয়া সাহায্য করিবেন।'

বর্ধমানবাসীর কাছে 'বরাতের ফের' আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রাজবাটীতে, গোলাপবাগে – যেখানেই ছবি তোলা হয়েছিল, কাতারে কাতারে লোক শুধু হাজিরই হননি, তাঁদের অকুণ্ঠ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। রাজন্যবর্গের যুক্ত থাকার ফলে প্রশাসনিক সহযোগিতা পাওয়া সহজ হয়েছিল। রাজপরিবারও তাঁদের উদারতা প্রকাশ করেছিলেন ছবিটি নির্মাণে। রাজবাটির ভিতরেও দু-একটি শট্ নেওয়া হয়েছিল। তাঁদের বেশ কিছু পোষাক পরিচ্ছদও দিয়েছিলেন ছবির স্বার্থে। হাতি-ঘোড়া তো দিয়েছিলেনই। ছবিটি নির্মাণের আগে ৫ই অগ্রহায়ণ, শুক্রবার) 'বর্দ্ধমান বাণী'তে প্রকাশিত হল।

বর্দ্ধমান বাণী ঃ ৫ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার

বর্দ্ধমানে সিনেমার ছবি প্রস্তুত

'আমাদের পাঠকগণ শুনিয়া সুখী হইবেন যে বর্দ্ধমান 'ষ্টার অফ ইণ্ডিয়া ফিল্‌ম কোম্পানি' 'বরাতের ফের' নামক এক নূতন ছবি প্রস্তুত করিয়াছেন। কুমার সাহেব উদয় চাঁদ স্বয়ং এই অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠ পোষক। তাঁহার সৌজন্যে এই কোম্পানি অবাধে রাজবাটীর হাতী ঘোড়া অশ্বারোহী ও নানা প্রকার দুর্লভ সাজ সজ্জা ব্যবহার করিতে সক্ষম হইয়াছেন। নাগ এণ্ড সন্স আধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে এই ছবি তুলিয়াছেন। বর্দ্ধমানের রাজবাটী দিলখোস বাগ প্রভৃতি নানা স্থানে ছবি লওযা হইয়াছে।

নূতন ছবি হিসাবে অতিশয় সুন্দর হইয়াছে। আরও সুখের বিষয় এই যে কলিকাতার সুবিখ্যাত ম্যাডান কোং এই ছবি তাহাদের হাউসে দেখাইবার জন্য গ্রহণ করিয়াছে। গত ১৫ই নভেম্বর তারিখ হইতে কলিকাতার রিপন থিয়েটারে এই ছবি চলিয়াছে।

বর্দ্ধমানের মিঃ আর, সি, বসু ও অনিলবাবু ও কলিকাতার কয়েকজন বিখ্যাত অভিনেত্রীগণ এই ছবিতে অভিনয় করিয়াছেন। আমরা এই ছবি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। ছবি অতি সুন্দর হইয়াছে। আমরা আশা করি যে বর্দ্ধমান সিনেমা হাউসে এই ছবি শীঘ্রই দেখান হইবে। বর্দ্ধমানের কয়েকজন উৎসাহী ব্যক্তির উদ্যমে এইরূপ সুন্দর ছবি প্রস্তুত হওয়া বর্দ্ধমানবাসীগণের পক্ষে অতিশয় গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই।

সবাক ছবির অভ্যুদয়, কারিগরী অসম্পূর্ণতা, গল্পের অসামঞ্জস্য, সমালোচকের আক্রমণ-যে কারণেই হোক, ছবিটি বাজার জাত করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। কিন্তু মফঃস্বল বাংলার প্রথম চলচ্চিত্র হিসাবে, ইতিহাস মূল্যের নিরিখে, ছবিটির গুরুত্ব অপরিসীম। তথ্যানিসন্ধিৎসু গবেষকের কাছে ছবিটি একটি মূল্যবান দলিল এবং আকর হিসাবে কাজ করতে পারে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ নাগ স্টুডিও এবং আব্দুল মজিদ

বর্ধমান জেলার অধ্যাত্ম সাধনার ধারা

জয়ন্ত মুখোপাধ্যায়

প্রাককথন

॥ ১ ॥

বর্ধমান জেলার আধ্যাত্মিকতা কোন প্রান্তিক বিষয় নয়, ভারতবর্ষের মূলধারার এক ক্ষুদ্র সংস্করণ। সেজন্য এই জেলার ধর্মচর্চার স্রোতধারাটি ভারতবর্ষীয় মূলধারার শাখা হিসাবে বিবেচ্য হওয়া উচিত। এক হিমালয় থেকে নির্গত ভিন্ন নদীগুলি যেমন ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলকে পুষ্ট করেছে তেমনি 'বেদ' থেকে উৎপন্ন নানা সাধনধারা একই সত্যকে আবিষ্কার করেছে। বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, গাণপত্য, সৌর ইত্যাদি বিভিন্ন উপাসক সম্প্রদায়ের মিলনভূমি এক - 'বেদ'। প্রত্যেকেই শ্রুতির আলোয় আলোকিত। এমনকি ঈশ্বর বিশ্বাস বা অবিশ্বাস নয়, বেদমান্যতা অনুযায়ী দর্শনগুলির আস্তিকত্ব নির্ণিত হয়েছে। বেদ প্রবর্তিত সাধনধারা তন্ত্রতেও অনুসৃত। মনুসংহিতার প্রখ্যাত টীকাকার কুল্লুকভট্ট, তন্ত্রকে শ্রুতিমূলক বলেছেন - 'বৈদিকী তান্ত্রিকী চৈব দ্বিবিধা কীর্তিতা শ্রুতিঃ।' আধুনিক গবেষকেরা যে সমস্ত ধর্মীয় ধারাকে 'অন্ত্যজশ্রেণী'-র, 'অনার্য' - দের ধর্ম বলেন - যেমন 'মনসা', 'ধর্মঠাকুর' ইত্যাদি - সেগুলিরও উৎস ভূমি বেদ। আর এই উৎসমুখটি নেহাৎ ক্ষীণতোয়া নয়। রাঢ় বাংলার 'আঞ্চলিক দেবতা' কিংবা 'গ্রাম দেবতাদের' অনেকেরই উৎপত্তিভূমি বেদ। আঞ্চলিক ভিন্নতা, নানা প্রকার দেশাচার, লৌকিক সাহিত্যের বাঁধনহারা কবিকল্পনা এ সকল দেবদেবীর নামের পরিবর্তন ঘটিয়েছে, রূপান্তর এনেছে রূপেরও। অবশ্য এটা শুধু রাঢ় বাংলার ক্ষেত্রে নয়, ভারতবর্ষের নানা জায়গায় এ পরিবর্তন ঘটেছে। মূল বেদ-ই বহু শাখা - প্রশাখায় বিভক্ত হয়েছে। ঋগ্বেদেরই মোট একুশটি শাখা। আঞ্চলিক ভিন্নতায়, স্বর বৈচিত্রে বেদ পাঠ করার নানা পদ্ধতি। একই বৈদিক যজ্ঞ করার জন্য কোথাও যে যজ্ঞকাঠ ব্রাত্য, অন্য জায়গায় তাই আদরণীয়। বাহ্যিক পোষাক শুধু পাল্টেছে। নাম - রূপ ও বাইরের আচার বৈচিত্র্যের মধ্যেও মূল প্রাণ স্পন্দন রয়েছে অব্যাহত। এযেন ঠিক আমাদের গঙ্গানদীর মতো - তাকেই দেখছি ; হাওড়ায়, হরিদ্বারে আবার গোমুখেও। গঙ্গানদীর সঙ্গে যেমন মিলেছে আরও কত নদনদী; সেরকম আমাদের মূল দেব-দেবীর সঙ্গে মিশেছে নানা দেশাচার, লোকাচার অথচ উৎস প্রাণতা নষ্ট হয়নি -নাম রূপের বৈচিত্রে পল্লবিত হয়েছে মাত্র। বর্ধমান জেলার আধ্যাত্মিকতার বর্ণনার ক্ষেত্রে সেই উৎস মুখটিকে খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে। বৌদ্ধ বা জৈন, বৈদিক ক্রিয়াকান্ডের বিদ্রোহী, কিন্তু মূল মাতৃপরিচয়ে ভিন্ন নয় — এসবই ঐতিহাসিক সত্য। আর্য ধর্মাবলম্বীরাও বুদ্ধদেবকে এক অবতার রূপে স্বীকার করে নিয়েছেন। একমাত্র উল্লেখযোগ্য ভিন্ন ধর্মীয় ধারা ইসলাম, যদিও ভারতবর্ষের আবহাওয়ায় তাও একান্ত আপনভাবে ভারতীয়। ইসলাম ধর্মের মূলনীতিগুলি কোরাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত। হাদিসের অনুশাসন দ্বারা মুসলিম জীবন নিয়ন্ত্রিত। পৃথিবীর সকল মুসলমানের ক্ষেত্রে এটি একটি মূলগত ঐক্য। তবে ইসলামের ক্ষেত্রেও ভৌগোলিক ভিন্নতা জীবনে ও মননে পরিবর্তন ঘটিয়েছে। ভারতবর্ষে

বৃহত্তর মুসলিম সম্প্রদায়ের সৃষ্টি বিভিন্ন কারণে হিন্দু সম্প্রদায়ের মুসলিম ধর্ম গ্রহণের মাধ্যমে। তারা ভিন্ন ধর্মমত গ্রহণ করলেও পূর্ব অভ্যাস ত্যাগ করেনি। ভারতবর্ষের ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের উৎসব - অনুষ্ঠানে হিন্দু আচারের অনেক কিছু মান্য করা হয়। মুসলিমদের হিন্দু ডাক নাম সেই ঐতিহ্য বহন করে। যে সকল হিন্দুরা (প্রধানত নিম্নশ্রেণীর হিন্দু) ইসলাম ধর্মগ্রহণ করত তারা ইসলাম ধর্মশাস্ত্র সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ছিল; আরবী - ফার্সী প্রায় কেউই জানতো না। হিন্দুরা ইসলাম ধর্মগ্রহণ করলেও মহাভারতের বাংলা অনুবাদ পাঠ করত। একজন মুসলিম ঐতিহাসিকের খেদোক্তি এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য - তিনি বলেছেন ;

'হিন্দু মোছলমান তাহা ঘরে ঘরে পড়ে।
খোদা রসুলের কথা কেহ না সোঙরে।।'[২]

মুসলিম সমাজে পীর ও মোল্লা সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হিন্দুদের গুরু এবং পুরোহিত-ব্রাহ্মণের অনুকরণে যা খাঁটি ইসলামে অনুমোদিত নয়। পীরদের শক্তিতে রোগ-ব্যাধির আরোগ্য হয় - এ ধরনের বিশ্বাসও হিন্দু সমাজের প্রভাব যা ইসলাম ধর্মে স্বীকৃত নয়।

ইংরাজ ও ফরাসী শাসনের ফলে মূলত খ্রীষ্টান ধর্ম এক নব সাধনধারা রূপে ভারতবর্ষে প্রভাব বিস্তার করে যা বর্ধমান জেলাতেও স্থায়ী স্রোতের সৃষ্টি করেছে।

।। ২ ।।

বর্ধমান জেলার আধ্যাত্মিকতার ধারার আলোচনার আগে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান করা জরুরী। বর্ধমানকে কোন্ ভৌগোলিক সীমারেখার দ্বারা বাঁধব ? বিভিন্ন কারণে এই সীমারেখা পরিবর্তিত হয়েছে। দু'হাজার বছরেরও আগে বর্ধমান ছিল সূক্ষ্মভূমি। সমগ্র বাংলাদেশের মধ্যেকার ভেদরেখা ছিল ভাগীরথী নদী। উত্তরখন্ডের নাম পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তি এবং দক্ষিণখন্ডের নাম বর্ধমান ভুক্তি। বর্ধমান ভুক্তির প্রধান নগর বর্ধমান ছিল দামোদর বা তার কোন শাখানদীর তীরে অবস্থিত। এখনকার বর্ধমান সেই বিরাট বর্ধমানের ধারে কাছেও আসে না।[৩] বর্তমান বর্ধমানের ধর্মচর্চা কি পাশ্ববর্তী বাঁকুড়া-বীরভূম-হুগলীর স্পর্শ ব্যতিরেকে সম্ভব? আসলে মানুষের জীবন চর্যার ধারা ভৌগোলিক সীমা'কে অগ্রাহ্য করে। আমরা বর্তমানের ভৌগোলিক সীমাকে মান্যতা দেব কিন্তু উৎস মুখটির সন্ধানে ভৌগোলিকতার বাইরে পদচারণা করতে দ্বিধা করব না; অন্ততপক্ষে ইতিহাসের সত্য রক্ষার জন্য তা একান্ত আবশ্যক ও প্রয়োজনীয়ও।

প্রাচীনকালে সমগ্র ভারতবর্ষ কয়েকটি অঞ্চলে বিভাজিত ছিল। খুব প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ মনুসংহিতায় এ ব্যাপারে স্পষ্ট নির্দেশ আছে। সমগ্র ভারতবর্ষ ব্রহ্মাবর্ত, ব্রহ্মর্ষি , বিনশন দেশ, মধ্যদেশ, আর্যাবর্ত এবং ম্লেচ্ছ দেশে বিভক্ত ছিল। মানুষের সংস্কৃতি, রীতিনীতি অনুযায়ী স্থান ভেদ ছিল। পৌন্ড্রক, ঔড্র, দ্রাবিড়, কাম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ ও খশ প্রভৃতি ছিল ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান নাম।[৪] দ্রাবিড় ভারতবর্ষের একটি আঞ্চলিক নাম। শ্রীমদভাগবত ও বৃহৎসংহিতাতেও একই প্রমাণ পাওয়া যায়। দ্রাবিড়

দেশের অধিবাসীদের 'দ্রাবিড়া' বা 'দ্রবিড়া' বলা হত। আচার্য শঙ্করের জন্মস্থান কেরলের 'কালাডি' গ্রামে। কেরল যেহেতু দ্রাবিড় অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত সেজন্য শঙ্করাচার্যকে 'দ্রাবিড়ে' অর্থাৎ দ্রাবিড়ে দেশীয় বলা হয়েছে। শঙ্করাচার্যের পরম্পরাগুরু গৌড়পাদ গৌড় বা বাংলাদেশের বলে তাঁকে 'গৌড়ে' বলা হয়েছে।[৫] পূর্বভারত ছিল আর্যাবর্তের শেষভাগ। মনুসংহিতায় কৃষ্ণসার মৃগের চারণভূমিকে যজ্ঞিয়ো দেশ বলা হয়েছে - 'কৃষ্ণসারস্তু চরতি মৃগো যত্র স্বভাবতঃ / স জ্ঞেয়ো যজ্ঞিয়ো দেশো ...'। এই কৃষ্ণসার মৃগের অন্যতম অনুকূল চারণভূমি ছিল বাংলাদেশ সহ সমগ্র পূর্বভারত। কৃষ্ণসার মৃগ ও কৃষ্ণাজিন ছিল আর্যদের অত্যন্ত প্রিয়। তৈত্তিরীয় সংহিতায় আছে, 'ব্রাহ্মণঃ এতদ্ রূপম ইয়াৎ কৃষ্ণাজিনম' -অর্থাৎ, কৃষ্ণাজিন যেন সাক্ষাৎ ব্রাহ্মণ তুল্য। ঋষি বশিষ্ঠ বলেছেন, 'যে স্থান পর্যন্ত কৃষ্ণসার মৃগদের চড়ে বেড়াতে দেখা যায় সেই পর্যন্ত ভূভাগ আধ্যাত্মিক শক্তিলাভের উপযোগী, অর্থাৎ আর্যদের বসবাসের উপযোগী।' অধ্যাপক ব্লানফোর্ড ও অধ্যাপক বুহ্‌লারের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী কৃষ্ণসার মৃগের (oryx cervicapra) চারণভূমির মধ্যে পূর্বভারতে পড়ে। সিন্ধু থেকে আসাম এবং হিমালয় থেকে ত্রিচিনাপল্লী পর্যন্ত বিস্তীর্ণ তৃণভূমিকে কৃষ্ণসায়র মৃগের বিচরণ ক্ষেত্র বলে ব্লানফোর্ড মন্তব্য করেছেন।[৬] আর্য শব্দের অন্যতম অর্থ শিষ্ট বা সংস্কৃতি মনস্ক। পতঞ্জলি আদর্শ শিষ্টদের যে বাসভূমির উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে পূর্বভারতও আছে।[৭] এ সমস্ত প্রমাণ থেকে আমরা যে ঐতিহাসিক সারসত্যটুকু পাই তা থেকে বলতে পারি, প্রাচীনকাল থেকেই পূর্বভারত আর্য সংস্কৃতির প্রভামন্ডিত ছিল। ঋগ্বেদে রাজা নমুচিও নমী সাপ্য - র নাম পাওয়া যায় যিনি বৈদিক দেবতা ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে স্তুতি করেন।[৮] নমীর পিতা সপ্ ছিলেন বৈদেহরাজ অর্থাৎ উত্তর বিহারের রাজা যা পূর্বভারতের অন্তর্গত।[৯] ঋক্‌বেদে যে সমস্ত প্রাচীন রাজবংশের নাম পাওয়া যায় তার মধ্যে অন্যতম 'অনু'বংশ। অনুর বংশে উশীনর জন্মান। উশীনরের পাঁচ পুত্রের অন্যতম হলেন 'শিবি'। শিবির বংশেই ঋষি দীর্ঘতমা ও ভার্গব জন্মান। শিবির অন্যান্য পুত্রগণ হলেন অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সূহ্ম ও পুণ্ড্র। বঙ্গের রাজত্ব ছিল বাংলাদেশে - তার নাম অনুসারেই এই দেশের নাম বঙ্গদেশ।[১০] পূর্বভারতে যে অশোকলিপি পাওয়া গেছে তাতে বৈদিক যুগ থেকেই যে আর্যরা এই অঞ্চলে বাস করত তা প্রমাণিত হয়। ডঃ সেনের মতে বৃহদারণ্যক ও তৈত্তিরীয় উপনিষদের আখ্যানগুলি পূর্বভারত সম্পর্কিত।[১১] সম্রাট অশোকের বহু পূর্ব থেকে পূর্বভারতে 'ছন্দস' বা বৈদিক ভাষার প্রচলন ছিল। বৈদিক যজ্ঞ করার প্রয়োজনীয় উপকরণ কাষ্ঠ, দুগ্ধ, ঘৃত, জল ইত্যাদি বাংলায় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। সাংখ্যদর্শনের প্রণেতা কপিল তাঁর তপশ্চর্যার জন্য বাংলাদেশের গঙ্গাসাগর সঙ্গমকে বেছে নিয়েছিলেন। মনে রাখতে হবে যে কপিল মহাভারত রচনার বহু পূর্বের মানুষ। কারণ গীতায় কপিলমুনির উল্লেখ আছে।[১২] ঋক্‌বেদে কপিলমুনির নাম পাওয়া যায়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আচার্য শঙ্করের পরম্পরা গুরু গৌড়পাদ বাঙালী ছিলেন যিনি মাণ্ডুক্যকারিকা রচনা করেন। বেদান্ত দর্শনের অন্যতম ভাষ্যপ্রণেতা আচার্য বিজ্ঞানভিক্ষুও বাঙালী ছিলেন। বিখ্যাত বৈয়াকরণিক পাণিনি বাংলাদেশের এবং তাঁর জন্মভূমি ছিল বর্তমান বাঁকুড়া জেলার শালতোড়া গ্রামে।[১৩] পূর্বে এ সমস্ত জায়গা বৃহত্তর বর্ধমানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। 'চরণব্যূহ' গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে

ভারতবর্ষের কোন প্রদেশের বেদের কি নাম প্রচলিত ছিল।

গুপ্তযুগের তাম্রশাসনগুলি প্রমাণ করে যে, বৈদিক যজ্ঞাদি বাংলায় ব্যাপক প্রচলিত ছিল। অগ্নিহোত্রাদি এবং পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান, মন্দিরাদি নির্মাণ ও দেবদেবীর পূজার জন্য ব্রাহ্মণকে ভূমিদান তাম্রশাসনগুলি থেকে জানা যায়। নিধানপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসন থেকে রাজা ভাস্করবর্মার বৈদিক যজ্ঞাদি ক্রিয়া নির্বাহের জন্য ব্রাহ্মণকে ভূমিদানের কথা উল্লেখ আছে। বর্মরাজগণ বৈদিক ধর্মের রক্ষক ছিলেন। পালরাজাগণও বৈদিক ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছিলেন, 'তাম্রশাসন হইতে জানা যায়, মধ্যদেশ হইতে আসিয়া কোন কোন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বাংলা দেশে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহা হইতে এরূপ মনে করিবার কারণ নাই যে, বাংলাদেশে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের অভাব ছিল। কারণ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ভারতবর্ষের এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে গিয়া বাস - স্থাপন করিয়াছেন, এরূপ বহু দৃষ্টান্ত তাম্রশাসন হইতে জানা যায়। বাংলাদেশ হইতেও বহু বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের দেশান্তর গমণের কথা তাম্রশাসনে পাওয়া যায়।'[১৪] সুতরাং বাংলাদেশে উষা লগ্ন থেকেই যে, বৈদিক ধর্ম , ভাষা ও সাহিত্য চর্চার অন্যতম প্রাণকেন্দ্র স্বরূপ ছিল তা ঐতিহাসিক প্রমাণসিদ্ধ যা এদেশের ধর্মচর্চার ধারার প্রধান উৎসপ্রাণতাকে খুঁজে পেতে সাহায্য করে। মধ্যযুগেও এই সংস্কৃত চর্চার থেকে বাংলা পশ্চাৎপদ ছিল না - 'নব্যস্মৃতি' , 'নব্যন্যায়' ও 'তন্ত্র' সাহিত্যের সৃষ্টি যা প্রমাণ করে। আবার রমেশচন্দ্র মজুমদার চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলাদেশে আর্য প্রভাব বিস্তারলাভ করেছিল বলে অনুমান করেছেন।

কাটোয়ার দক্ষিণ - পূর্বে অজয় - ভাগীরথীর প্রবাহপথের ধারে দাঁইহাট শহর। এই দাঁইহাট শহরের ভাউসিংহ মৌজা পর্যন্ত অতীত সময়ে এক নগরী ছিল - নাম , 'ইন্দ্রাণী'। ইন্দ্রাণী নামটির সঙ্গে বর্ধমানের দুই কবির স্মৃতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত - একজন বাংলায় মহাভারত রচনাকার কাশীরাম দাস এবং অন্যজন চণ্ডীমঙ্গলের কবি কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। মহাভারতের টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র 'ইন্দ্রাণী'নামের উল্লেখ করেছেন - 'ইন্দ্রাণী নাম তীর্থংস্যাৎ ইন্দ্রাণী যত্র বাসবম্।/তপস্তুতা পতিংলেভে শৈব শাক্তা প্রয়াগবৎ।' - অর্থাৎ তপস্যা করে ইন্দ্রাণী যেখানে বাসবকে (ইন্দ্র) পতিরূপে লাভ করেছিলেন, সেই ইন্দ্রাণী তীর্থ প্রয়াগের ন্যায় পবিত্র। বর্তমানে লুপ্ত এই প্রাচীন জনপদ আর্যসংস্কৃতির পরিচয় দিচ্ছে। বর্ধমানের 'মঙ্গলকোট', -এর নাম বৃহদ্ধর্ম পুরাণে পাওয়া যায়। সে সময় গ্রামটি অজয় নদীর তীরে অবস্থিত উজানী - কোগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। টলেমীর মানচিত্রে একে শিবিপুরী বলা হয়েছে। বর্ধমান জেলার কালনা মহকুমার প্রধান শহর 'অম্বিকা কালনা' বৈদিক সংস্কৃতির পরিচয় বহন করছে। 'অম্বিকা' বৈদিক দেবী। শুক্ল যজুর্বেদে আছে, 'এষতে রুদ্রভাগ সহ স্বস্রাম্বিকয়া তং জুষস্ব সাহা' অর্থাৎ, হে রুদ্র তোমার এইভাগ ভগবতী অম্বিকাদেবীর সাথে সেবা কর।[১৫] আবার তৈত্তিরীয় আরণ্যকের বিখ্যাত রুদ্রসূক্ত[১৬] 'ওঁ অম্বিকাপতয়ে, উমাপতয়ে, পশুপতয়ে নমো নমঃ'। যজুর্বেদে অম্বা বা অম্বিকাকে কোথাও রুদ্রভগিনী, কোথাও বা রুদ্রপত্নী বলা হয়েছে।[১৭] অম্বা বা অম্বিকা দুর্গার অপর নাম। মার্কণ্ডেয় পুরাণে শ্রীশ্রী চণ্ডীতে মহাশক্তিকে অম্বিকা বলা হয়েছে। কুব্জিকাতন্ত্রে মহাপীঠ

বর্ণনার ক্ষেত্রে দেবী অম্বিকার অবস্থান বদরী (অর্থাৎ বদরীনাথে) এবং বর্ধমানের অম্বিকায় বলে উল্লেখ করা হয়েছে - 'বদরী চ মহাপীঠ অম্বিকা বর্ধমানকম্'। দীনেশচন্দ্র সরকার বর্ধমানের অম্বিকা কালনাকেই অম্বিকা মহাপীঠ বলে উল্লেখ করেছেন।[১৮] অম্বিকা বৈদিক দেবী হলেও অনেক ঐতিহাসিক আশ্চর্যজনকভাবে অম্বিকাকে জৈনদেবী বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন। আসলে যে কোন ভাবে বাংলায় বৈদিকধর্ম বিস্তারলাভ করেনি - এটা প্রমাণ করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। কাটোয়ার 'জামড়া' গ্রামের গ্রামদেবতা ব্রহ্মা । মাঘীপূর্ণিমায় এই গ্রামের একটি বৃক্ষতলে ব্রহ্মার পূজা হয়। কাটোয়া থানার 'বরমপুর' গ্রামের প্রাচীন নাম ছিল ব্রহ্মপুর। পূর্বস্থলীতে ব্রহ্মাণীতলা নামে একটি গ্রাম আছে। এ সকল গ্রাম - নাম আর্যসংস্কৃতির পরিচয় বহন করছে।

সংস্কৃত ভাষা চর্চার ক্ষেত্রেও বর্ধমান জেলা পশ্চাৎপদ ছিল না। যে অঞ্চলে প্রাচীনকাল থেকে বৈদিক যাগ-যজ্ঞাদির ব্যাপক প্রচলন ছিল সেখানে সংস্কৃত ভাষা চর্চার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন জাগে না। আধুনিক যুগে ইংরেজী ভাষার প্রচলন এবং ইংরেজী কাজের ভাষা হয়ে ওঠায় বর্ধমানের পূর্বগৌরব লুপ্ত হয়েছে। শুশুনিয়ার পর্বতগুহায় রাজা চন্দ্রবর্মার চক্রস্বামী বিষ্ণুকে উৎসর্গলেখ পাওয়া গেছে যা খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের। বৈশেষিক সূত্রের প্রশস্তপদ রচিত পদার্থ ধর্ম সংগ্রহ ভাষ্যের টীকা 'ন্যায় কন্দলী' রচনা করেন শ্রীধরভট্ট। এই টীকা মিথিলা ও পশ্চিম ভারতেও প্রচলিত ছিল। কাশীতে প্রকাশিত 'ন্যায়কন্দলী' পুস্তক থেকে জানা যায় যে 'অন্বয়সিদ্ধি' ও 'তত্ত্ববোধ সংগ্রহ টীকা' - নামে আরও দুইটি টীকা গ্রন্থ শ্রীধর ভট্টের ছিল। এরপর একাদশ - দ্বাদশ শতকের 'বালবলভীভুজঙ্গ' ভট্টভবদেব বিখ্যাত। রাজা হরিবর্মার 'সান্ধিবিগ্রহিক'। অমরকোষের প্রাচীন 'টীকাসর্বস্বের' রচয়িতা বন্দ্যঘটীয় সর্বানন্দ (বন্দিঘাটি গাঁইয়ের লোক, এখনকার বন্দ্যোপাধ্যায় বা ব্যানার্জী)। নব্যস্মৃতিকার জীমূতবাহন বর্ধমানের পারিগ্রামের লোক। ১৭শ শতকের পাটলিপাড় বা বর্তমানের পাটুলীগ্রামের কল্যাণমল্ল মেঘদূতের টীকা 'মালতী' রচনা করেন। 'অনঙ্গরত্ন' কল্যাণমল্লের আর একটি গ্রন্থ। ভরত মল্লিক 'রঘুবংশ', 'মেঘদূত ', 'কুমারসম্ভব', 'কিরাতার্জুনীয়', 'ভট্টিকাব্য', 'নৈষধচরিত' প্রভৃতি গ্রন্থে টীকা লেখেন যা মল্লিনাথের টীকা থেকে উন্নত। বর্ধমানের রাজার অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, শম্ভুদাস বিদ্যালঙ্কার, মধুসূদন বাচস্পতি, রুদ্রনারায়ণ বিদ্যাবাগীশ এবং রাধাকান্ত ন্যায়লঙ্কার। Sir William Jones- এর উৎসাহে 'বিবাদভঙ্গার্ণব' নামে বিশাল স্মৃতিগ্রন্থের সঙ্কলন করেন জগন্নাথ তর্ক পঞ্চানন। চিত্রসেনের সভার পণ্ডিত বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার Warren Hestings -এর অনুরোধে আরও ১০ জন পণ্ডিতের সহযোগিতায় 'বিবাদার্ণবসেতু' গ্রন্থের সংকলন করেন Halhed যার ইংরাজী অনুবাদ A Code of Gento Law।[১৯]

এই জেলার মানকরের কাছেই 'মাড়ো' গ্রামে প্রখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত রঘুনন্দন গোস্বামী বাস করতেন। তিনি ৩৫ টি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। রায়না থেকে ৪ কি.মি. দূরে শাকনাড়া গ্রামে বাস করতেন কলকাতার সংস্কৃত কলেজের অলংকার শাস্ত্রের প্রখ্যাত অধ্যাপক

প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ। তাঁর মা কুড়নী দেবী স্বামীর মৃত্যুর পর গ্রামে টোল খুলে অধ্যাপনা করতেন। নাসিগ্রামে কাশীনাথ সার্বভৌম নামে একজন সাধক ও পণ্ডিত থাকতেন। তাঁর লেখা বেশ কিছু পুঁথি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত আছে। তিনি 'চৌর পঞ্চাশিকা'র অনুবাদ করেছিলেন। বর্ধমান জেলার নবদ্বীপ খণ্ডের বিদ্যানগরে বাসুদেব সার্বভৌম এবং গঙ্গাদাস পণ্ডিত বাস করতেন। আউসগ্রামের কাছে সোমাইপুরে প্রখ্যাত মহিলা পণ্ডিত হটী বিদ্যালঙ্কার শুধু বর্ধমানের নয়, সমগ্র বাংলার গর্ব। পূর্বস্থলীর সমুদ্রগড় ন্যায়শাস্ত্র চর্চার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল এবং এই গ্রামে ন্যায়ের বিখ্যাত অধ্যাপক ছিলেন বুনো রামনাথ। উদাহরণ বিস্তারের প্রয়োজন নেই।

ইতিহাসের গতি-প্রকৃতি বড়ই বিচিত্র। অনেকটা নদীর মতো। আজ যে জনপদের বুক চিরে নদী কল্লোলিনী, প্রাক্ শতাব্দীতে সেখানে তার চিহ্নমাত্র ছিল না। হাজার বছর আগে নদী যে অঞ্চলে ছিল 'পাগলপারা' আজ সেখানে ধূসর মরুভূমি। বড় খেয়ালী নদী। খেয়ালী ইতিহাসও। সময়ের নিরন্তর প্রবাহমানতার মাঝেই জনপদগুলির চরিত্র পাল্টে পাল্টে যায়। কালের বিভিন্ন অবস্থায় নানা ধর্মসংস্কৃতি এসে জড়ো হয়ে রূপ নেয় মিশ্র সংস্কৃতির। পূর্বভারতে কোন বিশেষ ধর্ম বা সংস্কৃতির চরম উৎকর্ষতার সময়েও অপ্রধান অনেক সংস্কৃতি তাদের নিজ বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর ছিল। পূর্বভারতেই এক সময় অনার্য রাজা ছিলেন জরাসন্ধ, বার্হদ্রথ বংশের শিশুনাগ। আবার মহাপদ্মনন্দ কিংবা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য আর্যসংস্কৃতির বাইরে ছিলেন বলে অনেকে অনুমান করেন। পূর্বভারতে, বিশেষতঃ বাংলাদেশে কালের নিয়মে বৈদিক সংস্কৃতি তার উৎকর্ষতাকে সবসময় ধরে রাখতে পারেনি। বোধহয় একারণেই বৌধায়ন বঙ্গের অধিবাসীদের শূদ্র বলেছেন। পরবর্তীকালের বৈদিক ধর্মের উৎকর্ষহীনতার জন্য বঙ্গের অধিবাসীদের হলায়ুধ আচারে ভ্রষ্ট শূদ্র বলেছেন। 'শূদ্র' শব্দটি অনার্য বাচক নয়। শূদ্র আর্য ধর্মের স্বীকৃত চতুবর্ণের অন্যতম বর্ণ। ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে আছে যে, মহান পুরুষের পদতল হতে শূদ্রের উৎপত্তি। যারা আর্য ধর্ম যথাযথ মেনে চলতে পারত না তারা শূদ্র। অসংস্কার অবস্থাকেও শূদ্রত্ব বলা হয়েছে (জম্মনা জায়তে শূদ্র/সংস্কারো দ্বিজগুচ্পতে..)। সংস্কারের ফলে শূদ্র থেকে দ্বিজ হওয়া যেত। বৌধায়নের শ্রৌতসূত্রে বঙ্গ বাসীদের সম্বন্ধে শূদ্র শব্দ প্রয়োগ দেখে অনেকে এই অঞ্চলের মানুষদের অনার্য প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন। 'দস্যু' সম্বন্ধে মনুসংহিতার মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। মনু বলেছেন, "ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র - এই চার বর্ণের মধ্যে যারা ক্রিয়ালোপাদি দোষে দুষ্ট তারা সাধু বা ম্লেচ্ছভাষী হলে, তাদেরকে 'দস্যু' বলে (১০ম সর্গ, ৪৫ শ্লোক)।'[২০] ফলে 'দস্যু' শব্দটি মানসিক ভাবাপন্ন শব্দ। আর্য কোন বিশেষ জাতিগোষ্ঠী নয়। আর্য শব্দটি অর্য থেকে এসেছে। আচার্য যাস্ক নিরুক্তগ্রন্থে 'অর্য' শব্দের অর্থ করেছেন ঈশ্বর বা প্রভু। 'আর্য' হলেন 'ঈশ্বরের পুত্র'। বেদসংহিতায় 'আর্য' সম্মানবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে যারা গৃহে অগ্নি রক্ষা করতেন, যজ্ঞ করতেন অর্থাৎ বেদপ্রবর্তিত ধর্মের অনুশীলন করতেন তারা আর্য। ঋগ্বেদ বলছে, 'হে জীব তুমি আর্য, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ; দস্যু অর্থাৎ দুষ্ট স্বভাবযুক্ত চোর তস্করাদি রূপ প্রসিদ্ধ নামধারী মনুষ্যগণের যে ভেদ আছে তাহা জ্ঞাত হও। (অনুবাদ -

দয়ানন্দ - শঙ্করানন্দ)।' কিংবা ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে আছে, '......... আমি দস্যুদের আর্য নাম হতে বঞ্চিত রেখেছি।' কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় ধর্মযুদ্ধ থেকে পরাঙ্মুখতার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে 'অনার্য' বলে নিন্দা করেছেন। যদু ও তুর্বাসাদের কখনও আর্য আবার কখনও অনার্য বলা হয়েছে। 'Antiquity of Men'- এর লেখক কীথ (Keith, Page - 139) বলেছেন 'We have insufficient knowledge of what was true Aryan.' তবে সবচেয়ে চমকপ্রদ ঘোষণা বর্তমানে ইউনেস্কোর। ইউনেস্কো আর্য জাতির অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেছে এবং মানব জাতিকে এভাবে ভাগ করাকে অবৈজ্ঞানিক ও অমানবিক বলে রায় দিয়েছে।[২১]

এ সমস্ত প্রাক্‌কথনে আলোচনা করার কারণ আমাদের গবেষণার ধারা যেন সত্যাভিমুখী হয় এবং ইতিহাস যেন মনগড়া ও অনুমান নির্ভর তত্ত্বের সংগ্রহশালা না হয়ে পড়ে। বহুবছর আগেই জীববিজ্ঞানী ও নৃতত্ত্ববিদদের দ্বারা পরিত্যক্ত তত্ত্ব আজও ইতিহাস রচনার উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে চলেছে। ফলে সঠিক উপাদানের উপর দাঁড়িয়ে যে গবেষণায় আমরা ব্রতী হয়েছি তার পরিচয় দেওয়ার দায়বদ্ধতা থেকেই যায়। আর এসব ক্ষেত্রে একটু ধৈর্যশীলতা আশা করা অন্যায় হতে পারে না।

বর্ধমান জেলার ধর্মীয় ধারার বর্ণনার ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন দেবদেবী ও ধর্মীয় সম্প্রদায় সম্বন্ধে কিছু পরিচয় দিয়েছি। এর কারণ বর্ধমান জেলায় ধর্মীয় ধারার মূল উৎস জানতে হলে এই সকল দেবদেবীর ও ধর্মীয় সম্প্রদায় সম্বন্ধে পরিচয় থাকা আবশ্যক - এতে মূল স্রোতধারাটি খুঁজে পেতে কষ্ট হবে না। শিব সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যে অহেতুক সন্দেহ ও বিতর্ক তুলেছেন আমরা তার নিরসনের জন্য প্রথমে দেখাতে চেয়েছি যে রুদ্র ও শিব একই দেবতা এবং ভারতবর্ষে শিবলিঙ্গ পুজো বৈদিক ধর্মেরই ফল। শিব ও মাতৃকাদেবী সম্বন্ধে তাঁদের সন্দেহ নিরর্থক - আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র তাই প্রমাণ দিচ্ছে। এই সমস্যার সমাধানে ব্রতী না হলে আমরা প্রথাগত অসত্য ধারণার বশবর্তী হতে বাধ্য হব এবং বর্ধমানের ধর্মীয় ধারার প্রকৃত পরিচয়টিও অবজ্ঞাত থাকবে। কোন অনুমান নির্ভর প্রমাণে বিশ্বাসী না হয়ে প্রাচীন শাস্ত্র সমূহের প্রমাণের ভিত্তিতে (যা Cultural Anthropology-র অন্তর্ভুক্ত) আমরা বর্ধমান জেলার আধ্যাত্মিক ধারার রূপরেখা অঙ্কনে সাহসী হয়েছি। গৌড়ীয় চৈতন্য সম্প্রদায় সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে তাঁরা গবেষকদের প্রচারিত মধ্ব সম্প্রদায় কিনা - সে সমস্যার আগে সমাধানে ব্রতী হয়েছি। বর্ধমানে বিভিন্ন ধর্মের নানা সম্প্রদায়ের উৎস মুখটিকে খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে। বৈদিক দেবতার পরিচয়ের ক্ষেত্রে রুদ্র বা শিব সম্বন্ধে বিস্তৃত বর্ণনা দিতে হয়েছে। অনেকের মনে হতে পারে বর্ধমান জেলার আধ্যাত্মিকতার বর্ণনার ক্ষেত্রে রুদ্র সম্বন্ধে তত্ত্বমূলক আলোচনা নিরর্থক। কিন্তু রুদ্র বা শিব সম্বন্ধে পণ্ডিতদের নানা ভ্রান্ত ধারণা প্রথমে যুক্তি ও তথ্য দিয়ে ভুল প্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছে, তা না হলে রুদ্র পূজা বা শিবলিঙ্গ পূজার ক্ষেত্রে স্বচ্ছ ধারণা গড়ে উঠবে না এবং বর্ধমানে গণদেবতা শিবের পূজার মূল উৎসটিও অবজ্ঞাত থাকবে।

বৈদিক ধর্ম

বেদ ঃ সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভিত্তিভূমি বেদ। বেদ - আর্যমনীষার এক অত্যুজ্জ্বল উদাহরণ। যে সময় পৃথিবীর অনেক জায়গায় সভ্যতার অঙ্কুরোদগম হয়নি, সেই সুদূর অতীতেই সাম গীতের ওঙ্কারধ্বনি ভারতের ধর্ম ও জীবনকে এক দৃঢ় স্তম্ভের ওপর স্থাপিত করেছিল। ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূল উৎস বেদ। বেদই ভারতের মর্মবাণী। কোনও জাতির সভ্যতা বিচার করতে হলে তার মূল উৎসের অনুসন্ধান করতে হবে।

জ্ঞানার্থক 'বিদ্' ধাতু থেকে বেদ শব্দ এসেছে। 'বেদ' শব্দের অর্থ জ্ঞান। চতুর্ব্বেদের ভাষ্যকার পূজ্যপাদ সায়নাচার্য বলেছেন, 'ইষ্টপ্রাপ্তনিষ্ট পরিহারয়োঃ অলৌকিকম্ উপায়ং যঃ গ্রন্থঃ বেদয়তি সঃ বেদঃ'[২২] - অর্থাৎ, ইষ্টপ্রাপ্তি এবং অনিষ্ট পরিহারের অলৌকিক উপায় যে গ্রন্থে আছে তা বেদ। যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন, 'প্রত্যক্ষেণানুমিত্যা বা যস্তুপায়ো ন বিদ্যতে। / এনং বিদন্তি বেদেন তস্মাৎ বেদস্য বেদতা' - অর্থাৎ, প্রত্যক্ষ বা অনুমানের দ্বারা যা জানা যায় না, বেদ তাই আমাদের জানায়, এখানেই বেদের বেদত্ব। মনু বেদকে অখিল ধর্মের মূল বলেছেন - 'বেদোঽখিল ধর্মমূলম্'।[২৩] আচার্য শঙ্করের মতে যে শব্দরাশি স্বয়ং প্রমাণ অর্থাৎ অন্য কোন প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না তাই বেদ - 'বেদ শব্দেন তু শব্দরাশি বির্বক্ষিত'। অমরকোষের মতে 'বিদ' ধাতুর করণ ও অধিকরণ কারকে 'ঘঙ' প্রত্যয় যুক্ত করে 'বেদ' শব্দ হয়। 'বিদ্ জ্ঞানে, বিদ্ সত্তায়াম্, বিদ্ লাভে, বিদ্ বিচরণে'[২৪] - অর্থাৎ 'বিদ' ধাতুর অর্থ জানা, অবস্থান করা, লাভ করা এবং বিচার করা। যে শব্দরাশি আমাদের মধ্যে যথার্থ জ্ঞানের জন্ম দেয়, যার দ্বারা প্রকৃত বিদ্বান হওয়া যায়, অনন্ত শান্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় ও যে জ্ঞানের দ্বারা সৎ - অসৎ বিচার সিদ্ধ হয় তাই বেদ। আমরা ভারতীয় সভ্যতার মর্মবাণী হিসাবে বেদকে দেখবো।

ঐতিহাসিকভাবে বেদ চারপ্রকার - ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব। মহাভারতের যুদ্ধের কিছু পূর্বে কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ বেদব্যাস বেদকে চার ভাগে ভাগ করেন। পূর্বে সকল বেদ একই সঙ্গে ছিল - 'একো বেদশ্চতুর্ধা তু যৈঃ কৃতো দ্বাপরাদিষু'।[২৫] বেদের পদ্য অংশে ঋক্, গদ্য অংশকে যজু, গান অংশকে সাম এবং অথর্ব বেদে 'ঋক্, সাম্ ও যজু - এই তিন ধরনের মন্ত্রই স্থান পায়। বৈদিক যজ্ঞে চারজন পুরোহিতের মুখ্য ভূমিকা থাকতো । হোতার জন্য ঋক্‌বেদ, অধ্বর্য্যুর জন্য যজুর্বেদ, উদলাতৃর জন্য সামবেদ ও ব্রহ্মার জন্য অথর্ববেদ। ঋষিদের মতে বেদ অপৌরুষেয়। ঋষিরা বেদমন্ত্র দর্শন করেছেন, সৃষ্টি করেননি - 'ঋষিণা দৃষ্টম্ নতু কৃতম্'। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ ভেদে প্রতিটি বেদ দু'প্রকার - 'মন্ত্র ব্রাহ্মণয়োর্বেদ নামধেয়ম্ '।[২৬] মন্ত্র ভাগকে সংহিতা বলে। যেমন - ঋগ্বেদ সংহিতা , সামবেদ সংহিতা, যজুর্বেদ সংহিতা ও অথর্ববেদ সংহিতা। বেদের মন্ত্রভাগ ছাড়া বাকী অংশকে ব্রাহ্মণ বলে। ব্রাহ্মণে বিধি (মন্ত্রপ্রয়োগের বিধান - ''অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ''), অর্থবাদ (যজ্ঞবিধি বা ক্রিয়াকাণ্ডের বিবরণ), নিন্দা (অবৈধকর্মের বারণ), প্রশংসা (বৈধকর্মের স্তুতি), পুরাকল্প (অতীতকালের

বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনী) ও পরকৃতি (অন্যের কর্ম বর্ণনা) - এই ছয়টি বিষয় থাকে। আরণ্যক জীবনে প্রয়োজনীয় ব্রাহ্মণভাগকে আরণ্যক বলে - 'অরণ্যে উক্তমিতি আরণ্যকম্'। উপনিষদ বেদের শেষভাগ যাতে বেদের গূঢ়তত্ত্ব উল্লিখিত।

পূর্বভারতে বেদের শাখা

আঞ্চলিক ভিন্নতা ও স্বরবৈচিত্র্যের পার্থক্যে প্রতিটি বেদের নানা শাখা। পূর্বভারত তথা বাংলায় ঋক্‌বেদের[4] আশ্বলায়নী শাখা, শুক্ল যজুর্বেদের মাধ্যন্দিনী ও কাণ্বশাখা, কৃষ্ণযজুর্বেদের কাঠক শাখা, সামবেদের কৌথুমীশাখা এবং অথর্ববেদের সৌনক শাখা প্রচলিত। যাজ্ঞবল্ক্য বঙ্গদেশে সহ পূর্বভারতে যজুর্বেদের মাধ্যন্দিনী ও কাণ্বশাখা প্রচার করেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও এ মত সমর্থন করেন। বর্ধমান জেলার অধিকাংশ হিন্দুদের বিবাহাদি দশবিধ সংস্কার আজও শুক্লযজুর্বেদের বিধি অনুযায়ী হয়। বর্ধমান জেলার বৃহত্তর আগুরী সম্প্রদায়ের সমস্ত ধর্মীয় ক্রিয়াকর্ম শুক্লযজুর্বেদের বিধি অনুযায়ী সংগঠিত হয়। তবে দেশাচার, মেয়েলী আচারও যুক্ত হয়েছে - বিশেষতঃ বিবাহে। বর্ধমান জেলায় দশবিধ সংস্কারের ক্ষেত্রে শুক্ল যজুর্বেদ ছাড়া সামবেদ ব্যাপক প্রচলিত। ঘোষাল প্রভৃতি পদবীধারীদের ক্ষেত্রে ঋক্‌বেদ্ অনুসরণ করা হয়।

ঋক্‌বেদের মূল ব্রাহ্মণের নাম ঐতরেয়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের শেষ অধ্যায়ে বিদেঘ (বিদেহ - বৈদেহ) স্থানের নাম আছে যা পূর্বভারতের মধ্যে উত্তর বিহারের অংশ। শুক্ল যজুর্বেদের শতপথ ব্রাহ্মণের যুগে বিদেহ বেদের কর্ম ও জ্ঞানকাণ্ডে আধিপত্য লাভ করেছিল। এই বেদের বৃহদারণ্যক উপনিষদের আখ্যানগুলি পূর্বভারত সম্পর্কিত বলে ডঃ সুকুমার সেন অনুমাণ করেছেন। সামবেদের তাণ্ড্য ব্রাহ্মণ প্রৌঢ় ব্রাহ্মণে পূর্বভারতের রাজা নমীসাপ্যর উল্লেখ পাওয়া যায়।

বর্ধমান জেলায় বৈদিক যজ্ঞ ও বিভিন্ন সংস্কার

বৈদিক যজ্ঞপ্রণালী ও ব্রাহ্মণভাগ পরবর্তীকালে এত জটিল ও বিস্তীর্ণ হয়ে পড়ে যে তার সংক্ষিপ্তসার করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এজন্য রচিত হ'ল কল্পসূত্র। কল্পসূত্র তিনখণ্ডে বিভক্ত - *শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র ও ধর্মসূত্র। শ্রৌতসূত্রে ব্রাহ্মণভাগের যজ্ঞপ্রণালীর সারমর্ম।* গৃহীর জীবনে অবশ্য কর্তব্য যজ্ঞপ্রণালী নিবদ্ধ হল গৃহ্যসূত্রে এবং সামাজিক, রাজনৈতিক, ব্যবহারিক, বর্ণাশ্রমের রীতিনীতি নিবদ্ধ হল ধর্মসূত্রে। বেদের কর্মকাণ্ডের প্রভাব হ্রাসের ফলে বঙ্গদেশসহ সমগ্র ভারতেই সাধারণভাবে শ্রৌতযজ্ঞ উঠে গেছে। গৃহ্যসূত্রের প্রধানযজ্ঞ 'পাকযজ্ঞ'। সাতটি পাকযজ্ঞের মধ্যে পিতৃশ্রাদ্ধ অদ্যাপি বঙ্গদেশে প্রচলিত। গুটিকয়েক বেদনিষ্ঠজনরা পার্বণশ্রাদ্ধাদিও করেন। এছাড়া রাঢ়বাংলা সহ সমগ্র বঙ্গদেশে নৈষ্ঠিক গৃহস্থ ব্রাহ্মণেরা পাঁচটি মহাযজ্ঞের (ব্রহ্মযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ ও মনুষ্যযজ্ঞ) অনুষ্ঠান করেন। গৌতমসূত্রে যে ১৫ টি সংস্কারের কথা বলা আছে তারমধ্যে রাঢ়বাংলা সহ বঙ্গদেশে 'সীমন্তোন্নয়নব্রত' অপ্রচলিত হয়েছে। বাংলাতে জাতকর্ম,

নামকরণ ও অন্নপ্রাশন একইসঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। মহানাম্নীব্রত ,মহাব্রত, উপনিষদব্রত ও গোদানব্রত -এই চারটি বেদাধ্যয়ন কালের ব্রত। সমাবর্তন হল পাঠসমাপনান্তে স্নানবিশেষ। এ সমস্ত বর্ধমান জেলাতেও অদ্যাপি ব্রাহ্মণের উপনয়ণকালে অতিসংক্ষেপে অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া কাত্যায়ণগৃহ্যসূত্রে ও গোভিলগৃহ্যসূত্রে 'নিষ্ক্রামণ' বলে একটি সংস্কার আছে, তাও বর্ধমান জেলা সহ বঙ্গদেশে অন্নপ্রাশনের সময় অনুষ্ঠিত হয়।

মনুসংহিতার প্রখ্যাত টীকাকার কুল্লকভট্ট বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন।[২৯] বর্তমানে পূর্ববঙ্গের রাজসাহী জেলার নন্দনবাসী গ্রাম ছিল তাঁর জন্মভূমি। মনুসংহিতার পর সারাদেশে যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা প্রচলিত ছিল। কেবলমাত্র বর্ধমান সহ সমগ্র বঙ্গদেশে দায়াধিকারে জীমূতবাহনের মত প্রবল হয়েছিল। সারাদেশে যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার উপর বিজ্ঞানেশ্বরের মিতাক্ষরা টীকার প্রচলন থাকলেও কেবলমাত্র সমগ্র বঙ্গদেশে জীমূতবাহনের দায়ভাগ অধিক প্রাধান্য লাভ করে। জীমূতবাহন বর্ধমান জেলার লোক।[৩০] বর্ধমান জেলার অজয় নদের তীরবর্তী পারিগ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। জীমূতবাহনের মূল গ্রন্থের নাম 'ধর্মরত্নগ্রন্থ'। জীমূতবাহনের কাল নিয়ে বিবাদ থাকলেও বলা যেতে পারে যে তিনি শ্রীকরের পরবর্তী এবং শূলপাণি ও রঘুনন্দনের পূর্ববর্তী। ফলে বর্ধমানসহ সমগ্র বাংলার ধর্ম ও জীবন প্রাচীনযুগ থেকে কোন্ মূল ধারায় পরিচালিত তা সহজেই বোঝা যায়।

বেদের দেবতা ঃ এক চৈতন্যসত্তার বিভিন্ন প্রকাশ

বৈদিক ঋষিরা সমস্ত কিছুর মধ্যে চৈতন্যসত্তার উপস্থিতি উপলব্ধি করেছেন। সেজন্য যেকোন প্রাকৃতিক বস্তুরই একজন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বা চৈতন্যসত্তা আছে। যাস্কাচার্য দেবতাদের লোকভেদে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন - পৃথিবীলোকের (ভূঃ) দেবতা, অন্তরীক্ষলোকের (ভুবঃ) দেবতা এবং দ্যুলোকের (স্বঃ) দেবতা - তিস্র এব দেবতা ইতি নৈরুক্তাঃ' (৭/১) অগ্নি, অপ্ (জল), সোম প্রভৃতি পৃথিবীলোকের দেবতা, ইন্দ্র, বায়ু, রুদ্র, মরুৎ, পর্জন্য ইত্যাদি অন্তরীক্ষলোকের অধিষ্ঠাতা এবং সূর্য, বরুণ, উষা,রাত্রি প্রভৃতি দ্যুস্থান বা দ্যুলোকের দেবতা। বেদে দেবতার সংখ্যা তেত্রিশ (৩৩) উল্লিখিত আছে - 'যে স্থ ত্রয়শ্চ ত্রিংশচ্চ' (ঋক্‌বেদ ৮/৩০/২) - ভূলোকের এগারো (১১) , ভুবঃলোকের এগারো এবং স্বঃলোকের এগারো (১১)। আবার ঋক্‌বেদের ৩/৯/৯ এবং ১০/৫২/৬ ঋক্‌সমূহে দেবতার সংখ্যা তিন হাজার তিনশত উনচল্লিশ (৩৩৩৯) উক্ত আছে। আসলে এ সমস্ত রহস্য করে ঋষিরা বলেছেন - ঋষিরা পরোক্ষবাচী - 'পরোক্ষপ্রিয়ম্'। মূল দেবতা এক। সেই এক চৈতন্যসত্তা ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে বহুভাবে প্রকাশিত - 'দেবতায়া এক আত্মা বহুধা স্তুয়তে' (নিঃ ৭/৪) । এক বহু হয়েছেন, বহুর মধ্যে এক আছেন - এই চমকপ্রদ মনীষা বৈদিক ঋষিদের দান।

> ইন্দ্রং মিত্রং বরুণামগ্নিমাহু - রথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্।
> একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতারিশ্বানমাহুঃ।।
>
> (ঋক্‌বেদ ১।১৬৪।৪৬)

অর্থাৎ , - এক আদিত্যকে ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ ও অগ্নি বলা হয়, ইনি দিব্য পক্ষাবিশিষ্ট ও সুন্দরগমণশীল। ইনি এক হলেও পণ্ডিতেরা বহু বলেছেন - ইনিই অগ্নি, ইনিই যম এবং ইনিই মাতরিশ্বা (বায়ু)।

এক এবাগ্নির্বহুধা সমিদ্ধ একঃ সূর্যো বিশ্বমনু প্রভূতঃ।
একৈবোষাঃ সর্বমিদং বিভাত্যেকং বা ইদং বি বভূব সর্বম্।।
(ঋক্‌বেদ ৮।৫৮।২)

অর্থাৎ, এক অগ্নি বহুভাবে সমিদ্ধ হয়েছেন, একই সূর্য বিশ্বে প্রকাশিত, একই উষা এই সমস্ত হয়েছেন এবং তিনিই সমস্ত কিছু হয়েছেন ।

ঋক্‌বেদের দশম মণ্ডলে আছে যে, পক্ষী একইপ্রকার কিন্তু বিদ্বানগরের কল্পনায় তিনি বহু হয়েছেন (ঋক্ ১০।১১৪।৫)।

বেদের কোন সূক্তে কোন দেবতা প্রাধান্য পেলেও অন্য দেবতা হীন হয় না - সব দেবতাকেই এক মহান দেবের বিভূতিস্বরূপ দেখা হয়েছে।

বেদে ঋষিরা জগতের তুচ্ছাতিতুচ্ছ পদার্থ থেকে মহৎ পর্যন্ত সমস্ত কিছুই একই চৈতন্য সত্তার প্রকাশরূপে দেখেছেন কিন্তু অধিকার ভেদে চেতনার উত্তোরণকে নির্দেশ করেছেন। সেজন্য ভিন্নরুচি ও যোগ্যতা অনুযায়ী পরবর্তীকালের মানুষেরা নিজের মতো করে বেদ-কে পেয়েছেন। জ্ঞানী জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়েছেন, কর্ম্মী দেখিয়েছেন কর্মের এবং ভক্ত ভক্তির প্রাধান্য উপলব্ধি করেছেন ।বেদে যেকোন শ্রেণীর উপাসনার ধারা নিহীত। আমরা বর্ধমান জেলায় যে সমস্ত ধর্মীয় ধারাগুলির বর্ণনা করব তাদের প্রত্যেকের সার অংশ বেদে নিহিত - আজ পর্যন্ত এমন কোন ধর্মীয় ধারা দেখা যায় নি যার মূল উপাদান বেদে নেই। তাই মনু যথার্থ বলেছেন, 'বেদোহখিল ধর্মমূলম্' - বেদ অখিল ধর্মের মূল। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, 'মানুষের পক্ষে পরমপদ ও মুক্তিলাভের জন্য যাহা কিছু আবশ্যক তাহা বেদেই বিদ্যমান। কেহ নূতন আর কিছু উদ্ভাবন করিতে পারে না।'

দ্বাদশ মাস নিয়ে বৎসর গণনা ও মলমাস নির্ণয় বেদের দান। 'বেদ মাসো ধৃতব্রতো দ্বাদশ প্রজায়তে। / বেদা য উপযায়তে' (ঋক্‌বেদ ১।২৫।৭ - ৮) - অর্থাৎ ; যিনি (বরুণ) ধৃতব্রত হয়ে ফলোৎপাদী দ্বাদশ মাসকে জানেন এবং আগন্তুক মাসকে জানেন।' বাংলায় এই আগন্তুক মাসে বা মলমাসে বিবাহাদি অনুষ্ঠান হয় না।

বেদের দেবতা ইন্দ্র ঃ সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও বর্ধমানে বিভিন্ন নিদর্শন

ঋগ্বেদে সবচেয়ে বেশী স্তোত্র আছে ইন্দ্র সম্বন্ধে। ঋগ্বেদে ২৫০ টি সম্পূর্ণ সূক্তে ইন্দ্রকে স্তব করা হয়েছে। 'যো অপাংনেতা স জনাস ইন্দ্রঃ (২।১২।৭)' - অর্থাৎ , যিনি জল দান করেন তিনি ইন্দ্র। 'যো অশ্বনোরং তরগ্নিং জজান ন জনাস ইন্দ্রঃ (২।১২।৩)' - যিনি মেঘের মধ্যে বজ্ররূপ অগ্নি উৎপাদন করেন তিনি ইন্দ্র। ঋগ্বেদে ইন্দ্রের প্রসিদ্ধ কীর্তি বৃত্র বধ। কে বৃত্র ?

যাস্কাচার্য বলেছেন, 'মেঘ ইতি নৈরুক্তা' অর্থাৎ মেঘ হল বৃত্র। মেঘের মধ্যে বিদ্যুতের ঝলকানিতে জল উৎপন্ন হয়। রূপক ছলে প্রকৃতির এই ক্রীড়াকে ইন্দ্র ও বৃত্রের যুদ্ধ বলা হয়েছে। ঋগ্বেদে ইন্দ্রপত্নী ইন্দ্রাণী ও মেনা। ইন্দ্রাণীর জন্মস্থান হিসাবে বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার দাঁইহাট শহরের ভাউসিং মৌজা পর্যন্ত অংশকে মনে করা হয়। বর্তমানে এই জনপদ লুপ্ত। অতীতের ইন্দ্রাণী নগরীর কথা মহাভারতের টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র উল্লেখ করেছেন। বরাকরের নদীখাত থেকে অনেকগুলি কষ্টিপাথরের মূর্তি পাওয়া গেছে তারমধ্যে রাজছত্রধারী এবং হস্তিবাহনে ইন্দ্রের মূর্তি আছে। বর্ধমানের কুড়মুনে হস্তি পৃষ্ঠে ইন্দ্রানী দেবীর মূর্তি আছে।

অগ্নি

ইন্দ্রের পরই বেশী স্তুতি দেখা যায় অগ্নি সম্বন্ধে। অগ্নি পুরোহিত, তিনি দেবগণের হব্যবাহক। প্রায় ২০০ সূক্তে অগ্নির স্তুতি আছে। অগ্নির ত্রিমূর্তি ভূঃলোকে অগ্নি, ভুবঃলোকে বিদ্যুৎ এবং স্বঃলোকে জ্যোতি। অগ্নি বিশ্বময়। ঋগ্বেদে বলা হয়েছে যে, অগ্নি দাম্পত্য সম্বন্ধ সুশৃঙ্খল করেন - 'সং জাম্পত্যং সুষমমা কৃণুষ্ব' (৫।২৮।৩); সেজন্য আজও হিন্দুর বিবাহে অগ্নি প্রজ্জ্বালন করে যজ্ঞে নব দম্পতি আহুতি প্রদান করে। অগ্নি রূপেও আছেন আবার অরূপেও আছেন অর্থাৎ যেকোন বস্তুর প্রকাশময় রূপ অগ্নি আবার জাতবস্তুর মধ্যে তিনি সূক্ষ্মভাবে আছেন তাই তিনি 'জাতবেদা'। বর্ধমান জেলার বরাকরের নদীখাতে ছাগবাহনে অগ্নির কষ্টিপাথরের মূর্তি পাওয়া গেছে।

বরুণ

বরুণ কেবল জলদেবতা নন, নৈতিক দেবতাও। জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতি তিনি জানেন। অন্তরীক্ষে পক্ষীদের গতিও তাঁর জানা। দ্বাদশ মাস ও মলমাসকেও বরুণ জানেন। বর্ধমান জেলার বরাকরের নদীখাতে মকরবাহনে বরুণ, অশ্ববাহিত রথের সূর্য বা আদিত্যের মূর্তি পাওয়া গেছে।

সূর্য

বেদে সূর্য বিভিন্নভাবে স্তুত হয়েছেন। সূর্যকে আদিদেব - 'আদিত্য 'বলা হয়েছে। সূর্যকে পুষা, ইলস্পতি পুরুবসু বলা হয়েছে। সূর্যের যে শক্তি মানব হৃদয়ে প্রজ্ঞার উন্মেষ ঘটায় তা সবিতা। এই সবিতাকেই গায়ত্রী বলা হয়েছে। এই গায়ত্রীর শ্রেষ্ঠত্বকে হিন্দুদের তন্ত্রসহ সকল ধর্মীয় ধারা একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছে। বর্ধমান জেলার তথাকথিত অনেক লোকধর্মই আসলে সূর্য বা আদিত্য উপাসনা। বর্ধমান সহ রাঢ়বঙ্গের সবচেয়ে প্রধান দেবতা ধর্ম বা ধর্মরাজ। এই ধর্মরাজের পুজা প্রকৃতপক্ষে সূর্যপূজা। ঋগ্বেদে সূর্যের কুষ্ঠরোগ নিরাময়ের কথা উল্লেখ আছে; রাঢ় বাংলার ধর্মরাজ বা ধর্মঠাকুরও কুষ্ঠরোগনিরাময়কারী দেবতা। সূর্যের সপ্তরশ্মিকে সপ্ত অশ্বের সঙ্গে কল্পনা করা হয়েছে। ধর্মঠাকুরের থানেও মাটির ঘোড়া দেওয়া হয়। গ্রাম্যলোকেরা বিশ্বাস করেন যে, ধর্মঠাকুর ঘোড়ায় চেপে আকাশে ঘুরে

বেড়ান। 'ইতু' পূজাও সূর্য বা আদিত্য উপাসনা। ইতু শব্দটি সংস্কৃত শব্দ আদিত্য থেকে এসেছে। বর্ধমান জেলার অনেক গ্রামে 'মাঘমণ্ডল' নামে আরও একটি সূর্যপূজা প্রচলিত যা কুমারী মেয়েরা করে থাকেন। রাল-দুর্গা সূর্যের পূজা বা ব্রত। সংস্কৃত 'রাতুল' থেকে রাল শব্দটি এসেছে। রাতুল বা রাল উভয়েরই অর্থ রক্তাভ বা রক্তুল্য। উদীয়মান সূর্যকে জবা কুসুমের মত হিন্দু শাস্ত্রে বর্ণনা করেছে। উদাহরণ বৃদ্ধি নিষ্প্রয়োজন।

বিষ্ণু

ইনি বেদে বিভিন্নভাবে স্তুত হয়েছেন। বেদে বিষ্ণুকে ইন্দ্র ও সূর্যের সঙ্গে একভাবে দেখা হয়েছে। বিষ্ণু ও ইন্দ্র উভয়েই দ্যাবা পৃথিবী ধারণ করেন - 'ব্যস্তভ্না রোদসী' (ঋক্‌বেদ ১০/৯৯/৩) এবং 'য উ বজ্রধাতু পৃথিবীমুত দ্যামেকো দাধার ভুবনানি বিশ্বা' (ঋক্ ১/১৫৪/৪) অর্থাৎ, যিনি একই সঙ্গে বজ্রধাতু, পৃথিবী, দ্যুলোক ও সমস্ত ভুবন ধারন করে আছেন'। ইন্দ্র ও বিষ্ণু উভয়েই মেঘের উপর পরিভ্রমণ করেন - 'যা সানুনি পর্বতানামদাভ্যাম্' (ঋক্‌বেদ ১/১৫৫/১)। সূর্যের সঙ্গে বিষ্ণুর একত্র অধিক স্পষ্টভাবে উচ্চারিত। সূর্য ও বিষ্ণু প্রকৃতপক্ষে একই চৈতন্যসত্তা। দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে বিষ্ণু একজন। ইন্দ্র ও সূর্যের মত তিনিও অদিতির পুত্র। আচার্য যাস্ক বিষ্ণু শব্দের অর্থ করেছেন - 'অথ যদ্বিষিতো ভবতি তদ্বিষ্ণু ভবতি, বিষ্ণু বির্শতের্বা ব্যশ্নোতের্বা' অর্থাৎ, অতঃপর যখন আদিত্য রশ্মিসকল সারাদিকে প্রকাশ করে তখন তিনি বিষ্ণু। 'বিশ্' ধাতু থেকে অথবা বি +অশ্ ধাতু থেকে বিষ্ণু শব্দ এসেছে। বিষ্ণু ত্রিপদে জগৎ ব্যাপ্ত করে আছেন। 'ইদং বিষ্ণু বির্চক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং' (ঋক্‌বেদ ১/২২/১৬-২১) - এই ঋকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শাকপূণি, আচার্য ঔর্ণবাভ এবং আচার্য যাস্ক সকলেই আদিত্যের বিষ্ণুর একত্র প্রতিপাদন করেছেন। 'বিষ্ণু' শব্দের অর্থ যিনি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত 'ব্যাপকত্বাৎ বিষ্ণুঃ'। বেদের পরবর্তী সময় থেকে আজ পর্যন্ত সর্ব অধিপতি হিসাবে বিষ্ণুর পূজা হয়। পূজার প্রারম্ভে 'আচমন' বিষ্ণু স্মরণ দিয়ে শুরু হয়। ম্যাক্সমুলারও আদিত্য ও বিষ্ণুর সমত্ব মেনে নিয়ে বলেছেন, 'The stepping of Visnu is emblamatic of the rising; the culminating and setting of the sun.' জ্ঞানীগণ বিষ্ণুর পরমপদ দর্শন করেন (তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যান্তি সূরয়ঃ / দিবীর চক্ষুরাততম্ - ঋক্‌বেদ ১/১৫৪/৪-৫) কারণ ঐ পদে মধুর (পরম অমৃত) উৎসস্থল - 'বিষ্ণোঃ পদে পরমে মধ্ব উৎসঃ''। সমস্ত অবতারকে বিষ্ণুর অবতার বলা হয়। যেমনভাবে বেদে আদিত্য ও বিষ্ণুকে একভাবে দেখা হয়েছে ঠিক সেই ভাবে বর্ধমান জেলাতেও ধর্মঠাকুর আদিত্য ও বিষ্ণুরূপে পূজা পাচ্ছেন। প্রখ্যাত লোকসংস্কৃতির গবেষক আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন '..... এই দেবতাকে বর্তমান সময়ে প্রায়ই বিষ্ণু, কূর্ম, বরুণ, যম, শিব ও সূর্যের সঙ্গে মিশিয়ে একাকার করে দেওয়া হয়'। যে প্রস্তরখণ্ডে ধর্ম ঠাকুরকে পূজা করা হয় তাকে বিষ্ণুর কূর্ম অবতার রূপে ব্যাখ্যা করা হয়। বরাকর নদীখাতে গরুর বাহনে বিষ্ণুর অবতার মুর্তি আরও অনেক বৈদিক দেবতার মুর্তির সঙ্গে পাওয়া গেছে। বোড়োয় 'বলরাম' লোকেশ্বর কিছু রূপে পরিচিত।

রুদ্র বা শিব

রুদ্র বা শিব বৈদিক দেবতা। পূজ্যপাদ যাস্কাচার্য 'রুদ্র' শব্দের অর্থ করেছেন, 'রুদ্র রৌতীতি সতঃ'; অর্থাৎ - যিনি সর্বদা গর্জন করেন তিনি রুদ্র। বাজসনেয় সংহিতা বা শুক্ল যজুর্বেদে রুদ্রকে 'উচৈচ্চঃ ঘোষ' (১৬/১৯) বা উচ্চশব্দকারী বলা হয়েছে। একই সংহিতায় রুদ্র সম্বন্ধে 'শ্রব'(শব্দ) ও 'প্রতিশ্রব'(প্রতিশব্দ) বলা হয়েছে (১৬/৩৪)। প্রকৃতপক্ষে রুদ্র হলেন মহানাদ বা পরানাদ যা ব্রহ্মবাচক প্রতিশব্দ। সায়নাচার্য 'রুদ্র' শব্দের নানাবিধ অর্থ করেছেন, মৃত্যুর সময় যিনি সবাইকে ক্রন্দন করান তিনি রুদ্র (' রোদয়তি সর্বঅন্তকালে ইতি রুদ্রঃ,'[৩২] - ঋক্‌বেদ ভাষ্য ১/৪৩/১), যিনি সংসারে দুঃখ দ্রবীভূত করে তাকে দূর করেন বা নাশ করেন তিনি রুদ্র (রুৎ সংসারাখ্যং দুঃখং তৎ দ্রাবয়িত অপগময়তি বিনাশয়তি ইতি রুদ্র - ঋ .ভা. ১/১১৪/১), রুৎ অর্থে শব্দাত্মিকা বাণী ও তৎ প্রতিপাদ্য আত্মবিদ্যা যা তিনি উপাসকদের দান করেন বলে রুদ্র ('রুৎ শব্দাত্মিকা বাণী তৎপ্রতিপাদ্যা আত্মবিদ্যা বা তামুপাসকেভ্যো রাতি দদাতি ইতি রুদ্রঃ।'- ঋ .ভা. ১।১১৪।১)। আবার সায়নাচার্য 'রুৎ' অর্থে অন্ধকার বলেছেন এবং রুদ্র তিনি যিনি ওই অন্ধকার দূর করেন (রুণদ্ধি আবৃণোতি ইতি অন্ধকারাদি তৎ দৃণাতি বিদারয়তি ইতি রুদ্রঃ – ঋ. ভা. ১/১১৪/১) যজুর্বেদের প্রখ্যাত ভাষ্যকার মহীধরের মতে রুৎ অর্থ জ্ঞান এবং যিনি জ্ঞান দান করেন তিনি রুদ্র অথবা পাপ কর্মকারী মানুষদের দুঃখ দিয়ে যিনি কাঁদান তিনি রুদ্র (রবণং রৎ জ্ঞানং রাতি দদাতি রুদ্রঃ। অথবা পাপিনো নরান্ দুঃখভোগেন রোদয়তি রুদ্রঃ। - বাজসনেয়ী সংহিতা ভাষ্য ১৬।১)। বেদে বিভিন্ন মন্ত্রে রুদ্রকে ধ্বংসের , প্রলয়ের দেবতা বলা হয়েছে। রুদ্র শুধু ভয়ংকর নন, কল্যাণকরও । রুদ্র 'মীলহু '[৩৩] অর্থাৎ অভিষ্টপূরণকারী। রোগ ব্যাধি নিরাময়ের ঔষধি রুদ্রের দান সেজন্য রুদ্র ভিষকশ্রেষ্ঠ।[৩৪] রুদ্র সাধকদের সম্পদ, গৃহ, খাদ্য, আয়ু, বল ও সন্তানাদি দান করেন, উপাসকদের শত্রুদের তিনি নাশ করেন।[৩৫] রুদ্রের এই কল্যাণময় রূপের জন্য তাঁকে শিব ও শিবতর বলা হয়েছে। 'শিব' শব্দের অর্থ যিনি মঙ্গ লময় বা কল্যাণময়। ঋক্‌বেদে কল্যাণময় রূপের জন্য অগ্নিকেও শিব বলা হয়েছে। তাছাড়া বেদে রুদ্রের সঙ্গে অগ্নি, মরুৎ, আদিত্য (সূর্য), ইন্দ্রের একত্ব প্রতিপাদন করা হয়েছে। যিনি রুদ্র তিনিই শিব। যখন প্রলয় করেন তখন রুদ্র আবার যখন আনন্দপ্রদ মঙ্গলকর তখন তিনি শিব।

'যা তে রুদ্র শিবা তনূরঘোরাপাপকাশিনী
তয়ানস্তন্ব শন্তময়া গিরিশন্তাভিচাকশীহি।।'[৩৬]

অর্থাৎ , হে রুদ্র তোমার যে শরীর মঙ্গলকর (শিবা),সৌম্য (অঘোর), পুণ্যকর সেই শান্তকর শরীর নিয়ে গিরিশন্ত আমাদের দর্শন কর।

ঋক্‌বেদে রুদ্র সম্পর্কে 'শিব' বিশেষণ না দেখে অনেকে শিবকে অনার্য দেবতা বলেছেন। তাঁদের মতে অনার্য শিব আর্য রুদ্রের সঙ্গে একীভূত হয়েছে। এধরনের মন্তব্যের কোন সত্যতা নেই। প্রথমতঃ বেদ সর্বপ্রথমে এক ছিল, দ্বাপরযুগে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মন্ত্রের প্রকৃতি অনুযায়ী বেদকে চারভাগে ভাগ করেন। বেদ বিভাগ করেছিলেন বলে তিনি বেদব্যাস, ব্যাস

অর্থ বিভাজন কর্তা। ঋক্ বা পদ্য আকারে বেদমন্ত্রগুলি একইজায়গায় সন্নিবিষ্ট হয়ে 'ঋক্‌বেদ', গদ্য বেদমন্ত্রগুলি যজুর্বেদ (যজু = গদ্য) এবং সঙ্গীতাকারে যে বেদমন্ত্র যজ্ঞে ব্যবহৃত হত তা সাম। অথর্ববেদে সবধরনের মন্ত্রের সন্নিবেশ হয়। ঋক্‌বেদে রুদ্র সম্পর্কে 'শিব' নাম দেখতে পাননি আমাদের অনেক প্রখ্যাত গবেষক। অথচ ঋগ্বেদে একজায়গায় রুদ্রকে 'শিব' বলা হয়েছে - 'যেভিঃ শিবঃ স বাঁ এবয়াবভির্দিবঃ সিষাক্ত স্বযশা নিকামাভিঃ'; অর্থাৎ 'উৎসাহী অশ্বারোহী মরুদ্‌গণের সহায়তায় শিব (রুদ্র) আকাশ থেকে জল সেচন করেন' (ঋগ্বেদ ১০।৯২।২)। যজুর্বেদ ও অথর্ববেদে রুদ্র সম্পর্কে বহুবার শিব নাম আছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও সেই মতের পৃষ্ঠপোষক কিছু ভারতীয় পণ্ডিতেরা যজুর্বেদাদিকে ঋক্‌বেদের পরবর্তীকালের বলে রায় দিয়েছেন এবং যজুর্বেদের শিব নামকে অনার্য প্রভাব বলে ব্যাখ্যা করেছেন। ভাবতেও অবাক লাগে কিভাবে ভারতীয় ইতিহাস অপব্যাখ্যার শিকার হয়েছে। বহু প্রাচীনকাল থেকেই বৈদিক যজ্ঞে পদ্যকার মন্ত্র ঋক্, গদ্যকার মন্ত্র যজু এবং সঙ্গীতাকারে সামবেদ গাওয়া হতো। যজ্ঞের প্রধান ঋত্বিক ব্রহ্মার অধিকারে অথর্ববেদ থাকতো। ঋক্‌বেদে রুদ্র সম্পর্কে একাধিকবার শিব বিশেষণ না থাকলেও তার প্রতিশব্দ বহু আছে। দীনেশচন্দ্র সেন (দ্রষ্টব্য ঃ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য - ৮ ম সং - পৃ ৩৪৭), সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, অতুল সুরের মতো গবেষকরা শিব সম্বন্ধে কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন।

শিবলিঙ্গ পূজা

শিব লিঙ্গ পূজাকে বহু গবেষক অনার্য সংস্কৃতির দান বলেন। তাঁরা বেদে 'শিশ্নদেবা' শব্দটির অর্থ করেছেন লিঙ্গপূজক। বেদে 'শিশ্নদেবা'দের নিন্দা করা হয়েছে ফলে আর্যরা অনার্য শিবকে নিন্দে করেছেন বলে তাঁরা মনে করেন। তাঁদের গবেষণা যথেষ্ট কৌতুককর। শিশ্ন ও লিঙ্গ এক অর্থবাচক শব্দ নয়। লিঙ্গ অর্থ প্রতীক বা চিহ্ন পুরুষ যৌনাঙ্গ নয়। পাশুপত সূত্রে আছে 'লিঙ্গধারী' (১/৬)। প্রখ্যাত ভাষ্যকার কৌণ্ডিণ্য লিঙ্গ অর্থ করেছেন চিহ্ন।[৩৭] তাঁর মতে বর্ণাশ্রমীদের আশ্রম পরিচায়ক বিভিন্ন লিঙ্গ অর্থাৎ চিহ্ন থাকে যেমন ব্রহ্মচারীদের লিঙ্গ দণ্ড, কমণ্ডলু, মৌঞ্জী - মেখলা এবং যজ্ঞোপবীত তেমনি পাশুপতদের লিঙ্গ বা ধর্ম পরিচায়ক চিহ্ন হলো শরীরে ভস্মলেপন, নির্মাল্যধারণ ইত্যাদি। 'সর্বরূপং ভবং জ্ঞাত্বা লিঙ্গে যোহর্চয়তি প্রভুম' (মহাভারত ৭ । ২০০ । ৯৩) - মহাভারতের এই শ্লোকের 'লিঙ্গ' শব্দের টীকা লিখতে গিয়ে প্রখ্যাত টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেছেন, 'লিঙ্গে সূক্ষ্মশরীরে অর্চায়াম্ প্রতিমায়াম্'[৩৮] অর্থাৎ লিঙ্গ অর্থ সূক্ষ্মশরীর এবং 'অর্চাতে' অর্থ প্রতিমাতে। ভাগবৎ গীতাতেও লিঙ্গ অর্থ 'চিহ্ন' বা লক্ষণ বলা হয়েছে। মনুসংহিতাতেও লিঙ্গ অর্থ চিহ্ন করা হয়েছে। 'শিশ্নদেবাঃ' অর্থ জননেন্দ্রিয় পূজক নয়।[৩৯] পূজ্যপাদ আচার্য যাস্ক 'শিশ্নদেবাঃ' শব্দের অর্থ 'করেছেন অব্রহ্মচর্যাঃ' অর্থাৎ যিনি অব্রহ্মচারী।[৪০] সায়ণচার্যও একই অর্থ প্রকাশ করেছেন। শিবলিঙ্গের আকার কখনই পুং-যৌনাঙ্গের মত নয়। শিবলিঙ্গ সাধারণতঃ নলাকার (Cylindrical)। প্রথাগত (Conventionalized) শিবলিঙ্গের নিম্নভাগ প্রায় বর্গাকার (Square), মধ্যের অংশ অষ্টভূজাকৃতি(Octagonal) এবং শিরোভাগ (Cylindrical)[৪১]। এছাড়া সবচেয়ে প্রাচীন ও ঐতিহ্যশালী শিবলিঙ্গগুলি নলাকার নয়। স্বয়ম্ভু

লিঙ্গ বা জ্যোতির্লিঙ্গ রূপে পরিচিত এই শিবলিঙ্গগুলি পর্বতাকৃতি বা স্তম্ভাকৃতি। উজ্জয়িনীর প্রখ্যাত জ্যোতির্লিঙ্গ মহাকালেশ্বর স্তম্ভাকৃতি, ভারতের উত্তরে হিমালয়ের কেদারনাথ পর্বতাকৃতি। নর্মদা তীরের ওঙ্কারেশ্বরে মান্ধাতা ওঙ্কারলিঙ্গ এবং মামলেশ্বর বা অমলেশ্বর স্তুপের মত। বিভিন্ন পুরাতন মুদ্রায় শিবের প্রতীক হিসাবে চন্দ্রকলা সহ পর্বতলিঙ্গ খোদিত আছে। বৈদিক যূপ (Phallus) শিবলিঙ্গের আদি। মহাভারতেও যূপস্তম্ভের পরিচয় আছে (মহাভারত ১।৯৪।২৯, ৩।১৯৮।১০)। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদড়োতে প্রাপ্ত প্রস্তরগুলি যে শিবলিঙ্গ সে সম্বন্ধে জন মার্শাল নিজেই নিশ্চিত নন। তিনি এদেরকে প্রথাগত (Conventionalized) বলে মন্তব্য করেছেন। যে দুটি প্রস্তরকে উনি শিবলিঙ্গ বলে মন্তব্য করেছেন তাদের সম্বন্ধেও বলেন যে তা কম বেশী প্রকৃত শিশ্নাকৃতি (more or less realistically modelled)।[৪২] গৌরীপটকে 'যোনি চিহ্ন' বলা যায় না তাহলে যেকোন হাতের অঙ্গুরীয় বা হাতের বালা (বলয়) কে যোনি চিহ্ন বলতে হয়। ঋগ্বেদে যজ্ঞদেবীকে 'দক্ষতনা' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 'দক্ষতনা' অর্থাৎ দক্ষের কন্যা। দক্ষের কন্যা পরবর্তীকালে গৌরী হয়েছেন। বেদের সময় যজ্ঞবেদীতে অগ্নি প্রজ্জ্বলন করা হতো। বেদে অগ্নি ও রুদ্রকে একই দেবতা রূপে বন্দনা করা হয়েছে। ঋগ্বেদে যজ্ঞবেদীকে যোনি বলা হয়েছে । চতুর্বেদ ভাষ্যকার সায়ণাচার্য লিখেছেন 'যোনিঃ' বদ্যাখ্যং স্থানম্' (ঋগ্বেদ ভাষ্য ১।১০৪। ১) । লিঙ্গ বিশ্বপিতা মহেশ্বরকে শিব বা রুদ্রের ভাবমূলক প্রতীক, যোনি অর্থ বিশ্বমাতা উমা বা গৌরী বা দক্ষতনয়ার প্রতীক। তন্ত্রশাস্ত্রে যোনি অর্থাৎ জগৎজননী মহামায়া বা ব্রহ্মশক্তি বা 'ব্রহ্মাত্মিকা' - 'ওঁ যোনিরূপে মহামায়ে সর্বসম্পদপ্রদে শুভে ...' কিংবা 'ব্রহ্মাত্মিকা মহাযোনিঃ সর্বান কামান্ পরক্ষতু' (প্রাণতোষণী বসুমতী সংস্করণ, পৃঃ ৫৫৩ - ৫৫৪)।[৪৩] বেদপন্থীরা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মাচর্যাদি রক্ষা করে গুরুগৃহে বেদাধ্যায়ন করতেন ফলে 'লিঙ্গ' অর্থ যদি শিশ্ন হতো তাহলে তারা কিভাবে এই শিশ্নপূজা গ্রহণ করলেন ; যেখানে বেদে অব্রহ্মচারীদের 'শিশ্নদেবাঃ' বলে তাঁরা নিন্দা করেছেন। বীরশৈব বা লিঙ্গায়তরা প্রচণ্ড সংযমী ও নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। তাঁদের শিবার্চনার সঙ্গে কোন প্রকার আদিরসাত্মক ব্যাপার জড়িত নাই। লিঙ্গ শব্দটি √লী এবং √গম্ থেকে উৎপন্ন। √লী = লয় বা বিনাশ এবং √ গম্ = নির্গত হওয়া বা সৃষ্টি হওয়া। ফলে যা থেকে সৃষ্টি ও লয় উভয়ই হয় সেই দেবাদিদেব মহেশ্বর বা রুদ্র বা শিবই হলেন লিঙ্গ। আমাদের বাংলা, সংস্কৃত সহ সমস্ত ব্যাকরণে লিঙ্গ অর্থ প্রতীক। পুংলিঙ্গ অর্থ পুরুষের প্রতীক ও স্ত্রীলিঙ্গ অর্থ স্ত্রীর প্রতীক। কোথাও লিঙ্গ অর্থ শিশ্ন বা পুং যৌনাঙ্গ নয়।

বর্ধমান জেলায় শিবপূজার নিদর্শন

বর্ধমান জেলার প্রায় প্রতিটি গ্রামে শিবলিঙ্গ । বর্ধমান শহরেই শিবলিঙ্গের সংখ্যা প্রচুর। শিবলিঙ্গ পূজা যে আর্যদেরই দান তা উপরের আলোচনা থেকে প্রমাণ হয়। যজুর্বেদে বহু জায়গায় রুদ্রকে শিবরূপে স্তব করা হয়েছে। মহাভারতের সময়েও দেখা যায় যে, উচ্চ অধিকারীরা লিঙ্গে শিবার্চনা করতেন, নিম্ন অধিকারীরা প্রতিমায় শিবার্চনা করতেন। মহাভারতে কৃষ্ণ ও অর্জুনের কাছে অশ্বত্থমা যুদ্ধে পরাজিত হলে ব্যাসদেবের কাছে তার

কারণ জানতে চাইলেন। ব্যাসদেব বলেন পূর্বকালে কৃষ্ণ ও অর্জুন নারায়ণ ও নর ঋষি ছিলেন এবং সেইসময় তাঁরা লিঙ্গে শিবার্চনা করতেন অথচ অশ্বত্থামা প্রতীকে শিবার্চনা করেন। সেজন্য উচ্চ অধিকারী কৃষ্ণার্জুনেরই কাছে অশ্বত্থামা যুদ্ধে পরাজিত হয়েছেন। মহাভারতের সময় শিবলিঙ্গে রুদ্র আরাধনার ব্যাপক প্রসার হয়।

বর্ধমানের পাণ্ডবেশ্বরে পঞ্চপাণ্ডবের প্রতিষ্ঠিত ছয়টি শিবমন্দির আছে যা নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের মহান্তরা পূজাদি নির্বাহ করে থাকেন। ভারতবর্ষের বৃহদাকার শিবলিঙ্গের মধ্যে বর্ধমান শহরের আলমগঞ্জে অবস্থিত বর্ধমানেশ্বর শিবলিঙ্গ অন্যতম। এই শিবলিঙ্গটির ওজন ৩৫০ মন, গৌরীপটের বেড় ১৮ ফুট এবং মোট উচ্চতা ৫ ফুট ৯ ইঞ্চি। বর্ধমান জেলার বরাকরের নদীখাতে হরগৌরী মূর্তি পাওয়া গেছে। এই মূর্তির নিম্নভাগে সিংহ ও বৃষ আছে। শিবের একটি নটরাজ মূর্তিও এই নদীখাত থেকে উদ্ধার করা হয়েছে যার নিম্নদেশে বৃষ ও গণেশমূর্ত্তিও আছে। বরাকরের বেগুনিয়া বাজারে চারটি উচ্চ শিখর দেউল আছে। ৬০ ফুট উচ্চ দুটি শিখর - দেউলের গর্ভগৃহে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। ১৪৬১ খ্রীষ্টাব্দে রাজা হরিশচন্দ্রের স্ত্রী হরিপ্রিয়া মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৫৪৬ খ্রীষ্টাব্দে মন্দির দুটি সংস্কার হয়। চারটি শিখর দেউলের মধ্যে একটিতে ধ্যানমগ্ন জটাজুটধারী এক মুনির মূর্তি আছে। মুনির ডানহাতে আছে একটি লগুড় বা লকুট। অদ্রীশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই মুনি হলেন 'লকুশীশ' যিনি লকুশীশ বা নকুশীল নামে প্রাচীন শৈব সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। পুরাতাত্ত্বিকদের মতে মন্দিরটি খ্রীষ্টীয় সপ্তম -অষ্টম শতকের। মহাভারতে পাশুপত মতের উল্লেখ পাওয়া যায় - 'সাংখ্যং যোগঃ পাঞ্চরাত্রং বেদাঃ পাশুপতং তথা।/জ্ঞানান্যেতানি রাজর্ষে বিদ্ধি নানামতানি বৈ' (মহাভারত ১২।৩৪৯।৬৪) নকুলীশ বা লকুলীশ পাশুপত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। মাধবাচার্য 'সর্বদর্শন সংগ্রহ ' গ্রন্থে নকুলীশকে পাশুপত মত বলে উল্লেখ করেছেন। লকুলী বা লকুলীশ বা নকুলীশ হলেন সম্ভবতঃ পাশুপত মতের স্রষ্টা, যদিও বায়বীয় সংহিতা, শিবপুরাণ প্রভৃতি মতে লকুলীশ আদি আচার্য নন, তিনি সর্বপ্রথম পাশুপত মতকে সংগঠিত রূপ দেন। পঞ্চাধ্যায়ী গ্রন্থ লকুলীশের লেখা ।[৪৪] পুরাণে লকুলীশকে শৈব অবতার বলা হয়েছে। পাশুপত মত বেদানুসারী, বেদবিরোধী নয়। বেদে শিবকে পশুপতি বলা হয়েছে। তাছাড়া পাশুপত মতের পাশুপত সূত্রের ভিত্তি তৈত্তিরীয় আরণ্যক। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের প্রথম পাঁচটি মন্ত্রের দ্বারা পাশুপত সম্প্রদায় শিবার্চনা করে থাকেন। তারমধ্যে বৈদিক রুদ্র গায়ত্রীও আছে - 'ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি। তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ' (পাশুপত সূত্র ৪।২২ - ২৪)।[৪৫] লিঙ্গপুরাণে লকুলীশের শিষ্যদের (প্রধান চার শিষ্য যথাক্রমে কুশিক, গর্গ,মিত্র এবং কৌরুষ্য) বেদ্‌বিদ্ ব্রাহ্মণ - ''ব্রাহ্মণাঃ বেদপারগাঃ'' বলা হয়েছে। বৃহৎ সংহিতাতে পাশুপতদের দ্বিজ (দ্বিজান ব্রাহ্মণান্ সভস্মান্ ভস্মসহিতান্ পাশুপতানিত্যর্থঃ' -উৎকল ভাষ্য) বলা হয়েছে। কূর্মপুরাণেও পাশুপতদের বেদমার্গী স্মার্ত শৈব বলা হয়েছে যাঁরা শতরুদ্রিয় (যজুর্বেদের বিখ্যাত রুদ্রস্তব) ও বেদের অন্যান্য রুদ্রসূক্ত দ্বারা শম্ভু বা শিবের উপাসনা করেন। ফলে বর্ধমানের লকুলীশ বা নকুলীশ পাশুপত শৈবধারা যে বেদমার্গী তা প্রমাণিত হয়।

বর্ধমানের শিব ঃ গণদেবতা

বহু প্রাচীন যুগ থেকেই রুদ্র বা শিব আপামর জনসাধারণের পূজা পেয়ে আসছেন। বৈদিক ও অবৈদিক সকল মানুষ শিবকে আপন করে নিয়েছেন। শুধু ভারতবর্ষ নয়, ভারতবর্ষের বাইরেও জনমানসের চিত্ত শিব অধিকার করে আছেন। মাতৃকাদেবী ছাড়া একমাত্র বৈদিক দেবতা শিব সকল শ্রেণীর মানুষের পূজা অদ্যাবধি পেয়ে আসছেন। এর প্রধান কারণ সম্ভবতঃ দুটি। প্রথমতঃ রুদ্র প্রলয় অর্থাৎ ধ্বংসের দেবতা। আধি - ব্যাধি রুদ্রের সৃষ্টি। সেজন্য মানুষ রুদ্রকে খুশী করতে চেয়েছেন কারণ রুদ্রের হাতেই আছে ঔষধ। ব্যাধি দূর করার ক্ষেত্রে তিনি ধন্বন্তরী ।[৪৬] যজুর্বেদের রুদ্র সূক্তে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, রুদ্রের কৃপায় মৃত্যু দূর হয় সেজন্য শিব পরবর্তীকালে 'মৃত্যুঞ্জয়'। আবার দ্বিতীয়তঃ শিব কৃষির দেবতা। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ সেজন্য সকলশ্রেণীর মানুষ শিবকে আরাধ্য দেবতার মর্যাদা দিয়েছেন। পশ্চিমবাংলার উপজাতিরা তাঁদের শ্রেষ্টদেবতা 'মারাং-বুরু'-কে শিবের সঙ্গে একাত্ম করে নিয়েছেন। শিব নিজেই গিরিবাসী, তাছাড়া প্রাচীন অনেক শিবলিঙ্গ পর্বতাকৃতি। 'মারাং বুরু' কথারও অর্থ বৃহৎ পর্বত।[৪৭]

গাজন ও চড়কের মূল অর্থ

বাংলার অন্যান্য অংশের মত বর্ধমান জেলাতেও শিবের গাজন উৎসব খুব বিখ্যাত চৈত্রমাসের সংক্রান্তিতে দিনে এই অনুষ্ঠান শেষ হয়। গাজন শব্দটি এসেছে গর্জন থেকে। রুদ্রের অন্যতম অর্থ 'যিনি সর্বদা গর্জন করেন' (রুদ্রো রৌতীতি সতঃ' - যাস্ক) । জাতিবর্ণ নির্বিশেষে গ্রামবাসীরা গাজনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়। মান্‌সিক করা অংশগ্রহণকারীরা চৈত্রসংক্রান্তির কয়েকদিন আগে থাকতে সংযম ও বিভিন্ন আচার পালন করেন, হবিষান্ন করেন। তাদেরকে গাজুনে সন্ন্যাসী বলে। এদের মধ্যে একজন মূল সন্ন্যাসী থাকেন তাকে 'পাটভক্ত্যা' বলা হয়। তারা বিভিন্ন ছড়া কেটে গান করেন ও নাচেন। এই গানগুলিতে শিবের কৃষিজীবিরূপ ফুটে ওঠে। তারা পালকিতে এক টুকরো পাথর বসিয়ে শোভাযাত্রা করে একগ্রাম থেকে অন্য গ্রামের শিব মন্দিরে যান। গৃহস্থদের বাড়ি গিয়ে শিবপূজার জন্য ভিক্ষা করেন। গৃহের সামনে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড গর্জন করে শিবনাম করেন। এভাবে প্রচণ্ড চিৎকার করেন বলে তারা গাজুনে সন্ন্যাসী। অনুষ্ঠানের শেষে হয় চড়ক পূজা।'চড়ক' (চক্রপথে আবর্তন) সেই মুহুর্তে সূর্যের দ্বাদশ রাশির চক্রপথে আবর্তনের সূচনার প্রতীক।[৪৮] চড়ক উৎসবটি আসলে সূর্যোৎসব বা সূর্যপূজা। বেদে রুদ্র বা শিব এবং আদিত্যে সমত্ব প্রতিপাদিত হয়েছে। শিবের গাজন হয় প্রচণ্ড গ্রীষ্মের সময়। প্রকৃতপক্ষে এই উৎসব বৃষ্টিপাতের উদ্দেশ্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা। সূর্য বৃষ্টি দেয় আবার বৃষ্টি ছাড়া চাষ হয় না তাই বৃষ্টির দেবতা শিব ও সূর্য এক হয়ে গেছে। বর্ধমান জেলার ধর্মঠাকুরকে এই সময় শিব ও সূর্য উভয়রূপেই পূজা করা হয়। বর্ধমান জেলার খুদকুড়ি গ্রামে একটি প্রাচীন প্রথা বেশ মজার। এখানে অনাবৃষ্টির জন্য ধর্মঠাকুরকে শাস্তি দেওয়া হয়। প্রখর রৌদ্রে ধর্মঠাকুরকে উন্মুক্ত স্থানে ফেলে রাখা হয়। বর্ধমানে নাসিগ্রামে গ্রামদেবতা হলেন শিব।

এখানকার গাজন খুব বিখ্যাত। আবার নিগনের নিগনেশ্বর শিবের গাজনও খুব সমারোহের সঙ্গে হয়। নিগনেশ্বরের প্রসাদ নিয়ে ক্ষিরগ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী যোগাদ্যার পূজো শুরু হয়। নিগন শব্দটি সম্ভবত নিগম শব্দের অপভ্রংশ। নিগম শিবের আর এক নাম। সম্ভবতঃ এই গ্রামে শৈব্য উপাসনার কোন ধারা প্রচারিত ছিল। বেদেরও আর এক নাম 'নিগম'। 'নিগম' গ্রাম্য উচ্চারণে সম্ভবত নিগন হয়েছে এবং এই শিব নামেই গ্রাম নাম হয়েছে। জামালপুরের 'বুড়োরাজ' খুব প্রাচীন শিবলিঙ্গ। 'বুড়োরাজ'কে ধর্মরাজ রূপেও পূজা করা হয়। ধর্মরাজ কোথাও বিষ্ণু রূপে, কোথাও বা আদিত্য বা শিবরূপেও পূজা পায়। আসলে বেদের এক দেবতাই বহু হয়েছেন - এই তত্ত্ব লোকধর্মকেও প্রভাবিত করেছে। শিবের মতনই ধর্মরাজেরও মূল অবস্থান কৈলাসে - 'কৈলাস ছাড়িয়া গোঁসাঞি করহ গমন'।[৪৯] শিবের মত ধর্মরাজকেও নিরঞ্জন বলা হয়। ফলে শিবই যে অনেক গ্রামে ধর্মরাজ, তা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। রাঢ় বাংলার গ্রামে গ্রামে শিব। শহর বর্ধমানেই শিবের সংখ্যা অগণিত। বিনয় ঘোষের মতে রাঢ়ের গণদেবতা ধর্মঠাকুর শিবঠাকুরে পরিণত হয়েছে। আমার মনে হয়, শিবঠাকুরই বর্ধমান সহ সমগ্র রাঢ়বঙ্গের ধর্মঠাকুর। শিবেরই আঞ্চলিক নাম হয়েছে ধর্মঠাকুর। ধর্মঠাকুরের রূপ বর্ণনা ও পূজামন্ত্র শিবের রূপ ও পূজামন্ত্রের অনুরূপ। তাছাড়া ধর্ম শব্দটি সংস্কৃত শব্দ। অনার্য ধর্মঠাকুর কি কারণে সংস্কৃত 'ধর্ম' নাম গ্রহন করলেন? শিবকে 'ধর্ম' বলা বরং অনেক যুক্তিযুক্ত। শিবের বাহন বৃষ বা 'বৃষভ'। ঋগ্বেদে রুদ্রকে 'বৃষভ' বলা হয়েছে। মনুসংহিতায় ধর্মকে বৃষভের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ -এই চারটি পুরুষার্থকে বৃষের চারপায়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, সেজন্য বৃষ অর্থ ধর্ম।[৫০] শিবেরও বাহন বৃষ এবং শিব ভক্তজনকে চারটি পুরুষার্থ দান করেন। সেজন্য মনে হয় শিব হয়েছেন ধর্ম। বর্ধমান সহ সমস্ত রাঢ় বঙ্গের মেয়েরা নীলের ব্রত বা নীল ব্রত করেন। এই সময় তারা উপবাস করে শিবের মাথায় জল ঢালেন। এই নীল ব্রত প্রকৃতপক্ষে শিবার্চনা। শিবের আর এক নাম 'নীলকণ্ঠ'। বেদেও শিবকে 'শিতিকণ্ঠ' বলা হয়েছে। জামালপুরে শিবকে 'বুড়োরাজ' বলে। শুক্ল যজুর্বেদে শিবকে জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, বর্ষীয়ান অর্থাৎ বৃদ্ধ বলা হয়েছে। আঞ্চলিক ভাষায় জ্যেষ্ঠ বা বৃদ্ধ হয়েছে 'বুড়ো'। বর্ধমানে গলসী গ্রামের গ্রাম দেবতাও 'বুড়োশিব'। বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম থানার নৈহাটীতে গ্রাম দেবতা কালার্করুদ্র বা কালরুদ্র। শুক্ল যজুর্বেদে রুদ্রকে 'কাল' বলা হয়েছে। উজ্জয়িনীর মহাকালেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ ভারতবর্ষের দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম। দাঁইহাটে একটি বৃক্ষতলে পঞ্চাননের পূজা হয়। আবার কাটোয়া থেকে বাসযোগে ফড়ে নদীর তীরে অবস্থিত গাঁফুলিয়া মৌজা। সমগ্র মৌজার আঞ্চলিক দেবতা পঞ্চানন। করজগ্রাম, গোপালপুর, রামকৃষ্ণপুর, দুর্গা, রাধাকৃষ্ণপুর, বিজয় নগর, গোঁড়া, আলমপুর, বাঁধমুড়া, বনগ্রাম এবং গাঁফুলিয়া গ্রাম নিয়ে এই মৌজা। পঞ্চানন শিবের আর এক নাম। শিবের পাঁচটি মুখ পঞ্চভুত - ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ও ব্যোমের প্রতীক। পাশ্চাত্য ভারততত্ত্ববিদ্ Alian Danielou তাঁর 'Hindu polytheism' গ্রন্থে লিখছেন, 'The peaceful manifest of the Golden Embryo (Hiranya garbha) which appears to us as the sun, source of our life, is connected with the

number 5 and with the five elements and is represented in the five headed Siva.'[৫০] পাঁচ সংখ্যা আর্যসংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক মঙ্গল জনক সংখ্যা। বর্ধমান জেলার বহুগ্রামে প্রাচীন শিবলিঙ্গ আছে এবং শিবের নামে গ্রামের নাম হয়েছে। কাটোয়ার পুঁইনি গ্রামে একটি প্রাচীন শিবলিঙ্গ আছে। শিবরাত্রিতে সপ্তাহব্যাপি মেলার বয়স আনুমানিক ২০০ বৎসর। বড়বিল্বগ্রামের মত বহু গ্রামের গ্রাম দেবতা শিব। বড়বেলুনের বানেশ্বর ডাঙ্গায় প্রতিষ্ঠিত শিব পাল / সেন আমলে বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। কাঁকসার বোনকোটি গ্রামেও কয়েকটি প্রাচীন শিবলিঙ্গ আছে। উদাহরণের অভাব নেই। ফলে প্রাচীনকাল থেকেই বর্ধমানের গণদেবতারূপে শিব অর্থাৎ রুদ্র পূজিত। গোটা পূর্বভারতে শুক্লযজুর্বেদের প্রসার ছিল বেশী। স্বয়ং যাজ্ঞবল্ক্য পূর্বভারতে শুক্লযজুর্বেদের প্রসার করেন। তিনি উত্তরবিহারের বিদেহ বা বৈদেহ রাজা জনকের রাজসভায় এসেছিলেন। শুক্ল যজুর্বেদে রুদ্রকে অসংখ্যবার 'শিব' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। কালনায় ও বর্ধমানে ১০৮ (প্রকৃতপক্ষে ১০৯টি শিবমন্দির) প্রতিষ্ঠা করেন বর্ধমান রাজ তেজচাঁদের মাতা বিষণকুমারী বা বিষ্ণুকুমারী। দীপকুমার দাস কালনায় ১০৮ শিবমন্দির সম্বন্ধে বলেছেন, 'শৈবতন্ত্রের ১০৯ টি বীজমন্ত্রের অনুসরণে পুরুষ-প্রকৃতির একাঙ্গ ভাবনায় একটি কালো অর্থাৎ 'পুরুষ বীজ' অন্যটি সাদা অর্থাৎ 'প্রকৃতি বীজ' এই বিন্যাসে শিবলিঙ্গগুলি স্থাপিত।'[৫১]

মাতৃকাদেবী

রাঢ় বাঙ্গলা সহ সমগ্র ভারতবর্ষে শাক্ত আরাধনা অর্থাৎ মাতৃকাদেবীর উপাসনার মূল স্রোতধারা বেদ। পূর্ববঙ্গে পরবর্তীকালে যে তন্ত্র আচার প্রবল হয়ে ওঠে সেই তন্ত্র সাধন ধারাও শ্রুতিমূলক। মনুসংহিতার প্রখ্যাত টীকাকার বাঙালী কুল্লুকভট, সেজন্য তন্ত্রকে শ্রুতিমূলক বলেছেন - 'বৈদিকী তান্ত্রিকী চৈব দ্বিবিধা কীর্তিতা শ্রুতিঃ'। আমাদের অনেক প্রসিদ্ধ গবেষকরা আর্যদের পিতৃতান্ত্রিক বলে মত দিয়েছেন কিন্তু প্রকৃত বেদপাঠক মাত্রই বিপরীত মত পোষণ করবেনই। আর্যরা পিতৃ কিংবা মাতৃতান্ত্রিক নয় - মানবতন্ত্রে বিশ্বাসী।

বেদের ঋষিরা সমগ্র বিশ্বচরাচরে এক অদ্বিতীয় চৈতন্যশক্তিকে উপলব্ধি করেছেন। শক্তি পুরুষও নয়, স্ত্রীও নয়। তাই ঋষিরা বর্ণনার সুবিধার জন্য শক্তিকে কখনও পুরুষদেবতা আবার কখনও স্ত্রী দেবতারূপে ব্যক্ত করেছেন। বিশ্বকোষ অনুযায়ী সংস্কৃত ভাষায় শক্তি বিবিধ ভাব প্রকাশ করে। যার দ্বারা কার্য হয় কিংবা যা কার্যরূপে পরিণত হবার যোগ্য, যা কোনভাবে রূপান্তরের যোগ্য, যা কোন দ্রব্যের ধর্ম কিংবা কারণের কারণ স্বরূপ তা শক্তি। শক্ ধাতুর অর্থ, হওয়া বা কোন কাজ করার ক্ষমতা। সেজন্য ব্রহ্ম লিঙ্গবর্জিত হলেও নারী অথবা পুরুষ রূপেও বর্ণিত হয়েছে। শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদে 'ব্রহ্ম' সম্বন্ধে উক্ত আছে যে ব্রহ্ম স্ত্রী, পুরুষ বা নপুংসক নন - 'নৈব স্ত্রী নপুমানেষ ন চৈবায়াং নপুংসকঃ'। তন্ত্রতত্ত্ব গ্রন্থে বলা আছে যে কল্পলতা যেমন স্ত্রীবাচক শব্দে ব্যবহৃত হয় সেরকম শক্তিকেও স্ত্রী শব্দে কীর্তণ করা হয়েছে - 'তথাপি কল্পবল্লীবৎ স্ত্রী শব্দেন যুজ্যতে'। বেদসংহিতায় অসংখ্য

দেবীর নাম পাওয়া যায়। তারমধ্যে প্রধান দেবী হলেন অদিতি। অদিতি ছাড়া অম্বিকা, সাবিত্রী, বাক্, ঊষা, সরস্বতী, রাত্রি, পৃথিবী, সিনিবালী, ইলা, রাকা, সীতা, ধীষণা, মহী, ভারতী, অরণ্যানি, নির্ঋতি, পৃশ্নি, সরণ্যু, মেধা, শ্রী, প্রভৃতি দেবী বেদসংহিতায় দেখা যায়। এছাড়া বিভিন্ন ব্রাহ্মণ গ্রন্থে অম্বিকা, উমা, হৈমবতী, রুদ্রাণী, ইন্দ্রাণী, ব্রহ্মাণী, কাত্যায়নী, কন্যাকুমারী, শর্বাণী, ভবাণী প্রভৃতি দেবীর উল্লেখ আছে। বেদসংহিতায় অদিতিকে মূলশক্তি বলা হয়েছে যার থেকে দেবতা, অসুর ও সকল কিছু জন্ম নিয়েছে। বিষ্ণু, রুদ্র, ইন্দ্র প্রভৃতি সকল দেবতারই মাতা অদিতি। ঋগ্বেদে কমকরে ৮০ বার অদিতি বিভিন্ন সূক্তে উক্ত হয়েছেন। যেকোন সোমযজ্ঞ শুরু হত অদিতিকে দিয়ে।

'অদিতির্দ্যোরদিতিরন্তরিক্ষমদিতির্মাতা স পিতা স পুত্রঃ।
বিশ্বে দেবা অদিতিঃ পঞ্চজনা অদিতির্জাতমদিতির্জনিত্বম্।।'
(ঋগ্বেদ ১।৮৯।১০)

অর্থাৎ অদিতি আকাশ, অদিতি অন্তরীক্ষ, অদিতি মাতা, অদিতিই পিতা, বিশ্বদেবতা সকল অদিতি, পঞ্চজন (দেব, গন্ধর্ব, অসুর, রাক্ষস ও পিতৃ অথবা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং নিষাদ - নিরুক্ত ৩/৮) অদিতি, যা জন্মেছে তা অদিতি, যা জন্মাবে তাও অদিতি।

ঋগ্বেদে অদিতিই সর্বেশ্বরী এবং সর্বদেবময়ী। √দো ধাতু থেকে অদিতিশব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। √দো = খণ্ডিত বা সীমিত। অদিতি = যা খণ্ডিত বা সীমিত নয়। সায়নাচার্যও অদিতির অর্থ 'অখণ্ডনীয়া করেছেন। আবার √অদ্ ধাতু থেকে অদিতি শব্দের ব্যুৎপত্তি নিষ্পন্ন হয়। √অদ্ = গ্রাস করা। 'যা অত্তিতা সা অদিতি' অর্থ্যাৎ যিনি সকল কিছু গ্রাস করেন বা লয় করেন তিনিই অদিতি। এই অদিতি পরবর্তীকালে দুর্গা এবং কালী রূপে আরাধিতা। অদিতির সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে চণ্ডীতে দুর্গার সম্বন্ধেও তাই পাওয়া যায়। মহাভারত বলেছেন যে, কাল সবকিছু সৃষ্টি ও নষ্ট করেন - 'কালঃ সৃজতি ভূতানি কালঃ সংহরতে প্রজাঃ''।[৫২] কাল-ই তন্ত্রের কালী। ঋগ্বেদে উমাকে সোম বা চন্দ্র বলা হয়েছে। 'সোমো বা ওষধীনাং রাজা'[৫৩] - সোম ঔষধী সমুহের রাজা অর্থাৎ কর্তা, 'সোম রেতোধাঃ'[৫৪] - সোম রেতোধা এবং সোম অম্বা 'সোম অম্বা'। শিবের বা রুদ্রের মাথায় সোমকলা আসলে পুরুষ-প্রকৃতির একত্র অবস্থান দেখানো হয়েছে। সোম শব্দ থেকে উমা শব্দ এসেছে - সোমা >হৌমা>ঔমা>ওম্ম >উমা। নিঘন্টুতে বাক্ অর্থাৎ গৌরী। গৌরী ও উমা একই। ঋগ্বেদেও সোমকে গৌরী বলেছেন। নিঘন্টুতে বাক্ এর আরও একটি প্রতিশব্দ হলো মেনা যা পুরাণে উমার মা মেনকা হয়েছেন।[৫৫] বৃহদারণ্যক উপনিষদে সোমকে অন্ন বলা হয়েছে। শুক্ল যজুর্বেদে রুদ্রকে অন্নপতি বলা হয়েছে। ফলে রুদ্র হলেন সোমের অর্থাৎ উমা বা গৌরী -র পতি। তন্ত্রে শিব - শক্তির প্রাধান্য দেখি। গন্ধর্বতন্ত্র সোমকে শক্তি এবং শিবকে সূর্য বলেছে। ঋগ্বেদে 'রাত্রি' দেবীর উল্লেখ আছে। শ্রী শ্রী চণ্ডীতেও বেদের রাত্রিসূক্ত পাঠ করতে হয়। গন্ধর্বতন্ত্রে ও নিশা বা রাত্রিকে শক্তি বা দেবী বলেছেন। তন্ত্রে কালীপূজা নিশায় বা মহানিশায় হয়।

রাঢ় বর্ধমানে তন্ত্র উপাসনায় বেদের প্রভাব

বেদমার্গীদের প্রত্যহ যজ্ঞ করার রীতি ছিল। গৃহে চতুষ্কোণ যজ্ঞবেদী থাকতো। বেদীর পশ্চিমে গার্হপত্য অগ্নির স্থান, পূর্বদিকে আহ্বানীয় অগ্নির স্থান এবং দক্ষিণে দক্ষিণাগ্নির স্থান। দক্ষিণাগ্নিতে পিতৃপুরুষ উদ্দেশ্যে আহুতি দেওয়া হতো। দক্ষিণদিকের অধিপতি হলেন যম যিনি মৃত্যুর দেবতা। শতপথ ব্রাহ্মণ মৃত্যুকে তম বা কালো বলেছেন - 'মৃত্যুর্বৈতমঃ'।[৫৬] সম্ভবতঃ এই দক্ষিণাগ্নি কাল অর্থাৎ মৃত্যুভয় নিবারণকারী দক্ষিণাকালী। মহাকাল সংহিতায় আদ্যাকালী হলেন দক্ষিণাকালী। নির্বাণতন্ত্রে দেখা যায় কালীর ভয়ে দক্ষিণদিকে রবিসুত বা যম ভয়ে পলায়ন করে - 'দক্ষিণস্যাং দিশি স্থানে সংস্থিতশ্চ রবেঃ সুতঃ। /কালীনাম্না পলায়তে ভীতিযুক্ত সমন্ততঃ।' দক্ষিণভারতে অগ্নিশিখাতে দেবীর উপাসনা করা হয়। মুণ্ডক উপনিষদে অগ্নির সপ্ত শিখার এক শিখার নাম কালী এবং অপর একটি শিখার নাম করালি।[৫৮] দক্ষিণাকালীর ধ্যানমন্ত্রে কালীকে 'করালবদনাং' অর্থাৎ করাল বদনবিশিষ্ট বলা হয়েছে। কালীকে অনেকে করালী বলে অভিহিত করেছেন।

তন্ত্রের মুলভিত্তি অর্থবেদ। তন্ত্রের বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান অর্থবেদে পাওয়া যায়। রুদ্রযামল তন্ত্রে অর্থবেদকে শক্ত্যাচার সমন্বিত এবং এই বেদকে 'দেবী মৃণাল সূত্র সদৃশ' বলা হয়েছে।[৫৯] অনেক পণ্ডিত অথর্ববেদের সৌভাগ্যকাণ্ড নামক উত্তর কাণ্ডকে তন্ত্রের মূল বলেছেন। বেদে অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় ইষ্টিযাগ হত। বৈদিক ঋষিরা অমাবস্যা তিথিতে অগ্নিস্থাপনের প্রশস্ত সময় বলে মনে করতেন। তন্ত্রেও অমাবস্যায় কালীপূজার প্রশস্ত সময় বলে ধরা হয়। বেদের রাত্রিদেবী পরে তন্ত্রের কালী হয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণশিষ্য স্বামী অভেদানন্দও একই অভিমত পোষণ করেন। স্কন্দপুরাণে মেনকার গর্ভস্থিত উমার গাত্রবর্ণ রাত্রিদেবী ঢেকে দিলে উমা কৃষ্ণবর্ণা হন। বৈদিকদেবী লক্ষ্মী বা শ্রী, সরস্বতী ও রাত্রি শ্রীশ্রীচণ্ডীতে মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী ও মহাকালী হয়েছেন। তাছাড়া শ্রীশ্রী চণ্ডী বেদের অন্যতম প্রধান তিনটি ছন্দ গায়ত্রী, উষ্ণিক ও অনুষ্টুপ দ্বারা রচিত হয়েছে। চণ্ডীর ঋষি ত্রয়ও বৈদিক ঋষি বশিষ্ট, বিশ্বামিত্র এবং ব্রহ্মা। বেদে গায়ত্রীর শ্রেষ্ঠত্ব সর্বাধিক। গায়ত্রীকে বেদমাতা বলা হয়েছে। তন্ত্রেও সাবিত্রী গায়ত্রীকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। (দ্রষ্টব্য মহানির্বাণ তন্ত্র)।[৬০] তাছাড়া বৈদিক গায়ত্রীর অনুসরণে বিভিন্ন দেবদেবীর তান্ত্রিক গায়ত্রী রচিত। আবার অনেক দেবতার ক্ষেত্রে বৈদিক ও তান্ত্রিক উভয় গায়ত্রী একই। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বাক্ দেবীকে 'মহতী নগ্নরূপধারিণী ' বলা হয়েছে। নিঘন্টু বাক্-কে নগ্না বলেছে।[৬১] পূর্বেই বলেছি বাক্‌কে গৌরী বা উমা বলা হয়েছে। এই নগ্নাদেবী দিগম্বরী কালী। শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদে রুদ্র শিবকে 'ব্রহ্ম' বলা হয়েছে। তন্ত্রেও সনাতন শিব নির্গুণ এবং সগুণ। মঙ্গলময় রূপের জন্য রুদ্রকে শুক্ল যজুর্বেদে 'ক্ষেম্য' (১৬/০৩) অর্থাৎ 'সকল মঙ্গলের মধ্যে যিনি অবস্থিত' বলা হয়েছে। ঐ একই বেদে রুদ্র বা শিবকে 'তার'(১৬/৪০) বলা হয়েছে। 'তার' অর্থ হল যিনি সংসার থেকে ত্রাণ করেন। তন্ত্রে অন্যতম মহাদেবী তারা, যিনি সংসার ত্রাণকারিণী বা ভববন্ধন ছেদনকারিণী। বেদ ও তন্ত্রে শিব-শক্তি অর্থাৎ পুরুষ-প্রকৃতি অভিন্ন। শৈবাগম তন্ত্রের শিব-পার্বতী, বৈষ্ণবীয় তন্ত্রে লক্ষ্মী-বিষ্ণু বা রাধা-কৃষ্ণ, শ্রী

ও শ্রীহরি হয়েছেন। বেদের ওম্(ওঁ) মহাবীজ তন্ত্রেও গৃহীত। ফলে শক্তি সম্প্রদায় যে বেদানুসারী তা প্রমাণিত হয়।

শাক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীকুল ও কালীকুল বিখ্যাত। বঙ্গদেশে কালীকুল প্রচলিত। বঙ্গদেশ বিষ্ণুক্রান্তার মধ্যে পড়ে। কালীকুলের তন্ত্রসাধকরা কালীর নানারূপ ভেদকে উপাসনা করেন। দক্ষিণাকালী, বামাকালী, শ্যামাকালী, শ্মশাণকালী, গুহ্যকালী, মহাকালী ইত্যাদি এবং দশমহাবিদ্যা যথা - কালী , তারা, ষোড়শী প্রভৃতির উপাসনা করেন। দশমহাবিদ্যা মহাশক্তি কালীরই বিভিন্ন রূপভেদ। শ্যামাকালী, দক্ষিণাকালীর নামান্তর। দক্ষিণাকালী বরদা ও সর্বকল্যাণকারিণী । গৃহী ও সন্ন্যাসী উভয়েরই দক্ষিণাকালী পূজা করতে পারে। বামাকালী সংসারনাশিনী; কেবল সন্ন্যাসীর পূজার্হ। কালীর একাক্ষরী, দ্ব্যক্ষরী, এ্যক্ষরী, একাদশাক্ষরী, দ্বাবিংশাক্ষরী প্রভৃতি বীজমন্ত্র আছে। হ্রীং ও ক্রীং প্রধান বীজ। বৈদিক মহাবীজ 'ওঁ' এবং কীলকাদিও ব্যবহৃত হয়।

রাঢ়বঙ্গ তন্ত্রসাধনার স্থান। তন্ত্রশাস্ত্রে যে ৫১ টি শক্তিপীঠ বা মহাপীঠের কথা উল্লিখিত তার মধ্যে রাঢ়বঙ্গেই ৯ টি মহাপীঠ পড়ে। দেবীপুজো রাঢ়বঙ্গ সহ সমগ্র ভারতবর্ষে এবং ভারতের বাইরে অনতি অতীত থেকে প্রচলিত। ভারতবর্ষে দেবীপূজা প্রধানতঃ দু'ধরনের - প্রথমটি সম্পূর্ণ বেদমার্গী এবং দ্বিতীয়টি বেদানুসারী। বৈদিক দেবী সম্বন্ধে পূর্বে বলা হয়েছে। বেদানুসারী দেবীপূজার প্রচলন দক্ষিণ ভারতের বেশ কয়েকটি জায়গায় দেখা গেলেও বঙ্গদেশে এর প্রভাব সম্ভবতঃ বেশী। বর্ধমান জেলা সহ সমগ্র রাঢ়বঙ্গে শাক্ত আরাধনায় বেদের প্রভাব স্পষ্ট। বর্ধমান জেলা সহ রাঢ়বঙ্গে - এমনকি বৃহৎবঙ্গেও শাক্তপূজার মূল উপাদান বেদ থেকে গৃহীত হলেও আঙ্গিক পুরোপুরি বৈদিক নয়। তন্ত্র তার সাধন ধারার প্রায় সকল উপাদান বেদ থেকে গ্রহণ করেও নিজের ভিন্ন স্বাতন্ত্র বজায় রেখেছে। বেদে যে সকল খুব গূঢ়ভাবে উল্লিখিত ছিল তন্ত্রে সে সকলের বিস্তার দেখতে পাওয়া গেছে। বর্ধমান জেলায় দুর্গতিনাশিনী দুর্গা চণ্ডী নামে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। চণ্ডীর নামের আগে বিভিন্ন গ্রামনাম যুক্ত হয়ে গ্রামদেবতা বা গ্রামদেবী হিসাবে পূজা পাচ্ছেন। আবার বিভিন্ন রোগব্যাধি থেকে রক্ষা পাবার জন্যও রোগের নামের সঙ্গে চণ্ডী নাম যুক্ত হয়েছে। কলেরা এবং বসন্ত রোগের থেকে রক্ষা পাবার জন্য বর্ধমান জেলায় একজন গ্রামদেবী হলেন বসনচণ্ডী। বাংলায় কলেরাকে বলে ওলাওঠা। সেজন্য চণ্ডী-র আগে 'ওলা'বা 'ওলাই' শব্দ যুক্ত করে ওলাচণ্ডী বা ওলাইচণ্ডী-র পূজা করা হয়। বৈশাখ মাসে বর্ধমান জেলা সহ সমগ্র বঙ্গদেশের মেয়েরা স্বামী ও সন্তানের মঙ্গল কামনায় মঙ্গল চণ্ডীর ব্রত করেন। জয়মঙ্গল চণ্ডীর ব্রত উদ্‌যাপিত হয় জ্যৈষ্ঠ মাসে আবার পারিবারিক সকল কল্যাণের জন্য অগ্রহায়ণ মাসে চারটি মঙ্গলবারে কলাইমঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করেন বাংলার মেয়েরা। মেয়েদের মধ্যে এরকম বহু প্রকার চণ্ডীপূজা প্রচলিত। দেবী-র নামে গ্রাম নাম বর্ধমান জেলায় প্রচুর। অট্টহাস, ইন্দ্রাণী, অম্বিকাকালনা, কল্যাণেশ্বরী, কালীগঞ্জ, কালিকাপুর, কালীপাহাড়ী, নলহাটী, বোঁয়াইচণ্ডী, ব্রহ্মাণীড়তলা, শক্তিগড়, শাঁকাই বা শাঁকাইচণ্ডী প্রভৃতি। এ সকল দেবীর পূজারীতি বৈদিক, পৌরাণিক ও তান্ত্রিক মতের মিশ্রণ।

বেদানুসারী তন্ত্র সাধনাধারায় প্রধানা হলেন কালী। সংস্কৃত ভাষায় ৫১ টি বর্ণমালাকে তন্ত্রে দেবদেবীর বীজ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। তন্ত্রে কালীকে বর্ণময়ী বলা হয়েছে।

তন্ত্রশাস্ত্রক্ত অন্যতম মহাপীঠ অট্টহাস। কারও মতে বর্ধমান জেলার কেতুগ্রামের সন্নিকটে অট্টহাস মহাপীঠ, কেউ বলেন বীরভূম জেলার লাভপুরে এই মহাপীঠ অবস্থিত। এই মহাপীঠের দেবী ফুল্লরা এবং ভৈরব বিল্বনাথ। বিল্বনাথ অবশ্য পার্শ্ববতী গ্রাম বিল্বেশ্বরে অবস্থিত। জয়দুর্গার ধ্যানমন্ত্রে দেবীর পূজা হয়। জামালপুর থানার অমরপুর গ্রামে আছেন অভয়া দেবী। আউসগ্রামের অমরারগড়ে আছেন দেবীশিবাখ্যা। দেবী দশভূজা এবং সিংহবাহিনী। কাটোয়ার আখড়ায় সিদ্ধেশ্বরী কালী, আদরার জয়দুর্গা, উজানিকোগ্রামের মঙ্গলচণ্ডী, উড়োগ্রামের সিংহবাহিনী জয়দুর্গা, মন্তেশ্বরের করন্দায় মহিষমর্দিনী করন্দেশ্বরী, কালিগ্রামে অষ্টভূজা মহিষমর্দিনী জয়দুর্গা, বরাকর হতে ৮ কিলোমিটার দূরবর্তী কল্যাণেশ্বরী, কাইতি গ্রামের সিদ্ধেশ্বরী, বর্ধমান শহরের কাঞ্চননগরে কঙ্কালেশ্বরী, মেমারীর কানপুরে মহিষমর্দিনী সর্বমঙ্গলা, বর্ধমান শহরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সর্বমঙ্গলা, কালিকাপুরে জয়দুর্গাকালী, ভাতাড়ের কালিপাহাড়ীর মঞ্জুলায় হংসের উপর উপবিষ্টা ব্রহ্মাণীদেবী, বর্ধমানের কুড়মুনে হস্তিপৃষ্ঠে ইন্দ্রাণীদেবী, শহর বর্ধমানের শ্যামবাজারে পুরাতন নিমকাঠের কালী, কেতুগ্রামে বহুলা মহাপীঠ, মাজিগ্রামে চতুর্ভুজ সিংহবাহিনী শাকম্ভরী, মঙ্গলকোটের কোঁয়ারপুরের এবং ক্ষীরগ্রামের দেবী যোগাদ্যা, দাঁইহাটের পাতাইচণ্ডি, একাইচণ্ডি প্রভৃতি অসংখ্য শক্তিপীঠ সমগ্র বর্ধমানে ছড়িয়ে আছে। শুধুমাত্র বর্ধমান শহরের দেবী আরাধনার ব্যাপ্তি বিরাট। সর্বমঙ্গলা বর্ধমানের প্রধানদেবী। বর্ধমানের কাঞ্চননগরে কঙ্কালেশ্বরী প্রকৃতপক্ষে চামুণ্ডামূর্তি। এই দেবীর মূর্তিটিতে দেহের সূক্ষ্ম শিরা-উপশিরা প্রকট। বর্ধমান শহরের গোকুলানন্দ ব্রহ্মচারীর প্রতিষ্ঠিত দুর্লভাকালী দুইশত বছরের অধিক প্রাচীন। এছাড়া প্রখ্যাত সাধক কমলাকান্তের প্রতিষ্ঠিত দেবী কমলাকান্ত কালী বিখ্যাত। বর্ধমানের চান্নাগ্রামে কমলাকান্তের মামারবাড়ি ছিল আর বাড়ি ছিল অম্বিকাকালনায়। কমলাকান্ত শ্রীপাঠ গোবিন্দমঠের চন্দ্রশেখর গোস্বামীর কাছে বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত হলেও চান্নাগ্রামে বিশালাক্ষী মন্দিরে শক্তি আরাধনা করেন এবং সিদ্ধিলাভ করেন। বর্ধমানের রাজা তেজচন্দ্র, দেওয়ান রঘুনাথ রায়ের পরামর্শে তাঁকে রাজার সভাপণ্ডিত হিসাবে বর্ধমানে নিয়ে আসেন এবং কোটালহাটে ১২কাঠা জমি দান করেন। রাজা ঐ জমিতে কমলাকান্তের গৃহ ও দেবীর মন্দির নির্মাণ করেন। 'কুব্জিকাতন্ত্রে' রাঢ় বর্ধমানে নয়টি ডাকার্ণব তন্ত্র পীঠের উল্লেখ পাওয়া যায়। স্কন্দপুরাণের বিভিন্ন খণ্ডে আরও নানা দেবীর উল্লেখ আছে যারা বর্ধমান জেলায় বিভিন্ন জায়গায় আঞ্চলিক দেবী বা গ্রামদেবী রূপে পূজা পাচ্ছেন। এই সকল দেবীর কথা 'লোকধর্ম' পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হলো। বৈদিক দেবদেবী পরবর্তীকালে বৌদ্ধ ও জৈন দেবদেবী মণ্ডলে প্রবেশ করেছে। বৌদ্ধতন্ত্র হিন্দুতন্ত্রের নামান্তর মাত্র। জৈনদের প্রায় সকল প্রধানদেবীর উৎস বেদাদি বিভিন্ন হিন্দুশাস্ত্র। রুদ্র বা শিবের মত মাতৃকাশক্তির পূজা সকল শ্রেণীর মানুষকে প্রভাবিত করেছে। তন্ত্রক্ত দেবদেবীর সামনে বিভিন্ন পশুবলিতে বেদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

বৈদিক প্রায় সকল দেবদেবীর উদ্দেশ্যে পশু উৎসর্গের বহু নিদর্শন আছে। মেরুতন্ত্রে তান্ত্রিক সকল মন্ত্রকেই 'বেদ' বলা হয়েছে। ''ন বেদঃ প্রণবংত্যক্তা মন্ত্রো বেদসমন্বিতঃ। / তস্মাদ্বেদ পরো মন্ত্রো বেদাঙ্গঁশ্চাগমঃ স্মৃতঃ ''- অর্থাৎ প্রণবছাড়া বেদ নেই আর মন্ত্র প্রণবযুক্ত ফলে মন্ত্রকে বেদপর এবং আগমকে বেদাঙ্গ বলা হয়। বর্ধমানের শরৎকালে দুর্গাপূজা, বসন্তকালে বাসন্তীপূজা এবং বৎসরের বিভিন্ন সময়ে জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা, গন্ধেশ্বরী পূজা হয়। তাছাড়া মনসা, শীতলা, ঈশানী, কমলেশ্বরী, ঈশ্বরী, সিদ্ধিদাত্রী প্রভৃতি বিভিন্ন মাতৃকাদেবীর পূজা প্রচলিত।

বর্ধমান জেলায় বৈষ্ণব , শৈব ও শাক্ত - এই তিন বেদমার্গী সাধন ধারা প্রধান। অন্যান্য দেবদেবী এই তিনের মধ্যেই মিশে গেছেন। তাছাড়া বিভিন্ন পূজায় অন্যান্য দেবদেবী খুব সংক্ষেপে পূজা পায়। গণেশ, ইন্দ্রাদি দেবতা সকল সংক্ষেপে বিভিন্ন পূজায় স্মরণ করা হয়। লক্ষ্মী, সরস্বতী, বিশ্বকর্মা এবং কার্তিকপূজার ধূম বর্ধমান জেলায় দেখা গেলেও - এই সকল দেবদেবী বর্ধমান জেলায় কোন পৃথক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্ম দিতে পারে নি। গৃহে অর্থাদি লাভ ও সুখসমৃদ্ধির জন্য লক্ষ্মীপূজা , বিদ্যাদি লাভের জন্য সরস্বতী পূজা হয়। বিভিন্ন কলকারখানায় ও ব্যবসাজীবি প্রতিষ্ঠানে বিশ্বকর্মা পূজা হয়। তাছাড়া প্রধানতঃ ব্যবসায়ীরা নতুন বছরের সূচনায় অর্থাৎ নববর্ষে কিংবা রামনবমী তিথিতে বা অক্ষয় তৃতীয়ায় গণেশ - লক্ষ্মী পূজা করেন। ভারতবর্ষে বেদ এবং বেদপ্রবর্তিত তন্ত্র সাধনধারা বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্ত সম্প্রদায়ের বিভিন্ন উপাসনা পদ্ধতির নিয়ন্ত্রক। 'দেবীপুরাণ', 'দেবীভাগবত' , 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ', 'মহাভাগবত পুরাণ' প্রভৃতিতে শাক্ত সম্প্রদায়ের পূজা পদ্ধতির বহু তথ্য পাওয়া যায়। বাংলাদেশে প্রচলিত কালীমূর্তির প্রচলন করেন বিখ্যাত তান্ত্রিক সাধক ও তন্ত্রসার গ্রন্থের প্রণেতা কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ। কৃষ্ণানন্দ চৈতন্যদেবের সময়কার। যদিও কালীর মূর্তির রূপ সম্বন্ধে বৈদিক গ্রন্থাদিতে উল্লেখ আছে। দুর্গাপূজা বাংলায় 'বৃহন্নন্দিকেশ্বর' ও 'নন্দিকেশরপুরাণ' দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। 'পদ্মপুরাণ', 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে' বৈষ্ণব ধর্মের পূজা পদ্ধতির তথ্য পাওয়া যায়। তাছাড়া নারদ পঞ্চরাত্র বিখ্যাত বৈষ্ণব গ্রন্থ। বৈষ্ণবদের প্রধান উপজীব্য 'ভাগবৎপুরাণ'।

বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্ত - সবই শ্রুতিমূলক। প্রতিটি ধর্মীয় ধারার একাধিক সম্প্রদায় আছে। ব্রহ্মের স্বরূপ, ব্রহ্মজ্ঞানের ফলে জীবজগতের ব্যবহারিক সত্তা, জীব ও জগতের সঙ্গে ব্রহ্মের সম্পর্ক এবং মুক্তি বিষয়ে নানা বিচারাত্মক জ্ঞান অদ্বৈতাদি বিভিন্ন মতবাদের জন্ম দিয়েছে। এছাড়া উপাসনা ভেদে নানা সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়েছে। শৈব সম্প্রদায় মূলত শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদকে স্বীকার করে। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে আচার্য আনন্দতীর্থ অর্থাৎ মধ্বাচার্য্য প্রচার করেন দ্বৈতবাদ, আচার্য বলদেব বিদ্যাভূষণ 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ' (যা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মতবাদ কারণ প্রকৃতপক্ষে এই মতবাদের স্রষ্টা ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য), দ্বৈতাদ্বৈতবাদের (বেদান্ত দর্শনের 'পারিজাত সৌরভ' ভাষ্য) স্রষ্টা আচার্য নিম্বার্ক যা নিম্বার্ক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের শিরোভূষণ, আচার্য বল্লভাচার্য শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, আচার্য রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বিখ্যাত। শৈববিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রচারক আচার্য শ্রীকণ্ঠ, বীর

শৈব সম্প্রদায়ের শিরোভূষণ আচার্য শ্রীপতির বিশেষাদ্বৈতবাদ। শাক্ত সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে পঞ্চানন ভট্টাচার্যের শাক্তবিশিষ্টা দ্বৈতাবাদ, মহর্ষি হারিতায়নের শাক্তাদ্বৈতবাদ উল্লেখযোগ্য। প্রত্যেকেই মহর্ষি শ্রীমৎকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বাদরায়নের ব্রহ্মসূত্রকে আপন বিচারধারায় ব্যাখ্যা করেছেন। দার্শনিক দৃষ্টিতে মতবাদে বৈপরীত্য থাকলেও যাঁকে প্রতিপাদনের জন্য এই সকল মতবাদের সৃষ্টি সেই বিশ্বাধিপতি পরমেশ্বর সকলেরই একমাত্র লক্ষ্য ও গন্তব্য। আধুনিককালে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, 'সর্ব্বধর্ম্মের লোকেরা একজনকেই ডাকছে' (কথামৃত ৫।৩।১০)। মহাত্মা পুষ্পদন্ত বলেছেন, '.... রুচির বৈচিত্রে মনুষ্যগণ সরল ও বক্র নানা পথে গমন করলেও নদীসমূহের পক্ষে সমুদ্রের মত হে পরমেশ্বর মনুষ্যগণের তুমিই একমাত্র গন্তব্যস্থল' - রুচিনাং বৈচিত্রাদৃজুকুটিল নানা পথ জুষাং, নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব'।

আমরা পরবর্তী পরিচ্ছেদে বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্ত ধর্মীয় ধারার মধ্যে শুধু মাত্র বর্ধমান জেলায় প্রচারিত সম্প্রদায়গুলির উল্লেখ করব।

বর্ধমানে বৈষ্ণব সম্প্রদায়

ভগবান বিষ্ণুর উপাসকদের বৈষ্ণব বলা হয়। যীশুখ্রীষ্টের জন্মের পাঁচশত বছর আগে অষ্টাধ্যায়ী প্রণেতা পাণিনি বাসুদেব উপাসকদের কথা উল্লেখ করেছেন। পতঞ্জলীর রচনাতেও বাসুদেবের উপাসক সম্প্রদায়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। গ্রীকদূত হেলিওদোরাস তক্ষশিলা থেকে পঞ্চম শুঙ্গরাজ ভাগভদ্রের সভায় আসেন। তিনি মধ্যপ্রদেশের বেসনগরে বৃহৎ গরুড়ধ্বজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। হেলিওদোরাস নিজেকে ভাগবত সম্প্রদায়ের বলে পরিচয় দিয়েছিলেন। সাতবাহন রাজবংশের অনেকে বৈষ্ণব ছিলেন।

মহাভারতের বিদুরকে পরম বৈষ্ণব বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি হিসাবে বিষ্ণু বা দামোদরের নাম উল্লেখ করেছেন। আচার্য শঙ্কর ব্যাসবচনের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন 'দামানি লোকমানানি' অর্থাৎ সমুদয় লোক যার উদরে তিনি দামোদর। প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত বেদ,পুরাণ ও তন্ত্র বিষ্ণুর ঈশ্বরত্বকে ঘোষণা করেছে। মহর্ষি নারদ সনকাদি ঋষির কাছে পরমতত্ত্ব উপদেশ পান যা সামবেদীয় ছান্দ্যোগ্যোপনিষদে উক্ত আছে। নারদ, পরাশর ও ঋষিশাণ্ডিল্য ভক্তিসূত্র প্রণয়ন করেন। বিষ্ণুর অন্যতম অবতার হিসাবে শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণকে মান্য করা হয়। বাস্তবিক পৃথিবীর দুই প্রাচীন মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠত্বকে প্রকাশ করেছে।

বাংলার বহুপূর্ব থেকে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারিত ছিল। গুপ্তরাজাদের রাজত্বকালে চন্দ্রবর্মা ছিলেন বাঁকুড়ার পুষ্করণা বা পোকর্ণার (বর্তমান কালে যার নাম পোখরন) রাজা। তিনি নিজেকে বিষ্ণুর উপাসক বলে পরিচয় দিয়েছিলেন। বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড়ে উৎকৃর্ণ লিপি থেকে যা প্রমাণিত হয়। কর্ণসুবর্ণের রাজা বিজয়নাগদেব পরম বৈষ্ণব ছিলেন। চেদীরাজ কর্ণদেব পালসম্রাট নয় পালের ছেলে বিগ্রহপালের সঙ্গে তাঁর মেয়ে যৌবনশ্রীর

বিবাহ দিয়েছিলেন। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন কর্ণদেবের পূর্বেই কর্ণাট বংশীয়দের দ্বারা রামানুজমের প্রচারিত বৈষ্ণব ভক্তিবাদ রাঢ়বঙ্গে প্রচারিত হয়। কবি জয়দেব ছিলেন নিম্বার্ক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। জয়দেব লক্ষ্মণসেনের পাঁচ রত্নের অন্যতম।

শ্রী সম্প্রদায়

প্রচারিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে 'শ্রী' 'ব্রহ্ম', 'রুদ্র' ও 'হংস' - এই চার সম্প্রদায় বিখ্যাত। 'শ্রী' সম্প্রদায়ের স্রষ্টা আচার্য রামানুজম্। তিনি বেদান্তদর্শনের 'শ্রী' ভাষ্য লেখেন। তাঁর প্রচারিত মতকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বলা হয়। রামানুজমের মতে নিত্যমুক্ত, স্বপ্রকাশ ও চৈতন্যস্বরূপ এবং অসংখ্য কল্যাণগুণসমন্বিত পুরুষোত্তম শ্রীবিষ্ণুই হলেন ব্রহ্ম। 'শ্রী' সম্প্রদায়ের মতে বাসুদেব শ্রীবিষ্ণু পরব্রহ্ম হলেও পর, ব্যূহ, বিভব, অন্তর্যামী এবং অর্চ্চাবিতার - এই পাঁচপ্রকার স্বেচ্ছাবিগ্রহধারী। এই সম্প্রদায়ের শঙ্খচক্রাদি দিব্যায়ুধধারী নারায়ণ 'পর' বিগ্রহধারী এবং প্রধান উপাসনার যোগ্য। 'শ্রী' সম্প্রদায়ের উপাসক বর্ধমান জেলায় অত্যল্প হলেও আছে। বর্ধমানের মাণিকচাঁদ যিনি মুর্শিদাবাদের নবাবের দেওয়ান নিযুক্ত হয়েছিলেন ; তিনি এক রামায়েৎ সাধুর কৃপা পান ও সম্ভবতঃ তাঁর কাছ থেকে দীক্ষা নেন। এই রামায়েৎ সাধু শ্রী সম্প্রদায়ের ছিলেন। তাঁর সমাধি বর্ধমান শহরের ময়ূরমহল জায়গায় আছে। তিনি 'সমাধিবাবা' বলে পরিচিত ছিলেন। তাঁর উপাস্য রঘুনাথ শালগ্রাম শিলা আজও পূজা পাচ্ছে। পূজকেরা প্রত্যেকেই 'শ্রী' সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব। বর্ধমানের রাজবংশের মধ্যে 'শ্রী' সম্প্রদায়ের প্রভাব ছিল। আরাধ্য 'লক্ষ্মীনারায়ণ জীউ' তার প্রমাণ তাছাড়া বর্ধমানের বিভিন্ন জায়গায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সময়েও রাজার অর্থানুকুল্যে লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়।

নিম্বার্ক সম্প্রদায়

আচার্য নিম্বার্ক বা নিম্বাদিত্য বা নিয়মানন্দাচার্যের প্রচারিত বৈষ্ণব সম্প্রদায় হংস নামে পরিচিত হলেও কালক্রমে তা 'নিম্বার্ক' সম্প্রদায় বলে অধিক বিখ্যাত।[৬৩] পূজ্যপাদ নিম্বাকাচার্য বেদান্তদর্শনের 'পারিজাত সৌরভ' নামক ভাষ্য রচনা করেন। এনার সময়কাল নিয়ে নানা মতভেদ আছে। কারও মতে ১১শ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। এই সম্প্রদায় আদি আচার্য হিসাবে শ্রী শ্রী হংস ভগবানকে মনে করেন। তাঁদের মতানুযায়ী স্বয়ং ভগবান আজন্ম ব্রহ্মচারী চার ব্রহ্মপুত্র সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার ঋষিদের পরমার্থ বিদ্যা দান করেন। পরে সনকাদি ঋষির কাছ থেকে মহর্ষি নারদ এই জ্ঞান লাভ করেন। নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের মতে নিম্বাকাচার্য মহর্ষি নারদের শিষ্য। তিনি 'শ্রীভগবৎ চক্রাবতার' রূপে সাধু সমাজে পরিচিত। সপ্তদশ শতকের শেষ দিকে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের নরহরি দেবাচার্য বর্ধমানের কাঞ্চননগরে সর্বপ্রথম আসেন এবং বাঁকা নদীর তীরে আশ্রম বা 'অস্থ্যল' প্রতিষ্ঠা করেন। এই সম্প্রদায় রাধাকৃষ্ণের। যুগলমূর্তির পূজা করতেন যা 'রাধাদামোদর জীউ' বলে পরিচিত। তবে নরহরি দেবাচার্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শিলা বিগ্রহ এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত মন্দিরটির নাম ছিল 'দাউজী মন্দির'। তবে বর্তমানে বর্ধমানের মহন্ত অস্থলে যে মন্দির

দেখতে পাওয়া যায় তার প্রতিষ্ঠাতা শ্রী মধুসূদন শরণ দেবাচার্য্য। তিনি পূর্বের মন্দিরকে অনেক সুচারুরূপে তৈরী করেন। তখনকার দিনে দু'লক্ষ টাকা ব্যয় করেন।[৬৪] তাঁর প্রতিষ্ঠিত শ্বেতপাথরের শিলালিপি থেকে বর্ধমানের নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের পীঠাধীশব্দের নাম পাওয়া যায়। তাঁরা হলেন যথাক্রমে শ্রীনরহরি দেবাচার্য্য, শ্রী সুখদেব দেবাচার্য্য, শ্রী গোপাল দেবাচার্য্য, শ্রী বসন্ত দেবাচার্য্য, শ্রী উদ্ভব দেবাচার্য্য, শ্রী পুরুষোত্তম দেবাচার্য্য, শ্রী গোপাল শরণ দেবাচার্য্য এবং শ্রী গিরিধারী দেবাচার্য্য। শ্রী মধুসূদন দেবাচার্য্য হলেন নবম পীঠাধীশ। এই মন্দিরে ভাগবৎ এর অনেক শ্লোক খোদিত আছে। মন্দিরের ভিতর একসময় শ্রীশ্রী রাধাদামোদর জীউ - এর অষ্টধাতুর মূর্তি ছিল। এছাড়া এখন শ্রীহংসভগবান, নিম্বাকাচার্য্য, নিরাসাচার্য্য, গরুরভগবান, রাম-লক্ষণ ও সীতাদেবী, মহাবীর হনুমানের শ্বেতপাথরের মুর্তি অবহেলায় পড়ে নষ্ট হচ্ছে। এছাড়া এখনও আছে মধুসুদন দেবাচার্য্যের একটা মূর্তি। আছে সিদ্ধিদাতা গণেশের দশভূজা মূর্তি। মন্দিরের ভিতর বিষ্ণুর দশঅবতার আজ সবই অবহেলায় পড়ে নষ্ট হচ্ছে। দশম মহান্ত ছিলেন মনোহর দাস। একাদশ মহান্ত সর্বেশ্বর শরণ দেবাচার্য্যের মৃত্যুর পর মহান্ত অস্থ্যল এখন অতীত ইতিহাসের স্মৃতিমাত্র। বর্ধমানের পাণ্ডবেশ্বরে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের কয়েকজন সন্ন্যাসী আছেন। পাণ্ডবেশ্বরে পঞ্চপাণ্ডবের প্রতিষ্ঠিত ছয়টি শিবমন্দিরের পূজা এদের দ্বারাই এখনও নির্বাহ হয়।

অণ্ডাল থানার 'উখরা' গ্রামে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। বর্ধমানের নরহরি দেবাচার্য তাঁর শিষ্য দয়ারামকে উখরায় পাঠান। দয়ারাম দেব উখরায় অস্থ্যল বা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। আশ্রমে গোপাল বিগ্রহ স্থাপিত হয়। বর্ধমানের রাজা কীর্তিচাঁদ দয়ারাম দেবকে ২৫১ বিঘা জমি দান করেন। পরবর্তীকালে মহান্ত মনসারাম দাস (১২২০খ্রীষ্টাব্দ) শ্রীবৃন্দাবন চন্দ্রের মন্দির নির্মাণ করেন। চৈতন্যপ্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সৃষ্টির আগে রাঢ় বঙ্গে নির্ম্বাক সম্প্রদায়ের প্রাধান্য ছিল। তাছাড়া চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রকাশের আগে রাঢ় বাংলায় বৈষ্ণবধর্মের দুটি মুলমাত্রা ছিল। একটি ছিল পঞ্চপাসনার সঙ্গে যুক্ত বৈষ্ণবীয় ক্রিয়াকাণ্ড এবং দ্বিতীয়টি বৈষ্ণবগান ও কবিতা। পৌরাণিক বৈষ্ণব ক্রিয়াকাণ্ডের প্রচলনের জন্য স্মৃতিশাস্ত্র রচিত হয়। বৈষ্ণবীয় পূজাপদ্ধতি সম্বন্ধে স্মৃতিনিবন্ধ রচনা করেন অনিরুদ্ধ ভট্ট, এবং হলায়ুধ।[৬৫] সকল বৈষ্ণব সম্প্রদায়ই পঞ্চরাত্র অনুসরণ করত। মহাভারতের শান্তিপর্বে নারদীয় অধ্যায়ে এই মতের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভীষ্ম পর্বের[৬৬] অধ্যায়ে সাত্ত্বতবিধির আলোচনা আছে। পঞ্চরাত্র বিধি মহাভারত থেকেও প্রাচীন। পঞ্চরাত্র ছাড়া ভাগবত পুরাণ বৈষ্ণবদের কাছে অত্যন্ত মান্য গ্রন্থ। ব্রহ্মসূত্রের মত ভাগবতপুরানের মাধ্বভাষ্য, নিম্বার্কভাষ্য, হনুমদ্ভাষ্য এবং চিৎসুখভাষ্য আছে। ভাগবতের উপর বল্লভ ভট্টের লেখা 'বালবোধিনী' ব্যাখ্যা প্রচলিত ছিল। এছাড়া 'সুবোধিনী', 'বীররাঘব', 'বিজয়ধ্বজ', 'চূর্ণিকা', 'শুকপক্ষ' প্রভৃতি ব্যাখ্যা প্রচরিত ছিল। শ্রীধরস্বামীর 'ভাবার্থদিপিকা' এবং বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 'সারার্থদর্শিনী' টীকা বৈষ্ণব সমাজের কাছে আদরণীয় ছিল। শ্রীধরস্বামীর টীকা স্বয়ং চৈতন্যমহাপ্রভু ভীষণ মান্য করতেন। বৈষ্ণবগান ও কবিতার প্রভাব বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' সর্ব্বাপেক্ষা

উল্লেখযোগ্য। এছাড়া চতুর্ভুজ ভট্টাচার্যের 'হরিচরিতকাব্যম্', মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কৃতিত্বের দাবীদার।

রুদ্রসম্প্রদায় শুদ্ধাদ্বৈতবাদী। এই বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের প্রধান আচার্য বল্লভাচার্য এবং বিষ্ণুস্বামী। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বল্লভাচার্যের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু এবং তাঁর কয়েকজন ভক্তবৃন্দের মিলনের উল্লেখ আছে। চৈতন্যমহাপ্রভু যখন প্রয়াগে ছিলেন তখন বল্লভাচার্য তাঁকে দর্শন করতে আসেন।[৬৩] তিনি সপার্ষদ চৈতন্যদেবকে আড়াইলে নিয়ে যান এবং মহাপ্রভুর পা ধুইয়ে দেন ও সকলে মিলে পাদোদক পান করেন। নীলাচলেও বল্লভাচার্যের সঙ্গে চৈতন্য প্রভুর সাক্ষাৎ হয়। বল্লভাচার্য প্রথমে বাৎসল্যরসে শ্রীকৃষ্ণ ভজনা করতেন এবং বাল-গোপাল মন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহের সেবা করতেন। চৈতন্য পার্ষদ গদাধর গোস্বামীর সঙ্গলাভে তাঁর মধ্যে মধুর রস আস্বাদনের প্রবৃত্তি জন্মায় তখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ নিয়ে তিনি শ্রীগদাধর পণ্ডিতের কাছে কিশোর-গোপাল মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহন করেন। বিষ্ণুস্বামী বা বিষ্ণুপুরী সম্ভবতঃ বিহারের দ্বারভাঙ্গা জেলার মধুবনীর অন্তর্গত তরৌনী গ্রামে জন্মগ্রহন করেন। কারওমতে বিষ্ণুস্বামী চৈতন্যের সমসাময়িক। বিষ্ণুস্বামী 'শ্রীমদ্ভাগবত' থেকে চারশ শ্লোকনির্বাচন করেন। যাইহোক্ বল্লভাচার্য সম্প্রদায়ের (রুদ্র সম্প্রদায়) কোন প্রভাব রাঢ় বঙ্গে, বিশেষতঃ বর্ধমান জেলায় দেখা যায়নি।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়

শুধু রাঢ় বাংলা নয়, সমগ্র বঙ্গদেশ চৈতন্য প্রেম-বন্যায় ভেসে গেছে। বাংলার গ্রামে গ্রামে বিষ্ণুপূজা ও বিষ্ণুমন্দির নির্মাণ চৈতন্য আর্বিভাবের ফল। বর্ধমান সহ সমস্ত রাঢ়-বঙ্গে চৈতন্য প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রসারের কথা আলোচনার পূর্বে আমরা একটি ঐতিহাসিক বিচারে প্রবৃত্ত হচ্ছি। প্রায় সকল পণ্ডিতের ধারণা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় মধ্বসম্প্রদায়ের (ব্রহ্ম সম্প্রদায়) অন্তর্ভুক্ত। আমরা এই বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করি। এক্ষেত্রে আমরা বৈষ্ণব শাস্ত্রের প্রখ্যাত পণ্ডিত ও সাধক ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্তকে অনুসরণ করছি। ডঃ মুখোপাধ্যায় এই বিষয়ে গুণীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

(১) চৈতন্য মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে মধ্বসম্প্রদায়ের এক আচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তত্ত্ববাদী আচার্যের কাছে অতি দীনভাবে বৈষ্ণবের সাধ্যসাধন বিষয়ে জানতে চান। বর্ণাশ্রমধর্ম কৃষ্ণে সমর্পণ এবং পঞ্চবিধ মুক্তির ফলে বৈকুণ্ঠ গমণের কথা আচার্য বললে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তার প্রতিবাদ করেন। শাস্ত্র থেকে প্রমাণ দেখিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তত্ত্ববাদী আচার্যকে বলেন যে শ্রবণ কীর্ত্তণ, কৃষ্ণপ্রেম, সেবা বৈষ্ণবের কর্তব্য। বৈষ্ণবভক্ত পঞ্চবিধ মুক্তি ত্যাগ করেন।

'কর্ম্মমুক্তি দুই বস্তু ত্যজে ভক্তগণ।
সেই দুই স্থাপ তুমি সাধ্যসাধন।।
এইত' বৈষ্ণবের নহে সাধ্যসাধন।
সন্ন্যাসী দেখিয়া আমারে করহ বঞ্চন।।'[৬৪]

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের যুক্তি ভট্টাচার্য মেনে নিয়ে বলেন যে মধ্বাচার্য যেহেতু ওই

নিয়ম নিবদ্ধ করেছেন ফলে এই সম্প্রদায়ের কাছে তাই মান্য। তখন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মধ্বসম্প্রদায়ের নিন্দা করে বলেন যে,-

'প্রভুকহে কর্ম্মী জ্ঞানী দুই ভক্তিহীন।
তোমার সম্প্রদায় দেখি সেই দুই চিহ্ন।।
সবে এক গুণ দেখি তোমার সম্প্রদায়।
সত্যবিগ্রহ করি ঈশ্বরে করহ নিশ্চয়।।'[৬৮]

যদি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মধ্বসম্প্রদায়ভুক্ত হবেন তাহলে কি করে নিজের সম্প্রদায়ের নিন্দা করলেন? তাছাড়া ভট্টাচার্যকে বলেছেন 'তোমার সম্প্রদায়'। শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 'যদি কেহ বলেন, শ্রীমন্‌মহাপ্রভু যেমন শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ পূর্বক শ্রীপাদ কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহন করিয়াছিলেন, তেমনই শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী হয়ত পূর্বে মধ্ববসম্প্রদায়ে দীক্ষা লইয়া পরে পুরী সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস লইয়াছিলেন। তাহার উত্তরে বলিতে হয় - তত্ত্ববাদী মঠে কোন গৃহী শিষ্য হইলে তাহার 'আচার্য' উপাধি হয়। আর তত্ত্ববাদী সম্প্রদায়ে সন্ন্যাসীদের দুইটি ধারা - একটি ব্যাসকূট, অপরটি দাসকূট। ব্যাসকূট ধারার সন্ন্যাসী মাত্রেই হন 'তীর্থ' উপাধীধারী, আর দাসকূট ধারার সকলেই 'দাস' উপাধি পাইয়া থাকেন। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী মধ্বসম্প্রদায়ে যে সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করেন নাই, তাহার প্রমাণ তিনি মাধবেন্দ্র তীর্থ নহেন তিনি মাধবেন্দ্রপুরী। আর গৃহী থাকাকালে তিনি এই মঠে শিষ্য হইলে, লোকে তাহাকে মাধব আচার্য বলিত। কারণ এই মঠে শিষ্য হইলে গৃহীগণের আচার্য উপাধি হয়।'[৬৯]

(২) মধ্ব সম্প্রদায়ের কাছে দ্বারকার অষ্টমহিষী, ব্রজগোপীগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভক্ত। মহিষীগণ থেকে যশোদা শ্রেষ্ঠ,যশোদা থেকে শ্রেষ্ঠ হলেন দেবকী, দেবকী থেকে বসুদেব শ্রেষ্ঠ ; তবে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তমের ভক্ত ব্রহ্মা । অথচ চৈতন্য প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কাছে ব্রজগোপীদের প্রেম সর্বশ্রেষ্ঠ। গোদাবরী তীরে রায় রামানন্দের সঙ্গে চৈতন্য মহাপ্রভুর আলাপাদি থেকে এ বিষয়ে বিস্তৃত জানা যায়। চৈতন্যের প্রশ্নের উত্তরে রায় রামানন্দ বলেন, 'রাধার প্রেম সাধ্য শিরোমণি'। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর লেখা 'প্রেমাম্ভোজ মকরন্দ' স্তোত্রের অনুবাদে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন যে, রাধার প্রেম সর্বশ্রেষ্ঠ -'কৃষ্ণের প্রেয়সী শ্রেষ্ঠা জগতে বিদিত' ।অথচ মধ্ব সম্প্রদায় এর বিপরীত কথাই বলে। সাহিত্য রত্ন ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 'মূঢ়তাবশত অন্যায় জেদের বশবর্তী হইয়া যাঁহারা বলেন শ্রীচৈতন্য সম্প্রদায় মধ্ব-সম্প্রদায় ভুক্ত তাঁহারা এই সমস্ত তথ্য বিচার করেন না। মধ্ব গোপীগণকে স্বর্বেশ্যার সঙ্গে, অপ্সরাগণের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। ইহা গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের চক্ষে অমার্জনীয় অপরাধ। শ্রী মহাপ্রভু যদি মধ্ব সম্প্রদায়ের শিষ্য হইতেন, তাহা হইলে তিনি কখনো শ্রীরাধার এই শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করিতেন না।..... মধ্ব সম্প্রদায়ভুক্ত হইলে শ্রীপাদ স্বরূপ , শ্রীসনাতন , শ্রীরূপ, শ্রীজীব, শ্রীরঘুনাথ দাস, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রভৃতি মহাপ্রভুর অনুবর্তিগণ শ্রীরাধার তথা গোপীগণের মহিমা প্রকাশে এমন উচ্চকণ্ঠ হইতেন না। গোপীগণ যে শ্রীরাধার কায়ব্যূহ, ইহা আচার্যগণ -

স্বীকৃত একটি স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত।'[৭০]

(৩) মধ্ব সম্প্রদায় পরকীয়া ভজনকে হেয় করেছেন অথচ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কাছে পরকীয়া তত্ত্ব প্রধান উপজীব্য।

(৪) শ্রীমধ্ব সম্প্রদায় শ্রীমদ্‌ভাগবতের ব্রহ্মমোহন লীলাগ্রহণ করেননি অথচ গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের কাছে সমগ্র শ্রীমদ্‌ভাগবত সর্বাপেক্ষা আদরণীয়।

এছাড়াও বহু যুক্তি উপস্থাপনা করে শ্রদ্ধেয় শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রমাণ করেছেন যে বঙ্গদেশে চৈতন্যপ্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম মধ্বসম্প্রদায় ভুক্ত নয়। বাংলাদেশে যে বৈষ্ণবধারা সর্বাপেক্ষা প্রবল সেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় প্রচারিত চারটি প্রধান বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কোনটিরই অন্তর্ভুক্ত নয়। শ্রীগৌরাঙ্গ গয়াধামে শ্রীঈশ্বরপুরীর কাছে দশাক্ষর গোপাল মন্ত্র লাভ করেন। শ্রীঈশ্বরপুরী কুমারহট্টের বাঙালী ছিলেন। শ্রীঈশ্বরপুরী শ্রীপাদ্‌মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য। ফলে চৈতন্য প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে মাধবেন্দ্র সম্প্রদায় বলা যায়, মধ্ব সম্প্রদায় নয়। 'শ্রীপাদ রূপগোস্বামী এই সম্প্রদায়কে রসিক সম্প্রদায় বলিয়াছেন। ইহাও যথার্থ কথন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় সত্যই রসিক সম্প্রদায়।'[৭১] তাছাড়া কবিকর্ণপুরের 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকেও চৈতন্য সম্প্রদায়ের মূল হিসাবে আচার্য যতিমুকুটমণি মুনীন্দ্র শ্রীমাধবাখ্য অর্থাৎ শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীকে বলা হয়েছে, শ্রীঅদ্বৈতাচার্যকে সেই মূলের প্রথম অঙ্কুর বলা হয়েছে। উক্তিটি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ কারণ বঙ্গদেশে মাধবেন্দ্র সম্প্রদায়ের শুরু হয় শ্রীঅদ্বৈত আচার্যকে দিয়ে। চৈতন্যের জন্মের বহু আগে শ্রীপাদ্‌মাধবেন্দ্রপুরী বঙ্গদেশে এসে শ্রী অদ্বৈত আচার্যকে দীক্ষা দেন। নবদ্বীপের শ্রীবাসপণ্ডিত, চট্টগ্রামের পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, শ্রীহট্টের পদ্মনাভ চক্রবর্তী মাধবেন্দ্র পুরীর দীক্ষিত। এমনকি মুকুন্দ দত্ত, শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীধর প্রভৃতিও মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য ছিলেন বলে অনেকে অনুমান করেন।

গয়ায় বিষ্ণুর পাদপদ্মে পিতা জগন্নাথ মিশ্রের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করতে গিয়ে নবদ্বীপের নিমাই পণ্ডিতের মধ্যে কৃষ্ণভাব আশ্রয় করে। সেখানেই ঈশ্বরপুরীর কাছে দশাক্ষর গোপালমন্ত্রে দীক্ষা পান। যে আধ্যাত্মিক প্রেম দেখা দিল নিমাই পণ্ডিতের জীবনে তার চরম পরিণতি ঘটল বর্ধমান জেলার কাটোয়ায় তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণের মাধ্যমে। কাটোয়ায় শ্রীপাদ কেশবভারতীর কাছ থেকে (১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে) সন্ন্যাস গ্রহণ করে তিনি রূপান্তরিত হলেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে। কৃষ্ণ দর্শনের জন্য ব্যাকুল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। যেতে চান শ্রীবৃন্দাবনে। কৃষ্ণপ্রেমে পাগল নবদ্বীপচন্দ্র বৃন্দাবনে যেতে গিয়ে ভ্রমে এলেন রাঢ়দেশে । তিনি শ্রীপাদনিত্যানন্দ, আচার্য চন্দ্রশেখর এবং মুকুন্দের সঙ্গে রাঢ়দেশ পরিভ্রমণ করলেন। চৈতন্য পূর্বযুগ থেকে বর্ধমানের কুলীনগ্রাম বৈষ্ণবচর্চার কেন্দ্ররূপে পরিচিত ছিল। চৈতন্য মহাপ্রভু কুলীনগ্রামের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন ঃ

> 'কুলীন গ্রামের ভাগ্য কহনে না যায়।
> শুকর চরায় ডোম সেহ কৃষ্ণ গায়।' — চৈতন্যচরিতামৃত

রাঢ়বঙ্গ সহ সমগ্র বঙ্গদেশে বৈষ্ণব ধর্ম প্রসারে মুখ্যভূমিকা নেন শ্রীপাদ্ অদ্বৈত ও শ্রীপাদ নিত্যানন্দ। শ্রীবৃন্দাবনে থাকাকালে প্রধান গোস্বামীগণ অনুভব করেন যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মতাদর্শ ও কর্মকাণ্ডকে একটি বিশিষ্ট রূপ দান না করলে শুধু ভক্তির আবেগে অভিজাত শ্রেণীকে প্রভাবিত করা সম্ভব হবে না। সেজন্য দক্ষিণী ব্রাহ্মণ গোপাল ভট্ট 'হরিভক্তি বিলাস' রচনা করেন যা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের স্মৃতিশাস্ত্ররূপে গ্রাহ্য হল। গোপাল ভট্ট সনাতন গোস্বামীর সাহায্যে এই গ্রন্থটি রচনা করেন। গোপাল ভট্টের দৃষ্টিভঙ্গি ভীষণ রক্ষণশীল যা চৈতন্যমহাপ্রভুর উদার চেতনার থেকে অনেকক্ষেত্রে পরিপন্থী। যাইহোক, চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন, পুরীতে অবস্থানকালে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত আচার্যকে বাংলায় কৃষ্ণভক্তি প্রচার করতে আদেশ দেন ঃ

'আচার্য্যের আজ্ঞা দিলা করিয়া সন্মান।
আচণ্ডাল আদি দিত্ত কৃষ্ণভক্তিদান।।
নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিলা যাহ গৌড়দেশে ।
অনর্গল প্রেম ভক্তি, করিও প্রকাশে ।।' — চৈতন্যচরিতামৃত

অদ্বৈত আচার্যের সেই সময় বয়স প্রায় ছিয়াত্তর কারণ চৈতন্যের জন্মকালেই তাঁর বয়স বাহান্ন ছিল। আচার্য ঐরকম বৃদ্ধবয়সেও বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। বৈষ্ণবগণ বলেন যে, অদ্বৈতের হুংকারে চৈতন্যের আবির্ভাব। লোচনদাসের পদে সে কথার উল্লেখ আছে - 'ও বুঢ়া গৌরাঙ্গ এনেছে।/ দেখিব দেখিব দেখিব বড় সাধটি লেগেছে।'[৭২] কৃষ্ণদাস কবিরাজ অদ্বৈত আচার্যকে চৈতন্যের 'অংশ অবতার' বলেছেন। অদ্বৈতাচার্যের মোট তেতাল্লিশ জন অনুগামী ছিল। বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মপ্রসারে এক একটি পরিবারের অবদান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। অদ্বৈত আচার্যের স্ত্রী সীতা ঠাকুরাণী এবং পুত্র অচ্যুতানন্দ, কৃষ্ণমিশ্র ও গোপালের অবদান উল্লেখের দাবী রাখে। অচ্যুতানন্দ কৃষ্ণদাস কবিরাজের স্বীকৃতি লাভ করেন।

'অচ্যুতের যেই মত সেই মত সার
আর যত মত সব হৈল ছারখার।' — চৈতন্যচরিতামৃত

অচ্যুতানন্দ বিয়ে করেননি। অচ্যুতানন্দের এক ভাই কৃষ্ণমিশ্রের বংশধরেরা মালদহে ও শান্তিপুরের মদনগোপাল পাড়ায় বসবাস করতেন। অদ্বৈত আচার্যের অন্যান্য অনুগামীদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন যদুনন্দন আচার্য, পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী, কানু পণ্ডিত, হৃদয়ানন্দ সেন, নারায়ণ দাস, নন্দনী, অনন্ত দাস, হরিচরণ ও বনমালী কবিচন্দ্র।[৭৩] অদ্বৈত শাখা ঢাকা মালদহ, বগুড়া, পাবনা, হুগলী, শ্রীহট্ট, নদীয়া সহ বর্ধমান জেলাতেও বৈষ্ণব ধর্ম প্রসারে উদ্যোগী হন। কুলীনগ্রামের কাছে নবগ্রামে অদ্বৈত আচার্যের আর এক পুত্র শ্যামাদাস আচার্যের একটি 'শ্রীপাট' প্রতিষ্ঠা করেন।[৭৪] শ্যামদাসের প্রচারের ফলে পালসিট, ভৈটা, বিজুর, মাতসর, রানাপাড়া, কেশবপুর, শিঙারকোণ প্রভৃতি গ্রামে বৈষ্ণব ধর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ

করে। এখানকার সকল শ্রেণীর মানুষ বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেন। প্রাথমিক উৎপাদক যারা যেমন; চাষী, জেলে, কামার, কুমোর প্রভৃতিরা বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেন। যবন হরিদাস কুলীনগ্রামে এসেছিলেন।

বঙ্গে বৈষ্ণবধর্ম প্রসারে সবচেয়ে বড় ভূমিকা অবশ্যই শ্রীপাদ নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর। নিত্যানন্দ অবধূত ছিলেন। তিনি সকলের সঙ্গে খুবই অন্তরঙ্গভাবে মিশতেন। স্বয়ং চৈতন্য মহাপ্রভু কিন্তু সন্ন্যাসীরূপে খুব সাবধানে থাকতেন। রায় রামানন্দকে তিনি বলেছিলেন,

আমি মনুষ্য আশ্রমে সন্ন্যাসী।
কায়মনোবাক্যে ব্যবহারে ভয়বাসি।।
শুক্ল বস্ত্রে মসিবিন্দু যৈছে না লুকায়।
সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র সর্বলোকে গায়।। — চৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভু বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে 'দ্বাদশ গোপাল'পদ সৃষ্টি করেন। এই 'গোপাল'দের মধ্যে ন'জন ব্রাহ্মণ , দু'জন বৈদ্য এবং একজন বৈশ্য ছিলেন। এই দ্বাদশ গোপালের মধ্যে তিনজন ছিলেন বর্ধমানের। বর্ধমানের শীতলগ্রামের ধনঞ্জয় পণ্ডিত, অম্বিকাকালনায় গৌরীদাস পণ্ডিত এবং আকাইহাটের কালাকৃষ্ণদাস। দ্বাদশ গোপাল যথাক্রমে[৭৫] ঃ

নাম	জাতি	শ্রীপাট	জেলা
১. অভিরাম রামদাস	ব্রাহ্মণ	খানাকূল	হুগলি
২. সুন্দরানন্দ ঠাকুর	ব্রাহ্মণ	মহেশপুর	যশোহর
৩. ধনঞ্জয় পন্ডিত	ব্রাহ্মণ	শীতলগ্রাম	বর্ধমান
৪. গৌরীদাস পন্ডিত	ব্রাহ্মণ	অম্বিকাকালনা	বর্ধমান
৫. কমলাকার পিপ্লাই	ব্রাহ্মণ	মাহেশ	হুগলি
৬. উদ্ধারণ দত্ত	বৈশ্য	সপ্তগ্রাম	হুগলি
৭. মহেশ পন্ডিত	ব্রাহ্মণ	পালপাড়া	নদীয়া
৮. পুরুষোত্তম দাস	বৈদ্য	চাঁদুরে	নদীয়া
৯. পরমেশ্বর দাস	বৈদ্য	আটপুর	হুগলি
১০. কালাকৃষ্ণ দাস	ব্রাহ্মণ	আকাইহাট	বর্ধমান
১১. শ্রীধর	ব্রাহ্মণ	নবদ্বীপ	নদীয়া
১২. হলায়ুধ ঠাকুর	ব্রাহ্মণ	রামচন্দ্রপুর	নদীয়া

(দ্রষ্টব্য ঃ গোপীজন বল্লভদাস,'রসিকমঙ্গল', তমলুক)

'দ্বাদশ গোপাল' - এর পর 'দ্বাদশ উপগোপাল'[৭৬] পদ সৃষ্টি হয়। বারোজন উপগোপালের মধ্যে বেলুনের শিবয় এবং ঝামটপুরের বিষ্ণাই - বর্ধমানের এই দুইজন। এছাড়া নিত্যানন্দের বংশধরেরা ও শিষ্য - প্রশিষ্যরা বর্ধমান জেলার বিভিন্ন স্থানে 'শ্রীপাট' গড়ে

তোলেন। নিত্যানন্দ বর্ধমানের অম্বয়া, নৈহাটী, উদ্ধারণপুর গ্রামে গিয়ে স্বয়ং ভক্তিধর্ম প্রচার করেন। তিনজন 'গোপাল' এবং দাস গদাধর নিত্যানন্দের আদেশে বর্ধমান জেলায় বিশেষ সক্রিয় ছিলেন। নিত্যানন্দের স্ত্রী জাহ্নবাদেবী শতাধিক কৃষক প্রজাসহ বর্ধমানের ভূম্যধিকারী চন্দ্রমণ্ডলকে দীক্ষা দেন।[৭৭] অম্বিকাকালনার গৌরীদাস পণ্ডিত নিত্যানন্দের খুড়া শ্বশুর ছিলেন এবং গদাধর পণ্ডিতের আত্মীয় হৃদয় চৈতন্যকে তিনি দীক্ষা দেন।

হরিদাস দাসের লেখা 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান'-এর দ্বিতীয় খণ্ডে বর্ধমান জেলার ৭৬টি শ্রীপাটের বর্ণনা আছে। অধিকাংশ বৈষ্ণব পদাবলীর রচনাকার বর্ধমান জেলার। জয়ানন্দ ('চৈতন্যমঙ্গল'), নরহরি সরকার, জ্ঞানদাস, লোচনদাস, ঘনশ্যাম, রঘুনন্দন, পীতাম্বর, জগদানন্দ, গোবিন্দ ঘোষ, চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়, শশীশেখর, কবি রঞ্জন, কবিচন্দ্র কবিশেখর যদুনন্দন, গোকুলানন্দ, নিত্যানন্দ দাস, রামগোপাল দাস, নয়নানন্দ কবিরাজ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।মেদিনীপুর জেলার শ্যামানন্দ প্রথমে কালনার হৃদয় চৈতন্যের কাছে দীক্ষা নেন। শ্যামানন্দের উল্লেখযোগ্য শিষ্যদের মধ্যে ছিলেন পাঠান শাসক শের খাঁ। শের খাঁ বৈষ্ণব হয়েছিলেন। শ্যামানন্দ শের খাঁ - এর সাহায্যে আলমগঞ্জ,নৈহালী, বড়কোলা, নৃসিংহপুর, গোবিন্দপুর, শ্যামসুন্দরপুর, ধারেন্দা ও গোপীবল্লভপুরে বৈষ্ণব উৎসব করেন। গোপীবল্লভপুরের অনুষ্ঠানে অদ্বৈতপন্থী শিষ্যরা, দ্বাদশ গোপালের শিষ্যগণ এবং গৌরীদাস পণ্ডিতের নাতজামাই হৃদয়চৈতন্য ও বাঁকুড়ার সোনামুখীর আউল মনোহার দাস যোগ দিয়েছিলেন।[৭৮]

শ্রীখণ্ডে 'গৌরনাগরবাদের 'প্রবক্তা ঠাকুর নরহরি সরকার। বর্ধমানে বৈষ্ণব ধর্ম প্রসারে তাঁর ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নরহরি সরকারের শিষ্য চৈতন্যমঙ্গল প্রণেতা লোচন দাস। লোচন দাসের শ্রীপাট ছিল কোগ্রামে। একব্বরপুর, আকাইহাট, এড়ুগ্রাম, কুলাইগ্রাম,তকিপুর, গঙ্গানগর, কাটোয়া প্রভৃতি অঞ্চলে নরহরি সরকারের শিষ্যদের দ্বারা বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারিত হয়।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও বৃন্দাবন দাস উভয়েই বর্ধমান জেলার মানুষ। আচার্য পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির শিষ্য গদাধর পণ্ডিত, লোকনাথ গোস্বামীর শিষ্য নরোত্তম ঠাকুর, বৃন্দাবন দাসের শিষ্য সনাতন দাস, শ্যামানন্দের শিষ্য রসিকানন্দ, রসিকানন্দের শিষ্য শ্রী মোহনানন্দ আচার্য বর্ধমান জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্ম প্রসারে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন।[৭৯]

বর্ধমান জেলার বিখ্যাত বিভিন্ন বৈষ্ণব কেন্দ্রগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নীচে দেওয়া হল

(১) অভিরামপুর (থানা : আউসগ্রাম)

শ্রীচৈতন্য পার্ষদ গদাধর পণ্ডিতের শাখার ধ্রুবানন্দের শ্রীপাট আছে। ধ্রুবানন্দের পূর্বাশ্রমের নাম শিবানন্দ। গয়া যাত্রার সময় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শিবানন্দের ঘরে যান। এই গ্রামে ধ্রুবানন্দের প্রতিষ্ঠিত বিজয়গোবিন্দ বিগ্রহ আছে যা তিনি রাধা ও অনুরাধাসহ বৃন্দাবন থেকে আনিয়েছিলেন।

(২) আউরিয়া (থানা ঃ কাটোয়া)

কেশব ভারতীর জন্মস্থান। মাঘ মাসের ভীম একাদশী তিথিতে তাঁর আবির্ভাব বলে এখানে একটি মেলা হয়। ঐ মেলায় বহু কীর্তনীয়া যোগ দেন।

(৩) আউসা (থানা ঃ মেমারী)

গোপাল জীউ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। কমলাকান্তের 'সাধকরঞ্জন' পুঁথিতে আউসা গ্রামকে 'গোবিন্দঘাট' বলা হয়েছে -

'শ্রীপাদ গোবিন্দ ঘাট গোপালের স্থান।
প্রভু চন্দ্রশেখর গোস্বামী মহাজন।।'

(৪) আকাইহাট (থানা ঃ কাটোয়া)

শ্রীপাদ নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর অন্যতম দ্বাদশ গোপাল কালাকৃষ্ণ দাসের 'শ্রীপাট' আছে। শ্রীকালাকৃষ্ণ দাস নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ করেন। এখানে কালাকৃষ্ণদাসের সমাধি আছে। কালাকৃষ্ণদাসের প্রতিষ্ঠিত গোপীনাথ বিগ্রহ বর্তমানে কড়ুইগ্রামে প্রতিষ্ঠিত। শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর তাঁর 'শাখা নির্ণয়' গ্রন্থে আকাইহাটে রঘুনন্দনের পায়ের নূপুর পড়েছিল বলে লিখেছেন। যে স্থানে নূপুর পড়েছিল তার নাম 'নূপুর কুণ্ড'।

(৫) আমাইপুর (বর্ধমান শহরের নিকটবর্তী, বর্তমানে লুপ্ত)

বর্ধমানের রায়ানগ্রামের কাছে রামাইপুরকে অনেকে 'আমাইপুর' বলেন, কিন্তু সে সম্বন্ধে কোন নিশ্চিত প্রমাণ নেই। 'চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থ প্রণেতা জয়ানন্দ মিশ্র আমাইপুরে জন্ম নেন। জয়ানন্দ গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন। জয়ানন্দের বাবা সুবুদ্ধি মিশ্র চৈতন্যের ছাত্র ছিলেন। চৈতন্যদেব নীলাচল থেকে ফেরার সময় সুবুদ্ধি মিশ্রের বাড়ী যান কোন এক জ্যৈষ্ঠ মাসে এবং সুবুদ্ধি মিশ্রের নবাগত পুত্রের নাম তিনি 'জয়ানন্দ' দেন।

(৬) উদ্ধারণপুর (থানা ঃ কেতুগ্রাম)

শ্রীপাদ নিত্যানন্দের কাছে দীক্ষা নেন সপ্তগ্রামের জমিদারপুত্র উদ্ধারণ দত্ত। তাঁর নামানুসারে এই গ্রামের নাম। এই গ্রামে বৈষ্ণব শ্রীপাট আছে। তিনি গৌরাঙ্গ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন।

ঝামটপুরের শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে উদ্ধারণ ঠাকুর সম্বন্ধে লিখেছেন

'মহাভাগবত শ্রেষ্ঠ দত্ত উদ্ধারণ।
সর্ব্বভাবে সেবে নিত্যানন্দের চরণ।'

'গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা' মতে উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর ছিলেন 'সুবাহু গোপাল'।

(৭) কাঞ্চননগর (থানা ঃ সদর বর্ধমান)

বর্ধমানের কাঞ্চননগরে 'কড়চা' প্রণেতা গোবিন্দদাস কর্মকারের জন্মভিটা। ইনি চৈতন্যদেবের দক্ষিণ ভারতের ভ্রমণের সঙ্গী ছিলেন বলে অনেকে মনে করেন। শ্রীল ভুগর্ভ ঠাকুর এখানে 'শ্রীপাট' প্রতিষ্টা করেন।

(৮) কানাইডাঙ্গা (থানা ঃ মঙ্গলকোট)

এখানকার গোস্বামীরা নিত্যানন্দের বংশধর। প্রতিষ্ঠিত বলরাম জীউর সেবা পূজা হয়। নবাব মুর্শিদকুলীর সময়ে কানাইডাঙার এক পণ্ডিত বাংলার অন্যান্য পণ্ডিতদের সঙ্গে মিলে জয়পুরের পণ্ডিতদের সঙ্গে পরকীয়া তত্ত্ব নিয়ে বিচারে প্রবৃত্ত হন।

(৯) কালিকাপুর (থানা ঃ কাটোয়া)

নিত্যানন্দপ্রভুর কন্যা গঙ্গাদেবীর বংশধরদের বাস। এখানে গঙ্গাদেবীর বংশের শ্রীরাধামাধব জীউ'র নিত্যসেবা হয়।

(১০) জ্ঞানদাস - কাঁদরা (থানা ঃ কেতুগ্রাম)

জ্ঞানদাস ও যদুনন্দন দাসের শ্রীপাট ছিল। পদকর্তা জ্ঞানদাসের শ্রীপাটে চন্দ্রশেখর, শশিশেখর ও মনোহরদাস আশ্রয় নিয়েছিলেন। গোকুলানন্দ, বংশীবদন ঠাকুরের মত প্রখ্যাত বৈষ্ণব কীর্তনিয়ারা এই শ্রীপাটে বাস করতেন। মনোহর শাহী কীর্তনের সূত্রপাত কাঁদড়ার শ্রীপাটে। প্রখ্যাত বৈষ্ণব জয়গোপাল দাস ঠাকুর (পিতা বলরাম দাস) 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস'ও 'জ্ঞানপ্রদীপ' গ্রন্থের প্রণেতা। এখানে নিত্যানন্দপুত্র বীরভদ্র এসেছিলেন। জনশ্রুতি যে, শ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাসের পর রাঢ়বঙ্গ ভ্রমণের সময় কাঁদড়ায় আসেন।

(১১) কুরুম্বা (থানা ঃ মঙ্গলকোট)

অনেকে বলেন যে, শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী কুরুম্বায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গোপাল প্রতিষ্ঠিত করায় গ্রামের নাম হয় পূর্বগোপালপুর, তবে তথ্যটি সম্ভবত সত্য নয়। মাধবেন্দ্র পুরীর আবির্ভাব তিথিতে এখানে উৎসব ও মেলা অনুষ্ঠিত হত।

(১২) কুলাই (থানা ঃ কেতুগ্রাম)

শ্রীচৈতন্যদেবের অন্যতম পার্ষদ গোপাল ঘোষ। তাঁর তিনপুত্র গোবিন্দ ঘোষ, বাসুদেব ঘোষ ও মাধব ঘোষের এই গ্রামে জন্মস্থান। সন্যাস গ্রহণের পরের দিন চৈতন্য মহাপ্রভু কুলাইগ্রামে আসেন এবং যেখানে বিশ্রাম নিয়েছিলেন তা 'বিশ্রামতলা' বলে বিখ্যাত। শ্রীখণ্ডের নরহরি ঠাকুরের শিষ্য যাদব কবিরাজ, দৈতারি ঘোষ, কংসারি ঘোষ এই গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। এই তিনজনে তিনটি নিমকাঠের গৌরাঙ্গ মূর্তি নরহরিকে দান করলে ; গুরু নরহরি ঠাকুরের আদেশে সেগুলি শ্রীখণ্ড, গঙ্গানগর ও কাটোয়ায় প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

বাসুদেব ঘোষ, যিনি চৈতন্যদেবের অন্যতম পার্ষদ ছিলেন; তাঁর সাধনস্থল কুলাইগ্রামের কাছে ছিল।

(১৩) কুলিনগ্রাম

মালাধর বসুর জন্মস্থান। তিনি 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' রচনা করে গৌড়েশ্বরের কাছ থেকে 'গুণরাজখান' উপাধি পান। মালাধর বসুর পুত্র সত্যরাজের আমন্ত্রণে চৈতন্যমহাপ্রভু কুলীনগ্রামে আসেন। কুলীনগ্রামের এই বসু পরিবার শ্রীচৈতন্যের আদেশে প্রতি বৎসর স্নানযাত্রার সময় পট্টডোরি নীলাচলে পাঠাতেন। এই পট্টডোরি দিয়ে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাকে রথে তোলা হত ও বিগ্রহগুলিকে রথের সঙ্গে শক্তভাবে বেঁধে রাখা হতো। 'কুলীন গ্রামীরে কহে সন্মান করিয়া / প্রত্যব্দ আসিবে যাত্রায় পট্টডোরি লঞা।/গুনরাজখান কৈল / তাঁহা এক বাক্য তাঁর আছে প্রেমময়।/নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ/এই বাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশে / তোমার কি তোমার গ্রামের কুকুর / সেই মোর প্রিয়, অন্যজন বহু দূর।'' (চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা - ১৫)। কুলীনগ্রামের কীর্তনিয়া সমাজ বিখ্যাত ছিল। এখানকার বিখ্যাত হল মদনগোপাল মন্দির। এই গ্রামের দক্ষিণ অংশে হরিদাস ঠাকুরের ভজন স্থানে কাষ্ঠনির্মিত গৌরাঙ্গ মূর্তি পূজা পেয়ে আসছে। হরিদাস ঠাকুরের শ্রীপাট এখনও বর্তমান।

(১৪) কেশবপুর (থানা : জামালপুর)

বিষ্ণুদাস আচার্যের বাসস্থান এবং শ্রীপাট আছে। বিষ্ণুদাসকে অনেকে জয়কৃষ্ণদাস বলেন, যিনি মাধবেন্দ্র পুরীর পূর্বাশ্রমের পুত্র।

(১৫) কৈয়র (থানা : খণ্ডঘোষ)

অভিরাম গোস্বামীর শিষ্য শ্রীবেদগর্ভের শ্রীপাট আছে। লক্ষ্মীজনার্দন, মদনগোপাল, বিজয়গোপাল ও রাইরানীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

(১৬) কোন্দা (থানা : অণ্ডাল)

ঘনশ্যাম গোস্বামীর সাধনস্থান। তাঁর শ্রীপাট আছে।

(১৭) কোঁয়ারপুর (থানা : মঙ্গলকোট)

বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব আছে। রাধামাধবের সেবা পূজা হয়।

(১৮) গোপালপুর (থানা : কেতুগ্রাম)

রাঘব চক্রবর্তীর কন্যা পদ্মা দেবীর সঙ্গে এই গ্রামে শ্রীনিবাস আচার্যের বিয়ে হয়। এখানে বৈষ্ণবধর্ম ব্যাপক প্রসার লাভ করে।

(১৯) ঘোষপাঁচঘে (থানা: মেমারি)

বৈষ্ণবসাধক গোবিন্দ গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত রাধা-গোবিন্দ বিগ্রহ আছে। প্রতিবছর চৈত্রমাসে গোবিন্দগোস্বামীর তিরোধান উৎসব হয়।

(২০) ঘোড়াঘাট

শ্রীরঘুনন্দন সরকারের শিষ্য বনমালী কবিরাজ ঠাকুরের শ্রীপাট ছিল। বর্তমানে এই স্থান লুপ্ত।

(২১) চম্পাহাটি (থানা : পূর্বস্থলী)

পরমবৈষ্ণব দ্বিজবাণীনাথের শ্রীপাট আছে। তিনি চৈতন্যমহাপ্রভুর ব্রজলীলার কামলেখা সখী ছিলেন। এই গ্রামে গৌর গদাধরের সেবা আছে।

(২২) চৈতন্যপুর (থানা : মঙ্গলকোট)

অনেকে মনে করেন সন্ন্যাসের পর রাঢ় ভ্রমনকালে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই গ্রামে আসেন। এখানে বৈষ্ণবধর্ম বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে।

(২৩) জগদানন্দপুর (থানা: কাটোয়া)

শ্রীচৈতন্যপার্ষদ জগদানন্দের নামে এখানকার নাম। রাধাগোবিন্দের বৃহৎ মন্দির আছে।

(২৪) ঝামটপুর (থানা : কেতুগ্রাম)

পরম ভাগবৎ শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের জন্মস্থান। কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' ও 'শ্রীগোবিন্দলীলামৃত' রচনা করেন।

(২৫) তকিপুর (থানা : মঙ্গলকোট)

অভিরাম গোস্বামীর শাখা বলরাম দাসের 'শ্রীপাট' বর্তমান।

(২৬) তড়িৎগ্রাম

বর্তমানে লুপ্ত। তড়িৎগ্রাম মাধবগুণাকরের জন্মভূমি (দ্রষ্টব্য ঃ শ্রীশ্রী গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান।)

(২৭) দেনুড় (থানা: মন্তেশ্বর)

বৃন্দাবন দাসের শ্রীপাট আছে। শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণী দেবীর পুত্র বৃন্দাবন শ্রী নিত্যানন্দের শিষ্য ছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁকে চৈতন্য চরিতে ব্যাস বলেছেন। তিনি নিত্যানন্দের আদেশে শ্রীপাট স্থাপন করেন। তাছাড়া এই গ্রাম চৈতন্যের সন্ন্যাস দীক্ষাগুরু

কেশব ভারতীর জন্মস্থান। কেশব ভারতীর প্রতিষ্ঠিত অষ্টধাতুর গোপাল মূর্তি আছে। এখানে গুরু বৃন্দাবন দাসের আদেশে রামহরি দাস নিত্যানন্দ চৈতন্যের সেবা স্থাপন করেন।

(২৮) ধাত্রীগ্রাম (থানা: কালনা)

নিত্যানন্দ প্রভু ধাত্রীগ্রামের ব্রাহ্মণ জমিদার রুদ্রকে দীক্ষা দেন। তিনি পরে স্বগৃহে বিষ্ণু মূর্তি পূজা করতেন।

(২৯) ধামাস (থানা : রায়না)

রামচন্দ্রের শ্রীপাট আছে। ইনি শ্রীরামাইপণ্ডিতের শিষ্য।

(৩০) নব-দ্বীপ

বর্ধমান জেলায় অবস্থিত নব-দ্বীপখণ্ডের বিদ্যানগরে বাসুদেব সার্বভৌম এবং গঙ্গাদাস পণ্ডিত বাস করতেন। মামগাছিতে শারঙ্গপ্রভু, নারায়ণীদেবী ও শ্রী বৃন্দাবন দাস থাকতেন।

(৩১) নিত্যানন্দপুর (থানা : ভাতাড়)

নিত্যানন্দের বড়ছেলে গোপীজনবল্লভ এই গ্রামে থাকতেন। গোস্বামীপরিবারের মদনগোপালের নিত্য পুজো হয়।

(৩২) নিঃশঙ্ক (থানা : মেমারী)

নরহরি অবধুত এখানে গৌরাঙ্গ বিগ্রহ স্থাপন করেন। বৈশাখ মাসে এখানে নরহরির জন্মতিথিতে মহোৎসব হয়।

(৩৩) নৈহাটি (থানা : কেতুগ্রাম)

রূপ ও সনাতনের পৈত্রিক বাসস্থান। সনাতন গোস্বামীর শিক্ষাগুরু সর্বানন্দ সিদ্ধান্ত বাচস্পতির বাসস্থান এই গ্রামে।

(৩৪) পঞ্চধাম

বাংলার প্রধান পাঁচটি স্থানের মধ্যে পূণ্যস্থান বা তীর্থস্থান রূপে পরিচিত হয়।

(৩৫) পাড়াল

বর্তমানে লুপ্ত। চন্দ্রশেখরের শ্রীপাট ছিল। ইনি শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দন ঠাকুরের শিষ্য।

(৩৬) পাতাগ্রাম (থানা : মন্তেশ্বর)

অভিরাম ঠাকুরের শিষ্য বিদ্যুর ব্রহ্মচারীর শ্রীপাট আছে।

(৩৭) পাতুন (থানা : মন্তেশ্বর)

যাদবেন্দু পণ্ডিতের শ্রীপাট আছে। ইনি অভিরাম গোস্বামীর শিষ্য।। এখানে গোপীনাথ জীউর পূজা হয়।

(৩৮) পাহাড়পুর

পুরন্দর ও শঙ্কর পণ্ডিতের শ্রীপাট আছে।

(৩৯) পুটশুড়ি (থানা : মন্তেশ্বর)

বৃন্দাবন দাসের স্মৃতি বিজড়িত গ্রাম। গোপীনাথের দোল বিখ্যাত। গোপালদাস বাবাজী যিনি একজন প্রখ্যাত কীর্তনিয়া ছিলেন; তাঁর সমাধি আছে।

(৪০) প্যারীগঞ্জ

নকুল ব্রহ্মচারীর শ্রীপাট আছে। শ্রীপাট গোপাল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে।

(৪১) বড়বেলুন (থানা : ভাতার)

অনন্তপুরী গোস্বামীর শ্রীপাট আছে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাধা-গোপীনাথ জীউর সেবা চলে।

(৪২) বাইগণকোলা (থানা : কেতুগ্রাম)

রামশরণ চট্টরাজের শ্রীপাট আছে। ইনি রামচরণ চক্রবর্তীর শিষ্য ছিলেন। রামচরণ শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য। অনেকে মনোহর দাসের জন্মস্থান হিসেবে এই স্থানকে চিহ্নিত করেন।

(৪৩) বাঘনাপাড়া (থানা : কালনা)

প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব শ্রীপাট। নিত্যানন্দ প্রভুর আদেশে বংশীবদন এখানে বাসস্থান নির্মাণ করেন। বংশীবদনের পৌত্র ও চৈতন্যদাসের পুত্র রামাইপণ্ডিত নিত্যানন্দের স্ত্রী জাহ্নবাদেবীর পালিত পুত্র ছিলেন। রামচন্দ্র গোস্বামী ১৫৮৩ সালে জাহ্নবাদেবীর সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবনে যান। ওখানকার প্রস্কন্দ তীর্থ থেকে কৃষ্ণ বলরাম মূর্তি নিয়ে এসে বাঘনাপাড়ায় শ্রীপাট স্থাপন করেন। বীরভদ্র একবার বার হাজার শিষ্য নিয়ে রাত্রে রামচন্দ্রের আতিথ্য গ্রহন করলে তিনি তাঁদের অভিরুচি আহার্য দিয়ে সকলকে আহার করান। মাঘ মাসের কৃষ্ণা তিথিতে রামচন্দ্রের তিরোধান উপলক্ষে আজও বাঘনাপাড়ায় মহোৎসব হয়।

(৪৪) বিদ্যানগর (থানা : পূর্বস্থলী)

মহেশ্বর বিশারদের পুত্র বাসুদেব সার্বভৌমের শ্রীপাট ছিল এবং শ্রীপাটে গৌরাঙ্গ এবং নিত্যানন্দের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল।

(৪৫) বেনালী (থানা : জামুরিয়া)

কবি জয়দেবের স্মৃতি বিজরিত কেঁদুলির মেলার অনুকরণে এখানে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মহামিলন মেলা হয়।

(৪৬) বেলগ্রাম (থানা : মঙ্গলকোট)

নিত্যানন্দের কন্যা গঙ্গাদেবীর বংশধররা থাকেন। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত বলরাম জীউর সেবা আছে। সুবুদ্ধি মিশ্রের 'শ্রীপাট' আছে, যিনি ব্রজের 'গুণচুড়া' সখী বলে পরিচিত।

(৪৭) বেলুন (থানা : বর্ধমান)

শিবাই পণ্ডিতের 'শ্রীপাট' ছিল। এখন কোন চিহ্ন নেই।

(৪৮) মতিসর (থানা : কালনা)

শ্যামদাসের প্রতিষ্ঠিত 'মহোন ঠাকুর' ছিল, যা বর্তমানে ভৈটা গ্রামে আছে। শ্যামদাস অদ্বৈত্য আচার্যের শিষ্য ছিলেন এবং তাঁর পুত্র অচ্যুতানন্দের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল।

(৪৯) মাড়ো (থানা : বুদবুদ)

রঘুনন্দন গোস্বামীর বাসভূমি। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'রামরসায়ন'। রামেশ্বরের পুত্র নৃসিংহদেব বর্ধমান জেলার ইছাপুর গ্রাম ছেড়ে 'মাড়ো'তে এসে বসবাস করতেন। বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব এই গ্রামে সুবিখ্যাত।

(৫০) মানকর (থানা : বুদবুদ)

এখানে বৈষ্ণবধর্মের গুরুত্ব অপরিসীম। এখানকার ভক্তলাল গোস্বামী কীর্তিচাঁদ ও তাঁর পুত্র চিত্রসেনের দীক্ষাগুরু ছিলেন। মধুসুদন গোস্বামী, হিতলাল মিশ্র ও শ্যামসুন্দর গোস্বামীর বিদ্যাচর্চার জন্য মানকর প্রসিদ্ধ ছিল। ভক্তলাল গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত (১১৩৫ সাল) রাধাবল্লভ জীউর নবরত্ন মন্দির আছে। ন্যায় শাস্ত্রে প্রখ্যাত পণ্ডিত রঘুনাথ শিরোমণি কোটা মানকর গ্রামে জন্মগ্রহন করেন বলে প্রসিদ্ধি আছে।

(৫১) মামগাছি (থানা : পূর্বস্থলী)

বাসুদেব দত্তের 'শ্রীপাট' আছে এবং এই শ্রীপাটে তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাধামদন ও গোপালদেবের মূর্তি আছে। এই শ্রীপাটের থেকে কিছুটা দুরে শারঙ্গ মুরারী প্রভুর শ্রীপাট আছে; সেখানে 'রাধাগোপীনাথে'র সেবা হয়। তাছাড়া এখানে মালিনীদেবীর 'শ্রীপাট' আছে। এই শ্রীপাটে নিত্যানন্দ, গৌরাঙ্গ, রাধাকৃষ্ণ, জগন্নাথ, বলরাম ও গোপালের বিগ্রহ আছে। শ্রীবাস ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণী দেবী এবং তাঁর পুত্র বৃন্দাবন দাস এই দুজনই শ্রীবাসুদত্ত ঠাকুরের শ্রীপাটে বাস করতেন! বাসুদেব দত্তের কাছ থেকে বৃন্দাবন দাস শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেন।

'পঞ্চম বৎসরের শিশু বৃন্দাবন দাস।
মাতা সহ মামগাছি করিলা নিবাস।।'' — প্রেমবিলাস

বৈষ্ণব সাহিত্যে মামগাছি 'মোদদ্রুম' দ্বীপ নামে বিখ্যাত।

(৫২) মাহাতা (থানা ঃ ভাতাড়)

গদাধর পণ্ডিতের শাখা ভুবানন্দ গোস্বামীর বংশধরেরা বাস করেন। তাঁরা 'অভিরামপুর' থেকে 'মাহাতা' গ্রামে আসেন। এদের গৃহে গোবিন্দদেবের সেবা প্রতিষ্ঠিত আছে।

(৫৩) মুস্থলী (থানা ঃ কাটোয়া)

সনাতন দাসের শ্রীপাট আছে। সনাতন দাস চৈতন্যভাগবতের রচয়িতা শ্রীবৃন্দাবন দাসের শিষ্য ছিলেন।

(৫৪) মাজিগ্রাম (থানা ঃ কাটোয়া)

শ্রীনিবাস ঠাকুরের শ্রীপাট আছে। প্রায় সমস্ত প্রখ্যাত বৈষ্ণবেরা এই শ্রীপাটে এসেছিলেন। রাজা বীরহাম্বি শ্রীনিবাস ঠাকুরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর সাধনাস্থলে নিত্যানন্দ চৈতন্যের দারুমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এখানে ষড়ভুজ গৌরাঙ্গের মূর্তি আছে। তাছাড়া একটি কষ্টিপাথরের গোপালমূর্তিও আছে। এই গ্রামে সিদ্ধ বকুল বৃক্ষের তলায় নরোত্তম ঠাকুর ও বীরভদ্র গোস্বামীর আসন ছিল। এই বৈষ্ণব শ্রী পাটে শিবের গাজন হয়।

(৫৫) শীতলগ্রাম (থানা ঃ মঙ্গলকোট)

ধনঞ্জয় পণ্ডিতের 'শ্রীপাট' আছে। ইনি নিত্যানন্দের দ্বাদশ গোপালের একজন। চট্টগ্রামবাসী ধনঞ্জয় পণ্ডিত নিত্যানন্দের আদেশে এখানে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন এবং একটি শ্রীপাট স্থাপন করেন। শীতলগ্রাম ছাড়া এই সর্বস্বত্যাগী বৈষ্ণব সাঁচড়া, পাঁচড়া ও করন্দা গ্রামে শ্রীপাট স্থাপন করেন। প্রতি বৎসর মাঘ মাসে তাঁর তিরোধান তিথিতে বিশাল মহোৎসব হয় ও একটি মেলা বসে।

(৫৬) শুঁড়েকালনা (থানা ঃ জামালপুর)

মদনগোপালের বিগ্রহ আছে। ভাদ্রমাসে 'নৌকাবিলাস' উৎসব পালিত হয়। মদনগোপাল ছাড়া রাধা ও ললিতার দারুমূর্তি আছে। এখানে বৈষ্ণব ধর্মের বিশিষ্ট প্রভাব আছে। এই গ্রামের পশ্চিমে দামোদর নদীর একটি মরাখাতকে 'মদন দহ' বলে। জনশ্রুতি ঐ দহে কালনাগিনীর আশ্রয়স্থল ছিল।

(৫৭) সমুদ্রগড় (থানা ঃ পূর্বস্থলী)

শ্রী বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য মঙ্গলে এই গ্রামের নাম আছে। পঞ্চদশ - ষোড়শ শতকে সমুদ্রগড়

নব-দ্বীপ মণ্ডলের অন্তর্গত ছিল। শ্রীলছমনজিউ এবং শ্রীচৈতন্যদেবের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। এখানে একটি গৌড়ীয় মঠ আছে।

(৫৮) সর (থানা ঃ আউসগ্রাম)

এখানে সারঙ্গমুরারি প্রভুর শ্রীপাট আছে। সারঙ্গদেবের প্রতিষ্ঠিত রাধাবল্লভ মূর্তি এখনও পূজিত হয়। এই গ্রামের 'গোস্বামী'রা মুরারী প্রভুর বংশধর।

(৫৯) সাঁচড়া (থানা ঃ জামালপুর)

এখানে ধনঞ্জয় পণ্ডিতের 'শ্রীপাট ' ছিল।

(৬০) সিঙ্গারকোন (থানা ঃ কালনা)

কমললোচন গোস্বামীর বাসভূমি। তাঁর দুইপুত্র শ্যামাদাস ও মোহনানন্দ শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যের গৃহে পালিত হয়। শ্যামাদাস বৈষ্ণব ধর্ম প্রসারে বিশিষ্ট ভূমিকা নেন। মোহনানন্দের বংশ শাখা এই গ্রামে আছে। প্রতিষ্ঠিত রাধাকান্তের সেবা হয়। মোহনানন্দের পুত্র গোপালাচার্য শ্রীরাধিকার মূর্তি স্থাপন করেন। মাঘমাসে এই গ্রামে অমাবস্যা তিথিতে মোহনানন্দের তিরোভাব তিথি পালিত হয় এবং চারদিন ধরে এক মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(৬১) হীরাপুর (থানা ঃ হীরাপুর)

মাণিকচাঁদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত মদনগোপাল বিগ্রহ আছে। মাণিকচাঁদ ছিলেন শ্রীনিবাস আচার্যের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ। এই গ্রামে মাণিকচাঁদ ঠাকুরের সমাধি আছে।

বর্ধমানে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের পাশাপাশি পৌরাণিক বৈষ্ণব ধর্ম প্রচলিত ছিল এবং বর্ধমানের রাজারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি আনুগত্য দেখালেও পৌরাণিক বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন। অষ্টাদশ - উনবিংশ শতকের অনেক পৌরাণিক বিষ্ণুমন্দির রাজানুগ্রহে তৈরী হয়। তবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম প্রসারে বর্ধমানের রাজাদের ও বণিকদের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য। বর্ধমান জেলায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার দামোদর, ভাগীরথী ও অজয় নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে অধিক দেখা গেছে। সাহিত্য, শিল্প, সংগীত ও জীবনধারায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম এক স্থায়ী প্রভাব রেখে গেছে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এই প্রেমধর্ম বৃহৎ মানুষকে এক ছত্রছায়ায় নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিল - এখানেই এই ধর্মের সার্থকতা।

আচার্য বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিষ্য আচার্য বলদেব বিদ্যাভূষণ বেদান্ত দর্শনের (ব্রহ্মসূত্র) 'গোবিন্দ ভাষ্য' রচনা করেন।[৮১] ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শ্রীমদ্‌ভাগবতকে এবং পূজ্যপাদ মধ্বাচার্যের 'পূর্ণপ্রজ্ঞ' ভাষ্যকে মান্য করতেন। তবে 'পূর্ণপ্রজ্ঞ' ভাষ্য তাঁর কাছে পুরোটাই আদরণীয় ছিল না। ঐ ভাষ্যের যে যে অংশ শ্রীমদ্‌ভাগবতের বিরোধী, শ্রীমন্মহাপ্রভু তার অর্থ পরিস্কার করে সামঞ্জস্য করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই ব্যাখ্যা শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ আচার্য শ্রী বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ও আচার্য শ্রীজীব গোস্বামীর কাছ থেকে গুরুপরমপরাক্রমে

প্রাপ্ত হন। শ্রী শ্রী গোবিন্দজীর কাছ থেকে তিনি স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে ঐ ব্যাখ্যা লেখেন যা বিদ্যাভূষণ তাঁর গ্রন্থশেষে উল্লেখও করেছেন। বিদ্যাভূষণ কর্তৃক প্রচারিত মতবাদকে 'অচিন্ত্যভেদাভেদ' বাদ বলে যা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মূল দর্শন। সাধারণভাবে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কাছে 'ক্রমদীপিকা' অতি মান্য গ্রন্থ। বৈষ্ণবদের কাছে রাধাতন্ত্র, কৃষ্ণযামলতন্ত্র ও গৌতমীয়তন্ত্র অন্যতম মান্য তন্ত্রগ্রন্থ হলেও গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের কাছে শ্রীবিদ্যা মতই আদরণীয়। দশমহাবিদ্যার মধ্যে ষোড়শী বা ত্রিপুরাসুন্দরীর বিশেষ প্রাধান্য আছে। এই ত্রিপুরাসুন্দরীকেই 'শ্রীবিদ্যা' বলে। গৌড়পাদ, শঙ্করাচার্য, মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীপাদ নিত্যানন্দ - এমনকি শ্রীপাদ বল্লভাচার্য পর্যন্ত শ্রীবিদ্যার উপাসক ছিলেন। বঙ্গীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের দর্শনে শ্রীবিদ্যার প্রাধান্য লক্ষণীয়।

বর্ধমান জেলায় শৈব সম্প্রদায়

রাঢ়বঙ্গের গণদেবতা শিব। বর্ধমানে প্রতি গ্রামে একাধিক শিব। বর্ধমান জেলার তথাকথিত লৌকিক দেবতা 'ধর্মরাজ' অনেকক্ষেত্রে শিবরূপে পূজিত।

আর্যাবর্তে সবচেয়ে প্রাচীন শৈব সম্প্রদায় হল 'পাশুপত'। যেহেতু বঙ্গদেশ আর্যাবর্তের শেষভাগ, সেজন্য বঙ্গদেশে 'পাশুপত' মতই প্রচলিত। পাশুপত ছাড়া অন্যান্য শৈব সম্প্রদায় প্রায় দেখা যায় না। বৈষ্ণব ও শাক্ত ধর্মের প্রাবল্যে বর্ধমানে শৈব সম্প্রদায় তেমন মাথা তুলতে না পারলেও সকল সম্প্রদায়ের কাছেই শিব পুজো পেয়েছে। শাক্তরা তো বটেই, বৈষ্ণবেরাও শিবের পুজো করে। তাছাড়া বর্ধমানের বৃহত্তর জনসমাজ কোন বিশিষ্ট শৈব সম্প্রদায়ের আচার অনুসরণ না করেই শিবকে আপন করে নিয়েছে। বলতে বাধা নেই সম্প্রদায়গতভাবে শৈবধর্ম যতটা না প্রচারিত তার থেকে 'গণদেবতা' হিসাবে শিব সমগ্র রাঢ়বঙ্গেই বহু প্রাচীনকাল থেকেই মান্যতা লাভ করেছে। সম্রাট নারায়ণ পালের তাম্রশাসন থেকে জানা গেছে যে তিনি পাশুপতাচার্য পরিষদের ব্যবহারের জন্য গ্রামদান করেছেন এবং নিজে একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সেন রাজাদের কুলদেবতা 'সদাশিব'। তাঁরা মুদ্রায় সদাশিবের মূর্তি উৎকীর্ণ করেন। বল্লালসেন ও বিজয় সেন শৈব ছিলেন - এমনকি লক্ষ্মণসেন নিজে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করলেও কুলদেবতা সদাশিবের পূজা করতেন।[৮২] বর্ধমানে পাশুপত ধারার লকুলীশ বা নকুলীশ সম্প্রদায়ের নিদর্শন পাওয়া গেছে। বরাকরের বেগুনিয়া বাজারে চারটি শিখর দেউলের মধ্যে একটি দেউলে জটাজুটধারী এবং ডানহাতে লগুড় বা লকুটধারী এক মুনির ধ্যানমগ্ন মূর্তি আছে। এই মূর্তিটি 'লকুলীশ' মুনির। তাঁর প্রচারিত শৈব সম্প্রদায়ই লকুলীশ সম্প্রদায়। মাধবাচার্য তাঁর 'সর্বদর্শন সংগ্রহ' গ্রন্থে লকুলীশকে পাশুপত মত বলে উল্লেখ করেছেন। বর্ধমানে শক্তিপূজার সঙ্গে কালভৈরব, মহাকালভৈরব ইত্যাদি নানা ভৈরবের পূজো হয়। ভৈরব প্রকৃতপক্ষে শিবানুচর।

বর্ধমান জেলায় শাক্ত সম্প্রদায়

যেকোন উপাসনা শক্তিরই উপাসনা। ফলে বৈষ্ণব, শৈব - সকলেই নির্বিশেষে শাক্ত।

হিন্দুশাস্ত্রে 'শক্তি' স্ত্রীলিঙ্গ বাচক শব্দ সেজন্য সাধারণভাবে নারী দেবতাদের উপাসককে 'শাক্ত' বলে। শক্তি-র উপাসনা সব সম্প্রদায়েরই স্বীকৃত। বৈষ্ণব তন্ত্রে রাধা ও অন্যান্য গোপিকাগণ কিংবা শ্রীকৃষ্ণের অষ্টমহিষী-র উপাসনা এবং শৈবাগমতন্ত্রে পার্ব্বতীর উপাসনা প্রকৃতিপক্ষে শাক্ত উপাসনা। বেদে পুরুষ ও নারী উভয় দেবতাই স্বীকৃত। বেদে আদি শক্তি হিসাবে 'অদিতি' -র নাম পাওয়া যায়। সমস্ত কিছুই অদিতি-রই বিভিন্ন প্রকাশমাত্র। তন্ত্রেও 'আদিশক্তি' হিসাবে দুর্গা বা ষোড়শী বা কালী স্বীকৃত। এ সমস্ত পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। বর্ধমান জেলায় বৈদিক দেবতা ইন্দ্রাণী, ব্রহ্মাণী, কাত্যায়ণী, সরস্বতী, শ্রী, প্রভৃতি দেবীর পুজো প্রচলিত। এছাড়া দ্বিজদের উপাস্য 'গায়ত্রী' বা 'সাবিত্রী' তো আছেনই।

বর্ধমান জেলা সহ সমগ্র পূর্ববঙ্গে বেদমার্গী তন্ত্রসাধন ধারা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। তন্ত্র একটি বিশিষ্ট সাধনধারা যার মূল উপাদান বেদ থেকে গৃহীত। মূলত অথর্ববেদে তন্ত্রের মূল উৎস । পরিবর্তিত ক্ষেত্রে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভেদে তন্ত্রে নানা পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। শাক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে ভারতবর্ষে 'শ্রীকুল' ও 'কালীকুল' প্রসিদ্ধ।

'কালী তারা রক্তকালী ভুবনা মহিষমর্দিনী। ত্রিপুটা ত্বরিতা দুর্গা বিদ্যা প্রত্যঙ্গিরা তথা। কালীকুলং সমাখ্যাতং শ্রীকুলঞ্চ ততঃ পরম্। সুন্দরী ভৈরবী বালা বগলা কমলাপি চ। ধূমাবতী চ মাতঙ্গী বিদ্যা স্বপ্নাবতী প্রিয়ে। মধুমতী মহাবিদ্যা শ্রীকুলং পরিভাষিতম্।'

(নিরুত্তর তন্ত্র, পৃঃ -১)

অর্থাৎ কালী , তারা , রক্তকালী, ভুবনেশ্বরী, মহিষমর্দিনী, ত্রিপুটা ত্বরিতা, দুর্গা এবং বিদ্যা প্রত্যঙ্গিরা কালীকুল হিসাবে বিখ্যাত এবং তারপর সুন্দরী (ত্রিপুরাসুন্দরীদেবী বা ষোড়শী), ভৈরবী, বালা, বগলা, কমলা, ধূমাবতী, মাতঙ্গী, বিদ্যা, স্বপ্নাবতী, মধুমতী ও মহাবিদ্যা 'শ্রীকুল' হিসাবে পরিচিত।

রাঢ়বঙ্গ সহ সমগ্র বঙ্গদেশে 'কালীকুল' শাক্ত সম্প্রদায় প্রচলিত। শক্তি সঙ্গম তন্ত্র গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, নেপাল থেকে কলিঙ্গ পর্যন্ত আঠারটি দেশে গৌড় সম্প্রদায় প্রচারিত ছিল। কেরল, কাশ্মীর ও গৌড় - এই তিনটি প্রধান শাক্ত সম্প্রদায় । তারমধ্যে গৌড় দেশে এবং গৌড় সম্প্রদায় প্রচারিত দেশে 'কালীকুল' প্রচলিত। আবার এই প্রধান তিনটি সম্প্রদায় 'শিব' , 'শক্তি', 'শিবশক্তি', 'শুদ্ধ', 'উগ্র', 'গুপ্ত', ইত্যাদি ন'টি ভাগে বিভক্ত। সিদ্ধসিদ্ধান্ত সংগ্রহ গ্রন্থে গৌড় সম্প্রদায় সম্বন্ধে বলা হয়েছে, 'সবার্থ সিদ্ধির জন্য সঙ্কল্প,পুষ্প অর্পণ করে পুজা, নৈবেদ্য নিবেদন,হোম, তাম্বুল নিবেদনের পর বলিদান করতে হবে। বামহাতে পূজা, দক্ষিণহাতে তর্পণ, পঞ্চমকারগ্রহণ, হৃদয়ে দেবীর বিসর্জন - গৌড় সম্প্রদায়ের বামাচারী নামক ধারা।'[৮৩]

বর্ধমান সহ সমগ্র বঙ্গদেশে গৌড় সম্প্রদায় (কালীকুল) ছাড়া 'কাদি-হাদি-কহাদি'-র মধ্যে কাদি সম্প্রদায় প্রচলিত। 'কাদি' তন্ত্রমতে 'কাদি' হলেন কালী। স্যার জন উডরফের মতে গৌড় সম্প্রদায় কাদি মতকে সর্বোচ্চ আসন দিয়েছে। কামধেনু তন্ত্র 'ক' অক্ষরকে

সাক্ষাৎদেবী রূপে বর্ণনা করেছে।

গুরুপরমপরাক্রমে আচারের পার্থক্যই সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছে। 'সৌভাগ্যসুধোদয়ে' আছে, 'সম্প্রদায়ঃ গুরুপরম্পরা আচারানুসরণম্' (পরশুরাম কল্পসূত্র ১/৯)।

শক্তি সঙ্গম তন্ত্রের সুন্দরীখণ্ডে চীন, কাপালিক, বৌদ্ধ, জৈন, দিব্য, কৌল, প্রভৃতিশাক্ত সাধক। 'চীনানাং দ্বিশতং ভেদাস্তারাচ্ছিন্নাবিধৌস তু' - চীনাচারে দ্বিশত প্রকারভেদ - তারা ও ছিন্নমস্তাক্রমানুসারে । 'কাপালিকে পঞ্চভেদা' - কাপালিকদের প্রকারভেদ পাঁচটি - ইন্দ্রজালী, দেবজালী,রুদ্রজালী, বিদ্যাজালী এবং সিদ্ধিজালী।

বর্ধমান সহ শুধু রাঢ়দেশে কেন - সমগ্র বঙ্গদেশে শাক্ত তন্ত্র ধারায় কালী ও দশমহাবিদ্যার পুজো সমধিক প্রচলিত।ব্রহ্মযামলতন্ত্রে 'আদ্যাস্তোত্রে' 'কালিকা বঙ্গদেশে চ' বলা হয়েছে। মহাকাল ও মহাকালী হলেন শিব ও শক্তি। 'মহাকাল সংহিতায়' কালী ন প্রকার - দক্ষিণাকালী, ভদ্রকালী, শ্মশানকালী, কালকালী, গুহ্যকালী- কামকলাকালী, ধনকালী, সিদ্ধকালী ও চণ্ডকালী। মহাকাল হলেন শিব কিন্তু মহাকালভৈরব শিবের অনুচর। কালীকুলের শক্তিসাধকেরা অদ্বৈতপন্থী। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ বলেছেন , ''কালীকুলের শক্তিসাধকেরা মনে করেন যে , শিবশক্তি তত্ত্ব প্রকৃতপক্ষে গুণাতীত,নির্দ্বন্দ্ব ও একমাত্র বোধস্বরূপ বা উপলব্ধিগম্য, - 'ত্বমেকা পরব্রহ্মরূপেন সিদ্ধা'। বাংলাদেশে কালীর নানা রূপভেদ - (১) মহাকালী, (২) শ্যামাকালী, (৩) রক্ষাকালী ও (৪) শ্মশানকালী। এছাড়া ফলহারিণী, রটন্তী, নিত্যকালী, ভদ্রকালী, গুহ্যকালী প্রভৃতি রূপভেদও আছে। বাংলাদেশে শক্তিপূজা সম্বন্ধে স্বামী জ্ঞানানন্দ বলেছেন, 'বাংলাদেশে শক্তিপূজায় বিজয়াশোধন, শ্রীযন্ত্রলিখন ও যন্ত্রের অর্চনার বিধি আছে। দেবীপূজায় সুধাকলস স্থাপন , আনন্দ ভৈরব ও আনন্দ ভৈরবীর ধ্যান ও পূজা এবং মাংস, মৎস্য,মুদ্রা ও সুধাদি পঞ্চতত্ত্বের শুদ্ধিকরণের উপযোগিতা আছে।' (তন্ত্রে তত্ত্ব ও সাধনা , পৃঃ - ৯১)

বৈদিক দেবী রাত্রি তন্ত্রে বিভিন্ন দশ মহাবিদ্যা হয়েছেন। সেজন্য দশ মহাবিদ্যার দশটি 'রাত্রি' উল্লেখ আছে - যথাক্রমে,

মহাকালী - মহারাত্রি
তারা - ক্রোধরাত্রি
ষোড়শী - দিব্যরাত্রি
ভূবনেশ্বরী - সিদ্ধরাত্রি
ছিন্নমস্তা - বীররাত্রি
ভৈরবী - কালরাত্রি
ধূমাবতী - দারুণরাত্রি
বগলা - বীররাত্রি
মাতঙ্গী - মোহরাত্রি
কমলা - মহারাত্রি

লোকধর্ম

(১)

সাধারণভাবে দেশের আদিম উপজাতীয়দের সংস্কৃতিকে লোকসংস্কৃতি বা লোকায়ত সংস্কৃতি বলে। এই লোকায়ত সংস্কৃতির আচার, রীতি-নীতি, পূজিত দেবদেবী ইত্যাদির উপর নির্ভর করে যে ধর্মচর্চা লক্ষ্য করা গেছে তাকে লোকধর্ম বলে।

সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে সুসংগঠিতভাবে দু'টি সমান্তরাল সংস্কৃতির রূপ লক্ষ্য করেছিলেন তৎকালীন সমাজতাত্ত্বিকেরা। কোন দেশের অনাদি অতীত থেকে বসবাসকারী আদিম মানুষের দ্বারা লালিত ধর্ম, সংস্কৃতিকে তাঁরা লোকধর্ম এবং লোকসংস্কৃতি আখ্যা দেন। আমাদের দেশে এই ধারণার প্রবক্তা কোন দেশজ চিন্তানায়ক নন, বিদেশী সমাজতাত্ত্বিকেরা। তবে মজার বিষয় হলো -আমেরিকার 'রেড ইণ্ডিয়ান' দের মতো কিংবা অন্যান্য দেশের আদিম উপজাতিদের মতো ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এই 'জাতি - উপজাতি' শ্রেণীবিন্যাসকরণ চেষ্টা - ইতিহাসের সত্যের পরিপন্থী। 'অনার্য - আর্য' শ্রেণীবিভাজনের এক সরল চেষ্টা থেকে এসব ধারণা তৈরী হয়েছে। আমরা 'প্রাককথনে' উল্লেখ করেছি আধুনিক যুগে জাতিগতভাবে 'আর্য - অনার্য' শ্রেণীবিভাজন শুধু অবৈজ্ঞানিক নয়, অমানবিকও। ইউনেস্ক দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সমাজতাত্ত্বিকদের এই চেষ্টাকে নিন্দা করেছেন এবং আর্যজাতির কোন অস্তিত্বই স্বীকার করেননি।

আমরা বর্ধমান জেলার লোকধর্ম আলোচনা করতে গিয়ে দেখাবো লোকধর্ম বলতে যে উপজাতীয় ধর্মের কথা লোকগবেষকেরা বোঝাতে চেয়েছেন তা আদৌ কোন উপজাতীয় ধর্ম নয়, বৈদিক ধর্মেরই এক অতি সরল রূপ। অধিকাংশ মানুষ ধর্মের উচ্চতত্ত্ব ও আচরণ ধারণের ক্ষেত্রে অনুপযোগী। শুধু ধর্ম কেন - সঙ্গীত, চিত্রকলা প্রভৃতি যেকোন ধ্রুপদী জিনিসের রসাস্বাদন সকলেই একভাবে করেনা। ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ধর্মকেন্দ্রিক। ধর্ম ও সংস্কৃতি ভারতবর্ষে মিলেমিশে একাকার। মনীষার ব্যাপ্তি এই বৃহৎ দেশে সকল অঞ্চলে একভাবে শুরু হয়নি। মানব মনের কর্ষণজাত রূপই কৃষ্টি। সকলের মানব জমিন একইভাবে আবাদ হয় না। বহু প্রাচীনযুগে মূলত প্রাকৃতিক ঘটনার কারণ ঠিকভাবে না জানার ফলে মানুষের মনে একপ্রকার ভয়ের উদ্ভব হতো আর এই ভয় থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য মানুষ নানা কুসংস্কারগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ভারতবর্ষের ব্রহ্মাবর্ত অঞ্চলে প্রথম আর্য - মণীষার প্রকাশ ঘটে। সেই আর্য মণীষা কালক্রমে ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে বিস্তারলাভ করে। বৃহৎ জনজীবন পরবর্তীকালে সেই মণীষার আলোকছটায় স্নাত হলেও পুরোনো অনেক সংস্কারকেও সমানভাবে লালন করতে লাগল। এরফলে আঞ্চলিকভেদে নানা আচার ও রীতিনীতি সৃষ্টি হলো।

উত্তর ভারত, পূর্ব ও মধ্যভারত এবং পশ্চিমভারত - এই বৃহৎ অঞ্চলে আম, বেল প্রভৃতি গাছ জন্মায় ফলে বৈদিক যজ্ঞে বেল, আম, যজ্ঞডুমুর (পূর্বভারতে শালকাঠ পর্যন্ত) গাছের কাঠ দিয়ে যজ্ঞ করা হয় এবং এই সব অঞ্চলে কোথাও কুলকাঠ দিয়ে যজ্ঞ হয়। এই সব

অঞ্চলে কোথাও কুল কাঠ দিয়ে যজ্ঞ করার রীতি নেই কিন্তু দক্ষিণ ভারতে কুল কাঠ দিয়ে যজ্ঞ হয়, বেলকাঠ দিয়ে যজ্ঞ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এরকম আচারগত ভিন্নতার উদাহরণের সংখ্যা অনেক। ভারতবর্ষের মত এক বৃহৎ দেশে ভিন্ন ভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশের ফলে সংস্কারগত নানা ভিন্নতা স্বাভাবিক কিন্তু মূল ধর্ম উদযাপনের ক্ষেত্রে কোন বৈপরীত্য নেই।

বর্ধমান জেলায় ধর্মরাজ, মনসা, শীতলা, চণ্ডী প্রধান লৌকিক দেবদেবীরূপে সমাজতাত্ত্বিকদের ভাবনায় আলোকিত। আমরা পরবর্তী পরিচ্ছেদে দেখাবো এই সকল দেবদেবী সমস্তই বৈদিক। অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে কোন সুসংগঠিত ধর্মীয় ভাবনা দেখা যায়নি।

(২)

ধর্মরাজ বা ধর্মরায় বা ধর্মঠাকুর

(১) ধর্মরাজ যদি অনার্য দেবতা হন তাহলে তিনি আর্যনাম গ্রহণ করলেন কেন? 'ধর্ম' শব্দটিতো সংস্কৃত শব্দ। আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে 'ধর্ম' শব্দটি 'ডোমরাজ' বা 'ডোমরায়' শব্দটির সংস্কৃতীকৃত (Sanskritised) রূপ। 'ডোমরাজ' বা 'ডোমরায়' শব্দের অর্থ ডোমদের রাজা অথবা ডোমজাতির ঈশ্বর।'[৮৪] 'ডোমরাজ' থেকে 'ধর্মরাজ' শব্দের বিবর্তন কিভাবে ঘটল তা তিনি উল্লেখ করেননি। বৈদিক মনীষায় উদ্ভাষিত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম 'অন্ত্যজ' ডোমদের দেবতাকে কেন মাথায় চাপিয়ে ধর্মরাজ বানালেন তারও কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। শিব (রুদ্র), বিষ্ণু, দুর্গা, ইন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি বহু দেবদেবীর পর কেনই বা ডোমরাজের উপাসনার প্রয়োজন হলো তারও কোন তথ্যনির্ভর প্রমাণ নেই। ডোমদের দ্বারা ধর্মরাজের পৌরোহিত্য করা থেকে অনেকে ধর্মরাজকে ডোমদের ঈশ্বর বলেন কিন্তু ধর্মের পৌরোহিত্য শুধু ডোম জাতি করেনি, অন্যান্য নিম্নজাতি হাঁড়ি, বাগদী, কৈবর্ত্য, মাল প্রভৃতিরাও ধর্মরাজ পূজায় পৌরোহিত্য করে। ফলে ধর্ম আসলে ডোমদেরই ঈশ্বর - এ ধারণার সত্যতা উপলব্ধি করা যাচ্ছে না।

(২) ধর্ম উপাসনার সঙ্গে সূর্য উপাসনার সাদৃশ্য আছে। ডোমজাতি সূর্যকে পরমেশ্বর বা 'Supreme God' হিসাবে মানে কিন্তু আর্য সংস্কৃতিতেও সূর্যকে আদিদেব 'আদিত্য' বলা হয়েছে। রুদ্র, বিষ্ণু, ইন্দ্র - প্রায় সব প্রধান দেবমণ্ডলীকে সূর্য বা আদিত্যের সঙ্গে একত্ব প্রতিপাদন করা হয়েছে। দ্বিজরা যে গায়ত্রীমন্ত্র জপ করেন তা সূর্যের শক্তি অর্থাৎ সবিতার উপাসনা। নারায়ণের ধ্যানমন্ত্রে 'সবিত্রি মণ্ডলমধ্যবর্তী' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ফলে সূর্য উপাসনা দিয়ে ডোমদের সঙ্গে ধর্মরাজের সম্পর্ক দেখানো সম্ভব নয়।

(৩) ধর্ম শুধু সূর্যদেব নন। ধর্মকে রুদ্র (শিব), বিষ্ণু, বরুণ, যম প্রভৃতি বৈদিক দেব হিসাবেও পূজা করা হয়। 'একই দেবতা বহু হয়েছেন' - আর্য মনীষার এই সিদ্ধান্ত ধর্মরাজে সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে। ঋগ্বেদাদি সহ সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে বিষ্ণু, রুদ্র, ইন্দ্র, আদিত্য (সূর্য), অগ্নি - সমস্ত কিছুকে একই পরমেশ্বরের প্রকাশ বলা হয়েছে।

(৪) ধর্মরাজ বর্ধমান জেলায় রুদ্র (শিব) এবং বিষ্ণু - এই দুইরূপে অধিক পূজা পায়। আর্য শাস্ত্র সমূহে রুদ্রকে এবং বিষ্ণুকে 'ধর্ম' নামে অভিহিত করা হয়েছে। ফলে ধর্মরাজের সঙ্গে রুদ্র ও বিষ্ণুর একত্ব প্রতিপাদন ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভাবের ফল তা বলা যায় না। মহাভারতের অনুশাসন পর্বে বিষ্ণুর সহস্র নাম স্তোত্রে বিষ্ণুকে 'ধর্মাধ্যক্ষঃ', 'ধর্ম', 'ধর্মগুপ্‌', 'ধর্মকৃৎ', 'ধর্মী' বলা হয়েছে। অনুশাসন পর্বে ঋষি তণ্ডীকৃত সহস্র শিবনাম আছে - তাতে শিব বা রুদ্রকে 'ধর্ম', 'ধর্মাধ্যক্ষ ', বলা হয়েছে। তাছাড়া রুদ্র ও বিষ্ণু উভয়কেই 'বৃষপ্রিয়', 'বৃষভাক্ষো', 'বৃষভঃ' , 'বৃষাহী', 'বৃষপর্বা' 'বৃষাকপি' প্রভৃতি নামে ডাকা হয়েছে। 'বৃষ' শব্দের অর্থ 'ধর্ম'। 'বৃষভাক্ষো' = ধর্মদৃষ্টি সম্পন্ন, বৃষপ্রিয় = ধর্মপ্রিয় (অথবা যিনি ধর্ম এবং প্রিয়রূপ), বৃষাকপি = ধর্ম ও বরাহ, বৃষভঃ = ভক্তগণের প্রতি ধর্ম দানকারী, বৃষাহী = ধর্মেস্থিত।

মনুসংহিতায় বৃষ অর্থাৎ ধর্মকে চতুষ্পদ বলা হয়েছে - চারটি পুরুষার্থের প্রত্যেকটি এক একটি পদ। পুরাণে এজন্য শিবের বাহন ষাঁড় বা বৃষ। ধর্মের গূঢ়তত্ত্ব সাধারণ মানুষকে বোঝানোর জন্য ধর্মরূপ বৃষ পশুরূপ বৃষে রূপান্তরিত।

(৫) ধর্মের পূজা যে প্রস্তরখণ্ডে হয় তাকে 'কূর্ম' বলে। হিন্দু শাস্ত্রে বিষ্ণুর 'কূর্ম' অবতার স্বীকৃত। ফলে ধর্ম ও বিষ্ণু যে একই তা প্রমাণিত হয়।

(৬) বর্ধমান জেলায় ধর্মরাজ সূর্য রূপে পূজিত হয়। সূর্য বা আদিত্যেরও ধর্ম নাম হিন্দুশাস্ত্রে দেখা যায়। তাছাড়া সূর্যে কুষ্ঠরোগ নিরাময়ের ক্ষমতা ধর্মরাজেরও আছে। তাই ধর্মরাজ সূর্য বা আদিত্য। সূর্যের সপ্তরশ্মিকে সপ্ত অশ্বের সঙ্গে কল্পনা করা হয়েছে। ধর্মঠাকুরের থানেও মাটির ঘোড়া গ্রামবাসীরা দেন; তাঁদের বিশ্বাস ধর্মঠাকুর ঘোড়ায় চেপে আকাশে ঘুরে বেড়ান।

(৭) শিবের মতন ধর্মরাজেরও আদি বাসস্থান কৈলাস - 'কৈলাস ছাড়িয়া গোঁসাঞি করহ গমন'। যদি ধর্মরাজ অনার্য দেবতা হতেন কিংবা রাঢ়বাংলার গ্রামদেবতা হতেন তাহলে তাঁর বাসস্থান কৈলাস হয় কি করে? কৈলাসের কথা তো আর্যসাহিত্যে আছে। শিবের মতন ধর্মরাজকেও 'নিরঞ্জন' বলা হয়। 'নিরঞ্জন' সংস্কৃত শব্দ।

(৮) যমকে হিন্দুশাস্ত্রে 'ধর্ম' বলে সম্বোধন করা হয়। বর্ধমান জেলাতেও ধর্মরাজ অনেকক্ষেত্রে 'যম' রূপে পূজা পান।

(৯) ধর্মঠাকুরের এক বিশেষ পূজার নাম 'ঘরভড়া' যা হিন্দুদেবতা সূর্যের 'গৃহভরণ'-এর নামান্তর।

(১০) ডোম পুরোহিতেরা যে প্রাচীন ও অপ্রচলিত বাংলা ভাষায় ধর্মঠাকুরের ধ্যানমন্ত্রটি উচ্চারণ করে থাকেন তার অর্থ নিম্নরূপ -

'হে ভগবান অর্কঃ (সূর্য) ,
তোমার কোন আকার নেই, রূপ নেই,

তুমি সূর্যের মধ্যে প্রকাশিত হও,
তুমি একগুচ্ছ চম্পক ফুলের মত।
তুমি আকাশে সমাসীন,
তোমার ভক্তের প্রার্থনায় তুমি সাড়া দাও।
তুমি সর্বশুক্ল সর্বপবিত্র -
তোমার আত্মা ও কৃষ্ণের আত্মা অভিন্ন।'

উপরিউক্ত ধ্যান মন্ত্র থেকে স্পষ্টতই প্রমাণিত হয় বৈদিক দেবতা সূর্য ও বিষ্ণু ডোমদের প্রভাবিত করে এবং বৈদিক ধর্মাচরণের আলোকছটা তাঁদের ওপর পড়ে। পবিত্রকে 'শুক্ল' বলা হিন্দুরীতি এবং 'কৃষ্ণ' বিষ্ণুর এক অবতার। তাছাড়া ধর্মের নিরাকার ধ্যানও আর্য মনীষার দান।

ডোম, বাগদী, হাঁড়ি প্রভৃতি অন্ত্যজশ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে ধর্মীয় আচরণের কোন সংগঠিত রূপ ছিল না। ভূত-প্রেত ও বিভিন্ন অলৌকিক শক্তিতে তারা বিশ্বাসী ছিল। ম্যাজিক বা জাদু প্রভৃতিতে তারা বিস্ময় অনুভব করত। যখন কালক্রমে আর্য মণীষার পুতধারার স্পর্শ তারা পেল তখন আর্য দেবদেবীকেই নিজেদের আঙ্গিকে তারা রূপ দিল। ধর্মের পূজা কিংবা শিবের গাজনে তার পরিচয় পাওয়া যায়। যেহেতু মূল আর্যধর্মের মধ্যে তারা অঙ্গীভুত হয়নি তাই আর্য অনুকরণে নিজেদেরকে সাজিয়েছেন; যেমন গাজনে পৈতের মত সূতো করে তারা 'গাজুনে ব্রাহ্মণ' সাজেন। ফলে লোকধর্ম আসলে বৈদিক ঐতিহ্যাশ্রয়ী- একথা প্রমাণিত হয়।

ধর্মঠাকুর ঃ স্থানীয় নাম

বর্ধমান জেলায় ধর্মরাজ বা ধর্মঠাকুর বিভিন্ন নামে পরিচিত। সেগুলির মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত নাম- (১) কালুরায়, (২) বাঁকারায়, (৩) শ্যামরায় এবং (৪) কালাচাঁদ।
এছাড়া এই জেলার পার্শ্ববর্তী জেলা বাঁকুড়া, বীরভুম, হুগলীতে ধর্মঠাকুর আরও কয়েকটি নামে পরিচিত; যথাক্রমে - (১) যাত্রাসিদ্ধি, (২) জগৎরায়, (৩) বৃদ্ধরায়, (৪) বংশীধারী, (৫) লক্ষ্মীনাথ, (৬) বাঁকুড়ারায়, (৭) দলমাদল, (৮) চূড়ামণি, (৯) মদনরায়, (১০) রসিকরায়, (১১) অনন্তরায়, (১২) লক্ষ্মীনারায়ণ, (১৩) গঙ্গাধর, (১৪) শ্যামরায় ইত্যাদি।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে শ্যাম, বাঁকা, কালো রঙের জন্য কালাচাঁদ বলে। কালো রঙের থেকে 'কালা' ও 'কালু' নাম হয়েছে। বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণের নাম থেকে ধর্মেরও নাম হয়েছে 'বংশীধারী'। রাধার পাশে শ্রীকৃষ্ণের বঙ্কিম অর্থ্যাৎ কিছুটা বাঁকা ভাবে অবস্থানের কথা স্মরণ রেখে ধর্মেরও নাম 'বাঁকারায়'। শিবকে 'গঙ্গাধর' এবং 'বৃদ্ধ' অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ বলে (যথা জামালপুরের 'বুড়োরাজ')। এছাড়া ধর্মের বাকী নামগুলিও বিষ্ণুর নাম যথা - লক্ষ্মীনাথ, মদন, অনন্ত, লক্ষ্মীনারায়ণ ইত্যাদি। বিষ্ণুর অবতার শ্রীকৃষ্ণকে রসিকরাজ বা রসিকশ্রেষ্ঠ বলে। সেজন্য রাঢ়বাংলায় বিষ্ণুভাবে পূজিত ধর্মরাজের নাম হয়েছে 'রসিকরায়'। তাছাড়া

'যাত্রা'য় ধর্মরাজ যাতে সিদ্ধি বা সফলতা দেন সেজন্য অনেক জায়গায় তিনি 'যাত্রাসিদ্ধি'। জগতের অধীশ্বর বলে তিনি 'জগৎরায়'।

ধর্মনামের উৎপত্তি নানা মুনির নানা মত

ভারতবর্ষের ধর্ম এবং সংস্কৃতির সকল ক্ষেত্রে পার্বত্য জাতি-উপজাতি অথবা কোন বিদেশী প্রভাব আছে যে কোন ভাবে দেখানোর চেষ্টা করে গেছেন অনেক আচার্য্যস্থানীয় পণ্ডিতেরা। তবে মজার বিষয় আর্যদের আদি বাসভূমির মতনই 'ধর্ম' নামের উৎপত্তি বিষয়ে তাঁরা একে অপরের থেকে ভিন্ন মতাবলম্বী। ধর্মনামের উৎপত্তি বিষয়ে বিভিন্ন মতগুলি নিম্নরূপ-

(১) সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, 'কূর্মবাচক কোন অষ্ট্রিক শব্দ 'দড়ম' থেকে 'ধর্ম' শব্দটি এসে থাকবে।'(Buddhist Survival in Bengal - B.C. Law, Vol.(Part -I) page 77-78 - দ্রষ্টব্যঃ 'রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর ঃ শ্রী অমলেন্দু মিত্র, ফার্মা, কে.এল, পৃষ্ঠা ৯৪)

(২) ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন, 'ধর্ম শব্দটি 'ডোমরাজ' বা 'ডোমরায়ে'র সংস্কৃত (Sanskritised) রূপ।'

(৩) শ্রী সুধাংশু রায় আবার ধর্ম নামের উৎপত্তি মিশর দেশে বলে মত দিয়েছেন। তাঁর মতে মিশরীয় শব্দ 'দো - অহোম - রা' থেকে ধর্ম শব্দ এসেছে! (দ্রষ্টব্যঃ Prehistoric India & Ancient Egypt)

(৪) আবার অমলেন্দু মিত্র অষ্ট্রিক ভাষায় প্রাপ্ত 'Dharamdak'থেকে সংস্কৃত ধর্ম শব্দের উৎপত্তি বলে অনুমান করেছেন। তাঁরমতে সাঁওতালি ও ওঁরাওদের 'করম' শব্দ থেকে 'ধরম' শব্দ ও 'ধরম' শব্দ থেকে ধর্ম শব্দ এসেছে।

সিউড়ির সেকমপুরে সাঁওতালি বিবাহের সময় 'দরম ডাক' থেকে সংস্কৃত ধর্ম শব্দ এসেছে বলে তিনি ধরে নিয়েছেন। (দ্রষ্টব্যঃ রাঢ়ের সংস্কৃতি ধর্মঠাকুর, পৃষ্ঠা ৯৫)

একদিন হয়ত গবেষকরা আবিষ্কার করবেন যে, 'বেদ' শব্দটি কোন সাঁওতালি, ওঁরাও বা মুণ্ডা শব্দ কিংবা নীলনদের তীর থেকে অথবা টাইগ্রীস-ইউফ্রেটিস নদীর তীর থেকে উঠে এসেছে। অনুমানকে প্রমাণ বলে চালাতে বেশী সময় লাগে না।

ধর্ম : বৌদ্ধ প্রভাব

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ধর্মরাজকে বুদ্ধদেব বলেছেন। বুদ্ধপূর্ণিমায় ধর্মপূজা, বুদ্ধের আরও এক নাম 'ধর্মরাজ' এবং ত্রিরত্নের এক রত্ন ধর্ম ইত্যাদি তথ্য দিয়ে শাস্ত্রী মহাশয় ধর্মকে বুদ্ধদেব বানিয়েছেন। অথচ বেদের যুগ থেকে পূর্ণিমার গুরুত্ব আছে এবং 'ধর্ম' শব্দটি ব্যক্তিবাচক হিসাবেও ব্যবহৃত হয়ে আসছে। যুধিষ্ঠিরকেও তো 'ধর্মরাজ' বলা

হয়েছে, শিব ও বিষ্ণুর বিভিন্ন 'ধর্ম' নাম আছে। শাস্ত্রী মহাশয় এই প্রমাণগুলিকে উপেক্ষা করেছেন। ধর্মঠাকুরের সঙ্গে যমের সম্পর্কও তো আছে - 'যমস্য ধর্মরাজস্য' বা 'যমোহপিঃ ধর্মরাজ'। শতপথ ব্রাহ্মণে জলকে ধর্ম বলা হয়েছে। ইন্দ্র 'ধর্ম' রূপে পরিচিত। তবে বৌদ্ধরা 'ধর্ম' দ্বারা প্রভাবিত। বৌদ্ধ ধর্মের মূল ভিত্তি আর্যধর্ম। বৌদ্ধধর্মের ভূমি ভারতবর্ষ, বিদেশে নয় - ফলে বুদ্ধদেবকে 'ধর্মরাজ' বলা স্বাভাবিক। আর্যদের চারটি পুরুষার্থের মধ্যে প্রথম পুরুষার্থ 'ধর্ম' বৌদ্ধদেরও ত্রিরত্নের প্রথম রত্ন। মহাজান বৌদ্ধরা রাঢ়বাংলায় হিন্দু তন্ত্রের সঙ্গে ধর্মপূজাকেও গ্রহণ করে। অনেক বৌদ্ধস্তূপ ধর্মস্তূপ রূপে পূজো পেতে শুরু করে।

ধর্মরাজের কাছে বলি

ধর্মপূজায় পশুবলি অপরিহার্য। যেখানে ধর্মরাজ 'বিষ্ণু' রূপে পূজিত হন সেখানে অবশ্য পশুবলি হয় না - এটা ভক্তিবাদী বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব। বেদে প্রায় সকল দেবতার উদ্দেশ্যে পশু উৎসর্গের কথা পাওয়া যায়। বেদের বিষ্ণু, শিব, সূর্য, বরুণ দেবতাকে 'ধর্মরাজ' বানিয়েছেন রাঢ়বঙ্গীয়রা। পশুবলি বৈদিক যজ্ঞাদির ক্ষেত্রে যেমন দেখা গেছে তেমনই তান্ত্রিক দেবমণ্ডলীর পূজাতেও তার প্রভাব ব্যাপকভাবে প্রচারিত। বহু প্রাচীনকাল থেকেই সকল শ্রেণীর মানুষের ধর্মীয় আচারের মধ্যে পশুবলি অন্যতম। তবে স্থানভেদে, সংস্কারভেদে, খাদ্যাভ্যাসভেদে এবং সঙ্গতিভেদে দেবতার কাছে ভিন্ন ভিন্ন পশুবলির নিদর্শন পাওয়া যায়। ডোম, বাগ্‌দি, হাঁড়ি ইত্যাদি অন্ত্যজজাতিরা দেবতার কাছে শুয়োর বলি দেয়। অনেক জায়গায় অন্ত্যজজাতিরা মুরগী বলি দেয়। বীরভুমে 'মুরগী ঠাকরুণ' বলে একজন দেবী আছেন। ধর্মরাজের কাছে বলির নানা পদ্ধতি। কোথাও ভৈরবের সামনে বলি হয় কোথাও বা ধর্মরাজের পাশে মনসা দেবীর সামনে বলি দেওয়া হয়। মানসিক্ পালনের জন্য ধর্মরাজের সামনে অনেকে শ্বেতছাগ বলি দেয়। জমির ফলন জাতে ভালো হয় সেই উদ্দেশ্যে ধর্মরাজের সামনে বলি দেওয়ার প্রথা আছে। বৈদিক দেবতা শিব সমগ্র রাঢ়বঙ্গে গণদেবতা ধর্মরাজে রূপান্তরিত। শিব কৃষির দেবতা, ধর্মরাজের সঙ্গেও কৃষির সম্পর্ক আছে। শিব বা রুদ্র কিভাবে 'ধর্মঠাকুর হয়েছে তা বৈদিক দেবতার পরিচয়ে রুদ্র অংশে আলোচনা করা হয়েছে। বর্ধমানের ভাতাড় থানার 'রায় রামচন্দ্রপুরে' একটি লম্বা খুঁটায় পরপর ৯ টি ছাগ রেখে এক কোণে বলি হয়। পরে এককোণে ৫ টি, ৩টি, ২টি এবং ১টি - এভাবে বলি হয়।

ধর্মরাজের পূজোয় বেতের ছাড়

আদিম যুগে তফসিলী জাতি উপজাতিদের মধ্যে ধর্মের নামে একপ্রকার কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। তুক্‌তাক্ , রোগশান্তি, ভূতবিতাড়ন ইত্যাদির জন্য নানা প্রকার অদ্ভুত ক্রিয়াকাণ্ডে বিশ্বাসী ছিল তারা। পরে উন্নত আর্যসভ্যতার স্পর্শে ধর্ম আচরণের ভাববাদী পরিকাঠামো তৈরী করে। বৈদিক বিভিন্ন দেবতাকে আপন যোগ্যতা অনুযায়ী গ্রহণ করলেও পুরোনো নানাপ্রকার আচরণও এর সঙ্গে যুক্ত করে নেয়। বৈদিক আর্যদের ধর্মীয় জীবনকে আপন

যোগ্যতা অনুযায়ী গ্রহণ করে - দেবতাদের বিভিন্ন বৈদিক নাম উল্লেখ না করে এই অশিক্ষিত জনগোষ্ঠী সাধারণভাবে 'ধর্ম' শব্দটি গ্রহণ করে।

এই উপজাতিদের মধ্যে বেতের ছড়ি নিয়ে ভূত তাড়ানো প্রথা প্রচলিত ছিল। তাছাড়া বেতের ছড়ি নিয়ে রোগশান্তি করত। কোথাও আবার বন্য জন্তুর ছাল দিয়ে তৈরী মুখোশ পড়ে ভূত তাড়ানো প্রথা প্রচলিত ছিল। আদিম জাতি উপজাতিদের এই সংস্কার ধর্মপূজোর ক্ষেত্রে ঢুকে গেছে। এই সংস্কার ধর্মের গাজনে প্রচলিত ছিল।'ধর্মরাজ' যেহেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিবরূপে পূজিত ; তাই পরবর্তীকালে শিবের গাজনে 'বেত্র' ব্যবহারের প্রথা প্রচলন হয়।

ধর্মঠাকুর ও শাকম্ভরী

মাজিগ্রামে ধর্মঠাকুরের সঙ্গে শাকম্ভরী দেবীর মদন চতুদর্শীর দিন বিবাহের অনুষ্ঠান বসে। প্রকৃতপক্ষে এই বিবাহে গ্রাম দেবতা দেউলেশ্বর শিবের সঙ্গে দেবীর বিবাহের অনুষ্ঠান হয় কিন্তু প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী পাত্র ও পাত্রী পক্ষের বিবাদের ফলে শেষ পর্যন্ত বিয়ে ভেঙে যায়। পাত্রপক্ষ দাবী তোলে, 'কালো মেয়ের সঙ্গে পাত্রের বিবাহ হবে না।' কন্যা পক্ষ তখন বলে , 'বুড়ো বরের সঙ্গে তারা মেয়ের বিয়ে দেবে না।' পরে উভয় পক্ষের কিছুক্ষণ বাদানুবাদের পর শেষ পর্যন্ত সবাই মিলে ছড়া কেটে বলে

'কালো কনে বুড়ো বর ।
বিয়ে হল না চল ঘর।।'

অনেকে শাকম্ভরীকে অনার্যদেবী বলেন। এই বিবাহ উৎসবটিকে লক্ষ্য রেখে অনেক গবেষক একে আর্য - অনার্য সংঘর্ষ বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু প্রথমতঃ মার্কণ্ডেয় ঋষির বর্ণিত মার্কণ্ডেয় পুরাণের শ্রী শ্রী সপ্তশতী চণ্ডী-তে শাকম্ভরীর উল্লেখ পাওয়া যায়।

ততোহহমখিলং লোকমাত্মাদেহসমুদ্ভবৈঃ।
ভবিষ্যামি সুরাঃ শাকৈরাবৃষ্টেঃ প্রাণধারকৈঃ।।[৪৮]
শাকম্ভরীতি বিখ্যাতিং তদা যাস্যাম্যহং ভুবি।
তত্রৈব চ বধিষ্যামি দুর্গমাখ্যাং মহাসুরম্।।[৪৯]

— শ্রী শ্রী চণ্ডী : একাদশ অধ্যায়।

শাকম্ভরী চণ্ডীর এক রূপ। দ্বিতীয়তঃ শাকম্ভরী মূর্তিটি সিংহবাহিনী চতুর্ভুজা। তৃতীয়তঃ চতুদর্শী তিথি ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অন্যতম মান্য তিথি এবং দেবী পুজার ক্ষেত্রে এই তিথির বিশেষ গুরুত্ব শ্রী শ্রী চণ্ডীতে 'কীলকস্তবে' উল্লেখ পাওয়া যায়। চতুর্থতঃ তফসিলী জাতি উপজাতি বা ব্রাহ্মণ্য বহির্ভূত সংস্কৃতিতে শাকম্ভরী দেবীব পূজার নিদর্শন পাওয়া যায় না। পঞ্চমতঃ বিবাহের সময় বাদানুবাদ থেকে শাকম্ভরী ও দেউলেশ্বরের মধ্যে অনার্য প্রভাবের কোন নিশ্চিত প্রমাণ গবেষকেরা দেখাতে পারেননি। বরং পরবর্তীকালে নানা আধুনিক পুরাণ এবং অবচীন উপপুরাণে নানাপ্রকার অর্থহীন লৌকিক সাহিত্যে নানা উদ্ভট গল্প

রচনা করা হয়। মাজিগ্রামে শাকম্ভরীর বিবাহ উৎসবে ওই উদ্ভট গল্প স্থান পাওয়া আশ্চর্য কিছু নয়। তাছাড়া রাঢ়বাংলার এইসব জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন সংস্কার ও বিশ্বাস প্রচলিত ছিল, যাদের সাধারণভাবে কোন অর্থ হয় না; ঐ সকল অর্থহীন ক্রিয়াকলাপ এভাবে দেবীপূজার সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকতে পারে। হরপ্পায় প্রাপ্ত লতাগুল্ম যুক্ত দেবী অনার্য দেবী বলা যায় না। হরপ্পায় সংস্কৃতি প্রত্নতাত্ত্বিক স্যার অরেল স্টাইনের সমীক্ষা অনুযায়ী বৈদিক সংস্কৃতি থেকে অভিন্ন।

ভাঁড়াল নাচানো

আদিম জাতিদের মধ্যে প্রচলিত rain charm রাঢ় বাংলায় ধর্মপূজায় ভাঁড়ালের ক্রিয়ারূপে প্রচলিত হয়। মূল পূজার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। ভাঁড়ে করে মদ নিয়ে আসা হয়। কোথাও মদের পরিবর্তে দুধ এবং গঙ্গাজল থাকে। এমনকি জিভে বা দেহের বিভিন্ন জায়গায় বাণ ফোড়া বা ছুঁচ ফোড়া আদিম জাতিদের নানা সংস্কার থেকে এসেছে। তবে মনে রাখতে হবে যে, মূল পূজার বাইরে এইসব বহিরঙ্গ সংস্কার হিসাবে রয়ে গেছে।

মনসা

বর্ধমান জেলার অন্যতম লৌকিক দেবী মনসা। 'মনসা' শব্দটি মূলতঃ সংস্কৃত শব্দ। মানব মনকে 'মনসা' বলে। 'মনস' শব্দের পরে 'আপ্' প্রত্যয় যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ বাচক শব্দ 'মনসা' সৃষ্টি হয়েছে। মনসাকে 'সর্প' বলে। 'সর্প' শব্দ থেকে প্রাকৃত 'সাপ' শব্দটি এসেছে। বেদে 'সর্প' শব্দটি আছে।

নমোহস্তু সর্পেভ্যো যে কে চ পৃথিবীমনু।
যে অন্তরীক্ষে যে দিবি তেভ্যঃ সর্পেভ্যো নমঃ।।
যা ইষবো যাতুধানানাং যে বা বনস্পতী নুর।
যে বাবটেষু শেরতে তেভ্যঃ সর্পেভ্যো নমঃ।।
যে বামী রোচনে দিবো যে বা সূর্যস্য রশ্মিষু।
যেষামপ্সু সদম্‌কৃতং তেভ্য সর্পেভ্যো নমঃ।।
(শুক্ল যজুর্বেদ ১৩ । ৬ - ৮)

অনুবাদ ঃ ' পৃথিবীতে যারা রয়েছে , সে সর্পদের নমস্কার করি, যারা অন্তরীক্ষে ও যারা দ্যুলোকে রয়েছে, সে সর্পদের নমস্কার করি।।

'যারা রাক্ষসদের বাণরূপে বর্তমান , যারা চন্দন প্রভৃতি বৃক্ষ বেষ্টন করে থাকে, যারা গর্তে শুয়ে থাকে সে সর্পদের নমস্কার।।

' আমাদের অদৃশ্য দ্যুলোকের দীপ্ত স্থানে যে সর্প রয়েছে , সূর্যের কিরণে যে সর্প অবস্থান করে, যারা জলে থাকে, সে সর্পদের নমস্কার করি।।'[৮৬]

দেবী ভাগবতে মনসাকে কশ্যপ মুনির মানসী কন্যা বলা হয়েছে। মানুষের মনকে মনসার লীলাভূমি বলা হয়েছে।

'সা চ কন্যা ভগবতী কশ্যপস্য চ মানসী
তেনৈব মনসা দেবী মনসা বা চ দীব্যতি।।'

'মনসা' প্রকৃতপক্ষে 'মন' বাচক শব্দ। মন মানুষের মিত্র আবার শত্রুও সেজন্য মনসা দেবী জ্ঞানদায়িনী যেমন, তেমনি আবার সংসার দুঃখের কারণ। হিন্দু জ্যোতিষে মনের অধিপতি দেবতারূপে চাঁদ বা চন্দ্রকে মনে করা হয়। এই ধারণা থেকে পরবর্তীকালে মনসামঙ্গলে চাঁদসদাগরের কাহিনীর জন্ম।

শক্তির গতি তরঙ্গাকার আবার মনসা বা সর্পের গতিও তরঙ্গাকার। সেজন্য যোগশক্তি বা কুলকুণ্ডলিনীর শক্তি হিসাবে মনসা বা সর্পের মান্যতা হিন্দুশাস্ত্রে বহু প্রাচীনকাল থেকেই আছে। পতঞ্জলের যোগদর্শনকে অনেকে অহি (সর্প) দর্শন বলে। যোগেশ্বর মহাদেবের মাথায় 'সাপ' সেই যোগশক্তিকেই প্রকাশ করছে। তাছাড়া পুরাণে দেখা যায় যে সৃষ্টির প্রারম্ভে মহাবিষ্ণু অনন্তনাগের ওপর শয্যায় শায়িত। মনসাকে নাগমাতা, নাগেশ্বরী প্রভৃতি বলা হয়। অনন্ত, বাসুকি, পদ্ম, মহাপদ্ম, তক্ষক, কুলীর, কর্কট, শঙ্খ - এই অষ্ট নাগের দ্বারা মনসাদেবী পরিবৃতা। পুরাণে নাগজাতির উল্লেখ পাওয়া যায়।

মনসার পূজার সময় আষাঢ় মাসের পঞ্চমী তিথি, যা নাগপঞ্চমী নামে পরিচিত। এসবেই হিন্দু প্রভাব স্পষ্ট। বর্ধমান জেলায় মনসাকে অনেক জায়গায় লক্ষ্মীর সঙ্গে এক করে দেখা হয়েছে। বর্ধমানে এই পূজো জৈষ্ঠ মাসের 'দশহরা' অর্থাৎ দশমী থেকে ভাদ্রের সংক্রান্তি পর্যন্ত হয়।

সরস্বতীর মতো মনসার বাহন হংস। হংসের জল ও দুধের জ্ঞান আছে। সেরকমভাবে যোগজ মনও অসার বস্তু (জল) - কে ত্যাগ করে এবং সারবস্তু (দুধ) গ্রহণ করে।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, দেবীভাগবত ছাড়া মহাভারতেও মনসার কথা আছে ফলে বর্ধমান জেলায় লৌকিক দেবী হিসাবে যে মনসা দেবীর পূজা হয় তা আসলে হিন্দুদের বৈদিক ও পৌরাণিক দেবী।

মনসা বর্ধমানে অনেক জায়গায় চণ্ডীরূপে পূজিত। বর্ধমান থানায় 'সিংহপাড়া' গ্রামে 'মোরাইচণ্ডী'-র পূজা হয় যা আসলে মনসা পূজা। বৈদিক 'অপ্রধান' দেবী মনসা রাঢ় বাংলায় বিশেষত বর্ধমান ও বীরভূম জেলায় অন্যতম প্রধান দেবীরূপে পূজিত হয়। বাংলা নদীমাতৃক দেশ ফলে সর্পের ভয় থাকা স্বাভাবিক। সর্পের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য সর্পদেবী 'মনসা' পূজার যে ব্যাপ্তি ঘটবে তাও স্বাভাবিক। তাছাড়া বর্ধমান জেলার

গণদেবতা শিব এবং শিবের কন্যা হিসাবে 'মনসা'কে পুরাণকাররা বর্ণনা করেছেন। ফলে শিব কন্যা হিসাবে মনসার খ্যাতি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। বিষ হরণ করেন বলে মনসা 'বিষহরি' আবার মনের চিন্তা লাঘব করেন বলে তিনি 'চিন্তামণি', লক্ষ্মীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে তিনি সম্পদ দান করেন বলে তাঁর আর এক নাম 'পদ্মকুমারী' বা 'পদ্মাবতী'। মনসার প্রাচীনতার সাক্ষী তাঁর 'বুড়ীমা' নাম । সাপদের সঙ্গে বলরামের সম্পর্ক বিষ্ণুপুরাণ থেকে জানা যায়। যদুবংশ ধ্বংসের সময় শ্রীকৃষ্ণ ও দারুক দেখেন যে, বৃক্ষতলে যোগাসনে উপবিষ্ট বলরামের মুখ থেকে প্রকাণ্ড সাপ নির্গত হচ্ছে। অনেক অপ্রধান বৈদিক দেবতা ও দেবী প্রাত্যহিক জীবনের নানা বিষয়ের জন্য 'গ্রামদেবতা' বা 'গ্রামদেবী' হয়েছেন। অশিক্ষিত মানুষ নানা প্রকার আদিব্যাধি থেকে রক্ষা পাবার জন্য, দৈনন্দিন নানা মঙ্গল কামনায় এই সকল দেবদেবীর পূজো করে। তাদের ধর্মচারণের মধ্যে কোন আধ্যাত্মিক মহান আদর্শ প্রায় থাকে না। আবার গোখরো সাপকে জাতিতে ব্রাহ্মণ বলা হয় এবং ব্রাহ্মণের মৃতদেহের মত গোখরো সাপের মৃতদেহ সৎকার হয়। মণ্ডলগ্রামের জগৎগৌরী হলেন মনসা দেবী। মেমারীতে মাঘ মাসের পূর্ণিমায় সর্পছত্র শোভিত প্রস্তরনির্মিত মনসা পূজো বিখ্যাত। 'মেজডিহি' গ্রামেও মনসা হলেন জগৎগৌরী। ভাতাড়ের ভাটাকুলে মনসার নাম 'শঙ্খিনী'। এছাড়া বর্ধমানের ভিটা গ্রামে , ভাতাড় থানার পোষলায় মনসা পূজা খুব বিখ্যাত। ছোট পোষলা, বড় পোষলা, মুসারু, নিগন, পলসোনা, প্রভৃতি গ্রামে ঝাঁকলাই সাপ দেখা যায় যা মানুষকে কামড়ায় না। আষাঢ় মাসের পঞ্চমী তিথিতে গাছতলায় ঝাঁকলাই পূজা হয়। কালনার 'নারিকেল ডাঙ্গায় ' জগৎগৌরী দুর্গা ও মনসার মিশ্র রূপ। মেমারীর চোংখণ্ডে জগৎগৌরী মনসার পূজা উপলক্ষে ঝাঁপান গান আকর্ষণীয়।

দামোদরের প্রাচীন খাত বেহুলা, গাঙ্গুর ইত্যাদি অঞ্চলে মনসা পূজার আধিক্য দেখা যায়। সম্ভবতঃ মনসা মঙ্গলের চাঁদসদাগরের কাহিনী এই অঞ্চলে মনসা পূজা প্রচলনে সাহায্য করেছে। তাছাড়া নদী পার্শ্ববর্তী গ্রামে সর্পভয় থেকে রক্ষা পাবার জন্যও মনসা পূজা প্রচলিত হয়েছে। মনসামঙ্গল কাব্যে উল্লিখিত 'চম্পকনগরী' অবস্থান বুদবুদ থানার আধুনিক কসবা চম্পাইনগরে। বর্ধমান, কালনা ও মেমারী থানার মধ্য দিয়ে বেহুলা নদী প্রবাহিত হয়েছে। মৃত স্বামী লখীন্দরকে নিয়ে বেহুলার যাত্রাপথ কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের বর্ণনা অনুযায়ী দুবরাজপুর, নবখণ্ড, জুজুটি, গোবিন্দপুর, গাঙ্গপুর, বৈদ্যপুর, হাসানহাটি, নারিকেলডাঙ্গা, দে পুর প্রভৃতি অঞ্চল। বর্ধমান জেলায় মনসা 'জগৎগৌরী', 'কঙ্কনাগ'.'কর্কটনাগ', 'শঙ্খিনী', 'বিষহরি', 'ব্রাহ্মণী' প্রভৃতি নামে পরিচিত।

শীতলা

রাঢ় বাংলার অন্যতম লৌকিক দেবী হিসাবে শীতলার পূজো হয়। বর্ধমান জেলায় শীতলা পূজা প্রচলিত আছে। বৈদিক দেবী 'অপ্' পুরাণে 'শীতলা' হয়েছেন। 'অপ' অর্থ 'জল'। বেদে জলকে মা -এরসঙ্গে তুলনা করা হয়েছে - 'আপো অস্মান্মাতরঃ'। [৮৮] পুত্রের হিতার্থী জননীর মত জল - 'উশতীরিব মাতরঃ' যিনি তাঁর কল্যাণময় রস দ্বারা - 'শিবতমো রসঃ' আমাদেব কল্যাণ করেন।

ব্যাধির ঔষধ আছে জলে; তাই জল 'ভেষজী'। স্বয়ং সোমের কাছ থেকে জলের গুণাগুণ জানা গেছে - 'সোমোহব্রবীৎ'। আয়ুর্ব্বেদের মতে ভোজনকালে স্বল্প জল পান অমৃততুল্য ('ভোজনে অমৃতং বারি'), ভোজ্যদ্রব্য জীর্ণ হলে জলপান বল বৃদ্ধি করে ('জীর্ণে বারি বলপ্রদম্'), অজীর্ণ রোগে জল পান ঔষধতুল্য ('অজীর্ণে ভেষজং বারি') কিন্তু ভোজনের পরই প্রচুর জলপান বিষতুল্য ('ভোজনান্তে বিষপ্রদম্')। [৮৯]

শীতলা দেবীর হাতে জলপূর্ণকুম্ভ। অন্য হাতে সম্মাজ্জনী, যার দ্বারা তিনি শীতল জল সিঞ্চন করে বিস্ফোটক রোগের উপশম করেন। শীতলা হলেন 'জলাভিমানী' দেবতা। তাই জলের মধ্যে শীতলাকে ধ্যান করতে বলা হয় - 'উদক মধ্যে তু ধ্যাত্বা সংপূজয়েন্নরঃ'। জলের স্বভাব শীতলতা। জল আমাদেরকে শীতল করে। সেজন্য বেদের 'অপ্' দেবতা পুরাণে 'শীতলা' হয়েছেন, যিনি বর্ধমান সহ রাঢ় বাংলায় লৌকিক দেবীরূপে পূজো পাচ্ছেন। শীতলা যেমন দেবী, বৈদিক 'অপ্'ও স্ত্রীলিঙ্গ বাচক শব্দ এবং বেদেই 'অপ্' অর্থাৎ জলকে 'মা' বলা হয়েছে।

মসুর ডালের মত দেহে বসন্তরোগের গুটি বের হয়। বসন্তরোগে দেহে প্রদাহ হয় তখন রোগী শীতলতা চায় সেজন্য বসন্তরোগের আর এক নাম শীতলা - 'মসূর্য্যের হি শীতলা'।

বাংলাদেশে শূর্প অর্থাৎ কুলো মঙ্গলবাচক বস্তু। শীতলা ব্যাধি দূর করে আমাদের মঙ্গলবিধান করেন বলে তাঁর মাথায় কুলো বা শূর্প থাকে। আবার দেবীর বাহন গর্দভ। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের মতে গর্দ্দভীর দুধে বসন্ত রোগের নিরাময়ের ক্ষমতা আছে। পণ্ডিত গয়া দাসের মতে গর্দ্দভীর দুধ বসন্ত রোগের স্ফোটক নির্গমণ করেনা - 'আদৌ যে পিবন্তি খরনাদপয়ঃ তেষাং ভবন্তি ন কদাচিদপীহ দেহে শীতলিকা বিকারাঃ।' বসন্ত রোগের দ্বিতীয় অবস্থায় গর্দ্দভীর দুধ ক্ষীর তুল্য - 'রাসভস্য ক্ষীরং হিতং'। যোগরত্নাকরের মতে গর্দ্দভীর দুধে জ্বর নাশ করে - 'রাসভস্য পয়ঃ পীতং শীতলাজ্বর নাশনং'। বৈদ্যামৃতের মতে গদ্দর্ভীর দুধ বিস্ফোটক নিবারণ করে। রাজ নির্ঘন্টু মতে গদ্দর্ভের মূত্র কফ ও বায়ু নিবারণ করে। স্তন দুগ্ধের অভাবে শিশুকে গদ্দর্ভীর দুগ্ধ পান করাতে বিধান দিয়েছে 'ভৈষজ্য রত্নাবলী'।

বর্ধমান জেলার শহর ও গ্রামে বহু জায়গায় শীতলার মন্দির আছে ও শীতলা পূজোর চলন আছে। স্ত্রী - পুরুষ নির্বিশেষে শীতলার পূজো করতে পারে। জামালপুরের 'সালানপুর' গ্রামে নাথ সম্প্রদায় শীতলা পূজো প্রচলন করেন।

চণ্ডী

'মাতৃকাদেবী' বর্ণনার ক্ষেত্রে 'চণ্ডী' সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

সংস্কার

শিক্ষা ও সচেতনার অভাব খুব প্রাচীনকাল থেকে গ্রামে গঞ্জে নানা অযৌক্তিক সংস্কার তৈরী

হয়েছে। নিসর্গিক নিয়ম সম্বন্ধে অজ্ঞতা লোক-বিশ্বাসের জন্ম দিয়েছে। আদি ব্যাধি থেকে পরিত্রাণ পেতে চেয়েছে মানুষ। সেজন্য ঔষধাদির গ্রহণের সঙ্গে নানা দেবতার পূজোও করেছে। বৈদিক অনেক অপ্রধান দেবীকে নিজেদের মতন করে নিয়ে পূজো করেছে অশিক্ষিত - গরীব-গুর্বো মানুষেরা। অবশ্য চিকিৎসা শাস্ত্রের বিদ্যাকে দেবদেবীর রূপ তৈরীতেও যোগ করেছে। প্রতিটি বিষয়েই একজন দেবতা আছেন এবং তাঁর কৃপাতেই রোগের আরোগ্য হয় বলে তাঁরা বিশ্বাস করেছেন। বর্ধমান সহ সমগ্র রাঢ়বঙ্গেই এইসব তথাকথিত লৌকিক দেবদেবীর উপাসনার ক্ষেত্রে কোন দার্শনিক চিন্তার উন্মেষ দেখা যায়নি। সাধারণ মানুষ ব্যাধির হাত থেকে রক্ষা পেতে চেয়েছে। সেজন্য বসন্তরোগের জন্য শীতলা, কুষ্ঠরোগের জন্য ধর্মরাজ, কলেরার জন্য ওলাইচণ্ডী (গ্রাম বাংলায় কলেরাকে 'ওলা' বলে তাই বৈদিক দেবী দুর্গার তান্ত্রিক নাম চণ্ডীর সঙ্গে রোগের নাম যুক্ত করে, তিনি হলেন ওলাইচণ্ডী), সর্বপ্রকার মঙ্গলের জন্য মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি দেবদেবীর পূজো করা হয়। এমনকি বদহজম বা অগ্নিমান্দ্য রোগের জন্য অনেক গ্রামে নানা দেবতার কল্পনা করা হয়েছে। মেয়েদের বারংবার পেটের বাচ্চা নষ্ট হলে তাকে বলা হয় 'পেটনামা' বা 'পেটখসা'। সেজন্য বাংলার মেয়েরা বেতের ব্রত করেন। মঙ্গল অথবা শনিবারে পেটে এক টুকরো বেত বাঁধে এবং 'বেত' দেবতার উদ্দেশ্যে চিঁড়ে, চিনি, দই ও ফল পূজো দেয়। তাছাড়া কৃষিপ্রধান বাংলাদেশে ফসলের মরশুমে নানা দেবীর পূজো করা হয়। তারমধ্যে সবচেয়ে বড় উৎসব 'কোজাগরী লক্ষ্মী' পূজো। এছাড়া এখনও বর্ধমান সহ সমগ্র বাংলাদেশের মেয়েরা 'ক্ষেত্রঠাকুর', 'পোষপালন' প্রভৃতি দেবীর পূজো করে।

বৃক্ষ পূজো

বর্ধমান জেলায় অনেক জায়গায় 'অশ্বত্থ' বৃক্ষের পূজো দেখা যায়। বৃক্ষ পূজোকে অনেকে উপজাতিদের পূজো বলেন। বেদে 'অশ্বত্থ' বৃক্ষের নাম আছে। যজ্ঞের 'সোমপাত্র' অশ্বত্থ বৃক্ষ দ্বারা তৈরী হত এবং অগ্নি চয়নের জন্য এই গাছের কাষ্ঠ দ্বারা তৈরী হত 'প্রমন্থ' ও 'অরণিকাষ্ঠ'। খুব প্রাচীনকাল থেকেই অশ্বত্থ পাদপ অতি পবিত্র। বৃক্ষনামে বর্ধমানের অনেক গ্রামনাম। বর্ধমানের 'অশ্বত্থগড়িয়া', 'আমাড়', 'আমডিহি', 'অর্জুনডিহি', 'কাঞ্চননগর', 'বেলকাশ', 'কুলেপাড়া', 'আমলাজোড়' প্রভৃতি বিভিন্ন বৃক্ষ নাম গ্রামনাম হয়েছে। গীতায় অশ্বত্থকে সম্মান জানিয়ে ভগবান বলেছেন, "অশ্বত্থ সর্ববৃক্ষানাম্"। যজ্ঞডুমুর, নিম, বেল প্রভৃতি গাছকে খুবই প্রাচীনকাল থেকেই সনাতন ধর্মে শ্রদ্ধার চোখে দেখা হয়। চণ্ডীতে 'শাকম্ভরী' দেবী আছেন - বর্ধমানের মাজিগ্রামে 'শাকম্ভরী'র পূজো হয়। তাছাড়া শাক্ততন্ত্রে 'নবপত্রিকা' হল কদলী, কচু, হরিদ্রা, জয়ন্তী, বিল্ব, রক্তদাড়িম্ব, অশোক, মানগাছ ও ধান্য। নবপত্রিকা দেবীর নবদুর্গা রূপের প্রতীক। কদলীতে ব্রাহ্মণী, কচুতে কালিকাদেবী, হরিদ্রাতে দুর্গা, জয়ন্তীতে কৌমারী, বিল্বগাছে দেবী শিবা, রক্তদাড়িম্বে রক্ত দন্তিকা, অশোকে শোকরহিতা, মানগাছে চামুণ্ডা এবং ধান্যে লক্ষ্মীদেবীর অবস্থান। এছাড়া বিভিন্ন পূজোয় কলা, ডাব, আম্র পল্লব, নারকেল ব্যবহৃত হয়।

বর্ধমান জেলায় বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম

ডঃ পঞ্চানন মণ্ডলের মতে বুদ্ধদেব ধর্মপ্রচারের জন্য বর্ধমানে এসেছিলেন। তিনি সূহ্মভূমির 'শেতক' ও 'দেশক' নগরে অবস্থান করেন। এই দুই অঞ্চল বর্তমানে আউসগ্রাম থানার সুয়াতা ও দেয়াশা গ্রাম। 'বনপাশ' অঞ্চলে বুদ্ধদেব তপস্যা করেন ও কল্যাণ সূত্রের ব্যাখ্যা করেন।[১০] এই সব অঞ্চলে শিব 'বুদ্ধেশ্বর' হিসাবে পূজিত। তাছাড়া বুদ্ধের জীবন সম্বন্ধে কিছু ছড়া প্রচলিত আছে। বর্ধমানের রামাই পণ্ডিতের লেখা 'শূন্যপুরাণ' আসলে বৌদ্ধবাদ বলে মত দিয়েছেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। ধর্মরাজের সঙ্গে বুদ্ধদেবও মিশে গেছেন। অনেক বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ধর্মরাজকে ভগবান বুদ্ধরূপে পূজো করতেন। বর্ধমানের নানা অঞ্চলে অনেক বৌদ্ধ স্তুপ ছিল যা প্রায় অধিকাংশ ধ্বংস হয়ে গেছে। কিছু বৌদ্ধ স্তূপ পীরের দরগায় বা পীরের আবাস হিসাবে পরবর্তীকালে চিহ্নিত হয়েছে। যেমন বর্ধমান শহর থেকে কিছুটা দূরে দামোদর নদীর পারে পলেমপুরে 'পীরপালম' আসলে বৌদ্ধস্তূপ। ভরতপুরে একটি বৌদ্ধস্তূপ আবিষ্কৃত হয়েছে। দক্ষিণ দামোদরে দেউল পাড়ায় বৌদ্ধ মন্দির আছে। শহর বর্ধমানে একটি পরিত্যক্ত বৌদ্ধ মন্দির আছে।

বর্ধমান জেলায় জৈন ধর্ম প্রচারিত হয়েছিল। প্রাচীন জৈন ধর্মগ্রন্থ 'আচারাঙ্গসূত্রে' বর্ধমানের উল্লেখ আছে। মহাবীর তীর্থঙ্কর বর্ধমানে এসেছিলেন এবং ধর্মপ্রচারের জন্য বারো বৎসর এখানে কাটান। সেসময় তাঁকে কুকুরের উৎপাত সহ্য করতে হয়েছিল। জনশ্রুতি অনেক রাঢ়বাসী তাঁর পিছনে কুকুর লেলিয়ে দেন। 'আচারাঙ্গ সূত্র' মতে মহাবীরের পূর্বেও অনেক তীর্থঙ্কর বর্ধমান ভূমিতে ধর্মপ্রচার করেন। বর্ধমান শহরের সর্বমঙ্গলা মন্দিরের পিছনে গড়গড়াঘাটে মহাবীর তীর্থঙ্কর একজায়গায় বিশ্রাম নেন এবং সেখানে পরবর্তীকালে জৈনপ্রভাব গড়ে উঠেছিল। ১৫১০ সালে ঐ স্থান দর্শন করেন গুরুনানক। এখন ঐ জায়গায় শিখ সম্প্রদায়ের 'গুরুদুয়ারা' তৈরী হয়েছে। বাবলাডিহির ন্যাংটেশ্বরকে অনেকে জৈন তীর্থঙ্কর শান্তিনাথ বলে দাবী করেন।

জামালপুর থানার সাতদেউলিয়া (মসাগ্রাম স্টেশন থেকে দু'কিলোমিটার দূরে) গ্রামে ইষ্টক নির্মিত শিখরদেউলটি জৈন দেবালয়। এই মন্দিরটির মাথায় একখণ্ড পাথরের ওপর মোট ১৪১ টি জৈন তীর্থঙ্করের মূর্তি খোদিত ছিল। সবচেয়ে ওপরে ছিল বৃষবাহন সহ স্বয়ং ঋষভনাথ। বর্তমানে এই প্রস্তর খণ্ডটি বেহালার সরকারী মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। প্রাচীনকালে এখানে সাতটি দেউল ছিল, তাই গ্রামের নাম হয়েছে 'সাতদেউলিয়া'। 'ইন্দ্রাণী' অঞ্চলে যে সমস্ত পুরাবস্তু পাওয়া গেছে তার মধ্যে দাঁইহাটের বেড়া নামক জায়গায় মাটি কাটার সময় প্রাপ্ত একটি তাম্রফলক বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীবাটীর রামচন্দ্র সাঁই ঐ ফলকটি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-র কাছে পাঠান। তিনি এটিকে জৈনদের 'নৌপজ্জি' বা 'নবপদ প্রতিমা' বলেন। 'নবপদ' যথাক্রমে অরিহত,সিদ্ধ, আচার্য্য, উপাধ্যায়, সর্ব্বসিদ্ধ,সম্যক্ত, জ্ঞান, চারিত্র এবং তপঃ।[১১] পাতাইঘাটের 'পাতাইচণ্ডী', একাইঘাটের 'একাইচণ্ডীকে' অনেকে জৈনদেবী বলেন তবে তা সম্পূর্ণ ভুল। এ সমস্ত হিন্দুদেবী। বায়না

থানার গোতান গ্রামে ক্ষয়গ্রস্ত দেউলপোতা ঢিবিকে অনেকে জৈনস্তূপ বলে অনুমান করেন। কালনার বৈদ্যপুর মন্দিরকে অনেকে জৈনমন্দির বলে। রায়নার শ্যামসুন্দরের পূর্ব নাম 'আহারবেলমা' ছিল। এই নাম থেকে অনেকে শ্যামসুন্দরে অতীতে জৈনপ্রভাব অনুমান করেন। সম্ভবতঃ অনুমানটি সত্য নয়। গ্রামের পশ্চিমদিকে দেড়কিলোমিটার লম্বা 'বিল' (জলাভূমি) ছিল যা 'আহার' (গ্রামবাসীর জলের অভাব মিটত বলে তা 'আহার' অর্থাৎ 'আহার্য'।) নামে পরিচিত ছিল। সেই থেকে গ্রামের নাম 'আহারবেলমা' হয়। পরে ভগবান শ্যামসুন্দরের (শ্রীকৃষ্ণ) মন্দির তৈরী হওয়ার গ্রামের নাম 'শ্যামসুন্দর' হয়। বর্ধমান জেলার উজানীগ্রামে জৈন শান্তিনাথের দণ্ডায়মান মূর্তি আছে যার নীচে লাঞ্ছন মৃগ ও পিছনে নবগ্রহের মূর্তি খোদিত আছে। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম দেববর্জিত নয়, বেদ থেকে পছন্দমত অংশগ্রহণ করেছে। বৌদ্ধগণ মূলত পশুহত্যা হয় এমন বৈদিক যজ্ঞের নিন্দা করেছেন। হীনযান বৌদ্ধরা আদিত্যপূজা ('আদিচ্চুপট্ঠানং'), মহাদেবতার পূজা ('মহতুপট্ঠানং') এবং শ্রীদেবীর ('সিরিবহানং') পূজা করতেন না। দীর্ঘনিকায় সীলকখণ্ডে এইসব দেবদেবীর পূজা করতে বারণ করা আছে। পরবর্তীকালে মহাযান বৌদ্ধরা অনেক হিন্দু তান্ত্রিক দেবী(যাদের মূল উৎস অবশ্য বেদ)-কে গ্রহন করেন। তারা, চুণ্ডা (হিন্দু দেবী চণ্ডীর মত ইনি চর্তুভুজা, ষোড়শভুজা আবার অষ্টাদশভূজা, লোহিতবর্ণ, চারহাতে যথাক্রমে কমণ্ডলু, ধ্যানমুদ্রা, জপমালা ও পুস্তক), হারিতী বসুধারা (লক্ষ্মীর বৌদ্ধরূপ, সম্পদের দেবী, এর আর এক নাম বসুধারা যা কুবেরের শক্তি, হিন্দুদেবী লক্ষ্মী-র আরাধনার সময়েও কুবেরের পূজো হয়।), সরস্বতী (হিন্দু সরস্বতীর মতন ইনিও সঙ্গীত ও কাব্যের দেবী) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। প্রমথনাথ তর্কভূষণ প্রভৃতি পণ্ডিতেরা বেদান্ত দর্শনের সঙ্গে বৌদ্ধ শূণ্যবাদের একত্ব প্রতিপাদন করেছেন। বুদ্ধদেব নিজে হিন্দুযোগী বৈশালীর ঋষি আরাঢ় (আলার) ও রাজগৃহের ঋষি রামপুত্র রুদ্রকের কাছে শিষ্যত্ব গ্রহন করেন ও যোগবিধি আয়ত্ত করেন। উরুবেলাগ্রামে(বোধগয়া) তিনি পঞ্চবর্গীয় সন্ন্যাসী কৌণ্ডিণ্য, বপ্র, ভদ্রিয়, অশ্বজিৎ ও মহানামের সঙ্গে মিলিত হন।

প্রথম জৈন তীর্থঙ্কর ঋষভনাথ। 'ঋষভ' শিবের আর এক নাম। জৈনরা শিবকে পূজা করেন। তাছাড়া হিন্দু দেবী সকলকে জৈনরা গ্রহন করেন যেমন চক্রেশ্বরী, কণিকা, মহাকালী, শ্যামা, চণ্ডা (চণ্ডী), বিজয়া, অম্বিকা, পদ্মাবতী, সিদ্ধিদায়িকা, সরস্বতী প্রভৃতি হিন্দু দেবী জৈন দেবীরূপে পূজো পায়।

বর্ধমান জেলায় ইসলাম ধর্ম

জনশ্রুতি যে, ইখতিয়ার উদ্দীন মহম্মদ বিন বখ্তিয়ার খলজি একরকম বিনাপ্রতিরোধে নদীয়া-লক্ষণাবতী জয় করেন। সময় নিয়ে মতভেদ থাকলেও তা ১২০২-১২০৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। ১৭ জন অশ্বারোহী নিয়ে বখ্তিয়ারের নবদ্বীপ বিজয় নিছক গল্পকথা। লক্ষ্মণ সেন সেই সময় বৃদ্ধ হলেও হীনবল ছিলেন না, তা না হলে ঐ বৃদ্ধ বয়সে বরেন্দ্রভূমি জয় করে 'দেবকোটে' রাজধানী স্থাপন করতে পারতেন না। বীরযোদ্ধা বলে লক্ষ্মণ সেনের পরিচিতি

ছিল। মুসলমান লেখক মিনহাজউদ্দীনও লক্ষ্মণ সেনের প্রশংসা করেন।

যাইহোক নবদ্বীপ বিজয় করতে গিয়ে বখ্‌তিয়ারকে বর্ধমান জেলার কালনা থেকে নদী পার হতে হয়েছিল। বখ্‌তিয়ার পশ্চিম ভারতের বদায়ুন থেকে প্রথমে আসেন মঙ্গলকোটে এবং সেখান থেকে কালনায় যান। শান্তিপুর ও বয়রার মধ্যবর্তী অঞ্চল 'বক্তার ঘাট' নামে পরিচিত। সম্ভবত এই ঘাট থেকেই বখ্‌তিয়ার নবদ্বীপে যায়।

মুসলিম লেখক মিনহাজউদ্দীনের 'তবকাত-ই-নাসিরী' গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে বখ্‌তিয়ার নবদ্বীপ বিজয়ের পর বহু বছর কালনা, মঙ্গলকোট, আউসগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চল হিন্দুরাজার রাজত্ব ছিল (১২৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত)। মুসলিম আগন্তুক জাফর খাঁ গাজী ১২৮৯ সালে সপ্তগ্রামের রাজাকে আক্রমণ করে পরাস্ত করেন এবং সপ্তগ্রাম নবদ্বীপের শাসনভুক্ত হয়।

তুর্কী রাজত্বকালকে ঐতিহাসিকেরা ধ্বংস-লুণ্ঠন ও অত্যাচারের তাণ্ডবের যুগ বলেছেন। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন, 'দ্বাদশ শতকের শেষপ্রান্তে পূর্বভারতে তুর্কী আক্রমণ শুরু হয়। তারপর দুই বৎসর ধরিয়া বাঙ্গলা দেশে অনিশ্চয়তার ও অরাজকতার ঝটিকা চলে।'[১৪] ডঃ অসিত কুমার ভট্টাচার্য, ডঃ ভুদেব চৌধুরী, গোপাল হালদার, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র সেন - প্রত্যেকেই এই সময়টিকে ত্রাস সঞ্চারী ও মানবতা বিধ্বংসী বলেছেন।

বাংলার কিছু কিছু জায়গায় প্রশাসনিক কর্তৃত্বের সঙ্গে মুসলিম শাসকদের দ্বারা বাংলায় ধর্মান্তকরণ সহজ হয়েছিল। সমগ্র বাংলাদেশে হিন্দুদের প্রতি অকথ্য অত্যাচার করা হত, দিতে হতো 'জিজিয়া কর'। মুসলিম হলে তাকে রাজনৈতিক সুবিধা দেওয়া হত। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন, 'ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে পর্তুগীজ দুয়ার্তে বারবোসা বাংলাদেশ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে রাজ-অনুগ্রহ পাইবার জন্য, প্রতিদিন হিন্দুরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। আবার জ্ঞাত - অজ্ঞাতসারে মুসলমানদের স্পৃষ্ট পানীয় গ্রহণ ও দ্রব্য ভোজন এমনকি নিষিদ্ধ ভোজ্য গন্ধ নাকে আসিলেও হিন্দুর জাতিচ্যুতি হইত। মুসলমান কোন হিন্দু নারীর অঙ্গ স্পর্শ করিলে এবং কোন কোন স্থলে তাহার পরিবার ও আত্মীয় - স্বজন জাতি ও ধর্মে পতিত বলিয়া গণ্য হইত। এই সমুদয় হিন্দুর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। অনেক সময় জোর করিয়া হিন্দুকে মুসলমান করা হইত- আবার কোন কোন সময়ে কেহ কেহ স্বেচ্ছায় ফকীর ও দরবেশদের প্রভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিত।'[১৫]

অর্থ ও উপহার দিয়ে মুসলমান শাসককে অভ্যর্থনা না করলে পুরো গ্রামকে ধর্মান্তরিত করা হত। দীপক কুমার দাস লিখেছেন, 'ধর্মান্তরণ কিংবা হত্যা করে আয়মাদার নিয়োগ একটি চলতি প্রথায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। কালনা ও তার আশেপাশে গ্রামে এরকম আয়মাদার(স্মরণীয় আয়মাপাড়া) বসানো হয়েছিল। পরবর্তীকালে সমুদ্রগড়ের রণজিৎ ভট্টকে মুর্শিদকুলি খাঁর আদেশে ধর্মান্তর গ্রহণ করতে হয়েছিল।'[১৬] ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দে হুগলীর পাণ্ডুয়ায় সূর্য এবং নারায়ণ মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ ও মিনার তৈরী করা হয়।

ব্রহ্মশিলায় নির্মিত সূর্য মূর্তি ভেঙ্গে উল্টোপিঠে ইউসুফ শাহের নাম খোদাই করা হয়। ১৪৯০ সালে দ্বিতীয় নাসিরুদ্দিন মাহমুদ্ শাহ্ কালনার শাসপুরে 'মজলিস সাহেব মসজিদ্' তৈরী করেন, যা আটকোণ বিশিষ্ট হিন্দুমন্দিরের ভিত্তির ওপর নির্মাণ করা হয়। কালনার দ্বিতীয় মসজিদ ফিরোজ শাহের একবছরের রাজত্বকালে নির্মিত (১৫৩২-৩৩ খ্রীষ্টাব্দে) হয় যা 'মসজিদ্-ই-জানিয়া' নামে পরিচিত ছিল। বর্তমানে এই মসজিদ নিশ্চিহ্ন। ১৫৫৪-৬০ সালের মধ্যে সুর বংশীয় মহম্মদ শাহ্ গাজীর পুত্র সুলতান গিয়াসুদ্দিন আবদুল বাহাদুর শাহ একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। মন্তেশ্বর থানার রাইগ্রামে গোপাল মন্দির ধ্বংস করে মসজিদ নির্মিত হয়। মসজিদের ভিতরের থামে ঘন্টা, পদ্ম, গণেশ, ছুটন্ত হরিণ খোদিত আছে। 'বালির বাজারে' মসজিদ নির্মাণ করেন শেখ খায়ের উল্লাহ(১৮৪৫ খ্রীঃ)। পরবর্তীকালে জবারীপাড়া, ডাঙ্গীপাড়ায় মসজিদ নির্মিত হয়। বখ্তিয়ারের নবদ্বীপ বিজয়ের সময় বর্ধমানে যে রাজবংশ ছিল তাদের রাজবাড়ি ছিল বর্ধমান শহরের 'গোদায়' (তৎকালীন গদা)।[১৭] অনেকে বলেন যে পাঠানেরা বাংলা আক্রমণ শুরু করে বর্ধমান থেকে। পাঠান সৈন্য গোদা আক্রমণ করে দখল নেয়। প্রকৃতপক্ষে এই সময় থেকেই বর্ধমানে মুসলিম ধর্মও প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে।

১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে গৌড়ের সিংহাসনে বসেন গিয়াসউদ্দিন মামুদ শাহ। ১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে শেরশাহ্ বা শের খাঁ বর্ধমান আক্রমণ করলে গিয়াসউদ্দিন দিল্লীর বাদশাহ্ হুমায়ুনের কাছে আশ্রয় নেন। শের খাঁ - এর সময় শহর বর্ধমানের পুরাতন চকে একটি মসজিদ তৈরী হয় যা 'কালো মসজিদ' নামে খ্যাত। ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দে ইছলাবাদে সৈয়দ তাহির তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ তৈরী করেন। তখন দিল্লীর বাদশাহ্ আওরঙ্গজেব। মসজিদে আওরঙ্গজেবের নাম খোদিত আছে। বর্ধমানে পুরাতন চক এলাকার দক্ষিণে মুসলিম সাধক পীর বাহ্রামের সমাধি আছে। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে চাঘতাই তুর্কি শাহ্ওয়াদি বায়াত নামে এই সুফী সাধক তিনি পারস্য থেকে বর্ধমানে আসেন। সে সময় ঐ স্থানে হিন্দুযোগী জয়পালের সাধন ক্ষেত্র ছিল। জয়পাল এই 'পীরবাবা'কে আশ্রয় দেন। জনশ্রুতি জয়পাল পীরবাহ্রামের কাছে দীক্ষা নেন। পীরবাহ্রামের মৃত্যুর পর জয়পালের বাগানে তাঁকে সমাধি দেওয়া হয়। সম্রাট আকবর সেখানে সমাধি মন্দির তৈরী করে দেন। শহর বর্ধমানের খাজা আনোয়ার বেড়-এ খাজা আনোয়ারের সমাধিভবনের মধ্যে সম্রাট ফারুকশিয়র দ্বারা নির্মিত মসজিদ আছে। গোলাপবাগের কাছে কমলসায়র পল্লীতে মহারাজ তেজচাঁদের অর্থানুকুল্যে একটি মসজিদ তৈরী হয়। সপ্তদশ শতকে সুফি বায়াজিদ সহ তুরস্ক থেকে আরও অনেক পীর-পয়গম্বর বর্ধমানে আসেন। ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে ফারুকশিয়র পীর বায়াজিদের জন্য আশ্রয়স্থল ও একটি মসজিদ নির্মাণ করেন খাঁ-পুকুরে। ফারুকশিয়ার ছিলেন আওরঙ্গজেবের প্রপৌত্র। কালনা রোডের 'বন মসজিদ' সেই স্মৃতি বহন করছে। বর্ধমানের বড়বাজারে একটি বিশাল মসজিদ আছে। সুলতান আমলে আর একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান বর্ধমানে আসেন, তিনি হলেন খক্কড় শাহ। এই সিদ্ধ সাধক সুফী মতাবলম্বী মুসলমান ছিলেন। বর্ধমানে পায়রা খানায় (পুরাতন চক) তাঁর সমাধি আছে।

আজও হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে বহু মানুষ তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে আসেন। এই অঞ্চলে আওরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম উসসানের তৈরী মসজিদ আছে, যেটি জুম্মা মসজিদ নামে বিখ্যাত। বর্ধমানে সুফী ধর্মের বিশিষ্ট স্থান আছে। সুফী শব্দের উৎপত্তি বিষয়ে পণ্ডিতেরা ভিন্নমত পোষণ করেন। কেউ বলেন 'আসহাব-উস-সাফা' শব্দ থেকে সুফী শব্দের উৎপত্তি যার বীজ ইসলামী অধ্যাত্মচিন্তার মধ্যেই সুপ্ত ছিল। কেউ বলেন গ্রীক সফিস্টরা 'Sophia' or 'Sophos', থেকে সুফী শব্দের উৎপত্তি যার অর্থ 'পরম প্রজ্ঞা'। হিব্রু কাব্বালীয় তন্ত্রের 'Ain Sof ' শব্দ থেকে সুফী শব্দের সৃষ্টি বলে অনেকে মত দিয়েছেন । সুফীরা মরমীয়া সাধক। সুফী ধর্মের উপরে উপনিষদ ও শঙ্করাচার্যের মায়াবাদের প্রভাব লক্ষিত হয়। বৈষ্ণব সহজিয়া ধর্মের সঙ্গে সুফী ধর্মের ভাবগত মিল আছে। পাঠান ও মুঘল আমলে সমস্ত বর্ধমান জেলাতেই অনেক মসজিদ তৈরী হয়। ফার্সী ও আরবী ভাষা শিক্ষার জন্য তৈরী হয় মক্তব ও মাদ্রাসা। অনেক মুসলিম সাধক এই সময়ে বর্ধমানে এসেছিলেন।

বর্ধমান জেলায় খ্রীষ্টান ধর্ম

আকবর এবং জাহাঙ্গিরের রাজত্বকালে বাংলায় পর্তুগীজদের হাত ধরে খ্রীষ্টান ধর্মের প্রবেশ। তবে যেমনভাবে পাঠান ও মোগলের হাত ধরে বর্ধমান জেলায় মুসলিম ধর্ম প্রচারিত হয়েছিল ঠিক একইভাবে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বকালে খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারিত হয়। বখ্‌তিয়ার যেমন কালনা পেরিয়ে নবদ্বীপে পৌঁছান, সেই রকমভাবে লর্ড ক্লাইভ ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা - হুগলী হয়ে ১৬ জুন কালনায়, ও পরে সেখান থেকে ২২ জুন পলাশীর প্রান্তরে নবাবের সৈন্যের মুখোমুখি হন।

সারা বর্ধমান জেলাতেই সেইসময় থেকে খ্রীষ্ট ধর্ম প্রসার লাভ করে। খ্রীষ্টান পাদ্রীরা যীশু খ্রীষ্টের জীবনী ও খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করার জন্য গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়েন। বর্ধমানে ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টধর্ম প্রসারের জন্য 'Church Missionery Society' তৈরী হয়। এই সংস্থার উদ্যোক্তা ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট ও রেভারেণ্ড ওয়েটব্রিক্ট। এই সময় ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে কালনায় একটি গীর্জা নির্মিত হয়। এটি বর্ধমান জেলায় দ্বিতীয় প্রাচীন গীর্জা। ১৮৩১ সালে বর্ধমান শহরের জি.টি.রোডের ধারে জন জেমস ওয়াইভ ব্রেখতব একটি গীর্জা নির্মাণ করেন যা 'Anglican Church' নামে খ্যাত। এই গীর্জাটি প্রোটেষ্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের। এটির পাশে এখন মূল পোষ্ট অফিস তৈরী হয়েছে। কালনার বিদ্যানগরে একটি প্রোটেষ্ট্যান্ট গীর্জা আছে। ১৮৩৪ সালে খ্রীষ্টান মিশনারীদের দ্বারা তৈরী হয় 'চার্চ মিশনারী সোসাইটি ইস্কুল' যা বর্তমানে সি.এম.এস হাই স্কুল। কালীবাজারে বর্তমানের 'মিউনিসিপাল গার্লস হাই স্কুলও' মিশনারীদের তৈরী। বর্ধমানে প্রোটেষ্ট্যান্টদের প্রভাব ক্যাথলিকদের থেকে বেশী ছিল। বর্ধমান জেলায় অনেক নীলকুঠি তৈরী হয়। বর্ধমান শহরের নীলপুর, বীরহাটা, কাছারিরোড, সাধনপুর এলাকায় খ্রীষ্টান সাহেবরা থাকত। কাছারীরোডের পূর্বদিকে খ্রীষ্টানদের জন্য বর্ধমান রাজার অর্থানুকুল্যে একটি 'বেরিয়াল গ্রাউণ্ড' তৈরী হয়।

কানাইনাটশালেও আর একটি 'বেরিয়াল গ্রাউণ্ড' ছিল। বর্ধমান মহারাজার অর্থানুকুল্যে ফাদার জ্যাকুইনের চেষ্টায় ১৮৭৭ সালে বর্ধমান শহরে একটি ক্যাথলিক চার্চ নির্মিত হয়। এই চার্চটির নাম 'Sacred Heart Church' বা 'পবিত্র হৃদয় গীর্জা'। তার আগের বছর অর্থাৎ ১৮৭৬ সালে জ্যাকুইনের চেষ্টায় আসানসোলে একটি ক্যাথলিক চার্চ নির্মিত হয়। ১৯৯৪ সালে বর্ধমানের 'পবিত্র হৃদয় গীর্জায়' আসেন মাদার টেরিজা। বর্তমানে এই চার্চের 'Prebyster-In-Charge' হলেন রেভারেণ্ড উইলিয়াম কাউরী। বর্ধমান জেলায় ইংরাজী শিক্ষা প্রসারে মিশনারীদের অবদান যথেষ্ট। কালনায় ইংরাজী শিক্ষার প্রসারে 'United Free Church of Scotland' এর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। ১৮৯২ সালে এই চার্চ কালনায় রাজ হাসপাতাল পরিচালনার দায়িত্ব নেয়। কালনা স্টেশনের কাছে জিউধারায় 'Sacred Heart Missionery'-র উদ্যোগে একটিগীর্জা তৈরী হয়। কালনার চার্চ পরিচালিত বিভিন্ন শিক্ষা কেন্দ্রের পরিচালক ছিলেন রেভারেণ্ড ক্যুরি ও রেভারেণ্ড ডিয়ার। রেভারেণ্ড লালবিহারী দে কালনার খ্রীষ্টান মিশনের শিক্ষক ও যাজক ছিলেন (১৮৫৬-১৮৬০খ্রীঃ)। তাঁর সময়ে চারজন হিন্দু খ্রীষ্টানধর্ম গ্রহণ করেন। গোষ্ঠবিহারী মাঁকড় ১৮৯৫ সালে কালনার খ্রীষ্টান মণ্ডলীর পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব নেন।

বর্ধমান - বিভিন্ন ধর্মের এক অপূর্ব সহাবস্থান

বর্ধমান যেন ক্ষুদ্র ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষের মত বর্ধমান কোন ধর্মকেই অবহেলা করেনি। বেদ প্রবর্তিত বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, সৌর, প্রভৃতি ধর্মীয় ধারার প্রধান প্রভাব থাকলেও পরবর্তীকালে বৌদ্ধ ও জৈনের মত সংস্কার পন্থী ধর্মের সঙ্গে ইসলাম ও খ্রীষ্টান ধর্মের এক অপূর্ব সহাবস্থান এই জেলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। শিখ ধর্মের প্রবক্তা গুরুনানক বর্ধমানে ১৫১০ সালে আসেন। বর্ধমান শহরের শ্যামবাজারের কাছে 'গড়গড়াঘাটে' আজ সেখানে 'গুরুনানক চরণ কমল গুরুদ্বোয়ারা'। শ্রী বাবা জনক সিং এর পর বর্তমানে এই গুরুদ্বোয়ারা গ্রন্থী শ্রী বাবা জ্ঞানীরাম সিং। জি.টি. রোডের ধারে শিখ সম্প্রদায়ের আর একটি গুরুদুয়ারা আছে। বর্ধমান মহারাজা এর জন্য জমি দান করেন। শ্রী বলদেব সিং বর্তমানে এখানকার গ্রন্থী। বর্ধমানে শিখ ধর্ম ছাড়া সহজিয়া, আউল-বাউল সম্প্রদায়েরও নিদর্শন পাওয়া যায়। বর্ধমানের কিছু গ্রামে এখনও অনেক বাউল আছেন। এখানে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৌলতে ব্রাহ্মধর্মও প্রচলিত হয়।

বৈদিক দেবতা ইন্দ্র, অগ্নি, রুদ্র (শিব), বিষ্ণু, বিভিন্ন মাতৃকাদেবীর পূজার প্রাচীন নিদর্শন যেমন বর্ধমানে পাওয়া যায় তেমনি বেদানুসারী তন্ত্র ধর্মের কালিকাদি দশমহাবিদ্যার উপাসনাও বর্ধমানে প্রচলিত। লোকধর্মগুলির মধ্যে বৈদিক দেবতা ও সংস্কৃতির প্রভাব স্পষ্ট। সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই এক মানুষ থেকে অন্য মানুষের মণীষার পার্থক্য স্পষ্ট। ধর্ম, সঙ্গীত, চিত্রকলা বা যে কোন সৃজনাত্মক ধ্রুপদী বিদ্যার অধিকারী হয় মুষ্টিমেয় মানুষ।

পরবর্তীকালে বাকি জনজীবন সেই মুষ্টিমেয় জনগণের সংস্কৃতিকে নিজেদের যোগ্যতা অনুযায়ী গ্রহন করে। তাছাড়া একই দেশে সব অঞ্চল একই সময় থেকে উন্নতি করেনা। মুষ্টিমেয় মানুষের মধ্যে থেকে উদ্ভুত সংস্কৃতি ভবিষ্যতে আপামর জনসাধারণের চরিত্রচিত্রায়ণে ভুমিকা পালন করে। আঞ্চলিক ভেদে কিছু আচার ব্যবহারে পার্থক্য থাকা যেকোন দেশের ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক।

যেহেতু ভারতবর্ষ ধর্ম সংস্কৃতির ধারক ও বাহক তাই ভারতবর্ষে যে কোন ধ্রুপদী সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে 'ধর্ম' - কে কেন্দ্র করে। বর্ধমান জেলাও সেক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। বর্ধমান জেলাতেও মানুষের রীতিনীতি, আচার ব্যবহার ধর্ম ও বিভিন্ন আঞ্চলিক বিশ্বাসের উপর গড়ে উঠেছে।

প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত নানা পরিবর্তনের মধ্যেও বর্ধমান জেলায় ধর্মীয় স্রোত নিরন্তর প্রবাহমান। কত বিখ্যাত সাধকের চরণস্পর্শ আছে এই জেলায়। জৈনতীর্থঙ্কর শান্তিনাথ, মহাবীর, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীপাদ নিত্যানন্দ, শ্রীপাদ অদ্বৈত্যাচার্য, গুরুনানক, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মা এসেছিলেন এই জেলায়। বৈষ্ণবসাধক নকুল ব্রহ্মচারী ('সাক্ষাৎ নৃসিংহ যার সনে কথা কয়'- চৈতন্যভাগবত), সাধক গৌরীদাস পণ্ডিত, অচ্যুতানন্দ, বীরভদ্র, বিখ্যাত বৈষ্ণব সাধক ভগবানদাস বাবাজী, সাধক কমলাকান্ত, স্বামী বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস, জ্ঞানানন্দ সরস্বতী মাতাজী, স্বামী ভাস্করানন্দ, স্বামী নিগমানন্দের শিষ্য সিদ্ধসাধক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ব্রহ্মচারী, শ্রীনাথযোগী, যবন হরিদাস, মাধবেন্দ্রপুরী, ঈশ্বরপুরী প্রভৃতি কত সিদ্ধ পুরুষের চরণস্পর্শ আছে বর্ধমান জেলায় তার ইয়ত্তা নেই। আধুনিক কালে শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ, স্বামী মোহনানন্দ ব্রহ্মচারী, ভবাপাগলা, স্বামী দুর্গাপ্রসন্ন পরমহংস, স্বামী স্বরূপানন্দ, স্বামী অভয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, বালক ব্রহ্মচারী, স্বামী পরমানন্দ প্রভৃতি সনাতন ধর্মীয় ধারার উত্তরগঙ্গা। বর্তমানে পরমানন্দের দুই শিষ্য স্বামী মাধবানন্দ ও স্বামী জ্যোতির্ময়ানন্দ যেমন অনেক তাপিত মানুষের আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছেন তেমনি স্বামী দেবানন্দ, স্বামী সচ্চিদানন্দ গিরি, ভোলানাথ অধিকারী, চান্নাগ্রামের মৌনি বাবা, প্রভৃতি বর্ধমানের ধর্মীয় প্রবাহকে সঞ্জীবিত করে। মুসলিম সাধক পীর বাহরাম, খক্করশাহ, কালনার বদর সাহেবের পুণ্য চরণস্পর্শ আছে বর্ধমানে। বর্ধমান জেলার বিভিন্ন জায়গায় শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম আছে। পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলের মত এখানেও শ্রীরামকৃষ্ণ, সারদাদেবী, ও স্বামীবিবেকানন্দের ভাবধারা জনমানসে এক উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করেছে। বর্ধমান শহরে যেখানে আজ শ্রীরামকৃষ্ণের আশ্রম সেখানে ঠাকুর তাঁর ভাগ্নে হৃদয়কে নিয়ে এসেছিলেন। বর্তমানে এই আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী শান্তানন্দ। বর্ধমানের স্বামী প্রণবানন্দ প্রতিষ্ঠিত ভারত সেবা সংঘ, সাঁইবাবার আশ্রম আছে।

সাধক ও পণ্ডিতের এক অপূর্ব সম্মিলন স্বামী সচ্চিদানন্দ গিরি। বর্ধমানের আমদপুর গ্রামের (বর্তমানে কাশীবাসী।) এই সন্ন্যাসী প্রাচীন আর্য ঋষিদের মতই বৈদিক ধর্ম বিকাশে নিরন্তর সচেষ্ট।

বিভিন্ন নদী যেমন এক সমুদ্রে এসে মিলিত হয়, তেমনই বর্ধমান নানা ধর্মীয় স্রোতধারার মিলনসমুদ্র। এত ভিন্নমুখী বৈচিত্রের মধ্যেও এখানে মিলনে সুর বেজে চলেছে নিরন্তর।

পাদটীকা ও তথ্যসূত্র

১। কূর্মপূরাণ, ৪৯ অধ্যায় এবং পতঞ্জলের 'মহাভাষ্য- কাশী সংস্করণ', পৃষ্ঠা ২৮
২। বাংলাদেশের ইতিহাস (২য়), : রমেশ মজুমদার, পৃষ্ঠা ২৩৫
৩। বর্ধমান চর্চা (১ম) : শ্যামাপ্রসাদ কুণ্ডু সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ১, প্রকাশক - অভিযান গোষ্ঠি, বর্ধমান
৪। মনুসংহিতা : দ্বিতীয় অধ্যায় ১৭-২৩ শ্লোক এবং দশমসর্গ, ৪৪শ্লোক
৫। নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধি : স্বামী সুরেশ্বরাচার্য : উদ্বোধন
৬। 'আর্যজাতির অস্বিত্বই ছিলনা' : পরমেশ চৌধুরী, প্রকাশক - জি. সাহা. কলি-১২, পৃষ্ঠা১০৫
৭। বৃহৎসংহিতা : সুধাকর দ্বিবেদী, বিজয় নাগারাম সংস্কৃত সিরিজ, পৃষ্ঠা-২৮৬
৮। ঋগ্বেদ সংহিতা (১০।৮৪।৯).
৯। পঞ্চ বিংশ ব্রাহ্মণ (২৫।১০।১৭).
১০। Indo-Iranica, No. 1-4, vol 33, 1980, page 133.
১১। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস : জাহ্নবীচরণ ভৌমিক, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২য় সংস্করণ - রথযাত্রা ১৩৮২, পৃষ্ঠা-৪৩।
১২। শ্রীমদভাগবৎ গীতা : বিভূতি যোগ
১৩। বেদের ভাষা ও ছন্দ : গৌরী ধর্মপাল, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯৯
১৪। বাংলাদেশের ইতিহাস (২): রমেশচন্দ্র মজুমদার, সপ্তদশ পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা-১৬৮
১৫। শুক্ল যজুর্বেদ ৩।৫৭, 'এষতে রুদ্র ভাগ সহ স্বস্রাম্বিকয়া তং জুষায় ভেষজম....'' কৃষ্ণযজুর্বেদ
১৬। তৈত্তিরীয় আরণ্যক ১০।১৮।১
১৭। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ১।৬।১০
১৮। Sakta Pithas : Dr. Dinesh Chandra Sen - Page 81
১৯। বর্ধমান সমগ্র (২য়) : সম্পাদনা - ডঃ গোপীকান্ত কোঙার, পৃষ্ঠা ২২৫-২২৭
২০। মনুসংহিতা, দশমসর্গ, ৪৫ শ্লোক
২১ 'আর্য জাতির অস্তিত্বই ছিলনা' : পরমেশ চৌধুরী, পৃষ্ঠা ২৩৮-২৩৯ ('Proposals on the Biological Aspects of Race, Moscow - 18-8-1964')
২২। ঐত্যরেয় ব্রাহ্মণ - সায়ণভাষ্য
২৩। মনুসংহিতা ২।৬
২৪। অমরকোষ
২৫। বিষ্ণুপুরাণ ৩।৩।২০
২৬। আপস্তম্ভ অনুযায়ী 'বিধিই ব্রাহ্মণ' - 'কর্থচোদনা ব্রাহ্মণানি'। কর্মকাণ্ডের

বিধিকে অপ্রবৃত্তপ্রবর্তক এবং জ্ঞানকাণ্ডের বিধিকে অজ্ঞাতজ্ঞাপক বলে। (সায়ণ)

২৭। সাতটি পাকযজ্ঞ যথাক্রমে (১) পিতৃশ্রাদ্ধ, (২) পার্বণশ্রাদ্ধ (৩) অষ্টকাশ্রাদ্ধ, (৪) শ্রাবণীযজ্ঞ, (৫) আশ্বযুজী যজ্ঞ, (৬) আগ্রহায়ণী ও (৭) চৈত্রীযজ্ঞ

২৮। গৌতমসূত্রের ১৫টি সংস্কার যথাক্রমে (১) গর্ভাধান, (২) পুংসবন, (৩) সীমন্তোন্নয়ন, (৪) জাতকর্ম, (৫) নামকরণ, (৬) অন্নপ্রাশণ, (৭) চূড়াকরণ, (৮) উপনয়ন, (৯) মহানাম্নী ব্রত, (১০) মহাব্রত, (১১) উপনিষদব্রত, (১২) গোদানব্রত, (১৩) সমাবর্তন, (১৪) বিবাহ, (১৫) অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

২৯। মনুসংহিতার প্রখ্যাত টীকাকার কুল্লুক ভট্টের পিতা রাজা উদয়নারায়ণ, রাজসাহীর তাহিরপুর নিবাসী রাজপুরোহিত রমেশচন্দ্র শাস্ত্রীর কথায় দুর্গোৎসব করেন। ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে কুল্লুক ভট্টের পুত্র রাজা কংসনারায়ণ ন' লক্ষ টাকা ব্যয় করে প্রতিমায় দুর্গাপুজা করেন।

৩০। 'পারিভ্রাদ্রকুলোদ্ভুতঃ শ্রীমান্ জীমূতবাহনঃ।
দায়ভগং চকারেমং বিদুষাং সংশয়চ্ছিদে।।'— জীমূতবাহন
জীমূতবাহনের দায়ভাগের অনেক টিকা আছে। তবে শ্রীনাথ আচার্য চূড়ামণির 'চূড়ামণি' টীকা সবচেয়ে প্রাচীন ও বিখ্যাত। অচ্যুত চক্রবর্তীর 'শ্রাদ্ধবিবেক' নিবন্ধ ও শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কারের 'দায়ভাগ সুবোধিনী' টীকা প্রসিদ্ধ। মহেশ্বর পণ্ডিতেরও একটি টীকা ছিল। তর্কালঙ্কার ও মহেশ্বর উভয়ই অষ্টাদশ শতকের মানুষ।

৩১। নিরুক্ত ১০।৫

৩২। ঋগ্বেদ ভাষ্য : সায়ণাচার্য

৩৩। ঋগ্বেদ ভাষ্য ১।৪৩।১

৩৪। ঋগ্বেদ ভাষ্য ১।১১৪।৫, ২।৩৩।২, ২।৩৩।৪

৩৫। ঋগ্বেদ ২।৩৩।১, ২, ৪, ৯, ১২ এবং ১।১১৪।১০, ২।৩৩।১১

৩৬। শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদ ৩।৫, বাজসনেয় সংহিতা ১৬।২

৩৭। 'লীয়নাল্লিঙ্গনাচ্চ লিঙ্গম্' - কাত্তিন্য (পাশুপত সূত্র ১।৬)

৩৮। মহাভারত ৭।২০০।৯২ - নীলকণ্ঠ টীকা

৩৯। 'কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো।
কিমাচার : কথঞ্চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানিতিবর্ততে।।' - শ্রীমদ্ভাগবতগীতা ১৪।২১

৪০। নিরক্ত ৪।১৯, ঋকবেদভাষ্য - সায়ণাচার্য ৭।২১।৫

৪১। শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা (প্রথম খণ্ড) ঃ উপেন্দ্রকুমার দাস ঃ বিশ্বভারতী, ১৩৯১, পৃষ্ঠা - ২২০

৪২। ঐ

৪৩। 'যোনিমণ্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ' - কঠোপনিষদ ২.২.৭ এখানে 'যোনি' অর্থ মাতৃগর্ভ।
'লিঙ্গরূপো মহাকালো যোনিরূপা কালিকা' - নিরুত্তর তন্ত্র, ১৪

"যোনিশ্চ জনিকা মাতা লিঙ্গশ্চ জনকঃ পিতা।
মাতৃভাবাং পিতৃভাবামুভয়োরপি চিন্তয়েৎ" - নিরুত্তর তন্ত্র, প্রাণতোষণী, বসুমতী সংস্করণ, পৃষ্ঠা - ৫৫১.

৪৪। শিবপুরাণের বায়বীয় সংহিতায় পঞ্চাধ্যায়ী গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়।
অথ বিদ্যা পরা শৈবী পশুপাশবিমোচনী।
পঞ্চার্থ সংজ্ঞিতা দিব্যা পশু - বিদ্যাবহিস্কৃতা ।। (বায়বীয় সংহিতা,উত্তরভাগ ২৪। ১৬৯)

৪৫। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের বাকী চারটি শিবমন্ত্র হল
(ক) ওঁ সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি সদ্যোজাতায় বৈ নমো নমঃ । ভবে ভবে নাতি ভবে ভজস্ব মাং ভবোদ্ভাবায় নমঃ । (পাশুপত সূত্র ১। ৪০ - ৪৪)
(খ) ওঁ বামদেবায় নমো জ্যেষ্ঠায় নমঃ শ্রেষ্ঠায় নমো রুদ্রায় নমঃ কানায় নমঃ। কলবিকরণায় নমো, বলবিকরণায় নমো বলায় নমো বলপ্রমথায় নমঃ সর্বভূতদমনায় নমো মনোন্মনায় নমঃ। (পাশুপত সূত্র ২। ২২ - ২৭).
(গ) ওঁ অঘোরেভ্যোহথ ঘোরভ্যো ঘোরঘোরতরেভ্যঃ। সর্বেভ্যঃ সর্বশর্বেভ্যো নমস্তে অস্তু রুদ্ররূপেভ্যঃ । (পাশুপত সূত্র ৩। ২১ - ২৬)
(ঘ) ওঁ ঈশানঃ সর্ববিদ্যানামীশ্বরঃ সর্বভূতানাং ব্রহ্মাধিপতি ব্রহ্মাণোহধিপতিব্রহ্মা শিবো মে অস্তু সদাশিবোম্ । (পাশুপত সূত্র - ৫। ৪২ - ৪৭)

৪৬। শিব সহস্রোনাম (তণ্ডীকৃত) - মহাভারত, অনুশাসন পর্ব

৪৭। বাংলার লোকসংস্কৃতি ঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য , ন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট, ১৯৯১, পৃষ্টা ৩৬

৪৮। ঐ , পৃষ্ঠা - ৬৯

৪৯। বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি (৩য়) , যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী

৫০। Hindi Polytheism : Alian Danielou : Page 278

৫১। কালনার ইতিবৃত্ত ঃ দীপক কুমার দাস, প্রকাশক - সাহিত্য সংবাদ সাম্প্রতিক, কালনা পৃষ্ঠা ৮৬

৫২। মহাভারত ১.১.২০৯ - ২১০ (দ্রষ্টব্য ঃ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ সংস্করণ, ১৩৩৮)

৫৩। তৈত্তিরীয় সংহিতা ৬.১.৯, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৩.৯.১৭.

৫৪। কাঠক সংহিতা ৫।৪

৫৫। নিঘন্টুতে (১.১১) 'বাক্' অর্থে 'গৌরী' শব্দও দেখা যায়।

৫৬। শতপথ ব্রাহ্মণ ১৪।১।১। ৩২

৫৭। নিরুত্তর তন্ত্র, পৃষ্ঠা - ১০

৫৮। 'কালী করালী চ মনোজবা চ সুলোহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা।
স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী চ দেবী লেলায়মানা ইতি সপ্তজিহ্বাঃ।।"
(মুণ্ডকোপনিষদ ১।২।৪)

৫৯। 'মৃণাল সূত্রসদৃশী অথর্ববেদরূপিণী।' - রুদ্রযামনতন্ত্র, উত্তরতন্ত্র, পঃ - ১৭

৬০। 'সাবিত্রী পরমা বিদ্যা ত্রৈলোক্যেষু চ দুর্লভা।'- নিরুত্তর তন্ত্র, পঃ ৩.

৬১। নির্ঘন্টু ১।১১

৬২। মেরুতন্ত্রবচন, পুরশ্চর্যার্ণব, (১ম) ,পৃষ্ঠা ৩১

৬৩। নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ঃ স্বামী সন্তদাস, স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, কলি - ৯

৬৪। নগর বর্ধমানের দেবদেবী ঃ নীরদবরণ সরকার, সারস্বত পীঠ, বর্ধমান - ২, পৃষ্ঠা ১০৯১

৬৫। অনিরুদ্ধ ভট্ট ঃ এই ব্রারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বল্লালসেনের গুরু ও মন্ত্রী ছিলেন। শকাব্দে ইংরাজী ১১৬৯ খ্রীষ্টাব্দে 'হারলতা' গ্রন্থ রচনা করেন। 'ভাগবততত্ত্ব মঞ্জরী' তাঁর লেখা বিখ্যাত গ্রন্থ।

হলায়ুধ ঃ হলায়ুধ ভট্ট, লক্ষ্মণ সেনের সমসাময়িক। 'ব্রাহ্মণসর্বস্ব' ও 'বৈষ্ণবসর্বস্ব' তাঁর লেখা দু'টি গ্রন্থ। 'বেদ বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত রহস্য' গ্রন্থ লিখে তিনি বেদের সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মের ঘনিষ্ঠতা প্রমাণ করেন।

আর এক হলায়ুধ আছেন যিনি 'অভিধান - রত্নমালা' ও কৃষ্ণরাজের সময়ে 'কবিরহস্য' লেখেন। এই দুই হলায়ুধ একই ব্যক্তি কিনা জানা যায় না।

৬৬। শ্রী শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত ঃ অন্তলীলা, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, সপ্তম পরিচ্ছেদ

৬৭। শ্রী শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত ঃ মধ্যলীলা, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, নবম পরিচ্ছেদ

৬৮। ঐ পৃষ্ঠা - ২৩ - ২৭

৬৯। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা ঃ ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ; পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ,১৯৯০

৭০। ঐ পৃষ্ঠা - ২৩ - ২৭

৭১। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা ঃ ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় , পৃষ্ঠা - ২৭

৭২। বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম ঃ রমাকান্ত চক্রবর্তী, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা - ৭৫

৭৩। চৈতন্যচরিতামৃত, কৃষ্ণদাস কবিরাজ

৭৪। গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান (২)

৭৫। বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম ঃ রমাকান্ত চক্রবর্তী, পৃষ্ঠা - ৭৯

৭৬। দ্বাদশ উপগোপাল হলেন যথাক্রমে -

শ্রী হলায়ুধ ঠাকুর (রামচন্দ্রপুর) , শ্রীরুদ্র পণ্ডিত (বল্লভপুর), শ্রীমুকুন্দানন্দ (নবদ্বীপ),শ্রী কাশীশ্বর (বল্লভপুর), শ্রীওঝা বনমালী (কুল্যাপাড়া) শ্রীমন্ত ঠাকুর (রুকুনপুর), শ্রীমুরারী মাইতি (বংশীটোটা) . শ্রীগঙ্গাদাস (নৈহাটী), শ্রী গোপাল ঠাকুর(গৌরাঙ্গপুর), , শ্রী শিবাই (বেলুন), শ্রীনন্দাই (শালিগ্রাম), শ্রীবিষাই (ঝামটপুর) (তথ্যসূত্র ঃ বাঙ্গালার কীর্তন ও কীর্তনিয়া ঃ ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, পরিশিষ্ট)

৭৭। চৈতন্য পরিকর ঃ রবীন্দ্রনাথ মাইতি, পৃষ্ঠা ১০

৭৮। বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম, পৃষ্ঠা - ১০৪

৭৯। বর্ধমান চর্চা (২য়) ঃ শ্যামপ্রসাদ কুণ্ডু সম্পাদিত, অভিযান গোষ্ঠী,পৃষ্ঠা - ২৪

৮০। অনেক গ্রামের তথ্যসূত্রের জন্য যজ্ঞেশ্বর চৌধুরীর 'বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি' (৩য় পুস্তকের সাহায্য নেওয়া হয়েছে)।

৮১। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঃ (১৬২৩ - ১৬৯১ খ্রীঃ) জন্মস্থান মুর্শিদাবাদের বালুচর, পিতা - গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী। বলদেব বিদ্যাভূষণ এবং কৃষ্ণদেব সার্বভৌম তাঁর শিষ্য ছিলেন। তাঁর লেখা 'শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত', 'সংকল্প কল্পদ্রুম', ঐশ্বর্যকাদম্বিনী', 'মাধুর্য কাদম্বিনী', 'রাগবর্ত্ম চন্দ্রিকা', 'গৌরাঙ্গ মৃতটীকা', ভাগবত টীকা, বিদগ্ধমাধব টীকা লিখেছেন।

৮২। বাংলাদেশের ইতিহাস (২), রমেশচন্দ্র মজুমদার, পৃষ্ঠা - ১৬০ - ১৬১.

৮৩। শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা (১ম) - পৃষ্ঠা ৪৬০ - ৪৬১

৮৪। বাংলার লোকসংস্কৃতি ঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃষ্ঠা- ১৮

৮৫। ঐ , পৃষ্ঠা - ২১

৮৬। শুক্ল যজুর্বেদ (১৩। ৬ - ৮) ঃ হরফ প্রকাশনী

৮৭। বিষ্ণুপুরাণ ৫। ৩৭। ৪০

৮৮। ঋগ্বেদ ১০।১৭।১০,

৮৯। দেবদেবী ও তাঁদের বাহন ঃ স্বামী নির্মলানন্দ, ভারত সেবাশ্রম সংঘ, পৃষ্ঠা ১৬৮ - ১৬৯

৯০। প্রাচীন বর্ধমানের সংস্কৃতি ও ধর্মীয় চেতনা ঃ নীরদবরণ সরকার, পৃষ্ঠা ১৭.

৯১। বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি - যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী,পৃষ্ঠা - ১০২ - ১০৩.

৯২। বৌদ্ধভারত ঃ বিমলচন্দ্র দত্ত, রামকৃষ্ণ - বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউট অফ্ রিসার্চ এ্যাণ্ড কালচার ।

৯৩। উদ্বোধন - শতাব্দী জয়ন্তী নির্বাচিত সংকলন ঃ সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, পৃষ্ঠা - ১৬৮

৯৪। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম) ঃ ডঃ সুকুমার সেন।

৯৫। বাংলাদেশের ইতিহাস (২) ঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, পৃষ্ঠা - ২৩২

৯৬। কালনার ইতিবৃত্ত ঃ দীপক কুমার দাস, পৃষ্ঠা ৩৯

৯৭। প্রাচীন বর্ধমানের সংস্কৃতি ও ধর্মীয় চেতনা ঃ নীরদবরণ সরকার।

বর্ধমান জেলার পূজা-পার্বণ-উৎসব ও মেলা : একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

ড. গোপীকান্ত কোঙার

পশ্চিমবঙ্গের তথা রাঢ় অঞ্চলের মধ্যমণি বর্ধমান জেলার অবস্থান ভৌগোলিক দিক থেকে এক অনন্য স্থানের অধিকারী। যদিও জৈন আচারঙ্গ সূত্রে 'সুহ্মভূমি', বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় 'বর্ধমানপুর', গুপ্তযুগের মল্লসারুল লিপিতে 'বর্ধমান ভুক্তি', হর্ষবর্ধনের বাঁশঘেরা লিপিতে 'বর্ধমানকোটি' , পাল/ সেন যুগে রাম চরিতে 'দণ্ডভুক্তি', 'বর্ধমানভুক্তি', ব্রিটিশ আমলে বর্ধমান, বীরভূম ও হুগলীর বেশ কিছু অংশ নিয়ে 'চাকলা বর্ধমান' ইত্যাদি ইঙ্গিত করছে বর্ধমান জেলার ভৌগোলিক সীমানার বহুল পরিবর্তন। কিন্তু দামোদর, ভাগীরথী, অজয়, বল্লুকা, দ্বারকেশ্বর, বাঁকা, খড়ি, কুনুর, বেহুলা প্রভৃতি অসংখ্য নদনদী বেষ্টিত ও বিধৌত এই অঞ্চলে নদ-নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা কৃষি ও শিল্পে সমৃদ্ধ সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব সত্যই অনুধাবনের অবকাশ রাখে। অবশ্য কোন একটি জেলার সভ্যতা বা সংস্কৃতি বিচ্ছিন্নভাবে গড়ে ওঠে না বা দেখাও সম্ভব নয়। তাই এটি পশ্চিমবঙ্গ তথা বাঙলার সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত।

বর্তমান প্রবন্ধে সব কটি বিষয় নিয়ে আলোচনা সম্ভব নয়। এখানে জেলার অসংখ্য পূজা -পার্বণ-উৎসব ও মেলাকে ঘিরে এ অঞ্চলে যে স্বতন্ত্র জীবনধারা গড়ে উঠেছে তার একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের চেষ্টা করা যেতে পারে। উৎসব ও মেলার মধ্যে জনমনে যে প্রভাব সৃষ্টি করে তা এক মন ও একযুগের নয়, সেটি সমষ্টি মনের ও বহুযুগের। দেব-দেবীর পূজা-পার্বণ ও অন্যান্য অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বৎসরের নির্দিষ্ট সময়ে বা তিথিতে বাঙালীর ধর্মসাধনা ও উৎসব পালনের ইতিহাস সুপ্রাচীন। বাঙালীর 'বারো মাসে তেরো পার্বণ' কথাটির যথার্থতা খুঁজে পাই জেলার অসংখ্য পূজা পার্বণের মধ্যে। বর্ধমান জেলায় এর আধিক্য একটু বেশী বললেও অত্যুক্তি হবে না। দৈবী বা অলৌকিক শক্তি কল্পনা করা হয়েছে গাছ, ফুল, পাতা, অরণ্য, নদী, পাহাড়, জল, বাতাস, আগুন, সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতির মধ্যে এবং এদের নিয়ে শুরু হয়েছে ধর্মাচার এবং বিবর্তিত হয়েছে পূজা-পার্বণ অনুষ্ঠান পালনের মধ্যে। আবার এই ধর্মীয় চিন্তার মধ্যে দিয়ে মানুষের বিশ্বাসের ক্ষেত্রটি তৈরী হয়েছে এবং পরিণতি ঘটেছে লোকায়ত উৎসবে যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে লোকসংস্কার, লোকবিশ্বাস, কিংবদন্তী, লোকশিল্প, লোকক্রীড়া, লোকচিকিৎসা, লোকখাদ্য , লোকাচার, লোককর্ম, লোকশিক্ষা, লোকঅভ্যাস ও অভিজ্ঞতা, লোকবিদ্যা, লোককথা, লোকসাহিত্য প্রভৃতি। এসবের মধ্যে আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতিকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব। মনে রাখা প্রয়োজন দেব-দেবীর পূজা-পার্বণ, অনুষ্ঠান পালন ও উৎসব সমাজ সংহতির একটি

মৌলিক ও শক্তিশালী উপাদান হিসাবে কাজ করে ও সমাজ জীবনকে পরিচালিত করে। অসংখ্য প্রতীক এবং দেব-দেবীর ধারণা বাঙালী মনকে যুগে যুগে পরিস্ফুট করেছে এবং সমষ্টিমূলক উৎসবের মধ্যে দিয়ে সমাজের সামগ্রিক কল্যাণে ব্যক্তি তার কল্যাণকে খুঁজে পেতে চেষ্টা করেছে। তাই কোন নির্দিষ্ট সমাজকে বিশ্লেষণ করতে পূজা-পার্বণ ও অনুষ্ঠান পালনের বিবর্তন বিশেষভাবে আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। তাছাড়া মন্দির গাত্রে পোড়ামাটির ভাস্কর্যে নিবদ্ধ টেরাকোটার অলংকরণের মধ্যে বাঙালীর সমসাময়িক সমাজজীবনের প্রতিফলন ঘটেছে এটি অনস্বীকার্য। উৎসব হয় সকলকে নিয়ে আর লোকজীবনে ও গ্রাম্যজীবনে উৎসব ও পূজা-পার্বণ মানুষকে ঐক্য সূত্রে আবদ্ধ করে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের সমন্বয় ঘটায়।

প্রাচীন সমাজে মানুষ পশুপালন ও কৃষির সঙ্গে জীবন-জীবিকাকে একাত্ম করে নিয়েছিল এবং কৃষির মধ্যে দিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে পৃথিবীর গর্ভস্থিত প্রজণন শক্তির মাহাত্ম্যকে আন্তরিকতার সঙ্গে বিশ্বাস করেছিল। ধর্মানুষ্ঠান ও উৎসবের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হয়েছিল নানা সংস্কার ও ধ্যান-ধারণা। কৃষিব্যবস্থার যুগে মাটির প্রজণন শক্তিকে আয়ত্বে আনতে চাষ - আবাদের ক্রিয়া কৌশলের সঙ্গে সঙ্গে নানা ধর্ম-কর্ম উৎসব অনুষ্ঠানের সূচনা করলো। ফসল বোনা, ফসল ফলানো, ফসল কাটার সাথে যুক্ত হলো নানা অনুষ্ঠান পালন। আজও বিভিন্ন উৎসব -অনুষ্ঠান গ্রাম ও কৃষি নির্ভর বর্ধমান জেলায় কৃষি ও ভূমিজ শক্তির উন্মেষ ও কল্যাণ সাধনের ভাবনা নানাভাবে প্রতিফলিত হয়। আবার ভাদু , টুসু, ইতু প্রভৃতি পূজা ও ব্রতানুষ্ঠানের মধ্যে সামাজিক ইতিহাসকে খুঁজে পেতে অসুবিধা হয় না। শ্রেণী-ধর্ম নির্বিশেষে একান্তভাবে নারী সমাজের ভাদু উৎসবের গানের মধ্যে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে প্রতিবন্ধকতার প্রতিবাদের সুর ধ্বনিত হয়। তাছাড়া, অবসর বিনোদনের জন্য বা আনন্দ পাওয়ার জন্য লোক-সঙ্গীত , লোকনাট্য ইত্যাদি অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠলো। এগুলি সামাজিক রীতিনীতি বা সমাজবোধের ফসল যা আজও প্রাচীন উৎসব - অনুষ্ঠানের মধ্যে পালিত হচ্ছে। এক কথায় ব্রত ও পূজা-অনুষ্ঠান এবং উৎসবের মধ্যে মানুষ তার মনের ইচ্ছা ও কামনাকে সফল করে তুলতে সচেষ্ট হয়েছে, এখানে শাস্ত্রীয় ও লৌকিক উভয় ধরণের উৎসব - অনুষ্ঠানের সন্ধান মেলে।

জেলায় গ্রাম ও শহর উভয় এলাকাতেই গ্রাম্য ও লৌকিক দেব-দেবী, বিভিন্ন মহাপুরুষ বা সিদ্ধপুরুষের কাহিনী, নির্দিষ্ট তিথি পালন, পুণ্যস্নান প্রভৃতি বা সনাতন হিন্দু ধর্মের দেবদেবীর পূজা-পার্বণ-অনুষ্ঠান পালন ও অন্যান্য বিষয়কে কেন্দ্র করে অসংখ্য উৎসব পালিত হয়। দেব-দেবীর পূজা-পদ্ধতি, অর্চনা, লোকাচার প্রভৃতি প্রায় সম্পূর্ণভাবে আঞ্চলিক ও পরিবেশ জাত। পূজার উপকরণ, মন্ত্র, বলি প্রভৃতি ক্ষেত্রেও বৈচিত্র্য সুপ্রচুর। অবশ্য একথা মনে রাখা প্রয়োজন আদিম শিকার সংগ্রহ নির্ভর, পশুচারণ, কৃষিনির্ভর জীবিকার মানুষ বর্ধমান জেলার সামাজিক বিবর্তনে যে উপাদান যুগিয়েছে তাকে বাঙলার সংস্কৃতির বিকাশ থেকে পৃথক বা নিরপেক্ষভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। এগুলির উৎপত্তি ও ইতিহাস অনেক ক্ষেত্রেই সঠিকভাবে নিরূপণ করা প্রায় অসম্ভব। এক্ষেত্রে লোকমুখে

প্রচলিত প্রবাদ, বিশ্বাস ও উৎসব-অনুষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে রীতি-নীতি স্থানীয়ভাবে ধ্বংসোন্মুখ স্থাপত্যের উপর ভিত্তি করে অনুমান করে নিতে হয়। সনাতন ধর্মের ব্রাহ্মণগণ অনেক ক্ষেত্রে তাদের যজমানের দলবৃদ্ধির জন্য বা স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে কিংবা উদারতাবশতঃ লৌকিক দেবদেবী ও ধর্মবিশ্বাসকে নিজেদের ধর্মের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছেন। তাছাড়া পূজা-পার্বন ও উৎসবের মধ্যে লৌকিক দেব-দেবীর আচার-অনুষ্ঠান, উপাস্য মূর্তি ও প্রতিমার বৈচিত্র্য, প্রধান অংশগ্রহনকারী সম্প্রদায় কর্তৃক উৎসব সংগঠনের বিষয় ও তাদের ভূমিকা, বিভিন্ন ধরনের জাতিগত ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্য ইত্যাদি সুপ্রচুর। শাস্ত্রাচারের অনুপ্রবেশ ঘটলেও পূজা-পার্বণের প্রচলিত অনুষ্ঠানগুলি অনেকক্ষেত্রে অব্যাহত থেকে গেছে। এক্ষেত্রে একদিকে যেমন প্রয়োজন ঐতিহাসিক ও নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, তেমনি সংস্কৃতায়ন, পুরোহিতদের ভূমিকা, পূজা-পদ্ধতি, পারস্পরিক সম্পর্ক ও স্বাতন্ত্র্য, আত্মনির্ভরতা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সহযোগিতা, সহাবস্থান ইত্যাদি বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন প্রয়োজন।

ধর্মের বিবর্তনে সামাজিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে দ্বান্দিক সম্পর্কটিও লক্ষণীয়। লক্ষ্মীপূজার সঙ্গে অলক্ষ্মী পূজা তারই একটি উদাহরণ। তবে একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে সমস্ত পূজা-পার্বণ ও উৎসব-অনুষ্ঠান লোক সংস্কৃতি নয়। এতে যুক্ত হয়েছে আধুনিক উচ্চকোটি সমাজের সংস্কৃতি। কিন্তু আদিম সমাজের সংস্কৃতি বা প্রাচীন অধিবাসীদের যে লোক সংস্কৃতি যা অনেকাংশে বর্তমান উচ্চকোটি সমাজের সংস্কৃতির ভিত্তি বলা যেতে পারে তা খুঁজে পেতে অসুবিধা হয় না। এক কথায় উৎসব অনুষ্ঠান হলো জীবন বিকাশের ঐতিহ্যগত ধারার প্রাচীন স্মৃতিচিহ্ন।

উৎসব ও পূজা-পার্বণকে ঘিরে জেলার বহুস্থানে যে মেলা অনুষ্ঠিত হয় সামাজিক দিক থেকে সেটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। কারণ লৌকিক বা অলৌকিক বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে যেমন ধর্মীয় উৎসব-পূজা-পার্বণ সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি জনসাধারণের প্রত্যক্ষ সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে মেলাগুলি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। কোলকাতা থেকে একশো কিলোমিটারেরও কম দূরত্বে সমতলভূমি বা কৃষি অঞ্চল এবং পশ্চিমদিকে সাঁওতাল পরগণার মালভূমি বা শিল্পাঞ্চল, উত্তর-পূর্বে অজয় ও ভাগীরথী নদী এবং দক্ষিণে দামোদর নদ প্রবাহিত হয়ে বর্ধমানকে এক অনন্য ভৌগোলিক অবস্থান দান করেছে। গ্রীক, শক, হুন, কুষাণ, পাঠান, মুঘল প্রভৃতি বিদেশী যেমন এই বাংলার তথা বর্ধমানের বুকে স্থান করে নিয়েছে তেমনি বহু মূল জাতির সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে এখানের সমাজ। বিজিত জাতির প্রাধান্য , বৃত্তির পরিবর্তন . স্থানান্তরে গমন ও বসবাস, নগরায়ন, আচারভ্রষ্ট হওয়া বা শুদ্ধ আচার গ্রহণ করা , অসবর্ণ বিবাহ প্রভৃতির ফলে সামাজিক , রাজনৈতিক , অর্থনৈতিক, ধর্মীয় পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে। বর্ধমান জেলায় হিন্দু, মুসলমান, শিখ , খৃষ্টান, জৈন, বৌদ্ধ, পার্শী, ইহুদী, আদিবাসী প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি ও ধর্মাবলম্বী মানুষের বৈচিত্র্যের মধ্যে এক সংহতি বা সমন্বয় (harmony) সাধিত হয়েছে। এক্ষেত্রে দেশী-বিদেশী , ছোট-বড়, উচ্চ-নীচ ইত্যাদি সম্প্রদায়গতভাবে কার কতটা প্রভাব আছে সে প্রশ্ন আজ নিরর্থক

হয়ে পড়েছে। তবে এক্ষেত্রে সকলের দাবী সমভাবে দেখাই যথোচিত মনে হয়। কারণ এক্ষেত্রে মিশ্রণ বা বিদেশীকরণ এতই জটিল যে সঠিকভাবে তা নিরূপণ প্রায় অসম্ভব। ধর্ম, বর্ণ, পেশা বা সম্প্রদায় কোন একটির ভিত্তিতে জেলার মানুষদের আজ চিনে নেওয়া সম্ভব নয়। এখানে যা ঘটেছে তা হলো বিবিধের মাঝে মিলন। কোন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের দ্বারা তাদের প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান গোত্রের মাধ্যমে পরিচয় দেওয়ার মধ্যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যকে ধরে রাখার মানসিকতাও লক্ষণীয়। নানা জাতি ও ধর্মের লোক মিলেমিশে একাকার হয়েছে কিন্তু বাহ্যিক আত্মীয়তা বা মিশ্রণ একীকরণকে সম্পূর্ণ সার্থক হতে দেয়নি। তবে একথা অস্বীকার করা যাবে না যে উৎসব ও মেলা সামাজিকভাবে জনগোষ্ঠীকে দৈহিক এবং মানসিক উভয় দিক থেকেই প্রভাবিত করে।

এহেন সামাজিক পটভূমিকায় বৎসরের বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত জেলার মেলাগুলি একদিকে কর্মব্যস্ত, অভাবগ্রস্ত, নিরানন্দ, বৈচিত্র্যহীন জীবনে আনন্দ এনে দেয়, অপরদিকে উৎসবের সূত্র ধরে মেলায় মিলনের মধ্যে অনেকের সঙ্গে অনেকের, মানুষের সঙ্গে মানুষের চিন্তা-ভাবনার মিলন ঘটায়, লোকশিক্ষা ও লোকসংস্কৃতির এক জীবন্ত প্রাণস্পন্দন জাগিয়ে তোলে। মেলার মধ্যে সমাজ ও সংস্কৃতির সমগ্র দিকটি ফুটে ওঠে। উৎসব ও মেলায় প্রাতিষ্ঠানিক প্রধান ধর্মগুলি অনেকক্ষেত্রেই লোকায়ত হয়ে ওঠে সার্বিক জনসমাবেশ ও লৌকিক স্পর্শে। জনজীবনে সাম্প্রদায়িক ধর্মের বিভাজন থাকলেও তা লুপ্ত হয়ে যায় উৎসব ও মেলার উদার মানবস্বভাবের স্পর্শে। নানা বর্গের মানুষের মধ্যেকার ভাবগত আদান-প্রদানের সম্পর্ক গড়ে ওঠে মেলায়। এখানে ধর্ম-কর্ম, সাধু-ফকির, আমীর-গরীব, গুরু - শিষ্য, ইতর - ভদ্র, জাত-বেজাত ইত্যাদি বিভাজন নেই, খাদ্যাখাদ্যে বিকার নেই। আছে কিছু অনিয়ম। প্রসঙ্গতঃ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বদেশী সমাজ (ভাদ্র, ১৩১১) প্রবন্ধে লিখিত মেলার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্পর্কে বক্তব্যটির উল্লেখ প্রয়োজন। তিনি বলেছেন, 'আমাদের দেশ প্রধানত পল্লীবাসী। এই পল্লী মাঝে মাঝে যখন আপনার নাড়ীর মধ্যে বাহিরের বৃহৎ জগতের রক্ত চলাচল অনুভব করিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠে, তখন মেলাই তাহার প্রধান উপায়। এই মেলাই আমাদের দেশে বাহিরকে ঘরের মধ্যে আহ্বান করে। এই উৎসবে পল্লী আপনার সংকীর্ণতা বিস্মৃত হয়, তাহার হৃদয় খুলিয়া দান করিবার ও গ্রহণ করিবার এটি প্রধান উপলক্ষ। যেমন আকাশের জলে জলাশয় পূর্ণ করিবার জন্য বর্ষাগম, তেমনি বিশেষভাবে পল্লী হৃদয়কে ভরিয়া দিবার উপযুক্ত অবসর মেলা'। তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর চিন্তাধারাকে বাস্তবায়িত করার জন্য শান্তিনিকেতনে মেলা প্রতিষ্ঠা করেন।

মানুষের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালনের কথা অস্বীকার করা যায় না। এগুলি অনেকক্ষেত্রে মানুষকে সামাজিক দায়বদ্ধতায় আবদ্ধ করতে, সামাজিক আচার-বিচার-বিশ্বাসকে প্রভাবিত করতে এবং ব্যক্তি - সমাজ - প্রকৃতি - অতি-প্রাকৃতের সমন্বয় ঘটাতে ধর্মের ভূমিকা আদিকাল থেকেই শুরু হয়েছে। বেশীর ভাগ উৎসব ও মেলা শিব, ধর্মরাজ, শক্তি, মনসা, গ্রাম্য ও লৌকিক কোন দেব-দেবী, বৈষ্ণব

সম্প্রদায়ের বিভিন্ন উৎসব, উল্লেখযোগ্য তিথি পালন, পূণ্যস্নান, পীরের উৎসব, উরস্ বা মুসলমান সম্প্রদায়ের বিভিন্ন উৎসব, আদিবাসী সম্প্রদায়ের উৎসব প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এছাড়া অন্যান্য বিষয় যেমন সংস্কৃতি উৎসব, বইমেলা, শিল্প মেলা প্রভৃতিকে কেন্দ্র করেও মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্যে বহুক্ষেত্রে রয়েছে মিশ্র সংস্কৃতির নিদর্শন। উদাহরণ হিসাবে পূর্বস্থলি থানার বুড়োরাজের কথা বলা যায়। ইনি আসলে ধর্মরাজ, কিন্তু সনাতন ধর্মের ব্রাহ্মণগণ শিবের সঙ্গে যুক্ত করে ধর্মরাজকে গ্রাস করেছেন। আসলে ধর্মরাজ প্রাক্-আর্য আদিবাসী কোমের দেবতা, পরবর্তী সময়ে দেশী-বিদেশী, বৈদিক - পৌরাণিক, বৌদ্ধদের প্রভাব প্রভৃতি মিলেমিশে একাকার হয়েছে, আজও ধর্মরাজ পূজায় শুয়োর বলির মধ্যে কৌম সমাজের ইঙ্গিত মেলে। আদিম অন্ত্যজ জাতি ডোম, বাগদী, বাউরি, মুচি, জেলে প্রভৃতিদের পূজিত দেবতা ধর্মরাজকে ব্রাহ্মণরা আজ অনেক ক্ষেত্রে গ্রহণ করেছেন। বাবলাডিহি গ্রামে ন্যাংটেশ্বর শিবকে আজও অনেকে জৈন মহাবীরের মূর্তি বলে মনে করেন। কুড়মুনের শিবের গাজনে কালিকার পাতার নৃত্য বা মড়ার মাথা খেলা অনুষ্ঠানে অনার্য সংস্কৃতির নিদর্শন খুঁজে পেতে অসুবিধা হয় না।

আবার মধ্যযুগের বৈষ্ণব ধর্মের যে প্লাবন এসেছিল সেক্ষেত্রে বৈষ্ণব ধর্মের আদিভূমি হিসাবে বর্ধমান জেলার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কালনা, কাটোয়া, শ্রীখণ্ড, অগ্রদীপ, বাঘনাপাড়া, দেনুড়, কাঁদরা, সর, কুলীনগ্রাম, পালসিট প্রভৃতি স্থানগুলি আজও সেই স্মৃতি বহন করে চলেছে। প্রায় তিনশো বছরের অধিককাল সময় ধরে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিকাশ ও চৈতন্যদেবের প্রভাব বাঙালী মনকে এক বিশেষ দিকে ধাবিত করেছে। ব্রাহ্মণদের সামাজিক আচার-আচরণের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণশীল মনোভাব, ব্রাহ্মণ -অব্রাহ্মণ শ্রেণী সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য বা জাতি-বিচারের অন্তরায় চৈতন্যযুগে বৈষ্ণব গোস্বামীদের প্রভাবে বিশেষভাবে শিথিল হতে দেখা যায়। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মচ্ছব বা মহোৎসব (কোন বৈষ্ণব সাধকের তিরোধান দিবসকে কেন্দ্র করে) আজও সকল মানুষকে একত্রিত করে। দধিয়া বৈরাগীতলার উৎসব ও মেলা, যেটিকে জেলার সর্ববৃহৎ মেলা বলা চলে, সেটি মূলতঃ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিষয়কে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হলেও এখানে উৎসব ও মেলা পরিচালনা থেকে শুরু করে মেলায় হাজির হওয়ার ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের মানুষের সমান অংশগ্রহণ রয়েছে। তাছাড়া বড়বেলুনের কালীপূজা, ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা, মন্তেশ্বরের চামুণ্ডা, জামালপুরের বুড়োরাজ, মণ্ডলগ্রামের জগৎগৌরী প্রভৃতি অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যায়, যেখানে উৎসব ও মেলাগুলিতে মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষের উপস্থিতি কোন অংশে কম নয়। আবার কুসুমগ্রাম, বোহার, ডিসেরগড়, নেড়োদীঘি, সুয়াতা, ইবিদপুর, শিবদা, রাণীগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে মুসলমান সম্প্রদায়ের উৎসবজনিত মেলাগুলিতে হিন্দুদের উপস্থিতি লক্ষণীয়। রাইগ্রাম ও ইবিদপুরে পীরের উৎসবে হিন্দু মেয়েদের দ্বারা অনুষ্ঠান পালন এক অনবদ্য সমন্বয়ের দৃষ্টান্ত বলা যায়। এগুলি বাঙলার সমাজ ও জীবন প্রবাহকে আলোড়িত করেছে, সংস্কৃতিতে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন এনেছে। আবার চৈতন্য যুগে ও তৎপরবর্তী সময়ে বাংলা তথা পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান অভিযান বর্ধমান জেলার সমাজ, সংস্কৃতি , অর্থনীতি ও ধর্মীয়

জীবনকে প্রভাবিত করেছে। সুলতান, পাঠান, মোঘল, আরবী, পারসিক প্রভৃতি বিভিন্ন মুসলমান জনগোষ্ঠী এখানে এসেছেন। তাদের উদ্দেশ্য কেবল রাজ্য শাসন বা ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে সীমিত না থেকে ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসারে ব্যবহৃত হয়েছে। অনেকক্ষেত্রে হিন্দু ধর্মে উদারতার অভাব বা বর্ণ হিন্দুদের দ্বারা নিম্নবর্ণের প্রতি অত্যাচার ও নিপীড়ন, শাসকগোষ্ঠীর অনুগ্রহ পাওয়া প্রভৃতি নানা কারণে – ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। দেব-দেবীর পূজা-অনুষ্ঠানের মধ্যেও ইসলাম ধর্মের প্রভাব লক্ষণীয়। রাইগ্রাম, সুয়াতা প্রভৃতি স্থানের কথা এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। এরুয়ার গ্রামের বহু মুসলমান আজও তাদের ধর্মান্তরিত মুসলমান বলে মনে করেন এবং পাশাপাশি হিন্দুদের সঙ্গে সম্প্রীতি বহন করে চলেছেন। এরা হিন্দুদের বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানেও সামিল হন। হিন্দু - মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের উৎসব - অনুষ্ঠানে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ একত্রে মিলিত হন। বাঙলার এই জেলাটিতে মুসলিম জনসমাজ কিভাবে গড়ে উঠেছে, প্রতিষ্ঠা পেয়েছে ও মিলেমিশে একাকার হয়েছে তা এই উৎসব-অনুষ্ঠান ও মেলার বিবর্তনে খুঁজে পেতে অসুবিধা হয় না। সর্বোপরি হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৈষ্ণব প্রভৃতি ধর্মের ও জাতির লোকদের পাশাপাশি জেলাটিতে রয়েছে বেশ কয়েকটি আদিবাসী জাতি ও উপজাতি গোষ্ঠীর বসবাস। এদের উৎসব-অনুষ্ঠানের বৈচিত্র্য কিছুটা স্বতন্ত্র হলেও এগুলি জেলার সমাজ, সংস্কৃতি ও জীবন প্রণালীর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এদের লৌকিক দেব-দেবীর পূজা ও অনুষ্ঠানের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে আদিম জাতির বিশ্বাস ও সংস্কৃতি। এক কথায় এখানে বিরোধ ও সংঘর্ষের পরিবর্তে উদারতা, সহযোগিতা, সমন্বয় ও সহাবস্থান প্রাধান্য পেয়েছে।

গ্রাম বা শহর এলাকায় ছোট অথবা বড় উৎসব অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে বৈচিত্র্য সুপ্রচুর হলেও এগুলিকে কেন্দ্র করে সারা বছর ধরে নির্দিষ্ট দিন বা তিথিতে যে অসংখ্য মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে সেগুলি সামাজিক দিক থেকে জনজীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে থাকে। তাই সমাজ জীবনে এদের আবেদনকে অস্বীকার করা যাবে না। এত বৈচিত্র্যপূর্ণ মিলন আর কোথাও নেই। মেলায় সাধারণ মানুষ আসেন তার একঘেঁয়ে জীবনের অবসান ঘটিয়ে আত্মীয়-পরিজনদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আনন্দ পেতে, পুণ্যার্থীরা আসেন পুণ্যলাভের আশায়, ব্যবসাদারগণ লাভের আশায়, যাত্রাওয়ালা, কথক, গায়ক, প্রমুখ শিল্পীরা আসেন আনন্দদানের মধ্যে দিয়ে অর্থোপার্জনের জন্য, কানা - খোঁড়া - দুঃস্থেরা আসে ভিক্ষার আশায়, সমাজসেবীরা সেবা করার সুযোগ পান, রাজনৈতিক নেতারা আসেন স্বীয় প্রচারের লোভে, অসামাজিক ব্যক্তিরা আসে তাদের স্বার্থসিদ্ধির লোভে। এক কথায় মেলা হলো সমাজের আয়না। এর মধ্যে সমাজের সামগ্রিক চিত্র ফুটে ওঠে।

উৎসব-পার্বণ ও সংশ্লিষ্ট মেলাগুলি অনুষ্ঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে মরশুম বা ঋতুগত দিকটি আলোচনার দাবী রাখে। শিব পূজার উৎসব ও মেলাগুলি মূলত ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে ; ধর্মপূজার উৎসব ও মেলাগুলি কয়েকটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছাড়া বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে; কালী, যোগাদ্যা, সিদ্ধেশ্বরী, গঙ্গাদেবী প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে উৎসব ও মেলাগুলি কার্তিক মাস থেকে শুরু করে – জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত ; মনসা পূজার উৎসব-অনুষ্ঠান ও মেলাগুলি জ্যৈষ্ঠ

মাস থেকে শুরু করে ভাদ্র মাসের সংক্রান্তি পর্যন্ত; ক্ষেত্রপাল, শীতলা, পঞ্চানন. চণ্ডী প্রভৃতি গ্রাম্য ও লৌকিক দেব-দেবীর উৎসব-অনুষ্ঠান ও মেলাগুলি মাঘ মাস থেকে শ্রাবণ মাস পর্যন্ত ; পুণ্যস্নানের উৎসব ও মেলা পৌষ সংক্রান্তি বা ১লা মাঘ; মুসলমান সম্প্রদায়ের উৎসব - অনুষ্ঠান ও মেলাগুলি ফাল্গুন - চৈত্র মাসে ; বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উৎসব ও মেলা মাঘ ও বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসে কিছুটা আধিক্য থাকলেও প্রায় সারা বছর ধরে; আদিবাসী সম্প্রদায়ের উৎসব ও মেলাগুলি ভাদ্র-আশ্বিন মাসে এবং বিবিধ বিষয়কে কেন্দ্র করে উৎসব ও মেলার আধিক্য মাঘ-ফাল্গুন মাসে থাকলেও প্রায় সারা বছর ধরে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। একটি লক্ষণীয় বিষয় হলো বৎসরের বিভিন্ন সময়ে উৎসব-পার্বণ ও মেলা অনুষ্ঠিত হলেও দুটি সময়ে এর আধিক্য রয়েছে। একটি হলো হেমন্তের ফসল ঘরে তোলার পর, আর একটি হলো কৃষিকাজ শুরু হওয়ার আগে। কৃষির উর্বরতা বৃদ্ধি বা সর্পের দেবীকে সন্তুষ্ট করার ইঙ্গিত এগুলির বেশ কয়েকটিতে স্পষ্টভাবেই ফুটে ওঠে। এদিক থেকে ঘনত্ব অনুসারে উৎসব-অনুষ্ঠান ও মেলাগুলিকে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। ফাল্গুন - চৈত্র মাস উচ্চ ঘনত্ব সম্পন্ন, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় মাস মধ্য ঘনত্ব সম্পন্ন; পৌষ-মাঘ ক্রম বর্ধমান মধ্য ঋতুগত ঘনত্ব সম্পন্ন; শ্রাবণ-কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাস নিম্ন ঋ তুগত ঘনত্ব সম্পন্ন এবং ভাদ্র - আশ্বিন মাস ক্রম বর্ধমান নিম্ন ঋতুগত ঘনত্ব সম্পন্ন।

গ্রামভিত্তিক বর্ধমান জেলার একদিকে কৃষি ও অন্যদিকে শিল্প কারখানার প্রাধান্য এবং আঞ্চলিক ভাবে জনসংখ্যার ঘনত্ব, জাতিগত বা ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির সংখ্যাধিক্য ইত্যাদি উৎসব-পার্বণ ও মেলাগুলি অনুষ্ঠিত হওয়ার ক্ষেত্রেও বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। বিষয়টি খুব সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে। জেলার সর্বত্র শিব পূজার অনুষ্ঠান হলেও এর আধিক্য রয়েছে বর্ধমান সদর, মেমারি, মন্তেশ্বর, কালনা, কাটোয়া, কেতুগ্রাম, আউসগ্রাম, অণ্ডাল, কুলটী প্রভৃতি থানা এলাকায়, শক্তিদেবীর পূজা ও উৎসবের আধিক্য রয়েছে রায়না, জামালপুর, ভাতার, কেতুগ্রাম প্রভৃতি থানা এলাকায়, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উৎসবের আধিক্য রয়েছে অজয় ও ভাগীরথী তীরবর্তী এলাকা কেতুগ্রাম, কাটোয়া, পূর্বস্থলী, কালনা প্রভৃতি থানায়, মুসলমান সম্প্রদায়ের উৎসবের আধিক্য রয়েছে বর্ধমান সদর, মঙ্গলকোট, কেতুগ্রাম, ভাতাড়, কালনা, মেমারি, রায়না, কাঁকসা, রাণীগঞ্জ, আসানসোল প্রভৃতি থানা এলাকায়, আদিবাসী সম্প্রদায়ের উৎসবের আধিক্য রয়েছে জামুরিয়া, কুলটী, সালানপুর থানা এলাকায়, গ্রাম্য দেবী বা বাস্তু দেব-দেবীর পূজা উৎসব অনুষ্ঠান প্রায় অধিকাংশ গ্রামে বৎসরের বিভিন্ন সময়ে নির্দিষ্ট দিনে অথবা তিথিতে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এক কথায় প্রচণ্ড কেন্দ্রীভবনের অন্তরতম অংশ হলো বর্ধমান সদর, মেমারি, জামালপুর, কালনা প্রভৃতি থানা এলাকা, মধ্যবর্তী কেন্দ্রীভবনের অংশ ভাতাড়, মন্তেশ্বর, পূর্বস্থলী, কাটোয়া, কেতুগ্রাম, মঙ্গলকোট, আউসগ্রাম, গলসী, খণ্ডঘোষ. রায়না, অণ্ডাল, আসানসোল, কুলটী, সালানপুর চিত্তরঞ্জন, হীরাপুর প্রভৃতি এলাকা এবং কম সংখ্যক উৎসব ও মেলার অঞ্চল হলো বুদবুদ, কাঁকসা, ফরিদপুর, কোক ওভেন, দুর্গাপুর প্রভৃতি থানা এলাকা। এই তারতম্য অনেকাংশে নির্ভর করে নির্দিষ্ট এলাকার আর্থ সামাজিক কাঠামো, জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ও বিন্যাস, তাদের

জাতিগত, ধর্মীয় ও ঐতিহ্যগত পরিচিতির উপর।

গ্রাম্য দেব-দেবীর পূজা-পার্বণ উৎসব ও মেলাগুলি সমাজ সংহতির এক শক্তিশালী মৌলিক উপাদান। এগুলির মধ্যে একদিকে যেমন রয়েছে বৈচিত্র্য, তেমনি অন্যদিকে রয়েছে সমন্বয় ও সহাবস্থানের সুর। বিভিন্ন গোষ্ঠী, ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষ তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে ধরে রাখতে যেমন প্রয়াসী, তেমনি একে অপরকে প্রভাবিত করেছে এবং অনেক ক্ষেত্রে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। এখানে বিরোধ ও সংঘর্ষের পরিবর্তে উদারতা, সহযোগিতা, সমন্বয় ও সহাবস্থান প্রাধান্য পেয়েছে।

উৎসব ও মেলাগুলি পরিচালনার ক্ষেত্রে অতীতে ব্যক্তিগত বা পারিবারিক পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রাধান্য থাকলে ও বর্তমানকালে এগুলি বেশীরভাগ ক্ষেত্রে বারোয়ারী রূপ নিয়েছে। অতীতের রাজা, জমিদার বা সমাজের প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতা থেকে এগুলি বর্তমানে প্রায় মুক্ত। কোন কোন ক্ষেত্রে দেব-দেবীর পূজারী বা সেবাইত বা বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের প্রাধান্য বর্তমানে থাকলেও বেশীরভাগ ক্ষেত্রে উৎসব ও মেলাগুলি কোন বারোয়ারী কমিটি বা পঞ্চায়েত দ্বারা পরিচালিত হয়। এক্ষেত্রে অনেক সময় মেলার দোকানদারদের তোলার উপর অনেকাংশে নির্ভর করতে হয় বলে মেলাগুলি কোথাও কোথাও ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়েছে। তাছাড়া প্রকৃতিগতভাবেও উৎসব ও মেলার মধ্যে পরিবর্তন এসেছে। এক্ষেত্রে ধর্মীয় চেতনাকে কিছুটা লঘু করে আড়ম্বর প্রিয়তার দিকে ঝোঁক লক্ষণীয়ভাবে বেড়েছে।

বর্তমানকালে যান্ত্রিক সভ্যতার বিকাশ, গতানুগতিকতা, জীবন-সংগ্রামের তীব্রতাজনিত অভাব প্রভৃতি যেখানে আত্মিক, অকৃত্রিম, অনাড়ম্বর, সহজ ও সরল মিলনে ছেদ টানতে চায় সেখানে এই উৎসব ও মেলাগুলি ধনী-নির্ধন, উচ্চ-নীচ, বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে মিলন ঘটিয়ে প্রাণ-স্পন্দনে পূর্ণ করে। বৎসরের নির্দিষ্ট সময়ে গ্রাম্য দেব-দেবীর পূজা-পার্বণ উপলক্ষে দূর-দূরান্ত থেকে আত্মীয়-স্বজন এক সঙ্গে মিলিত হওয়ার সুযোগ পান। সমাজের মানুষ অন্তর্মুখী মনোরাজ্য থেকে ও বিরক্তিকর, বৈচিত্র্যহীন একঘেঁয়েমি থেকে মুক্ত হওয়ার মানসে মেলায় প্রাণোচ্ছল, সাবলীল, আনন্দমুখর পরিবেশে মিলিত হন। এক কথায় ছোট-বড় এবং গ্রাম্য বা শহর এলাকায় সমস্ত উৎসব ও মেলাগুলি সামাজিক দিক থেকে জনজীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে থাকে। তাই সমাজ জীবনে এদের আবেদনকে অস্বীকার করা যাবে না।

প্রসঙ্গতঃ কৃষিনির্ভর গ্রামভিত্তিক বর্ধমান জেলার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও পূজা-পার্বণ-উৎসব ও মেলাগুলির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। উৎসব ও পূজা পার্বণের উপকরণ - মণ্ডা - বাতাসা থেকে শুরু করে নানা ধরনের ফলমূল, পূজা-উপাচার, নতুন কাপড়-চোপড় ইত্যাদির এক বাজার সৃষ্টি হয়, গরুর গাড়ীর চাকা বা কৃষিকাজে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ,ঘরবাড়ি তৈরীর দরজা, জানালা ও আসবাবপত্র প্রভৃতি নানা প্রয়োজনীয় জিনিস মেলা থেকে আজও সংগৃহীত হতে দেখা যায়। আবার এক মেলা থেকে অন্য মেলায় পর্যায়ক্রমে ঘোরার মধ্যে অনেক

দোকানদার এটিকে তাদের জীবিকা উপার্জনের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছেন। এক কথায় শহর ও পল্লী অঞ্চলে মেলাগুলির আয়তন, পরিবেশ, প্রকৃতিগত পার্থক্য থাকলেও এদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম যেটি এখানে বিশদভাবে আলোচনা সম্ভব হলো না।

উৎসব ও মেলায় জনসমাবেশের সূত্র ধরে যাত্রাগান, নাটক, লেটোগান, বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, ম্যাজিক, লটারী, সার্কাস, সিনেমা, পুতুলনাচ প্রভৃতি সাংস্কৃতিক উপাদানগুলি একদিকে মানুষকে আনন্দ দেয় ও অবসর বিনোদনের কাজ করে, অপরদিকে এগুলি সংগঠিত করার ক্ষেত্রে যে সামাজিক সংহতি সৃষ্টি হয় তার মূল্য কম নয়। এগুলির আয় থেকে বা মেলার আয় থেকে অনেক সময় লাইব্রেরী, ক্লাব প্রভৃতির উন্নয়ন ঘটানো, মন্দির, মসজিদ সংস্কার, রাস্তাঘাট মেরামত প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে প্রেরণা জোগায় সামাজিকভাবে সমষ্টিগত চিন্তাভাবনা ও সমষ্টির উন্নয়নে।

পূজা-পার্বণ-উৎসব ও মেলাগুলির প্রকৃতিগত, আকৃতিগত ক্ষেত্রে বর্তমানকালে যে পরিবর্তন তা উল্লেখের দাবী রাখে। জামালপুরের বুড়োরাজ, ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা, নবাবহাট ও আলমগঞ্জে (বর্ধমান) শিব, কালনায় মহিষমর্দিনী প্রভৃতির পূজা-উৎসব-এর মেলায় ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন সামাজিক মেলবন্ধনের দৃষ্টান্ত বা প্রভাব বেশী হলেও বর্তমানে সংস্কৃতি উৎসব, বর্ধমান পরিবেশ কাননের উৎসব ও মেলা, বইমেলা, যুব উৎসব মেলা প্রভৃতির মধ্যে অন্য ধরনের সংস্কৃতি চর্চার প্রাধান্য রয়েছে। আবার রাণীগঞ্জে পীরের দরগা, দধিয়া বৈরাগী তলা, মণ্ডলগ্রাম, চোৎখণ্ড প্রভৃতি স্থানের মেলাগুলিতে আর্থিক লেনদেন আজও প্রায় অটুট রয়েছে। সামাজিক বিবর্তন, যন্ত্রমুখর নগর সভ্যতার ছোঁয়াচ, অর্থনীতি ও বিপণন পদ্ধতির পরিবর্তন, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও যানবাহনের উন্নতি, হাট - বাজারের প্রসার, শহরমুখী মনোভাব, দৈনন্দিন জীবনে সংগ্রামের তীব্র কর্মব্যস্ততা, অবস র বিনোদনের নানা স্থায়ী ব্যবস্থা প্রভৃতি পূজা - পার্বণের অনুষ্ঠান পরিচালনা, উৎসব পালন ও মেলার চরিত্রকে প্রভাবিত করেছে। অতীতের প্রাণোচ্ছলতা হারিয়ে যাচ্ছে। কৃত্রিমতা ও আন্তরিকতার অভাব স্থান পাচ্ছে। অতীতের ধর্মীয় চেতনা, ভক্তি ও ভাবের প্রাধান্যপূর্ণ অন্তর্মুখী উৎসব বর্তমানে অনেকাংশে বাহ্যিক ও আড়ম্বরপূর্ণ বহির্মুখী হয়ে পড়েছে। অনুষ্ঠান, ব্রত প্রভৃতি পালনের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন এসেছে। এক্ষেত্রে আত্মিক ও আধ্যাত্মিকতা বর্জিত অন্ধ অনুবর্তনের প্রবাহ বাড়ছে। পুণ্যপুকুর, তুষ-তুষলী বা তোষলা, সাঁজপুজনী প্রভৃতি ব্রতের স্থান নিচ্ছে সন্তোষী মায়ের ব্রতের মতো বিষয়। উৎসবে আকর্ষণ সৃষ্টির জন্য বৈচিত্র্যপূর্ণ আড়ম্ব র, উদ্দাম-উচ্ছল আনন্দ উপভোগের প্রচেষ্টা ধর্মীয় সংস্কৃতির সনাতন ধারাটিকে অব্যাহত থাকতে দেয়নি। অবশ্য বর্তমান যুব সমাজের হতাশাগ্রস্ত অনিশ্চিত সময় কাটানোর একটি তাৎক্ষণিক উপায় হিসাবে এগুলি অনেকক্ষেত্রে গৃহীত হয়েছে। আবার নগর সভ্যতার বৃদ্ধি, বর্তমান সাহিত্য, প্রচার মাধ্যম, চিকিৎসা বিদ্যা, বিজ্ঞান মনস্কতা প্রভৃতি বিষয়গুলিও সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে মানুষের মিলনে পরিবর্তন এনেছে। উৎসব ও মেলায় অতীতের কবিগান, যাত্রা, রামায়ণ গান, লেটোগান, আলকাপ, পুতুল নাচ, লাঠি খেলা, রায়বেঁশে নাচ , ঢাকী-ঢুলীদের নাচ, কাঠের নাগর দোলা প্রভৃতির

পরিবর্তে সিনেমা, সার্কাস, বৈদ্যুতিক নাগরদোলা, মাইক, হিন্দিগান, অশ্লীল নাচ প্রভৃতি অনেকাংশে দখল করেছে। সামাজিক, জাতিগত ও বর্ণগত দিক থেকেও উৎসব ও মেলাগুলিতে মিলনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে। সামাজিকভাবে ধনী নির্ধনের প্রশ্নে বা জাতিগত ও বর্ণগত দিক থেকে উচ্চ-নীচ, 'জল চল' ও 'জল অচল' এ ধরনের চিন্তাভাবনা অনেকাংশে স্তিমিত হয়েছে। আবার স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ ও অনুভূতিও অনেকাংশে কমেছে। যন্ত্র সভ্যতায় শিক্ষিত মানুষ অনেকক্ষেত্রে গতানুগতিক হয়ে পড়েছে। কারণ সংস্কৃতিবৃত্ত নিয়ন্ত্রণ করছে জীবনবৃত্তকে ও তার অর্থনীতিকে। গ্রামভিত্তিক এই বর্ধমান জেলায় উৎসব ও মেলাকে কেন্দ্র করে যে আর্থিক লেন -দেন বা কেনা বেচা সেটিও সাম্প্রতিককালে যান্ত্রিক ও নগর সভ্যতার প্রভাবে , স্থায়ী বাজার-হাট বা দোকানপাট বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রয়োজন কমিয়ে দিয়েছে। স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত বাঁশ, কাঠ, মাটি প্রভৃতির তৈরী জিনিসপত্রের পরিবর্তে এ্যালুমিনিয়াম, স্টেনলেস স্টীল, প্লাসটিক, নাইলন প্রভৃতির তৈরী সামগ্রী স্থান দখল করেছে। কৃষি কাজে ব্যবহৃত গরুর গাড়ীর চাকা, লাঙ্গল প্রভৃতির স্থান দখল করেছে পাওয়ার টিলার, ট্রাকটর, ঝাড়াই মেশিন প্রভৃতি। মেলায় খাদ্যাখাদ্যে বিকার নেই, সেখানেও আজ সিড়ির নাড়ু , নারকেল নাড়ু, গুড়ের পাটালি, কদমা, পাঁপড় ভাজা প্রভৃতির স্থান দখল করছে কোল্ড-ড্রিঙ্কস্, ভেলপুরী প্রভৃতি খাবার। অবশ্য এটিকে অস্বীকার করা যাবে না যে মেলার অর্থনৈতিক দিকটিতে প্রকৃতিগত ও পরিমাণগত পরিবর্তন সূচিত হলেও আজও বেশ কিছু মেলায় বিশেষ বিশেষ জিনিসটি সংগ্রহ করার জন্য মানুষ অপেক্ষা করে বা আকৃষ্ট হয়। সাম্প্রতিককালে সাংস্কৃতিক মেলা, বিজ্ঞান মেলা, বইমেলা, কৃষিমেলা, শিল্পমেলা প্রভৃতি মেলাগুলিও উল্লেখযোগ্যভাবে আর্থিক লেনদেনের মধ্যে দিয়ে এবং সাংস্কৃতিক বিষয়কে তুলে ধরে সামাজিক মিলন ঘটায়।

উৎসব ও মেলাগুলি পরিচালনার ক্ষেত্রে সামাজিকভাবে এবং অন্যান্য দিক থেকে যে পরিবর্তন সেটিও প্রণিধানযোগ্য। অতীতে রাজা, জমিদার, ধনী বা সামাজিকভাবে প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের বিশেষ ভূমিকা ছিল। বর্তমানে এগুলি বেশীরভাগ ক্ষেত্রে বারোয়ারী কমিটি, পঞ্চায়েত, কোন বোর্ড বা কমিটির দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে উৎসব ও মেলা পরিচালকদের লাভ-লোকসানের প্রশ্ন থেকে যায় এবং অনেক সময় বাধ্যতামূলক চাঁদা আদায় বা জুলুমবাজি মানুষের সাবলীল আনন্দকে অনেকাংশে ব্যাহত করে। সুষ্ঠু পরিচালন ব্যবস্থার অভাবে জেলার কয়েকটি উৎসব ও মেলা ম্রিয়মান হয়ে পড়েছে। পাঁচড়া, রাইগ্রাম, মধ্যমগ্রাম, কুলীনগ্রাম, দোমহানীর মতো বহু মেলায় আজ জুয়া খেলা অর্থ সংগ্রহের অন্যতম অবলম্বন। পূজা-পার্বণ, উৎসব-অনুষ্ঠান পালন অনেক ক্ষেত্রে উপলক্ষ হয়ে পড়েছে। দেবদেবীর পূজা-পার্বণ, অনুষ্ঠানের আদি বৃত্তান্ত, সমাজতত্ত্ব না জেনে আত্মিক ও আধ্যাত্মিকতা বর্জিত হয়ে গা ভাসানোর প্রবণতা বেড়েছে। কিন্তু উৎসব ও মেলাগুলির প্রতি মানুষের, স্বাভাবিক আগ্রহ থেকে আজও অনেকে উৎসব ও মেলাগুলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার দায়িত্বে এগিয়ে আসেন। অতীতে যেখানে কোন ব্যক্তির দায়িত্বে সকলে আনন্দ উপভোগ করতেন, বর্তমানে সেখানে সমষ্টি দায়িত্ব নিয়ে সকলের আনন্দ

উপভোগের স্থান তৈরী করে দেয়।

পরিশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন জেলার জন-জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত পূজা-পার্বণ-উৎসব ও মেলাগুলি আমাদের সমাজ, সংস্কৃতি ও অর্থনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে সীমাহীন ভূমিকা পালন করে থাকে। গ্রাম নির্ভর জেলাটিতে গ্রামের সাধারণ মানুষের কাছে ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন, উৎসব সংগঠিত করা ও মেলায় মিলিত হওয়া কেবলমাত্র আমোদ-প্রমোদের বিষয় নয়, এগুলি পল্লী বাঙলার নিজস্ব সম্পদ। আজও বহু পূজা-পার্বণ-উৎসব ও মেলার মধ্যে আমাদের সনাতন সংস্কৃতির ধারা প্রবাহিত এবং সাবলীলভাবে সার্থক সামাজিক মিলন ঘটাতে মানুষ প্রয়াসী। কিন্তু আধুনিক প্রযুক্তি, অত্যাধুনিক নগ্ন সংস্কৃতি, বৈভবের প্রতিযোগিতা, বিজ্ঞাপন সর্বস্ব নিষ্প্রাণ আড়ম্বর, গণ মাধ্যমের শানিত প্রকরণ প্রভৃতি আমাদের রুচি, চিন্তাভাবনা, সংস্কৃতি, নিজস্ব যা কিছু তা থেকে দূরে সরিয়ে পরিবর্তন আনতে চায়। সুস্থ সংস্কৃতি, সুস্থ জীবন ও স্বতঃস্ফূর্ত মিলনের বাধা সৃষ্টি করতে চায়। তবে একথা অস্বীকার করা যায় না যে পূজা-পার্বণ -উৎসবের সূত্র ধরে মেলার মতো সামাজিক প্রতিষ্ঠান স্বতঃস্ফূর্তভাবে ও ঐতিহ্যগতভাবে সৃষ্টি হয়েছে। তাই এগুলি বিলীন হয়ে যাবে না বলা যায় বা এগুলির গুরুত্বকে অস্বীকার করা যাবে না। কিন্তু বর্তমান সামাজিক কাঠামো, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন, সাংস্কৃতিক আবেদন, অর্থনৈতিক সংগঠন, মানুষের রুচি, মানসিকতা, সংস্কারগত ধ্যানধারণা, বিশ্বাস, রীতিনীতি, লোকাচার প্রভৃতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পূজা-পার্বণ-উৎসব ও মেলাগুলি অনুষ্ঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রকৃতিগত ও পরিমাণগত পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। সময়ের দাবীতে এগুলির আংশিক পরিবর্তনকে স্বীকার করে নিয়ে বলা যায় সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে এদের সার্বিক আবেদনকে অস্বীকার করা যাবে না। কারণ নানা টানপোড়েনের চাপে জেলার তথা দেশের সমাজ ইতিহাসের গতি-প্রকৃতি পাল্টাচ্ছে এবং পরিবর্তন শুধু উৎসব ও মেলায় হচ্ছে না, উৎসবে অংশগ্রহণ করতে এবং মেলায় মিলিত হতে আসছে বদলে যাওয়া মানুষ। আমাদের সংস্কৃতি সম্মিলিত (Composite) ও গতিশীল (Dynamic)সংস্কৃতি। জেলার সংস্কৃতিকে খুঁজে পেতে এই পূজা-পার্বণ-উৎসব ও মেলাগুলি তাই আজও অদ্বিতীয় সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং সমাজ জীবনের প্রাণকেন্দ্র রূপে পরিচিত।

সামাজিক মিলনক্ষেত্র হিসাবে চিনে নিতে অসুবিধা হবে না জেলার উৎসব ও মেলাগুলি সম্পর্কে জানতে পারলে। অসংখ্য উৎসব ও মেলার মধ্যে চারটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন। লৌকিক দেবী ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা, আদিম অধিবাসীদের দেবতা ধর্মরাজকে সনাতন ধর্মের ব্রাহ্মণ কর্তৃক গ্রহণের দৃষ্টান্ত জামালপুরে, দধিয়া বৈরাগীতলায় বৈষ্ণবদের, রাণীগঞ্জ রোনাই রোডে মুসলমান সম্প্রদায়ের উৎসব ও মেলার কথা মাত্র এখানে স্থানাভাবে উল্লেখমাত্র করা যেতে পারে যেগুলি বিশ্লেষণ করলে বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সামাজিক ইতিহাসের দলিল মনে হওয়া স্বাভাবিক।

ক) *ক্ষীরগ্রামে যোগাদ্যাদেবীর পূজা-উৎসব ও মেলা ঃ* মঙ্গলকোট থানার অন্তর্গত

ক্ষীরগ্রামে বৈশাখ মাসের সংক্রান্তির দিন যোগাদ্যাদেবীর বাৎসরিক পূজাকে কেন্দ্র করে চৈত্র সংক্রান্তির দিন থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ বৈশাখ মাস ধরে গ্রামের লোকদের বিভিন্ন প্রথা মেনে চলা, অনুষ্ঠান পালন প্রভৃতির মধ্যে কৃষি সমাজের সংস্কৃতি ভাবনা, গোষ্ঠীভাবনার নিদর্শন খুঁজে পেতে অসুবিধা হয় না। 'লগ্ন - উৎসব', 'জলমগ্ন', 'ক্ষীর কলসের জল সিঞ্চন', 'চ্যাঙ-ব্যাঙ', 'মালাকারের বিয়ে', 'মামা-ভাগ্নের হাল লাঙ্গল', গ্রহাচার্যের বর্ষফল ঘোষণা,' 'দত্ত মশাইয়ের সাজ', 'ময়ূর নাচ', 'মৌর নাচ', অধিবাস, 'বীরদর্পে মাটি কাঁপানো নাচ', 'মাঝেনেওয়া', 'উগল পূজা', 'মাসি পিসির ঝাঁপি আনা', 'গুয়া ডাকা' 'পাট নড়ান', 'ডোম চুয়ারী', মহাপূজা প্রভৃতি অনুষ্ঠানগুলি সমাজ ও সাংস্কৃতিক উপাদানের অশেষ সন্ধান দেয় যা এখানে স্থানাভাবে আলোচনা সম্ভব হচ্ছে না। আবার দেবীর পূজা ও অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ক্ষীরগ্রাম ও পার্শ্ববর্তী কয়েকটি গ্রামের বত্রিশটি জাতির লোকদের নিয়ে সামাজিকভাবে যে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল সেটিও প্রণিধানযোগ্য। বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীর লোকদের নিয়ে দেবীর যে 'পরিজন' উৎসব পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে তা সমন্বয় ও সহাবস্থানের দৃষ্টান্ত ছাড়া আর কিছুই নয়। বর্তমানে এই দেবী সনাতন ধর্মের ব্রাহ্মণদের দ্বারা গৃহীত হলেও ডোম, বাগদি প্রভৃতি জাতির নির্দিষ্ট অংশগ্রহণ প্রমাণ করে দেবী যোগাদ্যা একদা লৌকিক দেবী ছিলেন। বর্তমানেও বাৎসরিক পূজার দিন মহিষ বলি হয় এবং পূর্বে নরবলি দেওয়া হতো সে সম্পর্কে বহু প্রবাদ আজও লোকমুখে প্রচলিত রয়েছে।

যোগাদ্যা দেবীর পূজা ও উৎসবকে কেন্দ্র করে একটি বেশ বড় মেলা বসে। তিন চার দিন ধরে বহু মানুষের সমাগমে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে এক সামাজিক মিলনক্ষেত্র গড়ে তোলে। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-পরিজন ও বহু মানুষের মিলনে গ্রাম্য পরিবেশে আনন্দ ও বিনোদনের অবকাশ এনে দেয়। এখানে সামাজিক মিলন আজও সাবলীলভাবে বয়ে চলেছে।

খ) পূর্বস্থলী থানার জামালপুরে বুড়োরাজের গাজন ও মেলা ঃ ভাগীরথী তীরবর্তী অঞ্চল জামালপুর গ্রামে বৈশাখ মাসে বুদ্ধ পূর্ণিমায় ধর্মরাজের গাজন উপলক্ষে অনুষ্ঠান পালন ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের অংশগ্রহণের মধ্যে এক অভিনব সামাজিক মিলন ও সংস্কৃতির সন্ধান মেলে। এখানে আদিম অন্ত্যজ জাতির দেবতা ব্রাহ্মণদের দেবতা শিবের সঙ্গে সংমিশ্রণ ও মিলিতভাবে উৎসব পালন, গোপ সম্প্রদায়ের প্রাধান্য রাঢ় বঙ্গের সংস্কৃতির ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করে। অনুষ্ঠানে মূলত গোপ সম্প্রদায় কর্তৃক মিলিতভাবে অংশগ্রহণ, বলির পরে ছাগমুণ্ড কাড়াকাড়ি প্রভৃতি খুবই কৌতুহল জাগায়। দেবতার পূজার উপকরণ দাগ কেটে ধর্মরাজ ও শিবের মধ্যে ভাগ করে দেওয়ার ব্যবস্থা আজও চলছে।

উৎসব ও গাজনকে কেন্দ্র করে বহু দূর-দূরান্ত থেকে আসা দোকানপাট এবং জনসমাবেশের মধ্যে দিয়ে একটি বড় মেলা বসে। মেলাটি প্রায় একমাস ধরে চলে। হিন্দু-মুসলমান - আদিবাসী ও তফসিলী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষের মিলনে সামাজিক ক্ষেত্রটি সুদৃঢ় হয়।

পূজা-পার্বণ-উৎসব-অনুষ্ঠান পালনের মধ্যে যে সামাজিক ইতিহাস লুকিয়ে আছে সেজন্য এগুলির সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

গ) কেতুগ্রাম থানায় দধিয়া বৈরাগীতলার উৎসব ও মেলাঃ অজয় নদের তীরে দধিয়া গ্রামের সংলগ্ন বৈরাগীতলায় বৈষ্ণব সাধক গোপালদাস বাবাজীর তিরোধান দিবস উপলক্ষে মাঘ মাসের মাকরী সংক্রান্তির দিন যে উৎসব-অনুষ্ঠান পালিত হয় সেখানে বহু বৈষ্ণব, বাউল, ফকিরের সমাবেশ ঘটে। তাছাড়া দূরদূরান্ত থেকে প্রত্যন্ত এই গ্রামটিতে লক্ষাধিক মানুষ সমবেত হন গোপালদাস বাবাজীর আশীর্বাদ পেতে।প্রায় দুশো পঞ্চাশ বছর ধরে চলে আসা এই গ্রামীণ উৎসবটি বৈষ্ণবদের উৎসব-অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে হলেও বর্তমানে এটি সামাজিকভাবে সকলের উৎসবে পরিণত হয়েছে। উৎসব ও মেলা পরিচালনার জন্য কমিটি গঠন থেকে শুরু করে মেলায় মিলিত হওয়া পর্যন্ত সমস্ত ক্ষেত্রেই হিন্দু - মুসলমান প্রভৃতি জাতি - সম্প্রদায়ের নির্বিশেষে অংশগ্রহণ লক্ষণীয়। এই উৎসবে অংশগ্রহণ কেবলমাত্র জেলা বা রাজ্য নয়, রাজ্যের বাইরের লোকেরাও সমবেত হন। এখানে যে সামাজিক মিলনের ক্ষেত্রটি গড়ে উঠেছে তা আজও সাবলীলভাবে বয়ে চলেছে।

উক্ত উৎসবকে কেন্দ্র করে যে বিরাট মেলা বসে তা প্রায় একমাস ধরে চলে। রাজ্য এবং রাজ্যের বাইরে থেকে দু'হাজার সালে দোকানপাট আসে। গত বৎসরও দোকানপাটের সংখ্যা ছিল প্রায় এক হাজার। মেলার প্রথম কয়েকটি দিনে প্রতিদিন প্রায় লক্ষাধিক লোকের সমাবেশ হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে বর্তমানে এই স্থানে গমনাগমনের জন্য রাস্তাঘাট ও যানবাহনের ব্যবস্থা হলেও কয়েক বৎসর পূর্বে হাঁটাপথ ও গরুর গাড়ী ছাড়া কিছুই ছিল না। এই মেলাটিকে বর্ধমান জেলার সর্ববৃহৎ মেলা বলা যেতে পারে এবং এর সামাজিক আবেদন বহুদূর বিস্তৃত।

ঘ) রাণীগঞ্জ থানায় রাণীগঞ্জ রোণাই রোডে দরগা শরীফের উৎসব ও মেলাঃ বাংলা ১৩০৬ সালে ৪ ঠা ফাল্গুন মুসলমান ফকির জনাব সৈয়দ শাহ শামসুদ্দিন হাসানি-উল-হোসাইনি কাদারির মৃত্যুদিন উপলক্ষে তার সমাধি বা মাজারকে কেন্দ্র করে প্রতি বছর ৪ঠা ফাল্গুন উৎসব পালিত হয়। এই উৎসব উপলক্ষে চাদর চাপানো, মানত দেওয়া ইত্যাদি অনুষ্ঠান পালনে মুসলমানদের প্রাধান্য থাকলেও প্রায় সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের মানুষ হাজির হন। শিল্পাঞ্চলের এই উৎসবের মধ্যে জেলার মানুষ নয়, রাজ্যের বাইরের মানুষদেরও অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়।

উক্ত উৎসবকে কেন্দ্র করে একটি বেশ বড় মেলাও বসে। সেটি প্রায় পাঁচ থেকে ছয় দিন ধরে চলে। শহর এলাকায় অনুষ্ঠিত এই মেলায় জাতি - ধর্ম সম্প্রদায় নির্বিশেষে মানুষের মিলনে আত্মিক বন্ধন শিথিল হলেও মেলায় মিলনের মধ্যে বিনোদন ও অবসাদগ্রস্ত একঘেঁয়ে জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটাতে সাহায্য করে। মেলার দোকানপাটগুলিতে বিভিন্ন ধরনের খাবার ও অন্যান্য সামগ্রীর বিক্রিও উল্লেখযোগ্যভাবে হয়ে থাকে। এক কথায় নগর জীবনে আজও মেলায় মানুষের মিলনের আকাঙ্ক্ষা শেষ হয়ে যায়নি তার প্রমাণ এই

মেলাটি।

জেলার শহর বা গ্রাম এলাকায় বৎসরের বিভিন্ন সময়ে নানা স্থানে যে সমস্ত পূজা-পার্বণ-উৎসব ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে তার একটি অতি সংক্ষিপ্ত বিষয়গতভাবে ও থানাভিত্তিক তালিকা দেওয়া হলো। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য স্থানাভাবে সংগৃহীত সমস্ত তথ্য এখানে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। কেবলমাত্র গ্রামের নাম ও সময় উল্লেখ করা হবে।

শিবপূজা উপলক্ষে উৎসব মেলা

বর্ধমান সদর থানায় ঃ

ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রিতে - নবাবহাট (বর্ধমান), ভিখারীডাঙ্গা (আলমগঞ্জ),
চৈত্র সংক্রান্তিতে গাজন উপলক্ষে - কুড়মুন, পলাশী, পাঁড়ুই, পূতুণ্ডা, বড়শুল, রায়ান (দক্ষিণেশ্বর), এরাচিয়া, কুবাজপুর
বৈশাখ মাস - ভিটা গ্রামে
জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তিতে - কাঞ্চননগর

ভাতাড় থানায় ঃ

চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে - এরুয়ার ,আমারুণ, নাসিগ্রাম, কালীপাহাড়ী, কালিপাহাড়ী।
জ্যৈষ্ঠ মাসে - শুশুনিয়া (তারাক্ষামাতা)

আউসগ্রাম থানায় ঃ

শিবরাত্রি উপলক্ষে - রঘুনাথপুর (সিদ্ধিনাথ), শিববাগান (গুসকরা ; সোমনাথেশ্বর) ভাটগোন্না, বেলারী।

চৈত্র সংক্রান্তিতে - চকতেঁতুল (রামেশ্বর), আদরা (আদারেশ্বর), কৈতারা, গোহগ্রাম।

মেমারি থানায় ঃ

চৈত্র সংক্রান্তিতে - কেজা, আহমদপুর, শ্রীধরপুর (জলেশ্বর), বেগুট (নবস্থা) সাতগাছিয়া, নিশঙ্ক, আহিরা, শঙ্করপুর।

জামালপুর থানায় ঃ

ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি উপলক্ষে - জৌগ্রাম (জলেশ্বর), গঙ্গারামবাটী, কাঠুরেপাড়া(কালনা),

চৈত্র সংক্রান্তিতে - পাঁচড়া (বুড়োশিব), কাঁশড়া, গুড়েঘর, দাসপুর, বেড়ুগ্রাম, সাদিপুর।

রায়না থানায় ঃ

চৈত্র সংক্রান্তিতে - রসুইখণ্ড, বড়কয়রাপুর, ছোটবৈনান (দক্ষিণেশ্বর),
বীরুপুর,নাড়ুগ্রাম (নাড়েশ্বর), বেলাড়।

আসানসোল থানায় ঃ

চৈত্র সংক্রান্তিতে - আগুরিপাড়া (আসানসোল)

হীরাপুর থানা ঃ

ফাল্গুনমাসে শিবরাত্রিতে - চন্দ্রচূড়

চৈত্র সংক্রান্তিতে - পুরুষোত্তমপুর, চন্দ্রচূড়

সালানপুর থানায় ঃ

ফাল্গুনমাসে শিবরাত্রিতে - রূপনারায়ণপুর, জেমিহারী, জীতপুর।

বরাবনি থানায় ঃ

ফাল্গুনমাসে শিবরাত্রিতে - শিবপুর গ্রামে

চৈত্র সংক্রান্তিতে - শিবপুর গ্রাম, জামুরিয়া।

ফরিদপুর থানায় ঃ

চৈত্র সংক্রান্তিতে - ফরিদপুর, সাধুডাঙ্গা, গোপালমাঠ।

কাঁকসা থানায় ঃ

চৈত্র সংক্রান্তিতে - রক্ষিতপুর, শিলামপুর।

অণ্ডাল গ্রাম ঃ

ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রিতে - খান্দরা, পাণ্ডবেশ্বর।

চৈত্র সংক্রান্তিতে - কাজোড়াগ্রাম, বাবুইসোর, রামপ্রসাদপুর।

কাটোয়া থানায় ঃ

ফাল্গুনমাসে শিবরাত্রিতে - সিঙ্গি (বুড়োশিব), পুইনি, চৈতন্যপুর (শৈলেশ্বর)

চৈত্র সংক্রান্তিতে - সিঙ্গি, চড়কতলা (কাটোয়া) পানুহাট, করুই, মাজিগ্রাম, গোপালপুর, আখড়া, শ্রীবাটী।

কেতুগ্রাম থানায় ঃ

ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রিতে - নিরোল, বেরুগ্রাম, জামলে।

চৈত্র সংক্রান্তিতে - নৈহাটী, শ্রীগ্রাম, শ্রীপুর, দধিয়া, নবগ্রাম।

মঙ্গলকোট থানায় ঃ

ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রিতে - বাবলাডিহি, যাগেশ্বর ডিহি (যজ্ঞেশ্বর),

চৈত্র সংক্রান্তিতে - নিগন (নিগনেশ্বর)

পৌষ সংক্রান্তিতে - ধূমক্ষেত্র (ঝিরেলা)

কালনা থানায় ঃ

চৈত্র সংক্রান্তিতে - বাঘনাপাড়া, রাণীবন্দ, বৃদ্ধপাড়া, রাজবংশীপাড়া (কৃষ্ণদেবপুর), অনুখাল, বৈদ্যপুর।

পূর্বস্থলী থানায় ঃ

চৈত্র সংক্রান্তিতে - পূর্বস্থলী, মেড়তলা, চাঙ্গাহাটী (বিদ্যানগর)।

মন্তেশ্বর থানায় ঃ

ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি উপলক্ষে - সুটরা, দেনুড়।
চৈত্র সংক্রান্তিতে - দেনুড়।

ধর্মঠাকুর/ধর্মরাজের পূজা উপলক্ষ্যে গাজন উৎসব মেলা

বর্ধমান সদর থানায় ঃ

জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে - সুহারী, বারাশতী, বড়শুল, পলাশী।

ভাতাড় থানায় ঃ

বৈশাখী পূর্ণিমায় - রায়রামচন্দ্রপুর, বেলডাঙ্গা, পাড়হাট, কালাচাঁদতলা।
জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় - আড়রা, এরুয়ার।

আউস গ্রাম থানায় ঃ

বৈশাখী পূর্ণিমায় - বন্‌কুল, এড়াল
জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় - দিগ্‌নগর।

গলসী থানায় ঃ

শ্রাবণ মাসে - গলসী (গর্গেশ্বর)

মেমারি থানায় ঃ

বৈশাখী পূর্ণিমায় - কানপুর
জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় - হৈড়গ্রাম, শালিগ্রাম, মামদোতলা, দাদপুর
জ্যৈষ্ঠ অমাবস্যায় - কালেশ্বর
আষাঢ় পূর্ণিমায় - কুচুট
মাঘ মাসে শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে - মল্লিকাপুর, ইছাবাচা

জামালপুর থানায় ঃ

বৈশাখী পূর্ণিমায় - পাঁচড়া, জারগ্রাম, অমরপুর।
জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় - পাল্লা, মসাগ্রাম।

রায়না থানায় ঃ

বৈশাখী পূর্ণিমায় - মুইধারা
জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় - হিজলনা, সাঁকটিয়া।

খণ্ডঘোষ থানায় ঃ
বৈশাখী পূর্ণিমায় - খণ্ডঘোষ
জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় - সগড়াই

আসানসোল থানায় ঃ
বৈশাখী পূর্ণিমায় - কালিপাহাড়ী, ডামরা।

জামুরিয়া থানায় ঃ
বৈশাখী পূর্ণিমায় - চিচুরিয়া,
জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় - শ্রীপুরগ্রাম, জামুরিয়া গ্রাম।
চৈত্র সংক্রান্তিতে - সত্তোর।

রাণীগঞ্জ থানায় ঃ
বৈশাখী পূর্ণিমায় - বাঁশরা
মাঘ মাসে - নারায়ণকুড়ি

বুদবুদ থানায় ঃ
বৈশাখী পূর্ণিমায় - বুদবুদ

ফরিদপুর থানায় ঃ
বৈশাখী পূর্ণিমায় - ফরিদপুর, বৈদ্যনাথপুর, বীরভানপুর, ভিরিঙ্গি, গোপালমাঠ

কাঁকসা থানায় ঃ
বৈশাখী পূর্ণিমায় - ভরতপুর, বসুধা।

অণ্ডাল থানায় ঃ
বৈশাখী পূর্ণিমায় - দক্ষিণখণ্ড
জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় - কুমারডিহি

কাটোয়া থানায় ঃ
বৈশাখী পূর্ণিমায় - পলশনী, আউরিয়া, বক্ষপুর, সুগাছি
মাঘ মাসে - বাঁদরা (কালুরায়)

কেতুগ্রাম থানায় ঃ
জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় - কাঁদড়া, কোমরপুর
আষাঢ় পূর্ণিমায় - শ্রীপুর, শ্রীগ্রাম

মঙ্গলকোট থানায় ঃ
বৈশাখী পূর্ণিমায় - ঝিলি, পালিশগ্রাম

কালনা থানায় ঃ

মাঘী পূর্ণিমায় - সহজপুর, মানিকহার, মেদগাছি।

পূর্বস্থলী থানায় ঃ

বৈশাখী পূর্ণিমায় - জামালপুর ।

মন্তেশ্বর থানায় ঃ

বৈশাখী পূর্ণিমায় - ইচুভাগরা, মূলগ্রাম।

গ্রাম্য ও লৌকিক দেব-দেবীর পূজা-উপলক্ষে উৎসব - মেলা

বর্ধমান সদর থানায় ঃ

আষাঢ় মাসে কৃষ্ণপক্ষ প্রতিপদ তিথি - রায়ান (বসন্তচণ্ডী), কৃষ্ণা দ্বিতীয়া - মির্জাপুর ।

আষাঢ় মাসে নবমী তিথি - হাটগোবিন্দপুর (পঞ্চানন)

ভাতাড় থানায় ঃ

আষাঢ় মাসে নবমী তিথি - ছাতনী (শংকরী দেবী)

চৈত্র মাসে রামনবমী তিথি - বড়বেলুন (দক্ষিণাচণ্ডী), কামারপাড়া (পঞ্চানন)

বৈশাখ মাস - ভাতাড় (লক্ষ্মী - জনার্দন)

আউসগ্রাম থানায় ঃ

বৈশাখ মাসে - ছোটরামচন্দ্রপুর (দিদিঠাকরুণ)

মাঘ মাস - রামনগর (ব্রহ্মদৈত্য - ১লা মাঘ)

চৈত্র মাসে - কয়রাপুর (নৈলোক্যতারিণী চণ্ডী)

গলসী থানায় ঃ

চৈত্র মাসে রামনবমী তিথি - গোহগ্রাম (ভগবতী দেবী)

আষাঢ় মাসে নবমী তিথি - চান্না (বিশালাক্ষ্মী)

শ্রাবণ মাসে - কুরকুবা (কমলামাতা)

মাঘ মাসে - সাঁকো (উষাদিত্য)

মেমারি থানায় ঃ

জ্যৈষ্ঠ মাসে - গন্তার (চণ্ডীদেবী, সীতানবমী তিথি), পাতরা (জামাই ষষ্ঠী), শশিনাড়া (গঙ্গাপূজা), কানপুর (মহিষমর্দিনী, সংক্রান্তি)

আষাঢ় মাসে - মণ্ডলগ্রাম (চণ্ডীদেবী)

শ্রাবণ মাসে - কাদরা (ক্ষেত্রপাল– প্রথম মঙ্গলবার)

মাঘ মাসে - কল্যাণপুর (নবগ্রহ পূজা, ১লা মাঘ)

জামালপুর থানায় ঃ

বৈশাখ মাসে - রঙ্কিনীমহল্লা (রঙ্কিনীদেবী, ১লা বৈশাখ), মনিরামবাটী (চামুণ্ডা, শুক্লা

অষ্টমী তিথি)
আষাঢ় মাসে - হালাড়া (বিপত্তারিণী, রথের পরবর্তী শনি ও মঙ্গলবার),
ফাল্গুন মাসে - বেত্রাগড় (শীতলাদেবী) , চক্ষণজাদি (ওলাইচণ্ডী)

রায়না থানায় ঃ
বৈশাখ মাসে - বেলাঢ় (ওলাইচণ্ডী ও পঞ্চানন, প্রথম মঙ্গলবার), বল্লা (জগধাত্রী)
জৈষ্ঠ মাসে - শিয়ালা (ওলাইচণ্ডী)
আষাঢ় মাসে - রায়না (বসন্তচণ্ডী, কৃষ্ণপক্ষে প্রতিপদ)
অগ্রহায়ণ মাসে - শুকুর (ওলাইচণ্ডী, ৯ ই অগ্রহায়ণ)
পৌষ সংক্রান্তিতে - নতু (ওলাইচণ্ডী)
মাঘ মাসে - মাছ খান্ডা (ওলাইচণ্ডী)
ফাল্গুন মাসে - গুনাড় (ওলাইচণ্ডী)
চৈত্র মাসে - ছোটবৈনান (শীতলাদেবী)

খণ্ডঘোষ থানায় ঃ
আষাঢ় মাসে অম্বুবাচী - বোঁয়াই (বসন্তচণ্ডী)
শ্রাবণ মাসে পূর্ণিমা - শাঁখারি (শঙ্করী দেবী)

আসানসোল থানায় ঃ
মাঘ মাসে - জুনুট (মঞ্চেশ্বরী), ঘাগরডাঙ্গা (ঘাগরবুড়ি) নুনিয়া (নুনিয়াবুড়ি) গাড়ুই (খেলেবুড়িচণ্ডী)

সালানপুর থানায় ঃ
মাঘ মাসে - আলাকুশ , নরহাট (মুক্তাইচণ্ডী)

বরাবণি থানায় ঃ
মাঘ মাসে - ছোটকড়া

বুদবুদ থানায় ঃ
পৌষ সংক্রান্তিতে - মাড়ো (খড়্গেশ্বরী)
জ্যৈষ্ঠ মাসে - হাঁসুয়া (ক্ষেত্রপাল)

কাঁকসা থানায় ঃ
বৈশাখ মাসে - মোবারকপুর (শুভচণ্ডী)
চৈত্র মাসে সংক্রান্তিতে - বসুধা (রূপাইচণ্ডী)

অণ্ডাল থানায় ঃ
১ লা মাঘ - চৌঠিয়া (চৈঠাবুড়ি)

কাটোয়া থানায় ঃ
জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় - ছোটমেইগাছি (ক্ষেত্রপাল)
আষাঢ় মাসে - মূলটি (অম্বুবাচী তিথি)
আশ্বিন মাসে - গৌরডাঙ্গা (গৌরচণ্ডী)
অগ্রহায়ণ মাসে - ছোটকুলগাছি (নবান্ন)
মাঘ মাসে - সিঙ্গি (ক্ষেত্রপাল), পঞ্চাননতলা (পঞ্চানন),মূলগ্রাম (পঞ্চানন)
চারুলিয়া(পঞ্চানন), আলমপুর(পঞ্চানন), দুর্গা (পঞ্চানন) দেয়াসিন (দেয়াসিন চণ্ডী)
কার্তিক মাসে - কাটোয়া (কার্তিকপূজা)

কেতুগ্রাম থানায় ঃ
ভাদ্র সংক্রান্তিতে - নলিয়াপুর (ভাদুপূজা)
আশ্বিন মাসে - কোগ্রাম (মঙ্গলচণ্ডী)
অগ্রহায়ণ মাসে - নবগ্রাম (নবান্ন)
মাঘমাসে - গোন্না সেরান্দি (পঞ্চানন), দক্ষিণডিহি (অট্টহাসদেবী), খোঁয়াই (খোঁয়াইচণ্ডী)

মঙ্গলকোট থানায় ঃ
আষাঢ় মাসে - নবমী তিথিতে - মাঝিগ্রাম (শাকম্ভরী), শিমুলিয়া (গন্ধেশ্বরী)
শ্রাবণ মাসে - লাখুরিয়া (রথযাত্রা)

কালনা থানায় ঃ
আষাঢ় মাসে - চণ্ডীতলা (আটখাইচণ্ডী), ভাটরা (চণ্ডীদেবী), রাণীবন্দ (চণ্ডীদেবী)
মাঘ মাসে - ধর্মডাঙ্গা (বাগ্‌দেবী), বাগরাইতলা (বাগদেবী), উপলতিগ্রাম (হনুমানজী)

পূর্বস্থলী থানায় ঃ
বৈশাখী পূর্ণিমায় - নপাড়া (কালিকাদেবী)
৮ ই আষাঢ় - পাটুলি (অম্বুবাচী তিথি), বিদ্যানগর (বাগ্‌দেবী), নসরৎপুর (বাগ্‌দেবী), গোপীনাথপুর (বাগ্‌দেবী)
ফাল্গুন মাসে - পলাশপুলি (শীতলাদেবী)
শ্রাবণ সংক্রান্তিতে - ব্রহ্মাণীতলা (ব্রহ্মাণীদেবী)
মাঘ মাসে (২রা) - লোহাচূড় (নবগ্রহপূজা)

মন্তেশ্বর থানায় ঃ
বৈশাখ মাসে শুক্লা অষ্টমী তিথি - মন্তেশ্বর (চামুণ্ডা)

মুসলমান সম্প্রদায়ের উৎসব ও মেলা

বর্ধমান সদর থানায় ঃ

ফাল্গুন মাসে - খাঁ পুকুর (বুদ্ধ শাহ্ পীরের উরস), নেড়োদীঘি (খাজাগরীব নেওয়াজ), হটুদেওয়ান (পীর হজরত দেওয়ান সাহেবের মৃত্যু দিবস ১৩ ফাল্গুন)

মাঘ মাসে - ১লা মাঘ খাজা আনোয়ার বেড়-এর মেলা।

চৈত্র মাসে - কৃষ্ণপুর জেরমন সেখ এবং ফকির মহম্মদ শাহ্ এর মৃত্যু দিবস)

মহরম মাস - কালাপাহাড়, পীর বাহারাম, কারবালা (বর্ধমান)

ভাতাড় থানায় ঃ

ফাল্গুন মাসে - বামশোর (বুড়োপীর), মুরাতিপুর (ফকির সাহেবের মৃত্যু দিবস, ৮ই)

আউসগ্রাম থানায় ঃ

পৌষ সংক্রান্তিতে - সুয়াতা (বহমন পীর)

মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে - শিবদা (মুসাফির পীর)

গলসী থানায় ঃ

মাঘ মাসে - দ্বারনড়ী (নূতন সাহেব পীর)

মেমারি থানায় ঃ

মাঘ মাসে - মহেশপুর (মাদার সাহেব পীর, ১লা), মোহনপুর (পীর দাতা সাহেব, ১লা), বড়র (বুড়োপীর) শাহ্ গিয়াসউদ্দিন আহমেদ সাহেব , ১লা) কেজা (দাতা পীর)

ফাল্গুন মাসে - বামুনিয়া (পীর খুশী বিশ্বাস), গয়েসপুর (পীর সাহেবের ওরস, ৫ই), কুলে (১৩ ই ফাল্গুন)

চৈত্র মাসে - বোহার (পীর গদাই সাহেব, ১৫ ই চৈত্র), সারগাছিয়া (পীরদাতা রঙ্গিলা সাহেব, ২০ শে)

জামালপুর থানায় ঃ

মাঘ মাসে - সরকারডাঙ্গা

ফাল্গুন মাসে - জানকুলি (বনবিবি, ২২শে), শাহোসেনপুর(বিবি শাহাজাদি, ২০ শে)

রায়না থানায় ঃ

মাঘ মাসে - ইবিদপুর (ঘোড়া সহিদ পীর), উচালন (মকদুমপীর, ১লা), পহলানপুর, বারপুর (শামজন্য পীরের তিরোধান), একলক্ষ্মী (ফকিরের মেলা)

ফাল্গুন মাসে - নিজামপুর (দেউলপোতা পীর, ৬ই), নিলুট (মাণিক পীর), মির্জাপুর (পীরের উরস্), ঘুন্টেনন্দনপুর (পীরের উরস্), দামিন্যা (পীরের উরস্)

চৈত্র মাসে - দেওড়া (পীরের উৎসব)

খণ্ডঘোষ থানায় ঃ
মাঘ মাসে - মুইধারা, বামুনারী, দাসপুকুর (কাঁথাসা পীর), খেজুরহাটী (শাহ্ জাহাঙ্গীর পীর), গোপালবেড়া।

হীরাপুর থানায় ঃ
মাঘ মাসে - কালাঝরিয়া

কুলটী থানায় ঃ
চৈত্র মাসে - ডিসেরগড়।

জামুরিয়া থানায় ঃ
বৈশাখ মাসে - কুমারডিহি,
ফাল্গুন মাসে - চুরুলিয়া (পীরদাতা সাহেব, ৭ই) , ছত্রিশগণ্ডা (বুড়োপীর)
চৈত্র মাসে - শিবপুর

রাণীগঞ্জ থানায় ঃ
ফাল্গুন মাসে - রোনাইরোড (দরগা শরীফ, ফকির জনাব সৈয়দ শাহ্ শামসুদ্দিন হাসানি উল হোসাইনি ক্কাদারির মৃত্যুদিবস, ৪ঠা)

কাঁকসা থানায় ঃ
পৌষ সংক্রান্তিতে - শিলামপুর (বারুখাঁ তিরোধান দিবস)

কাটোয়া থানায় ঃ
ফাল্গুন মাসে - রাধাকৃষ্ণপুর (খাদিম বিবি)

কেতুগ্রাম থানায় ঃ
মাঘ মাসে - নরসিংহপুর
ফাল্গুন মাসে - বাঁকুই (সত্যপীর, পূর্ণিমা তিথি),
চৈত্র মাসে - কাঁদরা (শাহ সাহেবের মাজার, ১৫ ই), আনখোনা

মঙ্গলকোট থানায় ঃ
পৌষ মাসে - পিল খেঁয়া (আউলচাঁদের তিরোধান দিবস)
মাঘ মাসে - নতুনহাট (বুড়োপীর, পূর্ণিমা তিথি) , পালিশগ্রাম(মুসাফীরপীর), মঙ্গলকোট (শাহ মেহের আলির মৃত্যু দিবস)
ফাল্গুন মাসে - শিমুলিয়া (শাহ ফরিদ পীর), মঙ্গলকোট (সেখ হামিদ দানেশ মন্দ বাঙালী - ১৮, ১৯ শে)
চৈত্র মাসে - মঙ্গলকোট (পীর পঞ্জাতনের মাজারে উৎসব)

পূর্বস্থলী থানায় ঃ

ফাল্গুন মাসে - ধর্মতলা (খাজা সাহেব পীর, ১৩ ই), বনপুকুর (শাহ ফরিদ পীর)

মন্তেশ্বর থানায় ঃ

মাঘ মাসে - খরমপুর (পীরের জন্মদিন)

ফাল্গুন মাসে - রাইগ্রাম (পীর গোড়াচাঁদ, ১৩ ই),কুসুমগ্রাম (মকাই পীর, ১০ই), সোনাডাঙ্গা (২২ শে)

চৈত্র মাসে - ভেলিয়া (পীর মহম্মদ গোলাম কাদের আলি)

কালীপূজা উপলক্ষে উৎসব ও মেলা

বর্ধমান সদর থানায় ঃ

বৈশাখ মাসে - বৈকন্ঠপুর (রক্ষাকালী, ১৬ ই)

জ্যৈষ্ঠ মাসে - শোনপুর (দক্ষিণা সিদ্ধেশ্বরী কালী, ফলহারিণী অমাবস্যা)

কার্তিক মাসে - কোটালহাট (কমলাকান্ত কালী), কাঞ্চননগর (কঙ্কালেশ্বরী, শাঁখারী পাড়া), হাটগোবিন্দপুর (শ্মশানকালী)

পৌষ মাসে - মাহিনগর (সংক্রান্তিতে)

ফাল্গুনমাসে - পুতুণ্ডা (রক্ষাকালী)

চৈত্র মাসে - জরুল, সুহারী (রক্ষাকালী)

ভাতাড় থানায় ঃ

বৈশাখ মাসে - মাহাতা (ভদ্রকালী)

শ্রাবণ মাসে - এরুয়ার (দক্ষিণাকালী)

অগ্রহায়ণ মাসে - নাসিগ্রাম (ডাকাতে কালী)

কার্তিক মাসে - বড়বেলুন (বড় কালীমাতা)

ফাল্গুন মাসে - খেড়ুর (শ্মশানকালী)

আউসগ্রাম থানায় ঃ

কার্তিক মাসে - এড়াল, তকীপুর, পাণ্ডুক

মাঘ মাসে - গুসকরা (রটন্তী কালী)

ফাল্গুন মাসে - অমরারগড় (শ্মশানকালী)

মেমারি থানায় ঃ

বৈশাখ মাসে - মণ্ডলগ্রাম (রক্ষাকালী, দ্বিতীয় মঙ্গলবার)

জ্যৈষ্ঠ মাসে - উন্টিয়া (রক্ষাকালী, দ্বিতীয় শনিবার)

শ্রাবণ মাসে - কৃষ্ণপুর (শ্মশানকালী)

অগ্রহায়ণ মাসে - বারকোনা, তৃতীয় মঙ্গলবার)

জামালপুর থানায় ঃ
বৈশাখ মাসে - ধলুক (রক্ষাকালী, প্রথম মঙ্গলবার), বেত্রাগড় (রক্ষাকালী)
বসন্তপুর (রক্ষাকালী), নন্দনপুর (রক্ষাকালী), চিলেডাঙ্গা,
মাঘ মাসে - সাহাপুর (রক্ষাকালী)
ফাল্গুন মাসে - পর্বতপুর (শ্মশানকালী, ১৩ই), বড়শিয়ালী (সিদ্ধেশ্বরী)
চৈত্র মাসে - জামদহ (শ্মশানকালী, ১১ ই), মাহিন্দর (শ্মশানকালী, ১৬ই),
ময়রা (শ্মশানকালী)

রায়না থানায় ঃ
বৈশাখ মাসে - ধামনাড় (১৮ ই), পাঁইটা (কালিকাদেবী, প্রথম সপ্তাহ),
কার্তিক মাসে - কাইতি
মাঘ মাসে - রামবাটী (সিদ্ধেশ্বরী কালী, ১৬ ই)
ফাল্গুন মাসে - জোতরামপুর (রক্ষাকালী, ১৪ই), শিবরামপুর, রায়না (শ্মশানকালী, ১৫ই)
চৈত্র মাসে - কামারগড়িয়া (১৮ই), নারায়ণপুর (রক্ষাকালী, ২৩ শে)
পৌষ সংক্রান্তিতে - ছোটবৈনান।

খণ্ডঘোষ থানায় ঃ
ফাল্গুন মাসে - খণ্ডঘোষ (বোসপাড়া) (রক্ষকালী , অমাবস্যা)

আসানসোল থানায় ঃ
কার্তিক মাসে - আসানসোল, ধাদকা, গোপালপুর।

কুলটি থানায় ঃ
মাঘ মাসে - ডিসেরগড় (ছিন্নমস্তা কালী)

জামুরিয়া থানায় ঃ
আষাঢ় মাসে - জবাগ্রাম
কার্তিক মাসে - জামুরিয়া
পৌষ মাসে - দরবার ডাঙ্গা
ফাল্গুন মাসে - চিচুরিয়া

রাণীগঞ্জ থানায় ঃ
চৈত্র মাসে - চাপুই (রক্ষাকালী)

অণ্ডাল থানায় ঃ
কার্তিকমাসে - মহাল (তারামাকালী, অমাবস্যা)
চৈত্রমাসে - খান্দরা

বুদবুদ থানায় ঃ
ফাল্গুন মাসে - মানকর (কালীপূজা)

কেতুগ্রাম থানায় ঃ
মাঘ মাসে - বেলবনিডাঙ্গা (শ্মশানকালী, ২২শে), হাটপাড়া (শ্যামাকালী, ২২শে), দক্ষিণডিহি (অতিন্দকালী, অমাবস্যা)।

কালনা থানায় ঃ
বৈশাখ মাসে - সুলতানপুর
জ্যৈষ্ঠ মাসে - মছলন্দপুর (সিদ্ধেশ্বরী কালী, অমাবস্যা)
আষাঢ় মাসে - সিঙ্গারকোণ (শ্মশানকালী, অমাবস্যা)
কার্তিক মাসে - কালনা (সিদ্ধেশ্বরী)

পূর্বস্থলী থানায় ঃ
বৈশাখ মাসে - কুকসিমলা (১ম মঙ্গলবার)

মন্তেশ্বর থানায় ঃ
বৈশাখ মাসে - মূলগ্রাম (রক্ষাকালী)
শ্রাবণ মাসে - পুটসুরী (গজকালী)
কার্তিক মাস - খরমপুর (কালীপূজা)

কালী ব্যতীত দুর্গা ও অন্যান্য শক্তিদেবীর পূজা-উৎসব-মেলা

বর্ধমান সদর থানায় ঃ
বৈশাখ মাসে - সড্যা (যোগাদ্যা, সংক্রান্তি),
আষাঢ় মাসে - মির্জাপুর (জয়দুর্গা, কৃষ্ণপক্ষে দ্বিতীয়া তিথি)
শ্রাবণ মাসে - কলিগ্রাম (জয়দুর্গা, দ্বিতীয়া তিথি)
আশ্বিন মাসে - বর্ধমান (সর্বমঙ্গলা, দুর্গা অষ্টমী-নবমী)
চৈত্রমাস - নুতনগঞ্জ (অন্নপূর্ণা)

ভাতাড় থানায় ঃ
শ্রাবণ মাসে - আমারুণ (জয়দুর্গা, শুক্লা নবমী তিথি), নারায়ণপুর (তারামা)
মাঘ মাসে - এরুয়ার (সরস্বতী পূজা), বড়বেলুন (সরস্বতী)
ফাল্গুন মাসে - বলগোনা (গন্ধেশ্বরী)

মেমারী থানায় ঃ
জ্যৈষ্ঠ মাসে - বসতপুর (চর্তুমুখী দেবী, চম্পক চতুর্দশী তিথি)
পৌষ মাসে - ঘোষ পাঁচমে (অন্নপূর্ণা পূজা)

মাঘ মাসে - বিটরা (রাজরাজেশ্বরী)
চৈত্র মাসে - বারকোনা (অন্নপূর্ণা পূজা)

জামালপুর থানায় ঃ
আশ্বিন মাসে - অমরপুর (অভয়া দেবী)
চৈত্র মাসে - শুঁড়ে কালনা (বাসন্তী পূজা)

রায়না থানায় ঃ
বৈশাখ মাসে - শুকুর (যোগাদ্যা)
পৌষ সংক্রান্তি - বাজেকামারপুর (গঙ্গাদেবী), সেরপুর(গঙ্গাদেবী)
ফাল্গুন মাসে - নান্দাল (বাসন্তী পূজা)
চৈত্র মাসে - বড়কয়রাপুর (বাসন্তীপূজা)

খণ্ডঘোষ থানায় ঃ
বৈশাখ সংক্রান্তি - নপাড়া (যোগাদ্যা)
মাঘ মাসে - ওঁয়ারী (সরস্বতী পূজা)

জামালপুর থানায় ঃ
কার্তিকমাস - হালদা , কল্যাণেশ্বরী (কল্যানেশ্বরী মাতা)

ফরিদপুর থানায় ঃ
বৈশাখ মাসে - সারপাই (গঙ্গাদেবী পূজা)

কাঁকসা থানায় ঃ
বৈশাখ মাসে - গোপালপুর (শ্যামারূপা)

বুদবুদ থানায় ঃ
বৈশাখ মাসে - মানকর, কবিরাজ পাড়া (সতীমায়ের মেলা)

অণ্ডাল থানায় ঃ
পৌষ মাসে - মহল (রায়ানী পূজা)
চৈত্র মাসে - অণ্ডাল (সাউথ বাজার)(মহাবীর ঝাণ্ডা, শুক্লা নবমী)

কাটোয়া থানায় ঃ
অগ্রহায়ণ মাসে - চাণ্ডুলী (অন্নপূর্ণা পূজা)
মাঘ মাসে - কালিকাপুর (জয়দূর্গা পূজা)

মঙ্গলকোট থানায় ঃ
বৈশাখ সংক্রান্তিতে - ক্ষীরগ্রাম (যোগাদ্যা)

আষাঢ় মাসে - পলসোনা, ছোট পোষলা, বড় পোষলা, মুসারু (ঝঙ্কেশ্বরী দেবী)

কালনা থানায় ঃ
বৈশাখ মাসে - নিভুজি (গজলক্ষ্মী, পূর্ণিমা তিথি), সারগড়িয়া (শীতলাদেবী), (পূর্ণিমাতিথি)
আষাঢ় মাসে - রাণীগঞ্জ (চণ্ডীপূজা, শুক্লা নবমী)
শ্রাবণ মাসে - নয়াগঞ্জ (কালনা) (মহিষমর্দিনী, পূর্ণিমা তিথি), আনুখাল (জয়দুর্গা)

পূর্বস্থলী থানায় ঃ
বৈশাখী পূর্ণিমায় - জালুইডাঙ্গা (সিদ্ধেশ্বরী দেবী)

মন্তেশ্বর থানায় ঃ
বৈশাখ মাসে - ধান্য খেড়ুর (যোগাদ্যাদেবী)
জ্যৈষ্ঠ মাসে - শুশুনিয়া (তারাক্ষা মাতা)
শ্রাবণ মাসে - করন্দা (কন্দেশ্বরী), জামনা (জয়দুর্গা)
ফাল্গুনমাসে - রাউৎগ্রাম (সর্বমঙ্গলা দেবী, পূর্ণিমা তিথি)

মনসা পূজা উপলক্ষে উৎসব - মেলা

বর্ধমান সদর থানায় ঃ
জ্যৈষ্ঠ মাসে দশহারা তিথিতে - পাড়ুঁই (পাণ্ডুলাক্ষ্মী), টৃপগ্রাম, সাঁপাড়, শুকুর, নান্দরা, দেবগ্রাম, হাটগোবিন্দপুর
আষাঢ় মাসে শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে - মূল্যে (মনুইচণ্ডী), ঝাপানতলা
আশ্বিন মাসে - হাটগোবিন্দপুর (৫ই আশ্বিন), কালী বাজার (সংক্রান্তি)

ভাতাড় থানায় ঃ
আষাঢ় মাসের পঞ্চমী তিথিতে - পোষলা (ঝঙ্কেশ্বরী / ঝাঁকলাই)
শ্রাবণ মাসের পঞ্চমী তিথিতে - কুবাজপুর, বামুনাড়া(বামড়ীমাতা), কুড়ুম্বা (কমলাদেবী)

আউসগ্রাম থানায় ঃ
জ্যৈষ্ঠ মাসের দশহারা তিথিতে - কুন্দরা

গলসী থানায় ঃ
শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তিতে - কুরকুবা (কমলামাতা)
ভাদ্রমাসের সংক্রান্তিতে - দ্বারনড়ী।

মেমারি থানায় ঃ
জ্যৈষ্ঠ মাসে দশহরা তিথিতে - সাতগাছিয়া ,সাহানুই,
আষাঢ় মাসে পঞ্চমী তিথিতে - মণ্ডলগ্রাম , কেজা,শঙ্করপুর (দশমী তিথি)

শ্রাবণ মাসে পঞ্চমী তিথিতে - সুটরা, কৃষ্ণপুর, মণ্ডলজনা, কালীবেলে
ভাদ্র মাসের পঞ্চমী তিথিতে - বারকোনা, চোৎখণ্ড,মেমারি, মগরা
চৈত্র মাসে - আহিরা

জামালপুর থানায় ঃ
শ্রাবণ মাসে - শ্রীকৃষ্ণপুর,অমরপুর
ভাদ্র মাসে - রাণাপাড়া (পঞ্চমী তিথি), সোনার গড়িয়া, ছৈবেড়িয়া,বিষ্ণুবাটী, মনিরামবাটী, চকদীঘি, শুঁড়েকালনা, চৌবেড়িয়া, বসন্তপুর, পর্বতপুর (সংক্রান্তিতে), জারগ্রাম (পূর্ণিমা তিথিতে)
মাঘ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে - কুলীনগ্রাম

রায়না থানায় ঃ
জ্যৈষ্ঠ মাসের দশহারা তিথি - উচিতপুর (বিষহরি), ভাদিয়াড়া,
শ্রাবণ মাসে - কাটনাবিল, খুন্টেনন্দপুর।
ভাদ্র মাসে - রায়পুর।

খণ্ডঘোষ থানায় ঃ
শ্রাবণ মাসে - তোড়কোনা

কাটোয়া থানায় ঃ
জ্যৈষ্ঠ মাসে দশহরা তিথিতে - চণ্ডুলিয়া, দোনা, বৈঁচি, পাজোয়া (দশহরা পরবর্তী পঞ্চমী)
শ্রাবণ মাসে - দেয়াসিন

কেতুগ্রাম থানায় ঃ
জ্যৈষ্ঠ মাসের দশহরা তিথিতে - কল্যাণপুর

মঙ্গলকোট থানায় ঃ
আষাঢ় মাসের পঞ্চমী তিথি - কাঁকোড়া (কঙ্কনাগ)
শ্রাবণ মাসের পঞ্চমী তিথি - কৈচর

কালনা থানায় ঃ
জ্যৈষ্ঠ মাসে - পাতিল পাড়া
আষাঢ় মাসে - অষ্টঘড়িয়া (বগা পঞ্চমী), তামাসাপুর(ষষ্ঠী), উদয়পুর (নবমী), নারকেল-ডাঙ্গা (জগৎগৌরী, শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে)
শ্রাবণ মাসে - নেপাকুলি (পঞ্চমী), কোয়ালডাঙ্গা (পঞ্চমী), হাটবেলে
ভাদ্র মাসে - ধর্মডাঙ্গা (সংক্রান্তিতে), বৃদ্ধপাড়া (শুক্লা নবমী), ধাত্রীগ্রাম (সংক্রান্তিতে)
আশ্বিন মাসে - সিমলন (১লা)

পূর্বস্থলী থানায় ঃ

আষাঢ় মাসে - দামোদর পাড়া (মোনাই, শেষ পঞ্চমী) ভাতসালা (পঞ্চমী)

শ্রাবণ মাসে - পলের হাট (সংক্রান্তি) জাহাননগর, ভাণ্ডারটিকুরী, ব্রহ্মানীতলা

মন্তেশ্বর থানায় ঃ

বৈশাখ মাসের শুক্লা অষ্টমী তিথিতে - শুশুনি

আষাঢ় মাসে - পুরগোনা, কসা (পঞ্চমী)

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উৎসব - মেলা

বর্ধমান সদর থানায় ঃ

বৈশাখ মাসে - রাজগঞ্জ (বর্ধমান) (হরিনাম সংকীর্তন), ভিটা (হরিনাম সংকীর্তন)

জ্যৈষ্ঠ মাসে - ভৈটা (শ্যামদাস আচার্য্যের মহোৎসব)

আষাঢ় মাসে - কাঞ্চননগর (রথযাত্রা), রাজবাড়ী বকুলতলার (রথযাত্রা)

শ্রাবণ মাসে - রাজবাড়ী বকুলতলার (ঝুলনযাত্রা)

ফাল্গুন মাসে - পুতুণ্ডা (গোপীনাথ, রঘুনাথ, হরির দোল), দেবগ্রাম (অধর চাঁদের উৎসব), কাঞ্চননগর (গোবিন্দ দাসের জন্মোৎসব), ভৈটা (নবম দোল)

ভাতাড় থানায় ঃ

বৈশাখ মাসে - নাসিগ্রাম (হরিসভা)

আষাঢ় মাসে - বড়বেলুন(গোপীনাথের রথযাত্রা), ঝাড়ুল (রথযাত্রা)

মাঘ মাসে - বৈষ্ণবডাঙ্গা (পূর্ণিমা তিথি), মাহাতা (গোবিন্দের উৎসব, ১লা), পালার (মাকুরি সপ্তমী)

শ্রাবণ মাসে - তুলসী ডাঙ্গা (হনুমানজী)

পৌষ মাসে - মহাপ্রভুতলা (কুলচণ্ডা, ১৬ই)

ফাল্গুন মাসে - নাসিগ্রাম (দোলযাত্রা)

গলসী থানায় ঃ

আষাঢ় মাসে - মানকর (রথযাত্রা)

কার্তিক মাসে - আদড়া (রাধাগোবিন্দ জীউ মহোৎসব)

অগ্রহায়ণ মাসে - লাউদহ (রাসপূর্ণিমা)

মাঘ মাসে - ইরকোনা (রাধাকৃষ্ণের উৎসব)

আউসগ্রাম থানায় ঃ

জ্যৈষ্ঠ মাসে - দীগনগর (রথযাত্রা)

আষাঢ় মাসে - পাণ্ডুক (হরিনাম সংকীর্তন)

ফাল্গুন মাসে - সর, এড়াল (দোলযাত্রা)

মেমারি থানায় ঃ

জ্যৈষ্ঠ মাসে - পালসিট (শ্যামদাস আচার্যের তিরোধান উৎসব), ভিটা (শ্যামদাস আচার্যের তিরোধান উৎসব), মোবারকপুর (স্নানযাত্রা)

ভাদ্র মাসে - বসতপুর (রাখালরাজ পূজা)

আষাঢ় মাসে (রথযাত্রা) - শ্রীধরপুর, আমাদপুর, হৈড়গ্রাম, দলুইবাজার

ফাল্গুনমাসে (দোলযাত্রা) - দুলুইবাজার, ভৈটা (হরির দোল, মদনগোপালের দোল), পালসিট)

মাঘ মাসে - মালম্বা (হরিসভা, ১লা)

জামালপুর থানায় ঃ

জ্যৈষ্ঠ মাসে - নবগ্রাম (স্নানযাত্রা)

আষাঢ়মাসে - কুলীনগ্রাম (রথযাত্রা), সেলিমাবাদ (রথযাত্রা)

ভাদ্র মাসে - দক্ষিণ শুঁড়ে, শুড়েকালনা, জৌগ্রাম (মদনগোপালের উৎসব), কুলীনগ্রাম (গোপাল ঠাকুরের উৎসব)।

ফাল্গুন মাসে - নবগ্রাম (দোলযাত্রা), শুঁড়ে কালনা (গোপালের দোল)

রায়না থানায় ঃ

বৈশাখ মাসে - বোরো (বলরামের চক্ষুদান উৎসব)

আষাঢ় মাসে - শ্যামসুন্দর (রথযাত্রা)

মাঘ মাসে - বিরামপুর(গৌরবালা উৎসব, ২৭ শে মাঘ), বোরো (বলরামের উৎসব, মাকুরী সপ্তমী)

খণ্ডঘোষ থানায় ঃ

শ্রাবণ মাসে - কৈয়র (ঝুলনযাত্রা)

পৌষ মাসে - কুমীরকোলা (রাধাগোবিন্দের উৎসব)

মাঘ মাসে - গৈতানপুর (গৌর নিতাই পূজা, ৩রা)

ফাল্গুন মাসে - খণ্ডঘোষ (রাধাকৃষ্ণের দোল)

আসানসোল থানায় ঃ

ফাল্গুন মাসে - গাড়ুই (বিষ্ণুপূজা)

হীরাপুর থানায় ঃ

ভাদ্র মাসে - বার্ণপুর (জন্মাষ্ঠমী)

মাঘ মাসে - ধেনো (কেন্দুলি মেলা, ২রা)

ফাল্গুন মাসে - বিদ্যানন্দপুর (দোলযাত্রা)

কুলটী থানায় ঃ

আষাঢ় মাসে (রথযাত্রা) - সিমুলগ্রাম,বেলরুই (সীতারামপুর)

ফাল্গুন মাসে - মিঠানি (কামকৃষ্ণ সারদা মায়ের জন্মজয়ন্তী)

বরাবনি থানায় ঃ
আষাঢ় মাসে (রথযাত্রা) - খাসকুঠী (ভানোরা)
ভাদ্রমাসে - খাসকুঠী (জন্মাষ্ঠমী)
কার্তিক মাসে - দোমাহানি (গোপাষ্টমী)

জামুরিয়া থানায় ঃ
বৈশাখ মাসে - নন্তি (হরিনাম সংকীর্তন)
কার্তিক মাসে - জামুরিয়া (গোশালা মেলা)
মাঘ মাসে - বেনালী (জয়দেবের মেলা)
চৈত্র মাসে - বেনালী (রামসীতা পূজা)

রাণীগঞ্জ থানায় ঃ
আষাঢ় মাসে - সিয়ারসোল (রথযাত্রা)
পৌষ মাস - নারায়ণ কুড়ি (হরিনাম সংকীর্তন)

দুর্গাপুর থানায় ঃ
আষাঢ় মাসে - সাধুডাঙ্গা (রথযাত্রা)
কার্তিক মাসে - ওয়ারিয়া (গোপাষ্টমী)

ফরিদপুর থানায় ঃ
বৈশাখ মাসে - কাঁটাবেড়া (হরিনাম সংকীর্তন)
আষাঢ় মাসে - নতুনডাঙ্গা (রথযাত্রা)
কার্তিক মাসে - কাঁটাবেড়া, বাগডামগা (গোপাষ্টমী)

কাঁকসা থানায় ঃ
বৈশাখ মাসে - রাজকুসুম (হরিনাম সংকীর্তন)
জ্যৈষ্ঠ মাসে - রক্ষিতপুর (হরিনাম সংকীর্তন)
ফাল্গুন মাসে - মোবারক গঞ্জ (দোলযাত্রা)

অণ্ডাল থানায় ঃ
আষাঢ় মাসে (রথযাত্রা) - রামপ্রসাদপুর, কাজোড়া, উখরা
ভাদ্র মাসে - উখড়া (ঝুলনযাত্রা)

কাটোয়া থানায় ঃ
মাঘ মাসে - আউরিয়া (কেশব ভারতীয় জন্মোৎসব, পূর্ণিমা), চন্দ্রপুর (পূর্ণিমা তিথি)।

কার্তিক মাসে - বড়ডাঙ্গা (শ্রীখণ্ড) (মহাপ্রভু পূজা)
ফাল্গুন মাসে - জগদানন্দপুর, পলাশনি (দোলযাত্রা), কলসা (রাধাগোবিন্দের দোল), বৈঁচি (দোলযাত্রা)
অগ্রহায়ণ মাসে - শ্রীখণ্ডগ্রাম (নরহরি সরকার তিরোধান উৎসব), মাধাইতলা (কাটোয়া)

কেতুগ্রাম থানায় ঃ
বৈশাখ মাসে - শিবলুন (রাধাকৃষ্ণ মিলন উৎসব)
আষাঢ় মাসে - নবগ্রাম (রথযাত্রা)
কার্তিক মাসে - নিরোল (রাসযাত্রা)
অগ্রহায়ণ মাসে - আমগড়িয়া (রাধারমন উৎসব)
আশ্বিন মাসে - ঝামটপুর (কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামীর জন্মতিথি পালন)
মাঘ মাস - দধিয়া (গোপাল দাস বাবাজীর তিরোধান উৎসব, মাকুরী সপ্তমী), এহিয়াপুর - (গৌরগোপালের উৎসব)
ফাল্গুন মাসে - ভাণ্ডারগড়িয়া (সতীমায়ের পূজা), নবগ্রাম (দোলযাত্রা)
পৌষ মাসে - কাঁদরা (জ্ঞানদাস প্রতিষ্ঠিত মঠের উৎসব মেলা, পূর্ণিমা তিথি) পিলসোঁয়া (অউলচাঁদের তিরোধান উৎসব)

কালনা থানায় ঃ
আষাঢ় মাসে - বৈদ্যপুর (রথযাত্রা), কালনা (রথযাত্রা)
ভাদ্র মাসে - কালনা (জন্মাষ্ঠমী), কালনা (ঝুলনযাত্রা)
কার্তিক মাসে - বৈদ্যপুর (রামযাত্রা)
মাঘ মাসে - বাঘনাপাড়া (রামাই পণ্ডিতের তিরোধান উৎসব, কৃষ্ণা তৃতীয়া তিথি
ফাল্গুন মাসে - ধাত্রীগ্রাম (দোলযাত্রা) সিঙ্গারকোন (দোলযাত্রা)
চৈত্র মাসে - গোপালদাস পুর (রাখালরাজ পূজা, রামনবমী তিথি)

পূর্বস্থলী থানায় ঃ
ফাল্গুন মাস - নিমতলাবাজার , সমুদ্রগড় (দোলযাত্রা)
চৈত্র মাসে - গঙ্গানন্দপুর (মহাপ্রভুর উৎসব)

মন্তেশ্বর থানায় ঃ
বৈশাখ মাসে - মূলগ্রাম (হরিনাম সংকীর্তন)
আষাঢ় মাসে - পাতুন (রথযাত্রা)
মাঘ মাসে - শ্যামনগর (গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পূজা)
ফাল্গুন মাসে - কাইগ্রাম (দোলযাত্রা), দেনুড়, লোহার (হরিনাম সংকীর্তন ও মহোৎসব), জামনা (রাধাকৃষ্ণের দোল উৎসব)

পূণ্যস্নান উপলক্ষে উৎসব - মেলা

বর্ধমান সদর থানায় ঃ
পৌষ সংক্রান্তিতে-কাঠগোলার ঘাট, সদরঘাট, খাজা আনোয়ার বেড়(বর্ধমান), বোঁড়শো
মাঘ মাসের ১লা - বাহির সর্বমঙ্গলা পাড়া (বর্ধমান)

ভাতাড় থানায় ঃ
পৌষ সংক্রান্তিতে - ঝিকরডাঙ্গা (রাধাকৃষ্ণ পূজা)

গলসী থানায় ঃ
পৌষ সংক্রান্তিতে - উড়ো, তাহেরপুর (রাধাকৃষ্ণ পূজা), পুরাতন গ্রাম, জুজুট (দণ্ডেশ্বরী পূজা), গরম্বা (গঙ্গা পূজা), মাড়ো, অমরপুর।

মেমারি থানায় ঃ
পৌষ সংক্রান্তিতে - বড়গাছিয়া

জামালপুর থানায় ঃ
পৌষ সংক্রান্তিতে - সালানপুর, মনিরামবাটী, নাঘড়া, সাদিপুর
মাঘ মাসের ১লা - কুলীনগ্রাম, সালানপুর, (উত্তরায়ন) পাল্লা (লক্ষ্মীনারায়ণ পূজা)

রায়না থানায় ঃ
চৈত্র মাসে - মসজিদপুর, কাইতি (বারুণি স্নান) (শ্বেতগঙ্গা দীঘিতে), নতু (পৌষলা)

খণ্ডঘোষ থানায় ঃ
পৌষ সংক্রান্তিতে - গোলাহাট
মাঘ মাসের ১লা - কুমীরকোলা (রাধাকৃষ্ণ পূজা)

কুলটী থানায় ঃ
পৌষ সংক্রান্তি - পল্টনডাঙ্গা

বুদবুদ থানায় ঃ
পৌষ সংক্রান্তিতে - মানকর (তুষপরব ও পূণ্যস্নান, খড়ি নদী)

ফরিদপুর থানায় ঃ
মাঘ মাসে - বৈদ্যনাথপুর

অণ্ডাল থানায় ঃ
পৌষ সংক্রান্তিতে - মাধবপুর, মুকুন্দপুর (কুটিরডাঙ্গা)

কাটোয়া থানায় ঃ
পৌষ সংক্রান্তিতে - দাঁইহাট

কেতুগ্রাম থানায় ঃ
পৌষ সংক্রান্তিতে - উদ্ধারণপুর

মঙ্গলকোট থানায় ঃ
পৌষ সংক্রান্তিতে - কোগ্রাম, কেউসা, ঝিরেলা

কালনা থানায় ঃ
মাঘ মাসে - মালতিপুর (১লা মাঘ), গ্রাম - কালনা (শুক্লা সপ্তমী তিথি)

পূর্বস্থলী থানায় ঃ
পৌষ সংক্রান্তিতে - দামপাল, মাধাইপুর
মাঘ মাসের ১লা - জালুইডাঙ্গা, বহরা, পাটুলী

আদিবাসী সম্প্রদায়ের উৎসব ও মেলা

সদর থানায় ঃ
বৈশাখ মাসে - ১লা বৈশাখ বর্ধমান শিয়ালডাঙায়
মাঘমাসে - ১লা মাঘ সদর ঘাটের মেলা
আউসগ্রাম থানায় ঃ
আশ্বিন মাসে - অমরারগড় (ছাতাপরব)

মেমারি থানায় ঃ
বৈশাখ মাসের ১লা - কুচুট (জাগরণ উৎসব)

জামালপুর থানায় ঃ
আশ্বিন মাসে - চৌবেড়িয়া (জাগরণ উৎসব)
ফাল্গুন মাসে - আঝাপুর (আদিবাসী উৎসব)

কুলটী থানায় ঃ
ভাদ্র মাসের সংক্রান্তিতে - নিয়ামতপুর (ছাতাপরব)

সালানপুর থানায় ঃ
ভাদ্রমাসের সংক্রান্তিতে - রামচন্দ্রপুর (ছাতাপরব)

অন্যান্য (বিবিধ) বিষয় উপলক্ষে উৎসব - মেলা

বর্ধমান সদর থানায় ঃ
জানুয়ারী মাসে - কৃষ্ণসায়র মেলা, বর্ধমান উৎসব
মে মাসে - রবীন্দ্র জন্মদিন উপলক্ষে - রবীন্দ্রভবন
আগষ্ট মাসে - শ্রাবণী মেলা,
ডিসেম্বর মাসে - বর্ধমান বইমেলা, স্বাস্থ্য মেলা, শিশু মেলা, লোক সংস্কৃতি মেলা,

ভাতাড় থানায় ঃ
মাঘ মাসের প্রথম সপ্তাহে - আলিনগর (নতুন মেলা), এরুয়ার (মাঘী উৎসব মেলা), বামশোর (নতুন মেলা)

গলসী থানায় ঃ
বৈশাখ মাসে - মানকর (রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী মেলা)

খণ্ডঘোষ থানায় ঃ
পৌষমাসে - খেজুরহাটি (সখের উৎসব ও মেলা)

আসানসোল থানায় ঃ
শ্রাবণ মাসে - আসানসোল (শ্রাবণী মেলা)
মাঘ মাসে - আসানসোল (বইমেলা)

হীরাপুর থানায় ঃ
মাঘ মাসে - বার্ণপুর (বইমেলা, বঙ্গ সংস্কৃতির মেলা)

জামুরিয়া থানায় ঃ
জ্যৈষ্ঠ মাসে - চুরুলিয়া (কবি নজরুলের জন্মদিবসের মেলা)

রাণীগঞ্জ থানায় ঃ
পৌষ মাসে - রাণীগঞ্জ (বইমোলা)

দুর্গাপুর থানায় ঃ
জানুয়ারী মাসের ১লা - দুর্গাপুর (কল্পতরু মেলা)
শ্রাবণ মাসের ২০ শে - ধবনী (নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় - এর তিরোধান দিবস)

ফরিদপুর থানায় ঃ
আষাঢ় মাসে - ধবনিগ্রাম (সাধক কবি নীলকণ্ঠের মৃত্যু দিবস)

মেমারী থানায় ঃ
ফাল্গুন মাসে - বইমেলা

কাটোয়া থানায় ঃ

ফাল্গুন মাসে - বইমেলা

তথ্য সূত্র ঃ

১. পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি — বিনয় ঘোষ

২. পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা(৫ম খণ্ড) - অশোক মিত্র

৩. বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি (৩য় খণ্ড) - যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী

৪. বর্ধমান পরিক্রমা - সুধীরচন্দ্র দাঁ

৫. বর্ধমান জেলার মেলা - সমাজতাত্ত্বিক পর্যালোচনা - গোপীকান্ত কোঙার

৬. পূজা - পার্বণ - এর উৎস কথা - পল্লব সেনগুপ্ত

৭. লোক উৎসব ও লোকদেবতা - বরুণ কুমার চক্রবর্তী

৮. মেলা ও উৎসবের দর্পণে বাংলার লোকসাহিত্য - সুনীতকুমার মুখোপাধ্যায়

৯. পশ্চিমবঙ্গের মেলা ও মহোৎসব - সুধীর চক্রবর্তী

১০. লোকশ্রুতি পত্রিকার বিভিন্ন প্রবন্ধ।

১১. উৎসব - পূজা - পার্বণ ও মেলা সম্পর্কে সমীক্ষিত তথ্য।

বর্ধমানের অর্থনীতি ঃ পটভূমি ও সম্ভাবনা

সমীরণ চৌধুরী

ডঃ ভবতোষ দত্তর ভাষায় , 'উনিশ শতকে যে সব বাঙালি অর্থনৈতিক বিষয়ে লিখেছেন যেমন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, দ্বারকা নাথ বিদ্যাভূষণ বা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এঁরা কেউই আনুষ্ঠানিকভাবে অর্থনীতির ছাত্র ছিলেন না। এঁরা সবাই অর্থনীতির চর্চায় আর গবেষণায় প্রধানত স্বয়ং শিক্ষিত।' অর্থনীতির ছাত্র না হলেও যাঁদের নাম লিখেছি তাঁরা ছিলেন 'স্বয়ং শিক্ষিত' আমি নিতান্তই 'অ-শিক্ষিত'। একটা ভরসা, যে লেখাটি লিখছি তা কোনও গবেষণা পত্র নয়, নিতান্তই চর্চার অংশ। অর্থনীতির ছাত্ররা ক্ষমা করবেন না জানি, কারণ এটা নিতান্তই অনধিকার চর্চা।

কারও কারও মতে বর্ধমান মানে 'a prosperous centre of growth.' কৃষির দিক থেকে বর্ধমান জেলাকে বলা হয়, পশ্চিমবঙ্গের 'শস্যভাণ্ডার', আর শিল্পের দিক থেকে ভারতের 'রূঢ়' (Ruhr)। জেলার ভৌগোলিক প্রাকৃতিক বিশ্লেষণে দাঁড়ায় পূর্বাঞ্চল শস্য শ্যামলা আর পশ্চিমাঞ্চল রুক্ষ পাথরে রাঙামাটির দেশ। স্বাভাবিক ভাবেই গড়ে উঠেছে কয়লা খনি ও কলকারখানা। কর্কট ক্রান্তিরেখা জেলাকে দু'ভাগে ভাগ করেছে। জেলার ব্যাপ্তি ৭০২৪ বর্গ কি.মি.।[১]

একথা অনস্বীকার্য খনি যুগের আগে থেকে বর্ধমান যদি ধনে, ঐশ্বর্য্যে অগ্রগামী হয়ে থেকে থাকে তা কৃষি কার্যের জন্যই। এতগুলো নদীর আশীর্ব্বাদ যেখানে, বীজ ছিটোলেই ফসল ফলে, সেখানে কৃষিকার্যে সাফল্য তো আসবেই। তবে বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীও বর্ধমানের কপালে ছিল, অনুমান করা যায়। কারণ কাটোয়া-কালনায় গঙ্গা পথে, দামোদর মারফত সপ্তগ্রামে যোগাযোগ ভালই ছিল। আর সড়কপথে উচালন দিয়ে তাম্রলিপ্ত, এদিকে পাটুলিপুত্র যাওয়ার পথে বর্ধমানের এক একটি চটি যে বিশ্রামের এবং ব্যবসার কেন্দ্র ছিল তা সহজেই অনুমেয়। তাঁতের কাপড়, কাঁসা, পিতলের বাসন -পত্তর, ছুরি-কাঁচি প্রভৃতি রপ্তানি করা হত অনুমান করা যায়।

ধন সম্পদে যে বর্ধমান চিরকালই রমরমা ছিল তা সহজেই অনুমেয়। শেরশাহ রাস্তা তৈরী করেছিলেন, মুঘলরা শের আফগানের সাথে যুদ্ধ করতে এসেছিলেন, বর্গীরা হামলা করেছিল, কাপড় বিক্রি করতে এসে কেউ বর্ধমানে রাজা হয়ে বসেছিলেন নিশ্চয়ই কোনও

অজানা অসমৃদ্ধ দেশে নয়। তবে এ অঞ্চলের মানুষদের খুব একটা সংগ্রামী চরিত্র গড়ে ওঠেনি প্রাকৃতিক আশীর্ব্বাদের জন্য। খরা-বন্যা-মহামারীতে ক্ষতি হয়েছে, কিন্তু অন্যান্য জেলার তুলনায় তা কখনই ব্যাপক নয়। সেই ট্রাডিশন এখনও চলছে। বহু অফিসার কর্মী রিটায়ারমেন্টের পর বর্ধমানে স্থায়ী ভাবে বাড়ি ঘর বানাচ্ছেন। কারণ, কলকাতার প্রাণস্পন্দন ছাড়া তথাকথিত এত সমৃদ্ধ জায়গা বাংলায় আর নেই।

যাইহোক চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্যন্ত বিভিন্ন পরিব্রাজকের লেখা থেকে বর্ধমানের সমৃদ্ধির খবর পাওয়া যায়। প্রথমে কাঁকসা এবং পরে দামোদরের পথ ধরে বর্ধমান সম্পূর্ণভাবে ১৫৭০ এর পর মুঘলদের হাতে যায়। ১৫৮৩ সালে টোডরমল জমি জরিপ এবং জমির গুরুত্ব অনুযায়ী খাজনা নিরুপন করেন।

এই খাজনা ব্যবস্থা থেকে সেই স্থানের জমির উর্বরতা, সুযোগ-সুবিধা বা অর্থনৈতিক অবস্থার কথা কিছুটা অনুমান করা যায়। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের ব্যক্তিগত জমি রাখার রেওয়াজ ছিল না। কিন্তু খাজনা ব্যবস্থার একটা সূক্ষ্ম রূপ দেওয়ার জন্য 'বিহার' থেকে চাষ-আবাদ করা হত। বলদ, জমি চাষীকে দেওয়া হত। খরচ- খরচা বাদ দিয়ে ১/৬ অংশ বিহারকে দিতে হত। কৌটিল্যের অর্থ-শাস্ত্র থেকেও প্রায় একই পদ্ধতির কথা জানা যায়। তবে সব ভূ-সম্পত্তিই রাজ সম্পত্তি হিসাবে ধরা হত। শেরশাহের আমলে আকবর টোডরমলের মাধ্যমে তা সম্পূর্ণ করেন। খাজনা ধার্য হয় ১/৩অংশ। ইংরেজরা ১৬৪২ বাংলায় শুল্কহীন যে কোনও রকম বাণিজ্যের অধিকার পায়। ১৬৯০ সালে পায় কলকাতা। ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিশ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন জারি করেন। বন্দোবস্তের আগে জমিদার বা ইজারাদারদের জমিতে কোন স্বত্ত্ব ছিল না, শুধু রাজস্ব আদায় করত তারা। আদায়ী টাকার ১১ ভাগের ১ ভাগ পেত কমিশন হিসাবে। জমির মালিক ছিল রায়ত কৃষকরা। বর্ধমান রাজের অধীনে এই সময় ছোট ছোট তালুক পত্তন হতে আরম্ভ করে। এইসব তালুক পত্তনের সময় বেশ উঁচু হারে সেলামী এবং জামানত নেওয়া হত। ইতিমধ্যে ১৭৭০ এবং ১৭৮৭ তে দামোদর এবং অজয়ের কোপে বন্যা কবলিত হয় বর্ধমান। বহু বর্ধিষ্ণু চাষী , এমনকি বর্ধমান মহারাজও তাদের দেয় খাজনা বা কর বাকী রাখতে বাধ্য হয়। কোম্পানীর কোর্ট অব ডিরেক্টর অসন্তুষ্ট হয় এতে। যাইহোক ক্রমে ১৭৯৯ থেকে ১৮২৫ এর মধ্যে পত্তনি তালুকের মাধ্যমে বর্ধমান রাজ রক্ষা পায় । ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিও খুশী হয়। সারা হিন্দুস্তানে কৃষি উৎপাদনের দিক থেকে বর্ধমানকে প্রথম বলে তারা চিহ্নিত করে এবং নথিপত্রে উল্লেখ পাওয়া যায় সাতের আটভাগ জমি চাষের আওতা ভুক্ত হয়। ১৮২৩ এবং ১৮৫৫ আবার দুটি বড় বন্যা হয়। বাঁকা, বেহুলা, ভাগীরথী, কানা দামোদরের পলি জমে জলধারণের ক্ষমতা কমে আসে। ফলে প্রায়শই বন্যা দেখা দিতে শুরু করে। ১৮৬৫ এবং ১৮৭৪ সালের খরা অন্যান্য জেলার মত বর্ধমানের মানুষকেও ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। আর্থিক সঙ্গতিপূর্ণ বর্ধমানেও ভূমিহীন কৃষক সৃষ্টি হয়।

এইভাবে নানান কারণে, সমৃদ্ধ জেলাটি নানাভাবে আর্থিক দুর্গতিতে পরে। কখনও বন্যা,

কখনও ঠিকমত ফসল না ফলায় সরকারি ও বেসরকারি দান-খয়রাতির ওপর প্রজাদের জীবন ধারণ চলতে থাকে। বিস্তারিত উল্লেখ করার সুযোগ এখানে না থাকলেও, এটুকু বলা যায়, ১৮৭৪ এরপর ১৮৮৪-৮৫, ১৯১৩ - ১৪, ১৯১৭ - ১৮, ১৯২৮ - ২৯, ১৯৩৪ - ৩৫, ১৯৩৫ - ৩৬, সামগ্রিক বাংলার হিসাবে ১৯৪৩, ১৯৫৬ - ৫৯ প্রভৃতি সালগুলি ইতিহাসে এক দুঃখজনক অধ্যায় হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

এরই মাঝে, ১৮৭১ সালে কাঞ্চননগর থেকে জামালপুর দীর্ঘ ২২ মাইল ইডেন খাল খনন করা শুরু হয়। ১৮৮১ সালে কাজ শেষ হয় এবং সেচের জন্য ব্যবহৃত হতে থাকে ১৮৮৮ -৮৯ থেকে। ক্রমান্বয়ে বন্যার ফলে রোগ-মহামারী থেকে শুরু করে নানান সমস্যায় মানুষ জর্জরিত হয়। যাইহোক ১৯২৬-এ রণডিহা থেকে দামোদর ক্যানেলের কাজ শুরু হয়ে ১৯৩৩-এ তা সম্পূর্ণ হয়। একর প্রতি সাড়ে তিন টাকা শর্ট টার্ম লীজে এবং সাড়ে বার টাকা লং লীজের জলকর ধার্য হয়। ১৯৩৫-এ সেচ এলাকায় সরকার জল নেওয়া বাধ্যতামূলক করে। কর বেড়ে দাঁড়ায় - সাড়ে পাঁচ টাকা। বর্ধমান কৃষি ভিত্তিক এলাকা। সুতরাং কৃষকদের একত্রিত করার মত সুযোগ বর্ধমান ছাড়া আর কোথায় আছে। কৃষক সভার মাধ্যমে এক ব্যাপক আন্দোলন গড়ে ওঠে এবং ক্যানেল কর ২ টাকা ৯ আনায় নেমে আসে।

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ । ৪২ সালে দুনিয়া জোড়া অর্থনৈতিক সংকট এবং দুর্ভিক্ষ। ক্যানেল কর বাড়তে বাড়তে হয় - সাড়ে পাঁচ টাকা। দ্বিতীয় পর্যায়ে আন্দোলন। অবশেষে দেশের স্বাধীনতা এবং প্রথম মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল ঘোষ কর্তৃক ক্যানেল কর কমিয়ে ৪ টাকায় ধার্য। ১৯৫২ থেকে 'ব্লক' পর্যায়ের সূত্রপাত। এবং প্রথম থেকেই কৃষি কার্যের ওপর জোর দেওয়ায় বর্ধমান জেলা উন্নতির দ্রুত মুখ দেখে। হয় সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ণ। ১৯৪৮ সালে আমেরিকার 'টেনেসি ভ্যালি কর্পোরেশন'- এর ধাঁচে গড়ে ওঠে 'দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন'।[২] অন্যদিকে ২১ শে মে ১৯৭৫ ফরাক্কা প্রকল্প শুরু হওয়ায় গঙ্গায় জল বাড়ে। কৃষিরও উন্নতি ঘটে। এই ফাঁকে কৃষি উন্নয়নের আগে ব্যবসা বাণিজ্যের কথা সেরে নিই।

রেল, নদীপথ, সড়ক যোগাযোগ ভাল থাকায় আসানসোল, রাণীগঞ্জ, বর্ধমান ব্যবসা বাণিজ্যের ভাল কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায় প্রথম থেকেই। মেমারী, কাটোয়া, কালনা, পানাগড়, গুসকরা গুরুত্বপূর্ণ বিতরণ কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। জল পথে অবশ্য কাটোয়া কালনার মন্দা শুরু হয়, প্রথমত পলি পড়ার জন্য, দ্বিতীয়তঃ রেল লাইন প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকেই। অবশ্য ফরাক্কা ব্যারেজ শুরু হওয়ার পর থেকে ছোট ছোট লঞ্চ চালানো যেতে পারত। কিন্তু সেদিকে এ পর্যন্ত নজর দেওয়া হয়নি। বড় নৌকা কিছু কিছু চলে এখনও।

এদিকে ১৭৭৪ সালে বর্ধমানে কয়লার সন্ধান পাওয়া যায়। রাণীগঞ্জ থেকে কলকাতা রেল যোগাযোগের সুবাদেই এই অঞ্চল শিল্প সমৃদ্ধ হতে থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ১৮৩৬ সালে দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করেন 'কার-টেগোর অ্যাণ্ড কোম্পানী।' পিগ আয়রণ

কারখানা স্থাপিত হয় কুলটিতে ১৮৭৪ সালে। ১৮৮৯ তে রাণীগঞ্জে কাগজ কল স্থাপিত হয়। উৎপাদন শুরু হয় ১৮৯১ সালে। মেসার্স বার্ণ অ্যাণ্ড কোম্পানী রাণীগঞ্জে তাদের পটারি কারখানার সাথে সাথে লাইম ওয়ার্কস করেন অণ্ডালে এবং ইঁট ও টালি তৈরী শুরু করেন দুর্গাপুরে। ১৯১৯ সালে বার্ণ অ্যাণ্ড কোং কর্ত্তৃক পত্তন হয় ইণ্ডিয়ান আয়রণ অ্যান্ড স্টীল কোম্পানী। সংক্ষেপে IISCO। পরবর্ত্তীকালে স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জী ও স্যার বীরেন মুখার্জীর নাম এ বিষয়ে স্মরণীয়।

সিল্ক উইভিং শিল্পেরও ব্যাপকতা ছিল তখন(১৯০৮ - ১৯০৯)। কাটোয়া, মেমারী, জগদাবাদ এবং সদরেই সাধারণতঃ এগুলি তৈরী হত। তসরের কাপড় মেমারীতে এত সুন্দর হত যে বম্বে, মাদ্রাজে পর্যন্ত এর ব্যাপক চাহিদা ছিল। সে সময় দেখা যাচ্ছে বাইরে চালান দেওয়ার থেকে স্থানীয় ভাবেই বিক্রি হত বেশি। অল্প পরিমানে হলেও বর্ধমান থেকে রপ্তানি হত তুলা, নীল এবং চিনি। পরে অবশ্য এ ব্যবসাগুলিতে ভাঁটা পড়ে।

চমৎকার এমব্রয়ডারী কাজ থাকত ধুতি, চাদরে। ৭ টাকা থেকে ১০ টাকা পর্যন্ত তসর, গরদ, সিল্ক-এর দাম ছিল। অনেক সময় মহাজনেরা তাঁতিদের কাঁচামালের জন্য আগাম দাদন দিত। এবং পরে সব মাল কিনে নিত। আবার 'দালাল'-দের এড়িয়ে মুনাফা বেশী করার আশায় কোনও কোনও তাঁতি সরাসরি বর্ধমান শহরে হাজির হত। কাটোয়া কালনার মাল অবশ্য কলকাতাতেই বেশী যেত। অনেক সময় চাষে যারাই রেশম উৎপাদন করত তারাই আবার কাপড় বুনত। ফলে সারা বছরই কিছু না কিছু কাজ তারা পেত। কালনা কাটোয়ার দিকেই এ ধরণের শিল্পের বেশী সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁত শিল্পও বর্ধমানের বেশ কিছু জায়গায় পাওয়া যায়। পূর্বস্থলী, কালনা এবং মন্তেশ্বরেই এর ব্যাপকতা বেশী। অবশ্য মেমারী, জামালপুর প্রভৃতি জায়গাতেও তাঁত শিল্পের প্রচলন ছিল। তাঁত শিল্প যে কত লাভজনক ছিল তার একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। বিদ্যাসাগর মশাইয়ের অন্যতম শিক্ষাগুরু তারানাথ তর্কবাচস্পতি মশাই ব্যবসা বাণিজ্যেও এক প্রবাদ পুরুষ ছিলেন। তিনি একাই ১২০০ টি তাঁত বসিয়েছিলেন। মুটের মাথায় করে কলকাতায় তৈরী কাপড় চালান দিতেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় মধ্যবিত্তের উৎসাহে এবং অনুকুলে তাঁত শিল্পকে পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা হওয়া সত্বেও হস্তচালিত তাঁত ইউরোপের যন্ত্রচালিত তাঁতের কাছে হটে যেতে বাধ্য হয়। ফলে তাঁত শিল্পের অধোগতি শুরু হয়। স্বাধীনতার পর বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা এবং সমবায় প্রথায় উন্নতির চেষ্টা হয়। কিন্তু তাঁতিদের অবস্থার আজও উন্নতি হয়নি। দালাল, ব্যাঙ্কের সুদ, সমবায়ের শিক্ষিত কর্মকর্তাদের চুরি, কলকাতার অফিস বাড়ি-গাড়ি প্রচারের চাপে যাঁতাপিষ্ট হচ্ছে আজও তাঁতিরা।

কংগ্রেসী জমানায় জনৈক ব্যারিস্টার মন্ত্রী বলেছিলেন, তিনি বাকিংহাম প্যালেসে কাঞ্চননগরের ছুরি দেখেছেন। খুব স্বাভাবিক। কাঞ্চননগরের ছুরি, কাঁচি, ছিল জগৎ বিখ্যাত। একজন দক্ষ কারিগর দিনে দু থেকে তিন ইঞ্চি লম্বা, শিক থেকে ১ ইঞ্চি চওড়া ছুরি ৭২ টি পর্যন্ত করতে পারত। সেই ঐতিহ্যময় শিল্প আজ ধ্বংসের পথে। পিতল,

কাঁসার বাসন, দাঁইহাট, বনপাস, কাটোয়া প্রভৃতি জায়গায় বিখ্যাত ছিল। কামারপাড়ায় এখনও অনেক দক্ষ শিল্পীদের বসবাস। এছাড়া মাটির পাত্র, মাদুর বর্ধমান জেলাতে ভালই হত। বর্ধমানে বিড়ি শিল্পও যে অনেক ঘরে ঘরে ছিল তা ১৯১০ এর বর্ধমান জেলা গেজেটিয়ারে পাই।

মূল বর্ধমানের ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে একটি পুরাতন লেখা থেকে উদ্ধৃত করি। লেখাটি একদা পৌরসভার চেয়ারম্যান প্রয়াত ফণীভূষণ সামন্ত মশাইয়ের। তিনি লিখেছেন, 'বর্ধমানের ব্যবসা বাণিজ্য অতি প্রাচীন কাল হইতেই ধান্য ও চাউলের উপর নির্ভরশীল। বর্ধমান শহরের আদি ও প্রধান ব্যবসা ছিল নূতনগঞ্জে। এই অঞ্চলে চেলো মহল, চেলো পট্টী আজও তা প্রমাণ করে। জনসংখ্যা ও শহর বৃদ্ধির সাথে সাথে এই ব্যবসা সদরঘাট, বাজেপ্রতাপপুর, আঁজির বাগান ও কেশবগঞ্জে প্রসার লাভ করে। ১৯০৮ সালে সর্বপ্রথম চাউল কল স্থাপিত হয় কেশবগঞ্জ চটিতে হরিপদ দে নামক এক ব্যবসায়ী দ্বারা। পুরাতন ব্যবসা হিসাবে সরিষার তেলের ব্যবসা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিল।'

এছাড়াও বর্ধমানের প্রথম দিকে চিঁড়া কল, ছোট ছোট শিল্প হিসাবে কাঠ ফাড়াই, সাবান কারখানা ও মোটর সারাইয়ের এবং ট্রেডিং ব্যবসা হিসাবে বিড়ির পাতার ব্যবসা, শুখা তামাক এক সময়ে রমরমা ছিল। এখন অবশ্য অন্য কথা। নতুন দিনে নতুন সময়ে নানান ব্যবসার প্রয়াস লক্ষণীয়। এগ্রোবেসড ইণ্ডাষ্ট্রি হিসাবে আধুনিক কালে তুঁষ থেকে তেল, কাগজ কল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পুরনো দিনের বর্ধমানের মানুষেরা ধানকল , কোল্ড স্টোরেজের প্রতি আগ্রহী ছিলেন, একালের উদ্যোগীরা ধানকল কোল্ড স্টোরেজ ছাড়াও নতুন ধরনের শিল্প স্থাপনে ক্রমে উৎসাহী হচ্ছেন। তবে সম্প্রতি বাইরের রাজ্য বা দেশ থেকে চাল এসে যাওয়ায় এবং রপ্তানীতেও বাধা পাওয়ায় রাইস মিল ব্যবসা সংকটে পড়ে।

ব্যবসার ব্যাপকতা বেড়েছে, রাস্তা-ঘাট, বিদ্যুৎ টেকনোলজির উন্নতি প্রভৃতি নানান কারণে আধুনিক যুগে পোলট্রি ব্যবসা থেকে ওষুধ কারখানা, বাসন-কোসন তৈরীতেও মন দিচ্ছেন অনেকে । আর পাঁচটা আধুনিক শহরের মত - টি.ভি. - ফ্রিজ বিক্রি থেকে এস.টি.ডি বুথ সবই দেখা যাচ্ছে। দক্ষিণবঙ্গের কেন্দ্র বিন্দু হিসাবে হোটেল বোর্ডিংয়ের ব্যবসাও ভালই চলছে। বর্ধমান যে ফিউডাল মানসিকতা থেকে মুক্ত হচ্ছে তার প্রমাণ বিয়ে বাড়ি ভাড়া। নিজের বাড়িতে প্যাণ্ডেল না খাটিয়ে অন্যত্র অতিথি আপ্যায়ণ কিছুদিন আগে পর্যন্ত ভাবা যেত না।

আগেই কাঠের ব্যবসায়ে যে রমরমা ছিল, তা উল্লেখ করা হয়েছে। কাঠ আসত চাইবাসা, চক্রধরপুর, ময়ুরভঞ্জ প্রভৃতি জায়গা থেকে, রেল যোগে।

এই জেলায় বেশ কিছু স্থায়ী হাট অবশ্য ছোট খাটো ব্যবসার কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। স্বাধীনতার পরবর্তী ক্ষেত্রে রাস্তা ঘাটের আস্তে আস্তে উন্নতি হয়। বিশেষতঃ ৭০-র দশক থেকে প্রত্যন্ত গ্রামে গঞ্জে পর্যন্ত রাস্তা পৌঁছে গেছে। বহু নদীতে আগে পারাপারের অসুবিধা ছিল। স্থায়ী

সেতু সে সমস্যার সমাধান করেছে। গ্রামের মানুষ এখন আর সদর শহর বা মূল ব্যবসা কেন্দ্রে পৌঁছতে অসুবিধা বোধ করে না। আসানসোল, রাণীগঞ্জ, দুর্গাপুর, বর্ধমান এখন বড় বড় দোকান, বড় বড় কোম্পানীর 'শোরুমে' ছেয়ে গেছে। কলকাতার দরের সঙ্গে খুব একটা পার্থক্য নেই। এককালের বর্ধিষ্ণু চাষীদের বাড়ির ছেলেরা এখন অনেকেই শহরে দোকান করা , এজেন্সী নেওয়া, হোটেল, রাইস মিল করার দিকে ঝুঁকেছে। মোটের ওপর কলকাতা, শিলিগুড়ির পরই বর্ধমান এখন বড় ব্যবসা কেন্দ্র। বিশেষতঃ শহর বর্ধমান হুগলীর কিছু অংশের, বাঁকুড়ার কিছু অংশের এবং বীরভূমের অনেকখানি ব্যবসার কেন্দ্র বিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ একটি কেন্দ্রে এত ডাক্তার এশিয়ার আর কোথাও নেই। এই শহরে ৪৫ টি অনুমোদিত নার্সিংহোম, রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম ওষুধের বাজার। বর্ধমানে এত সুপার মার্কেট হওয়ায় সন্দেহ প্রকাশ করা হচ্ছে খরিদ্দারের তুলনায় বোধহয় দোকান বর্ধমানে বেশি।

স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত বর্ধমানে সারা বছর চাষ হত না। মুখ্যত আউশ আমন ধান চাষ ছাড়া বছরের অনেকটা সময়ই বসে থাকতে হত। যাঁরা শিক্ষার আলো পেলেন, তাঁরা শহরে মহানগরীতে কাজের ধান্দায় বেরোতেন। কেউ চাকরি করতেন, কেউ ওকালতি করতেন। নিজের হাতে চাষ যারা করতেন না তাঁরা চাষের সময় জন-মজুর খাটাবার জন্য 'দেশে'র বাড়িতে যেতেন। জমি বেশিই থাকুক আর কমই থাকুক 'বর্ণ হিন্দুরা' কোনও দিনই লাঙ্গল ধরত না। ফলে গঞ্জে, চটিতে, শহরে ব্যবসা বাণিজ্য বা চাকরির জন্য যেত। গরীব চাষীরা যারা লাঙ্গল ধরত অবসর সময়ে হাতের কাজ করত। আমার জানা 'বাজার বনকাপাসী' একটা গ্রাম, যেখানে গ্রামের প্রায় সবাই শোলার কাজ জানে। আজ সেই শোলার কাজ জগদ্বিখ্যাত। তখন তো আর 'ফুড ফর ওয়ার্ক' ছিল না, ছিল না 'জওহর রোজগার যোজনা', কিংবা ডি, আর, ডি, এর অধীনে নানা প্রকল্প। যারা গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র মজুর খাটতে যেতে পারত না, তারা গ্রামেই এটা ওটা করত। আর হাতের কাজ না জানলে আশে পাশে ইঁট ভাটা থাকলে দিন মজুরীর কাজ করত বা গ্রামের পুকুর সংস্কার করত।

রাজ্যের মাথা পিছু আয়ের তুলনায় বর্ধমানের মাথাপিছু আয় অন্ততঃ ৭ শতাংশ বেশি। ৭০ -৭১ সালে মাথা পিছু আয় দাঁড়ায় পশ্চিমবঙ্গে যেখানে ৫২৪ টাকা, বর্ধমানে সেখানে ৬৮৫ টাকায়। বিশেষত গ্রামীণ উন্নয়নের প্রাথমিক শর্ত এই জেলায় অনেকখানি প্রতিপালিত। জনসংখ্যার হার কম হওয়ায়, নতুন নতুন ব্যবসা বাণিজ্য বেড়ে যাওয়ায় উন্নয়ণের অনুকুল পরিস্থিতি সৃষ্টিতে বর্ধমান জেলার অগ্রগতি তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষতঃ গ্রামীণ উন্নয়ণের প্রাথমিক শর্ত এই জেলায় অনেকখানি প্রতিপালিত।

যে জমিদারীর প্রসার শুরু হয় ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ঠিক ১৬০ বছর পর তার অবসান হয়। বর্ধমান জেলা এত পট পরিবর্তনের পরও কৃষিকার্যে সেই প্রথমটিই হয়ে আছে। এর কারণও আছে। প্রাকৃতিক সুযোগ সুবিধা ছাড়াও ১৯৬১, ৬৫ সালে বর্ধমানকে 'সবুজ বিপ্লবে'র আওতায় আনা হয়। I.A D.P. I.A.A.P প্যাকেজ প্রোগ্রামের মাধ্যমে

বর্ধমানের মাটিতে সোনা ফলতে থাকে। বলা বাহুল্য প্যাকেজ প্রকল্প ও নিবিড় চাষ পরিকল্পনা পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র অংশ গ্রহণকারী জেলা বর্ধমানকে অধিক ফলন ও সুফলের অধিকারী করে তোলে। কিছুদিন আগেও সেখানে হাড় গুঁড়ো আর গোবর একমাত্র সার ছিল সেখানে, বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক সার প্রয়োগেও বর্ধমান শীর্ষে চলে যায়। ৭০ - ৭১ এ একাধিক ফলন উৎপন্ন হল। সমগ্র প্রদেশের প্রগতি যেখানে ৫৫ শতাংশ বর্ধমানে সেখানে হল ১৯০ শতাংশ।[৩] ৭১-র গণনা অনুযায়ী ৫৪ শতাংশে কর্মপ্রবৃত্ত লোক কৃষি নির্ভর। তার মধ্যে ৩০ শতাংশই ভূমিহীন। এতে কৃষি সমৃদ্ধির ছিটে ফোঁটাও সংখ্যাগুরু ভূমিহীনরা পেতনা। এতে দীর্ঘ মেয়াদী অর্থনৈতিক প্রগতির সম্ভাবনা কম। কারণ সমৃদ্ধির সম্প্রসারণ বাজারের প্রসার ঘটায়, বিনিয়োগে উৎসাহের সঞ্চার করে। অসংখ্য কৃষিজীবিদের ভূমিহীনতা যেমন তাদের নিজেদের দারিদ্রের কারণ, তেমনই প্রগতির ঈপ্সিত গতি সঞ্চারেও প্রতিবন্ধক। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'যাঁরে তুমি ফেলিছ পিছে, সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।'

কৃষি উন্নয়নের দুটি পথ। একদল মনে করেন কৃষি পদ্ধতির উন্নয়ণের সাথে সাথে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের সম্ভাবনা উজ্জ্বল। অপর পক্ষ মনে করেন, প্রথমে ভূমি সংস্কার করা প্রয়োজন। দ্বিতীয় মতাবলম্বীরা বলেন, বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর জমি পুনরুদ্ধারের সংগ্রাম তাঁরা যেমন করেছেন, তেমনই ক্ষুদ্র কৃষকদের স্বার্থবাহী কিছু পদক্ষেপও তাঁরা নিয়েছেন।

১৯৭৭-কে ভিত্তি বর্ষ ধরলে তার আগের ১৫ বছরের উৎপাদন উন্নয়ণের মহার্ঘ উপকরণ বড় রায়তদের মাধ্যমে বেশি খরচ হয় এবং তখন উৎপাদন দাঁড়ায় ৪ লক্ষ টন থেকে ৮ লক্ষ টন, অথচ পরবর্তী ১৫ বছরে সরকারী সাহায্যে ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও ভাগচাষীদের অনুকূলে গেলে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৮ থেকে ১৬ লক্ষ টন। তবে ভূমি সংস্কারের সমস্যা একটি মৌলিক সমস্যা। কারও কারও মতে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ণের স্বার্থে সেই সমস্যা থেকে উদ্ধার পাওয়া জরুরী। ভূমি সংস্কারের প্রাথমিক কাজ রেকর্ড অফ্ রাইটস্ প্রতিষ্ঠা করা। এরজন্য নির্ভূল ম্যাপ ও অন্যান্য প্রাথমিক তথ্য নথীভুক্ত করা প্রয়োজন। এরপরের আরেকটি ধাপ পরীক্ষামূলকভাবে করা যেতে পারে, তা হচ্ছে এদের সকলকে সরকারের মাধ্যমে একত্রিত করে আল ভেঙ্গে দেওয়া ও সমবায় ভিত্তিতে কাজ শুরু করা। বিশাল লপ্তে কাজ হলে মহার্ঘ উপকরণের ব্যয়ের সাশ্রয় হবে, হবে শ্রম দিবসের সৃষ্টি। কৃষক রোজ অথবা পর্যায়ক্রমে যেমন কাজ পাবেন সেরকমই পাবেন ফসল বিক্রির লভ্যাংশ। অশিক্ষিত চাষীরা সব কাজ করতে না পারলে উদ্যোগী শিক্ষিত মানুষ তাঁদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করতে পারেন। প্রকৃত লিডারশিপ, আইনের রক্ষাকবচ এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকলে এ ধরণের পরিকল্পনা সার্থক হতে বাধ্য। বিশেষতঃ কৃষিযোগ্য জমি যেখানে অবহেলায় পরে আছে সেখানে নতুন নতুন ভাবনা চিন্তা নিয়ে গ্রামীণ উৎপাদন

বা কৃষি কার্যে উন্নতি সম্ভব এবং গ্রামের মানুষদের হাতে টাকা এলে বাজার বৃদ্ধি সম্ভব হবেই। তবে এ ব্যাপারে আমলাতান্ত্রিক মানসিকতার আমূল পরিবর্তন দরকার। জীপের তেল পোড়ালেই শুধু চলবে না, কি শিল্পে, কি কৃষিতে উৎপাদনের ক্রিয়াকৌশল, অর্থের যোগানের ব্যবস্থা, বাজার ধরা সব বিষয়েই সরকারী সুযোগ সুবিধা গ্রামের প্রত্যন্ত প্রদেশে পৌঁছে দিতে হবে। জনৈক কৃষি অর্থনীতিবিদের সুরে সুর মিলিয়ে বলা যায় 'স্বনির্ভর হতে গেলে, উন্নতির সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে গেলে এলাকার প্রাকৃতিক ও মানবিক সম্পদ সম্পর্কে পূর্ণভাবে অবহিত হতে হবে। না হলে কোন উন্নতি পরিকল্পনায় সার্থক হবে না।'

এবার কৃষি সংক্রান্ত কয়েকটি তথ্য দেওয়া যাক। জুন,১৯৯৬ পর্যন্ত এ জেলার ২৮২৬ টি মৌজার মধ্যে ২৫৪২-টি মৌজায় জমির রেকর্ড অফ্ রাইটস্ দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে মোট ব্যবহৃত জমি ৬২.৯১ শতাংশ, সেই তুলনায় বর্ধমানে শতকরা হিসাবে দাঁড়ায় ৬৮.১০ শতাংশ। কৃষি উৎপাদন পশ্চিমবঙ্গে গড় ২২৫.৬৭ মেট্রিক টন, বর্ধমানে ২৬৪.৭৩ মেট্রিক টন। এ জেলায় হিমঘরের সংখ্যা ৬৯টি, চালকলের সংখ্যা ১৭০টি।

বর্ধমানে কৃষি অর্থনীতির উন্নয়ণে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের ভূমিকা প্রশংসনীয়। ১৯১৭ সালের ২৬ জানুয়ারী ব্যাঙ্কটির সৃষ্টি হয়। দিন দিন ব্যাঙ্কটির শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে। শুধুই কৃষিতে নয় তাঁত, হিমঘর, বিপণন, চালকল থেকে পশুপালন , মৎস এমনকি ক্ষুদ্রশিল্প, বেকার ইঞ্জিনিয়ার, আবাসন সমাজের সর্বস্তরের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলিকে এই ব্যাঙ্ক ঋণ দিয়ে যাচ্ছে। অথচ অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি আমানত নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু দাদন দেওয়ার সেরকম কোন ভূমিকা নেই। জেলার উন্নতিতে এ এক ভয়াবহ চিত্র। বিগত ৩টি আর্থিক বছরেও তুলনামূলক আমানত ও ঋণ দাদনের শতকরা হার (সি.ডি.রেসিও) দেখলেই তা বোঝা যাবে। ১৯৯৭ - ৯৮ সালে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের ছিল ২৭.৪৫ শতাংশ, সমবায় ব্যাঙ্কের ৪৫.৪৭ শতাংশ। ১৯৯৮ - ৯৯ সালে ছিল বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কে ২২.৪৮ শতাংশ, সমবায় ব্যাঙ্কে ৪৪.৩৭ শতাংশ, ১৯৯৯ - ২০০০ সালে ২১.৭৩ শতাংশ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের, আর ৪৩.৮৪ শতাংশ সমবায় ব্যাঙ্কের। দেশের বর্তমান আর্থিক যে অবস্থা ব্যাঙ্কের সুদের টাকা দিন দিন কমবে। সাধারণ মানুষ এবং ব্যাঙ্কগুলিকেও টাকা খাটাতে হবে। টাকা জমিয়ে রাখলে চলবে না। আর এই টাকা খাটাবার ভাল জায়গা (অন্ততঃ বর্ধমানে) কৃষি বা কৃষি ভিত্তিক শিল্পে। শুধু ধান দিয়ে হবে না, চাই নতুন চিন্তার ধ্যান। সম্প্রতি একটা লেখা চোখে পড়ল। জনৈক কৃষি দপ্তরের কর্মী ষাটের দশকে তাঁর চাকরি জীবনের স্মৃতিচারণ করে বলেছেন, 'রাণীগঞ্জ এবং জামুরিয়ায় বহু খনি থেকে কয়লা উত্তোলনের কাজ শেষ হবার পর সেখানে দেখা যায় বহু পরিত্যক্ত খনি ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রচুর খাদ ভর্ত্তি জল সম্পদ, পরিত্যক্ত ভূমি, সেই সঙ্গে কয়লা খনির ছাঁটাই শ্রমিক সব মিলিয়ে উপযুক্ত এক পরিকাঠামো। মাটি পরীক্ষায় দেখা যায় সেখানকার বেলে মাটিতে সব্জি, ফল, গম, ভুট্টা চাষ করা অবশ্যই সম্ভব।' ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়। আজও ধানের চাহিদা কমে গেলে অন্য চাষ আমাদের করতে হবে। শিল্পাঞ্চলে এরকম বহু চাষযোগ্য জমি উদ্যোগের অভাবে পরে আছে।

এবার আসা যাক, শিল্প উন্নয়ণের দিকে। এ অঞ্চলে ইতস্ততঃ ধানকলগুলি আধুনিক শিল্পের পর্যায়ভুক্ত না করে, স্বাধীনোত্তর কালের বৃহৎ শিল্পের উন্নয়ণ উল্লেখযোগ্য। চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ থেকে শুরু করে দুর্গাপুর স্টীল প্ল্যান্ট, এম.এ.এম.সি, কোক ওভেন, সার কারখানা গড়ে ওঠে দুর্গাপুর কে কেন্দ্র করে। ৬টি বড় শিল্প, ১০টি মাঝারি শিল্প, প্রায় ২০০টির মত ক্ষুদ্র শিল্প এই নব্য শিল্প নগরীতে গড়ে ওঠে। সমগ্র টাউনশীপগুলির বিভিন্ন বিষয়ে তত্ত্বাবধানের জন্য গড়ে ওঠে ডি.এন.এ.ডি.এ, পরবর্তীকালে এ.ডি.ডি.এ.। প্রভৃতি সংস্থা। শুধু বর্ধমান নয় দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে কাজের সন্ধানে এখানে মানুষ আসতে থাকে। হয়ে ওঠে দেশের আকাঙ্খার প্রতীক। ডি.ভি.সি. উৎপাদিত বিদ্যুৎ, রাস্তাঘাটের যোগাযোগ, ট্রেন যোগাযোগ, শিল্পোন্নয়নের যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার, তা দুর্গাপুরে ছিল যথেষ্ঠ। মাত্র পঞ্চাশ বছর আগে পত্তন হয়েছিল দুর্গাপুর শিল্প নগরী। জন সংখ্যা ছিল ৭৫৫৬। একবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় সেই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ছ-লক্ষ। দুর্গাপুরে শিল্প কারখানা গড়ে ওঠার সহায়ক পরিবেশ আগেও ছিল এখনও আছে। কিন্তু রাজনীতির ঘূর্নাবর্ত উন্নয়ণ থমকে দাঁড়িয়েছে। একদিকে পাইয়ে দেওয়া মানসিকতা অন্যদিকে দুর্নীতি এবং ম্যানেজমেন্টের ব্যর্থতা যেমন দায়ী, সেরকম বর্তমান অর্থনীতির শিকার হতে বসেছে দুর্গাপুর। মাত্র কুড়ি কোটি টাকা খরচ করে এ.এস.পি. কে বাঁচানো যেতো। রাষ্ট্রায়ত্ত সার কারখানা চালু করতে মাত্র চল্লিশ কোটি টাকা চাওয়া হয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকার দেয়নি। এরকম বেশ কিছু উদাহরণ আছে। বর্তমানে নতুন কিছু কিছু ছোট কারখানা দুর্গাপুরে গড়ে উঠলেও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সেগুলির তেমন ভূমিকা নাই বরং দুর্গাপুরকে শহর হিসাবে গড়ে তোলার জন্য এ.ডি.ডি.এ. এবং পৌরনিগম নতুন অনেক প্রস্তাব গ্রহণ করছেন - এগিয়ে এসেছেন কিছু শিল্পোদ্যাগী। গড়ে উঠেছে নতুন কম্পিউটার - ইন্টারনেট শিক্ষা কেন্দ্র, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ম্যানেজমেন্ট শিক্ষায়াতন, আধুনিক আবাসন প্রকল্প, পরিচ্ছন্ন রাস্তা পার্ক ইত্যাদি কিন্তু যাকে কেন্দ্র করে দুর্গাপুর সেই শিল্প কারখানাগুলির শ্রমিক সংখ্যা নিয়তই কমছে। গোল্ডেন হ্যাণ্ডসেক, ভি, আর, এস, ভি, এস, এস, এর দৌলতে রাষ্ট্রায়ত্ব বড় শিল্প কারখানার শ্রমিক সংখ্যা কমছে।

ছয়ের দশকে দুর্গাপুর ইস্পাতে উৎপাদন শুরু হয় দশহাজার শ্রমিক নিয়ে যা বাড়তে বাড়তে এক সময় বত্রিশ হাজারে পৌছায় আর এখন সেখানে শ্রমিক সংখ্যা একুশ হাজারের কিছু বেশী।

মিশ্র ইস্পাতে উৎপাদনের প্রথম বছর শ্রমিক সংখ্যা ছিল চার হাজার। উৎপাদনের সর্বোচ্চসময়ে শ্রমিক সংখ্যা বেড়ে হয়েছিল ৭৪০০। এখন কমে হয়েছে ৩৮০০।

এম, এ, এম, সি কারখানা শুরু করেছিল মাত্র ৫০০ জন শ্রমিককে নিয়ে। এক সময় সেখানে ৮৫০০ শ্রমিক কাজ করে ছিল। আজ সেই সংখ্যা নেমে হয়েছে ১৪৫০।

সার কারখানায় উৎপাদন শুরুর সময় ছিল ৫০০ শ্রমিক। এখানে অবশ্য কোনদিনই

উৎপাদনের উচ্চমাত্রায় পৌঁছানো যায়নি। তবে ব্যাঙ্কিং প্লান্ট এর জন্য শ্রমিক সংখ্যা বেড়ে এক সময় ২৬০০ হয়েছিল এখন সার কারখানায় উৎপাদন হয় না কিন্তু শ্রমিক আছে ১৪৯৫ জন।

এখানে নতুন নতুন বৃহৎ শিল্প এবং তার সাথে 'এনসিলিয়ারী ইণ্ডাস্ট্রিজ' গড়ে তোলা সম্ভব ছিল। ক্ষুদ্র শিল্পের সম্ভাবনাও বর্ধমান জেলায় প্রচুর ছিল।

জেলার ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে ১৯৯৮ সালে রেজিস্ট্রিকৃত ইউনিটের সংখ্যা ৪৪,৭৭৮ টি এবং এর ফলে কাজ জুটেছে ২,৫৪,৯৩৭ জনের। ফ্যাক্টরী অ্যাক্টে রেজিস্ট্রিকৃত কারখানার সংখ্যা ১৯৯৭ সালে ৬৭৯ টি। কাজ পেয়েছে গড়ে প্রতিদিন ১,০৯,৩৩৫ জন। তুলনায় রাজ্য সরকারী দপ্তরে কাজ করেন ৩২,১৩৭ জন। সুতরাং যা সরকারী দপ্তরে বা বৃহৎ শিল্প স্থাপনে সম্ভব হয়নি, ক্ষুদ্র শিল্প তার থেকে অনেক বেশি লোককে কাজ দিয়েছে। ভয়ের দিক হচ্ছে এই বিশ্বায়নের যুগে ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য বিশেষ বিশেষ সুযোগ সুবিধা যদি না থাকে তাহলে প্রতিযোগিতার বাজারে টিকবে কিনা? সেক্ষেত্রে স্থানীয়ভাবে বাজার আছে এই রকম উৎপাদন করাই শ্রেয়।

আরও একটি কথা, আগেই বলা হয়েছে, শিল্প স্থাপনে অর্থ লগ্নী দরকার। বর্ধমান জেলায় যে টাকার অভাব আছে তা বলা যায় না।

জেলার বেশীরভাগই কৃষি নির্ভর। উৎপাদিত হয় চাল, চিঁড়ে, সরষে তেল সামান্য এবং কিছু ব্রান অয়েল। মিল প্রতি গড় ২ গাড়ি চাল বিক্রি হয়। একগাড়ি চালের দাম ৮০ - ৯০ হাজার টাকার মত। শুধু শহর বর্ধমানেই মাসে ২০টি রেকে ৪৪০০০ টন সিমেন্ট, সার, পশুখাদ্য, নুন ইত্যাদি আমদানী হয়। জেলায় প্রতিদিনই গাড়ি রেজিস্ট্রেশনের সংখ্যা বাড়ছে। জি.টি.রোড বরাবর বড় বড় গাড়ির শোরুম দেখার মত। অসংখ্য গ্যারেজ। টি.ভি., ফ্রিজ, বস্ত্রের দোকানে ভীড়ের কমতি নেই।

ব্যবসা করতে গেলে বিক্রয় কর দেওয়া প্রয়োজন। সবাই যে রেজিস্টার্ড ডিলার তা নয়। জেলার সামগ্রিক চিত্র বোঝার সুবিধার জন্য ছোট একটি তথ্য দিচ্ছি। যার থেকে বোঝা যাবে বর্ধমানের ব্যবসা বাণিজ্যের সুযোগ বাড়লে অবস্থা কত ভাল হবে।

এখানে আসিস্ট্যান্ট কমিশনার এর অধীনে যে এলাকা তা হল সদর, কালনা, কটোয়া মহকুমা। এই এলাকার মোট রেজিস্টার্ড ডীলারের সংখ্যা ২,৩২৬ এবং বিক্রয় কর গত আর্থিক বছরে আদায় হয়েছে ১৩ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা। ইনকাম ট্যাক্সেও সদর, কালনা, কাটোয়া মহকুমা শহরের যে ইনকাম ট্যাক্স অফিস আছে তার এলাকা একই। এই এলাকায় মোট এ্যাসিসির সংখ্যা ৪১,৪৭৫। জেলা শহরে জীবন বীমার মোট প্রিমিয়াম আদায় হয় প্রায় ৪১ কোটি টাকা। শহরের হেড পোস্ট অফিস থেকেই ক্ষুদ্র সঞ্চয় বাবদ আদায় হয়েছে ২৮৬ কোটি টাকার মত। জেলার ব্যাঙ্কের সংখ্যা ৪০০ পার হয়ে গেছে। এদের ডিপোজিট

ছিল (৯৮-৯৯) ৪০২৩ কোটি টাকা, লগ্নি ছিল ৯৭৮ কোটি টাকা, অর্থাৎ ডিপোজিটের শতকরা ২৪ ভাগ। ১৯৯৯ - ২০০০ সালে ডিপোজিট বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪,৫৮৪ কোটি টাকায়। সে তুলনায় লগ্নি ১,০৮২ কোটি টাকা অর্থাৎ হার কমে দাঁড়িয়েছে শতকরা ২৩ ভাগ। দুঃখজনক ঘটনা, যেখানে নথিভুক্ত বেকারের সংখ্যা ৫৮৯,৯২৬ জন, সেখানে ব্যাঙ্ক বা মানুষের হাতে, ব্যবসায়ে টাকা থাকতেও এমন কোন পরিস্থিতি সৃষ্টি করা যায়নি যেখানে টাকা লগ্নি করার উৎসাহ বাড়ে। একথা যথার্থ, নতুন করে আরেকটা এম.এ.এম.সি, ডি.এস.পি তৈরী করে আগের মত লোক নিয়োগ করা সম্ভব নয়। চাই ক্ষুদ্র শিল্প। বর্ধমানে বিশেষ করে কৃষিভিত্তিক শিল্প চাই , আর চাই ক্রপ প্যাটার্নের পরিবর্তন। চাষের ক্ষেত্রে শুধু ধান বা আলুই নয়, বাজার অনুযায়ী ফসল উৎপাদন করতে হবে। এ বিষয়ে সরকারের কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রেও নতুন হাওয়া আনতে হবে। এবং তা বাজারজাত করার ক্ষেত্রেও উদ্যোগী হতে হবে। যৌথ উদ্যোগে চাষ করে সমবায়ের মাধ্যমে বাজার ধরা যেতে পারে। রাজনৈতিক সদিচ্ছা এক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করতে পারে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য আধুনিক ব্যবসার ক্ষেত্রে এখানে কম্পিউটার জগতের কথা আনা হয়নি। কারণ পশ্চিমবঙ্গে তার ব্যাপকতা বাড়লে বর্ধমানের শিল্প বাণিজ্যেও প্রভাব ফেলবে।

মোট কথা শিল্পের 'রূঢ়' , রাজ্যের 'শস্য ভাণ্ডার' হওয়া সত্ত্বেও কোন ক্ষেত্রেই এ জেলায় সন্তোষজনক অগ্রগতি নেই। আরও পাঁচটা জায়গার মতো পুনর্বিনিয়োগের হার মন্থর, স্বতস্ফূর্ততার অভাব ঘটছে, অর্থ লগ্নিতে মানুষ আতঙ্কিত।

নগরায়ন সমৃদ্ধির লক্ষণ। প্রথম শ্রেণীর ১২ টি শহর গোষ্ঠীর ৫ টি বর্ধমান জেলাতে। পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ শহর গোষ্ঠীর বৃদ্ধি মুখ্যত লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফল। নগর সুলভ সমৃদ্ধি, কার্য সংস্থান, বাসস্থান, রাস্তাঘাট, হাসপাতাল, বিজলী, জলসরবরাহ, শিক্ষা , জলনিকাশী ব্যবস্থার পরিমাণ ও গুনগত মান সামান্য কিছু বাড়লেও শহরগুলি অসহনীয় ভীড়াক্রান্ত, মলিনবস্তিতে পরিণত হচ্ছে। অন্যদিকে গ্রামের কৃষকদের চেতনার বিকাশ ঘটেছে বটে কিন্তু দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মান সেরকম বাড়েনি। বাড়েনি চিকিৎসা ও শিক্ষার সুযোগ। অর্থনৈতিক বাড়বাড়ন্ত সত্ত্বেও এ জেলার মৌলিক সমস্যাগুলির কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। গর্ব করার মতো কিছুই আমরা অর্জন করতে পারিনি। কি নিয়ে বলব, Burdwan is ever prosperous? কিন্তু এরকম হওয়ার কথা ছিল না। স্থায়ী সরকারের সুযোগ, রাজনৈতিক সদিচ্ছা, পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সুফল সব কিছুকে মিলিয়ে যদি সত্যিকারের আন্তরিক পরিকল্পনা গঠিত হত তাহলে বর্ধমান ভারতবর্ষের মানচিত্রে অবশ্যই স্থান করে নিতে পারত।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ

১। পশ্চিমবাংলার ভূমি ব্যবস্থা ও ভূমি রাজস্ব - তারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

২। ভারতবর্ষের কৃষি অর্থনীতি - অশোক রুদ্র

৩। Buddhism is Ancient Bengal – Dr. Puspa Niyogi
৪। ভূমি ব্যবস্থা কংগ্রেস ও কৃষক সভা - মদন ঘোষ
৫। 'পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি গবেষণা', চতুরঙ্গ/মার্চ ১৯৮৭
৬। 'জেলা চিত্র ঃ বর্ধমান' - কলকাতা ২০০০ / এপ্রিল - মে ১৯৮৩
৭। দর্পণে বাংলা - শান্তি কুমার মিত্র
৮। পশ্চিমবঙ্গের নগর সমস্যা - অশোক মিত্র, ২৭ মার্চ ১৯৮২
৯। Fiftyfifth Annual Meeting of the Association of Indian University - Souvenir, 1980
১০। সমবায় চিন্তা, ত্রয়োদশ সংখ্যা
১১। সপ্তপর্ণী - ১৯৮৯
১২। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে বর্ধমান ঃ কল্যাণব্রত ভট্টাচার্য্য, মিউনিসিপ্যাল স্কুল শতবর্ষ স্মরণিকা
১৩। জেলা গেজেটীয়র, ১৯১০ খৃঃ
১৪। Industry in Burdwan
১৫। The Heritage of Burdwan . Agro-Economic Perspectives - Prof. Goutam Kr. Sarkar (1989)
১৬। উদয় অভিযান, যুবমেলা সংখ্যা ১৯৭৩
১৭। জনপদ বর্ধমান, দ্বিতীয় খন্ড, ২০০১
১৮। পশ্চিমবঙ্গ, বর্ধমান সংখ্যা, ১৯৯৭
১৯। শারদীয়া, বর্ধমান সমাচার, ১৪০৬
২০। শ্যামসুন্দর পাল, শ্যামাপ্রসাদ কুণ্ডু, অজিত হালদার প্রণবেশ চক্রবর্তী, অজয় কোনার।

বর্ধমান জেলার কৃষি চিত্র

বিদ্যানন্দ চৌধুরী

ভূমিকা

বর্ধমান পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় বৃহত্তর জেলা। বর্ধমানের সভ্যতা খুবই প্রাচীন। দুর্গাপুরের অন্তর্গত বীরভানপুরের প্রত্নবস্তুর আবিষ্কারের ফলে জানা গেছে, বর্ধমানের সভ্যতা এ অঞ্চলে আর্যদের আগমণের বহু পূর্বের প্রায় ৫০০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের।

জেলার মোট আয়তন ৭০২৪ বর্গ কি.মি. এর মধ্যে কৃষি জমি ৫১০৬ বর্গ কি.মি.। বনভূমি ২৪৩ বর্গ কি.মি., খনি ও শিল্প ১২১৮ কি.মি., অবশিষ্ট অংশ অনাবাদী ও পতিত। সার্বিক বিচারে রাজ্যে বর্ধমান জেলা একটা বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। কৃষি বিষয়ক আলোচনার দুটি দিক। একটি হল - ভূমি স্বত্ব ও ভূমি সংস্কার, অপরটি হল - কৃষি পণ্য উৎপাদন এবং কৃষিপণ্যের যথাযথ ব্যবহার।

জেলার প্রধান ফসল অবশ্যই ধান, তারপরই আলু। এছাড়া গম, তৈলবীজ, যেমন সরিষা, তিল এবং পাট, ইক্ষু, গ্রীষ্মকালীন , বর্ষাকালীন ও শীতকালীন সব্জী ও আনাজপাতি।

জেলার কৃষি জমির প্রকৃতি ও উর্বরতা

জেলার কৃষিজমির মাটি সব জায়গায় একরকম নয়। অঞ্চলভেদে এক একরকম। কোথাও এঁটেল মাটি, কোথাও এঁটেল-দোঁয়াশ মাটি, কোথাও দোঁয়াশ, কোথাও নদী বিধৌত উর্বর পলিমাটি, কোথাও বেলে বা কাঁকুড়ে ল্যাটেরাইট। সারণী-১ এ ব্লক ভিত্তিক কৃষিজমির মাটির গঠন ও প্রকৃতির বিবরণ দেওয়া হল।

সারণী - ১

ব্লকের নাম	মাটির প্রকৃতি	মোট এলাকা (শতাংশ)	মাটির মিশ্রণ	মোট এলাকার (শতাংশ)
১.বর্ধমান সদর	এঁটেল-দোঁআশ	৪৬	এঁটেল - দোআঁশ বেলে - দোআঁশ	৫৪
২. আউশগ্রাম - ১	ঐ	৪০	বেলে, এঁটেল বেলে - দোআঁশ	৬০
৩. আউশগ্রাম - ২	বেলে - দোআঁশ	৩৫	এঁটেল · দোআঁশ এঁটেল	৬৫
৪. ভাতার	এঁটেল - দোআঁশ বেলে - দোআঁশ	৬০	দোআঁশ এঁটেল - দোআঁশ	৪০

৫. গলসী-১,২	এঁটেল	৫৫	এঁটেল - দোআঁশ বেলে - দোআঁশ	৪৫
৬. জামালপুর	এঁটেল	৫৫	এঁটেল - দোআঁশ বেলে - দোআঁশ	৪৫
৭. খন্ডঘোষ	দোআঁশ	৫২	এঁটেল - দোআঁশ বেলে ও এঁটেল	৪৮
৮. মেমারী - ১	ঐ	৬০	ঐ	৪০
৯. মেমারী - ২	বেলে - দোআঁশ	৫০	ঐ	৫০
১০. রায়না -১,২	দোআঁশ, এঁটেল-দোআঁশ	৫৮	ঐ	৪২
১১. কালনা - ১	দোআঁশ	৬০	এঁটেল - দোআঁশ এঁটেল,বেলে-দোআঁশ	৪০
১২. কালনা - ২	গাঙ্গেয় পলিমাটি	৮০	ঐ	২০
১৩. পূর্বস্থলী - ১	ঐ	৮০	ঐ	২০
১৪. পূর্বস্থলী - ২	ঐ	৭৫	ঐ	২৫
১৫. মন্তেশ্বর	এঁটেল - দোআঁশ	৯০	বেলে - দোআঁশ	১০
১৬. কাটোয়া-১,২	এঁটেল - দোআঁশ	৬০	বেলে - দোআঁশ এঁটেল	৪০
১৭. কেতুগ্রাম-১	ঐ	৫০	দোআঁশ, বেলে	৫০
১৮. কেতুগ্রাম-২	ঐ	৬০	ঐ	৪০
১৯. মঙ্গলকোট	ঐ	৮১	এঁটেল,বেলে - দোআঁশ	১৯
২০. ফরিদপুর	এঁটেল - দোআঁশ	৪৮	বেলে - দোআঁশ দোআঁশ	৫২
২১. কাঁকসা	বেলে - দোআঁশ	৫৫	দোআঁশ এবং এঁটেল - দোআঁশ	৪৫
২২. আসানসোল	ল্যাটেরেটিক (কাঁকুড়ে)	৫৫	বেলে - দোআঁশ	৪৫

এছাড়া - বারবানি, হীরাপুর , জামুরিয়া -১,২, কুলটি, সালানপুর, অণ্ডাল, রাণীগঞ্জ এলাকার মাটি মূলত ল্যাটেরেটিক বা কাঁকুড়ে মাটি।

সূত্র ঃ জেলা কৃষিকরণ (১৯৯৯ - ২০০০)

সারণী - ১ দেখা যাচ্ছে জেলার পশ্চিমাঞ্চলের নয়টি ব্লক বাদে বাকি বাইশটি ব্লকের মধ্যে আঠারোটি ব্লক - এঁটেল, দোঁয়াশ, বা এঁটেল-দোয়াঁশ সমৃদ্ধ মাটি। এবং বাইশটির মধ্যে ৪ টি ব্লকে বেলে -দোয়াঁশ মাটি বা বেলে মাটির প্রাবল্য। পূর্বোক্ত আঠারোটি ব্লকের অর্ন্তভুক্ত কালনা - ২, পূর্বস্থলী -১ ও ২নম্বর ব্লক গাঙ্গেয় পলিমাটি সেবিত অধিক উর্বর।

রাজ্যে বর্ধমান জেলার গুরুত্ব এজন্য যে, কৃষি ও শিল্পের সহাবস্থান। জেলার পশ্চিমাঞ্চলে

কাঁকুড়ে ল্যাটেরাইট মাটির কারণে চাষ-আবাদ না হলেও মাটির নীচে রয়েছে অপর্যাপ্ত খনিজ সম্পদ। আবার সেই খনিজ সম্পদের কারণে পশ্চিমাঞ্চল জুড়ে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন ধরনের শিল্প-কারখানা। জমির উর্বরতার কারণে জেলায় মাত্র ৬৫ শতাংশ জমি (মোট জমি -৭০০১০০ হেক্টর, এর মধ্যে চাষযোগ্য জমি ৪৫৫৩০০হেক্টর) চাষ আবাদ করে, রাজ্যের জেলাগুলির মধ্যে বর্ধমান অনেক ফসলেই ফলনে এগিয়ে আছে।

সারণী -২

জেলার নাম	ফসল	জমির পরিমাণ হেক্টর	গড় ফলন কেজি/হেক্টর	মোট উৎপাদন (মেঃ টঃ)
ক)				
বর্ধমান	আউস ধান্য	১২.৬	১৮৩৭	৪৮.৩
হুগলী	ঐ	২৬.৩	১৫৩৪	১৯.৪
মেদিনীপুর	ঐ	৪২.০	৮৯৩	৩৭.৫
মুর্শিদাবাদ	ঐ	৯০.১	১০৪৩	৯৪.১
খ)				
বর্ধমান	আমন ধান্য	৪০২.৯	১৭৩৫	৬৯৯.৬
বীরভূম	ঐ	২১৮.৫	৬৭১	১৪৬.৬
হুগলী	ঐ	১৭৩.৯	১৪৩৭	২৪৯.৪
মুর্শিদাবাদ	ঐ	২০৬.৮	১৫২২	৩১৪.৭
গ)				
বর্ধমান	বোরো ধান্য	৩০.৬	২৬১১	৮০.০
মেদিনীপুর পূর্ব	ঐ	৩৮.০	২৭৯৭	১০৬.২
মুর্শিদাবাদ	ঐ	১৮.৬	২৯২৫	৫৪.৪
হুগলী	ঐ	২৯.৯	২৯৬০	৮৮.৪
নদীয়া	ঐ	২৬.৪	৩১০৫	৮০.৭
ঘ)				
বর্ধমান	গম	২৫.৭	১৫০০	৩৮.৫
মুর্শিদাবাদ	ঐ	১১২.১	১৭৭৩	১৯৯.৯
নদীয়া	ঐ	৪৭.১	১৮১৫	৮৫.৫
বীরভূম	ঐ	৫৮.৫	১৬১৮	১৪৬
ঙ)				
বর্ধমান	আলু	২৫.৫	২৩,৮২৪	৬০৬.৪
হুগলী	ঐ	৩১.১	২৩,৩৩৯	৭২৬.২
হাওড়া	ঐ	১.৯	২১,০৩৮	৪১.০
চ)				
বর্ধমান	সরিষা	১৫.২	৭৩২	১১.১
হুগলী	ঐ	৩ ৩	৬৯৮	২.৩

জেলার নাম	ফসল	জমির পরিমাণ হেক্টর	গড় ফলন কেজি/হেক্টর	মোট উৎপাদন (মেঃ টঃ)
বীরভূম	ঐ	৬.২	৭২৩	৪.৪
বাঁকুড়া	ঐ	৩.০	৬৯৮	২.১
পুরুলিয়া	ঐ	০.৫	৬৯৮	০.৪
ছ)				
বর্ধমান	পাট	১৩.১	৮.৪৮	১১১.২
হুগলী	ঐ	২৮.৫	১১.২৭	৩২১.১
মেদিনীপুর পূর্ব	ঐ	১১.৪	১০.৪৫	১১৮.৮
হাওড়া	ঐ	৪.২	৯.৯২	৪২.১
বীরভূম	ঐ	০.২	৯.৮৭	১.৯

উপরের পরিসংখ্যান মতো গম, বোরো এবং পাট চাষে বর্ধমান জেলার গড় ফলন কম। কিন্তু আমন, আউস, আলু,সরিষার গড় ফলন অন্যান্য জেলা অপেক্ষা বেশী।

জেলা কৃষিকরণের মতে ৮০ - ৯০ দশক অপেক্ষা ১৯৯০ - ২০০০ দশকে পাট ও আমন ধান ছাড়া প্রতিটি ফসলের ক্ষেত্রেই গড় ফলন এবং জমির পরিমাণ অনেক বেড়েছে।

জমির প্রকৃতি, জলবায়ু ইত্যাদি প্রসঙ্গে পাঠক জ্যোতিরিন্দ্র নারায়ণ লাহিড়ির লেখাটি পড়ে দেখতে পারেন।

কৃষিতে সার চাপানের ব্যবহার

জমির উর্বরতা বজায় রাখার জন্য জমিতে সার চাপান প্রয়োগ করা জরুরী, তবে মাটির চরিত্র, জলবায়ু এবং ফসলের প্রকার, বিবেচনা করে তবেই জমিতে সার প্রয়োগ করা উচিত।

মাটির অবস্থা অর্থাৎ মাটির গুণমান পরীক্ষা করার কথা বলা হয়েছে। এবং এই সব বিবেচনা করেই কৃষিবিজ্ঞানী কৃষি জমিতে সুষম সার ব্যবহারের কথা বলেন।

জেলার মাটিতে গাছের পক্ষে গ্রহণযোগ্য জৈব পদার্থ ব্লকওয়ারী বিভিন্ন ধরনের। সমষ্টিগতভাবে জমিতে গ্রহণযোগ্য নাইট্রোজেনের পরিমাণ কম। ফসফেটের পরিমাণ ৫ শতাংশ হতে ৭ শতাংশ এবং পটাশের পরিমাণ মাঝারি ধরনের, প্রায় ৫ শতাংশের কাছাকাছি।

জেলায় সত্তর দশকে সবুজ বিপ্লবের সময় উচ্চ ফলনশীল ধান চাষে অধিক মাত্রায় অপরিকল্পিত নাইট্রোজেন সার ব্যবহার করে তাৎক্ষণিক ফলন বৃদ্ধি পেয়েছিল সত্যি। কিন্তু পরবর্তীকালে এই অপরিকল্পিত নাইট্রোজেন ব্যবহারের ফলে জমির উর্বরতা হ্রাস পায়,

এবং কৃষিতে ফলনের বৃদ্ধির হার কমতে শুরু করে। এবং ক্রমাগত জমিতে চাপান সার হিসেবে নাইট্রোজেনের পরিমাণ (রাসায়নিক সার) বৃদ্ধি করলেও ফসলের উৎপাদন আশানুরূপ বৃদ্ধি হয়নি।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষের বৃহত্তম সার উৎপাদক সংস্থা 'ইন্ডিয়ান ফার্মাস ফার্টিলাইজার কো-অপাঃ লিঃ (ইফ্‌কো), বিভিন্ন কৃষি আলোচনাচক্রে সুষম সারের ব্যবহার সম্পর্কে কৃষককে সচেতন করতে শুরু করে।

রাজ্যের চাষীরা আজও সার সম্পর্কে অজ্ঞ। রাসায়নিক সার বলতে তারা শুধু নাইট্রোজেন বোঝে। সারের ব্যবহারিক নাম ডি.এ.পি. (ডাই অ্যামোনিয়াম ফসফেট) এবং ইউরিয়া। যেখানে জেলার চাষীরা নাইট্রোজেন ব্যবহার করেন ৯.৫ সেখানে ফসফরাস ও পটাশের অনুপাত ২.৭ : ১, অথচ সাধারণভাবে এর অনুপাত হওয়া উচিত, নাইট্রোজেন ৪ : ফসফরাস ২ : পটাশ ১।

রাসায়নিক সার ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে পরিপূরক হিসাবে জৈব সারের ব্যবহার করতে হবে। রাসায়নিক সার ব্যবহারের কারণে জৈব সারের ব্যবহার অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

কম্পোষ্ট - গোবরসার,সবুজ সার হিসেবে কচুরীপানা, অ্যাজোলা, নীলচে সবুজ শ্যাওলা, ধইঞ্চা, শিম্ব জাতীয় সার জমিতে হেক্টর প্রতি ২৫ - ৩০ কিলো নাইট্রোজেন জোগাতে পারে।

রাসায়নিক নাইট্রোজেনের ব্যবহার কমিয়ে মূল সার হিসাবে F Y M ও জৈব সার ব্যবহার করলে জমির উর্বরতা অক্ষুন্ন থাকবে আবার চাষী অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবেন। চাষীদের একটা কথা মনে রাখতে হবে রাসায়নিক নাইট্রোজেনের সঙ্গে পরিমাণ মতো সিঙ্গল সুপার ফসফেট এবং পটাশ - এর ব্যবহার প্রয়োজন আছে। কিন্তু মাটি পরীক্ষা না করে সার ব্যবহার কখনোই বাঞ্ছিত নয়। এতে জমির ক্ষতি হয়।

আশির দশকের তুলনায় নব্বই - এর দশকের শেষে জেলায় রাসায়নিক সারের ব্যবহার অত্যধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। আশির দশকে রাসায়নিক সারের ব্যবহার ছিল নিম্নরূপে

সারণী - ৩

চাষ	নাইট্রোজেন মেঃ টন	ফসফেট মেঃ টন	পটাশ মেঃ টন
খরিফ	১৭০০০	৪০০০	৩৬০০
রবি	২৭,৮০০	১২০০০	৮৯০০
মোট	৪৪,৮০০	১৬০০০	১২৫০০

সূত্র ঃ জেলার বাৎসরিক কৃষি পরিকল্পনা - ১৯৮৪ - '৮৫

নব্বই - এর দশকের শেষে জেলার চাষীরা রাসায়নিক সার ব্যবহারের ক্ষেত্রে সরকারী লক্ষ্যমাত্রার বেশ কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন। জেলার কৃষিকরণ সূত্রে জেলায় রাসায়নিক সারের প্রকৃত ব্যবহার সম্পর্কে যা জানা গেছে ঃ

সারণী - ৪

সার	সরকারী লক্ষ্যমাত্রা মেঃ টন	প্রকৃত ব্যবহার মেঃ টন
নাইট্রোজেন	৭৪০০০	৭০৭৪০
ফসফেট	৩৮০০০	৩৪৯০০
পটাশ	৩৮০০০	৩৪৯০০

সূত্র ঃ জেলা কৃষিকরণ বাৎসরিক পরিকল্পনা ১৯৯৮ - ৯৯

উপরের সারণীতে দেখা যাচ্ছে রাসায়নিক সার ব্যবহারের ক্ষেত্রে চাষী সরকারী লক্ষ্যমাত্রার বেশ কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন - প্রায় নব্বই হতে পঁচানব্বই শতাংশ।

রাসায়নিক সার ব্যবহারে সরকারের নির্দিষ্ট নীতি এবং সেই নীতি রূপায়নে জেলা কৃষিকরণ সচেষ্ট থাকলেও জমির উর্বরতা অক্ষুন্ন রাখার কারণে জৈব সারের ব্যবহারকরণে কৃষি দপ্তর এক রকম নিষ্ক্রিয় বলা যায়। এখন চাষীকে নিজের স্বার্থেই রাসায়নিক সারের সাথে সাথেই জৈব ও সবুজ সারের ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সেচ ব্যবস্থা

কৃষি কর্মে সেচ ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। বর্ধমান জেলায় সেচ ব্যবস্থার উপর নির্ভর করেই চাষের শ্রেণী বিন্যাস ঘটেছে। যেমন খারিফ, রবি, এবং বোরো ও গ্রীষ্মকালীন ফসল।

ক) *খরিফ চাষ* ঃ বর্ষাকালীন , প্রধান ফসল ধান - আউস, আমন এবং কিছু শাক-সব্জী।

খ) *রবি চাষ* ঃ হেমন্ত ও শীতকালীন, প্রধান ফসল - আলু, তৈল বীজ, গম এবং শাক সব্জী। বস্তুতঃ এই সময় শাক-সব্জীর চাষ ব্যাপক ও বৈচিত্র্যপূর্ণ।

গ) *গ্রীষ্মকালীন* ঃ প্রধান ফসল বোরো ধান, গ্রীষ্মকালীন সব্জী।

চাষের জন্যে জলের যোগান অপরিহার্য একথা আমরা সকলেই জানি। এইবার কোন চাষে জলের যোগান কিভাবে হয় সেটা নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক।

কৃষিক্ষেত্রে মূলতঃ আকাশ বৃষ্টি ও সেচ ব্যবস্থা দ্বারা জল সরবরাহ করা হয়। আকাশ বৃষ্টি প্রকৃতি নির্ভর - এটা নিয়ে কোন আলোচনা করবার সুযোগ নেই।

তাহলে সেচ ব্যবস্থা, যা মানুষ নিজ প্রয়োজনে নিজে যোগান দেয়। এখানে ' নিজ' বা স্বয়ং শব্দটির অর্থ বহুধা।

জেলায় সেচ ব্যবস্থা চালু হয়েছে - সেচ খাল বা ক্যানেল, ডীপ টিউবওয়েল বা গভীর

নলকূপ, রিভার লিফটিং বা নদী হতে জল উত্তোলন। শ্যালো ও সাবমার্শিবল পাম্প এবং সেচ পুকুর হতে।

জেলা কৃষিকরণ হতে পাওয়া তথ্যতে দেখা যাচ্ছে আজ পর্যন্ত ক্যানেল দ্বারা কৃষি ক্ষেত্রে সেচের জন্য জলের যোগান দেওয়া হয় মোট সেচের চল্লিশ শতাংশের কিছু বেশী। অর্থাৎ প্রায় আটান্ন শতাংশের কাছাকাছি কৃষিতে জলের জন্য অন্যান্য সেচ ব্যবস্থার উপর চাষীকে নির্ভর করতে হয়।

যে বহুমুখী পরিকল্পনা নিয়ে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন (সংক্ষেপে ডি.ভি.সি.) গঠন করা হয়েছিল, কার্যক্ষেত্রে তার ন্যূনতম কাজটুকুও রূপায়ন করা হয় নি। সেচের জল দেবার জন্য দামোদরের দক্ষিণ দিকে ৮৯ কিঃমিঃ প্রধান খাল বা ক্যানেল এবং বামদিকে ১৩৭ কিঃ মিঃ প্রধান ক্যানেল এবং ২২৭০ কিঃ মিঃ শাখা ক্যানেল করা হয়েছে ১.৯ লক্ষ এবং ৬.২৫ লক্ষ একরে (ডানদিক ও বাঁদিক যথাক্রমে) বা মোট ৮.১৫ লক্ষ জল দেবার জন্য। বাস্তবে গ্রীষ্মে জল দেওয়া হয় মাত্র ১ লক্ষ একরে।

(সূত্র ঃ ড. বাসুদেব দে ঃ ' নিম্ন দামোদর অঞ্চলে ভাঙন, প্লাবন ও জলমগ্নতার কারণ' অভিযান সাময়িকী - এপ্রিল -২০০০)

ডি.ভি.সি-র পরিকল্পনার এই ব্যর্থতা শুধু সেচ ব্যবস্থার নয়, অন্য যে প্রধান শর্ত ছিল নিম্ন দামোদর অঞ্চলে বন্যা নিয়ন্ত্রণে ডি.ভি.সি. কর্তৃপক্ষের কোন উদ্যোগই নেই। ডি.ভি.সি. কর্তৃপক্ষ যতদিন না প্রস্তাবিত সাতটি ড্যামের বাকী তিনটি ড্যাম (যথাক্রমে আয়ার, বোকারো ও বেলপাহাড়ি) নির্মাণ করছেন, দুর্গাপুর ব্যারেজ সময় মত ড্রেজিং না করছেন, এবং দামোদর নদের অববাহিকায় বসবাসকারী মানুষদের কথা সহানুভূতির সঙ্গে চিন্তা না করছেন, ততদিন বছর বছর বন্যা হতেই থাকবে। এই সঙ্গে কৃষিক্ষেত্রে সেচের জলের যোগান অপর্যাপ্ত থাকবে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির উষালগ্নে ১৯৪৮ সালের ২০ শে ফেব্রুয়ারী জওহরলাল নেহেরু বলেছিলেন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে এগিয়ে যাবার কথা। কিন্তু স্বাধীনতা প্রাপ্তির অর্ধ শতবর্ষ কবেই অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, সহযোগিতা তো দূরের কথা - কেন্দ্র ও রাজ্যসরকারগুলির সম্পর্ক আজ অহি-নকুল সদৃশ। কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরে কৃষিতে এই অব্যবস্থার কারণে সেচের ব্যবস্থা চাষী এখন নিজে নিজেই করে নিতে বাধ্য হচ্ছেন। আজ ক্যানেল সেচ ছাড়াও চাষী বিভিন্ন ধরনের নলকূপ, জলাশয়, নদী হতে জল উত্তোলন করে কৃষিকার্যে ব্যবহার করছেন।

জেলা কৃষিকরণ হতে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী ১৯৯৯ - ২০০০ সালের কৃষিকার্যে সেচের সামগ্রিক একটা চিত্র দেওয়া হ'ল।

সারণী - ৫

জলের উৎস	সেচ ব্যবস্থার সমস্যা	প্রকৃত সেচ ব্যবস্থা	কোন ফসলে কত হেক্টর জমিতে সেচ হয়			
			খরিফ	রবি	গ্রীষ্ম	মোট
১.ক্যানেল (ডি.ভি.সি. ময়ুরাক্ষী)	২	২	২৫০	১০	৩৫	২৯৫
২. ডীপ-টিউবওয়েল	৫০৮	৫০৮	১১	৮১	৬	৯৮
৩. রিভার লিফ্‌টিং	২৬৫	২৩৬	১১	৬	৬	২৩
৪. শ্যালো, সাবমার্শিবল	–	৩১,৯৭০	৫০	৮৪	৬৩	১৯৭
৫. পুকুর, জলাশয়	–		৩০	৯৯	৪০	১৬৯

বর্ধমান জেলায় খরিফ চাষে বর্ষার বৃষ্টির একটা বড় ভূমিকা আছে। এমন অনেক এলাকা আছে, যেখানে আজও ক্যানেলের জল কৃষিক্ষেত্রে পৌঁছায় না। ফলে ঐ সব এলাকায় খরিফ চাষে আবাদের জন্য বর্ষাকালীন বৃষ্টির জলের উপর চাষীর আবাদ নির্ভরশীল। কিন্তু এই প্রকৃতিদত্ত বৃষ্টির জল আবাদের কাজে খুব একটা নির্ভরযোগ্য নয়। গত দশ বছরের বৃষ্টিপাতের সারণীতে চোখ বোলালেই বিষয়টি পরিষ্কার বোঝা যায়।

জেলায় স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ হ'ল - ১৪৪০ মিলিমিটার হতে ১৫০০ মিলিমিটার।

সারণী - ৬

সাল	বৃষ্টিপাত (মিঃ মিঃ)	মন্তব্য
১৯৮৯	১২৩৯	ঘাটতি
১৯৯০	১৭২৩	অতিবৃষ্টি
১৯৯১	১৪২৩	স্বাভাবিক
১৯৯২	৯৭৫.১	খরা
১৯৯৩	১৪২৪.৬	স্বাভাবিক
১৯৯৪	১১১০.৩	ঘাটতি
১৯৯৫	১৪০৭.৭	স্বাভাবিক
১৯৯৬	১৩১৪.৫	ঘাটতি
১৯৯৭	১৭৫০.৬	অতিবৃষ্টি
১৯৯৮	১২৪৯.১	ঘাটতি

সূত্র ঃ জেলা কৃষিকরণ

উপরের সারণী হতে পরিষ্কার যে, গত দশ বছরে জেলায় যে বৃষ্টিপাত হয়েছে, তার মধ্যে চার বছর ঘাটতি বৃষ্টিপাত, এক বছর খরা, দুই বছর অতিবৃষ্টি, একমাত্র তিন বছর স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত। কাজেই চাষী তার সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে কৃষিক্ষেত্রে সেচের ব্যবস্থা নিজেই করতে বাধ্য হন।

উৎপাদন

ফসল উৎপাদন প্রক্রিয়া অর্থাৎ চাষ আবাদের ক্ষেত্রে গত পঞ্চাশ বছরে আধুনিকতা বা যান্ত্রিকতা এসে গেছে। দিল্লীর স্কুল অফ্ ইকনমিক্সের শিক্ষক বি.এম.ভাটিয়া একটি প্রবন্ধে লিখেছেন ঃ With the rapid stride made by the industrial and service section in the country over the last 50 years, agriculture still remains a leading section of Indian economy. It accounts for 28 percent of Annual national income, and employs 68 percent of the active labour force.....

..... The Indian farmers today produce more for the market than for domestic conjunction . The growth rate of food crops over the last 50 year has been 2.66 per cent annually while commercial crops have shown 4.5 to 5 per cent annual growth rate over the period.
Source : 'THe Statesman 22.01.2001'.

ভারতীয় অর্থনীতিতে শিল্পের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে কৃষি ক্ষেত্রে অগ্রগতি লক্ষ্যণীয়। গত পঞ্চাশ বছরের উপর খাদ্য শস্যের বাৎসরিক উৎপাদন ২.৬৬ শতাংশ বৃদ্ধি পয়েছে। এবং কৃষিজ বাণিজ্যিক পণ্যের বৃদ্ধির হার বাৎসরিক ৪.৫- ৫ শতাংশ পর্যন্ত।

কৃষি পণ্যের উৎপাদন কিন্তু সব রাজ্যে সমান নয়। পাঞ্জাব, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র,কর্ণাটক - এইসব রাজ্যে একরপ্রতি গড় ফলন পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় অনেক বেশী। এর মূল কারণ এ রাজ্যে ছোট ছোট ক্ষেত এবং রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার জন্য ঘনত্ব ইত্যাদি। পশ্চিমবঙ্গের উর্বর মাটির সুফল কৃষকরা একশো শতাংশ নিতে পারছেন না - বর্ধমান জেলা ও তার ব্যতিক্রম নয়। (সারনী - ৭)

সারণী অনুসারে ১৯৮১ - ৮২ সালের তুলনায় ১৯৯৩ - ৯৪ সালে আমন ছাড়া সব ফসলেরই মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বৃদ্ধি কিন্তু সময় এবং প্রযুক্তির কথা ভাবলে আশাপ্রদ নয়। ১৯৮৬ - ৮৭ সালে যেখানে ফসলের আবৃতি (Croping intensity)ছিল ১৪৮%, ১৯৯০ - ৯৪ সালে সেই আবৃতি দাঁড়িয়েছে ১৬৫%। অর্থাৎ বৃদ্ধি মাত্র ১৭ শতাংশ। আর একটা কথা, আউস, আমন এবং আলু চাষের মোট এলাকা তেমন বৃদ্ধি পায় নি, তবে গত পাঁচ বছরে বোরো চাষের এলাকা বেড়েছে ব্যাপকভাবে। এবং বোরো চাষের মোট উৎপাদন বৃদ্ধির কারণেই ফসল আবৃতির (Croping intensity) লক্ষ্য ঘোষিত হয়েছে ২০০ শতাংশ। লক্ষ্যমাত্রা যাই হোক তা পূরণ করা নিয়ে সমস্যা আছে। এই সমস্যাগুলি (যেমন পর্যাপ্ত সেচ, সার্টিফায়েড বীজ, রোগ ও পোকার হাত থেকে ফসল রক্ষা , যান্ত্রিক প্রযুক্তির প্রয়োগ এবং ন্যায্য মূল্যে ফসল বিপণন সহ সংরক্ষণ) সমাধান করতে সরকারী সক্রিয়তা প্রয়োজন।

সারণী

সাল	মোট কত পরিমাণ জমিতে চাষ হয়েছিল হাজার হেক্টরে				উৎপাদনশীলতা (প্রতি কেজি / হেক্টরে)				ফসল আবৃতি
	আউস	আমন	বোরো	আলু	আউস	আমন	বোরো	আলু	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)
১৯৮১ থেকে ৮২	২৩.৮	৪৩৫.৩	৩৩.৯	২৬.৯	১৮২৪	১৩৪৪	২৩৭১	২০৯৯৩	পাওয়া যায়নি
১৯৮৬ থেকে ৮৭	২৫.৪	৩৯২.৯	১০৫.৭	৩০.৬	১৮৫৪	২১৪৩	২৮৬৫	২১৭৬৮	১৪৮ শতাংশ
১৯৯০ থেকে ৯৪	৩৩.৯	৪১৬.৯	১৫৮.৮	৩১.৯	২৫২২	২৫৩৬	৩২০৭	২৮৫৭৭	১৬৫ শতাংশ

সূত্র – স্তম্ভ ১ থেকে ৯ জেলা পরিসংখ্যান হাত পুস্তিকা বই   স্তম্ভ ১০ জেলা পরিকল্পনা কমিটি প্রকাশিত

সারণী - ৮

ফসলের নাম	১৯৯৯ - ২০০০ (হেক্টর)	জেলা - বর্ধমান
আমন	৪০৯৫০৫	২.৭৬৩ মেঃ টন
আউস	৩৭৬৭৫	২.৮৭৭ মেঃ টন
বোরো	১,৮৮,৯২১	
গম	১২৮৯০	২৪৫০কিলোগ্রাম
আলু	৬৩৬১৬	২৫.০০০ মেঃ টন
তৈল বীজ	৪৯৫০০	৮৮০ কিলোগ্রাম

সূত্র ঃ জেলা কৃষিকরণ।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকে গত পঞ্চাশ বৎসরের অধিক কাল ধরে এই রাজ্যে জেলায় জেলায় যে কৃষি পরিকাঠামো সরকারী স্তরে গড়ে উঠেছে - বর্ধমান জেলায় তার অবস্থান নিম্নরূপ ঃ

কৃষি পরিকাঠামো (Agri cultural Infrastructure)

১)	সরকারী ফার্ম ঃ		
	জেলা বীজ খামার	-	২ টি
	স্টেট ফার্ম	-	১ টি
	ব্লক বীজ খামার	-	১৪ টি
	মডেল ফার্ম	-	১ টি
	সার রিসার্চ ফার্ম	-	৩ টি
২)	ফিল্ড ক্রপ রিসার্চ সেন্টার	-	১ টি
৩)	এগ্রিকালচারাল রিসার্চ সেন্টার	-	১ টি
৪)	সয়েল টেস্টিং ল্যাবরেটরী	-	২ টি
৫)	বীজ পরীক্ষাগার	-	১ টি
৬)	বীজ সার্টিফিকেশন এজেন্সী	-	১ টি
৭)	ফ্রুট প্রসেসিং কাম ট্রেনিং সেন্টার	-	১ টি
৮)	খাদ্য শস্য সংরক্ষণ কেন্দ্র	-	১ টি
৯)	কোল্ড স্টোরেজ	-	৭৯ টি

Annual plan on Agriculture 2000 - 2001.

বিপণন

জেলায় উৎপাদিত শস্যের বিপণন ব্যবস্থা কিন্তু সু-সংগঠিত নয়। ফলে ফসলের মূল্য নির্ধারণে কৃষকের কোন ভূমিকা নেই। ভূমি সংস্কার এবং বর্গা রেকর্ডের কারণে সম্পন্ন চাষীর জমির সিলিং কমে যাওয়া এর অন্যতম মূল কারণ। বর্গা এবং সিলিং বহির্ভূত জোত

সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ এবং ভূমিহীন চাষীদের বিলিকরণের ফলে চাষীর সংখ্যা বেড়েছে। কিন্তু এই সকল ক্ষুদ্র চাষীরা সঙ্গতি হীন, ফলে এঁরা কৃষিতে সেভাবে আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ করতে পারেন না। ফলে কোন রকমে ধার দেনা করে যে ফসলটুকু উৎপাদন করেন, ফসল তোলার পরই সেই ফসল বাজার অপেক্ষা অনেক কম দামে বিক্রি করতে বাধ্য হন।

জেলায় প্রধান ফসল ধান এবং আলু। ছোট চাষীরা ধান রাইস মিলে বিক্রী করতে পারেন না। তাঁরা বাধ্য হয়ে গ্রামে গঞ্জে স্থানীয় আড়তে অভাবী বিক্রী করতে বাধ্য হন, বাজারে কোন রকম প্রতিযোগিতা না থাকায়। আর সরকারী অদূরদর্শিতার কারণে গত ৬/৭ বছর আলু চাষীরা সর্বস্বান্ত হয়েছেন। আলু সংরক্ষণ এবং বিপণনের কোন সরকারী নিয়মনীতি না থাকায় চাষী এখন মাঠেই ফসল তুলে নাম মাত্র দামে বিক্রি করে বাড়ি ফিরে আসেন। এই ডামাডোলে গত পঁচিশ বছরে নতুন করে মহাজনের পরিবর্তে ফড়ে ও আড়ৎ দার সমাজ গ্রামে গঞ্জে নতুন করে গড়ে উঠেছে বা উঠছে। এঁরা প্রভূত অর্থ আয় করছেন ক্ষুদ্র চাষীদের অভাবের সুযোগে।

বর্ধমান জেলা রাজ্যের শস্যভাণ্ডার হলেও আজ বাজারে বহিরাগত ফসলের প্রাচুর্য। জেলার চাষ ও চাষীকে রক্ষা করার জন্য সরকারী কোন উদ্যোমই চোখে পড়েনা। যার ফলে জেলার সমগ্র বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে রাইসমিল মালিক, হিমঘর কর্তৃপক্ষ, আড়ৎদার এবং ফড়ে শ্রেণী। এখানে চাষীর কোন ভূমিকাই নেই। জেলায় ফসল বিপণনের জন্য যে পরিকাঠামো দরকার তা নেই।

সারণী ঃ ৯

১) রেগুলেটেড মার্কেট	-	২ টি
২) হোলসেল মার্কেট	-	১৪ টি
৩) প্রাইমারী মার্কেট	-	৩৫ টি
৪) রিটেল মার্কেট	-	১৯০ টি

সূত্র ঃ কৃষির বার্ষিক পরিকল্পনা ২০০০ - ২০০১ ঃ জেলা কৃষিকরণ।

জেলার ২৮৩১ টি মৌজার (গ্রাম - ২৬৭৯ টি) উৎপাদিত ফসলের বিপণন ও সংরক্ষণ ব্যবস্থার যে চিত্র উপরে আলোচনা করা হয়েছে, তা মোটেই আশাপ্রদ নয়। ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তা ক্রয় বিক্রয়ের পর্য্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকলে অসাধু ব্যবসায়ীরা চাষীকে স্বল্প মূল্যে ফসল বিক্রয়ে বাধ্য করবে - এটাই ঘটনা।

কৃষিজ তথ্য

১) ভৌগোলিক আয়তন	- ৭,০২,৮০০ হেক্টর
২) অকৃষি জমি	- ১,৭৮,৭৩৭ হেঃ
৩) বনভূমি	- ২৮,৭৮১ হেঃ

৪) কৃষি অযোগ্য জমি	-	৪,১২০ হেঃ
৫) তৃণভূমি	-	১৮৮ হেঃ
৬) বাগান	-	৫,৬৫২ হেঃ
৭) কৃষিযোগ্য পতিত জমি	-	৩,৫২৩ হেঃ
৮) বর্তমানে পতিত	-	৭৩৪৬ হেঃ
৯) কৃষিযোগ্য জমি	-	৪,৭৪,৪৫৩ হেঃ
১০) একবারের বেশী চাষ হওয়া জমি	-	৩,৮৭,৩৫৬ হেঃ
১১) মোট কৃষি জমি	-	৮,৬১,৮০৯ হেঃ
১২) শস্য উৎপাদন হার	-	১৮১.৬৪ শতাংশ

বীজ

চাষ আবাদে স্বাভাবিক ফলন পেতে হলে অবশ্যই নীরোগ ও পুষ্ট বীজ প্রয়োজন। আমাদের রাজ্যের চাষীরা অধিকাংশই সাধারণতঃ জমিতে উৎপন্ন ফসল হতে পরের মরসুমের জন্য বীজ সংগ্রহ করে রাখেন। এই পদ্ধতি কিন্তু বাস্তবোচিত নয়। ভাল ফলন পেতে ভাল বীজ প্রয়োজন। এখানে কোন আপোষ করা উচিত নয়। তবে উন্নত মানের ভাল বীজ পাওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার। জেলা সদর বর্ধমানে যে সব বীজ বিক্রয় হয় তার অনেকাংশ বিশ্বাসযোগ্য নয়। বিভিন্ন রাজ্য যেমন, মহারাষ্ট্র, উড়িষ্যা, অন্ধ্র, পঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্যের লেবেল সাঁটা যে বীজ বর্ধমানের বাজারে বিক্রয় হয় সেগুলি নিম্নমানের। এই বিষয়ে লেখকের নিজস্ব অভিজ্ঞতা খুবই খারাপ। এই জেলার কতিপয় অসাধু ব্যবসায়ী চক্র এই জঘন্য প্রতারণার সঙ্গে জড়িত।

চাষীকে এই বীজ সমস্যা হতে উদ্ধার করতে সরকার সক্রিয় না হলে, ঐ দুষ্ট চক্রকে দমন করা সম্ভব নয়।

বীজ সম্পর্কে সরকারের মূল্যায়ন ও নীতি সরকারী বয়ানেই জানা যাচ্ছে। ১৯৯৯ - ২০০০ সালে যেখানে বেসরকারী সংস্থা ২২৫০ মেট্রিক টন ধান্য বীজ সরবরাহ করেছিল, সেখানে সরকারকৃত বীজের পরিমাণ ৮৫০ মেট্রিক টন মাত্র। যেহেতু চাহিদার সঙ্গে সরকারী যোগানের এই যে বিশাল ঘাটতি, এই ঘাটতি পূরণ করার জন্যই বেসরকারী বীজ সরবরাহকারী সংস্থার উপর সরকার নির্ভরশীল। কিন্তু সরকারী এবং বেসরকারী সংস্থা ভিত্তিক যৌথভাবে উৎপাদিত মোট বীজ মোট প্রয়োজনের অনেকটাই পূরণ করতে পারেনা। ফলে সেই ঘাটতির সুযোগ নেয় কিছু অসাধু ব্যবসায়ী।

জেলা কৃষিকরণের বার্ষিক (২০০০ - ২০০১) পরিকল্পনায় বলা হয়েছে, *"Seed is an important constituent of current strategy of input in Agricultural production . The increasing relience on use of quality seed alone can enhance 10 to 20 per cent crop production. .....*

The quantum of quality seeds produce in the district is not adequate enough to cater the needs of farmers. Samabay Krishi Unnayan Samities and farmers are being encouraged by the extension agencies to extend their hands of Co-operation in undertaking the quality seed production programme in the district and also to use certified seeds in their Farms for better production.

উপরের বয়ানে পরিষ্কার ভাল ফলন পেতে হলে ভাল অর্থাৎ কোয়ালিটি বীজ প্রয়োজন। আবার এই সব কোয়ালিটি বীজ সরবরাহ করবে বিভিন্ন সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি, বেসরকারী সংস্থা এবং তৎসহ সরকারী, আধা-সরকারী সংস্থা।

সারণী - ১০

শস্য	১৯৯৯ - ২০০০সালে সরবরাহকৃত শংসিত বীজের পরিমাণ(মে. ট.)		শংসিত বীজ সরবরাহের লক্ষ্যমাত্রা (২০০০ - ২০০১) (মে. ট.)	
	বেসরকারী	সরকারী	বেসরকারী	সরকারী
ধান	২২৫০	৮৫০	২৫০০	৯৫০
গম	৪৫০	৩০০	৯০০	৪০০
তৈলবীজ	৪০	২০	৫০	৩০
ডাল	৩০	১৫	৩৫	২০
আলু	৬৫০	১৫০	৮০০	৩৫০

Source : Annual Plan on Agriculture 2000 - 2001, Dist. Burdwan.

Plant Protection Chemicals

Plant Protection Chemicals have been deemed as one of the important inputs for sustaining the productivity and production of different crops. To avoid indiscriminate use of P.P.Chemicals causing human and animal health hazards, ecological imbalance and resistance to pesticides etc. The unique system of post Management popularly known as " INTEGRATED PEST MANAGEMENT" (IPM) scheme have in operation for the last two decades in 6 blocks of the district for controlling the pest population in major crops. The farmers awareness is made in application of P.P.Chemicals only as preventive measures at critical condition except which the yield level may decline below the thres hold level. However the quantum of pesticides consumed during 1999 - 2000 and a target for 2000 - 2001 are placed below.

A) Consumption of Pesticides & Target For 2000 - 2001.		
Pesticides.	Consumption during 1999 - 2000 in MT/KL	Target requirement for the year 2000-2001 in MT/KL
1. Seed Treating Chemicals	30	40
2. Insecticide (Liquid)	285	250
3. - Do - (W.P.) & Fungicide (W.P.)	465	400
4. Insecticide (Dust)	180	200
5. Insectiside (Granule)	400	450
6. Weedicide	1100	1000

B) Quality Control :

Regular strict vigilance is kept on the quality of different pesticides sold in the market. The pesticide inspectors are drawing pesticide samples on regular basis as a routine and statutory work and got those samples tested in the notified laboratory. Actions are taken in accordance with the provision of the INSECTICIDE ACT in case of stock / sale of MISBRANDED Materials.

Consumption of Technical Grade of pesticides (in M.T)

1999 - 2001 Target for 2000 - 2001

730 MT. 600 MT. In pursuance of Principle of Ind

Target of Soil Seed Fertiliser Block wise.			
	Soil Sample	Seed Sample	Fertiliser Sample
Burdwan	220	6	8
Ausgram -I	220	6	8
Ausgram - II	220	6	8
Bhatar	220	6	8
Galsi - II	220	6	8
Jamalpur	220	6	8
Khandoghosh	220	6	8
Memari - I	220	6	8
Memari - II	220	6	8
Raina - I	220	6	8
Raina - II	220	6	8
Total	2420	66	88
Kalna - I	220	5	8
Kalna - II	220	5	8

Purbasthali - I	*220*	*5*	*8*
Purbasthali - II	*220*	*5*	*8*
Monteswar	*220*	*5*	*8*
Total	*1100*	*25*	*40*
Katwa - I	*220*	*5*	*8*
Katwa - II	*220*	*5*	*8*
Ketugram - I	*220*	*5*	*8*
Ketugram -II	*220*	*5*	*8*
Mongalkote	*220*	*5*	*8*
Total	*1100*	*25*	*40*
Faridpur	*210*	*5*	*8*
Kanksa	*210*	*5*	*8*
Asansol	*210*	*5*	*8*
Galsi - I	*210*	*5*	*8*
Barabani	*210*	*5*	*8*
Hirapur	*210*	*5*	*8*
Jamuria - I	*210*	*5*	*8*
Jamuria - II	*210*	*5*	*8*
Kulti	*210*	*5*	*8*
Salanpur	*210*	*5*	*8*
Andal	*210*	*5*	*8*
Raniganj	*210*	*5*	*8*
Total	*2520*	*60*	*96*
Dist. Total	***7140***	***176***	***264***

Source : District Annual Plan in Agriculture

কৃষি শ্রমিক

চাষ আবাদের ক্ষেত্রে শ্রমিক ও তার শ্রম অন্যতম প্রধান উপাদান। জেলার চাষযোগ্য ৪,৫৫,৩০০ হেক্টর জমিতে চাষ-আবাদ ও ঝাড়াই, বাছাই গোলাজাত করার কাজে বিশাল সংখ্যক শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। কিন্তু এই শ্রমিকের প্রকৃত সংখ্যা কোনভাবেই পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ চাষ-আবাদ বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকারের এবং ফসলের প্রকৃতি অনুসারে শ্রমিক সংখ্যার তারতম্য ঘটে। তাছাড়া জেলার স্থায়ী। কৃষি শ্রমিক ছাড়াও পার্শ্ববর্তী জেলা যেমন, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং বিহারের দুমকা জেলা হতে বিশাল সংখ্যক কৃষি শ্রমিক বর্ষাকালীন ও গ্রীষ্মকালীন (বোরো) চাষ করার সময় এবং ফসল তোলার সময় জেলার বিভিন্ন ব্লকে ব্লকে ছড়িয়ে পড়ে, এই বিশাল সংখ্যক বহিরাগত অসংগঠিত শ্রমিক সম্প্রদায়ের কোন হিসাব নেই।

তবে পঃ বঃ সরকারের Statistical Appendix - এর (১৯৯৮ -৯৯) অর্থনৈতিক পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে মোট জন সংখ্যার ২১.১৪ শতাংশ চাষী এবং ২৯.৭৬ শতাংশ

কৃষি শ্রমিক (১৯৯১ সাল) গত দশ বছরে চাষ আবাদ এবং চাষের এলাকা বৃদ্ধি (বিশেষ করে বোরো ধান এবং তৈল বীজ) পাওয়ার কারণে কৃষি শ্রমিকের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে - এটাই অনুমান।

কৃষি শ্রমিকের মজুরী

এই বিশাল সংখ্যক কৃষি শ্রমিক এদের জেলা ভিত্তিক নির্দিষ্ট কোন মজুরী নেই। এবং সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত কোন মজুরী থাকলেও কোন অঞ্চলেই তা মানা হয় না। সাধারণতঃ রাজনৈতিক লাভ ক্ষতির হিসাব করে গ্রামীণ নেতারা মজুরী স্থির করেন। এই মজুরীর হার ব্লক ভিত্তিক বা অঞ্চল ভিত্তিক নয়, একবারে গ্রাম ভিত্তিক। যেমন একজন কৃষিশ্রমিক দৈনিক খোরাকি হিসাবে দু'কিলো গ্রাম চাল (প্রায় ক্ষেত্রে এটা নির্দিষ্ট) এবং পঁচিশ টাকা হতে ত্রিশ টাকা মজুরী হিসাবে পেয়ে থাকে। যে সব গ্রামে মাঝারি জোতের মালিকের সংখ্যা বেশী এবং মালিকেরা সংগঠিত সেইসব গ্রামে মজুরীর হার স্বভাবতই কম। আর যে গ্রামে ছোট ছোট জোতের মালিকের সংখ্যা বেশী, এবং এই সব জোতের মালিক নিজেই শ্রমিক - এই সব গ্রামে শ্রমিকের মজুরী বেশী।

জেলা ভিত্তিক না হলেও অন্ততঃ ব্লক, নিদেনপক্ষে অঞ্চল ওয়ারী মজুরী এক করার লক্ষ্যে পঞ্চায়েতের সক্রিয় সহযোগিতা প্রয়োজন। রাজ্যের ত্রিস্তর শাসন ব্যবস্থার দ্বিতীয় স্তর অঞ্চল পঞ্চায়েতকে পাশ কাটিয়ে কোন সংগঠনের এককভাবে কোন মজুরী নীতি নির্ধারণ করা উচিত নয়।

বনসৃজন ও সবুজায়ন

বর্ধমান জেলার ভৌগোলিক আয়তন ৯০২৪ বর্গ কিমি. বা ৯০২৪০০ হেক্টর। এর মধ্যে ২৪৩ বর্গ কিমি. বা ২৪৩৩৭ হেক্টর হল বনভূমি।

ভারতবর্ষে জনসংখ্যার নিরিখে মাথাপিছু বনের পরিমাণ ১২ হেক্টর, সেখানে পশ্চিমবঙ্গে মাথাপিছু বনের পরিমাণ মাত্রই ০.০২ এবং বর্ধমান জেলায় এর পরিমাণ ০.০০৫ হেক্টর।

(সূত্র ঃ 'পশ্চিমবঙ্গ' বর্ধমান জেলা সংখ্যা ঃ ১৪০৩, পৃষ্ঠা ঃ ২১৮)

অথচ পরিবেশ সুরক্ষা, আবহাওয়ার ভারসাম্য রক্ষার জন্য সবুজায়ন ও বনসৃজন আশু প্রয়োজন। ভূমির ক্ষয় রোধ, গবাদি ও পশুখাদ্যের যোগান, কাগজ শিল্পের জন্য আমরা বনজ সম্পদের মুখাপেক্ষী। এছাড়া গ্রামীণ শ্রমজীবি মানুষরা জ্বালানীর জন্য বনজ গাছ পালার উপর নির্ভরশীল। এই কারণে বনজ সম্পদের অপ্রতুলতা দূর করতে ১৯৮১ সালে বিভিন্ন ধরনের সরকারী বেসরকারী পতিত জমিতে সমাজ ভিত্তিক বনসৃজন প্রকল্প রূপায়নের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

'......বর্ধমান জেলায় এই কাজে সহায়তা করতে ১৯৮২ সালের ১ জুলাই দুর্গাপুর সমাজভিত্তিক বনসৃজন বিভাগ যুগ্মভাবে বর্ধমান জেলায় বনসৃজন প্রকল্প রূপায়িত করছে। বর্ধমান বনবিভাগ বিশেষভাবে বনভূমি এলাকায় নিয়োজিত। অপরদিকে দুর্গাপুর সমাজভিত্তিক বনসৃজন বিভাগ বনভূমির বাইরে যথা পথপার্শ্বে, ক্যানেল ও নদী পাড়ে , রেললাইনের ধারে এবং ব্যক্তিগত অব্যবহৃত জমিতে বনভূমির সম্প্রসারণ ও পরিবেশ রক্ষায় নিয়োজিত।'

(সূত্র ঃ- 'পশ্চিমবঙ্গ' বর্ধমান সংখ্যা ১৪০৩, পৃষ্ঠা ঃ ২১৮)

উপরের এন. ভি রাজশেখরের লেখাটুকু পড়লে মনে হয়, সরকার সর্বাত্মকভাবে সচেষ্ট বনসৃজন ও পরিবেশ রক্ষায় ও সবুজায়নে। কিন্তু বাস্তবের সঙ্গে নীতির গভীর ফারাক।

আশির দশকের প্রথম দিকে বিভিন্ন রাজপথের দু'পাশে, ক্যানেলের বাঁধের দু'ধারে প্রচুর গাছ লাগানো হয়। মূলতঃ ইউক্যালিপটাস্, সোনাঝুড়ি, জ্যাকারাণ্ডা, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া গাছের প্রাধান্য ছিল। এছাড়া বাবলা, শিরিষ, অর্জুন, নিম গাছও কোথাও কোথাও লাগানো হয়েছিল। বিভিন্ন পঞ্চায়েতের সাহায্যে এলাকাভিত্তিক এই বৃক্ষরোপণ এবং পরিচর্যা ও দেখভাল করা হত। কিন্তু দশ বারো বছর পর, অর্থাৎ নব্বুই এর দশকে এই সব বৃক্ষ ছেদন করে রাজপথ, ক্যানেলের বাঁধের দু'ধারে বৃক্ষ শূন্য করে দেওয়া হয়। এমনই একটি রাজপথ বর্ধমান হতে গুসকরা - সিউড়ী রোড, এমনই ক্যানেলের বাঁধ - ডি.ভি.সি. -র ওড়গ্রাম হতে শালকুনি, কাশীপুর, শ্রীপুর, এরুয়ার হয়ে মঙ্গলকোটের ন-পাড়া । এই ক্যানেলের বাঁধে এবং সিউড়ী রোডের দু'ধারে ঘন গাছপালা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। আজ ঐ সব অঞ্চল বৃক্ষ শূন্য। মাঠের পর মাঠ - কোথাও কোন বৃক্ষ নেই। পানাগড়ে জি.টি.রোড হতে দার্জিলিং মোড়ের কাছে যে হাইওয়ে ইলামবাজারের দিকে গেছে - ঐ রাস্তার দু'পাশ জঙ্গল মহল নামে খ্যাত। বিশাল জঙ্গলের আর কিছুই অবশিষ্ট নেই জঙ্গ লমহলে।

পরিসংখ্যান বা তথ্যতে যাই থাকুক, প্রকৃতপক্ষে জেলায় নতুন করে বনসৃজন ও রক্ষণের তেমন কোন উদ্যোগ আর চোখে পড়ে না।

উপসংহার

স্বাধীনতার পূর্বে অবিভক্ত বাংলাদেশের বরিশাল জেলাকে দেশের শস্য ভাণ্ডার বলা হত। স্বাধীনতার পরে বিভক্ত পশ্চিমবাংলার বর্ধমান জেলা রাজ্যের শস্য ভাণ্ডার বলে স্বীকৃত। জেলার মাটি, সেচ ব্যবস্থা, জলবায়ু, শ্রমিক এবং বাজার রাজ্যের অন্যান্য জেলার তুলনায় কৃষিকার্যের সমধিক অনুকুল। কিন্তু এটাই শেষ কথা নয়।

বিশাল এই জেলার চাষ আবাদ, সেচ, সার, বীজ, বাজার নিয়ে কৃষকের যে সমস্যা তারই চিত্র দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। উন্নয়নের অন্যতম শর্ত হ'ল উৎপাদনের উপাদানগুলিকে

যথার্থভাবে কৃষকের কাছে পৌঁছে দেবার ক্ষেত্রে সরকারী দায়বদ্ধতা। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় রাজনীতির লাভালাভের চিন্তা না করে,জেলা কৃষিকরণকে ব্লক পর্যায়ের মাধ্যমে তৃণমূল স্তর পর্যন্ত সরকারী উদ্যোগকে প্রসারিত করতে হবে। জেলা কৃষিকরণকে হতে হবে আরো গতিশীল। অনেক এলাকায় কৃষক ফসল ঠিক ঠাক্ পায়না নানা রকম উৎপাতের জন্য। এর মধ্যে গরু, ছাগল, হাঁসমুরগীর উৎপাত যেমন আছে, তেমনি আছে রাতের অন্ধকারে পাকা ফসল লুঠ করা। আবার মৎস্য চাষে পুকুরের জলে বিষ মিশিয়ে দেওয়া।

আজকের বিশ্বায়নের দিনে প্রতিযোগিতা মূলক বাজারে চাষীকে টিকে থাকতে হলে, আহার ও বাসস্থানের নিশ্চয়তা পেতে হলে ধান-আলুর বদলে অন্যান্য অর্থকরী ফসলের কথা ভাবতে হবে।

যদি সরকার পঞ্চায়েতি শাসনের মাধ্যমে পরিবর্তিত, বিকল্প চাষের জন্য কৃষককে উৎসাহিত করেন, কৃষির উন্নত পরিকাঠামো কৃষকের কাছে পৌঁছে দেন, কৃষকের ফসল রক্ষা সুনিশ্চিত করেন, উৎপাদিত ফসল সংরক্ষণ এবং বিপণনের ক্ষেত্রে সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, তাহলে চাষীর উন্নতির মাধ্যমে রাজ্যের অর্থনীতি আবার চাঙ্গা হয়ে উঠবে।

চাষ - আবাদের সমস্যা, বাজার ও সংরক্ষণের সমস্যার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সমাধান? সে চেষ্টা করবেন নিজ নিজ ক্ষেত্রে কৃষকরা এবং সরকার।

কাটোয়ার পরিচিতি মূলতঃ বৈষ্ণব চেতনাকে নিয়েই

চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ক্ষুরে শান দিতে দিতে বারে বারেই আনমনা হয়ে পড়ছে মধু নাপিত। ব্যাপারটা কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না। বুঝতেই পারে নি এতবড় একটা গুরুদায়িত্ব তার ঘাড়ে বর্তাবে। প্রথমে ভেবেছিল কি আর এমন ব্যাপার! একজনের মাথা নেড়া করতে হবে - এই তো! কিন্তু সময় যত এগিয়ে আসছে ততই কোথা থেকে রাজ্যের কাঁপুনি এসে মধুকরের গায়ে বিঁধছে। রাতে ঘুম আসছে না। ভোর না হতেই মধুকর যন্ত্রপাতি নিয়ে হাজির হয় গঙ্গার ধারে। সেখানে পাশাপাশি দুটো গাছ। একটি অশ্বত্থ,অন্যটি পিপল। এরপর আকাশ ফর্সা হতেই জড়ো হতে থাকেন চন্দ্রশেখর আচার্য, গদাধর পণ্ডিত, ব্রহ্মানন্দের মতো মহাজ্ঞানী মহাজনের দল। তাদের সঙ্গে কেশব ভারতী। তাদের সঙ্গে ঐ ছেলেটি । কতই বা বয়স! কিন্তু কি দীপ্তি! গায়ের কি রঙ। একেই বুঝি বলে গৌর অঙ্গ। ওর নাম নিমাই। ওরই না কি চৈতন্য হবে।

এর পরের ঘটনা তো ইতিহাস। কাটোয়ার পরম বৈষ্ণব গদাধর গোস্বামীর সাধনাস্থলে কেশব ভারতীর কাছে দীক্ষা নিয়ে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম ধারণ করে বৃন্দাবনের পথে গেলেন নিমাই। পিছনে পড়ে থাকল নবদ্বীপের শচীদেবীর হাহাকার, বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রেম। সংসার থেকে 'নিমাই' নামটি 'নাই' হয়ে 'চৈতন্য' শুধু তারই হল না, চৈতন্য হল মধুকর নাপিতেরও। সেই চৈতন্য ছুঁয়ে নিল দেশব্যাপী এক বিরাট অংশের মানুষকে। স্বাভাবিক কারণেই বৈষ্ণব পরিমণ্ডলে কাটোয়ার গুরুত্ব অনেকখানি। কালের স্রোতে পিপল গাছটি মরে গেছে। কিন্তু অশ্বত্থ গাছটি এখনও আছে। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে এখানে তৈরী হয়েছে শ্রী গৌরাঙ্গ মন্দির। এই মন্দির চত্বরেই আছে আর একটি পরিত্যক্ত মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ; যার নির্মাণ কাল ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে (অনুমিত) । অশ্বত্থ গাছের নিচে রয়েছে মধুকর নাপিতের সমাধি। আছে নিমাইয়ের দীক্ষাগ্রহণের সময় উপস্থিত পাঁচজন ভক্ত - বৈষ্ণবের স্মরণ-বেদী। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ও কেশব ভারতীর খোদিত পদচিহ্ন। আর এখানের সন্যাসস্থলীর পিছনের একটি ছোট ঘরে রয়েছে কেশব ভারতীর সমাধি। মন্দির প্রাঙ্গণের মাঝখানের নাটমন্দিরে রয়েছে মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ ও জগন্নাথদেবের মূর্তি. এখানে আছে নিত্য পূজার ব্যবস্থা। ভক্তজন ও শুভার্থীদের দানের মাধ্যমে মন্দিরের সব কিছু চলে। এখানে ঘটা করে অনুষ্ঠিত হয় ঝুলন উৎসব (শ্রাবণী পূর্ণিমা), জন্মাষ্টমী (ভাদ্র), দোলযাত্রা (ফাল্গুনী পূর্ণিমা), গৌরাঙ্গের আবির্ভাব তিথি ও সন্যাসগ্রহণ তিথি (১লা মাঘ)। সন্যাসগ্রহণ তিথি উপলক্ষে ১ লা মাঘ মহাপ্রভুর মূর্তিটিকে গেরুয়া কেপীন, দণ্ড, মুণ্ডল সহযোগে সন্যাস বেশ পরানো হয়। পরের দিন পরানো হয় রাজবেশ। এছাড়া কার্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী

তিথিতে গদাধর বৈষ্ণবের তিরোভাব তিথিতেও গৌরাঙ্গ মন্দিরে বড় উৎসব হয়।

মহাপ্রভুর দীক্ষা গ্রহণের শহর বলেই কাটোয়া মহকুমা জুড়ে বিভিন্ন জায়গায় বৈষ্ণব ক্ষেত্রের বাহুল্য। কাটোয়া থেকে দাঁইহাটের দিকে যেতে গৌরাঙ্গ মন্দির থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে মাধাইতলা আশ্রম। কলসির কানায় বৈষ্ণব চেতনার বদ রক্তটুকুকে বের করে দিয়ে নিজেরাই যে প্রেমে লীন হয়েছিলেন; সেই জগাই - মাধাই এর স্মারক হিসাবে এখানে রয়েছে জগাই - মাধাইয়ের সমাধি ও মহাপ্রভুর বিশ্রামস্থলী। হাজার বছর ধরে অখণ্ড নাম-কীর্তনের সঙ্কল্প - ধারা অটুট রেখে আজও চলছে হরি বন্দনা। এই আশ্রমের তিনটি প্রকোষ্টের একটিতে নিতাই, গৌর ও সীতানাথ, মধ্যে মাধাইয়ের মূর্তি। এছাড়াও এই মন্দিরে আছে ত্রিভঙ্গদাস, চরণ দাস প্রমুখ বৈষ্ণব সাধকের সমাধি। চৈতন্যদেব আসার আগে তৈরী শহরে ঘোষেশ্বর শিব মন্দিরটি আজও রয়েছে।

প্রাচীন ইতিহাস

কাটোয়ার ইতিহাসে অতি প্রাচীনতার ছাপ থাকলেও চৈতন্যপূর্বযুগ পর্যন্ত সে ছাপে স্পষ্টতা নেই, বরং অনেকটাই অনুমানসাপেক্ষ ও কিংবদন্তী নির্ভর। কাটোয়া , কেতুগ্রাম ও মঙ্গলকোট এই তিন থানা এলাকা নিয়ে গঠিত বৃহত্তর কাটোয়া পশ্চিমবঙ্গের অখণ্ড অঙ্গ হলেও তার আর্থ - সামাজিক , রাজনৈতিক ইতিহাস অন্য অংশের থেকে কিছুটা হলেও স্বতন্ত্র। মঙ্গলকোটের বিভিন্ন অংশে প্রত্নখনন করে ইতিহাসবিদরা কাটোয়ার ঐতিহ্য ও অস্তিত্বের বয়সকে বাড়ানোর সৎ চেষ্টা করেছেন। তাঁদের মতে তিন হাজার বছর আগেও বাংলাদেশের এই সব অঞ্চলে যারা বাস করতেন তারা ছিলেন সব দিক থেকেই সভ্য ও সমৃদ্ধ। অস্পষ্ট হলেও গ্রিক লেখকদের রচনায় যে গঙ্গারিডি (না কি গঙ্গারাঢ় ?) রাজ্যের মধ্যে 'কাটাদুপা' নগরীর কল্পনা করেছেন তার অবস্থান ও বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে কাটোয়া মিলে যায়। তবে কাশীরাম দাসের মহাভারত, মাণিক দত্ত ও কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল, বিপ্রদাস পিপলাইয়ের মনসা বিজয়, বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত সহ বিভিন্ন মধ্যযুগীয় রচনা ও বহু প্রচলিত কিংবদন্তীতে বর্ণিত ইন্দ্রাণী পরগণা যে কাটোয়ারই একটা বড় অংশ তা ইতিহাসসিদ্ধ। চীনের পরিব্রাজক ফা-হিয়েন বা হিউ-এন-সাঙ - এর বিবরণে 'কাটুয়া'র উল্লেখ আছে। অনুমিত হয় যে বঙ্গদেশ যখন মৌর্য ও গুপ্ত সাম্রাজ্যভুক্ত হয় তখন বৃহত্তর কাটোয়া এই সাম্রাজ্যের অধীন ছিল।

'কাটোয়া' নামটির উৎপত্তি নিয়েও বহু আলোচনা এষণার ইঙ্গিত মেলে। মেগাস্থিনিস রচিত 'ইণ্ডিকা' গ্রন্থে চিহ্নিত 'কাটাদুপা' বা 'কূটদ্বীপ' যে আসলে কাটোয়াই তা নিয়ে একটা ঐকমত্যে আসা গিয়েছে। আবার 'কাটাদুপা' নামকরণের তাৎপর্যের সমর্থন মেলে এই অঞ্চলের এককালের বাসিন্দা 'কাটাদিয়া' নামে এক শ্রেণীর রাঢী ব্রাহ্মণদের নামের অপভ্রংশ থেকে। এছাড়া চিনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন বর্ণিত গঙ্গা অজয়ের সঙ্গমস্থলে 'কাটুয়া' নগরীর উল্লেখ আছে। তবে অনেক অধুনা গবেষকদের মতে কাটোয়া যে আসলে গঙ্গারই একটি দ্বীপ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই মতের বক্তব্য ঃ গঙ্গা, অজয়, বাবলা,

শিবাই (বর্তমানে অস্তিত্বহীন) ও তাদের শাখা প্রশাখা বেষ্টিত কাটোয়া দূর অতীতে ছিল এক কন্টকপূর্ণ দ্বীপ। এই ভাবনা থেকে 'কাটোয়া' নামটি কীভাবে উপজাত তার ব্যাখ্যাটি হল ঃ কন্টকদ্বীপ – কাঁটাদ্বীপ – কাঁটদ্বীপ – কাটদিপা – কাটদিবা – কাটবা – কাটোঙা – কাটোয়া। চৈতন্যপ্রাণ ভক্তজনের মতে কাটোয়ার নাম ছিল আসলে চম্পক নগর। কাটোয়া থেকেই নিমাই আনুষ্ঠানিকভাবে সংসার বিমুক্ত হন বলে তার মা শচীমাতার আক্ষেপ ও বিলাপে চম্পক নগর রূপান্তরিত হয় কন্টকনগরে। 'চৈতন্যচরিতামৃত' বা চৈতন্য ভাগবত' গ্রন্থে কন্টকনগর ও কাটোঙা-র উল্লেখ আছে। অন্যদিকে গৌড়ের অধিপতি হুসেন শাহ্-র সময়ে বিপ্রদাস রচিত (১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দ) 'মনসা বিজয়' গ্রন্থে আমরা 'কাটোয়া' শব্দের উল্লেখ পাইঃ 'উজানি কাটোয়া বাহি রহে ইন্দ্রঘাটে'। মনোহর দাস রচিত 'অনুরাগবল্লী' গ্রন্থে (১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দ) কাটোয়ার উল্লেখ আছে এইভাবে ঃ 'কাটোয়া নিকট বাগানকোলা পাটবাড়ী'। ডঃ কালী চরণ দাস তাঁর 'কাটোয়া দর্শন' গ্রন্থে লিখেছেন, 'বর্তমান অজয় নদীর শাখা (মূল শাখাও হতে পারে) এক সময় কাটোয়ার ঘোষেশ্বরতলা ও বর্তমান শ্মশানঘাটের পাশ দিয়ে ভাগীরথীকে স্পর্শ করত। এই কারণে কাটোয়া হয়ত এক সময় কাঁটাপূর্ণ দ্বীপ বা কাঁটাদ্বীপে পরিণত হয়েছিল।' নামের বহুগামিতা উত্তীর্ণ হয়ে ষোড়শ শতক থেকে 'কাটোয়া' শব্দে থিতু হয়।

ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্বাপর স্থিতি।
দ্বাদশ তীর্থেতে যথা বৈসে ভাগীরথী।।
বার হাট তের ঘাট তিন চণ্ডী তিনেশ্বর।
এই কথা যে বলিতে পারে তার ইন্দ্রাণীতে ঘর।।

মহাভারতের বাংলা অনুবাদক কাশীরাম দাস তাঁর গ্রন্থ পরিচয়ের স্বর্গারোহন পর্বে লিখিত (১৬০২-০৪ খ্রীষ্টাব্দে) চারটি পংক্তি ঘিরে এই ধারণা দৃঢ় হয়েছে যে 'কাটোয়ার অপর একটি প্রাচীন নাম ইন্দ্রাণী।' বা 'কাটোয়া ও ইন্দ্রাণী অবিচ্ছিন্ন'। তবে প্রাচীন ইতিহাস সেচনে এই তথ্য স্পষ্ট যে, বৃহত্তর কাটোয়ার একটি ব্যাপক অংশ এক সময়ে ইন্দ্রাণী নামে চিহ্নিত ছিল। ইন্দ্রাণী পরগণার অস্তিত্ব এখন বিলুপ্ত হলেও 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে উল্লিখিত 'ইন্দ্রয়ীন' বা 'ইন্দ্রায়ন' পরগণা এবং কৃত্তিবাস ওঝা-র 'রামায়ণে' বর্ণিত নামকরণ প্রসঙ্গে পুরাণ যে সাক্ষ্য দেয় তা হল– এখানকার প্রয়াগতুল্য ইন্দ্রেশ্বর ঘাটে কঠোর তপস্যা করে ইন্দ্রকে পতি হিসেবে লাভ করে শচীদেবী 'ইন্দ্রাণী' নামে পরিচিত হন। রামায়ণ, মহাভারত ছাড়াও মনসা মঙ্গলের কবি বিপ্রদাস পিপলাইয়ের 'মনসাবিজয়', দ্বিজমাধবের মঙ্গলচণ্ডী গীত কাব্য, লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল, বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত, মাণিক দত্ত ও কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল প্রভৃতি অগণন মধ্যযুগীয় কাব্য ও ধর্মগ্রন্থ; ইন্দ্রাণীতে অবস্থিত স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের অনুপম নিদর্শণ, কাটোয়া ও দাঁইহাটের মধ্যবর্তী স্থানে ভাগীরথীর পরিত্যক্ত খাতের দক্ষিণ তীরে (অধুনা বিকিহাট) অবস্থিত ইন্দ্রেশ্বর মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এবং বিভিন্ন প্রত্ন-নিদর্শনের ভিত্তিতে এই জনপদের অবস্থান, বিস্তৃতি, গুরুত্ব ও সময়কালের সত্যতা নির্ণয় করা সম্ভব।

এছাড়া কাশীরাম দাস বর্ণিত বার হাট ও তেরঘাটের অস্তিত্ব আজও বিরাজমান। হাটগুলি হল – হাঁড়িহাট, গুড়হাট, আতুহাট, ঘোষহাট, পানুহাট, মণ্ডলহাট, পাতাইহাট, বিকিহাট, বীরহাট (বর্তমানে বেরা), আকাইহাট, চণ্ডীহাট বা দাঁইহাট বা দেওয়ানের হাট এবং গঞ্জই মুর্শিদপুর, নসরৎপুর ও কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাট উক্ত তিন ব্যক্তি নামের নিশান নিয়ে গড়ে ওঠে। তেরঘাট হল – ইন্দ্রেশ্বর বা ইন্দ্রঘাট, বারদুয়ারী ঘাট, গণেশ মাহাতোর ঘাট, শঙ্খানী বা শঙ্খেশ্বরীর ঘাট, মনোহারী ঘাট, শিবের ঘাট, দেওয়ানের ঘাট, কদমতলার ঘাট, কলুর (মতান্তরে কালুর) ঘাট, শিবের ঘাট, দেওয়ানের ঘাট, কদমতলার ঘাট, বক্সীর ঘাট, স্বরূপ পালের ঘাট, কান্তবাবুর ঘাট, ভাউসিং-এর ঘাট। তিনচণ্ডী হল-পাতাইহাটের পাতাই চণ্ডী, আকাই হাটে আকাইচণ্ডী ও কুলাই হাটে কুলাই চণ্ডী এবং তিনেশ্বর হাল চন্দ্রেশ্বর, শঙ্খেশ্বর (বা ঘোষেশ্বর) ও ইন্দ্রেশ্বর। কাটোয়া থেকে দাঁইহাটের ভাউসিং পর্যন্ত ভাগীরথী তীরবর্তী প্রবাহপথে যে বন্দর গড়ে উঠেছিল বারঘাট ও তেরঘাটে তার প্রমাণ মেলে।

'মহকুমা' হিসেবে কাটোয়া মান্যতা পায় ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে। প্রাচীন ইন্দ্রাণী পরগণা রূপান্তরিত হয় কাটোয়া থানায়, ধেএ্রা ও মনোহরশাহী পরগণাদ্বয় যথাক্রমে মঙ্গলকোট ও কেতুগ্রাম থানায় রূপান্তরিত হয়ে তিন থানা মিলে গঠিত হয় কাটোয়া মহকুমা। তবে এই পরগণা তিনটি মহকুমাভুক্তির আগে মুর্শিদকুলি খাঁ-র আমল থেকেই বর্ধমানের চাকলার অন্তর্গত ছিল। তবে বৃহত্তর কাটোয়ার উজানি মঙ্গলকোট ও পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের ভিত্তি থেকে বলা যায় ১২০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ অথবা তারও আগে এখানে সুসভ্য জাতির বসবাস ছিল। এই অঞ্চল থেকে দাঁইহাট পর্যন্ত তাম্রাশ্মীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য বহমান। এমনকি তাম্রপ্রস্তর যুগ থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে এখানে ক্রম-উন্নত সভ্যতার চিহ্ন মেলে ; যে নজির অনন্য। পুরাতত্ত্ব বিশেষজ্ঞ অমিতা রায়ের মতে, 'The historical phases that have been revealed at Mangalkot can be lebelled as Maurya-Sunga, Kushana-Gupta and Post-Gupta in Chronocultural Stages'. উল্লেখ্য যে কাটোয়া মহকুমায় অবস্থিত দুটি শহর কাটোয়া ও দাঁইহাট ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে পুরসভার স্বীকৃতি পায়। তারপর থেকে সময় যত এগিয়েছে কাটোয়ার ক্রমশ শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে আর দাঁইহাট তার শরীরে পঞ্চায়েতের ঘ্রাণ নিয়েই পড়ে আছে।

অস্পষ্ট ইতিহাসের স্বাক্ষর স্পষ্ট প্রতীতি পেল পাল ও সেন যুগের। মহীপাল ও তার পরবর্তী পাল রাজাদের যুগে রাজশক্তির দুর্বলতার সুযোগে সামন্তরাজারা স্বাধীনতা ঘোষণা করার পর বর্ধমানের বিভিন্ন অংশে গড়ে ওঠা রাজ্যগুলির অংশ ছিল এই কাটোয়া। কেতুগ্রামের নৈহাটি গ্রামে প্রাপ্ত বল্লালসেনের তাম্রশাসন থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় কাটোয়া সেন রাজাদের অধীন ছিল। মঙ্গলকোট হোসেন শাহি মসজিদের প্রস্তর ফলক থেকে প্রাপ্ত চন্দ্রসেন ও রণসেন নামক যে দুজন রাজার নাম পাওয়া যায় তাদের সেন বংশীয় সামন্ত রাজা বলেই ধারণা করা হয়। মঙ্গলকোটের সামন্ত রাজা বিক্রমজিতের আমলেই বখতিয়ার খিলজি বিহার থেকে কাটোয়ার মধ্য দিয়ে নবদ্বীপের পথে অগ্রসর হন। তখন সেন বংশের রাজা ছিলেন লক্ষ্মণ সেন। বখতিয়ার খিলজির বাংলাদেশ জয় করার পর থেকেই মঙ্গ

লকোটে শুরু হয় মুসলমান প্রাধান্য। অবশ্য এই প্রাধান্যে কিছুটা চিড় ধরে যখন বখতিয়ারের পর গিয়াসউদ্দিন খিলজি (১২১৩ - ২৭ খ্রীষ্টাব্দে) গৌড়ের সিংহাসনে বসেন। এই সময়ে দাক্ষিণাত্যের গঙ্গরাজা তৃতীয় অনঙ্গ কাটোয়া সমেত এই অঞ্চল দখল করে নেন। পরবর্তীকালে অবশ্য গিয়াসউদ্দিন তা উদ্ধার করতে সমর্থ হলে ফের মঙ্গলকোটে মুসলিম যুগের সূচনা হয়। এই সময় ১৮ জন মুসলিম আওলিয়া ধর্মপ্রচারক এখানে এলে স্থানীয় হিন্দুরাজা বিক্রমজিতের সঙ্গে একে একে সকলে নিহত হলেও গজনবি নামে একজন গাজি বা পীর হিন্দুরাজাকে পরাজিত করে শেষ পর্যন্ত মঙ্গলকোট অধিকার করেন। এখানে মৃত আউলিয়াদের সমাধিস্থল মুসলিমদের পবিত্র তীর্থক্ষেত্র হিসেবে মান্যতা পেয়েছে।

ইতিহাসের আশ্রয় ছাপিয়ে মঙ্গলকোটের অন্য প্রধান পরিচয়টি হল এর প্রত্নতা বৈশিষ্ট্য। মোটামুটি ৬ কিমি. বিস্তৃত অজয় কুনুর অববাহিকার মঙ্গলকোট (২৩°৩৬´ উত্তর অক্ষাংশ ও ৮৭°৫৫´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ) বা মঙ্গলকোটের ১০ ফুট থেকে সর্বোচ্চ ৩০ ফুট অঞ্চল জুড়ে খনন কার্য ঠিকমতো করা হয়নি। এই অঞ্চলের বর্ধমান জনবসতিও খননকার্যের প্রধান প্রতিবন্ধকতা। ষাটের দশকে এখানে উৎখননের ফলে যেসব বস্তু পাওয়া গিয়েছে সেগুলি হল ঃ -

১. নীচের অংশ ভগ্ন পাথরের বিষ্ণুমূর্তি। এই মূর্তির গঠন সৌকর্য প্রমাণ করে মূর্তিটি পালযুগীয়। ২. পালযুগীয় সরস্বতী মূর্তি। বিষ্ণুমূর্তির হাত ও সরস্বতী মূর্তির মুখ। ৩. মাকড়া পাথরের প্রাচীন যুগের হনুমান মূর্তি। ৪.নতুন প্রস্তর যুগের শেষার্ধের (খ্রীষ্টপূর্ব ৯০০০ - ৬০০০ অব্দ) ক্ষুদ্র প্রস্তর কুঠার। ৫. প্রস্তরীভূত কাঠ। ৬. আদি পাঠান যুগের টেরাকোটা ফলক। ৭. স্থানীয় পীরপুকুরের ঈশানকোণে ৮ ফুট x ৪ ফুট আয়তনের ছাদ বিশিষ্ট ভূগর্ভস্থিত পাকা ইঁটের গাঁথনি। ৮. ভূগর্ভস্থিত পোড়ামাটির বেড় দেওয়া অসংখ্য কূপ। ৯. দুটি সাদা রঙের ক্রিস্ট্যাল ও একটি খয়েরি রঙের বিড। ১১. প্রাপ্ত পোড়া চালের অস্তিত্ব প্রমাণ করে কোনো অগ্নিকাণ্ড জনিত দুর্ঘটনা। ১২. লাল, কালো সহ বিভিন্ন রঙের মাটির ব্যবহার্য বহু তৈজসপত্র,খেলনা। ১৩. চারটি তামার মুদ্রা। যেগুলি খ্রীস্টপূর্ব চার শতকের মৌর্যযুগের মুদ্রা হিসেবে প্রমাণিত।

এখান থেকে প্রাপ্ত বস্তুগুলির মধ্যে মৌর্য, শুঙ্গ, কুষাণ ও গুপ্তযুগের মুদ্রা ও সীলমোহর বর্ধমান জেলার এই অঞ্চলের প্রত্নতাত্ত্বিক তাৎপর্যকে গৌরবান্বিত করেছে। শুধু তাই নয় এই অঞ্চলে প্রাপ্ত বস্তুগুলি বিচার করলে তাম্রপ্রস্তর যুগ থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত একটা ধারাবাহিক সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায়।

এই অঞ্চলের অন্য যে প্রত্নতাৎপর্য মণ্ডিত ক্ষেত্রটি রয়েছে সেটি হল পাণ্ডুরাজার ঢিবি। এই ঢিবির ভৌগোলিক অবস্থান হল অজয়ের দক্ষিণ তীরে বোলপুরের কয়েক মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে পাণ্ডুক (২৩°৩৫´ উত্তর অক্ষাংশ ও ৮৭°৩৯´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ) গ্রামে। পাণ্ডু (মতান্তরে পাণ্ডু দাস) নামক রাজার রাজত্ব ছিল এখানে। গ্রামের উত্তর পশ্চিম অংশের উঁচু ভূভাগটি ; যার নাম 'রাজাপোতার ডাঙা' বর্তমানে 'পাণ্ডুরাজার ঢিবি' নামে পরিচিত।

এখানে মোট চারবার (১৯৬২, ১৯৬৩, ১৯৬৪ ও ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে) উৎখননের ফলে তাম্রাশ্মীয় সভ্যতার যে প্রত্নপ্রমাণ মেলে সন তারিখের নিরিখে তা সাড়ে তিন হাজার বছরেরও বেশীদিনের পুরনো। এই সময়কালকে সামনে রেখে বলা যেতে পারে এই অঞ্চল সম্ভবত পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীনতম জনবসতির নিদর্শন। এখানকার পুরাবস্তুর নিদর্শনস্বরূপ পাঁচ ধরনের অস্ত্র এখানে পাওয়া যায়; যেমন হাত কুঠার (hand axe), ছেদক (cleaner), খনত্র (digger), চাছক (scraper) এবং ক্ষেপন গোলক (bolla),এছাড়া পোড়ামাটির বহুধরনের ভাস্কর্য, অলঙ্কার, জিনিসপত্র সহ অনেক প্রত্ন নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। পাণ্ডুরাজার ঢিবি ও মঙ্গলকোটের ভূগর্ভ থেকে এবং এই অঞ্চলের গায়ে গায়েই অজয় ও কুনুরের নদীগর্ভ থেকে রোজই কিছু না কিছু প্রাচীন মূর্তি ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন মিলছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দের মতে মঙ্গলকোট ও সংলগ্ন এলাকায় ঠিকমতো উৎখননের কাজ করা গেলে ভারতবর্ষের ইতিহাসের গতিপথটিই পাল্টে যাবে।

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন কাটোয়া মহকুমার অন্য জায়গাতেও রয়েছে। সেগুলি হল কাটোয়ার সিংহ দরজার পাথর, হনুমানলাঠি, দাঁইহাটের বদর সাহেবের মসজিদের পাথর, বেড়াগ্রামের ভাগীরথীর পরিত্যক্ত খাতে বিশাল বিশাল পাথর, একাই হাটের বৃষলাঞ্ছিত মুদ্রা, সীতাহাটিতে প্রাপ্ত বল্লালসেনের তাম্রশাসন, বেড়ায় প্রাপ্ত জৈন নৌপঞ্জী, ভাউসিংয়ের প্রস্তরফলক, কাটোয়ার শাহি মসজিদে প্রাপ্ত পাথরের উল্টোদিকে দুর্গা - গণেশের মূর্তি অঙ্কিত দেখতে পাওয়া গিয়েছে।

আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের সময়কাল (৩২৭ খ্রীস্ট পূর্বাব্দ) থেকে পরবর্তী ৫০০ বছর পর্যন্তও কাটোয়ার ইতিহাসে স্পষ্টতা নেই। তবে বঙ্গদেশ তখন মৌর্য ও গুপ্ত সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল ; মঙ্গলকোট ও দাঁইহাটে প্রত্নখননে আবিষ্কৃত বিভিন্ন প্রত্নবস্তু থেকে তার পরিচয় মেলে। মঙ্গলকোটে অবশ্য শুঙ্গ ও কুষাণ আমলেরও বহু প্রত্নবস্তুর সন্ধান মিলেছে। অন্যদিকে কাটোয়া থানা এলাকার বরমপুর গ্রাম ও মঙ্গলকোট থানার লাখুড়িয়া গ্রামে গুপ্ত আমলের মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে। এমনকী মঙ্গলকোটে তক্ষশীলার ধাঁচে নির্মিত তিন ধরণের তাম্র মুদ্রার সন্ধানও মিলেছে। এখান থেকে প্রাপ্ত চতুর্থ শতকের একটি পোড়ামাটির সীলে যে নাগদত্তের উল্লেখ আছে, অনেকের মতে তিনি ছিলেন সমুদ্রগুপ্তের আমলে উজানির রাজা। উল্লেখ্য যে সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ লিপিতে এই নাগদত্তের কথা আছে।

খ্রীস্টিয় ষষ্ঠশতকে গুপ্ত সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে যখন গৌড়বঙ্গ ও রাঢ়ে বেশ কিছু সামন্তরাজা যেমন গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য, সমাচারদেব প্রমুখ স্বাধীনভাবে শাসনকাজ পরিচালনা করতেন, তখন রাঢ় ও সমতটের অধিপতি গোপচন্দ্রের অধীনে ছিল ফরিদপুর থেকে বর্ধমান সহ সমস্ত রাঢ় অঞ্চল। কাটোয়া ছিল এই অঞ্চলের মধ্যেই। তবে বাংলার স্বাধীন সার্বভৌম নরপতি শশাঙ্কের আমলে কাটোয়া যে কর্ণ-সুবর্ণ বা গৌড় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বলা হয়, এই সময় প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি ও দণ্ডভুক্তি নামক বিভাগগুলির মধ্যে দণ্ডভুক্তির প্রাণকেন্দ্র প্রাচীন ইন্দ্রাণী পরগণা ছিল

সবচেয়ে উন্নত জনপদগুলির অন্যতম। চীনা পরিব্রাজক হিউ-এন-সাঙ সম্ভবত রাঢ় বঙ্গ পরিভ্রমণ করে কাটোয়া অথবা মঙ্গলকোটে অজয় পার হয়ে শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণে পৌঁছেছিলেন। হিউ-এন-সাঙ-এর ভ্রমণ কাহিনী থেকে জানা যায় সেই সময় কাটোয়া জনপদের দৈর্ঘ্য ছিল নয় মাইল ও প্রস্থ আড়াই মাইল।

একাদশ শতকে বৈদেশিক আক্রমণ ও অভ্যন্তরীণ বিপ্লবে পাল শক্তি দুর্বল হয়ে পড়লে পাল সাম্রাজ্যের মধ্যেই ছোট ছোট স্বাধীন খণ্ডরাজ্যের উদ্ভব হয়। গোপভূমের সদ্‌গোপ সামন্ত রাজাদের উত্থান এই সময়ে ঘটে। এই রাজাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাজা মহেন্দ্রর সাম্রাজ্য পঞ্চকোট থেকে কাটোয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই সময়ে ঢেকুর বা ঢেক্করীর (অধুনা শ্যামারূপা) রাজা ঈশ্বর ঘোষ বা ইছাই ঘোষ কাটোয়ার প্রাচীন শিব মন্দিরের জায়গায় নবনির্মিত মন্দিরে শিব মূর্তি স্থাপন করে নামকরণ করেন ঘোষের ঈশ্বর বা 'ঘোষেশ্বর'। এই ঘোষেশ্বর শিবকে ঘিরে কাটোয়া ও লাগোয়া গ্রামাঞ্চলের মানুষজন গাজন উৎসবে আজও মাতে। পালরাজ তৃতীয় নয়পালের আমলে বৃহত্তর কাটোয়ার যে সমস্ত ছোট ছোট সামন্তরাজ্যের নাম পাওয়া যায় সেগুলি হল নিদ্রাবল (রাজা বিজয়রাজ), কৌশাম্বী (রাজা দ্বোর পবর্দ্ধন), দেবগ্রাম (বিক্রমরাজ) ও পদুবম্বা (রাজা সোম)। প্রাক্-মুসলিম যুগে কেতুগ্রাম (বেহুলাপুর) -এ সম্ভবত পাল আমলের শেষের দিকে ভূপাল, চন্দ্রকেতু, কেশরী সিংহ প্রভৃতি ছোট ছোট সামন্ত রাজা বা ধনাঢ্য ব্যক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। জনশ্রুতি অনুযায়ী ভূপালের রাজার পুত্রের নাম 'চন্দ্রকেতু'। আর এই চন্দ্রকেতুর নাম অনুযায়ী বহুলাপুরের নাম হয় কেতুগ্রাম।

চৈতন্য প্রভাব

বৈষ্ণব চেতনা ও সাধকদের স্মৃতি জড়ানো রয়েছে কাটোয়া মহকুমার বিস্তৃত অঞ্চলগুলিতে। মহাপ্রভুর জীবৎকালে বৈষ্ণব সাধনার অন্যতম পীঠে পরিণত হয়েছিল শ্রীপাট শ্রীখণ্ড বা বৈদ্যখণ্ড গ্রাম। কাটোয়া থেকে দক্ষিণে বর্ধমানের দিকে যেতে এই গ্রামের খ্যাতি নরহরি দাস ও তার দাদা মুকুন্দ দাস ও পুত্র রঘুনন্দনের জন্য। এই তিন ভক্ত বৈষ্ণব শ্রীখণ্ডকে বৈষ্ণব নাগরীভাবের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত করেন। এঁদের উপাসনা ছিল গৌরাঙ্গ ও বিষ্ণুপ্রিয়ার যুগল মূর্তি। গৌর লীলার পদ - প্রবর্তক নরহরি শ্রীখণ্ডের এক বর্ধিষ্ণু বৈদ্য পরিবারে ১৪৭৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। গৌড়ের শাসক তাঁকে 'সরকার' উপাধিতে ভূষিত করেন। শ্রীখণ্ডের যেখানে তিনি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন সেই জায়গাটির নাম 'বড়ডাঙ্গাতলা'। এখানে প্রত্যেক বছর অগ্রহায়ণ মাসে নরহরি সরকারের তিরোভাব তিথিতে তিনদিন ধরে মহোৎসব ও মেলা বসে। কথিত আছে বড়ডাঙাতলার পুকুরটিতে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব বিশ্রাম নিতে এসে পা ধুয়েছিলেন। শ্রীখণ্ড গ্রামটির সঙ্গে বৈষ্ণব চেতনা সম্পৃক্ত থাকলেও গ্রামটির নামের উৎপত্তিতে শাক্ত চেতনারই আভাস। গ্রামের পশ্চিমে অধিষ্ঠাত্রী 'খণ্ডেশ্বরী' কালীর নাম অনুসারেই নাকি গ্রামের নাম হয় শ্রীখণ্ড। এছাড়া ব্যাণ্ডেল - কাটোয়া রেলপথের কাটোয়া থেকে ১২ কি মি. দূরে অগ্রদ্বীপে দীক্ষান্তে

যাত্রা করার পর মহাপ্রভু চৈতন্যদেব রাত্রিবাস করেন। এখানকার বৈষ্ণব সহজিয়া সাধু - আউল বাউলের দল বছরে একবার গোপীনাথ মন্দিরে মিলিত হন। চৈতন্য সমসাময়িক বা তার উত্তরকালে অগণিত ভক্ত - পার্ষদ, বৈষ্ণব ভাগবতবৃন্দ ও খ্যাতকীর্তি বৈষ্ণব পদকর্তারা বৈষ্ণব ভাবনা জগতকেই ঋদ্ধ করেছেন। তাদের মধ্যে নৈহাটির রূপ-সনাতন, কুলাইগ্রামের তিনভাই – গোবিন্দ, মাধব ও বাসুদেব ঘোষ, উদ্ধারণ দত্ত, যাজিগ্রামের শ্রীনিবাস আচার্য, ঝামটপুরের কৃষ্ণদাস কবিরাজ, কাঁদরা গ্রামের জ্ঞানদাস, উজানী বা কোগ্রামের লোচনদাস বা ত্রিলোচন দাস প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

কাটোয়া তার প্রাচীন ইতিহাস বা অতিপ্রাচীন ভূগোল অথবা প্রত্নতাত্ত্বিক উৎকর্ষের থেকেও আদৃত হয়েছে চৈতন্য পরিমণ্ডলটির সুগভীর বিস্তারের বিভাবে। সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে বিপ্লব আনয়নকারী চৈতন্যদেব তার প্রেমের পট্টডোরী দিয়ে শুধু কাটোয়াকে বাঁধেন নি, একটি সফল উত্তরাধিকার সৃজিত করে গিয়েছিলেন যা ভক্তিতে প্রেমে এবং সাহিত্যসৃষ্টিতে শাশ্বত আছে। কাটোয়া মহকুমা জুড়ে বিভিন্ন অঞ্চলে চৈতন্য চর্চার যে চিহ্নগুলি রয়েছে সেগুলি নিয়ে এবার আলোচনা করা যাক।

এসব ছাড়াও আর যে সব প্রত্ন প্রমাণ কাটোয়া মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চলে মেলে সেগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। অজয়-কুনুর ও কুনুরের বিচ্ছিন্ন শাখার তীরে অবস্থিত মঙ্গলকোট - দেউলিয়া - কোগ্রাম - কাছারির ডাঙা ও নিগনের চাঁই-রাজার ঢিবি। মঙ্গলকোট - দেউলিয়া - কোগ্রামে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় উৎখনন কার্য চালানো হয়েছিল। এ সম্পর্কে Director of Archaeology, West Bengal যে রিপোর্ট লিপিবদ্ধ করেছে তা হলঃ By following the course of the Ajoy and the Kunoor a very important proto-historic site yielding relics of the same culture (cultures of Pandu Rajar Dhibi) was discovered at Mangolkot (Lat. 23°82' and Long 87°54') just at the confluence of the two rivers. 'ছোট কাঁদড় তীরবর্তী প্রত্নসমৃদ্ধ কেতুগ্রাম থানা এলাকার গ্রামগুলি হচ্ছে রতনপুর, কাঁটারি, কাঁচড়া, মালিহা, সীতাহাটি এবং 'বড় কাঁদড় তীরবর্তী স্থানগুলি হল রাইখ্যা, রাজুর, কাঁদড়া, আমগড়িয়া, চরকি, রাউন্দি, গঙ্গাডাঙা প্রভৃতি। নিম্নগাঙ্গেয় অববাহিকার ভাগীরথী তীরবর্তী প্রত্নসমৃদ্ধ গ্রামগুলির মধ্যে একাইহাট, বিকিহাট, দাঁইহাট, ঘোড়ানাশ - মুস্থুলি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই গ্রাম গুলি অবশ্য কাটোয়া থানা এলাকার অধীন। 'গঙ্গাডাঙা' সম্পর্কে রাজ্যের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের রিপোর্টে পাচ্ছিঃ Resultant of this investigation a proto-historic world known as Ganga Danga (Lat. 23°42' and Long. 88°03') was again discovered a few miles to the West of Katwa ... Among the antiquities recovered from Ganga Danga mention may be made of fragments of Black and Red ware, Lustrous red ware, black and burnished pottery and microliths. A few of the shreds of black and red ware, mainly knife-edged bowls, were found as painted in whitish pigment so typical of the culture of this time.

এই প্রত্নমণ্ডলগুলিতে প্রাপ্ত জিনিসগুলি হচ্ছে দুটি কাঠের ফসিল, অনেকগুলি ছোট-বড় ভগ্ন-অভগ্ন পাথুরে হাতিয়ার, লাল-কালো, ধূসর, কালো-ধূসর, কালো ও লাল মৃৎপাত্র, পোড়ামাটির তৈরি নানা ধরনের নরনারী, নানা প্রকার পোড়ামাটির ফলক, পোড়ামাটির শীল, কালো কার্বন চাউল, পালিশযুক্ত দ্রব্যাদি, কাঁটি (beads), তামার মুদ্রা, তামার গহনা প্রভৃতি। কাঠের ফসিল দুটির একটি মঙ্গলকোটের ঢিবি থেকে এবং অন্যটি চরঘি থেকে পাওয়া গিয়েছে। পাথুরে হাতিয়ারগুলি বেশির ভাগটিই পাওয়া গিয়েছে কেতুগ্রাম থানার কাঁদরা ও চিতাহাটির প্রত্নভূমি থেকে। এইসব প্রাপ্ত দ্রব্যগুলি পুরাতন প্রস্তর যুগ (Palaeotithic Age) ও নতুন প্রস্তর যুগের (Neolithic Age) সাক্ষ্য বহন করছে।

কাঁটারির প্রত্নভূমি থেকে একটি পোড়ামাটির ফলক উদ্ধার করা হয়েছে। এই ফলকে 'বাসকসা' বা 'বাসক' নামক রাজার নাম খোদিত আছে। মঙ্গলকোটের চৈতন্যপুরে প্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্তিটি বেশ প্রাচীন। এর পরণে খাটো বহরের শাটক। এই মূর্তি বৌদ্ধ সংস্কৃতির ছাপ বহন করছে। মূর্তিটি ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামে রাখা আছে। এছাড়া পালযুগের (দশম শতক) কিছু বিষ্ণমূর্তি আছে আমগড়িয়া, নিরোল, কেতুগ্রাম, এনায়েতপুর, খেড়ুয়া প্রভৃতি গ্রামে। লোকেশ্বর বিষ্ণমূর্তি (সপ্তশীর্ষ সর্পফনা ছত্র সহ) আছে কাটোয়া থানার ননগর গ্রামে। বেড়ার সিংহমূর্তি, সতীনপুর ও দেবকুণ্ডুর ভগ্ন বিষ্ণু মূর্তিগুলি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলির হেফাজতে রাখা আছে। কো-গ্রামের মঙ্গলচণ্ডী মন্দিরে প্রাচীন বৌদ্ধমূর্তি, চাণ্ডুলির পঞ্চাননতলা, মঙ্গলকোট ও নিরোলের ষষ্ঠীতলার অনেক মূর্তির ভগ্নাবশেষ লক্ষিত হয়। কাটোয়া মহকুমা গ্রন্থাগারও বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রাপ্ত পাল ও সেন যুগের বহু প্রত্নদ্রব্য সংগ্রহ করে রেখেছে। এছাড়া মূলত মঙ্গলকোট ও কেতুগ্রাম থানা এলাকায় অজয় ও কুনুরের গর্ভ থেকে তীরবর্তী এলাকায় প্রত্নদ্রব্য প্রাপ্তির খবর প্রায়ই শোনা যায়।

কাটোয়া ১নং ব্লকের মধ্যে শ্রীখণ্ডে চৈতন্য প্রভাবের বিষয়টি আগেই আলোচিত হয়েছে। বাকি চৈতন্য চর্চিত ক্ষেত্রগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল যাজিগ্রাম। মহাপ্রভুর দ্বিতীয় অবতার শ্রীনিবাস আচার্যের তিরোভাব উৎসব (অগ্রহায়ণ মাস)কে ঘিরে এলাকার বহু বৈষ্ণবপ্রাণ মানুষ এখানে জমায়েত হন। যাজিগ্রামে শ্রীনিবাসের সাধনপাটের ভগ্নপ্রায় অস্তিত্ব হিসেবে যে মন্দিরটি রয়েছে সেখানে কাঠের তৈরী নৃত্যরত মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দের মূর্তি আছে। এছাড়া ষড়ভুজ গৌরাঙ্গ, রাধাকৃষ্ণ, পাঁচটি শালগ্রাম শিলা, কষ্টিপাথরের গোপালমূর্তি প্রভৃতি রয়েছে। শ্রীনিবাসের জন্মভূমি হল নদীয়ার চাকন্দি গ্রাম। যাজিগ্রাম তাঁর মামার বাড়ি। যাজিগ্রামে শ্রীনিবাসের বসতবাড়ি ও প্রাচীন সাধনমন্দির ধ্বংস হয়ে যেতে বসলে কাশিমবাজারের মহারাজা সেটি তৈরী করেন (১৯১৭ খ্রীস্টাব্দ)। যাজিগ্রামে চৈত্র মাসে এই গ্রামের শিব কালিন্দীনাথে চড়ক আর গাজন উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে আয়োজিত মেলার বয়স প্রায় চারশ বছর। উল্লেখ্য যে খ্যাতকীর্তি বৈষ্ণব কীর্তনিয়া গোকুল দাসের জন্মও এই গ্রামে।

কেতুগ্রামের দুটি ব্লকের বিভিন্ন স্থানে চৈতন্য-চিহ্ন ও চর্চার ক্ষেত্র এখনও বিরাজমান। ১নং

ব্লকের কাঁদড়া, দধিয়া ও ন'পাড়া এই ক্ষেত্রগুলির মধ্যে অগ্রগণ্য। কাঁদড়া গ্রামের নাম ইতিহাস সম্পর্কে যতটুকু জানা যায় তা হ'ল ঃ মুর্শিদাবাদ জেলার ধুলিয়ানের কাছে কিরীটকণা গ্রামের (অন্যতম শক্তিপীঠ) কিরীটেশ্বরী দেবীর পূজারী অকৃতদার মঙ্গল ঠাকুর বৈরাগ্যবশত নিজের গ্রাম ছেড়ে কাঁদড়ায় এসে নির্জন জায়গা দেখে সাধন ভজন শুরু করেন। তাঁর দীক্ষাদান পদ্ধতি ছিল কর্ণ ধারণ করে মন্ত্র পড়া। সেই থেকেই এই গ্রামের নামকরণ ঃ কর্ণধারণ > কান্‌ধরা > কান্দরা > কাঁদড়া। অন্যমত অনুসারে বড় বড় নদী থেকে যে ছোট ছোট শাখা বেরয় তাকে স্থানীয় ভাষায় কাঁদড়া বলে। এখানকার কাঁদড়ের ধারে অকৃতদার মঙ্গলঠাকুর স্বপ্নাদেশে সংসারী হলে এবং তাঁকে ঘিরে গড়ে ওঠা জনবসতি 'কাঁদড়া' নামে অভিহিত হয়। উল্লেখ্য যে ১৫১০ খ্রিষ্টাব্দে কাটোয়ায় কেশব ভারতীর কাছে দীক্ষা নেওয়ার পর রাঢ়দেশ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে গঙ্গা-তীর ধরে কেতুগ্রাম পার হয়ে কাঁদড়ায় এসে (তেসরা মাঘ) মঙ্গলঠাকুরের বাড়িতে আশ্রয় নেন চৈতন্যদেব। শ্রীচৈতন্য দেবের সঙ্গে ছিলেন গদাধর, মুকুন্দসহ বহু পার্ষদ। এই উপলক্ষে আজও প্রতিবছর তেসরা মাঘ চৈতন্য স্মৃতি বিজড়িত গৌরাঙ্গডাঙায় উৎসব হয়। মঙ্গলঠাকুরের বংশে শশিশেখর, চন্দ্রশেখর, গোকুলানন্দ, বংশীবদন ঠাকুরসহ বহু বৈষ্ণব পদকর্তা ও মহাজনের জন্ম হয়। বৈষ্ণবপদ রচনা ছাড়াও বংশীবদন ঠাকুর 'দীপান্বিতা' নামে একটি ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থও রচনা করেছিলেন। বলা হয় যে 'মনোহরশাহী' কীর্তনের উৎস এই কাঁদড়া গ্রাম।

১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্যের প্রয়াণের পর প্রাথমিক শোক ও মুহ্যমানতা কাটিয়ে বৈষ্ণব সম্প্রদায় নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর নিরিখে চৈতন্যকে কলিযুগের অনন্য অবতার হিসেবে সমৃদ্ধ করে তুললেন। এই সমৃদ্ধকরণ কল্পনার উৎকর্ষ ফলশ্রুতি হ'ল বৈষ্ণব পদাবলী। আর এই উৎকর্ষ-তার শিখর স্পর্শ করে চৈতন্য-উত্তর সময়কালে ষোড়শ শতকের শেষ পাদে। বৈষ্ণব পদসাহিত্য সৃজনে যে তিন পদকর্তাকে শীর্ষস্থানীয় (চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দ দাস) ধরা হয় ; তার মধ্যে জ্ঞানদাসের জন্ম (১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দ) এই কাঁদড়া গ্রামে। চারশর উপর পদ তিনি রচনা করেছিলেন যার এক চতুর্থাংশের ভাষা ব্রজবুলি আর বাকিগুলি বাংলা। তাঁর পূর্বরাগ, রূপানুরাগ, আক্ষেপানুরাগ, রসোদ্‌গার প্রভৃতি পর্যায়ের পদগুলি অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ও ভাব সমৃদ্ধ। একটি উদাহরণ ঃ 'সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু / অনলে পুড়িয়া গেল / অমিয় সাগরে সিনান করিতে / সকলই গরল ভেল। / সখি কি মোর করমে লিখি ...' জ্ঞানদাসের সঙ্গে জড়িয়ে কাঁদড়া গ্রামের পরিচয় আজ 'জ্ঞানদাস-কাঁদড়া' নামে। জ্ঞানদাসের তিরোধান দিবস উপলক্ষে এখানকার 'জ্ঞানদাসপাট' নামক স্থানে প্রতিবছর পৌষ সংক্রান্তিতে জ্ঞানদাস প্রতিষ্ঠিত রাধাগোবিন্দ মূর্তিকে ঘিরে বহু ভক্তসমাগম হয়। অনেক সাহিত্য গবেষকের মতে 'মনসামঙ্গল'-এর রচয়িতা কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের জন্মস্থান এই কাঁদড়া গ্রামে। আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষের নবমী থেকে মহালয়ার দিন পর্যন্ত এই গ্রামের রাধাবল্লভ, বৃন্দাবনচন্দ্র ও রাধাকান্ত জিউ-এর মন্দিরে প্রায় ছ'শ বছর ধরে চলে আসছে খাঁজি উৎসব। এছাড়া 'সা-সাহেব' নামে এক পীরের সমাধি আর গ্রামের দক্ষিণে বুড়োপীর ঠাকুরকে ঘিরে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে মানত ও উক্তি-র বাহুল্য দৃষ্ট হয়।

প্রখ্যাত বৈষ্ণবসাধক ও চৈতন্যের প্রেমধর্মের পূজারী শ্রীমৎ গোপালদাস ব্রজবাসী বা গোপালদাস বাবাজীর শ্রীপাট এই কেতুগ্রাম ১নং ব্লকের দধিয়া গ্রামে কোপাই নদীর একটি শাখা (কাঁদড়) 'পূর্ণা-মা'র উত্তর প্রান্তে। ১৭২৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গোপাল দাস বাবাজীর। ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দধিয়ায় এসে রঘুনাথ জিউ-কে প্রতিষ্ঠা করেন মাঘ মাসে শুক্লা ষষ্ঠীর দিনে। বর্ধমানের মহারাজা তিলকচাঁদের কাছ থেকে তিনি ৬৯ বিঘা জমি পান। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় দধিয়াকে কেন্দ্র করে গোপালদাস সপার্ষদ গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করে অন্নদান উৎসব করেন। সেই থেকে প্রতিবছর দধিয়া বৈরাগ্য তলায় সরস্বতীর পূজোর পর যে সপ্তমী আসে সেদিন থেকে তিনদিন ব্যাপী যে অন্নদান উৎসব ও মেলা আয়োজিত হয় তা ব্যাপকতায় ও প্রাচীনত্বে বর্ধমান জেলায় প্রথম স্থানে আছে। কথিত আছে এই মেলায় হাতি পর্যন্ত বিক্রি হত। কাটোয়ায় দীক্ষা নেওয়ার পর চৈতন্যদেব কুলাই-গ্রামে চৈতন্য অনুচর পদাবলীকার বাসুদেব ঘোষ-এর বাড়ি যাওয়ার পথে অজয় তীরবর্তী ন'পাড়া গ্রামের বটতলায় একটু বিশ্রাম নিয়েছিলেন; যে জায়গাটি এখনও 'বিশ্রামতলা' অভিধায় প্রকীর্তিত।

কেতুগ্রাম ১নং ব্লকের কুলুট গ্রামের মসজিদটির গায়ে আঁকা পোড়ামাটির নকশা মুসলিম স্থাপত্য ও শিল্পসৌকর্যের অপরূপ নিদর্শন। গৌড়ের প্রজাবৎসল সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ্ (মতান্তরে সুলতান রুকনুদ্দিন বরবক শাহ্) পঞ্চদশ অথবা ষোড়শ শতকে এই মসজিদটি নির্মাণ করেন। এছাড়া এই ব্লকের শ্রীপুর ও যাননাগরার মাঠ বহু প্রত্নসম্ভাবনা বুকে নিয়ে গবেষকদের পথ চেয়ে প্রতীক্ষারত। কেতুগ্রাম ২ নং ব্লকের অন্তর্গত এলাকার চৈতন্যচর্চার প্রাণকেন্দ্র হিসেবে উল্লেখনীয় হল ঝামটপুর গ্রাম। মহাপ্রভুর প্রামাণ্য জীবনীগ্রন্থ 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থের রচয়িতা পরমবৈষ্ণব কৃষ্ণদাস কবিরাজের জন্ম এই ঝামটপুর গ্রামে। চিরকুমার, 'তৃণাদপী সুনীচেন' ব্যবহারে বিনয়াবনত কৃষ্ণদাস বৃন্দাবনের আচার্যদের অনুরোধে চৈতন্য জীবনের অন্ত্যখণ্ড বিস্তারিতভাবে লেখেন। চৈতন্যজীবনের আদি-মধ্য অংশের ঘটনাকে সংক্ষেপে বর্ণনা করে অন্ত্যখণ্ডকে সুবিস্তৃতভাবে লিখে তিন খণ্ডে বিভক্ত ৬২ টি অধ্যায়ে ১২ হাজার ৫১টি শ্লোকে বিভাজিত করে চৈতন্যজীবনী সম্পন্ন করেন কৃষ্ণদাস। এই গ্রন্থে চৈতন্যদেবের ভারত ভ্রমণের অনুপুঙ্খ বর্ণনার পাশাপাশি বৈষ্ণবতত্ত্ব ও দর্শনের 'অমৃত' পরিবেশনে বেশি মনোযোগী ছিলেন। সেই সঙ্গে যোজিত হয়েছে ঐকান্তিক ভক্তিভাবাশ্রিত দুর্লভ-কবিত্ব শক্তি। – 'আমি অতি ক্ষুদ্র জীব পক্ষী রাঙ্গাটুনি / সে যৈছে তৃষ্ণায় পিয়ে সমুদ্রের পানি। তেমনি আমি এক কণা ছুঁইলুঁ লীলার / এই দৃষ্টান্তে জানিহ প্রভুর লীলার বিস্তার'। ইউরোপীয় সাহিত্যে সন্তদের সফল জীবনী গ্রন্থকে Hegiography বলে। 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' এই শ্রেণীভুক্ত রচনা। কৃষ্ণদাস রাধাকৃষ্ণলীলাকে উপজীব্য করে 'গোবিন্দলীলামৃত' নামে একটি গ্রন্থও লিখেছিলেন। এছাড়া 'অদ্বৈতসূত্র কড়চা', 'স্বজন পবর্নম', 'বাগময়ীরুণা' ও দক্ষিণভারতীয় 'কৃষ্ণকথামৃত'র টীকাভাষ্য এই গ্রামে বসেই রচনা করেন সংস্কৃতজ্ঞ কৃষ্ণদাস। তাঁর তিরোধান দিবস উপলক্ষে প্রত্যেক বছর আশ্বিন মাসে ঝামটপুর গ্রামে যে মেলা বসে তার

বয়স প্রায় তিনশ বছর। এই উপলক্ষে বহু বৈষ্ণব ভক্ত সমাগমও হয়।

ঝামটপুর গ্রামের পাশেই অবস্থিত বহড়ান গ্রামটি হল বর্ধমান জেলার অন্যতম প্রাচীন গ্রাম। বাংলার প্রাচীন গ্রন্থ 'কায়স্থ কুল পঞ্জিকা' ও 'ঘটক কুল নির্ণয়' গ্রন্থে এই গ্রামের উল্লেখ আছে। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতক বা তারও আগে এই গ্রামটি ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এই সময়ে বাংলার রাঢ় প্রদেশে আদিত্যশূর (মতান্তরে আদিশূর)-এর রাজসভায় কান্যকুব্জ বা কনৌজ থেকে আগত পাঁচজন কায়স্থের মধ্যে পুরুষোত্তম দাস-কে বহড়ান গ্রামটি দান করা হয়। পুরুষোত্তম দাসের অধস্তন সপ্তম পুরুষ অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী রামদাস 'সরস্বতী' উপাধি পান। এই গ্রামে চৈত্র মাসে অনুষ্ঠিত শিবপুজো ও চড়ক মেলার বয়স সাতশ বছরেরও বেশি। গ্রামের দুর্গাপুজোর বয়সও দুশো বছরের কাছাকাছি। এখানকার নিরোল মৌজার দক্ষিণডিহি গ্রামের দেবী শক্তিরূপা অট্টহাস দেবীকে ঘিরে প্রতিবছর মাঘ মাসে রটন্তী চতুর্দশী তিথি থেকে তিনদিন ব্যাপী সার্বজনীন উৎসবের আয়োজন করা হয়।

দ্বাদশ গোপালের অন্যতম উদ্ধারণ দত্তের নাম অনুসারে আজ থেকে প্রায় পাঁচশ বছর আগে নৈহাটি গ্রামের নাম হয় উদ্ধারণপুর। হুগলী জেলার সপ্তগ্রাম নিবাসী উদ্ধারণ দত্ত প্রথম জীবনে ছিলেন নৈরাজা-র মন্ত্রী বা দেওয়ান। প্রথমে তিনি উচ্চাকাঙ্খী হলেও নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর সংস্পর্শে এসে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেন এবং নিত্যানন্দ ও শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে তীর্থ পরিক্রমা শুরু করেন। চিরকুমার এই উদ্ধারণ দত্ত ভাগীরথী তীরবর্তী শাঁখাই গ্রামের ঘাটে একদিন দেখেন গঙ্গাদেবী এক শাঁখারির কাছে শাঁখা পরছিলেন। এই অতিলৌকিক কাহিনীকে প্রতিষ্ঠা দিতে ঘাটটির নামকরণ হয় 'উদ্ধারণ দত্তের ঘাট'। প্রতিবছর মাঘ মাসের পয়লা এই উদ্যানপুর বা উদ্ধারণপুরে শ্রীচৈতন্যের প্রধান পার্ষদ ও দ্বাদশ গোপালের অন্যতম উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের আবির্ভাব উৎসব এবং উদ্ধারণ ঠাকুরের সমাধি বেদিতে পৌষ সংক্রান্তিতে শ্রাদ্ধবাসর উপলক্ষে আয়োজিত মেলার বয়স পাঁচশ বছরেরও বেশি। উদ্ধারণপুরের শ্মশানটিও অবস্থান গরিমায় শক্তিসাধকদের চারণ ক্ষেত্র রূপে প্রতিষ্ঠিত। মঙ্গলকোটের বিভিন্ন অঞ্চলেও চৈতন্যচর্চার চিহ্ন পরিদর্শিত হয়। ধামালি (না কি ধামালী)-র ঢঙে লেখা চৈতন্য জীবনীগ্রন্থ 'চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থের রচয়িতা লোচন দাসের নিবাস মঙ্গলকোটের উজানী বা কোগ্রামে। ১৫৫০ থেকে ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোনোও এক সময়ে এই গীতিময় কাব্যটি চারটি খণ্ডে (সূত্রখণ্ড, আদিখণ্ড, মধ্যখণ্ড ও শেষখণ্ড) এগার হাজার ছত্রে বিন্যস্ত। গৌরাঙ্গ চন্দ্রের রূপ বর্ণনায় কবি লিখেছেন, 'ধবল পাটের জোড় পর্য্যাছে / রাঙ্গা রাঙ্গা পাড় দিয়্যাছে / চরণ উপর দল্যা যাইছে কোঁচা।' আর তাঁর আদি অকৃত্রিম ধামালী রীতির পরিচয় হল ঃ 'রূপ-রসে / জগৎ ভাসে /এ চৌদ্দ ভুবনে / খাইলে খজে / দেখলে মজে / কহিলে কেবা জানে।/ বিষম সেবা / লইয়ে যেবা / আপনা মারে যে / লোচন বলে / অবহেলে / গৌর পাবে সে।' কোগ্রামে অজয় তীরবর্তী এলাকায় অবস্থিত লোচনদাসের সমাধিক্ষেত্রটি নদীর গ্রাসে লীন হয়ে যেতে বসায় এখানকার বাসিন্দা পল্লীকবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের উদ্যোগে গ্রামের ভিতরে তাঁর সাধন ক্ষেত্র ও সমাধিক্ষেত্র প্রতিস্থাপিত করা হয়। মাঘমাসে লোচনদাসের তিরোভাব দিবস উপলক্ষে এখানে

আয়োজিত মেলা, কীর্তন ও নামগানের অনুষ্ঠান বেশ প্রাচীন। পুরনো সরকারি তথ্যে এই মেলা সম্পর্কে পাই ঃ A large number of pilgrims resort to the place on the anniversary of Lochan Das's death where a large fair is held.

রাঢ় দেশে ভ্রমণ করার সময় কৈচর ও মাজিগ্রামের মাঝামাঝি একটি গ্রামে ক্লান্ত মহাপ্রভু চৈতন্যদেব হঠাৎ অচেতন হয়ে পড়েন। তাঁর শিষ্যদের ঐকান্তিক চেষ্টায় মহাপ্রভু চৈতন্য ফিরে পান বলে এই গ্রামের নাম হয় চৈতন্যপুর। তবে চৈতন্যস্পর্শ চিহ্ন পরিচয়ের থেকেও এই গ্রামটির যে পরিচয় বেশি করে নজর কেড়েছে; তা হল গ্রামের জমিদার রায়চৌধুরীদের বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত কৃষক অভ্যুত্থান। নিখিলানন্দ সর ও সমর বাওড়ার নেতৃত্বে এই আন্দোলনে বনমালী কুশমেটে ও পাঁচকড়ি মাঝি নামে দু'জন ভূমিহীন কৃষক জমিদারদের গুলিতে নিহত হন। গুরুতর আহত হন সমর বাওড়া। এই গ্রামের ৫০০ বছরের পুরনো ন্যাংটেশ্বর শিবের মেলা এখনও শিবরাত্রিতে মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়। কালো পাথরের এই মূর্তিটি নবম বা দশম শতকের পাল যুগের বলে অনুমিত হয়।

মঙ্গলকোটের কাঁকোড়া বা কঙ্কননগর বা কর্কটনগর গ্রামটি বেশ পুরনো। ইতিহাস বলছে এই শৌর্যশালী গ্রামটিকে ভাস্কর পণ্ডিত সাতদিন অবরোধ করে রেখেও দখল করে নিতে না পেরে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেন। অষ্টনাগের এক নাগ কর্কটনাগের অধিষ্ঠান এই গ্রামে। দশহরার পরের নাগপঞ্চমীতে মহাধূমধাম করে এই গ্রামের পুজোয় অব্রাহ্মণদের প্রাধান্যই বেশি পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। এই ব্লকের ক্ষীরগ্রাম হল একান্ন পীঠের এক পীঠ। দেবী দুর্গার ডান পায়ের আঙুল বিষ্ণুচক্রে ছিন্ন হয়ে এই গ্রামে পড়েছিল। ক্ষীরগ্রামের শক্তি যোগাদ্যা বা যুগাদ্যা নামে খ্যাত। আর এই দেবীর হিসেবে গ্রামের চার পাশের চারটি গ্রামে চারজন শিবের অবস্থান। এঁরা হলেন ঃ নিগণের লিঙ্গেশ্বর, গীর্বগ্রামের গীর্বেশ্বর, পুইনি-পলাশির পাতালেশ্বর আর সিম্বল বা শীতলগ্রামের সিদ্ধেশ্বর। সারা বছর গ্রামের পাশে ক্ষীর দীঘিতে ডুবে থাকেন দেবী। বৈশাখের সংক্রান্তিতে দেবীমূর্তিটিকে জল থেকে তুলে সারাদিন পুজো হয়। যজ্ঞকুণ্ডে হোম হয়, মহিষবলি হয়। মেলা বসে। মঙ্গলকাব্যের চাঁদ সদাগর মঙ্গলকোটের মাজিগ্রামে মাঝিদের বসত করেছিলেন। আবার এই গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শাকম্ভরী মা-কে 'জী' সম্বোধন করা হত বলে গ্রামের নাম 'মাজিগ্রাম' বলে অনেকের ধারণা।

মোগল যুগ ও বর্গির হাঙ্গামা

মোগল যুগে পাঠান সুলতান দাউদ খাঁর মৃত্যুর পরই প্রকৃতপক্ষে কাটোয়া মোগলদের অধীন হয়। আইন-ই-আকবরি -তে বর্ণিত বর্ধমানের যে মহলের উল্লেখ আছে কাটোয়া সম্ভবত তারই অন্তর্ভুক্ত ছিল। খুর্‌রম যখন সাজাহান হননি, পিতা জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে লড়াই করার অনুপ্রেরণা নিতে কাটোয়ার মঙ্গলকোটে এসেছিলেন তাঁর দীক্ষাগুরু হজরত আব্দুল হামিদ বাঙালি দানেশ মন্দের কাছে (১৬২৪ খ্রীঃ) । আবার বাংলার নবাব

মুর্শিদকুলি খাঁ কাটোয়াকে মুর্শিদাবাদের প্রবেশ দ্বার হিসেবে গণ্য করে কাটোয়ায় একটি মাটির দুর্গ নির্মাণ করেন। এছাড়া ফারুক শিয়ার যখন দিল্লির সিংহাসনে (১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দ) তখন মোগল সম্রাট জাহান্দার শাহের জনৈক উজির সৈয়দ শাহ্ আলম খাঁ দিল্লিতে বাস করা নিরাপদ মনে না করে বিভিন্ন জায়গা ঘুরে শেষ কাটোয়ায় এসে ধর্মসাধনায় মন দেন এবং ১১২৭ হিজরী সনে একটি মসজিদ তৈরী করান। নিজের বাসস্থানকে সুরক্ষিত করতে শাহ্ আলম খাঁ যে গড় (বর্তমানে কাটোয়া বাগানে পাড়ায় অবস্থিত) খনন করেছিলেন তার ও শাহ্ আলমের বাড়ির তেরশটি সিংদরজা এখনও আছে। আলিবর্দি খাঁ বাংলার মসনদে বসতেই (১৭৪০ খ্রীঃ) বর্গী হাঙ্গামা শুরু হয়ে যায়। ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ এপ্রিলের ভোররাতে নবাব আলিবর্দির বর্ধমানের রাণীসায়র স্থিত শিবিরটি মারাঠা সেনাপতি ভাস্বররাম কোলহাতকর প্রায় ২০ হাজার সৈন্য নিয়ে আক্রমণ করেন। এই ঘটনায় বর্ধমান ও লাগোয়া ৬০ কিমি. অঞ্চলে ব্যাপক হাঙ্গামা শুরু হলে নবাব কাটোয়ায় আসতে মনস্থ করেন। বর্গী হাঙ্গামায় আক্রান্ত ভাগীরথীর তীরবর্তী মূল জায়গাগুলি প্রত্যক্ষদর্শী কবি গঙ্গারামের ভাষায় ঃ গোটপাড়া চাঁদপাড়া আর য়াদগিয়া । রাতারাতি পাটলি দিল পোড়াইয়া ।।/ আতাইহাট পাতাইহাট আর দাঞিহাট।/ বেড়া ভাওসিংহ পোড়াত্র আর বিকিহাট।।/ এইরূপে ইন্দ্রাইন পরগণা বরগি লুটি।/ কাগা মোগাত্র লুটে ওলন্দেজের কুটি।।

১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত বর্গীরা এই অঞ্চলে দ্বিতীয় অভিযান চালায়। ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর বর্গীদের তাড়িয়ে আলিবর্দি মুর্শিদাবাদে ফিরতে না ফিরতেই মারাঠা সর্দার রঘুজি ভোঁসলে নাগপুর থেকে ভাস্কর পণ্ডিতকে নিয়ে কাটোয়ায় এসে হাজির হন। অনুগত সেনাপতি ভাস্করের বিতাড়নের প্রতিশোধ নিতে আর প্রধানত চৌথ আদায়ের উদ্দেশ্যে রঘুজি ভোঁসলের এই আগমন। তবে নবাবের সুবিধা হয়ে গেল এই সময়ে পেশোয়া বালাজি বাজিরাও তাঁর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী রঘুজিকে আক্রমণের উদ্দেশ্যে মুর্শিদাবাদে এসে হাজির হন। আলিবর্দি বাজিরাও-এর সঙ্গে সন্ধি করে যৌথ বাহিনী নিয়ে কাটোয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার খবরে রঘুজি নাগপুরে পালান। তবে এই সময়ে মারাঠা সৈন্যের অত্যাচারে মানুষের জীবন অতিষ্ঠ হয়েছিল। মহারাষ্ট্র পুরাণকার গঙ্গারামের বর্ণনায় ঃ 'তবে সব বরগি গ্রাম লুটিতে লাগিল / জত গ্রামের লোক সব পলাইল। / ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পলায় পুঁথির ভার লইয়া / সোনার বাইনা পলায় কত নিক্তি হুড়পি লইয়া। / গন্ধ বণিক পলায় দোকান লইয়া জত / তামা পিতল লইয়া কাঁসারি পলায় কত । / শঙ্খ-বণিক্ পলায় কয়াত লইয়া জত / চতুর্দিকে লোক পলায় কি বলির কত।'

তৃতীয় পর্যায়ে বর্গি অভিযান চলে ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস থেকে ১৭৪৪-এর জুন পর্যন্ত এক বছরেরও বেশি সময় কাল ধরে। এই অভিযানে আলিবর্দি কৌশলের দ্বারস্থ হয়ে ভাস্কর পণ্ডিতকে কপট সন্ধির প্রস্তাব দিলেন। এই মোতাবেক ভাস্কর ২১ জন সৈন্য সহ বহরমপুরের কাছে মানকরা নামক স্থানে পৌছন মাত্র আলিবর্দির নির্দেশে ভাস্কর পণ্ডিত সহ ২১ জন মারাঠি সৈন্যকে নবাবি সৈন্যরা হত্যা করে (মার্চ ৩১, ১৭৪৪ খ্রীঃ)। এরপর

নবাবের সামনে এক নতুন বিপদ উপস্থিত হয়। সেনাপতি মুস্তাফা খাঁ-র বিদ্রোহের সুযোগে মীর হাবিব পলায়নপর মারাঠা সৈন্যদের একত্রিত করে অতর্কিতে মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করেন (ডিসেম্বর ২১, ১৭৪৫ খ্রীঃ)। এরপর নবাবি সৈন্যদের হাতে পর্যুদস্ত হয়ে রঘুজি পালিয়ে যান এবং মীর হাবিবও শেষ পর্যন্ত উড়িষ্যায় পালান।

বর্গিদের চতুর্থ অভিযানটি (১৭৪৮ খ্রীঃ) হয় রঘুজির পুত্র জানোজির নেতৃত্বে। বয়সের ভার, স্বজন বিদ্রোহ, অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্রে সেই সময়ে আলিবর্দি জর্জরিত। প্রায় বাধ্য হয়েই ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি করে কাশিমবাজার কুঠি থেকে কাটোয়া অভিযান করলে মারাঠারা ইংরেজদের ৪.৩৫·লক্ষ টাকা মুল্যের মালপত্র লুঠ করে। শেষ পর্যন্ত সমান্ত নবার বাধ্য হয়ে রঘুজির সঙ্গে সন্ধি করেন (মে, ১৭৫১ খ্রীঃ) সন্ধির চুক্তি অনুসারে নবাব কটকের উপর প্রভূত্ব ত্যাগ করেন ও বার্ষিক বারো লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হন।

'কৃপায় কৃপণ, গর্ভবতী ও শিশুর পীড়ক' হিসেবে খ্যাত বর্গী আক্রমণে কাটোয়াবাসীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের ভিত্তি পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায়। কাটোয়ায় দেশি-বিদেশি সমস্ত ব্যবসা স্তব্ধ হয়ে যায়। কৃষিকাজ ব্যাহত হওয়ায় কাঁচামালের উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। তন্তুবায় শ্রেণী সহ প্রায় সকলেই যাযাবর শ্রেণীতে পরিণত হওয়ায় কার্পাস বয়ন কেন্দ্রগুলি বন্ধ হয়ে যায়। মাটিয়ারি, দাঁইহাট, বেগুনকোলা প্রভৃতি অঞ্চলের কাংস শিল্প এবং বর্গিদের ঘোড়ায় তুঁত গাছ খেয়ে ফেলায় চাণ্ডুলি, মুস্থুল প্রভৃতি অঞ্চলের রেশম শিল্পও সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

নবাব যখন সৈন্যসহ তারকপুর আসেন তখন মারাঠারা কাটোয়ায় পালান। নবাবের সৈন্যদল প্রথমে মুর্শিদাবাদের পশ্চিমাংশ থেকে মারাঠাদের বিতাড়িত করেন এবং পরে কাটোয়ায় ভাগীরথীর পূর্ব পাড়ে রহনপুর নামক স্থানে উঁচু মাচা বেঁধে কাটোয়ার শত্রুশিবিরের উপর কামান দাগতে থাকেন। ফলে ভাস্কর পণ্ডিতের দল দাঁইহাটের দিকে এগোতে থাকেন। এই সময় প্রচণ্ড বর্ষায় ভাগীরথী উন্মত্ত হয়ে পড়ে। ফলে নবাব আর তাকে আক্রমণ করতে পারবে না ভেবে এবং এই প্রবল বর্ষণ দেবী দুর্গার আশীর্বাদ মনে করে ভাস্কর পণ্ডিত দাঁইহাটে দশেরা উৎসব (দুর্গাপুজো) পালন করেন। এই খবর পেয়ে নবাব মোস্তাফা খান, শামসের খান,রহিম খান, উমর খান , জৈনুদ্দিন ও জাফর খানের অধীনে বাছাই করা সৈন্য নিয়ে উপস্থিত হন এবং নৌকার পর নৌকা সাজিয়ে সেতু তৈরী করে ভাগীরথী অতিক্রম করেন। ২৭ শে সেপ্টেম্বর মহা অষ্টমীর ভোর রাতে আচমকা মারাঠা শিবিরে আক্রমণ করলে হতবিহ্বল মারাঠারা কোনো রকমে দেবীর নিরঞ্জন করে পঞ্চকোটের দিকে চলে যান।

নবাব আলিবর্দি খাঁর আমলে যখন বর্গী আক্রমণ হয় তখন বর্ধমানের রাজা ছিলেন চিত্রসেন রায় এবং পরবর্তিকালে ত্রিলোকচাঁদ। আলিবর্দি খাঁ উড়িষ্যার বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত (১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দ) থাকার সময়েই খবর পান মারাঠা সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত চল্লিশ হাজার ঘোড়সওয়ার নিয়ে বিষ্ণুপুর আর বীরভূমের ভিতর দিয়ে বর্ধমানে প্রবেশ করেছে। এই খবর

পেয়েই আলিবর্দি বর্ধমানেই বর্গীদের গতিরোধ করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু নবাবি সৈন্যদের খাদ্য সঙ্কট ঘনীভূত হওয়ায় আলিবর্দি ২২শে এপ্রিল কাটোয়ার উদ্দেশ্যে বর্ধমান ত্যাগ করেন। সেখান থেকে নিগণ চটিতে পৌঁছলে ২৪শে এপ্রিল সেখানে বর্গিদের সঙ্গে একটি ছোটখাট যুদ্ধ হয়। এমনকি আলিবর্দির বেগম বন্দি হওয়ার উপক্রম হন। এই অবস্থায় অসহায় আলিবর্দি ভাস্কর পণ্ডিতকে সন্ধির প্রস্তাব দিলে ভাস্কর তা ফিরিয়ে দেওয়ায় যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। আফগান সেনাপতি মুস্তাফা খানকে প্রায় হাতে পায়ে ধরে বর্গিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রায় রাজী করান আলিবর্দি। শেষ পর্যন্ত ২৫শে এপ্রিল 'নিগণ সরাই'-এ প্রচণ্ড যুদ্ধ বাধে। নবাব কাটোয়া পৌঁছানর সিদ্ধান্ত নেন। বর্ধমান থেকে কাটোয়া আসতে নবাবি সৈন্যদের দেরি হওয়ার সুযোগে বর্গিরা খুবই দ্রুততায় কাটোয়ার শস্যভাণ্ডার লুঠ করে। বর্গিদের প্রতিহত করেই ৭ই মে নবাব সসৈন্যে মুর্শিদাবাদ ফিরে যান।

বর্গীরা প্রথমে ঠিক করেছিল নবাবের পিছু পিছু ধাওয়া করেই মুর্শিদাবাদ পৌঁছবে। কিন্তু দুটো কারণে তারা কাটোয়া না ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেয়। প্রথমত কাটোয়ার ভৌগোলিক গুরুত্ব এবং সুজাউদ্দিনের প্রাক্তন সেনাপতি ও আলিবর্দির চিরশত্রু মীর হবিবের সাহচর্য। বর্গীদের পরামর্শদাতা মীর হবিব মুর্শিদাবাদে জগৎশেঠের ধনভাণ্ডারের সন্ধান দেওয়ায় রাতের অন্ধকারে বর্গীদের সেই ভাণ্ডার লুঠ করতে (৬ই মে) সুবিধা হয়েছিল। মীর হবিবের পরামর্শেই বর্গীরা বর্ষাকালে কাটোয়াতেই থেকে গেল। দাঁইহাটের কাছে দেওয়ানগঞ্জে ছিল বর্গীদের মূলশিবির। মূলত কাটোয়া থেকে দাঁইহাট পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে গড়ে উঠেছিল বর্গীদের উপনিবেশ।

অন্য যে ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঘটনার জন্য ইতিহাসের পাতায় কাটোয়ার স্থায়ী আসন সেটি হলঃ কাটোয়ায় মীরকাসিমের সঙ্গে ব্রিটিশ সৈন্যদের যুদ্ধ। এই যুদ্ধের (১৭৬০ খ্রীঃ) নবাবী পক্ষের সেনানায়ক ছিলেন কাটোয়া দুর্গের প্রধান তকি খাঁ আর ইংরেজদের পক্ষে প্রধান ছিলেন কর্ণেল স্নেন। ভাগীরথী তীরবর্তী কাটোয়ার শাঁখাই এবং এই সঙ্গে গেরিয়া ও উধুয়ানালার যুদ্ধে ইংরেজদের হাতে মীরকাসিমের পরাজয় হয়। এই যুদ্ধে ভাগীরথীর কালো জলে দেশের স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়; যে সূর্য উঠতে প্রায় দুশো বছর লেগে যায়।

স্বাধীনতা আন্দোলন

এই দুশো বছরের পরাধীনতার ইতিহাসে স্বাধীনতার লড়াইয়েও কাটোয়া স্বীকৃত। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে কালিকাপুরের ডাঃ গুণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও দাঁইহাটের জিতেন্দ্রনাথ মিত্রের নেতৃত্বে কাটোয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয় আত্মোন্নতি সমিতি। এলাকার ছাত্র, শিক্ষক, সাধারণ মানুষ স্বদেশী, বয়কট, কারাবরণ প্রভৃতি দেশাত্মবোধক কাজকর্মে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। যুগান্তর দলের একটি শাখাও কাটোয়ায় ছিল। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে চাণ্ডুলিয়া নিবাসী অধ্যাপক প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় প্রথম কারাবরণ করেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু কাটোয়ায় এসে গুণীন্দ্রনাথ বাবুর বাড়িতে আন্দোলনের পদ্ধতি ও প্রকরণ সম্পর্কে বৈঠক করেন। এছাড়া

উল্লাসকর দত্ত মহাশয়ও কাটোয়ায় এসেছিলেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সহযোগী হিসেবে জিতেন্দ্রনাথ মিত্র কাটোয়ায় স্বরাজ্য দলের প্রতিষ্ঠা করলেও সুভাষচন্দ্রেব ফরওয়ার্ড ব্লক প্রতিষ্ঠার (১৯৩৮ খ্রীঃ) সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু মানুষ এই দলের হয়ে কাজকর্ম করতে থাকেন। তবে মূলতঃ জিতেনবাবু ও গুণীবাবুকে কেন্দ্র করে কাটোয়ায় গান্ধীবাদী আন্দোলনের ধারাটিই বেশী মাত্রায় প্রকট ছিল। এই দুজনের সহযোগী হিসেবে দাঁইহাটের স্বামী নির্মলানন্দ সরস্বতী, মঙ্গলকোটের আবুল হায়াত, কাটোয়ার বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, হরেরাম মণ্ডল, মহিমারঞ্জন ঘটক, বিজনগরের মনীন্দ্রমোহন বক্সী, কেতুগ্রামের বিভূতিভূষণ দত্ত প্রমুখ কাজ করেছিলেন। বিপ্লবী কানাইলালের ফাঁসি হলে মহকুমার গঙ্গাটিকুরি নিবাসী ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বঙ্গভূমি' পত্রিকায় পঞ্চানন্দ ছদ্মনামে লিখলেন – 'দ্বাপরে কানাই ছিল নন্দের নন্দন।/কলিতে তাঁতির ঘরে দিলা দরশন।।/তাহারে ছলিয়া নিল অক্রুর গোঁসাই।/গোঁসাইরে দিল কানাই বৃন্দাবনে ঠাঁই।।/গোঁসাই হল গুলিখোর কানাই নিল বাঁশি।/ কোন চোখেতে কাঁদি বল কোন চোখেতে হাসি।।' এছাড়া সেই সময়ের কাটোয়া থেকে প্রকাশিত পত্রিকা 'প্রসূন' -এ মূলত সরকার পক্ষীয় কাজকর্মের কথাই প্রকাশ পেত।

কমিউনিস্ট আন্দোলনের ধারাটিও কাটোয়ায় বেশ প্রবল ছিল। ক্ষীরগ্রাম নিবাসী দাশরথি চৌধুরী ও করজগ্রামের অশ্বিনী মণ্ডল প্রথম দিকে কংগ্রেস কর্মী হিসেবে কাজ করলেও পরে এই দুজনকে কেন্দ্র করেই কমিউনিস্ট আন্দোলনটি কাটোয়ায় সংগঠিত রূপ নেয়। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই দুজনকে মধ্যমণি করে শ্রীখণ্ড, কৈচর, করজগ্রাম, সুদপুর, কুরচি, অগ্রদীপ - কালিকাপুর প্রভৃতি গ্রামে কৃষক সংগঠনের কাজ চলতে থাকে। এইসব সংগঠনের কাজকর্মে নেতৃত্ব দিতেন নদীয়ানন্দ ঠাকুর, ললিত হাজরা, অনঙ্গ রুদ্র, জ্যোতিষ সিংহ, শান্তব্রত চ্যাটার্জী প্রমুখ। এই সময়েই কাটোয়ায় প্রথম কমিউনিস্ট পার্টির অফিস খোলা হয়। দাশুবাবুর নেতৃত্বে আমোদপুর - কাটোয়া ও বর্ধমান - কাটোয়া (এ.কে, বি.কে.) রেল ইউনিয়ন তৈরী হয়। এই ইউনিয়ন ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে রেলওয়ে কর্মীদের বিভিন্ন দাবী - দাওয়া নিয়ে শ্রমিক ধর্মঘট করে ঐতিহাসিক সাফল্য অর্জন করে। গ্রামের কৃষক সংগঠনের পাশাপাশি শহর কাটোয়াতেও অজয় রায়, শশাঙ্ক চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের নেতৃত্বে শ্রমিক আন্দোলন বিস্তার লাভ করে। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত অগ্রদ্বীপের সুবোধ চৌধুরী গ্রামে ফিরে আসার (১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে) পর কাটোয়ার কমিউনিস্ট আন্দোলন বিশেষতঃ কৃষক আন্দোলনে নতুন প্রাণ সঞ্চার হয়। সুবোধবাবুর নেতৃত্বে অগ্রদ্বীপের জমিদারদের বিরুদ্ধে যে কৃষক আন্দোলন শুরু হয় সেটাই ছিল প্রকৃত প্রস্তাবে মহকুমার প্রথম সংগঠিত সুসংবদ্ধ কৃষক বিপ্লব ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম। এই আন্দোলনের অন্য প্রধান শরিক ছিলেন তেভাগা আন্দোলনের অংশীদার সৌরী ঘটক, শহীদ সুশীল চক্রবর্তী প্রমুখ। পরবর্তীকালে সুবোধবাবুর ভাবশিষ্য হিসেবে হরমোহন সিংহের নেতৃত্বে মহকুমার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ধারাটি আরও সমৃদ্ধ ও পুষ্ট হয়ে ওঠে।

কার্তিক পুজো ঃ কাটোয়ার নিজস্ব ঐতিহ্য

গঙ্গার নিম্নাভিমুখী প্রবাহ যেটা বর্ধমানে বাহিত তার নাম ভাগীরথী। এর তীরে উল্লেখযোগ্য

বন্দর হিসেবে প্রাচীনকালে কাটোয়া, দাঁইহাট, কালনার নিদর্শন মেলে। বর্তমানে কাটোয়ার বাঁদরা গ্রামটির নাম 'বন্দর' - এর অপভ্রংশ বলে ইতিহাসবিদদের দাবী। প্রাচীনকালে অজয়ের মূলধারাটি দক্ষিণে সাহেব বাগানের বেড়া গ্রামের পাশ দিয়ে ভাগীরথীতে মিশত। এখানেই একটি বৃহদাকার লৌহস্তম্ভ আছে যেখানে জাহাজ নোঙর করা হত। কাঁসা-পিতল, রেশম, পাথরের মূর্তি নির্মাণ শিল্পে দাঁইহাট শহরের (মূলত দেওয়ান গঞ্জকে ঘিরে) প্রসিদ্ধি ছিল সর্বাধিক। ব্যবসায়িক উৎকর্ষে দাঁইহাট জনবহুল থাকায় একটু দূরে ঘনবসতি ছেড়ে কাটোয়াকেই বেছে নিয়েছিল দেহ ব্যবসায়ীরা। তারাই কার্তিক মাসের সংক্রান্তিতে ঘরে ঘরে আরাধ্য (না কি নিষিদ্ধ ?) দেবতা কার্তিকের পূজো করত। যা এখন পরিবর্ধিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম লোকউৎসব হিসেবে মান্য। ইংরেজ শাসনকালে মোটামুটি আঠার শতক পর্যন্ত এই অঞ্চলে ভাগীরথী প্রবাহে যেসব পণ্যের আনাগোনা ছিল সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল প্রবাল, মণি-মুক্তা, পশম, রেশম ও কার্পাস বস্ত্র, হাঁতির দাঁতে তৈরী বিভিন্ন শিল্পকর্ম, চিনি, গুড়, চাল, লৌহদ্রব্য, ধাতুর তৈজস, সুগন্ধী, সুপারি, ভেষজ দ্রব্য, আদা , তুলা প্রভৃতি। কলকাতা থেকে ইলাহবাদ যাওয়ার দুটি জলপথের (উনিশ শতকে) একটি ছিল কাটোয়ার ভাগীরথী। জলপথে দামোদর ও অজয় হয়ে রাণীগঞ্জ থেকে কলকাতায় কয়লা পরিবহন করা হতো। এই এলাকায় রেশম শিল্পের প্রসারও ছিল সর্বাধিক। একটি প্রবাদ আছেঃ 'পরে তসর, খায় ঘি/তার আবার খরচ কি।' এখানে লবণ, গুড় ও ধানের ব্যবসা ক্ষেত্রটিও সমৃদ্ধ ছিল। মূলতঃ কৃষিভিত্তিক এই এলাকায় পরবর্তীকালে ধান ও পাট চাষের শ্রীবৃদ্ধি হয়। ব্যাণ্ডেল - কাটোয়া রেলপথ চালু হওয়ার পর থেকে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থাটিও উন্নত হয়েছে।

কাটোয়ার কার্তিক পুজোর আদি উৎস খুঁজতে গিয়ে অনেকে গঙ্গারিডি সভ্যতার সময়কাল পর্যন্ত পিছু হাঁটেন। যোদ্ধা হিসেবে গঙ্গারিডি জাতির খ্যাতি ছিল। ওল্ডহ্যাম, পিটারসন, কানিংহ্যাম প্রমুখ ঐতিহাসিকের মতে গঙ্গারিডিয়গণ ছিলেন বর্তমান বাগদী, ডোম প্রভৃতি অন্ত্যজ শ্রেণীর পূর্বপুরুষ। একালের বাগদি জাতিই গঙ্গারিডি অঞ্চলের প্রধান অধিবাসী ছিল বলে মনে করা হয়। বৃহত্তর কাটোয়ার ভূমিপুত্রেরা আজও অন্ত্যজশ্রেণীর। এক সময়ে এরাই জমিদার ও রাজা রাজড়াদের সৈন্যবাহিনীতে সৈনিক, লাঠিয়াল ও পাইক-বরকন্দাজের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করত। এই সমস্ত যোদ্ধাজাতির পেশার প্রেক্ষিতে কার্তিক লড়াইয়ের উৎস লুকিয়ে আছে বলেও ধারণা করা হয়। আবার গুপ্তযুগে ভারতবর্ষে দেবসেনাপতি কার্তিকের আরাধনার বিষয়টি ইতিহাস স্বীকৃত ঘটনা। কাটোয়ার বিভিন্ন স্থানে কার্তিক পূজার প্রচলন এইসব অঞ্চলে গুপ্ত শাসনের সাক্ষ্য বহন করে বলে অনেকের মত।

ভাস্কর ও ভাস্কর্য

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্প এবং রেশম তসর শিল্প উৎকর্ষে কাটোয়া মহকুমা এক সময়ে বিশিষ্টতা অর্জন করেছিল। প্রাচীনকাল থেকেই ভারত শিল্পের সঙ্গে এই অঞ্চলের

অধিবাসীদের একটা যোগাযোগ ছিল এবং স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের মাধ্যমে জীবিকা অর্জনে নাগরিকদের একটা বিরাট অংশ যুক্ত ছিল। দাঁইহাটের সংলগ্ন এলাকায় ইন্দ্রেশ্বরের প্রস্তর নির্মিত এক বিশাল মন্দির ঐ শিল্পীগোষ্ঠীর প্রতিভার পরিচয় দেয়। ভাগীরথীর তীরে বসবাসকারী ঐ শিল্পী গোষ্ঠী পরবর্তিকালে সারা বঙ্গদেশে ভাস্কর্য-শিল্পে খ্যাতি লাভ করে। মধ্যযুগে বৃহত্তর কাটোয়ার দাঁইহাট, পাতুন, পাঁচুন্দি, দেবকুণ্ড প্রভৃতি স্থানে ভাস্করদের বসতি গড়ে ওঠে। উনিশ শতকে জগদানন্দপুরের পাথরের মন্দির তৈরীর জন্য কারুক র্যময় কিছু পাথর বারাণসী থেকে আনা হলেও এই মন্দির নির্মাণ সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে দাঁইহাটের ভাস্করদের অবদান কম ছিল না। ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা, দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী, জেমো রাজবাড়ির কালী, বর্ধমানের গোপাল, সৈদাবাদ ও নাটোরের কালী প্রভৃতি প্রস্তর মূর্তির স্রষ্টা ছিলেন নবীন ভাস্কর ও তার পুত্রগণ। নবীন ভাস্করের প্রতিভা ও নির্মাণ সৌষ্ঠব জয়পুরের শিল্পীদের থেকেও বেশি ছিল বলে মনে করা হয়। উল্লেখ্য যে দিনাজপুরের মহারাণী শ্যামমোহিনী কৃষ্ণের কালীয়দমন মূর্তির অপূর্ব শিল্প নৈপুণ্যের জন্য নবীনকে সোনার বাটালি উপহার দিয়েছিলেন। কলকাতার নিমতলার বিশালকৃতি শিবলিঙ্গটি কাটোয়ার গদাধর ভাস্করের নির্মিত। জেলার ভাস্করদের মধ্যে কেতুগ্রামের বংশীধর রাজ ও মেগারাম রাজ ছিলেন অগ্রগণ্য। কাটোয়া থানার দেবকুণ্ড গ্রামে প্রাপ্ত সূর্যমূর্তি ছাড়া আরও বিভিন্ন মূর্তি পাওয়া যাওয়াতেই প্রমাণিত এই অঞ্চলে ভাস্করদের বসবাস ছিল।

পোড়া মাটির কাজ

টেরাকোটা বা পোড়ামাটির ফলকে সজ্জিত জেলার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন উপাসনালয়টি হল কেতুগ্রামের কুলুটে অবস্থিত জীর্ণ হোসেন শাহি আমলের মসজিদ। মঙ্গলকোট, পাণ্ডুরাজার ঢিবি, বেড়া গ্রাম থেকে প্রচুর টেরাকোটার তৈরি মাতৃমূর্তির পরিচয় মেলে! মূর্তিগঠনে অভূতপূর্ব শিল্প সুষমার নিদর্শন মেলে মঙ্গলকোটে প্রাপ্ত একমুখলিঙ্গ শিব, ক্ষীরগ্রামের শিবের ভৈরব মূর্তি, নৈহাটির কালরুদ্রদেব, নিরোলের অষ্টভুজ গণেশমূর্তি প্রভৃতিতে। ভাস্কর্য-শিল্পের যে ধারাটি একসময় কাটোয়া ও সংলগ্ন অঞ্চলে স্রোতস্বিনী ছিল তা এখন লুপ্ত। বহু সন্ধানে পরিচয় মেলে কাটোয়ার ভাস্কর সরোজ নারায়ণ ভাস্করের। নদীয়ার বাসিন্দা সরোজবাবুরা বংশানুক্রমে এই শিল্প সৃজনে সম্পৃক্ত। সরোজবাবুর পিতা বনবিহারীর হাতে তৈরী বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি আজও কাটোয়ার সিদ্ধেশ্বরী মন্দির, হরগৌরী মন্দির, সখির আখড়া প্রভৃতি স্থানে শোভিত। পাথরের তৈরী কাজের জন্য সরোজবাবু সরকারি পুরস্কারেও ভূষিত হয়েছিলেন।

রেশম শিল্প

রেশম ও তসর শিল্পে এক সময় কাটোয়া ও সংলগ্ন অঞ্চলের প্রভাব ও প্রচার ছিল দেশ জোড়া। কাটোয়ায় এই দুই শিল্পের অস্তিত্বের পরিচয় মেলে ১৯১০ সালের একটি সরকারি

নথি থেকে ঃ "The silk weaving industry, although a declining one, is still fairly prosperous ... It is carried on at Bagtikra, Musthali and Ghoranash in the Katwa Subdivision and at Memari, Jagdabad and Panchkola in the Sadar. The Tasar Cloth produced at Bagtikra and Memari is of excellent quality and is exported as far as Madras and Bombay. The majority of Katwa silk goes to Calcutta where it is sold or exported "(J.C.K. Peterson) এন. জি. মুখার্জি রচিত 'Monography on the silk fabrics of Bengal' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে কাটোয়া মহকুমার ১২টি গ্রামে তসরের গুটি পোকার চাষ, রেশমের সুতো তৈরী ও কাপড় তৈরীর কাজ হত। এই বারটি গ্রাম হল ঃ বাটটিকরা, গোয়ালকানিগি, মাধতপুর, ঘোড়ানাস, মুস্থুলি, আমডাঙা, পাঁচ বেড়িয়া, জগদানন্দপুর, চাণ্ডুলী, শ্রবাটি, মূলটি ও মায়গাছি। এই শিল্পের মাধ্যমে এই অঞ্চলের পাঁচ হাজারেরও বেশি পরিবারের অন্নসংস্থান হত। ভাগীরথী তীরবর্তী অঞ্চল হওয়ায় রপ্তানির ক্ষেত্রেও প্রভূত সুবিধা পাওয়া যেত।

কাঁসা ও পিতল

বিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়কাল পর্যন্ত দাঁইহাটের কাঁসা ও পিতল শিল্পের দেশ জোড়া খ্যাতি ছিল। একদিকে তন্তুজ দ্রব্য আর কাঁসা ও পিতল শিল্পের খ্যাতিতে দাঁইহাট ব্যবসাক্ষেত্রে সমৃদ্ধ ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত হত। তার সঙ্গে পাথরের মূর্তি নির্মাণের বিষয়টিতো ছিলই। বারবার বর্গী আক্রমণের ফলে এই শিল্পগুলির রমরমা ব্যাহত হয়েছিল যা শেষ পর্যন্ত সময়কালে বর্গীরা কাটোয়ায় আস্তানা গেড়ে কাটোয়া ও সংলগ্ন অঞ্চলে লুটতরাজ ও অত্যাচার চালাত। তাদের আক্রমণে ভাগীরথীর পশ্চিমাঞ্চল কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও কাটোয়া মহকুমার ক্ষতির পরিমাণ ছিল সর্বাধিক। বর্গী আক্রমণে কাটোয়ার যাযাবর হয়ে যাওয়া যে জাতিগুলির নাম গঙ্গারাম বর্ণিত মহারাষ্ট্র পুরাণে পাওয়া যায় সেগুলি হল ঃ ব্রাহ্মণ, সোনার বাইনা, গন্ধবণিক, কাঁসারি, কাহস্ত, গোসাঞি, মোহান্ত, বৈদ্য, সেখ, সৈয়দ প্রভৃতি। হলওয়েল সাহেব মন্তব্য করেছিলেন, বর্গীদের দ্বারা অত্যাচারিত অঞ্চলগুলির ব্যবসা বাণিজ্য আগের মতো আর কোন দিনই জমে ওঠেনি।

কাঠ শিল্প

কাটোয়ার নতুনগ্রামে কাঠের শিল্পের খ্যাতিও কম নয়। প্রাচীনকালে কাঠশিল্পের বিখ্যাত কারিগরদের নিবাস নতুনগ্রাম ছাড়াও পাটুলি, অগ্রদ্বীপ, কাটোয়া, পূর্বস্থলী, দাঁইহাট, করজগ্রাম, গাঁফুলিয়া, কেতুগ্রাম, শ্রীখণ্ড, বহরান প্রভৃতি গ্রামে ছিল। এদের তৈরী দ্রব্যের তালিকায় শুধু দেবদেবীর মূর্তিই ছিল না, ছিল কৃষিকাজে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, গৃহস্থালীর আসবাব, কাঠের ঝিল্লি, মৃদঙ্গ, শ্রীখোল, গো-যান, পালকি এবং এমনকি ডিঙি নৌকাও। আর কাঠের পুতুল নির্মাণ কুশলতায় নতুনগ্রামের সূত্রধরদের খ্যাতি ব্যাপক। এই গ্রামের বিখ্যাত শিল্পীদের মধ্যে গোপাল ভাস্কর, তপন ভাস্কর প্রমুখ্য উল্লেখযোগ্য।

অন্যান্য শিল্প

শোলা শিল্পে দক্ষতায় মঙ্গলকোটের বনকাপাসি গ্রামটি উল্লেখযোগ্য। এখানকার আদিত্য মালাকার, কল্যাণী মালাকাররা দেশের বাইরেও খ্যাতি অর্জন করেছেন। মৃৎশিল্পের ক্ষেত্রে অবদানের জন্য কাটোয়া, বিজনগর, সুদপুর, গোড়াপাড়া প্রভৃতি অঞ্চলের সুনাম আছে। পটুয়া বা পট আঁকার শিল্পী কাটোয়ার যেসব অঞ্চলে এখনও কিছু কিছু দেখা মেলে সেগুলি হল কাটোয়া, নিগণ, দুর্গাগ্রাম প্রভৃতি। বিবাহের শাঁখা প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে বিজনগরের ঘোড়ানাশ গ্রামের নাম উল্লেখ করতে হয়। শঙ্খচূর্ণের সঙ্গে মাটি মিশিয়ে তার ভিতরে লোহার তার দিয়ে লাল ও হলুদ রঙের তৈরি শাঁখা গ্রামীণ এলাকায় হিন্দুদের বিবাহের অপরিহার্য উপকরণ। বাঁশের তৈরী নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিস তৈরীর ক্ষেত্রে কেতুগ্রামের সুনাম আছে। কাটোয়ার মায়ারাণী শিল্পের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছেন। তবে পণ্যায়নের বাজারি বৈভবে সাধনায় মজ্জমান শিল্পগুলি ক্রমশই লুপ্তপ্রায় হয়ে যাচ্ছে। কোনোরকমে সে শিল্পকর্মগুলিকে টিকিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টায় বৃত শিল্পীদের পৃষ্ঠপোষণার কোনো ব্যবস্থাই চোখে পড়ে না।

তবে ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, পুরাণ বা বাণিজ্যিক পরিপ্রেক্ষিত যতই কাটোয়াকে সমৃদ্ধ করুক না কেন, আজও বৃহত্তর অর্থে ও ক্ষেত্রে কাটোয়ার পরিচিতি মূলত বৈষ্ণব চেতনাকে নিয়েই।

কাটোয়া মহকুমা ঃ এক নজরে

১। ভৌগোলিক আয়তন ঃ ১০৬০ বর্গ কি.মি.

২। অক্ষাংশ ঃ উত্তর ২৩°.৫৩, দক্ষিণ ২২°.৫৬
দ্রাঘিমাংশ ঃ পূর্ব ৮৮°.২৫, পশ্চিম ৮৬°.৪৮

৩। জনসংখ্যা (২০০১-এর জনগণনা অনুসারে) ঃ ৮,৫৩,৫১৪ জন
পুরুষ ঃ ৪,৩৮,৭১৭
মহিলা ঃ ৪,১৪,৭৯৭

৪। মোট ভোটার ঃ ৪,৯২,৮৬৯ জন
২৮০ কাটোয়া বিধানসভা – ১,৮১,৩৪৬
২৮১ মঙ্গলকোট বিধানসভা – ১,৫৩,৮২২
২৮২ কেতুগ্রাম (সং) বিধানসভা – ১,৫১,২৫৪

৫। বার্ষিক বৃষ্টিপাত (গড়ে) ঃ ১৪০০ মিলিমিটার

৬। তাপমাত্রা ঃ সর্বোচ্চ ৩৬° সেলসিয়াস
সর্বনিম্ন ৫° সেলসিয়াস

৭। থানা ঃ তিনটি – কাটোয়া, মঙ্গলকোট, কেতুগ্রাম

৮। কাটোয়া শহরের ভৌগোলিক অবস্থান ঃ সমুদ্রতল থেকে ৫২.৭৪৬ ফুট উচ্চ।

অক্ষাংশ ২৩°৩৭', দ্রাঘিমাংশ, দ্রাঘিমাংশ ৮৮°০৭'

৯। ব্লক ঃ পাঁচটি - কাটোয়া ১ ও ২ নং, মঙ্গলকোট এবং কেতুগ্রাম ১ ও ২ নং ব্লক

১০। পুরসভা ঃ দুটি — কাটোয়া ও দাঁইহাট।

১১। ভোটগ্রহণ কেন্দ্র ঃ ৬০০ টি

১২। মৌজা ঃ ৩৮৮ টি

১৩। গ্রাম পঞ্চায়েত ঃ ৪৬ টি

১৪। পঞ্চায়েত সমিতি ঃ ৫টি

১৫। কলেজ ঃ তিনটি — কাটোয়া, চন্দ্রপুর, কাঁদড়া

১৬। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ঃ ১টি - যাজিগ্রাম

১৭। উচ্চতর বিদ্যালয় ঃ ১৭টি

১৮। উচ্চবিদ্যালয়, জুনিয়র উচ্চবিদ্যালয় ও মাদ্রাসা ঃ ৯১টি

১৯। প্রাথমিক বিদ্যালয় ঃ ৫৮২ টি

২০। গ্রামের সংখ্যা ঃ ৪৫৭ টি।

গ্রন্থ ঋণ

১। বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি - যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী

২। বাঙ্গালীর ইতিহাস — ড. নীহাররঞ্জন রায়

৩। কাটোয়া দর্শন — ড. কালীচরণ দাস

৪। কাটোয়া মহকুমার প্রত্নতত্ত্ব পরিচয় — মুহম্মদ আয়ুব হোসেন

৫। পশ্চিমবঙ্গ সংস্কৃতি — বিনয় ঘোষ

৬। বর্ধমান পরিচিতি — অনুকূল চন্দ্র সেন ও নারায়ণ চৌধুরী

৭। পশ্চিমবঙ্গ — বর্ধমান জেলা সংখ্যা

৮। বর্ধমান চর্চা ঃ সম্পাদনা - শ্যামাপ্রসাদ কুণ্ডু ও সমীরণ চৌধুরী

৯। বর্ধমান জেলার পুরাকীর্তি ও সংস্কৃতি — সম্পাদনা রামসেবক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমিত সান্যাল

১০। বঙ্কিম ঘোষ লিখিত কাটোয়ার ইতিহাস সম্পর্কিত প্রবন্ধাবলী

১১। বঙ্গভূমিকা — ড. সুকুমার সেন

১২। J.C.K. Peterson, Bengal District Gazetteers : Burdwan

এছাড়া বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লিখিত প্রবন্ধ, সরকারি নথিপত্র থেকে পাওয়া তথ্যসমূহের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। সাহায্য নেওয়া হয়েছে মঙ্গলকাব্য ও চৈতন্য জীবনী বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থ সমূহের।

কালনা মহকুমা

শান্তনু সেনশর্মা

ভূমিকা

প্রবহমান ভাগীরথী নদীর পশ্চিমতীরে বর্তমানে বর্ধমান জেলার অম্বিকা - কালনা শহরটি অবস্থিত। বর্ধমান জেলার একেবারে দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত কালনা মহকুমার অন্যতম সদর শহর অম্বিকা - কালনা এই জেলার একটি প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু স্থানরূপে চিহ্নিত। অম্বিকা কালনার স্থান নাম সম্পর্কে বিশিষ্ট গবেষকগণ একাধিক অভিমত প্রকাশ করেছেন। অম্বিকা কালনার নাম অনুসন্ধানে অম্বুয়া নামটি থেকে অম্বিকা শব্দটি এসেছে মনে করা হয়। অম্বুয়া শব্দের একটি বিশেষ অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়। (অম্বু + আ) - অম্বুয়া অর্থাৎ সমুদ্রের জল থেকে আগত বোঝায়। অনেকে বলেন অম্বু ঋষির আশ্রমস্থল হিসেবে এই স্থানটি অম্বিকা নামে পরিচিতি লাভ করেছে। আবার এই অঞ্চলের প্রাচীন দেবী অম্বিকার নাম অনুযায়ী এই স্থানের নাম অম্বুয়া হয়েছে বলে অনেকেই মনে করেন। প্রাচীন পুঁথি ও কড়চা থেকে জানা যায় এই প্রাচীন জনপদটি অম্বিকা,আম্বুয়া, আঁবুয়া প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিল। এক সময় কালনা স্টেশনের নাম ছিল 'কালনা কোর্ট'। পরে তা পরিবর্তন করে করা হয় অম্বিকা কালনা। অনেকে অম্বিকা শব্দের মধ্যে যেমন স্থানীয় দেবী অম্বিকার প্রভাবের কথা বলেন, তেমনি কালনা শব্দটি পর্তুগীজ শব্দ যার অর্থ 'থানা' থেকে এসেছে বলেও অনেকে মনে করেন।

তবে ডঃ সুকুমার সেন তাঁর রচিত ' বাংলা স্থান নাম ' গ্রন্থে লিখেছেন (আম্র + ক) অর্থাৎ যে স্থানে খুব ভালো আম হয় তার থেকে আম্বুয়া ও পরে আম্বুয়া থেকে আঁবুয়া শব্দটি এসেছে। আবার তাঁর মতে 'কালনা' শব্দের অর্থ ছোট কল্যাণকর গাঁ (কল্যাণ + ক)। কিন্তু ডঃ সুকুমার সেনের এই ব্যাখ্যা আবার অনেকের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁদের মতে আম্বুয়া এবং কালনা একসময় দুটি পৃথক গ্রাম ছিল। আম্বুয়া একসময় সুলতানি শাসনকালে (প্রমাণ - মুসলিম শাসনকালে রাজপুরুষরা এখানে বসবাসকালে দুটি মসজিদ নির্মাণ করেন। বর্তমানে তা প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও তার প্রতিষ্ঠালিপি থেকে সুলতানি শাসনের কথা প্রমাণিত) পরগণায় পরিণত হয়। আর কালনা ছিল ঐ অঞ্চলের বর্ধিষ্ণু গ্রাম। এই ধারণা আরও বিশ্বাসযোগ্য হয় যখন দেখা যায় ১৭৭৯ সালে প্রকাশিত রেনেলের মানচিত্রে শান্তিপুরের পূর্বপাড়ে কালনা (Culna), আম্বুয়া (Ambooa)ও শ্রীপুরকে গঙ্গানদীর পশ্চিমপাড়ে অবস্থিত বলে দেখানো হয়েছে। এই মানচিত্র অনুযায়ী দেখা যায় অম্বিকা ও কালনা গ্রাম দুটি পাশাপাশি অবস্থিত। একটা সময় অম্বিকা গ্রামটি কালনা গ্রামের অস্তিত্বকে মুছে দিয়েছিল। তবে বর্তমানে কালনার পরিচয়ে অম্বিকা নামটি বেঁচে আছে, 'অম্বিকা কালনা' এই পরিচয়ে।

এ প্রসঙ্গে বিনয় ঘোষ বলেছেন, 'অম্বিকা কালনার অম্বিকা জৈনদেবী ছিলেন। পরে তিনি

হিন্দু শক্তি পূজায় স্বাতন্ত্র বিসর্জন দিয়েছেন । বৌদ্ধতন্ত্রের প্রভাবের যুগেই বাংলা দেশে অম্বিকা পূজার প্রচলন ছিল মনে হয়। অর্থাৎ পাল যুগে। অম্বিকা কালনার ইতিহাস হিন্দু-পাল যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত না হলে 'অম্বিকা' কথার ব্যাখ্যা করা যায় না'। আবার ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার বলেছেন, বর্তমান অম্বিকা কালনাই হল অতীতের 'অম্বিকা' নামের সিদ্ধপীঠ। কুব্জিকাতন্ত্রে যে সিদ্ধপীঠ সম্পর্কে বলা হয়েছে 'বদরী চ মহাপীঠ অম্বিকা বর্ধমানকম্'। এই কুব্জিকাতন্ত্র থেকেই জানা যায় গোবর্ধন পীঠের (নাসিকার কাছে) অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন অম্বিকা। আবার মহাকবি কালিদাস তাঁর 'কুমারসম্ভব' কাব্যে পার্বতীকে 'অম্বিকা', এই নামে উল্লেখ করেছেন। আবার কৃত্তিবাস তাঁর বর্ণনায় লিখছেন - 'আশ্বিনে অম্বিকামূর্তি যদি দেখিতে পাই।/তবে সে প্রত্যয় হয় ঘরে ফিরে যাই। ' অন্যদিকে খানসাহেব মৌলবী ওয়ালির অভিমত হল , হিন্দু ও মুসলিম এই দুই যুগেই কালনা যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। আইন - ই - আকবরীতে সাতগাঁও ভুক্ত 'অম্বোয়া' নামের একটি পরগণার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আবার ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে এই অম্বোয়া পরগণাকে চাকলা বর্ধমানের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে (জায়ার খাঁর আমল)। সেই সময় থেকেই অম্বিকা - কালনা বর্ধমান জেলার অন্তর্গত। ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে ভন.ডেন.ব্রুকের মানচিত্রে উল্লিখিত 'Ambowa' হল বর্তমানের এই অম্বিকা কালনা।

এছাড়া বিপ্রদাস পিপল্লাই-র 'মনসাবিজয়', কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী রচিত চণ্ডীমঙ্গল ও জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে অম্বুয়ার উল্লেখ আছে। শ্যামামায়ের সাধক কমলাকান্ত ভট্টাচার্যর পিতৃগৃহ এই অম্বিকা-কালনায় । তাঁর শৈশব কাটিয়েছেন তিনি এই মহকুমার চান্নাগ্রামে । আবার অম্বিকা - কালনার হাঁসপুকুরের বাসিন্দা কবি কৃষ্ণদাস (পরবর্তীকালে কলকাতায় চলে যান) ১০৯৯ সালে জ্যৈষ্ঠ মাসে তাঁর রচিত 'নারদ পুরাণ' গ্রন্থে বলেছেন - 'পৈতৃক বসতি পূর্বে অম্বিকানগর/ হাঁসপুকুর নাম যথা তাহার উত্তর'।

বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে অতীতে কালনা খুবই প্রসিদ্ধি লাভ করে। বর্ধমান রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় কালনা সংস্কৃত ভাবার আদর্শ শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে কালনা থানার অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলে মোট ৩৭ টি টোল ছিল। সেইসময় কালনার বিশিষ্ট পণ্ডিত বর্গের মধ্যে তারানাথ তর্ক বাচস্পতি , অযোধ্যারাম বিদ্যাবাগীশ , দুর্গাদাস ন্যায়রত্ন প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। তারানাথ সেইসময় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অনুরোধে সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপকের পদে আসীন হন। তাঁর ছটি খণ্ডে রচিত 'বাচস্পত্য অভিধান ' এক অনন্য সাহিত্য কীর্তি। কালনায় ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন হয় ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে। সেই সময় পাদ্রী কুরি ও পাদ্রী ডিয়ারের সক্রিয় প্রচেষ্টায় এখানে প্রথম ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয় যেখানে ছাত্রসংখ্যা ছিল ২০০ জন। এই মিশনারীরাই কালনায় প্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করে। আবার ১৮১৭ খ্রীঃ বর্ধমান মহারাজা এখানে ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন যা ১৮৬৮ খ্রীঃ উচ্চ বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়।১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কালনা শহর মহকুমা সদরে রূপান্তরিত হয়। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে গঠিত হয় কালনা পৌরসভা।

ভৌগোলিক বিবরণ

বর্ধমান জেলার একেবারে দক্ষিণ - পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত কালনা মহকুমা। এই মহকুমার উত্তরে অবস্থিত কাটোয়া মহকুমা, দক্ষিণে হুগলী জেলার অন্যতম দুটি কৃষিপ্রধান অঞ্চল বলাগড় ও পাণ্ডুয়া থানা। আর এই মহকুমার পূর্বে প্রবহমান ভাগীরথী নদী ও নদীয়া জেলার শান্তিপুর ও কৃষ্ণনগর থানা এবং পশ্চিমে বর্ধমান সদর ও মেমারী থানা।

কালনা মহকুমা ভাগীরথী নদী তীরবর্তী ৭৮ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে অবস্থিত। এই মহকুমার বিস্তার ৮৮°৭´ পূর্ব থেকে ৮৮°২৪´ ৩০´´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত, আবার উত্তরে কর্কটক্রান্তি রেখা থেকে দক্ষিণে ২৩°১২´ ২৫´´ উত্তর অক্ষাংশ পর্যন্ত উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত।

এই মহকুমার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কালনা শহরটি আবার মহকুমার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত। এই শহরের দ্রাঘিমাংশ ৮৮°১০´ পূর্ব ও অক্ষাংশ ২৩°১২´ ২৫´´ উত্তর অক্ষাংশ। হাওড়া থেকে প্রায় ৮১ কিলোমিটার উত্তরে হাওড়া - কাটোয়া লাইনে অবস্থিত। কালনা শহরটি 'অম্বিকা কালনা', এই নামে সর্বাধিক পরিচিত। বহু অতীতে (১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে) এই রেল স্টেশনটির নাম ছিল 'কালনা কোর্ট'। কালনা শহরটি হিসেব মত সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৪৫ কিলোমিটার উচ্চে অবস্থান করছে। কালনা মহকুমা মূলত নদী নির্ভর এলাকা। মৌসুমী বায়ু প্রবাহে ও কালবৈশাখী ও শীতকালীন বৃষ্টিপাত মিলিয়ে এখানে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৫০ থেকে ২০০ সেমি।

আয়তন ও জনসংখ্যা

বর্ধমান জেলার কালনা মহকুমাটি স্থাপিত হয় এখন থেকে প্রায় দেড়শো বছর আগে ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে। সেই সময়ই কালনায় একটি কোর্ট নির্মিত হয়। তখন মহকুমায় থানা ছিল তিনটে। কালনা, মন্তেশ্বর ও ভাতুরিয়া। তখন এই মহকুমায় মোট পুলিশ ছিল ১০৬ জন। আর চৌকিদারের সংখ্যা ছিল ২২৬০ জন। ১২ জন কয়েদীকে রাখার মত একটি জেলখানাও তখন এখানে নির্মাণ করা হয়।

কালনা মহকুমার বর্তমান আয়তন ৩৮৫.০১ বর্গ কিলোমিটার। বর্তমানে এই মহকুমায় থানা আছে তিনটে। (১) কালনা (২) মন্তেশ্বর (৩) পূর্বস্থলী (ভাতুরিয়া)। মহকুমার একমাত্র পৌরসভা হল কালনা শহর। কালনা মহকুমায় মোট গ্রামের সংখ্যা ৭১৪ টি। গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যা ৪৯টি। ব্লক ও পঞ্চায়েত সমিতি আছে ৫ টি করে। ব্লকগুলি হল — কালনা ১নং ব্লক, কালনা ২ নং ব্লক, পূর্বস্থলী ১নং ব্লক, পূর্বস্থলী ২ নং ব্লক ও মন্তেশ্বর থানার অধীনে একটি ব্লক।

এই মহকুমার মোট জনসংখ্যা ৬৫৩৮৪৪ এরমধ্যে মহিলা ও পুরুষের সংখ্যা যথাক্রমে ৩২১৭৮৬ এবং ৩৩২০৫৮ জন। মহকুমায় চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ১৮৪৯৪৯ একর। যেখানে রায়তের সংখ্যা ৫৩৭৮৪। সমগ্র মহকুমায় কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা ৫৮৫০৮ জন।

এছাড়া অন্যান্য কর্মে নিযুক্ত শ্রমজীবি মানুষের সংখ্যা ১১২৯২ জন।

কালনা মহকুমার বিস্তীর্ণ অঞ্চল মূলত ভাগীরথীর কূলে অবস্থিত হলেও এই মহকুমার বহুলাংশের গ্রামগুলি আসলে পুরানো দামোদরের অববাহিকা অঞ্চলে অবস্থান করছে। যদিও দামোদর এই অঞ্চলের প্রধান নদী হিসেবে পরিচিত নয়, তথাপি দামোদরের নদীবাহিত কাঁকড়, নুড়ি ও বালি দিয়ে এর মাটি গঠিত। বর্ধমান জেলায় দামোদরের অববাহিকা অঞ্চলের আয়তন ১৪৭.১ মাইল। কালনা মহকুমার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নদনদীগুলি হল বাঁকা,গাঙ্গুর,বেহুলা, ডুবি, বল্লুকা প্রভৃতি। এই মহকুমার পূর্ব দিয়ে বয়ে যাওয়া ভাগীরথী নদী কালনা মহকুমায় প্রবেশ করেছে পাটুলির কাছে। আর তা শেষ হয়েছে কালনা থানার শতপটি গ্রামের কাছে। মূলত দামোদর ও তার বিভিন্ন শাখাপ্রশাখা ও ভাগীরথীর সংমিশ্রণে কালনা মহকুমার কৃষিভিত্তিক জীবনধারা গড়ে উঠেছে সমগ্র মহকুমা জুড়ে।

কৃষিভিত্তিক বাণিজ্য

ধান চালের ব্যবসা - বহু অতীতকাল থেকেই কালনা মহকুমা কৃষিকে কেন্দ্র করে তার বাণিজ্য গড়ে তুলেছে । মূলত ধানই ছিল সেই সময়ের মূল কৃষিজাত উৎপাদন। যা থেকে চাল তৈরী হয়ে এই মহকুমা সহ জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা ও পার্শ্ববর্তী নদীয়া ও হুগলী জেলার মানুষের দৈনন্দিন চাহিদার যোগান দিয়েছে।

একসময় কালনায় তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় প্রতিষ্ঠা করেন চালশিল্প। সেই সময় এই শিল্পে ঢেঁকির মাধ্যমে চাল বার করা হত। কিন্তু এখন সর্বাধুনিক যন্ত্রের মাধ্যমে ধান থেকে চাল তৈরী হচ্ছে। ফলে ব্যবসার প্রসার বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই মহকুমার প্রায় লক্ষাধিক মানুষ এই ধান - চাল কারবারের সঙ্গে বিভিন্নভাবে যুক্ত রয়েছে। চাষীর কাছ থেকে ধান কেনা, লোডিং করা,সেই ধান শহরে এনে গোলাদারদের কাছে বিক্রি, ধান সেদ্ধ, শুকনো করা, হাস্কিং মেসিনে ধান ভাঙা, নৌকা ও ভ্যানে করে সেই চাল মূল ব্যবসাদারের কাছে পৌঁছে দেওয়া , এটাই হল এই কারবারের বিস্তৃত ক্ষেত্র। সুতরাং বহু মানুষই এই কাজের সঙ্গে দৈনন্দিন যুক্ত হবার সুযোগ পাচ্ছে। তারা আর্থিকভাবে উন্নতও হয়েছে। ভবিষ্যতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি এর ব্যবসায়িক প্রসারের সম্ভাবনাও রয়েছে। কালনা মহকুমায় ধান চাল ব্যবসার মূল কেন্দ্রগুলি হল কালনা শহর, নিভূজিবাজার,সমুদ্রগড়, নাদনঘাট, পূর্বস্থলী, মন্তেশ্বর, বৈদ্যপুর, পাটুলি, মোধপুর, বোহার প্রভৃতি অঞ্চল।

একটি পরিসংখ্যান

কালনা মহকুমায় ধান চাল কারবারের সঙ্গে যুক্ত মানুষের সংখ্যা এক লক্ষের অধিক।

১। রাইস মিলের সংখ্যা - ৭ টি

২। শ্রমিক সংখ্যা প্রতিটিতে - ৫০ থেকে ৭০ গড়ে।

৩। উৎপাদনের পরিমাণ - ৩০০ টন প্রতি মাসে ।

৪। সহায়ক শিল্প - তেল, পশুপাখির খাদ্য, মাছের খাদ্য , জ্বালানি।

৫। সবচেয়ে পুরানো রাইস মিল - পুরাতন হাট রাইস মিল, নিভূজিবাজার।

৬। ব্যবসার সময়কাল - বছরে দু'বার এই অঞ্চলে ধান উৎপন্ন হলেও ধান চালের ব্যবসা চলে সারা বছর।

হিমঘর শিল্প

কৃষি প্রধান কালনা মহকুমার বর্তমান একটি সম্পদ হল আলু। বর্তমানে কৃষিব্যবস্থার আধুনিকীকরণের ফলে আলুর উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় বহু মানুষ এই মহকুমা জুড়ে এর সঙ্গে জীবিকার তাগিদে যু ক্ত হয়ে পড়েছে। মার্চ মাসে আলু ওঠার পর থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত মাঠে ও কোল্ডস্টোরেজে আলু সংক্রান্ত ব্যবসার লেনদেন হয়। প্রতিটি স্টোরে কমপক্ষে ৩ কোটি টাকার ব্যবসা সংক্রান্ত লেনদেন প্রতিবারে হয়ে থাকে ।এই মহকুমায় ১৮ টি কোল্ড স্টোরেজ রয়েছে ।

একটি পরিসংখ্যান

১। কোল্ড স্টোরেজের সংখ্যা - কালনা শহরে ৫ টি ও সমগ্র মহকুমায় মোট ১৮ টি।

২। শ্রমিক সংখ্যা - প্রতিটিতে ১৫ থেকে ৩০ জন।

৩। স্টোরের লোডিং ক্যাপাসিটি - দেড় থেকে দু'লক্ষ প্যাকেট প্রতিটিতে।

৪। সবচেয়ে পুরনো স্টোর - দি কালনা কোল্ড স্টোর।

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য শিল্প বাণিজ্য

তাঁত শিল্পের প্রসার ঃ কালনার নিকটবর্তী সরস্বতী নদী মজে যাওয়ায় , অতীতে গঙ্গার বহতাধারাকে কেন্দ্র করে তাঁতীদের মধ্যে নতুন ব্যবসাকেন্দ্র গড়ে তোলার প্রবণতা দেখা দেয়। প্রাচীন সপ্তগ্রামের সূতো ও কাপড় ব্যবসায়ীরা কালনা , ধাত্রীগ্রাম ও সমুদ্রগড়ে ছড়িয়ে পড়ে। (সূত্র ঃ কালনার ইতিহাস - তরুণ ভট্টাচার্য্য)

স্বাধীনতার পরে দেশভাগের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বহু মানুষ পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে । বিভিন্ন এলাকায় তারা নতুন করে বসবাস করতে শুরু করে। কালনা মহকুমায় - কালনা শহর, ধাত্রীগ্রাম, বাঘনাপাড়া, সমুদ্রগড় থেকে শুরু করে পূর্বস্থলী পর্যন্ত গঙ্গা তীরবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বহু মানুষ সেইসময় বসবাস শুরু করে। জীবিকার প্রয়োজনে এদের মধ্যে কেউ কৃষিকে বেছে নেয়, আবার কেউবা স্থানীয় কুটির শিল্পের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে।

কুটির শিল্প হিসেবে তাঁতই ছিল তখন অন্যতম শিল্প। স্থানীয় তাঁতগুলির সঙ্গে জীবিকার তাগিদে বহু মানুষ তখন থেকেই যুক্ত হয়ে পড়েন। এই শিল্পের সঙ্গে বর্তমানে কালনা মহকুমায় যুক্ত রয়েছে প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষ। তাদের অনেকেই এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত থেকে আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছে। অনেকে আরও সফল হবার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে।

কালনা থেকেই দুজন তাঁতশিল্পী রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছেন। এঁরা হলেন রবীন্দ্রনাথ সাহা ও শঙ্কর কর্মকার।

রবীন্দ্রনাথ সাহা ঢাকাই মসলিনের পুনর্জন্ম দিয়ে সরকারি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। মসলিন শিল্প গড়ে তুলেছেন কালনা শহরে। বহু মানুষের নতুন জীবিকার সন্ধান দিতে সক্ষম হয়েছেন। কালনায় এখন ৫০০ কাউন্টের সূতোয় মসলিন কাপড় বোনা হচ্ছে। এই ব্যবসার ভবিষ্যত বেশ উজ্বল। আবার শঙ্কর কর্মকার ঢাকাই জামদানির উপর উন্নত নক্‌শা তৈরীর জন্য সরকারি পুরস্কার পান। নিজস্ব প্রচেষ্টায় বর্তমানে একটি তাঁত শিল্পালয় গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন, যার উপর শ'খানেক মানুষের জীবন ও জীবিকা নির্ভরশীল।

মৎস্য শিল্প

ধান চাল ও তাঁত শিল্পের পাশাপাশি জীবিকার সন্ধানে আরও অনেক বাণিজ্যিক শিল্প কালনায় গড়ে ওঠে। যার অন্যতম হল মৎস্য শিল্প। কালনা মহকুমার পাশ দিয়ে যেমন ভাগীরথী প্রবাহিত হয়েছে , ঠিক তেমনি এখানে রয়েছে অনেক দীঘি, পুকুর ডোবা। অতীতে এই সব দীঘি ও পুকুরে ছোট মাছ ছেড়ে বড় করে তোলা হত। কিন্তু বর্তমানে এইকাজ ছোট হ্যাচারির মাধ্যমে করা হচ্ছে । এখানে মাছের ডিম থেকে প্রসেসিং করে ঐ ডিম থেকে ধানা পোনা ও চারা পোনা তৈরী করা হচ্ছে। ঐ পোনা ব্যবসায়িকভাবে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে রপ্তানিও হচ্ছে। এই শিল্পের বাণিজ্যিক সাফল্য ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

একটি পরিসংখ্যান

১। হ্যাচারির সংখ্যা - ৭ টি
২। শ্রমিক সংখ্যা - প্রতিটিতে কম করে ২০ জন।
৩। সবচেয়ে পুরনো হ্যাচারি - আমলাপুকুর হ্যাচারি
৪। কাজের সময় - এপ্রিল মাস থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত।
৫। মৎস্য ব্যবসার সঙ্গে এই মহকুমার প্রায় দশ হাজার লোক জড়িত।

ইঁট শিল্প

কালনা মহকুমার পাশ দিয়ে ভাগীরথী নদী বয়ে যাওয়ায় তার পার্শ্ববর্তী এলাকাতেই তৈরী হয় ইঁট শিল্প। কারণ - বর্ষার সময় নদীর জল বাড়ার পর ঐ জল যখন কমে যায় সেই সময় বিস্তীর্ণ এলাকায় পলি পড়ে। ঐ পলি দিয়ে তৈরী হয় ইঁট। আগে এখানে ইঁট পোড়ানো হত চিমনির সাহায্যে । এর ফলে উৎপাদন কম হত। তাই পরবর্তী কালে হাওয়া চুল্লীতে এই ইঁট তৈরী হয়। এতে খরচ কম হয়, উৎপাদন হয় বেশী। বর্তমানে এই মহকুমায় ইটের চাহিদা রয়েছে। কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি নতুন বাড়ি তৈরী হচ্ছে প্রচুর। ফলে ব্যবসায়িক সাফল্য এই ব্যবসায় এখনও রয়েছে।

একটি পরিসংখ্যান

১। ইঁট ভাটার সংখ্যা - ১৪ টি

২। শ্রমিক সংখ্যা - প্রতিটিতে ১০০ জন (আনুমানিক)
৩। উৎপাদনের পরিমাণ - ৩ থেকে ৫ লক্ষ মাসে (আনুমানিক)

দুগ্ধ শিল্প

কালনা মহকুমার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে গরুর দুধকে কেন্দ্র করে ব্যবসায়িক প্রসার লক্ষ্য করার মত। কালনা থেকে দুধ ও ছানা এই জেলার সঙ্গে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে রপ্তানি হয়। এই ব্যবসার সঙ্গে মহকুমায় কমপক্ষে দশ হাজার মানুষের জীবন জড়িয়ে রয়েছে। এই ব্যবসার একটা ভবিষ্যৎ আছে। কালনা শহরেও বিভিন্ন এলাকায় দুধ থেকে যে ছানা তৈরী হয় তা বিক্রির জন্য আলাদা বাজার রয়েছে। এই বাজারে প্রতিদিন লক্ষাধিক টাকার কারবার হয়।

স্থানীয় মানুষের ও ব্যবসায়ীদের অভিমত

কালনা মহকুমায় ব্যবসার সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কে তাঁরা বলেন এই মহকুমার ব্যবসায়িক শ্রীবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা । আসাম রোডকে আরও চওড়া করা, কালনায় গঙ্গার উপরে ব্রিজ তৈরী করে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা ও কালনা - বৈঁচি রুটকে ডবল লাইন করা এবং কালনা - কাটোয়া ডবল লাইন করা। এই বিষয়গুলির উপর সরকার দৃষ্টি দিলে এখানে ব্যবসার প্রসার আরও বাড়বে। এছাড়া কালনা শহরে বহু মন্দির থাকায় এখানে পর্যটন শিল্প তৈরীর একটা উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। কালনার রাজবাড়ি ও পার্শ্ববর্তী দর্শনীয় স্থানগুলিকে কেন্দ্র করে এই পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলা যায়। এরজন্য কালনায় পর্যটকদের থাকার আরও সুব্যবস্থা সরকারি পর্যায়ে করা প্রয়োজন। কুটির শিল্প ও কৃষির পাশাপাশি পর্যটন শিল্পও আগামী দিনে কালনাকে আরও অধিকভাবে সমৃদ্ধ করবে বলে স্থানীয় বাসিন্দারাও মনে করেন।

পুরাতাত্বিক ও ঐতিহাসিক নিদর্শন

অম্বিকা কালনার উল্লেখযোগ্য প্রত্ন নিদর্শন হিসেবে কালনা শহরের নিকটবর্তী শাসপুরের দাঁতনকাঠিতলার একটি গড় ও দুটি মসজিদ চিহ্নিত হয়ে আছে। এখন এক ভয়াবহ ভগ্নস্তূপে পরিণত। এই গড় ও মসজিদ সম্পর্কে সরকারের রিপোর্টে বহুবার আলোচিত হয়েছে। Annual Report of Archeological Survey of Bengal 1903 (Page - No.4) রিপোর্ট থেকে ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাঙ্গালার ইতিহাস' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন - 'আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহের রাজত্বকালে একখানি মাত্র শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বর্ধমান জেলায়, কালনায়, শাহ মজলিসের আস্তানার নিকটে একটি পুরাতন মসজিদে এই শিলালিপিখানি আবিষ্কৃত হয় এবং তদনুসারে ৯৩৯ হিজিরায় রমজান মাসের প্রথম দিবসের উলুগ মসনদ খাঁ মালিক কর্তৃক এই মসজিদটি নির্মিত হইয়াছিল।' এই তারিখ ইংরেজী তারিখের হিসেব মত ২৭ শে মার্চ ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে।

আবার কালনা কোর্টের কাছে ক্যানিংহাম নামে এক সাহেব অপর একটি শিলালিপি আবিষ্কার করেন। যা নির্মিত হয়েছিল দ্বিতীয় নাসিরুদ্দিন মহম্মদ শাহের সময়ে। যার নির্মাণ

কাল পূর্ব্বে আবিষ্কৃত শিলালিপিটির থেকে ৪৩ বছর আগে। এই শিলালিপিতে শুধুমাত্র ৮৯৬ হিজরা তারিখের উল্লেখ আছে। ইংরাজী হিসেব মত যা হয় ১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ নভেম্বর। ঐতিহাসিকদের মতে ক্যানিংহাম সাহেবের আবিষ্কৃত শিলালিপিটি হল এই অঞ্চলের প্রাচীনতম প্রত্ন নিদর্শন। এরপর ইংরেজ রাজত্বকালের মধ্যেই সেই সময়ের শাসনকর্তা মিঃ ব্লকম্যান এই অঞ্চল থেকে আরও কয়েকটি শিলালিপি আবিষ্কার করেন যা বর্তমানে কলকাতার ভারতীয় জাদুঘরে সুরক্ষিত আছে। এছাড়া কালনা মহকুমার মন্তেশ্বর থানার অন্তর্গত সিজনা গ্রামে একাদশ শতকে নির্মিত একটি দ্বিভঙ্গ চতুর্ভুজ দণ্ডায়মান বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া যায় যা বর্তমানে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে। মূর্তিটি সেই সময় মাইকাসিল্ট পাথর দিয়ে তৈরী করা হয়েছিল।

শ্রীচৈতন্য ও অম্বিকা কালনা

১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্যদেব নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। এরপর সময়ের পরিবর্তিত ধারায় মানবধর্ম প্রচারে এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে শ্রীচৈতন্য নৌকাযোগে অম্বিকা কালনায় এসে উপস্থিত হন ১৫০৮ খ্রীষ্টাব্দে, যখন তাঁর বয়স মাত্র ২২ বছর। বর্তমান কালনার মহাপ্রভু পাড়ায় সেই সময় এক সামান্য কুটিরে ঈশ্বর সাধনায় ব্রত ছিলেন গৌরীদাস পণ্ডিত। যিনি চৈতন্যদেবের চেয়ে বয়সে মাত্র একবছরের বড় ছিলেন। কথিত আছে এই গৌরীদাস পণ্ডিতের কুটিরে বসেই শ্রীচৈতন্যের মুখ থেকে উচ্চারিত হয়েছিল সেই মহানবাণী 'কলিকালে হরিনামই সত্য'। সেই সময় চৈতন্যদেবের সঙ্গে এসেছিলেন তাঁর অভেদ আত্মা নিত্যানন্দ।

চৈতন্যদেব সেই সময় বর্তমান কালনার পাথুরিয়া মহলের ঘাটে এসে নেমেছিলেন। সেই ঐতিহাসিক ক্ষণকে স্মরণে রেখে বর্তমানে কালনার কুমার বাড়ির সহযোগিতায় ঐ ঘাটে একটি স্মারক তোরণ নির্মাণ করা হয়েছে। আর শ্রীচৈতন্যের আগমনে সহায়ককারী নৌকাটির বৈঠা এবং তাঁর স্বহস্তে লিখিত পুঁথি কালনার মহাপ্রভু পাড়ার নিতাই গৌর মন্দিরে আজও রাখা আছে। কালনার মহাপ্রভুপাড়ার 'নিতাই গৌর' মন্দিরটি হল শ্রীচৈতন্যের জীবদ্দশায় নির্মিত একমাত্র মন্দির যেখানে মন্দিরের মধ্যে নিতাই ও গৌর দারুমূর্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। মূর্তি দুটিতে তাঁদের সঠিক দৈহিক উচ্চতা ও শারীরিক গঠন ধরা আছে।

প্রথমবারের পরে আরও একবার শ্রীচৈতন্যদেব অম্বিকা কালনায় এসেছিলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৩১ বছর। ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দের মাঘী পূর্ণিমায় (সম্ভবত) এখানে দণ্ড মহোৎসব উদযাপন উপলক্ষে তাঁর এখানে আগমন। সেই সময় গৌরীদাস পণ্ডিতের কুটিরে ঢোকার মুখে একটি তেঁতুল গাছের তলায় তাঁকে সাময়িক বিশ্রাম নেবার জন্য বসানো হয়েছিল। পাঁচশো বছরের সেই তেঁতুল বৃক্ষ আজও জীবিত যার বৃক্ষমূলে শ্রীচৈতন্যের পাথরে খোদিত চরণ - চিহ্ন আজও সুরক্ষিত।

আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মন্দির

জগন্নাথ মন্দির ঃ আনুমানিক ১৭৩১ - ৩২ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ কালনার বর্তমান কোর্ট সংলগ্ন এলাকায় জগন্নাথ মন্দিরটি নির্মাণ করা হয়। বর্ধমানের রাজমাতা ব্রজকিশোরীদেবীর অনুরোধে রাজা কীর্তিচন্দ্র অম্বিকা কালনার গঙ্গার তীরে এই মন্দিরটি নির্মাণ করেন যার মধ্যে সুভদ্রা, বলরাম ও জগন্নাথের দারুমূর্তি স্থাপিত হয়। প্রতিবছর জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা ও রথযাত্রা উপলক্ষে এখানে মেলা হয়।

লালজী মন্দির ঃ কালনায় ভারতবর্ষের মধ্যে অনন্য কীর্তি হিসেবে একই শহরে তিন তিনটি ২৫ চূড়া যুক্ত মন্দিরের অন্যতমটি হল লালজী মন্দির। এর দেওয়ালে টেরাকোটার কাজ অপূর্ব। মন্দিরের সম্মুখভাগে 'গিরি গোবর্ধন ' নামে এক মনোরম পাহাড়ের অনুকরণে বার্লিন পুতুল রাশি সাজানো রয়েছে। ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়। কথিত আছে রাজমাতা ব্রজকিশোরী দেবীর বৃন্দাবন যাত্রাকে উপলক্ষ্য করে এই মন্দির নির্মিত হয়। এই মন্দিরটি কালনার রাজবাড়ি চত্বরের মধ্যেই অবস্থিত ।

কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দির ঃ কালনা শহরে অবস্থিত অপর ২৫ চূড়াযুক্ত এই মন্দিরটি নির্মিত হয় ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে । এই মন্দিরের গায়েও টেরাকোটার কাজ উল্লেখযোগ্য। এর উচ্চতা প্রায় ৬০ ফুট। রামায়ণ, মহাভারত, দুর্গা, কালী, শিব সহ বিভিন্ন ঘটনা এই মন্দিরের গায়ে টেরাকোটার কারুকার্যে ধরা আছে।

গোপাল জীউর মন্দির ঃ এই মন্দিরটি কালনার সিদ্ধেশ্বরী পাড়ায় অবস্থিত। এটিও আর একটি ২৫ চূড়া যুক্ত মন্দির। ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে এটি নির্মিত হয়। এই মন্দিরের গায়েও টেরাকোটার কাজ দর্শনীয়। মন্দিরের ভিতরে জগমোহনের বিগ্রহ আছে। শহরের এই তিনটি ২৫ চূড়া বিশিষ্ট মন্দিরের চূড়াগুলি সজ্জিত আছে এইভাবে - প্রথম ধাপে ১২টি, দ্বিতীয় ধাপে ৮টি, তৃতীয় ধাপে ৪টি এবং মূল শিখর ১টি চূড়া বিশিষ্ট।

রাসমঞ্চ ঃ বর্ধমান রাজপরিবার কর্তৃক নির্মিত রাসমঞ্চটি কালনা রাজবাড়ি চত্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা উৎসব উপলক্ষে এক সময় এই মঞ্চে বিগ্রহ সাজানো হত। এখনো এই রাসমঞ্চে প্রতিবছর একটি বিশেষ দিনে উৎসব পালিত হয়।

প্রতাপেশ্বর মন্দির ঃ ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে কালনা রাজবাড়ির ঠিক দক্ষিণ দরজার পাশে বর্ধমান মহারাজ প্রতাপচাঁদের স্মৃতি রক্ষার্থে প্রতাপেশ্বর মন্দির স্থাপিত হয়। মন্দিরের গায়ে অপূর্ব টেরাকোটার কারুকার্য্য দর্শনীয় বিষয়। মন্দিরের সামনে একটি দরজা। ভিতরে শিবের সুবিশাল বিগ্রহ। অন্য তিন দিকে তিনটি কৃত্রিম দরজা নির্মাণ করা হয়েছে। মন্দির গাত্রে টেরাকোটার কারুকার্যে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা, রাবণের দুর্গাপূজা, কালী, দশমহাবিদ্যা ইত্যাদি বিষয় খোদিত আছে। মন্দিরের এই সূক্ষ্ম কারুকার্যের কথা বাংলা তথা সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বারবার প্রকাশিত হয়েছে। মন্দিরটি উড়িষ্যার রেখদেউলের আদলে নির্মাণ করা হয়েছে।

সিদ্ধেশ্বরী মন্দির ঃ ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়। মন্দিরটি বাংলার কুটির দেউলের অনুকরণে নির্মিত। মন্দিরের চূড়াটি পাশাপাশি দুটি দো-চালা ঘরের সংলগ্ন আদলে নির্মিত। দুটি চালেরই কোন চূড়া নেই। পরিবর্তে দুটি চালেতেই কলস ও আমলক ধ্বজ পোঁতা। খিলানের আকৃতি পাতার মত। মূল গর্ভগৃহে প্রবেশের পূর্বে একটি খিলানের দরজা আছে। গর্ভগৃহে অবস্থিত জাগ্রত কালীমূর্তিটি নিমকাঠে তৈরী চতুর্ভূজা মূর্তি। এই সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের ঠিক সামনে আর একটি কালীমন্দির অবস্থিত যা সাধনকালী মন্দির নামে খ্যাত। এই মন্দিরে শ্যামাঙ্গীকালী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। এই দুটি কালী মন্দিরের ভিতরেই শিবের আলাদা মন্দির আছে।

অনন্ত বাসুদেব মন্দির ঃ ইংরেজীর ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে কালনার গঙ্গা তীরবর্তী আদি শ্মশান সংলগ্ন বর্তমান সিদ্ধেশ্বরী পাড়ায় এই মন্দিরটি স্থাপিত। মন্দিরটি ৪৮ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট, যার ভিত্তি বেদী ৫ ফুট। ১৯৬৪ সালে এই প্রাচীন মন্দিরটির বিড়লা পরিবারের অর্থানুকূল্যে সংস্কার সাধিত হয়। মন্দিরের ভিতরে একসময় কষ্টি পাথরের নারায়ণ বাসুদেব মূর্তি ছিল পরে যা চুরি হয়ে গেছে বলে জানা যায়। এখন দারু নির্মিত রাধাকৃষ্ণ মূর্তি এখানে প্রতিষ্ঠিত আছে। মূল মন্দিরের সামনে একটি নাটমন্দির আছে।

জগন্নাথ বাড়ির জোড়া শিবমন্দির ঃ ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে কালনার জগন্নাথ বাড়ির কাছে দুটি শিবমন্দির পাশাপাশি তৈরী হয় যার উচ্চতা ১৫ ফুট মত। এরগায়ে আকর্ষণীয় টেরাকোটার কাজ রয়েছে। মন্দিরের ফলক থেকে জানা যায় এই মন্দির দুটি মহারানী ইন্দ্রকুমারীর ইচ্ছায় স্থাপিত হয়েছিল।

১০৮ শিবমন্দির ঃ বর্ধমান জেলায় বর্ধমান শহরে যেমন ১০৮ শিবমন্দির আছে তেমনি এই জেলার কালনা শহরে এর রাজবাড়ির ঠিক দক্ষিণ প্রান্তে ১০৮ শিবমন্দির অবস্থিত। বর্ধমান রাজ তেজচন্দ্র ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় একলক্ষ টাকা ব্যয় করে এই মন্দির নির্মাণ করেন। ১০৮ শিবমন্দিরগুলি দুইটি চক্রাকারে নির্মিত। এর বাইরের বড় চক্রাকৃতি অংশে ৩৩ টি সাদা ও ৩৩ টি কালো শিবলিঙ্গ আছে। আর এর মধ্যবর্তী দ্বিতীয় চক্রে ৪২ টি সাদা শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। মধ্যবর্তী চক্রের ভিতরে একটি বৃহৎ ইঁদারা অবস্থিত। প্রসঙ্গত কালনা রাজবাড়ি সংলগ্ন এই ১০৮ শিবমন্দির , রাজবাড়ির ভিতরে অবস্থিত লালজী মন্দির, কৃষ্ণচন্দ্র মন্দির, রাসমঞ্চ ও প্রতাপেশ্বর মন্দিরের খুব সম্প্রতি ভারত সরকারের আর্কিওলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগে সংস্কার সাধন করা হয়।

এছাড়া কালনা শহরে আরও কয়েকটি দর্শনীয় স্থানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল নামব্রহ্ম বাড়ি, ভব পাগলার আশ্রম, নিগমানন্দ আশ্রম, জ্ঞানানন্দ মঠ ইত্যাদি। এর পাশাপাশি কালনার গঙ্গায় জেগে ওঠা ১০০০ বিঘে চরের জমিতে সবুজায়ন প্রকল্প গড়ে তোলার পরিকল্পনা আছে।

শ্রীপাট বাঘনাপাড়া

ব্যাণ্ডেল - কাটোয়া রেলপথে অম্বিকা কালনার ঠিক পরের স্টেশন বাঘনাপাড়া। স্টেশন থেকে মূল বাঘনাপাড়া গ্রামের দূরত্ব প্রায় দুই কিলোমিটার। এই গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে বেহুলা নদী। রামাই পণ্ডিত বা রামচন্দ্রের (জন্ম ১৪৫৬ শকাব্দ) কীর্তিতে এই গ্রাম খ্যাত। প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু এই বাঘনাপাড়া গ্রামে প্রথম সাধক বংশীবদন বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের জন্য এসেছিলেন। তারপর তাঁর পৌত্র ও চৈতন্যদাসের পুত্র রামাইপণ্ডিত বা রামচন্দ্র এই অঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্ম প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা নেন। তিনি ছিলেন জাহ্নবা দেবীর পালিত পুত্র। ১৫৮৩ সালে তিনি জাহ্নবাদেবীর সঙ্গে বৃন্দাবনে যান এবং সেখানে পাঁচ বছর কাটিয়ে বাঘনাপাড়ায় ফিরে আসেন। সঙ্গে নিয়ে আসেন বৃন্দাবনের প্রণবানন্দ তীর্থ থেকে কৃষ্ণ বলরামের বিগ্রহ। যা পরে তিনি এই গ্রামে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

বাঘনাপাড়া নামকরণের তাৎপর্য সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে যে রামচন্দ্রের প্রভাবে এই গ্রামে বাঘের উপদ্রব দূর হয়েছিল এবং তিনি একটি বাঘকে পোষও মানিয়েছিলেন। তাই এই স্থানকে বলা হয় 'বাঘ - না (নাই) - পাড়া'। আবার কেউ কেউ বলেন ব্র্যাঘ্রপাদ নামক এক ঋষি এই অঞ্চলে অবস্থান করেছিলেন, তাই এই স্থানের নাম বাঘনাপাড়া।

রামচন্দ্র নিজে ছিলেন পণ্ডিত এবং তাঁর ভাগবত ভক্তি ছিল প্রগাঢ়। তাঁর নিষ্ঠা ও ভক্তির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এর সংলগ্ন বৃহত্তর অঞ্চলের বহু লোক বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। রামচন্দ্র শেষ জীবনে তাঁর ছোটভাই শচীনন্দন ও তাঁর পুত্রত্রয়ের হাতে শ্রীপাটের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। রামচন্দ্র শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ১৫০৬ শকাব্দে (মতান্তরে ১৫১৯ শকাব্দে)। দিনটি ছিল মাঘী কৃষ্ণা তৃতীয়া তিথি। তাই আজও এই দিনটিকে স্মরণ করে প্রতিবছর মাঘী কৃষ্ণা তৃতীয়া তিথিতে এই গ্রামে মহোৎসব পালিত হয়। উৎসবে বহু বৈষ্ণব ভক্তের আগমন ঘটে এখানে।

রামচন্দ্র শিশুপুত্র মনে করে কৃষ্ণ বলরামের সেবা করেছিলেন। তাই প্রতিবছর এই মহোৎসবের ৬ দিন বিভিন্নভাবে পালন করা হয়। মূল তিরোধান তিথির দিন পিতৃশ্রাদ্ধের কথা স্মরণ করে কৃষ্ণ বলরাম বিগ্রহকে 'কাছা' পড়ানো হয়। দ্বিতীয় দিন নবীন বেশ, তৃতীয় দিন রাখাল বেশ, চতুর্থ দিন নটবর বেশ, পঞ্চম দিন রাজবেশ এবং ষষ্ঠ দিনে সিঙ্গার বেশে বিগ্রহদ্বয়কে সাজানো হয়। ষষ্ঠ দিন দুবেলা বিগ্রহদ্বয়কে ফকির বেশে সাজিয়ে বোঝান হয় পিতৃশ্রাদ্ধ করে তাঁরা সহায় সম্বলহীন হয়ে পড়েছেন। গোপীশ্বর শিবমন্দিরটি চারচালা পদ্ধতিতে নির্মিত।

বৈষ্ণবদের তীর্থক্ষেত্র এই বাঘনাপাড়ায় বৈষ্ণব ধর্মের পাশাপাশি শৈব, শাক্ত ও লৌকিক বিভিন্ন উৎসবের সমন্বয় দেখা যায়। এই গ্রামেই রয়েছে গোপীশ্বর শিবলিঙ্গ যার মূর্তি ভাস্কর্য বিরল প্রকৃতির। এই গোপেশ্বর শিবের স্ত্রীলোকের কোন বেশভূষা নেই। তিনটি পৃথক প্রস্তর খণ্ডের দ্বারা শিবলিঙ্গটি নির্মিত। লিঙ্গের রুদ্রাংশে এক দশভূজামূর্তি খোদিত। এই দশভূজামর্তি বদ্ধ - পদ্মাসন ভঙ্গীতে আসীন যা দশপ্রহরণ - ধারিণী। এই মূর্তি এক কথায়

বিরল বলা যায়। শিবরাত্রিতে গোপীশ্বর মন্দিরে প্রতিবছর বহুভক্তের সমাগম হয়। এই শিবলিঙ্গের মাথায় জল ঢালবার জন্য কালনার পাশ্ববর্তী গঙ্গা থেকে জল নিয়ে গিয়ে ভক্তরা আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে জল ঢালতে যায়।

এছাড়া এই গ্রামে রামচন্দ্রের ভাই শচীনন্দন নির্মিত কৃষ্ণ-বলরাম মন্দির আছে। মন্দিরের গর্ভগৃহটি আটচালার এবং এর জগমোহনটি চারচালা পদ্ধতিতে নির্মিত। এই মন্দিরের উত্তরে অবস্থান করছে আটচালা পদ্ধতিতে নির্মিত রেবতী-রাধারাণীর মন্দিরটি। এর বিপরীতে আছে অষ্টাদশ শতকে নির্মিত একচালার জগন্নাথ মন্দির। এই জগন্নাথ মন্দিরের মধ্যে আছে গোকুল চাঁদ, গোপাল, লক্ষ্মী, নিতাই - গৌর, ১০৮ টি ক্ষুদ্রাকৃতির শিবলিঙ্গ ও ১০৮ টি শালগ্রাম শিলাসহ রাজরাজেশ্বর। প্রাসাদের ন্যায় এই ঠাকুর বাড়িটির সম্মুখে আছে সুউচ্চ সিংহদ্বার ও মন্দির চত্বরে আছে - দ্বিতল নহবৎখানা, দোলমঞ্চ, নাটমন্দির, জগন্নাথদেবের গুণ্ডিচাঘর, অষ্ট কোণাকার ঘড়িঘর, দুর্গামন্দির, রন্ধনশালা ও গাজন মন্দির। এখানে আষাঢ় মাসে জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা ও রথযাত্রা উপলক্ষে উৎসব হয়।

বাঘনাপাড়া গ্রামের মধ্যেই আছে চারচালার ইঁটের একটি মন্দির যার অভ্যন্তরে আছে মনসা, শীতলা ও জগৎগৌরী। তাছাড়া রয়েছে নন্দ গোস্বামীদের যমুনা গাটের মন্দির, নাথেদের পারিবারিক মন্দির, বন্দ্যোপাধ্যায়দের জোড়া মন্দির, সেনগুপ্ত পরিবারের মন্দির, রঘুনাথ গোস্বামীর মন্দির। এই গ্রামে শৈব ও বৈষ্ণব উভয় সম্প্রদায়েরই অবস্থান ছিল পাশাপাশি। মূলত গোস্বামী পরিবারের উদারতার জন্যই একই ঠাকুর বাড়িতে যেমন আছেন রাধাকৃষ্ণ তেমনি আছেন শিব, শক্তি ও লৌকিক দেবতারা।

গ্রামে চৈত্রমাসে বংশীবদনের জন্মোৎসব, হোড়া পঞ্চমী উৎসব, জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তিতে মনসাদেবীর ঝাপান উৎসব পালিত হয়। গ্রামের পশ্চিমপ্রান্তে রাধানগরে ধর্মরাজের পূজো ও উৎসব পালিত হয়। প্রতিবছর মাঘ মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে এই ধর্মরাজের উৎসব পালিত হয়। বর্তমানে বাঘনাপাড়া 'তীর্থক্ষেত্রের ' পাশাপাশি কালনা মহকুমার একটি অন্যতম ব্যবসাকেন্দ্র হিসেবেও পরিচিতি লাভ করেছে।

চুপী গ্রামের রাধাবল্লভ মন্দির

পূর্বস্থলী থানার অন্তর্গত চুপী গ্রামের রাধাবল্লভ মন্দির বর্ধমান রাজার দেওয়ান হিসেবে চুপীর রায় পরিবার পরিচিত ছিলেন। এক সময় এই বংশের সন্তান ব্রজকিশোর রায় ও অকিঞ্চন (রঘুনাথ রায়) শাক্ত পদাবলী রচনা করেছিলেন। এঁদেরই পূর্বপুরুষ ছিলেন গৌরীকিশোর রায়, যিনি চুপীতে দালানরীতির একটি রাধাবল্লভ মন্দির ও চারটি শিবমন্দির তৈরী করেন। এই মন্দিরের মধ্যে দেড় ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট কালো কষ্টিপাথর নির্মিত বংশীধারী রাধাবল্লভ ও এক ফুট উচ্চতার পিতলের রাধারাণী অধিষ্ঠিত আছেন। এছাড়া রাধাকৃষ্ণের দুপাশে একটি কষ্টি পাথর ও অপরটি পিতল নির্মিত গোপাল মূর্তি আছে। আর সিংহাসনে উপবিষ্ট মূর্তির আগে রয়েছে দেড ফুট উচ্চতার গৌরী পট্টহীন কালো কষ্টি পাথরের একটি ছোট শিবলিঙ্গ। এছাড়া ৬ ইঞ্চি উচ্চতার একটি গণেশ মূর্তিও সেখানে

রয়েছে।

দোগাছিয়া গ্রামের গোপীনাথ মন্দির

কালনা মহকুমার পূর্বস্থলী থানার অন্তর্গত দোগাছিয়া গ্রামের গোপীনাথ মন্দিরটি এই অঞ্চলের অন্যতম প্রাচীন মন্দির। মন্দির গাত্রে উল্লেখিত প্রতিষ্ঠাফলক থেকে জানা যায় এটি ১৬৫৪ খ্রীষ্টাব্দে নির্মাণ করা হয়। এর উচ্চতা ষাট ফুট, গড়ন বাংলার আটচালা মন্দিরের ন্যায়, মন্দিরের প্রবেশ দ্বারের দুপাশে দুটি স্তম্ভ আছে যা চিত্রায়িত, উপরিভাগের দেওয়াল গাত্রও শিবলিঙ্গ, লতাপাতা ও পাখিতে অঙ্কিত। মন্দিরের ভিতরে চারটি বিগ্রহ আছে। রাধারাণী, কৃষ্ণচন্দ্র, মদনমোহন ও গোপীনাথ মূর্তিগুলি কষ্টিপাথরের মুরলীধর কৃষ্ণ।

একটি প্রাচীন দুর্গোৎসব

কালনা মহকুমার প্রাচীনতম দুর্গোৎসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কালনার নৃপ পল্লীর চরণ চ্যাটার্জী বাড়ির দুর্গোৎসব যা প্রায় ৫০০ বছরের পুরনো। তৎকালীন বর্গী আক্রমণকে উপেক্ষা করে এই পূজো আজও এই শহরের বুকে হয়ে আসছে। এছাড়া কালনার তেপুতলবাড়ি, ভট্টাচার্য্য বাড়ি, সেন বাড়ি, যুগল মোক্তারের বাড়ি, দীনবন্ধু সাহার বাড়ি, বসু মল্লিক পরিবারের দুর্গাপূজো বহু প্রাচীন কালের। এরমধ্যে সব কটি পরিবারে পূজো অবশ্য এখনো হয় না। অন্য দিকে শহরের বাইরে সমুদ্রগড়ের বুড়িমার পূজো বলে খ্যাত বর্তমানের বারোয়ারী পূজোটিও প্রায় ৫০০ বছরের পুরনো। অতীতে এটিও পারিবারিক পুজোই ছিল। সমুদ্রগড়ের কাছে নাদনঘাটের দিগ্‌পাড়ার সাধন মজুমদারদের বাড়ির দুর্গাপূজোও বহু প্রাচীন। (৫০০ বছরের পুরনো দুর্গা পুজোর কথা ঐসব পরিবার ও বারোয়ারীর কর্মকর্তারা দাবি করেন। তবে দুর্গাপুজোর ইতিহাস ৪০০ বছরের একথা ইতিহাস সিদ্ধ)

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মেলা

কালনা শহরের কানাদিঘীর চড়কপূজো উপলক্ষ্যে আয়োজিত মেলা আনুমানিক ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে হয়ে আসছে। চৈত্র সংক্রান্তির দিন এখানে বিরাট মেলা বসে । কালনার প্রাচীনতম অঞ্চল শাহপুরে সতীমায়ের থান (পাষাণ) মূর্তিকে কেন্দ্র করে বৈশাখ মাসে ঐ অঞ্চলে বিরাট উৎসব ও মেলার আয়োজন হয়। কালনা - বৈদ্যপুর বাসরুটে ওমরপুরের কাছে একটি প্রাচীন বটগাছকে 'ঢেলাইচণ্ডী' দেবী হিসেবে পূজা ও উৎসব পালিত হয়। ১লা মাঘ উত্তরায়ণ উপলক্ষে সমুদ্রগড়ের জালুইডাঙ্গা ও কাঞ্চনতলায় দুটি বিরাট মেলা প্রতি বছর হয়। বেহুলা নদীর তীরবর্তী কালনা পাণ্ডুয়া বাসরুটে ট্যারা বাধের ঝাপানের মেলা মনসা মায়ের পুজো উপলক্ষে পালিত হয়। পূর্বস্থলীর জামালপুরের বুড়োরাজতলায় বৈশাখী পূর্ণিমায় শিবপুজোকে কেন্দ্র করে বৃহৎ মেলার আয়োজন হয়। মেলা চলে প্রায় একমাস । তবে বুড়োরাজ শিবের পূজো হয় বৌদ্ধ পূর্ণিমার দিন। মন্তেশ্বরের শুশুনিয়ার কামাখ্যাদেবীর পুজো উপলক্ষে এখানে মেলা বসে প্রতিবছর। কালনা - বৈদ্যপুর রুটে

নেপাকুলীর ঝাপানের মেলা বসে প্রতিবছর। এই উপলক্ষে এখানে বারুদও পোড়ানো হয়। বৈশাখ মাসের শুক্লা চর্তুর্দ্দশীতে সারগড়িয়ায় শীতলা মায়ের পূজো উপলক্ষে মেলা বসে ও প্রচুর জন সমাগম হয়। ১লা মাঘ উত্তরায়ণ উপলক্ষে কালনা-বর্ধমান রুটে মালতিপুরে গঙ্গার তীরে একটি মেলা বসে। চৈত্রসংক্রান্তি উপলক্ষে শিবের গাজনে এক চাকায় মেলা ও যাত্রানুষ্ঠান হয়। হাটগাছার বিশালাক্ষ্মী মন্দির প্রাঙ্গনে বৈশাখ সংক্রান্তিতে বিশেষ পূজোর আয়োজন করা হয় ও মেলা বসে। শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা তিথি উপলক্ষে রামেশ্বরপুরের ব্রহ্মাপূজার আয়োজন ও জনসমাগম। জ্যৈষ্ঠ মাসের পঞ্চমী তিথিতে জামীর তলায় ঝাপানের মেলা ও পূজো উৎসবের আয়োজন করা হয়। ভাদ্র মাসের সংক্রান্তিতে চাগ্রামে ঝাপান উৎসব পালিত হয়। ছোট বহরকুলি গ্রামে জ্যৈষ্ঠ মাসের ঝাপান উপলক্ষে মেলা বসে ও বারুদ পোড়ানো হয়। চা-গ্রামের শিবমন্দির প্রাঙ্গনে ফাল্গুন মাসের শেষ দিনে শিবপূজোকে কেন্দ্র করে মেলা বসে। গঙ্গাপূজোকে কেন্দ্র করে কালনার পাথুরিয়া মহলে ও মহিষমর্দিণী তলায় উৎসব পালিত হয়। শ্রাবন মাসের পূর্ণিমায় কালনার মহিষমর্দিণী তলায় বিরাট মেলা বসে ও প্রচুর লোকসমাগম হয়। মেলা থাকে প্রায় পনেরোদিন। এছাড়া সরস্বতী পূজো উপলক্ষে কালনা শহর চারদিন ধরে উৎসবের সাজে সেজে ওঠে। চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী, নবদ্বীপ ও শান্তিপুরের রাস এবং কাটোয়া ও চুঁচুড়ার কার্তিক পূজোর মত কালনার সরস্বতী পূজোও এখানকার স্থানীয় উৎসব হিসেবে ক্রমশই বিখ্যাত হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য কুটির শিল্প

তাঁত, রাখী, মৃৎশিল্প, শীতলপাটি, বারকোষ, বিড়ি, শঙ্খ, লেদার ব্যাগ, মোড়া, হ্যাচারী, গেঞ্জী, শোলা ও টিপ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

কয়েকটি বিশেষ জনগোষ্ঠী

(১) কালনা মহকুমার পূর্বস্থলীতে বসবাস করে 'বুনো' (স্থানীয় নাম) সম্প্রদায়। এরা ব্রিটিশ রাজত্বকালে নীলকর সাহেবদের দাস হিসেবে সেই সময় ছোটনাগপুর মালভূমি থেকে এখানে এসেছিল। মালপাহাড়ী সম্প্রদায়ভুক্ত এই আদিবাসী গোষ্ঠী বর্তমানে এই এলাকায় মূলত চাষবাসের কাজে নিযুক্ত আছে।

(২) আবার কালনা মহকুমার পূর্ব সাতগেছিয়া অঞ্চলে বহুদিন ধরে বসবাস করছে একটি জেলে সম্প্রদায়। যারা বহুবছর ধরে কালনা পাশ্ববর্তী ভাগীরথী নদী অতিক্রম করে সমুদ্রবক্ষে মাছ ধরতে যায়। এরা সুন্দরবন সংলগ্ন বিভিন্ন অঞ্চলেও যায় মাছ ধরার তাগিদে। এইসব অঞ্চলে বাঘের উপদ্রব থাকায়, বাঘের হাত থেকে বাঁচবার জন্য এরা বাড়ি থেকে যাবার আগে বনদেবতার (বনবিবি) পূজো করে। এরা বংশপরম্পরায় এই মাছ ধরার কাজ করে আসছে। এখনো এই সম্প্রদায়ের লোকেরা পূর্ব সাতগেছিয়া অঞ্চলে বসবাস করছে।

(৩) শহর কালনার শাসপুর ও মধুবন অঞ্চলে রয়েছে দাস পদবীধারী ঢাকী সম্প্রদায়। এদের আদি বাড়ি পূর্ববঙ্গে হলেও স্বাধীনতার পর থেকে এরা কালনা শহরে এসে বসবাস

করছে। এই অঞ্চলে বেশ কয়েক ঘর ব্যাণ্ডপার্টিও আছে। যারা সারাবছর তাদের পেশাগত চর্চা চালিয়ে যায়। এছাড়া পূর্বস্থলী, মন্তেশ্বর ও নাদনঘাটে ঢাক, ঢোল, সানাই ও কাঁসি বাদকেরা বসবাস করছে বংশ পরম্পরায়। এইসব সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা তাদের পেশাগত প্রয়োজনে আজ দিল্লী, মুম্বাই, কলকাতা, কাশ্মীর সহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে যাচ্ছেন।

(৪) কালনা শহরের সুবর্ণ-নগর কলোনীতে আর বালির বাজারে একসময় অনেক 'পটুয়া বাস করতেন। তাই বালির বাজারের পূর্বের নাম ছিল পটোবেড়ে। এই অঞ্চলের সর্বশেষ পটশিল্পী ছিলেন বিহারীলাল চিত্রকর। কালনার পটুয়া সম্প্রদায় ছবি আঁকতেন নৈরী তুলট কাগজে। সতীশচন্দ্র চিত্রকর ছিলেন সেই সময় অপর একজন প্রসিদ্ধ - পটুয়া শিল্পী। বিহারীলাল ও সতীশচন্দ্র একসময় বাগবাজারের বসু পরিবারে দুর্গাপ্রতিমার অঙ্গরাগ ও চালচিত্র আঁকতেন। এছাড়া কালনা মহকুমার মন্তেশ্বর ও গুপ্তিপুরেও পটুয়া শিল্পীদের বাস ছিল।

(৫) এছাড়া কালনায় 'সাঁজি' লোকশিল্পী সম্প্রদায় সপ্তদশ শতকে রাজা চিত্রসেন ও কীর্তিচন্দ্রের আমলে ছিলেন। তাঁদের জনপ্রিয়তা রাজ আনুকূল্যে এই অঞ্চলে ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। এই দুই সম্প্রদায় এখন প্রায় বিলুপ্ত।

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মেলা ও লোকউৎসব

বর্ধমান জেলার কালনা মহকুমা কৃষিপ্রধান অঞ্চল হলেও এখানে বৈশাখ থেকে চৈত্র পর্যন্ত বহু মেলা বসে বিভিন্ন লোক উৎসবকে কেন্দ্র করে।

তিথি	মেলার নাম	লোক উৎসব	দেবদেবীর নাম
১ বৈশাখ	মন্তেশ্বর	শিবের গাজন	চামুণ্ডা শিব
বৈশাখী শুক্লাষ্টমী			
বৈশাখী নৃসিংহ			
চতুদর্শী	সারগড়িয়া	শীতলার ঝাপান	শীতলা
বৈশাখী বুদ্ধপূর্ণিমা	বৃদ্ধপাড়া	বৈষ্ণব মেলা	শ্রীহরি
ঐ দিন	জালুইডাঙ্গা	ভূদেবী উৎসব	সিদ্ধেশ্বরী
ঐ দিন	জামালপুর	ধর্মের গাজন উৎসব	বুড়োরাজ
ঐ দিন	নিভূজীবাজার	ভূদেবী উৎসব	গজলক্ষ্মী
ঐ দিন	বাঘনাপাড়া	গাজন	গোপেশ্বর শিব
২. জ্যৈষ্ঠ			
দশহরা	কালনা	দশহরা উৎসব	গঙ্গাদেবী
৩. আষাঢ়			
শুক্লা পঞ্চমী	নারকেলডাঙ্গা	ঝাঁপান	জগৎগৌরী

ঐ দিন	সিমলন	পুজো ও উৎসব	সিদ্ধেশ্বরী
ঐ দিন	মগুলগ্রাম	ঝাঁপান	জগৎগৌরী
ঐ দিন	নন্দগ্রাম	ঝাঁপান	মনসা
ঐ দিন	নেপাকুলি	ঝাঁপান	মনসা
আষাঢ় ষষ্ঠী	নসরৎপুর	ঝাঁপান ও জাত	বাগ্দেবী
ঐ দিন	বিদ্যানগর	ঝাঁপান ও জাত	বাগ্দেবী
ঐ দিন	গোপীনাথপুর	ঝাঁপান ও জাত	বাগ্দেবী
কৃষ্ণ দ্বিতীয়া তিথি	কালনা	রথযাত্রা	গোপাল, জগন্নাথ
ঐ দিন	বাঘনাপাড়া	রথযাত্রা	কৃষ্ণ বলরাম
৪. শ্রাবন -			
শ্রাবনী - পূর্ণিমা	নয়াগঞ্জ	পূজাধিবাস ও উৎসব	মহিষমর্দিণী
৫. ভাদ্র -			
শুক্লা পঞ্চমী	বৃদ্ধপাড়া	ঝাঁপান	মনসা
ভাদ্র সংক্রান্তি	বৈদ্যপুর	ছাতাপরব	ইন্দ্র
ঐ দিন	বৈদ্যপুর	আদিবাসী উৎসব	কারাম পুজো
৬. আশ্বিন -			
১ লা আশ্বিন	সিমলন	ঝাঁপান	মনসা
আশ্বিন নবমী	বৈদ্যপুর	আদিবাসী উৎসব	জাগরণ
৭. কার্তিকী			
কার্তিক পূর্ণিমা	বাঘনাপাড়া	শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা	কৃষ্ণ বলরাম ও শ্রী চৈতন্য
অষ্টমী তিথি	বাঘনাপাড়া	গোপাষ্টমী	গোকুলচাঁদ
৮. অগ্রহায়ণ -			
২ রা অগ্রহায়ণ	বাঘনাপাড়া	শ্রীকৃষ্ণের রথযাত্রা	কৃষ্ণ বলরাম
৯. পৌষ			
৮ ই পৌষ	বাকুলিয়া,টেরাবাঁধ	খ্রীষ্টোৎসব বড়দিন	যীশু
পূর্ণিমা তিথি	লালজী বাড়ি কালনা	বৈষ্ণবোৎসব	কাত্যায়ণী
সংক্রান্তি	কুঠীরডাঙ্গা, বহরা, পাটুলী, মালতীপুর	মকরসংক্রান্তির মেলা ও গঙ্গাস্নান	বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি
১০. মাঘ			
কৃষ্ণাতয়া	বাঘনাপাড়া	রামাই পণ্ডিতের তিরোধান উৎসব	কৃষ্ণ-বলরাম
মাঘী পূর্ণিমা	ধর্মডাঙ্গা	ঝাঁপান	বাগ্দেবী
মাঘী সংক্রান্তি	শাসপুর	মুসলিমদের উৎসব	মজলিশ পীর
ঐ দিন	বাগড়াইতলা	ঝাঁপান	বাগ্দেবী

শ্রী পঞ্চমী	কালনা	পূজো, মেলা ও উৎসব	সরস্বতী
১১. ফাল্গুন			
২ রা ফাল্গুন	কুসুমগ্রাম	মকাই পীরের মেলা	পীরবাবা
দোল পূর্ণিমা	পাতুন	শ্রীচৈতন্য জন্মোৎসব ও বৈষ্ণব মেলা	শ্রীকৃষ্ণ
ঐ দিন	সমুদ্রগড়	ঐ	ঐ
ঐ দিন	সিঙ্গারকোন	ঐ	ঐ
ঐ দিন	দেনুড়	ঐ	ঐ
১৩ ই ফাল্গুন	রাইগ্রাম	পীর গোরাচাঁদের মেলা	পীরবাবা
ঐ দিন	চকবামন গড়িয়া	খাজা পীরসাহেবের মেলা	পীরবাবা
১৪ ই ফাল্গুন	বনপুর	শাহ্ ফকির পীরের মেলা	পীরবাবা
ঐ দিন	সমুদ্রগড়	ঐ	পীরবাবা
১২. চৈত্র - রামনবমী	গঙ্গানন্দপুর	বৈষ্ণবমেলা	শ্রীচৈতন্য
চৈত্র সংক্রান্তি	আনুখালবেলে	গাজন ও উৎসব	শিব
ঐ দিন	কৃষ্ণদেবপুর	ঐ	ঐ
ঐ দিন	কানাদিঘীর পাড়	ঐ	শিব
চৈত্র অমাবস্যা	বড় ধামাস	পূজা ও উৎসব	রক্ষাকালী

তথ্যসূত্র ঃ কালনার ইতিবৃত্ত / দীপক কুমার দাস

লোকসংস্কৃতি

কালনা মহকুমার লোক সংস্কৃতির মধ্যে যা এখনো প্রচলিত আছে সেগুলি হল মঙ্গলকাব্য পরবর্তী যুগের পাঁচালি কথকতা, কীর্তন,কবিগান, যাত্রা, বাউল, তরজাসহ সড়কী ও লাঠিখেলা, রণপা নৃত্য, লেটো, হাপুগান, জারিগান, লাঠিনাচ, মই মাচানে নাচ, বারুদ পোড়ানো ইত্যাদি। এইসব লোকসংস্কৃতির মূল ধারক ও বাহক হল মহকুমার গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা সাধারণ মানুষ যাদের মাধ্যমে সংস্কৃতির এইসব সম্পদ আজও বিকশিত হচ্ছে। এই মহকুমার লোকসংস্কৃতির একটি সামগ্রিক রূপরেখা –

উৎসব	স্থানের নাম	উৎস
১. বারুদ পোড়ানো	সিঙ্গারকোন, চাগ্রাম, আনুখাল বাঘনাপাড়া, সমুদ্রগড় নেপাকুলি, সুলতানপুর	জৈনদের আলোক উৎসবের প্রকাশ
২. চড়কের ফোঁড়, সঙ সহ গাজন	কালনা শিমূলতলা, কৃষ্ণদেবপুর নিভূজীবাজার, একচাকা,রকাপিলপাড়া, বুড়োশিবতলা ও কপিলপাড়া	শৈব ধারণা মতে নিজের দৈহিক কৃচ্ছ সাধনা

৩. তরজা	আলাউদ্দীন (গোয়ারায়)	কবিত্ব শক্তির তাৎক্ষণিক প্রকাশ
৪. লেটো ও রাসযাত্রা	কালনা শহর ও পাশ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল	তাৎক্ষণিক নাট্যভাবনা
৫. বহুরূপী	মধুবন (কালনা শহর)	আমোদ দানের মাধ্যমেঅর্থউপার্জন
৬. ঢাল ও তলোয়ার সহযোগে নাচ	জবানীপাড়া(কালনা শহর) নিভূজী বাজার	বীরত্ব
৭. ঝুমুর	বৈদ্যপুর	নান্দনিক সংস্কৃতির প্রকাশ
৮. ভাদু ও টুসু	পূর্বস্থলীর গ্রামাঞ্চল	সন্তানসন্ততির মঙ্গলকামনা
৯. ষাঁড় ও মানুষের মধ্যে লড়াই	কেশবপুর	বীরত্ব প্রদর্শন
১০. জারিগান, লাঠি ও সড়কি খেলা	নাদনঘাট, জামালপুর কালনার নীচুরাস্তা ও গঙ্গাপাড়ার মসজিদ	ঐ
১১. বাউল	বাবুডাঙ্গা, চুপী, বড় কোবলা কুমীরপাড়া, উত্তর শ্রীরামপুর	দেহতত্ত্ব ও আত্মানুভূতির মাধ্যমে সঙ্গীত
১২.বাণফোঁড়া, আগুনঝাঁপ ও কাঁটা ঝাঁপ	বৈশাখী পূর্ণিমায় পূর্বস্থলী ও মন্তেশ্বরের গ্রামাঞ্চল	ধর্মরাজের পূজো উপলক্ষ
১৩. ঘেঁটু	এই মহকুমার প্রায় সব গ্রাম	জৈনদের আলোক উৎসব
১৪. সয়লা ও ঝাপানে মই মাচানে নাচ	কাশীপুর, ট্যারাবাঁধ, ছোটবহর কুলী, নেপাকুলী, নারকেলডাঙ্গা	দম্ভ প্রকাশের মাধ্যম
১৫. ঘোড়ানাচ ও রাম রাবণের যুদ্ধ	কালনার পাথুরিয়া মহলে ওড়িয়া সম্প্রদায় রামনবমী ও গঙ্গাপূজোয় নাচে	বীরত্ব দেখানো
১৬. কীর্তন	যোগীপাড়া, দাঁতন কাঠিতলা,নার-কেলডাঙ্গা, রামেশ্বরপুর, বৈদ্যপুর	ভাব ও প্রেমরসের প্রভাব
১৭. যাত্রা	নাদনঘাট, পূর্বস্থলী, মন্তেশ্বর, ধাত্রীগ্রাম, বাঘনাপাড়া, বৈদ্যপুর, হাটগাছা, কালনা শহর, সমুদ্রগড়	সমাজের চেতনা ও ইতিহাসের প্রভাবে উদ্ভাসিত।
১৮. ঝুলনের সাজ	কালনা শহর, ধাত্রীগ্রাম, কৃষ্ণ - দেবপুর , নাদাই অঞ্চল	শ্রীকৃষ্ণর ভাব ধারণ

১৯. সঙযাত্রা	উপলতি, বাঘনাপাড়া, অকালপৌষ . রঙপুর, পাথরঘাটা, নপাড়া, কালনা শহর	সামাজিক ঘটনার প্রভাব
২০. আদিবাসীদের ধমসা, মাদলসহ নৃত্যগীত	কালনা মহকুমা হাসপাতালের নিকটবর্তী আদিবাসী পল্লী	রাঢ়ভূমির বর্ষবরণ উৎসব ও নতুন ফসল তোলার আনন্দ

তথ্যসূত্র ঃ কালনার ইতিহাস - তরুণ ভট্টাচার্য

যাত্রা ও নাটক

অতীতে কালনায় কৃষ্ণযাত্রা রচনায় নাম করেছিলেন কোয়ালডাঙ্গার দাসপাড়া নিবাসী নারায়ণ চন্দ্র দাস। তিনি গ্রামের কুড়িজন যুবককে সঙ্গে নিয়ে কৃষ্ণযাত্রার দল গড়েছিলেন। সেই সময় কৃষ্ণ যাত্রার কুশীলবরা ছিলেন গ্রাম বাংলার সাধারণ -অশিক্ষিত সম্প্রদায়। নারী চরিত্রে সে সময় পুরুষরাই অভিনয় করতেন। এই দলের ক্ষুদিরাম দাস মানভঞ্জন পালা গানে অসাধারণ অভিনয়ের জন্য তৎকালীন রাজবাড়ি থেকে মেডেল ও নগদ অর্থ পুরস্কার স্বরূপ পায়। এছাড়াও কালনা মহকুমার মন্তেশ্বরের মতিলাল রায়, আনুখালের ভূষণচন্দ্র দাস, গোয়ারার কালীপদ হালদার, বাঘনাপাড়ার সতীশচন্দ্র মুখার্জী, কোয়ালডাঙ্গায় দুর্গাপদ দাস কৃষ্ণযাত্রার পরিচালক ও পালা রচনাকার হিসেবে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

কালনার একসময় পুতুল সঙ বা জীবন্ত সঙের যাত্রা খুব বিখ্যাত ছিল। সেসময় চুরি, ডাকাতি, কালোবাজারি, পুলিশের অত্যাচার, কর ফাঁকি ইত্যাদি বিষয়কে সামনে রেখে সঙ যাত্রা অনুষ্ঠিত হত। মূলত উপলতি,বাঘনাপাড়া, অকালপৌষ, পাথর ঘাটা, আকবপুর, রাইগাঁ, বিষহরি ডাঙ্গা, রঙপুর, নারকেলডাঙ্গা,বাঘাসন, নপাড়া প্রভৃতি গ্রামের সঙযাত্রা বেশ নাম করেছিল। তাছাড়া কালনা শহরে গঙ্গাপূজো, রাসযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, মহিষমর্দিনী পূজো এই সঙযাত্রার সমারোহ এখনো লক্ষ্য করা যায়।

১৯২৩ সালে কালনায় স্থাপিত হয় মহিষমর্দিনী নাট্য সমিতি। ১৯৩১ সালে তারা দুটি উল্লেখযোগ্য নাটক মঞ্চস্থ করে কর্ণার্জুন ও দুর্গেশনন্দিনী। ১৯৩৮ সালে চাঁদ সদাগর ও ১৯৩৯ সালে খনা ও উত্তরা ছিল আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাটকের মধ্যে অন্যতম। সেসময় এই দলের উল্লেখযোগ্য অভিনেতারা হলেন গৌর সেন, কার্তিক ব্যানার্জী, জগদীশ্বর সামন্ত, শক্তিকান্ত গাঙ্গুলি, রথীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, বিধূভূষণ সেন, শ্যাম কিংকর ভট্টাচার্য্য, জগবন্ধু চক্রবর্তী,শ্যামাপদ ভট্টাচার্য, বৈদ্যনাথ মিশ্র, জগদীশ চন্দ্র রায় ও রমাচরণ সান্যাল। ১৯৪৭ সালের পর এই দলটির নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় অম্বিকা মহিষমর্দিনী নাট্যসমিতি। সেই সময় এর দায়িত্বে আসেন বলাই রায়, অনাদি দাস, হাঁসি ঘোষ ও গোবিন্দ কর্মকার। এই সময় দলটি নাটক ছেড়ে যাত্রার প্রতি আকৃষ্ট হয়। অনাদি দাসের পরিচালনায় তাদের উল্লেখযোগ্য যাত্রাগুলি হল বঙ্গে বর্গী, ভক্ত হরিদাস,পলাশীর

পরে, অরুণ-বরুণ - কিরণমালা, সাধক রামপ্রসাদ,কবি চন্দ্রাবতী, ভক্ত সুরদাস প্রভৃতি।

কালনা মহকুমার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাট্য সংস্থা হল সুভাষ নাট্যগোষ্ঠী,বীণাপাণি নাট্য সমিতি, গৌরীদাস নাট্য সমিতি, ধ্রুব নাট্য সমিতি, পাথুরিয়া মহল সৌখিন নাট্য সমিতি, পাথুরিয়া মহল নাট্য সমাজ, ব্রহ্মা নাট্য সমাজ স্পুটনিক নাট্য সমিতি, শরৎনাট্য সমিতি,কালীমাতা নাট্য সমাজ, কিশোর নাট্য সমিতি, ঐকতান নাট্য সংস্থা, জাগরণী নাট্য সমিতি, অনাদি নাট্য সমিতি, গ্রহরাজ নাট্য সমিতি, বাঘনাপাড়া তরুণ সংঘ, চাগ্রাম - গোয়ারা আদিবাসী নাট্য সংস্থা, ছোট বহরকুলী আদিবাসী যাত্রা ক্লাব।

বর্তমানে কালনায় সুভাষ পাঠাগারের উদ্যোগে ১৪ বছর ধরে সারা বাংলা একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই সংস্থাই নাট্য চর্চার মুখপত্র হিসেবে 'মহুয়া' পত্রিকাটি প্রকাশ করে। ২০০০ সাল থেকে কালনার স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সহযোগ অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে সারা বাংলা শিশুনাটক প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। কালনায় রবীন্দ্র ও নজরুল গীতিনাট্যে সঞ্চারী (পরিচালনায় মানসী পাল) ও দিশারী (পরিচালনায় সুচিত সান্যাল) উল্লেখের দাবি রাখে।

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রাম

(১) অকাল পৌষ - কালনা - বৈঁচি বাসরুটে কালনা থেকে প্রায় ৯ কিলোমিটার দূরত্বে অকাল পৌষ গ্রামটি অবস্থিত। গ্রামটি দুজন বিখ্যাত ব্যক্তির জন্মস্থান হিসেবে প্রসিদ্ধ। প্রথম জন হলেন বিপ্লবী অরবিন্দ প্রকাশ ঘোষ (১২৭৬ সাল) ও দ্বিতীয় জন হলেন বাংলা সবাক চলচ্চিত্রের প্রারম্ভিক চিত্র পরিচালক দেবকী কুমার বসু (১৮৯৪ সালের ২৫শে নভেম্বর) বর্তমানে এই গ্রামটিকে কালনা মহকুমার একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম হিসেবে গণ্য করা হয়।

(২) উদয়পুর - কালনা মহকুমার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত বেহুলা নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত উদয়পুর গ্রামটি মনসামঙ্গল গ্রন্থের বেহুলা লখিন্দর ঘটনা অবলম্বনে প্রসিদ্ধ। জনশ্রুতি আছে মৃত স্বামী লখিন্দরকে নিয়ে বেহুলা কলার ভেলায় চেপে যাবার সময় এই গ্রামে সেই সময় উদয় হয়েছিলেন। তাই এই গ্রামের নাম উদয়পুর। এই গ্রামের আষাঢ় নবমীর ঝাঁপান উৎসব বিখ্যাত। এই সময় বিভিন্ন গ্রামের ওঝারা সাপ নিয়ে নানারকম খেলা দেখায় তা অত্যন্ত আকর্ষণীয়। গ্রামে বেহুলার প্রাচীন মন্দির আছে যার মুল সেবাইত হল পণ্ডিত উপাধিধারী বাগদী সম্প্রদায়।

(৩) করন্দা - মন্তেশ্বর থানার অন্তর্গত এই গ্রামটিতে দেবী করন্দেশ্বরীর মন্দির আছে। মা মহিষমর্দিনী রূপে এই গ্রামদেবী একটি মাটির ঘরে প্রতিষ্ঠিত আছেন। সারা বছর দেবীর নিত্যসেবার পাশাপাশি শ্রাবন মাসের শুক্লা চতুর্দশী তিথিতে এখানে বিশেষ উৎসব ও মেলা হয়। এই উৎসবের বিশেষত্ব হল হাড়ি সম্প্রদায়ের শূকর বলিদানের মাধ্যমে পূজারম্ভ ও দেবীর সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত গ্রাম প্রদক্ষিণকালে প্রতিটি বাড়ির সামনে বলিদান প্রথা। এই গ্রামের অন্য দুটি বিশেষ উৎসব হল চৈত্র মাসের গাজন এবং মাঘী ও বৈশাখী পূর্ণিমায়

বুড়োরাজের পূজো।

কুসুমগ্রাম - মন্তেশ্বর থানার অন্তর্গত কুসুমগ্রাম অঞ্চলটি ছিল মধ্যযুগের ইসলাম সংস্কৃতির একটি অন্যতম কেন্দ্র। এই গ্রামে অতীতে মুসলিম সম্প্রদায়ের বিদ্যাচর্চার জন্য বেশ কয়েকটি মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। যার ফলে এই গ্রামে মুসলিমদের বসতি গড়ে ওঠে। এই গ্রামেই বসবাস করতেন সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ খুদাবক্স মল্লিক।

(৫) গোপালদাসপুর - কালনা শহর থেকে প্রায় ৮ কিলোমিটার দূরে কালনা - বৈঁচি বাসরুটের ধারে অবস্থিত বৈদ্যপুরের নিকটবর্তী গ্রাম হল গোপালদাসপুর। জনশ্রুতি আছে এই গ্রামে কানু গোস্বামী নামে এক বৈষ্ণব সাধক প্রায় তিনশো বছর আগে রাখালরাজ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । প্রতিবছর ফাল্গুন মাসে এখানে দেবতার অস্তরাগ হয় ও নববর্ষের দিন বিশেষ উৎসব পালিত হয়।

(৬) চুপী - পূর্বস্থলীর কাছে (ব্যান্ডেল কাটোয়া রেলপথে অবস্থিত) চুপী গ্রামটি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে অক্ষয়কুমার দত্ত ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের নামে। মূলত অক্ষয়কুমার দত্ত ছিলেন এই গ্রামের বাসিন্দা। এই গ্রামে ধ্বংস প্রাপ্ত বেশ কয়েকটি প্রাচীন মন্দির আছে।

(৭) জামনা - মন্তেশ্বর থানার অন্তর্গত এই গ্রামটি মেমারী - পুটশুঁড়ি বাসরুটের ধারে অবস্থিত ভাকরার নিকটবর্তী অঞ্চল। বৈদ্যপ্রধান এই গ্রামটিতে পিতলের জয়দুর্গা, রঘুনাথ শিবের ও চণ্ডীর প্রাচীন মন্দির রয়েছে। দোলে ও গাজনে এই গ্রামে বিশেষ উৎসব হয়। গ্রামটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল আজ থেকে প্রায় দেড়শো বছর আগে ১৮৫০ সালে সুবোধচন্দ্র মল্লিক নামে একজন বিদ্যানুরাগী এখানে একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রনাথ মল্লিক এই গ্রামে জন্মেছিলেন।

(৮) জামালপুর - ব্যাণ্ডেল - কাটোয়া রেলপথে পাটুলী স্টেশনে নেমে যেতে হয় জামালপুর। জামালপুর গ্রামটি বিখ্যাত মূলত গ্রামদেবতা 'বুড়োরাজ' -এর অধিষ্ঠান ক্ষেত্র হিসাবে। এই বুড়োরাজ শিবলিঙ্গ হলেও অন্তরালে তিনি ধর্মরাজ হিসেবে রয়েছেন। তাই তিনি এখানে একদিকে যেমন শিবরূপে পূজিত হন তেমনি আবার অন্যদিকে ধর্মরাজ রূপেও পূজিত হন। বুড়োরাজের বিশেষ উৎসব উপলক্ষে এখানে প্রতিবছর বৈশাখ ও মাঘী পূর্ণিমায় মেলা বসে যেখানে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম হয়। গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে বহু লোক এই সময় তাদের মানত মানতে বুড়োরাজের কাছে আসে। পূজোর সময় বলিদান পর্ব উৎসবে এক অন্যতম অঙ্গ।

(৯) দেনুড় - মন্তেশ্বর থানার অন্তর্গত দেনুড় গ্রামটি শ্রীচৈতন্যদেবের দীক্ষাগুরু কেশব ভারতীর জন্ম স্থান হিসেবে বিখ্যাত। গ্রামের ভিতরে ভারতী গড় নামক পুকুরের ধারে কেশব ভারতীর সাধনক্ষেত্র ছিল। তিনি এই গ্রামে অষ্টধাতুর বালগোপাল মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন 'ক্রমদীপিকা' গ্রন্থের রচয়িতা। তাছাড়া এই গ্রামে শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্ত

বৃন্দাবন দাসের শ্রীপাট রয়েছে খণ্ডেশ্বরী নদীর তীরে। এই শ্রীপাটে বৃন্দাবন দাসের রচিত চৈতন্য ভাগবত পুঁথিটি রক্ষিত আছে। এই গ্রামে প্রাচীন দেবতা হিসেবে দীনেশ্বর নামে একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে।

(১০) দত্তদারিয়াটোন - কালনা-বৈঁচি বাসরুটে কালনা থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত হল দত্তদারিয়াটোন গ্রামটি। এই গ্রামটিতে স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক বাস্তু ভিটে ছিল। বর্তমানে তাঁদের সেই ভিটেতে একটি উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। এই গ্রামে একসময় স্বামীজির ভাই ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এসেছিলেন বলে জানা যায়।

(১১) ধাত্রীগ্রাম - ধাত্রীগ্রাম ব্যাণ্ডেল কাটোয়া রেলপথে বর্তমানে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন। ধাত্রীগ্রাম একসময় সত্যিই গ্রাম হলেও, ক্রমশ তা শহরের রূপ নিতে চলেছে। স্থানটি বর্তমানে কালনা মহকুমার একটি অন্যতম ব্যবসাকেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। এই অঞ্চলের তাঁতশিল্প খুবই প্রসিদ্ধ। বহু তাঁতী ও তাঁত শ্রমিক এই অঞ্চলে বসবাস করে।

ধাত্রীগ্রাম মূলত রামসুন্দর তর্কচূড়ামণি, সত্যব্রত সামশ্রয়ী ও সুসাহিত্যিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের জন্মস্থান হিসেবে এক সময় প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। বহু অতীতে এই ধাত্রীগ্রামে বিদ্যাচর্চার জন্য ছাত্ররা এসে গুরুগৃহে থাকতেন ও তাঁদের সেখানে স্মৃতি,ন্যায় ও দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হত।

(১২) নাদনঘাট - কালনা মহকুমার অপর একটি উল্লেখযোগ্য ব্যবসাকেন্দ্র হল নাদনঘাট। কালনা থেকে নাদনঘাট বাস রয়েছে। বহু অতীতে নাদনঘাট থেকে বাণিজ্য চলত পার্শ্ববর্তী খড়ি নদীপথে। বর্তমানে এখানে রাস্তাঘাটের অনেক উন্নতি হয়েছে। ব্যবসার মূল উপাদান এখানে ধান ও চাল ।

(১৩) পাটুলি - ব্যাণ্ডেল - কাটোয়া রেলপথে পাটুলি স্টেশনটি অবস্থিত। ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত এই গ্রামটি মধ্যযুগে ব্যবসাকেন্দ্র হিসেবে খুবই পরিচিতি লাভ করেছিল। স্থানটি ইতিহাসে সম্পৃক্ত হয়ে আছে এইভাবে যে যুদ্ধের জন্য মুর্শিদাবাদ যাবার পথে রবার্ট ক্লাইভ ১৭৫৭ সালের ১৮ ই জুন পাটুলিতে শিবির স্থাপন করেন (ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নথিপত্র থেকে জ্ঞাতব্য বিষয়) । অতীতে পাটুলির কাছে নীলকুঠি ছিল। এখানে পৌষ সংক্রান্তি , ১লা মাঘ ও দোল যাত্রার দিন বিশেষ উৎসব পালিত হয়। গ্রামে লক্ষ্মীনারায়ণ ও সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির আছে।

(১৪) পাতিলপাড়া - কালনা - বৈঁচি বাসরুটে কালনা থেকে প্রায় ৭ কিলোমিটার দূরে পাতিলপাড়া গ্রামটি অবস্থিত। কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের (কল্লোল যুগের কবি) জন্মভূমি হিসেবে এই গ্রামটি প্রসিদ্ধ। এছাড়া এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বিপ্লবী ভূপতি মজুমদার (রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ছিলেন)। স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে যিনি ২৮ বছর জেল খেটেছিলেন। কবি কালিকিঙ্কর সেনগুপ্ত এই গ্রামে শৈশবকালে ছিলেন।

পাতিলপাড়া গ্রামে বর্ধমান মহারাজার কবিরাজ কিশোরীমোহন সেন বসবাস করতেন।

(১৫) পূর্বস্থলী - ব্যাণ্ডেল - কাটোয়া রেলপথে পূর্বস্থলী স্টেশনটি। যে গ্রামের উল্লেখ আমরা মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে পাই। বহু অতীতে এই স্থানটি একটি অন্যতম বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। এই গ্রামটি আরও চার - পাঁচটি গ্রামকে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত করে আছে। যার মধ্যে কাষ্ঠশালি উল্লেখযোগ্য। এই গ্রামের মালাকার পরিবারের কৃতিত্বে এখানকার শোলাশিল্প খুবই খ্যাতি লাভ করেছে। পাঁচ পুরুষ ধরে এই পরিবার এখানে শোলাশিল্পের কাজ করে চলেছে। পূর্বস্থলী গ্রামে চড়ক, রাস ও কার্তিক পূজো উপলক্ষে খুবই ধূমধাম হয়। এই গ্রামে বহু অতীতে সংস্কৃত পাঠদানের জন্য টোল ছিল। যেখানে বহু বিশিষ্ট পণ্ডিত অধ্যাপনা করতেন। বর্তমানে পূর্বস্থলী গণমাধ্যমের শিরোনামে এসেছে এখানে শীতকালীন পরিযায়ী পাখির আগমনকে কেন্দ্র করে। এর ফলে এখানে সরকারি উদ্যোগে একটি পাখিরালয় গড়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই বহু পর্যটক এই পাখির টানে পূর্বস্থলীতে আসতে শুরু করেছে।

(১৬) বৈদ্যপুর - কালনা - বৈঁচি বাসরুটে কালনা থেকে প্রায় ৮ কিলোমিটার দূরে বৈদ্যপুর গ্রামটি অবস্থিত। এই গ্রামে বেশ কয়েকটি মন্দির আছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল বৃন্দাবনচন্দ্রের নবরত্ন মন্দির, নবরত্ন শিবমন্দির, ১৫৯৮ সালে নির্মিত দুটি শিব মন্দির ও কষ্টি পাথরে নির্মিত বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণ ও পিতলের শ্রীরাধিকা। গ্রামে ১২০৪ সালে নির্মিত দুটি কাঠের রথ আছে। রথের দিন এখানে বিরাট মেলা বসে।

(১৭) মন্তেশ্বর – কালনা মহকুমার অন্তর্ভুক্ত মন্তেশ্বর থানা। এই গ্রামটি একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম হিসেবে পরিচিত। খড়ি নদীর তীরে অবস্থিত এই গ্রামটিতে বৈশাখী পূর্ণিমার দিন গাজন হয়। এছাড়া এই গ্রামে চামুণ্ডা পূজোকে কেন্দ্র করে বৈশাখী শুক্লা অষ্টমীতে উৎসব হয়। গ্রামে একটি সিদ্ধেশ্বরী দেবীর মন্দির আছে। বর্তমানে এই গ্রামটি কালনা মহকুমার একটি অন্যতম ব্যবসা কেন্দ্র।

(১৮) সমুদ্রগড় – ব্যাণ্ডেল – কাটোয়া রেলপথে সমুদ্রগড় ভাগীরথী নদীর তীরে অবস্থিত একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত এবং মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে সমুদ্রগড়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। অতীতে এক সময় সমুদ্রগড়ের সাতকাইশা পরগনার জমিদার রঞ্জিত ভট্টঠাকুর পাওনা খাজনার দায়বদ্ধতা থেকে নদীয়ার রাজা রামকৃষ্ণকে উদ্ধার করতে গিয়ে মুর্শিদাবাদের নবাবের শর্তানুসারে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে বাধ্য হন। তবে আজও এই জমিদার বংশে হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের বিভিন্ন উৎসব পালিত হয়। রাজবাড়ির বাইরের অংশে নির্মিত মন্দিরে যেমন লক্ষ্মীনারায়ণ, বুড়োশিব ও সিদ্ধেশ্বরী পূজো হয়, তেমনি বাড়ির অভ্যন্তরে পরিবারের সদস্যরা মহরম, ঈদ ইত্যাদি পালন করেন। সমুদ্রগড়ের প্রাচীন দুর্গা পূজাটি যা বুড়িমার পূজা বলে খ্যাত, এক সময় এই পরিবারের নিজস্ব পূজো ছিল। সমুদ্রগড়ে একসময় ন্যায় শাস্ত্রের প্রখ্যাত অধ্যাপক বুড়ো রামনাথের গৃহ ও চতুষ্পাঠী ছিল। তাঁত শিল্পের জন্য এই স্থান এখন বিখ্যাত।

স্বাস্থ্য পরিষেবা

অতীতে ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে কালনায় বর্ধমান রাজ এস্টেটের খরচে 'রাজ হাসপাতাল' তৈরী হয় ও তা চালুও করা হয়। ১৮৯২ সাল থেকে কালনার এই হাসপাতালটি united free church of scotland medical mission এর হাতে পরিচালনার দায়িত্ব পায়। তাছাড়া সেই সময় ১৮৯৬ সালের ১লা আগষ্ট পূর্বস্থলী, ১৯০৫ সালের ১লা জুন কুলীনগ্রাম ও ১৯০৬ সালের ১লা এপ্রিল জামনায় সরকার পরিচালিত ডিসপেনসারী খোলা হয়। আবার ১৯০৯ সাল থেকে বর্ধমান জেলা বোর্ডের পরিচালনায় ও তত্ত্বাবধানে একটি ভাসমান চিকিৎসালয় চালু হয়। এই ভাসমান চিকিৎসালয়টি খড়ি নদীতে ১৮ মাইল এবং ভাগীরথী নদীতে কাটোয়া থেকে ত্রিবেণী পর্যন্ত (কালনা মহকুমা-এর মধ্যে অবস্থিত) গ্রামগুলিতে চিকিৎসা করতো।

১৯৭০ সাল পর্যন্ত কালনা শহরের সদর মহকুমা হাসপাতালটি কালনার জাপট পাড়ায় অবস্থিত ছিল। ৭১-৭২ সালে তার নতুন ভবন গড়ে ওঠে এস.টি.কে.কে. রোডের উপর জ্ঞানানন্দ মঠের কাছে। কালনা স্টেশন থেকে বর্তমান এই মহকুমা হাসপাতালের দূরত্ব রিক্সাতে ১৫ মিনিট মত।

১৯৯১ সালের সরকারি হিসেবমত কালনা মহকুমার স্বাস্থ্য পরিষেবার চিত্রটা হল ১৫০টি শয্যা বিশিষ্ট আধুনিক যন্ত্রপাতি সরঞ্জাম সহ মহকুমা শহরে ১টি প্রধান হাসপাতাল।

মহকুমায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সংখ্যা ৫টি।

মহকুমায় সহায়ক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সংখ্যা ১৪টি।

মহকুমায় উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের সংখ্যা ১২৮টি।

প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতের তত্ত্বাবধানে একটি করে দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। যারা ৪৭টি গ্রামের চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার কাজ করছে। জন সংখ্যার হিসেবে প্রতি ৪০ হাজার জনে একটি করে স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান কাজ করে চলেছে।

থানা ও ব্লক ভিত্তিক স্বাস্থ্য পরিষেবার চিত্র

কালনা	প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র	সহায়ক কেন্দ্র	উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র
১ নম্বর ব্লক	১টি (মধুপুর)	৩টি	২৪টি
২নম্বর ব্লক	১টি (চাগ্রাম)	২টি	২১টি
মন্তেশ্বর থানা	১টি (মন্তেশ্বর)	৩টি	২৮টি
পূর্বস্থলী থানা			
১নং ব্লক	১টি (নাদনঘাট)	৩টি	২৩টি
২ নম্বর ব্লক	১টি (পূর্বস্থলী)	৩টি	২৩টি

তথ্যসূত্র ঃ কালনার ইতিবৃত্ত — দীপককুমার দাস

এছাড়া কালনা মহকুমার স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে সত্তরের দশক থেকে রেডক্রশের কালনা শাখা নিয়মিত কাজ করে চলেছে। ১৯৮৩ সাল থেকে লায়ন্স্ ক্লাবের কালনা শাখাও মহকুমার বিভিন্ন প্রান্তে স্বাস্থ্য পরিষেবার কাজ করে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গে বিজ্ঞান মঞ্চের কালনা শাখার উদ্যোগেও ১৯৮৭ সাল থেকে এই মহকুমায় স্বাস্থ্য পরিষেবার কাজ চলছে। স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে কালনা চেম্বার অফ্ কমার্সেরও ভূমিকা আছে।

উল্লেখযোগ্য ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব

কালনা মহকুমার উল্লেখযোগ্য ক্রীড়া ব্যক্তিত্বের মধ্যে বাঘনাপাড়ার বিদেশ বসু ও সুবীর ঘোষের নাম স্মরণীয়। এঁরা উভয়েই একাধিকবার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ম্যাচে অংশগ্রহণ করেছেন। কবাডিতে আনসার আলি এশিয়াডে ভারতীয় কবাডি তলের একমাত্র বাঙালী সদস্য। এছাড়া ইনসান আলি, অঞ্জিল সেখ ও মঞ্জিল সেখও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন কবাডি খেলায়। এঁরা সকলেই কালনা শহরের নিকটবর্তী কালীনগর গ্রামের বাসিন্দা। অন্যদিকে মহিলা হিসেবে অপর্ণা চক্রবর্তী অল ইণ্ডিয়া কবাডি প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। কৃষ্ণদেবপুর গ্রামের সুশীল সরকার এ্যাথালেটিকস্ হিসেবে বাংলার প্রতিনিধিত্ব করেন ও সুখেন মজুমদার, অতীন্দ্র ভট্টাচার্য্য, আলি আফজল সেখ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে অল ইণ্ডিয়া ইউনিভারসিটি প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। কালনার বলাই দাস চ্যাটার্জী ক্রীড়া সংগঠক হিসেবে একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব যিনি এক সময় মোহনবাগান ক্লাবের সভাপতির আসনও অলঙ্কৃত করেছিলেন। এই মহকুমারই উদয় সরকার পশ্চিমবঙ্গ এ্যাথেলেটিক্স এ্যামেচারের সম্পাদক এবং অল ইণ্ডিয়া কমিটিতে গুরুত্বপূর্ণ পদ অলংকৃত করেন। কালনার হরিসাধন ঘোষ ১৯৯৫ সালে জাতীয় রেফারীর সম্মান পান। এছাড়া প্রকৃতিকুমার মুখার্জী, ধর্মদাস সামন্ত ও অম্বিকাচরণ ঘোষ এই মহকুমার উল্লেখযোগ্য ক্রীড়া সংগঠক হিসেবে চিহ্নিত। আবার কালনার শ্যামরাই পাড়ার রতন চ্যাটার্জী ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে প্রায় ছয়মাস কাল পায়ে হেঁটে দার্জিলিং, আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা ও সিকিম ভ্রমণ করেন। এরপর ১৯৮৬ সালে বিশ্বশান্তিকে সামনে রেখে রতনবাবু দেশের ১০ টি রাজ্য স'ইকেলে ভ্রমণ করেন। অন্যদিকে এই মহকুমার বাঘনাপাড়া গ্রামের বাবলু মুখার্জী দীর্ঘ দশ মাস সময়কালে সাইকেলে প্যারিস, রোম, হাঙ্গেরী এবং ইতালী ভ্রমণ করে নজীর স্থাপন করেন।

পুরনো বিদ্যালয়

১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে এখানে মিশনারী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজস্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৫৮ খ্রীঃ। হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় ১৯০১, অম্বিকা মহিষমর্দিনী উচ্চবিদ্যালয় ১৯৩৫ ও মহিষমর্দিনী ইনষ্টিটিউশন ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। কালনা কলেজের বয়স ৫০ বছরের বেশী।

মহকুমা গ্রন্থাগার ও অন্যান্য গ্রন্থাগার - কালনা মহকুমা গ্রন্থাগার ভবনটি ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে নির্মাণ করা হয়। এর সদস্য সংখ্যা দেড় হাজারের অধিক। এছাড়া এই মহকুমার

উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাগারগুলি হল সুভাষ পাঠাগার, সত্যময় সাধারণ পাঠাগার, বাঘনাপাড়া পাবলিক লাইব্রেরী, সিঙ্গারকোন - সাধারণ পাঠাগার, পূর্বস্থলী অক্ষয় গ্রন্থাগার, তেলিনিওপাড়া বন্ধুমহল পাঠাগার ইত্যাদি।

কালনা মহকুমার উল্লেখযোগ্য লেখক - লেখিকা - অক্ষয়কুমার দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য, কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, জগদীশ চন্দ্র রায়, বৈদ্যনাথ মিশ্র, বিনয় মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র পাল, কৃষ্ণকুমার ভদ্র, সুচরিতা পাল, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলচন্দ্র বড়ুয়া, বিজলীপ্রভা বিশ্বাস প্রভৃতি প্রবীণ-প্রবীণাদের নাম অবশ্য স্মরণীয় যাঁদের মধ্যে অনেকেই আর আমাদের মধ্যে নেই। পরের প্রজন্মের লেখকদের মধ্যে ডাঃ গৌরাঙ্গ গোস্বামী, বসন্ত পাল, গোবিন্দচন্দ্র রায়, অনিল চক্রবর্তী, দীপক চাঁদ বর্মন, তরুণ সেন, দীপক কুমার সেন, তরুণ ভট্টাচার্য্য, সমীর ঘোষ, অসীম ঘোষ, সমর চট্টোপাধ্যায়, অমর চট্টোপাধ্যায়, অলোক বিশ্বাস প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব

কালনা মহকুমার রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বদের মধ্যে যাঁরা মহকুমা ছাড়িয়ে জেলা ও রাজ্য পর্যায়ে নাম করেছিলেন ও করেছেন তাঁদের কয়েকজনের নাম, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষে রাসবিহারী সেন ও নুরুল ইসলাম উল্লেখযোগ্য। মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি অফ্ ইন্ডিয়ার পক্ষে হরেকৃষ্ণ কোঙার, মনসুর হবিবুল্লা, অঞ্জু কর ও হরিশ করের নাম উল্লেখযোগ্য।

উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিত্ব

বর্তমান সময়কাল - কালনা মহকুমার উল্লেখযোগ্য বিষয়ের মধ্যে সর্বাগ্রে স্মরণীয় কালনা থেকে ১০৫ বছর প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকা পল্লীবাসী যার বর্তমান সম্পাদক অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। কালনা পৌরসভার ১২৫ বছর বয়স অতিক্রান্ত - এর বর্তমান চেয়ারম্যান ডাঃ গৌরাঙ্গ গোস্বামী। কালনার সীমায়ন পত্রিকা ২৭ বছর ব্যাপী প্রকাশিত - যার সম্পাদক গোবিন্দচন্দ্র রায়, কালনার একমাত্র প্রবন্ধ পত্রিকা পৌরদিশারী - সম্পাদক বসন্ত পাল, কালনা মহকুমা থেকে প্রথম রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত জাতীয় শিক্ষক রাধেশ্যাম চক্রবর্তী, কালনার কৃতি সন্তান পুলিনবিহারী সান্যাল যিনি বাংলার আকাশবানীর সংবাদ জগতে অতি সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন একসময়, সৌমেন পাল - সংবাদপত্র জগতে এই মহকুমার সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ সাংবাদিক। সমাজসেবায় কালনা মহকুমা হাসপাতালের পাশাপাশি আছে কালনা রেডক্রশ, লায়ন্স ক্লাব ও পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের কালনা শাখা । এছাড়া রয়েছে মহকুমার কনজিউমার ফোরাম যার সম্পাদক শুভেদ্র পাল। কালনা মহকুমায় অঙ্কন শিল্পে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হলেন সুমিত গোস্বামী যাঁর সংস্থার নাম শিল্পনীড়, সঙ্গীতশিল্পী হিসেবে মানসী পাল, সুচিত সান্যাল, গুরুপ্রসাদ মিশ্রর নাম বর্তমানে স্মরণীয়। এছাড়া সঙ্গীত জগতে কালনার কৃতি সন্তান ছিলেন সুশীল মল্লিক। আবৃত্তিকার হিসেবে কালনার

স্বরবৃত্ত সংস্থার কর্ণধার দীপঙ্কর ঘোষের নাম স্মরণীয়। বর্তমানে অডিও ভিসুয়াল জগতে এই মহকুমায় বিশেষভাবে স্মরণীয় তাপস তা। কালনা মহকুমায় প্রাথমিক স্তর থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত ইংরেজী মিডিয়ামে শিক্ষাদানে ব্রতী উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হলেন সুশীল মিশ্র। নৃত্যাঙ্গনে স্মরণীয় শান্তনা ও স্নিগ্ধা মুখার্জী। চেম্বার অফ্ কমার্সের সেক্রেটারী সুবোধ নস্কর।

পরিশিষ্ট

স্বাধীনতা সংগ্রামী কয়েকজনের নাম

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে কালনা মহকুমায় বহু মানুষের ভূমিকা ছিল। সেই অগ্নিযুগে এই মহকুমায় যাঁরা স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দেবকীকুমার বসু, আব্দুস সাত্তার, নারায়ণ চৌধুরী, বীরেন্দ্রকুমার মল্লিক, প্রমথনাথ গাঙ্গুলী, গুণীন্দ্রনাথ মুখার্জী, অরবিন্দপ্রকাশ ঘোষ, আব্দুল কাশেম, ডাঃ সন্তোষকুমার ঘোষ, ডাঃ কালীকিঙ্কর চক্রবর্তী, বৈদ্যনাথ মজুমদার, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ভক্ত রায়, পূর্ণানন্দ পাল, জগবন্ধু সাঁই, অন্নদাপ্রসাদ মণ্ডল, কার্তিক দত্ত, ব্রহ্মানন্দ উপাধ্যায়, ডাঃ বিনোদবিহারী মুখার্জী, কানাইলাল পাল, সুচরিতা পাল, অনিল ব্যানার্জী প্রমুখ।

১২৫ বছর অতিক্রান্ত কালনা পৌরসভার পৌরপিতাগণ ঃ

শ্রীচন্দ্রনাথ রায়, শ্রীসূর্য্যনারায়ণ সর্বাধিকারী, শ্রী অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রী বিধূভুষণ চ্যাটার্জী, শ্রী যতীন্দ্রনাথ বসু মল্লিক, শ্রী যোগেশচন্দ্র মিত্র, শ্রী শান্তশীল দত্ত, শ্রী বীরেন্দ্রকুমার মল্লিক, শ্রী মথুরামোহন গাঙ্গুলী, ডাঃ বিনোদবিহারী মুখার্জী, শ্রী তারাপদ ঠাকুর, শ্রী দেবব্রত ব্যানার্জী, শ্রী সুধাংশুভূষণ চ্যাটার্জী, শ্রী প্রকৃতিভূষণ দত্ত, শ্রী তড়িৎভূষণ - সাবুই, শ্রীকৃষ্ণ কুমার ভদ্র, শ্রী চিত্তরঞ্জন রায় ও ডাঃ গৌরাঙ্গ গোস্বামী।

তথ্যসূত্র ঃ

১. বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি - যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী।
২. বাঙ্গালার ইতিহাস - রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
৩. কালনার ইতিবৃত্ত - দীপককুমার দাস।
৪. কালনার ইতিহাস - তরুণ ভট্টাচার্য্য।
৫. বৃহত্তর পূর্বস্থলীর ইতিবৃত্ত - মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল।
৬. বর্ধমান সমাচারের বিশেষ সংখ্যা।
৭. পল্লীবাসী পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা।

আসানসোল ঃ একটি পরিক্রমা

পার্থপ্রতিম আচার্য

প্রাক কথন

আসন গাছের জঙ্গলে ঘেরা শোলজমি অর্থাৎ উর্বর জমির বিশাল এলাকা – 'আসানশোল'। পরবর্তীকালে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আজকের 'আসানসোল'। কান টানলে আসে মাথা আর আসানসোল এর কথা বলতে গেলেই সঙ্গে আসে রাণীগঞ্জ। কাজেই রাণীগঞ্জের কথার সামান্য অবগাহন করলে ব্যাপারটি প্রাসঙ্গিক হবে বলে মনে করি।

রাণীগঞ্জ থেকে আসানসোল ইতিহাসের সচল পাঁচালি

রাণীগঞ্জের উন্নয়ন শুরু কয়লা শিল্পের হাত ধরে, আসানসোলের উন্নয়ন রাণীগঞ্জের হাত ধরে। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক মানচিত্রে কয়লাশিল্পের প্রবল উপস্থিতির পূর্বে বাংলার প্রান্তিক অঞ্চলের ছোট ছোট কৃষিপ্রধান গ্রামীণ এলাকা হিসেবে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিলো – আসানসোল, বরাকর, হীরাপুর, কুলটি, সালানপুর, উখড়া, পাণ্ডবেশ্বর মঙ্গলপুর ইত্যাদি। মোটামুটি দামোদর, বরাকর, অজয় ছিলো এ অঞ্চলের প্রধান নদ-নদী। এছাড়া নুনিয়া নদীও ছিল, আর ছিলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কিছু জোড়।

ব্রিটিশ সরকার বৎসরান্তে রাজস্ব আদায় করত এই সকল গ্রামগুলি থেকে, পরিবর্তে উন্নয়ন ছিলো শূন্য। যোগাযোগের চিকিৎসার শিক্ষার ব্যবস্থাহীন এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছিলো দিনে দুপুরে দুর্বৃত্তের আক্রমণ, লুটপাট।

১৮৫৫ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি, হাওড়া থেকে রাণীগঞ্জ পর্যন্ত রেলপথ চালু করা হয়। ঐ রেলপথ ১৮৬৩ সালে আসানসোল পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। ১৮৭০ সালে রাণীগঞ্জ শহরের মর্যাদা পায়। পৌরসভা গঠন হয় ১৮৭৬ সালে। ১৮৭৭ সালে রাণীগঞ্জ হয়ে যায় মহকুমা। প্রশাসনিক সুবিধের জন্য আদালত স্থাপন হয় ঐ সময়ে।

এই অবধি আসানসোলের মুকুটে কিছুই নেই। আসানসোলের ভাগ্য পরিবর্তনের বাতাস বইতে লাগল তখন, যখন 'ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে' রেলের কাজকর্মের সম্প্রসারণের জন্য রেলের আঞ্চলিক ঘাঁটির স্থান হিসেবে বেছে নিল আসানসোলকে। ভারতবর্ষের তৎকালীন বিখ্যাত কোল কোম্পানী 'বেঙ্গল কোল কোম্পানী' ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে'কে কোন রকম সহযোগিতা করেনি। ১৮৬৩ সালে যখন রেলপথ আসানসোল পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয় তখন আসানসোল ছিল সামান্য স্টেশনমাত্র। ১৮৮৫ সালে আসানসোল রেলের আঞ্চলিক ঘাঁটির স্বীকৃতি পাওয়ার পর বর্তমান রেল স্টেশনটি তৈরী হয়। স্টেশনের পাশে লোকোশেড, লোকো কলোনী গড়ে ওঠে। ১৯০৫ সালে রাণীগঞ্জ থেকে মহকুমার সদর দপ্তর, মহকুমা আদালত, প্রশাসনিক কার্যালয় উঠে এল আসানসোলে। আসানসোল পেল মহকুমার

সম্মান। ১৮৮৫ সালেই তৈরী হয় আসানসোল পৌরসভা।

বেঙ্গল কোল কোম্পানীর সদর কার্যালয় রাণীগঞ্জ থেকে চলে এলো আসানসোলে, বর্তমান NH-2 অর্থাৎ জি.টি. রোডের পাশে। ক্রমে রেলপথের আরও সম্প্রসারণ হল। যোগসূত্র তৈরী হল আসানসোলকে ঘিরে গড়ে ওঠা ছোট বড় মাঝারী কোলিয়ারীগুলির মধ্যে।

আসানসোল থেকে কুলটি বরাকর হয়ে ধানবাদ যাওয়ার রেলপথ তৈরী হল ১৮৯৪ সালে। বর্তমানে যা গ্রাণ্ড কর্ড নামে পরিচিত। বি. এন. আর বা বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে ১৮৮৯ সালে পুরুলিয়া - আদ্রা - আসানসোলের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করল। ১৯২৫ সালে রেলওয়ে ডিভিশনের উদ্বোধন হল এবং ১৯২৮ সালে সুরম্য বৃহৎ ডিভিশনাল অফিসটি তৈরী হল। মূলতঃ এই ভাবেই একদা গ্রাম্য আসানসোল ভারতবর্ষের মানচিত্রে গুরুত্বপূর্ণ শহর হয়ে গড়ে উঠতে লাগল।

পৌরসভা থেকে কর্পোরেশন

১৮৮৫ সালে পৌরসভা গঠন হলেও সক্রিয় কাজকর্ম শুরু হয়েছিল ১৮৯৬ সাল থেকে। তখন পৌরসভার আয়তন ছিল ২.২০ বর্গমাইল বা ৫.৬৩২ বর্গ কি.মি.।

লোকসংখ্যা ছিল ১১,০০০। ঐ সময়ে আসানসোলের চেহারা ছিল অন্যরকম। বসবাসকারী অঞ্চলগুলি ছিল আসানসোল গ্রাম, বুধা, ইসমাইল, মহীশীলা, ধাদকা, কুমারপুর ছাড়া দুটি রেল কলোনী।

১৯৯৪ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি রবীন্দ্রভবনে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আসানসোল কর্পোরেশনে পরিণত হয়। বার্ণপুর নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি সহ বেশ কিছু গ্রাম পঞ্চায়েত ঢুকে যায় কর্পোরেশনের এক্তিয়ারের মধ্যে। আসানসোল কর্পোরেশনের সরকারী কাজকর্ম শুরু হয় ১৯৯৪ সালের ৩১ জানুয়ারি থেকে। বর্তমানে কর্পোরেশনের অধিগৃহীত জমির পরিমাণ ১২৭ স্কোয়ার কিলোমিটার। ৫৩টি মৌজা এর অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে আসানসোল বিশাল জনপদ। ভারতবর্ষের ছোট সংস্করণ।

চিকিৎসা

প্রথম দিকে বিক্ষিপ্তভাবে গ্রামের কবিরাজরাই রাণীগঞ্জসহ আসানসোলের এই বিস্তীর্ণ এলাকার চিকিৎসা করতেন। ১৮৬৭ সালে সরকারী উদ্যোগে স্থাপিত হয় রাণীগঞ্জ ডিসপেন্সারী। ১৯৩৩ সালে হয় লেপ্রসি রিলিফ এ্যাসোসিয়েশন। আসানসোলে চিকিৎসা প্রসারের মূল ভূমিকাটি গ্রহণ করেছিল রেল ও কোলিয়ারী সমুহের মালিকগণ। খনিগুলিতে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য সামান্য ওষুধপত্র ও ডাক্তারবাবু থাকতেন যদিও তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল ছিল। রেলের দেশীয় কর্মীদের জন্য ছিলো মণ্ডল হসপিটাল ও সাহেবদের জন্য বালিংটন হসপিটাল। ১৯৪৪ সালের মার্চ মাসে বেঙ্গল কোল কোম্পানী সাঁকতোড়িয়ায় একটি বড় হাসপাতাল উদ্বোধন করে। এই হাসপাতালের সাথে

যুক্ত ছিলেন শিল্পাঞ্চলের প্রবাদপ্রতিম তিন বিখ্যাত শল্য চিকিৎসক, ডাঃ জি. সি. সেন, ডাঃ এন. সি. সেন ও ডাঃ বংশী মুখোপাধ্যায়। ১৯৪৩ সালের ৪ঠা এপ্রিল আসানসোলের আই, এম. কে শাখা গড়ে ওঠে। ১৯১২ সালে গড়ে ওঠে আসানসোল মাইনস্ বোর্ড অফ্ হেল্থ। বর্তমান আসানসোলে রয়েছে প্রচুর নার্সিংহোম, দাতব্য চিকিৎসালয়, ই.এস.আই হাসপাতাল, মহকুমা হাসপাতাল ছাড়াও রেল পরিচালিত হাসপাতাল। বার্ণপুরে ইসকো পরিচালিত হাসপাতাল।

শিক্ষা

তেমন কোন প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আসানসোলে নেই। কি মোঘল আমলে কি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে আসানসোলে শিক্ষার কোন গুরুত্ব ছিল না। টোল, চতুষ্পাটি, মাদ্রাসার নিদর্শন থাকলেও তার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে সন্দেহ রয়েছে। তুলনামূলকভাবে আসানসোলে শিক্ষার কিরণ এসে পৌঁছে ছিল বেশ দেরীতে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি মূলতঃ গড়ে উঠেছিল পেশাগত ও প্রশাসনের তাগিদে।

আসানসোলে মূলতঃ মিশনারীদের উদ্যোগেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। যথা সেন্ট ভিনসেন্ট স্কুল ১৮৭৭ সালে, সেন্ট লোরেটো কনভেন্ট ১৮৭৭ সালে মহিলাদের জন্য। সেন্ট প্যাট্রিক স্কুল ১৮৯১ সালে। ১৯০৪ সালে হয় ঊষাগ্রাম প্রাইমারী স্কুল যা ১৯৩১ সালে দুটি পৃথক স্কুলে পরিণত হয়। ১৮৮২ সালে শুরু হয় ইস্টার্ন রেলওয়ে হাই স্কুলের। ১৯২৬ সালে নৈশ স্কুল দিয়ে সূচনা হলেও ১৯৩৯ সালে নিম্ন মাধ্যমিক ও ১৯৪৫ সালে হাইস্কুলে পরিণত হয় আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়। বর্তমান আসানসোলে বাংলা, হিন্দি, উর্দু, ইংরাজী মাধ্যমের স্কুল রয়েছে।

একটি স্নাতক পর্যায়ের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বর্তমানে আসানসোলে চালু হয়েছে। এছাড়া রয়েছে আসানসোল পলিটেকনিক ও কন্যাপুর পলিটেকনিক কলেজ। ফার্মেসি'তে ডিপ্লোমা ও ডিগ্রী কলেজ সম্ভবতঃ ২০০১ সাল থেকে শিক্ষাবর্ষ শুরু করবে। তিনটি সাধারণ পর্যায়ের কলেজে কলা, বাণিজ্য ও বিজ্ঞান বিভাগ রয়েছে। এই তিনটি কলেজের মধ্যে একটি কেবলমাত্র মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট।

আসানসোলে প্রথম কলেজের সূচনা ১৯৪৪ সালে। বর্তমানের বি. বি. কলেজই আসানসোলের প্রথম কলেজ। যদিও পূর্বে এর নাম ছিল আসানসোল কলেজ, কলেজ ভবন ও ছিল জি.এস. আটওয়াল নামে জনৈক ব্যবসায়ীর দোতলা বাড়িতে। আসানসোলে কলেজ স্থাপনে যাদের ভূমিকা প্রধান সারিতে তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন রায় বাহাদুর যোগীন্দ্রনাথ রায়, ডঃ অতুলচন্দ্র লাহিড়ী, নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পশুপতি নাথ মালিয়া, অমূল্য রাহা প্রমুখ।

শিল্প

কয়লা আর রেলওয়ে নির্ভর করেই আসানসোলের বেড়ে ওঠা। মূলতঃ উন্নত যোগাযোগ

ব্যবস্থা, প্রচুর পরিমাণে জমি, বিহার উড়িষ্যার মজুর আর কয়লার ওপর ভরসা করেই আসানসোলে বড় শিল্পের পত্তন হতে শুরু করে। ১৮৫৫-তে রাণীগঞ্জ পর্যন্ত রেললাইনের সংস্কার, ১৮৫৫তেই সিয়ারসোল রাজার উদ্যোগে রাণীগঞ্জ থেকে আসানসোল পর্যন্ত জি.টি.রোডের সংস্কার শিল্প স্থাপনে অনুকূল আবহাওয়া তৈরী করে দিয়েছিলো। ১৮৯১ তে তৈরী হল বেঙ্গল পেপার মিল, রাণীগঞ্জে। সে সময় বাংলাদেশ তো বটেই সমস্ত ভারতবর্ষের অন্যতম সেরা কাগজের কারখানা ছিল সেটি। ঐ সময়ে রাণীগঞ্জে বেশ কিছু রিফ্রেকটরি'র কারখানাও তৈরী হল। ১৯১৮ সালে হল বার্ণপুর লৌহ ইস্পাতের কারখানা (পুর্বে এস. সি. ও. বি. পরে ইসকো) এবং তার সাথেই ওয়াগন তৈরী করবার কারখানা ইণ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ড ওয়াগন বর্তমানে বার্ণ স্ট্যাণ্ডার্ড কো. লিঃ। ১৯২২ সালে তৈরী হল ডিসেরগড় পাওয়ার সাপ্লাই কারখানা। কালক্রমে হিন্দুস্তান কেবল্‌স (অবশ্য রূপনারায়ণপুরে) হিন্দুস্তান পিলকিংটন গ্লাস (বর্তমানে বন্ধ) সাইকেল কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড (বর্তমানে রুগ্ন) ইসকো এর কুলটি কারখানাসহ ছোট মাঝারি অসংখ্য কারখানা।

সংবাদপত্র

'আসানসোল সমাচার' আসানসোল থেকে প্রকাশিত সম্ভবত প্রথম সংবাদ পত্র। ১৯২০ সালে পত্রিকাটি আসানসোল থেকে প্রকাশিত হত। সম্পাদক ছিলেন গোপেন্দু ভূষণ সাংখ্যতীর্থ। প্রধানত জমিদারী সংক্রান্ত মামলা মোকদ্দমার খবর প্রকাশিত হত এতে। বর্তমানে আসানসোল থেকে জাতীয় পত্রিকা, দিনক্ষণ, দৈনিকলিপি ও প্রতিনিয়ত নামে চারটি কাগজ দৈনিক প্রকাশিত হয়। এছাড়া আছে বেশ কিছু সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকা। আসানসোল থেকে প্রকাশিত তেমন কোন নিয়মিত সাহিত্য পত্রিকা নেই যার নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। তবে এ প্রসঙ্গে সর্বপ্রাচীন সাহিত্য পত্রিকাটির নাম উল্লেখ করা সংগত। আসানসোলের সর্ব প্রাচীন সাহিত্য পত্রিকাটির নাম 'আলোক' । সম্পাদক ছিলেন প্রফুল্ল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক প্রফুল্ল সান্যাল, ম্যানেজার ভূধর চৌধুরী। পত্রিকাটি ছিল মাসিক। ১৩৪১ বঙ্গাব্দের (১৯৩৪ সাল) বৈশাখ থেকে শ্রাবণ এই চারটি সংখ্যার সম্পাদক ছিলেন প্রফুল্ল বাবু। পঞ্চম ও শেষ ভাদ্র সংখ্যার সম্পাদক ছিলেন কনক ব্যানার্জী। তবে যে পত্রিকাকে ঘিরে প্রথম সাহিত্য পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল তার নাম 'উন্মোচন'। ১৯৫০ সালে এর প্রথম প্রকাশ। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় ছিলেন এর সম্পাদক। পরবর্তীকালে বিশিষ্ট কবি তারক সেন ও গদ্যকার সুহাস দাস এই পত্রিকার সাথে জড়িয়ে ছিলেন।

দর্শনীয় স্থান

আসানসোলের সাথে সড়ক ও রেল পথে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের সঙ্গে সুন্দর যোগাযোগ রয়েছে। 'কম্পিউটারাইজড রিজার্ভেশন' সিস্টেমের সমস্ত রকম সুবিধা আসানসোলে পাওয়া যায়। এছাড়া বাস স্ট্যাণ্ড থেকে ছাড়ে দূরপাল্লার বাস। উঁচু ও মাঝারী মানের প্রচুর হোটেল, গেস্ট হাউস আসানসোলে থাকলেও সুউচ্চ মানের কোন তিন তারা বা পাঁচতারা

হোটেল নেই আসানসোলে। জনসাধারণের জন্য কোন বিমান বন্দর নেই। আসানসোল থেকে ঘুরে দেখা যেতে পারে নুনীয়া নদীর তীরে ঘাঘরবুড়ির মন্দির। এখানে প্রতিদিন পুজো হয়। শনি ও মঙ্গলবার বিশেষ পুজো হয়। আসানসোল থেকে সরাসরি বাস যায় বার্ণপুরের 'নেহেরু পার্ক' এ। বেশ বড় সুন্দর পার্ক। দামোদর নদের পাশে। নেহেরু পার্কের মনোরম পরিবেশ, প্যাডেল বোটিং এর সুবিধা সহ সুন্দর রেঁস্তোরা রয়েছে। নেহেরু পার্কের পাশে রয়েছে হরিণ উদ্যান। আসানসোল থেকে সরাসরি বাসে যাওয়া যায় মাকল্যাণেশ্বরী মন্দির। মায়ের থানে পুজো দিয়ে মাইথন বাঁধ দেখে নেওয়া যেতে পারে। মাইথনে থাকবার ব্যবস্থা আছে। তবে বুকিং আগাম করতে হবে। এখানকার মজুমদার নিবাসে থাকবার আনন্দই আলাদা। এখানে থাকতে হলে চিঠি লিখতে হয় ডি.ভি.সি-র মাইথন অফিসে কিংবা কলকাতার সল্টলেক হেড অফিসে। এছাড়া মাইথনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের টুরিস্ট লজ রয়েছে। থাকতে হলে যোগাযোগ করতে হবে পশ্চিমবঙ্গের টুরিস্ট ইনফরমেশন ডিপার্টমেন্ট এর সাথে, কলকাতায় । আসানসোলকে কেন্দ্র করে বেড়িয়ে নেওয়া যায় ঝাড়খণ্ডের রাঁচী, তোপচাচী, পরেশনাথ ও আরও অনেক জায়গা। আসানসোল থেকে তো জয়দেবের মেলা, চুরুলিয়া, শান্তিনিকেতন, বিষ্ণুপুর, পুরুলিয়া, যাওয়ারও সহজ ব্যবস্থা রয়েছে।

কাজীনজরুল ইসলাম, শৈলবালা ঘোষ, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, তারাশংঙ্কর বন্দোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, অজিতেশ বন্দোপাধ্যায়, তারক সেন, কালীপদ ঘটক, শিল্পী বিকাশ সেনগুপ্ত সহ আরও অনেক বরেণ্য মানুষের স্মৃতি বিজড়িত আসানসোল বর্তমানে কর্পোরেশনে পরিণত হলেও পূর্বের জেল্লা আর নেই। কারণ মূলত অর্থনৈতিক। যে কয়লা খনিগুলির রসদ ইস্কো, সাইকেল কর্পোরেশনের কাঁচা পয়সায় জমজমাট ছিল আসানসোল ঐ সমস্ত সংস্থাগুলির সাম্প্রতিক হাল পরিবর্তন আসানসোলকে পিছিয়ে দিচ্ছে প্রতিনিয়তই। আসানসোলের চারপাশে আজ বন্ধ কিংবা রুগ্ন শিল্পাঞ্চলে ছড়াছড়ি। এ বাধা প্রবল বাধা। বিশ্বায়নের সাথে সাথে কৃৎ কৌশল বদলে যাওয়ার সঙ্গে এর সরাসরি যোগসূত্র রয়েছে।

তবুও আসানসোল স্বপ্ন দেখে তিলোত্তমা সাজবার। তবে সেই স্বপ্ন কোনদিন বাস্তবায়িত হবে কিনা সম্ভবতঃ তা জানেন না কেউই।

ঋণ স্বীকার

১। আসানসোল পরিক্রমা/শান্তিময় বন্দ্যোপাধ্যায়।

২। আসানসোলের ইতিবৃত্ত/সম্পাদনা : নন্দদুলাল আচার্য

৩। আজকের যোধন/আসানসোল সংখ্যা।

৪। কবি অসীমকৃষ্ণ দত্ত।

দুর্গাপুর – কি ছিল কি হয়েছে

প্রণবেশ চট্টোপাধ্যায়

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঁকুড়া জেলার জগন্নাথপুর গ্রাম থেকে এসে এক ব্রাহ্মণ গোপীনাথ চট্টোপাধ্যায় নডিহায় বসবাস শুরু করেন। তার নামানুসারেই লাট্ গোপীনাথপুর মৌজার পত্তন হয়। দুর্গাপুর নামে কোন মৌজা নাই। প্রাচীন দুর্গাপুর ষ্টেশন বাজার সগড়ভাঙ্গা বসত এলাকা সবই এই গোপীনাথপুর মৌজায়। সেই গোপীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র দুর্গাচরণের নামানুসারেই দুর্গাপুরের প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে। সেই দুর্গাপুর থেকে এই দুর্গাপুরের রূপান্তরের সংক্ষিপ্ত ইতিকথার এই প্রয়াস।

ভারতের মাটিতে প্রথম রেল চালু হয় মুম্বাইতে ১৬ই এপ্রিল ১৮৩৫। আর ১৮৫৫ তে বর্ধমান থেকে অণ্ডাল (কেউ বলে রাণীগঞ্জ) রেলপথ সম্প্রসারিত হলে দুর্গাপুরে একটি ফ্ল্যাগ স্টেশন স্থাপিত হয়। দুর্গাপুর শিল্পনগরীর পত্তন হয় আরও ৯৭ বছর পর অর্থাৎ ১৯৫২তে আর দুর্গাপুর মহকুমা শহরের জন্ম ১৯৬৮ খ্রীঃ। উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত গ্র্যাণ্ড ট্র্যাঙ্ক রোডের দুপাশে গভীর গাঢ় জঙ্গল। পানাগড় বাজার ছেড়ে এলে অণ্ডাল মোড়ের আগে কোন দোকান ছিল না যেখানে মিঠাই, লাড্ডু কিংবা এক কাপ চা পাওয়া যেতো। মুচি পাড়ায় কয়েকজন মুচির বাস ছিল। দুর্গাপুর বাজারে মশলার দোকান, কাপড়ের দোকান, মিষ্টির দোকান মিলে ছ সাতটি আর ছিল কয়েকটি চালের আড়ত। ছোট্ট স্টেশনে কাঁচ ঘেরা কেরাসিনের আলো জ্বলতো। রেলের একটা গোডাউন শেড আর এক নম্বর প্লাট ফর্মের ওই ঘরটি - এই দুর্গাপুর স্টেশন। স্টেশনের বাইরে জলাজঙ্গল ; গেট পেরিয়ে মোরামের রাস্তা জঙ্গলের মধ্যদিয়ে গেছে বীরভানপুর গ্রামে, অন্য রাস্তাটি শ্যামপুর খেয়া ঘাটে। এখন দুর্গাপুর স্টেশনে রিটায়ারিং রুম, অফিস, বাইরে জলের ফোয়ারা, ফুলের বাগান, সুসজ্জিত পুরানো রেল ইঞ্জিন, ট্যাক্সি ও বাসস্ট্যাণ্ড, হোটেল, দোকান, পাবলিক ইউরিন্যাল, জবর দখল করে এস.টি.ডি বুথ।

দামোদরের ধারে বীরভানুপুর গ্রাম পুরাতত্ত্বের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। নডিহার বাসিন্দা অজিত মুখার্জী ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৭ পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ায় ভারতীয় পুরাতত্ত্ব দপ্তর খনন করে ২৮২ খানি ক্ষুদ্রাকৃতি আয়ুধ ও অনুশিলা আবিষ্কার করেন এবং সিদ্ধান্তে আসেন যে ২০ থেকে ৩০ হাজার খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এখানে জনবসতি ছিল যারা শিকার আর ফলমূল আহার করে জীবনধারণ করতো। অজয়, কুনুর, দামোদর নদীর তীরবর্তী স্থানে প্রাগৈতিহাসিক যুগের আরো পুরাকীর্তি আবিষ্কৃত হতে পারে বলে ঐতিহাসিকদের বিশ্বাস। বীরভানপুরের সঙ্গে যোগসূত্র ছিল এমন আরও একটি গ্রাম বুদবুদ থানার ভরতপুর। পাশাপাশি দুটি গ্রাম ভরতপুর ও মনোরমার মধ্যে একটি উঁচু ঢিবি। এখানেও খনন করার পর পাথর ও অনুশিলার অস্ত্রশস্ত্র তামা ও হাড়ের তৈরী যন্ত্রপাতি নানান রংয়ের পাথর ও পুঁতির মালা, মৃৎপাত্র পাওয়া গিয়েছিল। দুর্গাপুর অঞ্চলের প্রাচীনতম শিব মন্দির - আড়ার

শিব; অজয়ের তীরে শিবপুরের কাছে গভীর জঙ্গলে ইছাই ঘোষের দেউল। বিষ্ণুপুর গ্রামের কাছে শ্যামা রূপার গড় ও মন্দির। ডি.ভি.সি. মোড়ে ভবানী পাঠকের ঢিবির সঙ্গে দর্শনীয় তালিকায় যুক্ত হয়েছে সিটি সেন্টারের ট্রায়োপার্ক, ডিয়ার পার্ক ইত্যাদি। (সেখানে অবশ্য ছোটদের চাইতে বড়দের ভীড় - একটু নির্জনতার সন্ধানে একটা কাছে পাওয়ার ছোট্ট সুযোগ।)

১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে জেলার কয়লাখনির আবিষ্কার হলেও রাণীগঞ্জের কাছে এগরা গ্রামে প্রথম বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কয়লা তোলা শুরু হয় ১৮১৪/১৫ তে। ১৮৪৩-এ কার এণ্ডটেগোর কোম্পানী অন্য একটি কোম্পানীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে বেঙ্গল কোল কোম্পানী তৈরী করে জাতীয়করণের আগে পর্য্যন্ত এটিই ছিল সর্ববৃহৎ কয়লাখনি কোম্পানী। দুর্গাপুর তৈরী হওয়ার পিছনে কয়লার একটা বড় ভূমিকা আছে তাই এই প্রসঙ্গে আসা। রাণীগঞ্জের আশপাশের কয়লাখনিগুলি থেকে কয়লা তুলে গরুর গাড়ীতে করে তা রাণীগঞ্জে এনে জমা করা হতো। সেখান থেকে নৌকা যোগে যেতো কলকাতায়। দামোদরের নাব্যতা পরবর্তীকালে নেভিগেশন ক্যানেল মারফৎ জাহাজে মালপরিবহণের পরিকল্পনা গ্রহণের প্রেরণা দেয়। ক্যানেল, লকগেট, স্টীমার, সারেঙ্গ এসেছিল কিন্তু মালপরিবহণ কার্য্যকর হয়নি - দপ্তর আজও আছে।

দূরদর্শী, বাংলার রূপকার ডাঃ বিধান রায় দুর্গাপুরেই শিল্প কারখানা গড়ার কথা চিন্তা করলেন কেন? তার কারণ বোধহয় রাণীগঞ্জ, অণ্ডাল অঞ্চলের মাটির নীচে ফাঁকা, কয়লা তুলে নেওয়ার জন্য। তাছাড়া দুর্গাপুরের জি.টি. রোডের দক্ষিণে জঙ্গল পশ্চিমে পর্য্যাপ্ত জমি, পাশেই দামোদর, কাছে বীরভূম বাঁকুড়ার সুলভ শ্রমিক - এসবই ছিল তাঁর স্বপ্নের উৎস। ১৯০৫ খৃঃ দুর্গাপুর রেল স্টেশনের কাছে টালি এবং ফায়ার ব্রিক্স তৈরীর কারখানা তৈরী হয় দুর্গাপুরের প্রথম শিল্প কারখানা ওটাই। তার আগে রাণীগঞ্জের কাছে বল্লভপুরে বেঙ্গল পেপার মিল তৈরী হয়েছিল ১৮৯১তে। ১৮৯৫ তে রাণীগঞ্জে বার্ণ এণ্ড কোম্পানীর পটারী কারখানা, ১৮৮৫তে আসানসোলে কেরু এণ্ড কোম্পানী আর ১৯০৫ সালে ভারতে প্রথম খনি শিল্প বিদ্যায়তন - ইভনিং মাইনিং স্কুল খোলে রাণীগঞ্জে। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে পানাগড়ের কাছে রণ্ডিয়াতে একটি ব্যারেজ বা আড়াআড়ি বাঁধ নির্মাণের সঙ্গে সেচের জন্য ২১৭ মাইল দীর্ঘ সেচ খাল কাটা হয়। বন্যানিয়ন্ত্রণের জন্য করা হলেও এটিই এ অঞ্চলের প্রথম উন্নয়ন পরিকল্পনা বলতে পারি। বন্যা নিয়ন্ত্রিত হয়নি। ১৯৩৫-এ ছোট এবং ১৯৪৩-এর বিশাল বন্যায় ২০ মাইল জি.টি. রোড এবং রেলপথ জলে ডুবে যায়। এই সময় আমেরিকার টেনিসি ভ্যালির অনুকরণে দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা রচিত হয় (ডি.ভি.সি.)। বন্যানিয়ন্ত্রণ জলসেচ বিদ্যুৎ উৎপাদন, পানীয় জল সরবরাহ, জলপথ পরিবহণ, মৎস চাষ, বনজ সম্পদবৃদ্ধি প্রভৃতি ছিল উদ্দেশ্য। পরিকল্পনা ছিল আটটি বাঁধ নির্মাণের। কিন্তু বিশেষজ্ঞের পরামর্শ উপেক্ষা করে রাজনীতিবিদ্‌দের ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণের এ বোধহয় প্রথম দৃষ্টান্ত। ১৯৫২-তে ব্যারেজের কাজ শুরু হয় - দূর্গাপুর হয়ে ওঠার সিঁড়ির প্রথম ধাপ। ২২৭১ ফুট লম্বা, ২৪ ফুট চওড়া, ৩৪টি গেট যুক্ত এই ব্যারেজের দুপাশে বাঁকুড়া,

বর্ধমানের বিস্তৃত এলাকায় সেচের জন্য বাঁয়ে ১৩৭ কি.মি. ডাইনে ৮৯ কি.মি. আর এ দুটির সঙ্গে শিরা উপশিরার মত ২২৭০ কি.মি. শাখা খাল কাটা হোল। অভিজ্ঞতার অভাবে আরো একটি ভুল হোল — আপার ক্যাচমেন্টের বিস্তৃত এলাকায় ভূমি সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তাকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হোল না ফলে ব্যারেজের আপ স্ট্রীমে পলি জমে উঠলো। দুর্গাপুর ব্যারেজ আজ বিপন্ন। তবে সেচের সুযোগ পাচ্ছে ৯ লক্ষ ৬৭ হাজার একর জমিতে। বাঁকুড়া পুরুলিয়া, বীরভূমের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের ব্যবস্থা হয়েছে। ওয়ারিয়ায় ডি.ভি.সি. পরিচালিত একটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রও গড়ে উঠেছে। আপৎকালীন জলসঞ্চয়ের জন্য একটি রিজারভার, শিল্প কারখানায় ও নগরীতে পানীয় জল সরবরাহের জন্য ২৬৫০০ ফুট লম্বা খাল তৈরী হয়েছে। এই খালের পাশ দিয়ে কারখানার বর্জপদার্থবাহী টামলা খাল চলেছে। বর্ষায় অনেক সময় এদুটি খাল মিশে যায়। জল দূষণ, বায়ু দূষণ এখানের বড় সমস্যা। পরিকল্পনাগত ত্রুটির জন্য এ দূষণ মুক্ত হওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।

দামোদরের জল সম্পদ, রাণীগঞ্জের কয়লা, কমলপুরের নুড়ি পাথর, পর্য্যাপ্ত জমি, রেল সড়ক, জলপথে পরিবহণের সুযোগ, বাঁকুড়া বীরভূমের সুলভ শ্রমিক ইত্যাদির সহজ লভ্যতার কথা ভেবে দুর্গাপুরকে রূঢ় হিসাবে গড়ে তোলার কথা ভেবেছিলেন ডাঃ রায়। দশ মাইল দীর্ঘ ছয় মাইল প্রস্থ বিশিষ্ট শিল্প নগরীর পত্তনের কাজ শুরু হয়। তেরটি বৃটিশ কনট্রাক্টর ফার্ম ১৯৫৭ তে শুরু করে ইস্পাত কারখানা (ডি.এস.পি.)। এরপর দুর্গাপুর থার্মাল, দুর্গাপুর প্রজেক্ট, ফিলিপস কার্বন ব্ল্যাক, হেভি ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন (এম. এ. এম. সি)। এ.ভি.বি, বি. ও. জি. এল, এইচ. এফ. সি. আই. প্রভৃতি বড় ও মাঝারি কারখানার সঙ্গে আরো প্রায় দুশোটি ছোট কারখানা গড়ে উঠলো সত্তরের দশকের মধ্যেই। কারখানা গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে জীবিকার সন্ধানে বিহার, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, ইউ.পি., কেরল প্রভৃতি রাজ্য থেকে মানুষের স্রোত এলো আর এলো পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তুরা। কৃষি নির্ভর বাংলার মানুষের একটা ক্ষুদ্রাংশ চাকরিতে আসতো তাই এই সব কল কারখানায় উদ্বাস্তুরা বিপুল সংখ্যায় কাজ পেয়ে গেল। শ্রমিকরা সংগঠিত হয়ে শুধু দাবী আদায়ের তৎপর হোল। কোন নেতৃত্বই তাদের শেখালো না, 'প্রোডাকসন বাড়াতে হবে' কিম্বা সংস্থাকে লাভজনক করে তুলতে প্রত্যেককে কর্ম্মসচেতন হতে হবে। দলভারী করতে পরিচালন কর্তৃপক্ষের ওপর চাপ সৃষ্টি করে প্রয়োজনের অতিরিক্ত লোকনিয়োগ করতে লাগলো। ফলে উৎপাদন ব্যয় বাড়তে লাগলো। অযোগ্য লোকেরা সিনিয়ারিটির ভিত্তিতে কিম্বা খুঁটি ধরে প্রমোশন পেতে লাগলো। মাথাভারি প্রশাসন। উৎপাদিত দ্রব্যের মান উন্নত হোল না। আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় পিছু হটতে লাগলো। এর সঙ্গে যুক্ত হোল কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবর্তিত অর্থনীতি এবং মুক্ত বাজার ব্যবস্থা। আমদানী শুল্ক হ্রাস বা কোথাও তুলে দেবার ফলে দেশীয় শিল্প প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হতে লাগলো। সরকার সিদ্ধান্ত নিলেন — আর ভর্তুকি নয়। ভর্তুকি দিয়ে অলাভজনক সংস্থাকে আর চালানো হবে না। সুতরাং শুরু হোল শ্রমিক ছাঁটাই, কোথাও ভি. আর. কোথাও ভি. এস. এস. প্রকল্পে হাজার হাজার শ্রমিক অবসর নিলেন।

ষাট সত্তরের দশকে বহু কারখানা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক ব্যবসায়ী, শিক্ষক ও অন্যান্যদের জন্য প্রয়োজন হল আবাসনের। রাজ্য সরকারের সর্ববৃহৎ আবাসন প্রকল্প গড়ে উঠলো এখানে। সগড় ভাঙ্গা, বাতুরিয়া, বিধাননগরে তৈরী হল ২২০০ বাস গৃহ। বিভিন্ন কোম্পানি তাদের প্রয়োজনমত ঘর নিলেন, চুক্তির ভিত্তিতে বিলি করলেন শ্রমিকদের। পরবর্তীকালে কোন কারখানা বন্ধ হয়েছে কিংবা কোন শ্রমিক অবসর নিয়েছেন কিন্তু কোয়ার্টার ছেড়ে না দিয়ে অবৈধভাবে হস্তান্তর করেছেন। সত্তর থেকে নব্বই হাজারে বিক্রি হয়েছে সেই কোয়ার্টার। সরকার কোন কোন ক্ষেত্রে ভাড়াও পাচ্ছেন না। ডি.পি.এল. বিদ্যুতের লাইন কেটে দেবার পর অসাধু কর্মীদের পয়সা দিয়ে আবার বৈদ্যুতিক সংযোগ করে নিয়েছেন। ফলে বিল না দিয়েও বিদ্যুৎ ব্যবহার করছেন এমন আবাসিকের সংখ্যা কম নয়। আবাসন দপ্তর এখন সেই সব অবৈধ বসবাসকারীদের উচ্ছেদকরার উদ্যোগ নিয়েছেন। এম.এ.এম.সি, ফার্টিলাইজার, স্টীল কর্তৃপক্ষ প্রচুর কোয়ার্টার তৈরী করেছেন যার অনেকগুলি এখন খালি। সেগুলো নষ্ট হচ্ছে কিংবা সমাজবিরোধীদের আড্ডাখানা বা কোথাও জবরদখল হচ্ছে। ম্যানেজমেন্ট এবার নতুন ভাড়াটে বসাবার কথাও চিন্তা করছে।

অষ্টাদশ শতক পর্য্যন্ত শিল্পাঞ্চল ছিল শিক্ষাক্ষেত্রে অন্ধকারে তখন মানকর কোটা মারোতে ছিল বিদ্যাচর্চা কেন্দ্র। পণ্ডিত রঘুনাথ শিরমণি ন্যায় ও দর্শন পাঠ শেষ করে টোল খুলেছিলেন কোটাগ্রামে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে কাশ্মিরী ব্রাহ্মণ গোবিন্দ প্রসাদ রায়না এই অঞ্চলে এসে কয়লার ব্যবসা করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন এবং সিয়ারসোলে রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনিই সিয়ারসোল রাজ হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। দুর্গাপুর এলাকায় প্রথম স্কুল স্থাপিত হয় মানকরে ১৮৯০ খ্রীঃ তারপরে ১৯০৫ খ্রীঃ পলাশডিহা মাইনর স্কুল। ১৯২৬ অণ্ডালের সারদা প্রসাদ একাডেমি ওই বৎসরই গোপালপুর গ্রামে স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২৯ এ ভিরিঙ্গী ত্রৈলোক্যনাথ ইনস্টিটিউশন স্থাপন করেন বসন্ত কুমার মুখোপাধ্যায় ও তাঁর পুত্র সত্যগোপাল। আর দুর্গাপুর স্টেশনের কাছে তারকনাথ স্কুলটি ১৯৪১ নডিহা গ্রাম থেকে উঠে আসে। ১৯০৯ অব্দে শিক্ষার হার ছিল পুরুষ ১৬.২ শতাংশ আর স্ত্রী হাজারে ৮ জন। আর ইংরাজীতে লিখতে পড়তে পারত শতকরা একজনের কিছু বেশী। ১৮৭৬ খ্রীঃ প্রথম সাধারণ পাঠাগার স্থাপিত হয়েছিল রাণীগঞ্জে। দুর্গাপুর ইস্পাত প্রকল্প ১৯৫৮ খ্রীঃ 'কে' সেক্টরে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং 'এ' জোন বহুমুখী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ছাত্রছাত্রী বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্কুলের সংখ্যাও বাড়ে দশটি উচ্চমাধ্যমিক পনেরটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ২১ হাজার ছাত্রছাত্রীর জন্য ১০২৮ জন শিক্ষক শিক্ষিকা এক সময় যুক্ত ছিলেন। এখন শিক্ষা ক্ষেত্রেও সঙ্কোচন নীতি এসেছে, বন্ধ হচ্ছে স্কুল , ভি.আর. নিচ্ছেন শিক্ষক শিক্ষিকারা। অন্য দিকে শিক্ষার সুযোগ বাড়ছেও। দুর্গাপুরে এখন তিনটি সাধারণ কলেজ, দুটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, বহু কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, হোটেল ম্যানেজমেন্ট ও অন্যান্য ম্যানেজমেন্ট শিক্ষণ কেন্দ্র, প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ কেন্দ্র (লাওদোহাতে) চলছে। অত্যন্ত ব্যয়বহুল

হলেও এই সব শিক্ষাকেন্দ্রে সিট্ খালি নেই। উল্টোদিকে পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি বীতশ্রদ্ধ

হয়ে কেউবা এখানে সুযোগ না পেয়ে ছেলেমেয়েরা ছুটছে বাঙ্গালোর, পুনে, দিল্লী, চণ্ডীগর, বেনারস, কিংবা অন্য কোথাও।

ফরিদপুর থানার ধবসীগ্রামে জন্মেছিলেন এতদ্ অঞ্চলের বিখ্যাত পালাকার কবি নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় ১৮৪২ খ্রীঃ। তিনি সাত হাজার ভক্তিগীতি রচনা করেছিলেন। ১৯৬০ সালে দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে প্রথম সংবাদ সাপ্তাহিক 'দুর্গাপুর' প্রকাশিত হয়, সম্পাদনায় রবীন মুখোপাধ্যায়। 'দুর্গাপুর বাণী' প্রকাশিত হয় ১৯৬৪তে। এক সময় দুর্গাপুর মহকুমা থেকে ইংরাজী বাংলা হিন্দি মিলিয়ে ৪৩টি সংবাদ সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক প্রকাশিত হত পরে এর প্রায় অর্ধেকই বন্ধ হয়ে যায়। সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে স্বভাবকবি নীলকণ্ঠ গোপালপুর গ্রামের শিক্ষক গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তার কাব্যগ্রন্থ দুর্বাদল ও অশ্রুপুষ্পাঞ্জলী স্বাধীনতার পটভূমিকায় লেখা। বিরুডিহা গ্রামের চারণ কবি কনকভূষণ মুখোপাধ্যায়, ভিরিঙ্গী স্কুলের প্রধান শিক্ষক রামবন্ধু পট্টনায়ক, বামুনাড়া গ্রামের নরেশ মুখোপাধ্যায়, মেজেডিহির গণেশ সামন্ত, শশাঙ্ক ঘটক প্রমুখ সাহিত্য সেবকদের নাম উল্লেখযোগ্য। ১৯৫৫/৫৬ সালে ডি.ভি.সি-র নিউকলোনীর খেয়ালী সংঘ হাতে লেখা ম্যাগাজিন 'বলাকা' বের করতো। প্রথম ছাপা পত্রিকা শারদীয় 'অর্ঘ্য' ১৯৫৮তে। এরপর নাম পাল্টে শারদীয়া 'সত্যম'। প্রথমে হাতে লেখা নবারুণ তারপর ছাপা পত্রিকা 'স্বগত' অনিয়মিত হলেও আজও বেঁচে আছে। সত্তরের দশকে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক পত্র পত্রিকার প্রকাশ ঘটে - হাতে লেখা আর ছাপা মিলে প্রায় ৫০টি। মহিলারাও একসময় এগিয়ে এসেছেন। নিভা দে ও শিপ্রা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে 'জলপ্রপাত' শুধু পত্রিকা প্রকাশই নয় সাহিত্য আড্ডা পূর্ণিমা অভিলাষ এর শততম রজনী পার করেছে। সম্বর্ধনা জানিয়েছে স্থানীয় গুণীজনদের, পালন করেছে বিশেষ কবি সাহিত্যিকদের জন্মজয়ন্তী। এখন অবসর নিয়ে তারা চলে গেছেন চব্বিশ পরগণার সুখচরে। জলপ্রপাত আজও প্রকাশিত হয় বিশ বছর ধরে। অন্য অনেক লিটিল ম্যাগাজিন, শিশুসাহিত্য পত্রিকা, ছড়ার পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে, হচ্ছে তবে অনেকেরই স্থায়ী ঠিকানা নেই ব্যক্তিগত উদ্যোগ। দুর্গাপুরে যাত্রা থিয়েটারের ব্যাপক প্রচলন ছিল স্বাধীনতার অনেক আগে থেকেই। গোপালপুরের বীণাপাণি নাট্যসমাজ, আঢ়ার রাঢ়েশ্বর অপেরা, অণ্ডাল গ্রামের ধর্মরাজ অপেরাপার্টী, মেজেডির সরস্বতী ক্লাবের মত আরও অনেক যাত্রা পার্টী ছিল। শিল্পায়নের ফলে প্রাচীন বিষয়গুলি ছেড়ে সামাজিক সমস্যা নিয়ে সাহিত্য ও নাট্যচর্চা শুরু হয়। প্রতিষ্ঠিত হয় মিলনি নাট্যগোষ্ঠী, শৌভিক, স্বগত সাহিত্য পরিষদ, ময়ুখ, আনন্দম, মঞ্চরূপা, দরবারী, রানার, স্মারক, অয়ন প্রভৃতি নাট্যসংস্থা। শিল্পের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন প্রদেশের মানুষের সমাগমের মধ্যে থেকে সংস্কৃতিচর্চারও শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। ১৯৫৯ সালে দুর্গাপুর ইস্পাতের জি.এম. করুনা কেতন সেনের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় 'স্কুল অফ মিউজিক'। রবীন্দ্র সঙ্গীত শিক্ষায়তন (কলকাতা) দক্ষিণীর অধ্যক্ষ শুভ গুহঠাকুরতার সুযোগ্য শিষ্য

চিন্তামনি ভট্টাচার্য্য ছিলেন রবীন্দ্র সঙ্গীতের শিক্ষক। আজ দুর্গাপুরে রবীন্দ্র সঙ্গীত শিক্ষার অনেক স্কুল হয়েছে, অনেকেই খ্যাতি অর্জন করেছেন এর পিছনে চিন্তামনি ভট্টাচার্যের অবদান অসামান্য। ১৯৬৩তে সঙ্গীতশিক্ষার আসরে আসেন কণ্ঠশিল্পী বীরেশ্বর ভট্টাচার্য্য, জয়ন্ত মজুমদার, সেতারী জয়গোপাল রায়, নৃত্যবিদ কেলু নায়ার। দিপালী সান্যাল প্রমুখ। ১৯৭৭-এ বুদ্ধদেব সেনগুপ্ত প্রতিষ্ঠা করেন রবীন্দ্র সঙ্গীত শিক্ষায়তন 'রম্যবীনা'। দুর্গাপুরে গীতি আলেখ্য ও গণসঙ্গীতের পথিকৃৎ স্বগত সাহিত্য পরিষদ। আলেখ্য রচনায় শিল্পাঞ্চলের বিশিষ্ট সাহিত্যিক আরতি কুমার বসু ও সঙ্গীতে অভিজিৎ সেনগুপ্ত। ১৯৮৩তে শাস্ত্রীয় নৃত্য শিক্ষায়তন নৃত্যমন্দিরের জন্ম হয়। ১৯৮৮ তে দুর্গাপুর ব্যালে আর এখনতো সঙ্গীত, নৃত্য, অঙ্কন শিক্ষার বহু স্কুল হয়েছে। শিশুদের সুস্থ সংস্কৃতি চর্চায় উদ্বুদ্ধ করতে এক নতুন আন্দোলন শুরু করেছে দুর্গাপুর চিলড্রেনস্ একাডেমি অব্ কালচার। রাজ্য সভার সদস্য জীবন রায়, আরতি কুমার বসু, মনোজ চক্রবর্তী, নির্মাল্য ঘোষ প্রমুখ শিশু প্রেমিদের নিরলস প্রচেষ্টায় শিশু একাডেমি দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করছে।

দুর্গাপুরে ছোটবড় মিলে ৬৫৪ টি শিল্প সংস্থায় প্রায় পঁচানব্বই হাজার কর্মী ছিলেন এখন যার অনেকটাই কমে গেছে। যেমন ১৯৯১তে M.A.M.C. ও F.C.I. তে কর্মী ছিলেন যথাক্রমে ৭৫০০ এবং ১৫০০ যা ২০০০-এ নেমে এসেছে ১৮০০ এবং ১১৫১-তে। এখন দুর্গাপুরকে বলা যেতে পারে ভি. আর. নগরী। কেন্দ্রে বিরোধী কিম্বা বন্ধু যে সরকারই আসুক তারা পশ্চিমবঙ্গকে বঞ্চনাই করে গেছে ফলে ৬০/৭০ এর দশকে গড়ে ওঠা কারখানাগুলির আধুনিকীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করেননি। ডি.এস.পি'র আধুনিকীকরণ হলেও তার সিংহ ভাগ চলে গেছে ঠিকাদার, অসাধু অফিসার ও রাজনৈতিক নেতাদের পকেটে। এই অসাধু অফিসারদের অনেকেই বাড়ী গাড়ী ক্ষেতিবাড়ী করে নিয়ে স্বেচ্ছা অবসর প্রকল্পে আরো টাকা পেয়ে ব্যাঙ্কে গচ্ছিত করে বসে পড়েছেন। ওদিকে কারখানার নাভিশ্বাস উঠেছে। এম.এ.এম.সি. বন্ধের সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। আগামী দিনে এ.এস.পি., এ.বি.এলের মত আরো অনেক কারখানা বন্ধ হবে। স্মল ইণ্ডাস্ট্রির কটি কারখানা বেঁচে আছে তা এখন খুঁজে দেখতে হবে। যারা আধুনিকীকরণের দৌলতে (ডি.এস.পির) চাঙ্গা হয়ে উঠেছিল তাদের হাতে এখন কাজ নেই।

পশ্চিমবঙ্গে শিল্পে জোয়ার আনার উদ্দেশ্যে সরকারী উদ্যোগে ২০০০-এর মার্চে দুর্গাপুরে অনুষ্ঠিত হয়েছে সাড়ম্বরপূর্ণ হরাইজন টু থাউজেণ্ড। এসেছিলেন ছোট বড় অনেক শিল্পপতি মন্ত্রী আমলা। উদ্বোধন করেছিলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী।

দুর্গাপুরের স্বাস্থ্য পরিষেবা সম্পর্কেও কিছু বলা দরকার। দুর্গাপুরের স্বাস্থ্য পরিষেবা হতাশাব্যঞ্জক। ১৫৪ বর্গকিমিঃ পৌর এলাকায় এখন জনসংখ্যা প্রায় সাতলক্ষ ১৯৬১ তে যা ছিল সাতহাজারের কিছু বেশী। এই জনসংখ্যার মধ্যে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার মানুষ সরকারী জায়গা জবর দখল করে বাস করছে এদের না আছে বেসিক সেনিটেশনের ব্যবস্থা না আছে বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা। যেমন ছড়িয়ে ছিটিয়ে গড়ে উঠেছে টাউনশিপ তেমনি তার

আশ পাশে গজিয়েছে ঝুপড়ি, বস্তি। ইস্পাত প্রকল্পের কর্মীদের জন্য ৮০০ শয্যাবিশিষ্ট একটি হাসপাতাল, পাঁচটি হেল্‌থ সেন্টার, ৭টি সেক্টর মার্কেট, ৩টি পার্ক, ৪টি কমিউনিটি সেন্টার আর ২৫ হাজার দর্শক বসার উপযোগী স্টেডিয়াম। রাজ্য সরকারের এবং সরকারী বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের হাসপাতাল আছে সাতটি যার শয্যা সংখ্যা এক হাজার। কর্পোরেশনের ৪টি সহ মোট স্বাস্থ্য কেন্দ্র ৩০টি যার পাঁচটি রেডক্রশের দায়িত্বে। ঐ এক হাজার শয্যাসংখ্যার মধ্যেই মহকুমা হাসপাতালের ১৫০টি শয্যা যা সর্বসাধারণের। বাকিগুলি সংশ্লিষ্ট কারখানা শ্রমিকদের। সম্প্রতি শ্রমিকদের জন্য ই.এস.আই. হাসপাতাল হয়েছে। অবশ্য রোগ প্রতিষেধক ব্যবস্থা কার্য্যকরভাবে করছেন কর্পোরেশন ও অন্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। শহরে রয়েছে ২১টি স্বাস্থ্য ব্যবসা কেন্দ্র নার্সিং হোম। মহকুমা হাসপাতালের সম্প্রতি কিছু উন্নতি ও শৃঙ্খলা লক্ষ্য করা যাচ্ছে তবু সাধারণের সম্পূর্ণ আস্থা তারা অর্জন করতে পারেননি। তাই সামর্থ না থাকলেও মানুষ ছুটছে নার্সিং হোমে।

সামগ্রিকভাবে দুর্গাপুরের অবস্থা এখন ভাল নয়। ভলানটারি রিটায়ারমেন্টের টাকা পোষ্ট অফিস ব্যাঙ্কে জমা রেখে বসে খাচ্ছেন কিছু কর্মঠ লোক। বাবার সঞ্চিত টাকায় টু-হুইলার কিনে হাঁকিয়ে বেড়াচ্ছে যুবকদের একাংশ। আর ভিন প্রদেশ থেকে এসে সরকারী জায়গা দখল করে যেমন করে হোক বাঁচার লড়াইয়ে নামছে তারা। বড় কারখানা খুলে অনেক লোকের চাকরি আর কখনো হবে না তাই বাঁচতে হলে হাতের কাজ, কুটির শিল্প ছোট ব্যবসা বাণিজ্যে মন দিতে হবে। যে কটা কারখানা বেঁচে আছে সেখানে দল মত নির্বিশেষে সব শ্রমিক সংগঠনকে এক হয়ে সংস্থাকে বাঁচিয়ে রাখার লক্ষ্য নিয়ে উন্নতমানের উৎপাদনে ব্রতী হতে হবে আর যেগুলি বন্ধ হতে চলেছে তাদের বাঁচার জন্য ঐক্যবদ্ধ লাগাতার সংগ্রাম প্রয়োজন। অসাধু অফিসার, শ্রমিক এবং শ্রমিক নেতাদের চিহ্নিত করার জন্য সাহসী ভূমিকা নিতে হবে শ্রমিকদেরই অন্যথায় উপবাস, অকালমৃত্যুর দিন তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসবে।

দুর্গাপুরকে বাঁচাতে দায়িত্ব নিতে হবে সবাইকে। এক এবং ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আঙ্গিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে চাই আত্মিক উন্নয়ন, সার্বিক দেশাত্মবোধ – এ শিক্ষাই আজ আগে প্রয়োজন।

লেখাটির জন্য সাহায্য নেওয়া হয়েছে অবশ্যই অভিজ্ঞ প্রবীণদের এবং
দুর্গাপুরের ইতিহাস – প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়
বর্ধমান চর্চা (২) - অভিযান গোষ্ঠী
দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের সাহিত্য চর্চা - মধু চট্টোপাধ্যায়
জলপ্রপাত সাহিত্য দুর্গাপুর সংখ্যা
শিল্পাঞ্চলের শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি – মধু চট্টোপাধ্যায়

বর্ধমানের স্বাস্থ্যচিত্র

ডাঃ কৌশিক লাহিড়ী

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার দেওয়া সংজ্ঞা অনুযায়ী, 'Health is a state of complete physical, mental and social wellbeing and not merely an absence of disease or infirmity' অর্থাৎ , 'কেবলমাত্র অসুখ বা দুর্বলতাহীনতা নয়, স্বাস্থ্য হল সম্পূর্ণরূপে শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিকভাবে ভাল থাকার একটি অবস্থা'। তবে এ হল প্রথাগত সংজ্ঞামাত্র। অন্যদিক থেকে স্বাস্থ্য হল এমন এক গতিশীল ভারসাম্য যেখানে অনেকগুলি বিষয় একই সাথে ক্রিয়াশীল থাকে। অনেকগুলি মাত্রার সমন্বয়েই গড়ে ওঠে সামগ্রিক স্বাস্থ্যের জটিল রসায়ন। সংজ্ঞায় বলা শারীরিক , মানসিক এবং সামাজিক দিকগুলি ছাড়াও আরও বেশ কিছু মাত্রা এই সূত্রে বিবেচিত হয়। যেমন, আত্মিক বা আধ্যাত্মিক, ভাবগত এবং রাজনৈতিক মাত্রা। বৃত্তের পরিধি আর একটু বিস্তৃত করলে আলোচনায় এসে পড়ে আরো অনেকগুলি প্রসঙ্গ। যেমন দার্শনিক, সাংস্কৃতিক, আর্থসামাজিক, পরিবেশগত, শিক্ষাগত, পুষ্টিগত, প্রতিরোধ এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত। প্রবন্ধের এই স্বল্প পরিসরে স্বাস্থ্যের এই বহুমাত্রিক অস্তিত্বের সামগ্রিকতাকে ছুঁয়ে দেখার প্রয়াস দুরূহ শুধু নয় বাতুলতাও বটে।

সুবিধার জন্য রাঢ়বঙ্গের বর্ধমান নামাঙ্কিত ভূখণ্ডের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, কিছু নির্দিষ্ট তথ্য ও পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে আলোচনার চেষ্টা করবো। এই প্রসঙ্গে একথাও মনে রাখা ভাল যে স্বাস্থ্য হ'ল একটি আপেক্ষিক ব্যাপার। উপরে উল্লিখিত বিষয়গুলি ছাড়াও ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক এবং নৃতাত্ত্বিক বিষয়গুলিও একটি অঞ্চলের সামগ্রিক স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে। বৃহত্তর সমাজ তথা দেশ তার সমস্ত রকম জটিলতা নিয়ে পরিস্থিতির নিয়ন্তা হয়ে দাঁড়ায়। এখানে বর্ধমান বা কোন ভূখণ্ডকেই বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করা যায় না। দেশ তথা জাতির সামগ্রিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়।

আদিকথা

বর্ধমান নামটির উৎপত্তি নিয়ে গবেষক মহলে যতই মতান্তর থাকুক, ভূখণ্ডটির প্রাচীনত্ব নিয়ে আদৌ কোন বিতর্ক নেই। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে জৈন ধর্মপ্রচারক তীর্থঙ্কর মহাবীরের এই অঞ্চলে আগমনের উল্লেখ মেলে প্রাচীন জৈন ধর্মগ্রন্থ আচারাঙ্গ সূত্র-তে। বর্ধমানের কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে মহাবীর নাম থেকেই বর্ধমান নামটি এসেছে। সে সময় রাঢ়ভূমে আর্য আগমন ঘটেনি। ঐ একই গ্রন্থ অনুযায়ী, সে সময় এখানে 'চুয়াড়' -দের বাস ছিল। মহাবীর নাকি প্রাথমিকভাবে অপমানিত এমনকি লাঞ্ছিতও হন এই ভূমিপুত্রদের হাতে। পরবর্তীতে ঐ 'চুয়াড়' - রাই নাকি আবার জৈন ধর্ম গ্রহণ করেন। আরেক দল গবেষকদের মতে গ্রীক ঐতিহাসিক বর্ণিত গঙ্গারিডি রাজ্যের রাজধানী 'পার্থেলিস' আসলে আজকের এই বর্ধমান শহর।

তবে নিশ্চিত করে এ বিষয়ে কিছু বলা মুশকিল কারণ প্রাক্-ইতিহাসের সেই

আলো-আঁধারির সময় নিয়ে তথ্য ও যুক্তিভিত্তিক কোন নির্ভরযোগ্য বিস্তারিত শব্দচিত্র আজও অমিল। ইতিহাসভিত্তিক একটি উপন্যাসে অষ্টাদশ শতকের প্রায় মাঝামাঝি সময় একটি চরিত্রের কথা পাওয়া যায় যাঁর নাম রূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর নিবাস ছিল বর্ধমানের সোঞাই গ্রামে। তিনি বিখ্যাত ছিলেন 'একবগ্গা ঠাকুর' অথবা 'ধন্বন্তরি' নামে। ব্যতিক্রমী আধুনিকমনা এবং প্রগতিবাদী এই মানুষটি ছিলেন পেশায় চিকিৎসক। জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের চতুষ্পাটীতে ব্যাকরণ, ন্যায়, নবন্যায়, দর্শন পাঠ করে তিনি সরগ্রামে যান। সেখানে প্রখ্যাত কবিরাজ আচার্য গোকুলানন্দের পিতামহের কাছে সাত বছর আয়ুর্বেদশাস্ত্র, চরক, সুশ্রুত ও নিদান অধ্যয়ন করেন এবং গোকুলানন্দের নির্দেশে তিনি স্ত্রীরোগের বিষয়েও বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠেন। সে সময় এটা অচিন্ত্যনীয় ব্যাপার হিসেবেই পরিগণিত হত।

সব সময়ে বর্ধমানভুক্তিতে আন্ত্রিক, ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ছিল ব্যাপক। সচেতনতার অভাবে কেবলমাত্র ঝাড়-ফুঁক, মন্ত্র-তন্ত্র, তাবিজ-কবচ অথবা যজ্ঞ, গ্রহশান্তি আর ডাকিনী-যোগিনী বিদ্যাই ছিল সাধারণের সম্বল। ভিষগাচার্য রূপেন্দ্রনাথ এই সমস্ত অজ্ঞানতার বিরুদ্ধেই প্রয়োগ করেছেন নিজের অধীত বিদ্যা এবং বিন্দুমাত্র গোঁড়ামি না রেখেই। সংস্কৃতের পাশাপাশি আরবী-ফার্সিও শেখেন তিনি। পরবর্তীতে বর্ধমানের এক প্রথিতযশা মুসলমান হাকিমের কাছে হাকিমী বিদ্যা পাঠ করেন রূপেন্দ্রনাথ। এই সমস্ত তথ্য সমকালীন বর্ধমানের এক গুরুত্বপূর্ণ দিকের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

রাজ বংশের উত্থান ও বিকাশের সাথে সাথে শহর বর্ধমানেরও উন্নতি ঘটতে থাকে পরবর্তী দু'দুটি শতাব্দী জুড়ে। বদলাতে থাকে স্বাস্থ্যচিত্রটা একটু একটু করে।

বর্ধমান হাসপাতাল-উৎপত্তি, বিকাশ ও বিবর্তন

আজ থেকে প্রায় শ'চারেক বছর আগে বর্ধমানের রাজাদের পূর্বপুরুষরা পাঞ্জাব থেকে বঙ্গ দেশে আসেন। দিল্লীর মস্‌নদে তখন মোগলদের আধিপত্য। দিল্লীর ফরমান বলে চৌধুরী থেকে রাজা, অবশেষে মহারাজাধিরাজ উপাধিতে ভূষিত হন তাঁরা। মহতাবচন্দ বাহাদুর সিংহাসনে আসীন হন ১৮৩৩ সালে। বর্ধমানের সৌন্দর্যবৃদ্ধিতে বিশেষভাবে যত্নবান হন তিনি। কৃষ্ণসায়র, শ্যামসায়র, রানীসায়রের পাড় বরাবর বৃক্ষশোভিত সুরম্য পথ তৈরী করেন। তাঁর সময়েই গড়ে ওঠে গোলাপবাগ, রাজবাড়ি ইত্যাদি।

তবে মহতাবচন্দ বাহাদুর যে কেবলমাত্র শহরের সৌন্দর্যের দিকেই দৃষ্টি দিয়েছিলেন তা নয়।
প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশার প্রতিও তিনি সচেতন ছিলেন। সেসময় বর্ধমান একটি ম্যালেরিয়া প্রবণ অঞ্চল হিসেবে গণ্য হত। প্রতিবছর বহু মানুষ এ রোগের কবলে প্রাণ হারাতেন। ১৮৬৯ সালে ম্যালেরিয়া দেখা দেয় মহামারীর আকারে। মহতাবচন্দ তাঁর রাজ্যের বেশ কিছু অঞ্চলে দাতব্য চিকিৎসা কেন্দ্র খোলেন। মহামারীর প্রকোপ কমে এলে অবশ্য এই

চিকিৎসা কেন্দ্রগুলি বন্ধ হয়ে যায়। তবে সম্ভবতঃ এই সময়েই বর্ধমানে একটি স্থায়ী চিকিৎসা কেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়।

ঠিক কবে হাসপাতালটি শুরু হয় তার কোন প্রামাণ্য নথি পাওয়া দুষ্কর। তবে এটুকু বলা যায় ১৮৬৯ সালের আগেই শ্যামসায়রের পশ্চিম প্রান্তে এই চিকিৎসা কেন্দ্রের সূচনা। কারণ ঐ বছর ২৬ অক্টোবর মহতাবচন্দ মারা যান। বর্তমান হাসপাতালের OFM Ward টির একতলা বাড়িতেই প্রথম রাজ হাসপাতাল শুরু হয়। ইতিমধ্যে ১৮৬৫ সালে বর্ধমান পৌরসভা গঠিত হয়েছে।

মহতাবচন্দের মৃত্যুর পর তাঁর দত্তক পুত্র আফতাবচন্দ ১৮৮০ সালে হাসপাতালে একটি চক্ষু চিকিৎসা কেন্দ্র উদ্বোধন করেন। এভাবেই আজ থেকে প্রায় একশ একুশ বছর আগে বর্ধমান হাসপাতালের পথ চলা শুরু।

আফতাবচন্দের পর সিংহাসনে বসেন বিজয়চন্দ মহতাব। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এই বিজয়চন্দই হলেন রাজপরিবারের প্রথম সদস্য যিনি বিলেত যান। সংস্কার মুক্ত, উদারচেতা, আধুনিক মনের এই মানুষটি ১৯০৬ সালে ইউরোপের বহু স্থান ভ্রমণ করেন। ঘুরে দেখেন বিভিন্ন আধুনিক চিকিৎসা কেন্দ্রও। নিজের শহরে একটি উন্নতমানের, বড় মাপের আধুনিক হাসপাতাল গড়ে তোলার ইচ্ছে জন্ম নেয় মহারাজাধিরাজের মনে। দেশে ফিরে এসে নিজেই উদ্যোগ নেন তিনি। সে সময় বর্ধমানে দু'টি হাসপাতাল ছিল। একটির কথা আগেই বলেছি, রাজ হাসপাতাল, অন্যটি হ'ল পুরসভা পরিচালিত হাসপাতাল।

এই দু'টি প্রতিষ্ঠানকে এক করে সরকারের সাহায্যে একটি বৃহত্তর চিকিৎসালয় গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯০৭ সালের ১৩ জুলাই বর্ধমানে একটি কনভেনশন আয়োজিত হয়। সেই কনভেনশনে মহারাজ বিজয়চন্দ ছাড়াও বৃটিশ সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের প্রতিনিধি, ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টর, সিভিল সার্জেন, পুরসভার চেয়ারম্যান উপস্থিত ছিলেন। মহারাজ শ্যামসায়রের পশ্চিম তীরে রাজ হাসপাতালের আশেপাশের ৩০ বিঘা জমি সম্পূর্ণ বিনা ভাড়ায় দেবার কথা ঘোষণা করেন। এছাড়াও তিনি বিল্ডিং ফাণ্ডে আশি হাজার টাকা এককালীন অনুদান এবং সাড়ে বারো হাজার টাকা বার্ষিক চাঁদা দেবার কথাও বলেন। সরকার এবং পুরসভাও এগিয়ে আসেন। সংগ্রহ হয় চল্লিশ হাজার করে আরও আশি হাজার টাকা। পুরসভা এছাড়াও বার্ষিক ৯,২৫০ টাকা চাঁদা দিতে প্রতিশ্রুত হয়। বাৎসরিক রক্ষণাবেক্ষনের খরচা বাবদ ৬,২৫০ টাকা দেবার কথা দেন ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড (অন্য একটি সূত্রে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী বার্ষিক ২৫,০০০ টাকা, যার মধ্যে মহারাজের ১২,০০০, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ৯,০০০ এবং পুরসভার ৪,০০০, অর্থাৎ ন্যুনধিক মাসিক ২,০০০ টাকায় তখন হাসপাতাল চালানো হ'ত)। ১৯০৮ সালের ১৬ জুলাই বাংলার তৎকালীন গভর্ণর স্যার অ্যানড্রু ফ্রেজার হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। মহারাজ আরও ২০,০০০ টাকা অনুদান দেন।

অবশেষে ১৯১০ সালের ৯ নভেম্বর ১২৭টি ইনডোর বেড নিয়ে বর্ধমান ফ্রেজার হাসপাতালের উদ্বোধন করেন স্যার এডওয়ার্ড বেকার। সেসময় রোজ প্রায় দু'শ রোগী আউটডোরে চিকিৎসার সুযোগ পেতেন। তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার মফস্বল শহরে এটি শ্রেষ্ঠ হাসপাতাল হয়ে উঠল অচিরেই। কলকাতার মেডিক্যাল কলেজের পরই উচ্চারিত হ'ত বর্ধমান ফ্রেজার হাসপাতালের নাম। দিনে দিনে উন্নতি হতে থাকল হাসপাতালটির। ১৯১৫ সালে থাইসিকাল (টিউবারকুলোসিস) ওয়ার্ড খুলল। ঐ একই বছর ২০ মার্চ একটি ফিমেল ওয়ার্ডেরও উদ্বোধন করা হয়। মহারাজা এই উপলক্ষে আরো দশ হাজার টাকা দেন। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডও দেন পাঁচ হাজার টাকা। ওয়ার্ডটির নাম দেওয়া হ'ল লেডি কারমাইকেল ফিমেল ওয়ার্ড বা LCF। এটি একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ মহিলা হাসপাতাল হয়ে ওঠে। ১৬টি বেড, একটি অপারেশন থিয়েটার এবং একটি লেবার রুম ছিল এখানে। (পরবর্তীকালে এটি এমার্জেন্সি বিভাগ রূপে ব্যবহৃত হয়)।

হাসপাতালের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য একটি পরিচালন সমিতির হাতে দায়িত্বভার ন্যস্ত করা হ'ল। এই সমিতিতে ছিলেন মহারাজা স্বয়ং, জেলা কালেক্টর, সিভিল সার্জেন, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান, বোর্ডের একজন সদস্য, পুরসভার চেয়ারম্যান, দু'জন পুরপ্রতিনিধি এবং তিনজন রাজ প্রতিনিধি।

দিন দিন বেড়ে চলল হাসপাতালের সুনাম। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ছাড়াও তখন কলকাতা এবং ঢাকায় দুটি মেডিক্যাল স্কুল ছিল। মহারাজ বিজয়চন্দের আগ্রহে এবং উদ্যোগে ১৯২১ সালে শ্যামসায়রের পূর্ব দিকে রোনাল্ডশে মেডিক্যাল স্কুল স্থাপিত হ'ল। শতাধিক ছাত্রের ছাত্রাবাস সহ এই মেডিক্যাল স্কুলটি তৎকালীন পূর্বভারতের একটি প্রধান মেডিক্যাল শিক্ষাকেন্দ্র হয়ে ওঠে। ১৯২৫ সালে প্রথম ব্যাচের ছাত্ররা পাশ করে চিকিৎসক হন। এই স্কুলের শিক্ষক-চিকিৎসকরা ফ্রেজার হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ছাত্রদের হাতে কলমে শিক্ষার ব্যাপারটা স্বভাবতঃই ফ্রেজার হাসপাতালেই হ'ত। আরো অনেকগুলি বিভাগ খুলল হাসপাতালে। তারমধ্যে চেস্ট, ই. এন. টি, আই, স্কিন ও ভি.ডি. উল্লেখযোগ্য। হাসপাতালের বেড সংখ্যা বেড়ে হ'ল ২৫০টি। ১৯৪৩ সালে সরকার হাসপাতালের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।

হাসপাতালের বর্ণময় জয়যাত্রা থমকে যায় এর পরই। ভোড় কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সারাদেশে সুসংগঠিত এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ মেডিক্যাল শিক্ষা ব্যবস্থা শুরু হ'ল। ঢাকার একটি এবং কলকাতার দু'টি ছাড়া সব ক'টি মেডিক্যাল স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হ'ল। ১৯৪৭ সালে নতুন ছাত্রভর্তি বন্ধ হয়ে গেল রোনাল্ডশে মেডিক্যাল স্কুলে। হাসপাতালটিও হারাল তার অনেকখানি গৌরব। (অবশ্য ১৯৫৮ অবধি স্কুলটি চালু ছিল)।

স্বাধীনতার পর হাসপাতালের নাম বদলে হ'ল বিজয়চন্দ হাসপাতাল বা বি.সি.হসপিট্যাল। তবে বন্ধ হয়ে থাকল মেডিক্যাল শিক্ষা ব্যবস্থা।

বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ

বাঁকুড়া এবং উত্তরবঙ্গে একটি করে মেডিক্যাল কলেজ উদ্বোধন করা হ'ল। উপেক্ষিত থেকে গেল বর্ধমান। অবশেষে বর্ধমান টাউন হলে বিজয়চন্দের কনিষ্ঠ পুত্র অভয়চন্দ মহতাবের পৌরোহিত্যে আয়োজিত একটি সম্মেলনে বর্ধমানে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হ'ল।

তৎকালীন ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান জিতেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়, মহারাজকুমার অভয়চন্দ, ডাঃ নরোত্তম সামন্ত, রোনাল্ডশে মেডিক্যাল স্কুলের কিছু ছাত্র পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে যান। ডাঃ রায় প্রস্তাবে সায় দেন। তবে কাজের কাজ কিছু হয় না। পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেনের আমলেও প্রস্তাবটি কার্যকর করা হয়নি। অবশেষে স্বল্পায়ু প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে ১৯৬৯ সালের আগষ্ট মাসে তারাবাগে একটি ছোট একতলা ঘরে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের উদ্বোধন করা হয়। এ প্রসঙ্গে শ্রী ফকির চন্দ্র রায় এবং মন্ত্রী শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র হালদারের অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

১৯৭৮ সালে হাসপাতালের নাম দেওয়া হ'ল বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল।

আবার অগ্রগতির নতুন অধ্যায়ের সূচনা। ইতিহাসের গতিপথের ফের বদল। প্রথমে কিছুই ছিল না। না হস্টেল, না কলেজ বিল্ডিং, না মেডিক্যাল কাউন্সিলের স্বীকৃতি। ছাত্রসংসদের নিরন্তর প্রচেষ্টা আর ছাত্রদের অসামান্য সংগ্রামের ফলে এল সবই। আজ আর খুঁজেও পাওয়া যাবে না সেই রাজ হাসপাতাল বা ফ্রেজার হাসপাতালটিকে। আজ বিশাল বটবৃক্ষের মত ছড়িয়ে গেছে তার বিস্তার।

আজ এটি রাজ্যের অন্যতম স্নাতকোত্তর স্তরের মেডিক্যাল শিক্ষাকেন্দ্র। অ্যানাটমি, বায়োকেমিস্ট্রি, গাইনি, আই বিভিন্ন বিভাগে খুলেছে পোস্টগ্রাজুয়েট ডিগ্রি, ডিপ্লোমা কোর্স। প্রথম বর্ষে ভর্তি হওয়া ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে পঞ্চাশ থেকে একশ। সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছেন এই কলেজ থেকে পাশ করা চিকিৎসকরা।

কর্তৃপক্ষের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী মোট ঊনিশটি চিকিৎসা সংক্রান্ত বিভাগ আজ এই হাসপাতালে আছে। দু'শ পাঁচজন চিকিৎসক যুক্ত আছেন এর সাথে। গত বছরের (২০০০) পরিসংখ্যান অনুযায়ী দৈনিক প্রায় হাজার দেড়েক মানুষ চিকিৎসা পেয়েছেন বর্হিবিভাগে (সারণী-১)। ইনডোর বেডের সংখ্যা ১০৯৯ টি।

বর্ধমান শহরে চিকিৎসা পরিষেবা

গত প্রায় সওয়া শতাব্দী ধরে বর্ধমান পূর্বভারতের একটি প্রধান চিকিৎসা কেন্দ্র হিসাবে বিকশিত হয়ে উঠেছে। এর পেছনে কয়েকটি ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক এবং সমাজতাত্ত্বিক কারণ আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকের রাজ হাসপাতাল বা বিংশ শতাব্দীর প্রথম

দিকের ফ্রেজার হাসপাতালে যুক্ত থাকার সূত্রে বেশ কিছু আধুনিক এবং উন্নতমানের চিকিৎসক বর্ধমানে চিকিৎসা করতেন। এ সুযোগ সেকালে কলকাতার বাইরে দুর্লভ ছিল। ফলে চিকিৎসাকেন্দ্র হিসেবে বর্ধমানের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র পূর্বভারতেই। খোসবাগানকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে ডাক্তার পল্লী। গত শতাব্দীর তিন ও চার দশকে বর্ধমানে নামী ডাক্তারদের মধ্যে ছিলেন কেশব চক্রবর্তী, রমেশ চক্রবর্তী, নরেন সামন্ত, মৃগেন ঘোষ, সত্যচরণ মৈত্র, অহিভূষণ মুখোপাধ্যায়, গণেশ ডাক্তার, নাজেম ডাক্তার, রুদ্র ঘোষ চৈতন্য ডাক্তার প্রমুখ। হোমিওপ্যাথি ডাক্তারদের মধ্যে ছিলেন বাসুদেব চক্রবর্তী আর অমূল্য সেন। রোনাল্ডশে মেডিক্যাল স্কুলে শিক্ষক -চিকিৎসক হিসেবে ছিলেন প্রখ্যাত স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ চুনীলাল মুখার্জী, সার্জেন কর্ণেল শচীন রায় প্রমুখ। প্রথিতযশা চিকিৎসক ডাঃ ভাস্কর রায়চৌধুরী যুক্ত ছিলেন বি.সি.হসপিটালে। পরবর্তীকালে কিছু বিখ্যাত চিকিৎসকের কর্মদক্ষতায় বর্ধমানের খ্যাতি আরো বিস্তার পায়। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য ডাঃ শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এবং ডাঃ অরিণ গুপ্ত। এঁদের মধ্যে প্রথম জন জীবৎকালেই কিংবদন্তীতে পবিণত হয়েছিলেন।

চিকিৎসা সংক্রান্ত অন্যান্য পরিষেবা

আজ ওষুধের ক্ষেত্রে বর্ধমান শহর রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহৎ পাইকারী বাজার। খোসবাগান এবং তার আশেপাশে সব মিলিয়ে ঠিক ক' জন চিকিৎসক আছেন তা বলা সত্যিই দুষ্কর। ডাক্তারবাবুদের সংগঠন আই.এম.এর শুধু বর্ধমান শহরেই সদস্য সংখ্যা প্রায় ২৭০ জন। এবছরে বর্ধমান সহায়িকাতেই (বর্ধমান সমাচার পত্রিকা গোষ্ঠী প্রকাশিত একটি গাইড বই) আছে প্রায় দু'শর কাছাকাছি চিকিৎসকের নাম (সহায়িকা, পৃঃ ১১৩-১১৭)। নতুন পুরানো মিলিয়ে নার্সিংহোমের সংখ্যাও প্রায় পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই (সহায়িকা, পৃঃ ১১৮)। একটি জেলা শহরের পরিপ্রেক্ষিতে সংখ্যাগুলি অভাবনীয়ভাবেই বেশী। শহরে দাতব্য চিকিৎসালয় আছে অন্ততঃ সাতটি (সহায়িকা, পৃঃ ১২২)। এছাড়া শহীদ শিবশঙ্কর সেবা সমিতি, বর্ধমান রেডক্রশ বা লায়ন্স ক্লাবের মত কিছু সংস্থাও স্বল্প খরচে চিকিৎসার অসামান্য অবদান রেখে চলেছে। এক্স-রে তো ছিলই সম্প্রতি বর্ধমানে বেশ কিছু কেন্দ্রে এন্ডোস্কোপি, আলট্রাসোনোগ্রাফি, ইকোকার্ডিওগ্রাফি, ডপলার ই.ই.জি., সিটি স্ক্যানের মত আধুনিক পরীক্ষা নিরীক্ষারও সুযোগ মিলছে। (সহায়িকা, পৃঃ ১১৬)

অতি সম্প্রতি বর্ধমানের উপকণ্ঠে সম্পূর্ণ বেসরকারী উদ্যোগে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধা যুক্ত একটি চিকিৎসা কেন্দ্র।

জেলার সামগ্রিক অবস্থা

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য

সর্বশেষ পাওয়া তথ্য অনুযায়ী (সারণী-২) বর্ধমান জেলার মোট জনসংখ্যা এখন ৬৯,১৬,৭৪৫। প্রতি হাজার পুরুষ প্রতি ৯২১ জন মহিলা। মোট জনসংখ্যার সাড়ে বারো

শতাংশের বয়স ছ'য়ের নীচে। শতকরা প্রায় তেষট্টি জন মানুষই বাস করেন গ্রামে। সাক্ষরতার হার বাষট্টি শতাংশের মতো। অর্থাৎ বহু মানুষ আজও নিরক্ষর। আর এই শিক্ষার সাথে স্বাস্থ্যের সম্পর্কটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা বিশেষতঃ নারী শিক্ষার সাথে শিশুস্বাস্থ্য , পুষ্টি, শিশু মৃত্যুহার এই সবের সম্পর্ক সরাসরি। বিস্তারিত বিশ্লেষণে না গিয়ে কয়েকটা তথ্য ও পরিসংখ্যান দিলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। বছর দশেক আগের একটি রিপোর্ট অনুযায়ী বর্ধমান শহরের একটি বস্তিতে যেখানে শতকরা ৬৫ জন নিরক্ষর, সেখানে ১৪ বছরের কমবয়সীদের মধ্যে শতকরা ৪২ জনেরই পেটে বড় কৃমি, শিশুদের প্রায় শতকরা ৩০ জনের এ্যামিবায়োসিস। ১৯৮২ সালে বিট্‌রা গ্রামে, ১৯৮৩ সালে শ্রীপুরগ্রামে আর ১৯৮৪ সালে কামরা গ্রামে টাইফয়েডের মহামারী দেখা যায়। আক্রান্তদের প্রায় সবাই ছিল নিরক্ষর। এনকেফেলাইটিস এক সময় প্রতিবছরই মহামারী আকার নিত বছর দশ বারো আগে অবধি। আক্রান্তদের মধ্যে নিরক্ষররাই সংখ্যাগরিষ্ঠ।

১৯৮৬ সালে বর্ধমানের খুব কাছে নতুনগ্রামের আদিবাসী পাড়া 'বরার পাড়ে' অজানা জ্বরের প্রাদুর্ভাব ঘটে। (সংবাদটি প্রথম প্রকাশিত হয়, 'বর্ধমান সমাচার' পত্রিকায় এবং জেলাস্তরে সংবাদটি প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথেই রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্তরের স্বাস্থ্য দপ্তরের টনক নড়ে) ঐ অঞ্চলে নিরক্ষরতা সর্বব্যাপী। কেউ হাসপাতাল, চিকিৎসক বা স্বাস্থ্যকর্মীর কাছে যেতেন না। ফল হল সহজেই অনুমেয়। মৃত্যুর হার বাড়তে থাকল। অবশেষে ১৯৮৮ সালের ডিসেম্বরে জানা গেল রোগটা 'কালাজ্বর'। গ্রামবাসীদের ধারণা ছিল গ্রামে একটা পুরোনো অশ্বত্থ গাছ কাটা হয়েছিল বলেই ঐ অসুখ।

আজ বর্ধমান পশ্চিমবঙ্গের তথা পূর্বভারতের শস্যভাণ্ডার। বাংলার 'পাঞ্জাব'। উন্নত, অগ্রগামী জেলা হিসেবেই তার খ্যাতি। শুধু পরিসংখ্যান নয়, বাস্তব অবস্থাও সত্যিই বদলেছে অনেকখানি। তবু দারিদ্র্য, অশিক্ষা আর কুসংস্কারকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলা যায়নি আজও। তাই সাফল্যের আলোর পাশাপাশি ব্যর্থতার অন্ধকার আজও আমাদের লজ্জার বিষয় হয়েই থেকে গেছে।

এনকেফেলাইটিস

মশা বাহিত এই ভয়ঙ্কর ভাইরাল অসুখটি বর্ধমানকে আক্রমণ করত প্রায় প্রতিবছরই। ১৯৭৩,'৭৬,'৭৭,'৭৮,'৭৯,'৮২, '৮৪, '৮৬ এবং '৮৭ সালে ঘটে সাংঘাতিক সংক্রমণ (সারণী-৩)। বর্ষার শেষের দিক থেকে শীত অবধি এর প্রকোপ থাকত। হাসপাতালে খুলতে হতো এনকেফেলাইটিস ওয়ার্ড। শতকরা প্রায় সত্তর জনই অল্প বয়স্ক (৫ - ৩৪ বছর)। এদের মধ্যে বেশীব ভাগই পুরুষ। সমীক্ষায় দেখা গেছে তফ্‌সিলী জাতি-উপজাতির মানুষদের মধ্যেই আক্রান্তের হার বেশী। দারিদ্র্য, অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতি এবং শূকর প্রতিপালনের অভ্যাসই এর কারণ। আক্রান্তদের মধ্যে শতকরা ২১ থেকে ৪৪ জনের মৃত্যু ঘটত। স্বস্তির কথা, স্বাস্থ্যবিভাগের উদ্যোগে পরিচালিত নিরন্তর বিভিন্ন কর্মসূচীর ফলে আজ ঐ অভিশাপের অবসান হয়েছে। মশা নিয়ন্ত্রণ, টীকাকরণ, শূকরদের টীকাকরণ,

জনসচেতনতা বৃদ্ধি ইত্যাদি বিভিন্নমুখী পরিকল্পনা নেওয়া হয়। বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে স্থাপিত হয় জাপানীজ এনকেফেলাইটিস স্ট্যাডি সেন্টার। বর্ধমানের বুক থেকে এনকেফেলাইটিসের আতঙ্ক মুছে দিতে এই সংস্থাটির অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে ডাঃ বিজয় মুখার্জীর কর্মনিষ্ঠা।

জেলার সরকারী স্বাস্থ্য পরিষেবা

প্রায় সত্তর লক্ষ মানুষের বাস এই বর্ধমান জেলায়। জেলার একত্রিশটি ব্লক এবং এগারটি ছোট বড় পৌরসভা শহরে ছড়িয়ে আছে এই বিপুল জনসংখ্যা। সাতানব্বই সালের পরিসংখ্যান (সারণী-৪, ক,খ) অনুযায়ী সারা জেলায় সব মিলিয়ে ৭,০৮৫ টি শয্যা আছে বিভিন্ন হাসপাতালে সরকারী স্বাস্থ্য পরিষেবার আওতায়। আসানসোল মহকুমায় সবচেয়ে বেশী ২,৭১৯টি। আর কালনায় মাত্র ৩৩৪ টি। হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ক্লিনিক , ডিসপেনসারী মিলিয়ে সবচেয়ে বেশী চিকিৎসাকেন্দ্র আছে সদর মহকুমায়। তিরাশিটি। আর কাটোয়া মহকুমায় ছাব্বিশটি। সারা জেলায় ২৩৭ টি। প্রতি ৯৭৬ জন মানুষ পিছু একটি করে বেড। সংখ্যাতত্ত্বের হিসেবে বা পরিসংখ্যানগতভাবে এগুলি খুব খারাপ নয়। বিশেষতঃ সর্বভারতীয় স্তরের তুলনায় বেশ উন্নতই।

সারা জেলায় ৩১ টি ব্লকে BPHC - র সংখ্যা সাতাশটি। (সারণী-৫)। গ্রামীণ হাসপাতালের সংখ্যা ৫। এগুলি হ'ল মেমারী, ভাতাড়, শ্রীরামপুর, মানকর এবং বল্লভপুর । মোট প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সংখ্যা ১০৬। কাজ করছে এমন উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের সংখ্যা ৭৪৪। গ্রামীণ হাসপাতালগুলির মধ্যে ৬০ টি বেড সহ বৃহত্তম হাসপাতালটি মেমারীতে। এছাড়া কালনা, কাটোয়া, দুর্গাপুর আর আসানসোলে একটি করে সাবডিভিশনাল হাসপাতাল আছে। বৃহত্তমটি কাটোয়ায় - বেডসংখ্যা ২৫০ টি।

টীকাকরণ

সাম্প্রতিক অতীতে বড় আকারে টীকাকরণের উদ্যোগ নেবার ফলে অবস্থাটা একটু বদলেছে। তবুও স্বাস্থ্য দফতরের হিসেবেই দেখা যাচ্ছে, জেলার ১৩ % শিশু আজও কোন প্রতিষেধক টীকা পায়নি।

ন্যাশানাল স্যাম্পল সার্ভের পরিসংখ্যান কিন্তু অন্যকথা বলছে। তাদের মতে ৪৮ শতাংশ শিশুই থেকে গেছে টীকাকরণ অভিযানে উপকৃতদের বাইরে।

তবে এই ধরনের পরিসংখ্যানের কিছু কারণ ভাবা যেতে পারে –

(১) সীমান্তবর্তী জেলা হিসেবে সংলগ্ন বিহার বা ঝাড়খণ্ডের শিশুরাও এখানে এসে সংখ্যাতত্ত্বের হিসেবে গরমিল আনতে পারে।

(২) শিক্ষার অভাবে টীকাকরণ কার্ডটির রক্ষণাবেক্ষণই করা হয় না। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে

কার্ড হারিয়ে যায়।

(৩) রাজ্যের সরকারী স্বাস্থ্য পরিষেবার মাধ্যম ছাড়াও জনসংখ্যার একটা বড় অংশ ECL. SAIL ইত্যাদি সরকারী/আধাসরকারী সংস্থার মাধ্যমেও চিকিৎসিত হয়। এই সংস্থাগুলি সবসময় তাদের রিপোর্ট ঠিকভাবে পেশ করে না।

মা ও শিশুর স্বাস্থ্য বিষয়ে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে কয়েকটি স্তরে কাজ করা হয়ে থাকে

(সারণী-৬)

গত কয়েক বছরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী এক্ষেত্রে সাফল্যের হার চোখে পড়ার মত (সারণী-৭)

তবে সরকারী হিসাব যে সবসময় বাস্তব অবস্থাকে প্রতিফলিত করে, তা কিন্তু নয়। বেশীর ভাগ স্বাস্থ্য কেন্দ্রেই সুন্দর,পর্যাপ্ত ঘর থাকা সত্ত্বেও অভাব রয়েছে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, এবং ওষুধপত্রের। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবও একটা বড় কারণ। আর অভাব চিকিৎসক এবং অচিকিৎসক স্বাস্থ্যকর্মীর। সম্প্রতি প্রকাশিত একটি সরকারী রিপোর্ট অনুযায়ী সারা জেলায় বিভিন্ন স্তরের স্বাস্থ্যকর্মীদের শূন্য পদের অবস্থাটা এইরকম ঃ–

১. ব্লক পাবলিক হেল্‌থ নার্স (BPHN) - ২

২. পাবলিক হেল্‌থ নার্স (PHN) - ১৩

৩. হেল্‌থ সুপার ভাইজার (মেল) HS(M) - ৪৮

৪. হেল্‌থ সুপার ভাইজার (ফিমেল) HS (F) - ১৯

৫. হেল্‌থ অ্যাসিস্ট্যান্ট (মেল) HA(M) - ৩৪০

৬. হেল্‌থ অ্যাসিস্ট্যান্ট (ফিমেল) HA(F) - ৭১

সরকারী ডাক্তারদের ক্ষেত্রে ছবিটা আরও করুণ। সারা জেলায় এই মুহূর্তে ৬৫ টি চিকিৎসকের পদ খালি রয়েছে। অথবা চুক্তিতে নিযুক্ত ডাক্তারদের দিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে। মাত্র ৩৫ জন সরকারী ডাক্তার সারা জেলায় স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি চালাচ্ছেন। উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাবে এই ৩৫ জনও যে তাঁদের অধীত বিদ্যাকে জনসাধারণের স্বার্থে সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ করতে পারছেন তাও নয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের মত একটি নিরন্তর বদলে যাওয়া বিষয়ের সাথে তাল রাখতে গেলে যে সমস্ত তথ্যভাণ্ডার এবং প্রযুক্তির সাহচর্য অত্যাবশ্যক, বেশিরভাগ গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে তার একান্ত অভাব। ফলে বাড়ছে হতাশা।

পরিসংখ্যানে অবশ্য এই হতাশাটা ধরা পড়ে না।

পরিশিষ্ট

স্মরণাতীত কাল থেকেই পূর্বভারতের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূখণ্ড এই বর্ধমান। আগেই বলেছি কিছু ঐতিহাসিক এবং সমাজতাত্ত্বিক কারণে চিকিৎসাকেন্দ্র হিসেবে এর প্রতিষ্ঠা। ঐতিহাসিক কারণগুলি বলা হয়েছে আগেই। পাশের জেলাগুলির তুলনায় (যেমন বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম, সাঁওতাল পরগণা, মুর্শিদাবাদ) বর্ধমান কিছু ভৌগোলিক কারণেই সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল। কৃষি, শিক্ষা, রাজনীতি সব দিক থেকেই অগ্রগামী হয়ে ওঠে এই অঞ্চলটি। রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় এই উন্নতি আরও ত্বরান্বিত হয়।

সংলগ্ন রাজ্য বিহারের দক্ষিণ অংশের (অধুনা ঝাড়খণ্ড) এবং সন্নিহিত জেলাগুলির তুলনায় অপেক্ষাকৃত উন্নত অঞ্চল বলেই হয়ত ঐ সমস্ত অঞ্চল থেকে বিপুল সংখ্যক মানুষ রোজই বর্ধমানে আসেন চিকিৎসার আশায়। রাজ হাসপাতাল, ফ্রেজার হাসপাতাল, বি.সি.হসপিটালের দিনগুলি পেরিয়ে আজকের বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের সময়েও বহু স্বনামধন্য, সুযোগ্য চিকিৎসক বর্ধমানে এই পেশায় নিযুক্ত থেকে ঐ বিপুল জনগোষ্ঠীর উপকারে এসেছেন। তবে এটাও ঠিক প্রয়োজনের তুলনায় সামগ্রিকভাবে বর্ধমানের স্বাস্থ্য পরিষেবা বেশ অপ্রতুল। ১৯৯০-এ যে হাসপাতালে ইনডোর বেডের সংখ্যা ছিল ১২৭, প্রায় একশ বছর পর সংখ্যাটা মাত্র সাড়ে আটগুন বেড়ে আটকে আছে ১০৯৯ তে। সে সময় দৈনিক শ'দুয়েক মানুষ চিকিৎসা পেতেন বর্হিবিভাগে আর আজ প্রায় হাজার দেড়েক। খুব চোখে পড়ার মত পার্থক্য কিন্তু নয়। বিশেষতঃ মাঝখানে পেরিয়ে যাওয়া একটা গোটা শতাব্দীর সময়ের ব্যাপ্তিটা যদি মনে রাখি। বিশ শতকের একেবারে প্রথম দিকে রাজ হাসপাতাল ছাড়াও আর একটি হাসপাতাল বর্ধমানে ছিল। সেটি চালাত পুরসভা। আজ কিন্তু মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ছাড়া দ্বিতীয় কোন সরকারী হাসপাতাল এ শহরে নেই। বহুবার শোনা গিয়েছে সদর হাসপাতালের কথা। সেই হাসপাতাল, কেন জানিনা, জেলা হাসপাতাল ভবন তৈরী হবার কয়েক বছর পরও চালু হয়নি আজও।

দক্ষিণবঙ্গের এত গুরুত্বপূর্ণ একটি শহর ভৌগোলিক, রাজনৈতিক অর্থনৈতিকভাবে এত সুবিধাজনক অবস্থায় থেকেও স্বাস্থ্য পরিষেবায় মাঝারিয়ানা কাটাতে পারল না। ১৯৯৯ সালের জানুয়ারী মাসে জেলা পর্যায়ে কিছু কর্মসূচী নেওয়া হয়, '২০০১ সালে সকলের জন্য বুনিয়াদী শিক্ষা এবং সকলের জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য' (সারণী-৮) এই শ্লোগান দিয়ে। শিক্ষার প্রসঙ্গ আমাদের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্গত নয়, কিন্তু ২০০১ সালের শেষে এসে দেখা যাচ্ছে অন্যান্য অনেক মহতী পরিকল্পনা-কর্মসূচীর মত এটিও কেবলমাত্র শ্লোগান হয়েই থেকে গেছে। বাস্তবায়িত হতে বাকি অনেকখানিই।

সরকারের তরফে সদিচ্ছার কোন অভাব হয়ত নেই। অভাব শুধু সময়োচিত রূপায়নের। সেটুকু হলেই স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে অন্ততঃ বর্ধমান পথিকৃত হয়ে দাঁড়াবে।

সারণী -১

বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল (২০০০ সালের পরিসংখ্যান)

বিষয়	সংখ্যা
মোট চিকিৎসা সংক্রান্ত বিভাগ (জেনারেল এমার্জেন্সী ও গাইনি এমার্জেন্সী সমেত)	১৯
মোট ইনডোর বেড সংখ্যা	১.০৯৯
শিক্ষক এবং অশিক্ষক চিকিৎসকদের মোট সংখ্যা	২০৫
বর্হিবিভাগে চিকিৎসাপ্রাপ্ত পুরনো রোগী	১,৮৮,০৪৫
বর্হিবিভাগে চিকিৎসাপ্রাপ্ত নতুন রোগী	২,৬৮,৭২৩
বর্হিবিভাগে মোট চিকিৎসাপ্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা	৪,৫৬.৭৬৮
অন্তর্বিভাগে ভর্তি হওয়া মোট রোগীর সংখ্যা	৭০,৫০৭
ছুটি হওয়া মোট রোগীর সংখ্যা	৬৬,৮৮৫
সর্বমোট প্রসব সংখ্যা	১৪,৫৮৭

সারণী-২

জনসংখ্যা সংক্রান্ত তথ্য (২০০১ সালের পরিসংখ্যান)

বিষয়	জনসংখ্যা	শতাংশ
পুরুষ	৩৫,৯৯,৬২২	৫২.০৪
মহিলা	৩৩,১৭,১২৩	৪৭.৯৬
মোট জনসংখ্যা	৬৯,১৬,৭৪৫	
গ্রামবাসী	৪৩,৪৭,২৭৫	৬২.৮৫
শহরবাসী	২৫,৬৯,৪৭০	৩৭.১৫
মোট সাক্ষর	৪২,৯০,৭২১	৬২.০৩
জনঘনত্ব (প্রতি বর্গ কি.মি.)	৯৮৪	

সারণী -৩

এনকেফেলাইটিসের পরিসংখ্যান (১৯৮৮ সালের তথ্য অনুযায়ী)

বছর	আক্রান্তের সংখ্যা	মৃত্যু সংখ্যা	মৃত্যুহার
১৯৭৩	২৩২	৮৯	৩৮.৪
১৯৭৬	৩০৭	১২৬	৪১.০
১৯৭৮	৬৪৫	২২১	৩৪.৩
১৯৭৯	৭৯২	৩০৪	৩৮.৪
১৯৮০	৬২	২৭	৩৩.৫
১৯৮১	৩৪	২০	৫৮.৮
১৯৮২	৬৯০	২৩৬	৩৪.২
১৯৮৩	৩৯	২২	৫৬.৪
১৯৮৪	৮৩৬	৩৯৮	৪৭.৬
১৯৮৫	১৭১	৬৭	৩৯.২
১৯৮৬	৮০১	২০২	২৫.২
১৯৮৭	৭৭৪	২৭১	৩৫.০

সারণী-৪ক

জনস্বাস্থ্য পরিসংখ্যান (১৯৯৭ সালের তথ্য অনুযায়ী)

মহকুমা	হাসপাতাল	স্বাস্থ্যকেন্দ্র	ক্লিনিক	ডিসপেনসারী	মোট	শয্যা সংখ্যা
আসানসোল	২০	২৭	৯	৬	২	২,৭১৯
দুর্গাপুর	১০	১৮	৫	১	৩৪	১,৪৪৩
সদর	৬	৫২	৮	১৭	৮৩	২,২২৭
কাটোয়া	২	১৭	৬	২	২৬	৩৬২
কালনা	২	২০	৪	৬	৩২	৩৩৪
মোট	৪০	১৩৪	৩২	৩১	২৩৭	৭,০৮৫

সারণী-৪খ

সরকারী স্বাস্থ্য পরিষেবা (১৯৯৭ সালের তথ্য অনুযায়ী)

বিষয়	চিকিৎসা কেন্দ্র	পরিবার কল্যান কেন্দ্র	শয্যা সংখ্যা	প্রতিলক্ষ জনসংখ্যায়/ শয্যাসংখ্যা	মোট চিকিৎসাধীন রোগী
সংখ্যা	২৩৭	৭৩৭	৭,০৮৫	১১৭	২৮,৭৮,৩৭২

সারণী - ৫

গ্রামীণ বর্ধমানের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো (২০০১ সালের পরিসংখ্যান)

ক্রমিক নং	ব্লক	BPHC	গ্রামীণ হাসপাতাল (RH)	প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সংখ্যা	চালু উপকেন্দ্র
১	সদর-১ও২	কুড়মুন	-	৫	৪১
২	মেমারী -১	-	মেমারী(RH)	৩	৩১
৩	মেমারী-২	পাহাড়হাটী	-	৩	২৫
৪	জামালপুর	জামালপুর	-	৪	৩৮
৫	রায়না-১	মহেশবাটী	-	৩	২৬
৬	রায়না-২	মাধবডিহি	-	৫	২১
৭	খণ্ডঘোষ	খণ্ডঘোষ	-	৩	২৬
৮	ভাতাড়	-	ভাতাড় (RH)	৬	৩৮
৯	আউসগ্রাম-১	বননবগ্রাম	-	৩	২১
১০	আউসগ্রাম-২	জামতাড়া	-	৫	২০
১১	গলসী-১	পুরষা	মানকর (RH)	২	২৬
১২	গলসী-২	আদ্রাহাটী	-	২	২১
১৩	কালনা-১	আটঘরিয়া	-	৩	২৬
১৪	কালনা-২	বাদ্‌লা	-	৪	২১
১৫	পূর্বস্থলী-১	-	শ্রীরামপুর (RH)	৩	২৩
১৬	পূর্বস্থলী-২	পূর্বস্থলী	-	৪	২৫
১৭	মন্তেশ্বর	মন্তেশ্বর	-	৩	৩২
১৮	কাটোয়া-১	শ্রীখণ্ড	-	৩	২৫
১৯	কাটোয়া-২	নোয়াপাড়া	-	২	২০
২০	কেতুগ্রাম-১	রামজীবনপুর	-	২	২৪
২১	কেতুগ্রাম-২	কেতুগ্রাম	-	২	১৮
২২	মঙ্গলকোট	মঙ্গলকোট	সিঙ্গোট (RH)	৪	৩৭
২৩	দূর্গাপুর-ফরিদপুর	লাউদোহা	-	৩	১৫
২৪	অণ্ডাল	খাঁদরা(উখরা)	-	৩	৩৪
২৫	কাঁকশা	পানাগড়	-	৪	২৪
২৬	রানীগঞ্জ	রানীগঞ্জ	বল্লভপুর (RH)	২	১১
২৭	জামুরিয়া-১	অকালপুর	-	২	২২
২৮	জামুরিয়া-২	বাহাদুরপুর	-	২	১৪
২৯	বারাবণী	কেলেজোরা	-	৫	১৬
৩০	সালানপুর	পিঠাইকেরী	-	২	১২
			কুলটি	৩	
			হীরাপুর	৩	
			ডোমরা	৩	১০
			মোট	১০৬	৭৪৪

সারণী-৬

মা ও শিশুর স্বাস্থ্য উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রদেয় পরিষেবা

উপকৃত গোষ্ঠী	প্রদেয় পরিষেবা
গর্ভবতী মহিলা	াভুক্তিকরণ, গর্ভাবস্থার স্বাস্থ্যপরীক্ষা, ধনুষ্টংকারের টীকা, আয়রন ফোলিক অ্যাসিড, ট্যাবলেট সরবরাহ, সমস্যা থাকলে উচ্চতর কেন্দ্রে পাঠানো, প্রসবের স্থান, গর্ভাবস্থা সংক্রান্ত জটিলতা, স্তন্যপান এবং নবজাতকের যত্ন বিষয়ে ওয়াকিবহাল করা।
একবছর বয়স অবধি শিশু	যক্ষ্মা, ডিপথেরিয়া, হুপিং কাশি, ধনুষ্টঙ্কার, পোলিও, হাম এই ৬টি অসুখের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ টীকাকরণ। ভিটামিন 'এ'র প্রথম ডোজ।
এক থেকে তিন বছরের শিশু	ডি.পি.টি আর পোলিওর বুস্টার ডোজ, অ্যানিমিয়া থাকলে চিকিৎসা।
পাঁচ বছরের নীচের সব শিশু	আন্ত্রিক. নিউমোনিয়া ইত্যাদির চিকিৎসা, মা'দের সচেতন করা। ও.আর.এস.-র সংস্থান।
১৫ থেকে ৪৫ বছরের মহিলা	জন্মের মধ্যে ব্যবধান রক্ষা বিষয়ে সচেতন করা, জন্মনিয়ন্ত্রণ-এর প্রয়োজনীয়তা এবং পদ্ধতি বোঝান, এ সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ।

সারণী-৭

মা ও শিশুর স্বাস্থ্য (প্রাপ্ত পরিসংখ্যান)

	১৯৯৯-২০০০	২০০০-২০০১ (সর্বশেষ তথ্য)
লাইগেশন	৪৫৪৫০	৪৬৫০০
ইন্ট্রাইউটেরাইন ডিভাইস	১০,৫০০	১১,৫০০
গর্ভনিরোধক পিল	২,৩৭,২৫০	৩,৭৫,০০০
টীকা		
ধনুষ্টংকার (টিটেনাস)	১৫৯৭৩৬	★
বি.সি.জি.	১৪১৫০০	★
ডি.পি.টি.	১৪১৫০০	★
ওরাল পোলিও	১৪১৫০০	★
হাম	১৪১৫০০	★
আয়রন ফোলিক অ্যাসিড বড়ি (মা)	১৫৩৭৩৬	★
ভিটামিন 'এ' তেল	১৩৫০০০	★

★ *তথ্য পাওয়া যায়নি।*

সারণী -৮

(যা রূপায়িত হবার কথা ২০০১ সালের মধ্যে)

১) ১০০ % টীকাকরণ।

২) গ্রাম পঞ্চায়েতের সমস্ত সদস্যকে সাধারণ স্বাস্থ্য সচেতন করে তোলা।

৩) বিদ্যালয়ের প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর জন্য 'হেল্‌থ কার্ড' চালু করা।

৪) সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিক্ষা সংস্থায় স্বাস্থ্যসম্মত শৌচালয় রাখা।

৫) সংগঠিত শিশু বিকাশ কর্মসূচী (ICDS) এবং শিশুর পুষ্টির ব্যাপারটা জোরদার করা।

৬) সরকারী ও বেসরকারী ব্যবস্থার মাধ্যমে শিশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা।

৭) ধোঁয়া বিহীন উনুন ব্যবহার।

তথ্যসূত্র

১. A Century of Burdwan Hospital - Dr. Subodh Mukhopadhyay. Souvenir, Centenary of Burdwan Medical College Hospital, 1980 (1880 - 1980)

২. বর্ধমান হাসপাতালের সেকাল Vs একাল - ডাঃ শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, Souvenir, Centenary of Burdwan Medical College Hospital (1880 - 1980),1980

৩. স্মৃতি সত্ত্বার বর্ধমান - রাখহরি সরকার, প্রকাশক গিরিধারী সরকার, বর্ধমান,২০০১

৪. বর্ধমান সহায়িকা ২০০১ - বর্ধমান সমাচার।

৫. Plan of outreach R.C.H. Services - District Family Welfare Bureau, Burdwan, 2001

৬. Epidemiology of Japanese Encephalitis - Dr. Bijoy Mukherjee, SPECTRA, The Annual magazine, Burdwan Medical College,1988

৭. শিক্ষা ও স্বাস্থ্য - ডাঃ বিজয় মুখার্জী, SPECTRA,The Annual Magazine, Burdwan Medical College,1990

৮. দক্ষিণ দামোদর ঃ গত শতাব্দীর অগ্রগতি, এই শতাব্দীর সম্ভাবনা, একটি পরিসংখ্যান এবং অনুসন্ধান ভিত্তিক প্রতিবেদন -জ্যোতিরিন্দ্র নারায়ণ লাহিড়ী, অভিযান সাময়িকী, জুন - আগষ্ট, ২০০১

৯. Internet : www.burdwan.org.

১০. Park's Text book of Preventive and Social Medicine, Part and Park, 13 th ed., Banarasi Das Bhanot Publishers, Jabalpur, 1991

১১. রূপমঞ্জরী, নারায়ণ সান্যাল, দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৯

১২. Impressions (আমার য়ুরোপ ভবন), বিজয় চন্দ মহতাব (অনুবাদক শ্রী জলধর সেন), ১৯১৫।

কৃতজ্ঞতা

১. ডাঃ কৌস্তভ চ্যাটার্জী

২. শ্রী কার্তিক চন্দ্র বোস

বর্ধমানের খেলাধুলো
অতীত থেকে বর্তমান ঃ একটি রূপরেখা

নিরুপম চৌধুরী

বর্ধমান জেলার শিল্প সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যেমন রাজ আনুকুল্যের নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায় খেলাধুলোর ক্ষেত্রেও তেমনি তার ব্যতিক্রম হয় নি। বর্ধমানের খেলাধুলোর সঙ্গে তাই মহারাজ বিজয়চাঁদ , উদয়চাঁদ, অভয়চাঁদ ও বনবিহারী কাপুরের নাম যুক্ত হয়ে আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ লগ্নে পুলিশ লাইনের মাঠে বৃটিশদের সঙ্গে বনবিহারী কাপুর অথবা তাঁর পুত্র বিজয়চাঁদের পোলো খেলার ঘটনা থেকে বর্ধমানের খেলাধুলোর সূচনাকাল ধরা যেতে পারে। তারও আগে রাজবাড়িতে কুস্তি, লাঠি, ছোরা খেলার যে রেওয়াজ ছিল অনেকের মতেই তা শরীরচর্চা ও আত্মরক্ষার কৌশল হিসেবে রাজ রক্ষীদের নিজস্ব বিষয় ছিল। রাজার বর্ধমানে সকাল হত তোপধ্বনি দিয়ে আর শহরের কোলাহল থেমে যেত ধীরে ধীরে রাতের তোপধ্বনি শুনে। এই শহরে হাতিশাল ছিল ঘোড়াশাল ছিল। ছিল রাজার দুখানা বিশাল প্রাসাদ। আলোড়ন বিহীন সেই শহরে ছিল ঘোড়দৌড় চটি। ঘোড়দৌড় যদি ক্রীড়া হয় তাহলে এটিও সূচনা কালে স্থান করে নিতে পারে। ঘোড়দৌড় হতো বিজয়চাঁদের আমলে। বিলেত থেকে জাহাজে করে ঘোড়া আনা হত। বনবিহারী কাপুরের ছেলে মহারাজ বিজয়চাঁদ। বিজয় চাঁদকে দত্তক নিয়েছিলেন অপুত্রক আফতাব চাঁদের স্ত্রী। আফতাব চাঁদের মৃত্যুর পর নাবালক বিজয় চাঁদের পিতা বনবিহারী কাপুর রাজকার্য দেখাশোনা করতেন। বনবিহারী কাপুর ছিলেন সাহিত্যিক ও ক্রীড়ানুরাগী। পুলিশ লাইনের মাঠে গিয়ে তিনি নিয়মিত বৃটিশ জজ, ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে পোলো খেলতেন। তাঁরই নামে ১৯০০ সালে গড়ে উঠল বনবিহারী জেলা অ্যাথলেটিক্স অ্যাসোসিয়েশন। প্রকৃতপক্ষে এই সংস্থা গড়ে ওঠে মহারাজ বিজয়চাঁদের উদ্যোগে ১৮৯৫ সালেই কিন্তু আই- এফ - এর অনুমোদন লাভ করে ১৯০০ সালে। এই বছরটিকেই এখন জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রতিষ্ঠা বছর ধরা হচ্ছে। এই সংস্থাটিই পরবর্তীকালে নাম পাল্টে হয় বর্ধমান জেলা অ্যাথলেটিক্স অ্যাসোসিয়েশন এবং অবশেষে বর্ধমান জেলা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন। বর্ধমানের খেলাধুলোর কথা বলতে গেলে এই ক্রীড়া সংস্থার কথা বলতেই হবে। শতবর্ষের পুরোনো এই সংস্থা। এর সঙ্গে মাঠ হিসেবে ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ডের কথাও আসবে অনিবার্যভাবে।

ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ড নাম এবং রূপ পাল্টে হয়েছে স্পন্দন কমপ্লেক্স। এই প্রজন্মের কাছে অপরিচিত সেই ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ড যা ঘেরা ছিল পিচের ড্রাম কাটা কালো টিন দিয়ে। সেখানে লাইন দিয়ে টিকিট কেটে মানুষ খেলা দেখতে যেতো। আর খেলা দেখে উত্তেজনায় টগবগ করত। মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলের খেলা নয়, স্থানীয় ক্লাবের খেলা। ক্রীড়া সংস্থা পরিচালিত লিগ অথবা শীল্ডের খেলা। কল্যাণ স্মৃতি সংঘ বনাম শিবাজী সংঘের খেলার দিন মাঠে চরম

উত্তেজনা বিরাজ করত। পুলিশ মোতায়েন করা হত। এটাতো বিংশ শতাব্দীর সাতের দশকের দৃশ্য। এই উৎসাহ বিষ্ণুদাস (দনু) তেওয়ারীর আমলেও ছিল। তাঁর জন্ম ১৯১৯ সালে। দনুদার মুখে ২০০০ সালে বসে শুনেছি পুরানো সেই দিনের কথা। ২ আনার টিকিট কেটে স্থানীয় মাঠে ফুটবল খেলা দেখতে যাওয়ার কথা। দনুদা ফুটবল এবং ভলি দুটোই খেলতেন। ভলিতেই বেশী নাম করেছিলেন। ৯ বার বাংলা দলের হয়ে খেলেছেন। ভারতীয় দলের সহ অধিনায়ক হয়েছিলেন। ১৯৫৩ সালে ভারতীয় দলের হয়ে ইতালী, সুইজারল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া প্রভৃতি দেশ সফর করেন। বর্ধমানের আর এক প্রাক্তন বিশিষ্ট ফুটবলার বারীন ব্যানার্জীও বলছিলেন ১৯৬০-৬১ সালের খেলা। জাতীয় সংঘ বনাম ডব্লু বি এ সির খেলা। ২ আনা টিকিটের দাম। মাঠের কাউন্টার থেকে ১৭০০ টাকার টিকিট বিক্রি হয়েছিল সেদিন। ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ডে অথবা তারও আগে ম্যাজিস্ট্রেট মাঠে ফুটবল খেলার সেই উৎসাহ জানি না আজও রাধারানী স্টেডিয়াম পর্যন্ত ধরে রাখা গেছে কিনা। সম্ভবত যায়নি। তার অনেক কারণ আছে। এখানে সে কথা বলার অবকাশ নেই। একটা কথা উল্লেখ করা যায় - এখন বিনোদনের অনেক উপকরণ আমাদের হাতে চলে এসেছে।

বর্ধমানের খেলাধুলো পরিচালিত হয় এখন প্রধানতঃ রাধারানী স্টেডিয়াম ও শ্রীঅরবিন্দ স্টেডিয়াম থেকে। রাধারানী স্টেডিয়ামে জেলা ক্রীড়া সংস্থার অফিস। অন্যটিতে বর্ধমান জেলা ভলিবল বাস্কেট বল সংস্থার অফিস। এছাড়াও বর্ধমানের খেলাধুলোর আর একটি কেন্দ্র বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়। গড়ে উঠেছে আরও কিছু কেন্দ্র যেমন বর্ধমানে রয়েছে স্পোর্টস অথরিটি অফ্ ইণ্ডিয়ার (সাই) অফিস। সাই বিদ্যালয় স্তরের ছেলেমেয়েদের ক্রীড়া প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। এটিও শ্রীঅরবিন্দ স্টেডিয়ামে ছিল। ১০.২.২০০১ তারিখে উঠে গেছে তালিত স্টেশনের কাছে ঝিঙুটি গ্রামে নিজস্ব স্পোর্টস কমপ্লেক্সে। ভলি, বাস্কেট, ফুটবল ও জিমন্যাসটিকের আবাসিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে এই কমপ্লেক্সে। কল্পতরু মাঠে রয়েছে সাঁতারের ব্যবস্থা। ক্রিকেট, টেবিল টেনিস খেলা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও রয়েছে বর্ধমানে। হকি খেলা হত এক সময়ে এই শহরে। এখন এই খেলাটি অবলুপ্ত হয়েছে। দুর্গাপুর, আসানসোল মহকুমায় অবশ্য হকি খেলা এখনও হয়। বছর কুড়ি - পঁচিশ আগে টাউন হলে লন টেনিসের চর্চা হত। এখানে বাঁধানো কোর্ট রয়েছে এখনও। এখন এই খেলাটিও বর্ধমান থেকে উঠে গেছে। লন টেনিসের আদি কেন্দ্র ছিল বর্তমানে স্টেটব্যাঙ্কের প্রধান ভবনের কাছে আফতাব গ্রাউণ্ডে। আফতাব ক্লাবের নামই হয়ে গিয়েছিল আণ্ডা কুঠি। শোনা যায় টেনিস বলের সঙ্গে স্থানীয় মানুষ ডিম বা আণ্ডার সাযুয্য খুঁজে পায় যে বাড়ীটিতে আণ্ডাসম বল নিয়ে পেটানো হত সেই বাড়িটিকে আণ্ডাকুঠি নাম দিয়েছিলেন। এই খেলাটিও রাজ পরিবারের সদস্য ও বৃটিশ আমলাদের কাছেই প্রিয় ছিল। বর্ধমানে সন্তোষ কুমার বোসের বাড়ীতেও লন টেনিস চর্চা হত। বর্ধমানে বিলিয়ার্ড খেলাও হত তার প্রমাণ টাউন হলের এক কোণে পড়ে থাকা বিলিয়ার্ড বোর্ডটি। পৌরসভা এটি সংরক্ষণ করতে পারে। এখন দেহচর্চার অনেকগুলি প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠেছে বর্ধমানে। তিনটি ধারা রয়েছে এই দেহচর্চার। একদিকে আছে উপকরণ নিয়ে দেহচর্চা অন্যদিকে আছে যোগাসন ও

মার্শাল আর্টের চর্চা। এই দেহচর্চা ধারাটির সঙ্গে স্বাধীনতাপূর্ব বিপ্লবী আন্দোলনেরও যোগ ছিল। গুলিপুকুরের কাছে ফ্রেন্ডস স্পোর্টিং ক্লাবে বর্ধমানের যুবদের দেহচর্চার সূত্রপাত। মনোরঞ্জন চক্রবর্তীর মতে ফ্রেন্ডস স্পোর্টিং ক্লাবে নিয়মিত দেহচর্চার যে ধারা তৈরী হয়েছিল তার পিছনে শংকরদাস বর্মন ও বিনয় চৌধুরীর মুখ্য ভূমিকা ছিল। ১৯২৫ সালে এই ক্লাবটি স্থাপিত হয়। বিপ্লবীরা এখানে গোপনে দেহচর্চা করতেন। এখন যাঁরা প্রাক্তণ বডি বিল্ডার হিসাবে পরিচিত তাঁরা অনেকেই দেখেছেন রূপমহল সিনেমার পিছনে রাজ লাইব্রেরীতে দেহচর্চার ব্যবস্থা ছিল। উদয়চাঁদ গ্রন্থাগারের সামনে উদয়চাঁদ ব্যায়ামাগারটি স্থাপিত হয় গত শতাব্দীর চারের দশকে। বোরহাট তরুণ সংঘেও ছিল দেহচর্চার ব্যবস্থা। বিংশ শতাব্দীর ছয়ের দশকে শংকর দাস বর্মনের উৎসাহে আরও অনেক জায়গায় দেহচর্চা জনপ্রিয় হয়। নতুন অনেক ক্লাব নিয়মিত দেহচর্চার বিষয়ে উৎসাহী হয়ে ওঠে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য তিনকোনিয়ার উদয় সংঘ, ইছলাবাদ অ্যাথলেটিক ক্লাব ও বড়নীলপুরের ফ্রেন্ডস ক্লাব। ইতিমধ্যে বর্ধমানে গড়ে ওঠে বর্ধমান জেলা অ্যামেচার ওয়েট লিফটার্স ও বডি বিল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশন। রাজ্য স্তরে ভারোত্তলন ও দেহগঠন সংস্থা দুটি আলাদা হওয়ায় বর্ধমানেও দুটি পৃথক সংস্থা গড়ে উঠেছে। শংকর দাস বর্মনের পর যাঁরা বর্ধমানে দেহচর্চাকে জনপ্রিয় করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আদিত্য দে, মনোরঞ্জন চক্রবর্তী, জগদীশ মিত্র, নবকুমার কেশ, তিলক চৌধুরী, কৃষ্ণচন্দ্র ব্যানার্জী, স্বপন ঘোষ প্রমুখ। সাতের দশকের শুরুতে পশ্চিমবঙ্গের টালমাটাল রাজনৈতিক পরিবেশে শংকরদাস বর্মন আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছিলেন। এখন তাঁর স্মৃতিতে একটি বড় দেহ সৌষ্ঠব প্রতিযোগিতা প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হয়। (ফ্রেন্ডস স্পোর্টিং ক্লাবের প্রতিষ্ঠা বছর থেকে ধরলে) বর্ধমানে দেহচর্চার ঐতিহ্য রয়েছে। আছে ৭৫ বছরের ধারাবাহিকতা।

বর্ধমানে পর্বতাভিযান চর্চার বয়েসও কম নয়। বিগত ৩৫ বছর ধরে ক্রীড়ার এই শাখাটি পুষ্ট করেছে বেশ কিছু সংস্থা । আসানসোলের মাউন্টেন লাভার্স অ্যাসোসিয়েশন এ বিষয়ে জেলার পথিকৃত বলা যায়। এই সংস্থাটি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন প্রাণেশ চৌধুরী, চৌধুরী আবদুর রহিম প্রমুখ। আসানসোল , চিত্তরঞ্জন, বার্ণপুর, দুর্গাপুর, বর্ধমানসহ জেলায় বিভিন্ন স্থানে একটি দুটি পর্বতাভিযান সংস্থা গড়ে ওঠে। বর্তমানে এরকম সংস্থা রয়েছে ৯ টি। এই সংস্থাগুলি নিয়মিত শৈলারোহণ প্রশিক্ষণ ও পর্বতাভিযানের আয়োজন করে।

তবে 'সব খেলার সেরা বাঙালীর খেলা' ফুটবলকে ঘিরেই ক্লাব গড়ে তোলা ক্লাব কেন্দ্রীক ক্রীড়া চর্চা এবং উত্তেজনাই ছিল বর্ধমানের প্রধানতম ক্রীড়া বিনোদন। আর এই বিনোদনের পীঠস্থান হয়ে উঠেছিল ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ড । সাতের দশকে ভারতের প্রতিরক্ষা দপ্তর এই মাঠটিকে তাদের দখলে আনার জন্যে তৎপর হয়। কিন্তু নিরুপম সেন, মদন ঘোষ, আবদুর রশিদ প্রমুখের চেষ্টায় বর্ধমানের সাধারণ মানুষের ইচ্ছাই শেষ পর্যন্ত জয়যুক্ত হয়। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় সম পরিমাণ জমি প্রতিরক্ষা দপ্তরকে দিতে সম্মত হলে ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ডের দাবী প্রতিরক্ষা দপ্তর ছেড়ে দেয়। এরপর ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ডের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয়।

গ্যালারী তৈরী হয়। ফুলের বাগান করা হয়। নাম হয় স্পন্দন। গ্যালারীর নিচে মাঠের বাইরে সারি সারি দোকান ঘর তৈরী করে সেই দোকান বিলির টাকায় গড়ে ওঠে আজকের স্পন্দন। কিন্তু একটা ক্ষতিও এরমধ্যে হয়ে যায়। ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ডের প্রমাণ মাপের মাঠটি স্পন্দনের ঘেরাটোপে ছোট হয়ে যায়। এই ছোট মাপের মাঠে আর কোনদিন বড় মাপের খেলাধুলো সম্ভব হবে না। এখন অবশ্য এই স্টেডিয়ামটিকে আন্তর্জাতিক মানের হকি খেলার স্টেডিয়াম হিসেবে গড়ে তোলা যেতে পারে।

ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ড থেকে স্পন্দন গড়ে ওঠার মতই একদিন নয়নের ডাঙ্গা ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ড হয়ে উঠেছিল।সেটা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগের সময়। জামালপুরের জমিদারদের সম্পত্তি ছিল নয়ন ডাঙ্গা নামের ওই মাঠটি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে এই মাঠে কবাডি, খো - খো , কুস্তী , লাঠি খেলা ইত্যাদি হত বলে শোনা যায়। স্বাধীনতা আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ যুবকেরা এখানে দেহচর্চাও করতেন উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এই মাঠে রেলের বৃটিশ ও অ্যাংলো কর্মীদের ফুটবল দলগুলি ফুটবল ম্যাচ শুরু করে। ইতিমধ্যে বর্ধমানেও কিছু স্থানীয় ফুটবল দল গড়ে ওঠে। রাজ বদান্যতায় জেলা ক্রীড়া সংস্থারও জন্ম হয়। শুরু হয় নতুন শতাব্দী। বিংশ শতাব্দীর কয়েকটা বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর শুরু হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। নয়ন ডাঙ্গায় বৃটিশ ইন্ডিয়ার মিলিটারীরা ক্যাম্প করল। ভারী যানবাহন রাখা হল। বন্ধ হয়ে গেল খেলাধুলো এই মাঠে। লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল মিলিটারীদের ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ড নামটি। এক সময়ে যুদ্ধ থেমে গেল। মিলিটারীরাও চলে গেল। কিন্তু নয়নডাঙ্গার নাম ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ডই থেকে গেল। ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময়েও এখানে মিলিটারীরা যানবাহন রেখে ছিল। ১৯৪৬ সালে তৎকালীন জেলাশাসক জি ডি বিল ও প্রণবেশ্বর সরকারের উদ্যোগে পানাগড় থেকে পিচের ড্রাম এনে ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ড ঘেরা হয়েছিল।

বৃটিশরা ভারতে নিয়ে এসেছিল ফুটবল, ক্রিকেটের ক্রীড়া ,সংস্কৃতি। রেলের কর্মরত বৃটিশ ও অ্যাংলো ইন্ডিয়ানরা নিজেদের মধ্যে ফুটবল, ক্রিকেট শুরু করে নয়নডাঙ্গার মাঠে। তাদের ফুটবল প্রতিযোগিতাগুলি দেখে স্থানীয় যুবকেরাও উৎসাহিত হয়ে ওঠে। খেলাধুলায় উৎসাহ ছিল মহারাজ বিজয় চাঁদের। তিনি স্থানীয় ক্রীড়া প্রেমীদের ডেকে গড়ে তোলেন তাঁর পিতার নামে বনবিহারী জেলা অ্যাথলেটিক অ্যাসোসিয়েশন। ১৯০৭ সালেই শুরু হয় বনবিহারী চ্যালেঞ্জ কাপ টুর্নামেন্ট। এই প্রতিযোগিতার জন্যে বিজয়চাঁদ ইংল্যান্ড থেকে অর্ডার দিয়ে একটি সম্পূর্ণ রূপোর তৈরী কাপ করিয়ে এনেছিলেন। সেই সময়ের প্রটেস্টান্ট চার্চের পাদ্রীরাও মাঝে মাঝে কলকাতা থেকে ফুটবল দল নিয়ে এসে বর্ধমানে খেলানোর ব্যবস্থা করত। রাজপরিবার ছাড়াও এই সময়ে ক্রীড়া সংস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যাঁরা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন গিরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, স্যার রাসবিহারী ঘোষের ভাই অতুলচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ। একটি সূত্র অনুসারে রেভারেন্ড ললিতমোহন দে ছিলেন বনবিহারী জেলা অ্যাথলেটিক অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম সম্পাদক। অবশ্য জেলা ক্রীড়া সংস্থার বর্তমান সম্পাদক আব্দুর রশিদ জানিয়েছেন প্রথম সম্পাদক কে ছিলেন তা সুনির্দিষ্ট ভাবে জানা যায়নি।

একটি ক্রীড়া সংস্থা গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই খেলাধুলোয় স্থানীয় তরুণদের উৎসাহ বাড়তে থাকে। তখন কয়েকটি স্কুল কলেজ লিগ শীল্ডের খেলায় অংশ নিত। রাজ স্কুল, মিউনিসিপ্যাল স্কুল, রাজ কলেজ, রোনাল্ডাসে মেডিকেল কলেজ যেমন খেলত তেমনি বয়েজ অ্যাথলেটিক ক্লাব, ডায়মন্ড জুবিলী ক্লাব, মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব, আর এম সি , বর্ধমান অ্যাথলেটিক ক্লাব প্রভৃতি দলগুলিও তৈরী হয় এবং খেলাধুলোয় অংশ গ্রহণ করে। আর এম সি এবং বর্ধমান অ্যাথলেটিক ক্লাব মিশে গিয়ে ১৯২৯ সালে গড়ে ওঠে রাসবিহারী অ্যাথলেটিক ইউনাইটেড ক্লাব। এই ক্লাবের দোতলা পাকা বাড়ী আজ ও রয়েছে ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ড তথা স্পন্দন কমপ্লেক্সের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে। বর্ধমানের প্রথম দুটি ফুটবল ক্লাব সান স্পোর্টিং ও স্পোর্টিং ক্লাব। অশীতিপর প্রাক্তন খেলোয়াড় রাখহরি সরকার জানিয়েছেন সাদা চামড়ার লোকেদের খেলা দেখে বর্ধমানের কিছু অভিজাত পরিবারের যুবকরা এগিয়ে এসে এই ক্লাব দুটি গঠন করেন, সান ক্লাবে ছিলেন অতুল ঘোষ, প্রমথ মুখোপাধ্যায়, পুণ্ডরীক্ষ বসু, সুচাঁদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। দ্বিতীয়টিতে ছিলেন গিরীন চট্টোপাধ্যায়, মন্মথ চট্টোপাধ্যায়, শরৎ ঘোষ, বিনোদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। প্রথম দলটি অনুশীলন করত ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ডে, দ্বিতীয়টি অনুশীলন করত টাউন হলে। পরে এই দুটি ক্লাব এক হয়ে বয়েজ স্পোর্টিং ক্লাব গঠন করে। ১৯২৮ সালে আবার এই ক্লাব দুভাগ হয়। বয়েজ অ্যাথলেটিক ক্লাব ও রাসবিহারী মেমোরিয়াল ক্লাব গঠিত হয়। ১৯২৮ সালে বনবিহারী জেলা একাদশ বনাম মোহনবাগান ক্লাবের মধ্যে একটি প্রদর্শনী ম্যাচ হয়েছিল। এই ম্যাচে বর্ধমান ৩ - ২ গোলে জিতেছিল। সেদিন যাঁরা বর্ধমানের হয়ে খেলেছিলেন তাঁদের নাম গিরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ফনিভুষণ সামন্ত, শ্যামসুন্দব সামন্ত, কেশব সরকার, প্রণব সরকার, জ্ঞানচন্দ্র , অতুল ঘোস, সুচাঁদ মুখোপাধ্যায়, জ্যোতিপ্রকাশ চন্দ্র, হারান সেন, মথেরাল ইসলাম, রাসবিহারী দাস, জাফর আলি, যতীন্দ্রমোহন হাজরা ও বিনোদগোপাল রায়। বর্ধমান দলের অধিনায়ক ছিলেন ফনিভুষণ সামন্ত। বর্ধমানের পক্ষে গোল করেছিলেন শ্যামসুন্দর সামন্ত,জ্যোতি প্রকাশ চন্দ্র ও হারাণ সেন। দুয়ের দশকে মোহনবাগান , ইষ্টবেঙ্গল, ভবানীপুর, স্পোর্টিং ইউনিয়ন বর্ধমানের বনবিহারী চ্যালেঞ্জ কাপে অংশ নিতে আসত। মোহনবাগান বনাম বর্ধমান একাদশের এই সময়ে পরবর্তী খেলাটি ১ - ১ গোলে ড্র হয়। বর্ধমানের পক্ষে গোল করেছিলেন বিনোদগোপাল রায়। তৎকালীন জেলাশাসক মিঃ স্টুয়ার্ট বর্ধমানের মানুষের খেলাধুলোয় উৎসাহ দেখে নিজের বাংলোর কাছে একটি খেলার মাঠ তৈরী করে দেন। এটাই ছিল ম্যাজিস্ট্রেট গ্রাউণ্ড। ১৯৩৫ সালে এই মাঠে ডি সি এল আই নামে একটি ব্রিটিশ মিলিটারী দল বর্ধমান একাদশকে ৯ - ১ গোলে পরাজিত করে। ওরা সবাই বুট পড়ে খেলেছিল। বর্ধমান দলে ফনিভূষণ সামন্ত ছাড়া সকলেই ছিলেন খালি পায়ে। এই খেলার মাঠটির অস্তিত্ব বর্তমানে নেই। ১৯৪১ সালের পর ওয়েষ্ট বর্ধমান অ্যাথলেটিক ইউনাইটেড ক্লাব, জাতীয় সংঘ, বিবেকানন্দ সংঘ, মিলনী ও নির্ভীক সংঘ লিগ ও শীল্ডে অংশগ্রহণ শুরু করে। এই সময়ে বর্ধমানে হকি খেলারও প্রচলন হয়। ওয়েষ্ট বর্ধমান ও আর এ ইউ সি - র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ৪ ও ৫ -এর দশকের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ফুটবল ছাড়াও বর্ধমানে ক্রিকেট খেলারও চল ছিল। যাদবোত্তম সামন্ত, অমিয় মাধব সামন্ত,

বিনোদ মাধব সামন্ত ভালো ক্রিকেট খেলতেন। টাউন স্কুল মাঠে ক্রিকেট খেলা হত। ক্রিকেট তখন মানুষকে বিশেষ আকর্ষণ করত না। অ্যাথলেটিক্সেও বর্ধমানের নাম উজ্জ্বল করেছেন অনেকেই। দুর্গা চৌধুরী পোল ভল্টে সর্বভারতীয় রেকর্ড সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি অনায়াসে সাড়ে দশফুট উচ্চতা অতিক্রম করতেন। অন্যান্য কৃতীদের মধ্যে ছিলেন জাফর আলি, যাদব সামন্ত, ফনি সামন্ত, আনন্দ মুখার্জী, পঙ্কজ ভট্টাচার্য, আনন্দবিহারী বোস, বিনয় চৌধুরী, নিয়তি ভট্টাচার্য প্রমুখ।

বর্ধমানের খেলাধুলোর ক্ষেত্রে রাজ স্কুল, টাউন স্কুল, মিউনিসিপ্যাল স্কুলের যথেষ্ট অবদান ছিল। টাউন স্কুলের সুচাঁদ মুখোপাধ্যায় থেকে গোপাল ব্যানার্জী মিউনিসিপ্যাল স্কুলের বিনোদ মাধব সামন্ত এবং রাজ স্কুলের বিনোদগোপাল রায় প্রমুখ ছিলেন খেলোয়াড় তৈরীর কারিগর। পরবর্তীকালে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া শিক্ষকরা যেমন দীপ্তি ঘোষ, রথীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, শান্তনু দাশগুপ্ত প্রমুখ বর্ধমানের খেলাধুলোর মানোন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। ১৯৬৫ সাল টাউন স্কুলের ক্রীড়া ইতিহাসের স্বর্ণ যুগ। ঐ বছর বিদ্যালয়ের ফুটবল, ভলি, বাস্কেট , সাঁতার, অ্যাথলেটিক্স সব ক্ষেত্রেই সাফল্য অর্জন করেছিলেন। এই তথ্য থেকে বোঝা যায় বিদ্যালয় স্তরে এই প্রতিযোগিতাগুলি তখন নিয়মিত ছিল। টাউন স্কুলের ক্রীড়া শিক্ষক সুচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের প্রভাব প্রধান শিক্ষকের থেকে কোন অংশে কম ছিল না। অকৃতদার সুচাঁদবাবু মেসে থাকতেন। ভালো খেলোয়াড়দের প্রতি তাঁর বিশেষ নজর থাকত। ১৯৫৭ সাল থেকে সুচাঁদ বাবুর উত্তরসূরী হিসেবে টাউন স্কুলের ক্রীড়া শিক্ষক হিসেবে সুনামের সঙ্গে কাজ করেছেন গোপাল ব্যানার্জী। বর্ধমানের অনেক স্কুলেরই ভালো মাঠ রয়েছে। তবে টাউন স্কুলের মত প্রশস্ত ও সবুজ মাঠ দেখা যায় না।

অতীতের যাদবেন্দ্র সামন্ত , সুচাঁদ মুখোপাধ্যায়, রমেশ দাস, মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জী, তুষার ঘোষ থেকে সাম্প্রতিক কালের অমর্ত্য ঘোষ, দেবাশীষ কোনার বর্ধমানের খেলা এবং খেলোয়াড়দের উঠে আসা অনেকটাই ক্রীড়া সংস্থা ও ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ডকে ঘিরে। এর পাশাপাশি আর একটা কেন্দ্র শ্রী অরবিন্দ স্টেডিয়াম বর্ধমানের ভলিবল ও বাস্কেটবলের ইতিহাসকে পুষ্ট করেছে। ১৯৪১ সালে বর্ধমান শহরের বোরহাটে তরুণ সংঘের জন্ম হয় বর্ধমান জেলা ভলিবল ও বাস্কেট বল সংস্থা বর্তমানে সংস্থানটি নানা ক্রীড়া কর্মকাণ্ডে নিজেদের নিয়োজিত করেছে। একদিকে এই সংস্থা যেমন বিদেশের ভালো ভালো দল নিয়ে এসে বর্ধমানে প্রদর্শনী ম্যাচ করেছে, রাজ্য ও জাতীয় স্তরের ভলি ও বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা সংগঠিত করেছে অন্যদিকে স্থানীয় খেলোয়াড় তৈরীর জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। ১৯৭৫ সালে হরিজন স্কুলের পিছনে অবস্থিত ধোবাপুকুর নামে ৪ একরের একটি জলাশয় বর্ধমান পৌরসভা ভলিবল বাস্কেটবল সংস্থাকে দান করে। ১৯৭৭ সালের ২৯ এপ্রিল এখানে শ্রী অরবিন্দ স্টেডিয়ামের উদ্বোধন হয়। এই স্টেডিয়ামের ভেতরে আছে উন্নতমানের বাস্কেটবল কোর্ট। চারটি ভলিবল কোর্ট একটি জিমন্যাসিয়াম ও একটি মাল্টি জ ম । মানস রায় দীর্ঘদিন এই সংস্থার সম্পাদকের পদে রয়েছেন।

বর্ধমানের খেলাধুলোর অপর একটি কেন্দ্র বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে যে সমস্ত খেলাধুলোর চর্চা হয় বা প্রতিযোগিতায় বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় অংশগ্রহণ করে তার মধ্যে রয়েছে ফুটবল , ক্রিকেট, বাস্কেটবল, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন, টেবল্ টেনিস, কাবাডি, অ্যাথলেটিক্স, ভারোত্তলন, ও দেহসৌষ্ঠব এবং নতুন সংযোজন হ্যাণ্ডবল। এখানে স্পোর্টস অফিসার রথীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য সহ পাঁচজন এন আই এস প্রশিক্ষক রয়েছেন। স্পোর্টস অফিসার নিজে ফুটবল ও বাস্কেটবলের প্রশিক্ষণের দায়িত্বে রয়েছেন। শান্তনু দাশগুপ্ত ক্রিকেট প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। অ্যাথলেটিক্স কোচ আব্দুল রহিম , ভারোত্তলনের প্রশিক্ষক নবকুমার কেশ ও কাবাডির প্রশিক্ষক স্বপন কুমার ঘোষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব মাঠ রয়েছে। নাম মোহনবাগান মাঠ। ১৯৭৪ থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল দল বিভিন্ন সময়ে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করে। ১৯৯৫ সালে সারা ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ফুটবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়। বর্ধমানের খেলাধুলো চর্চার প্রধান কেন্দ্র শতবর্ষের জেলা ক্রীড়া সংস্থা যে সমস্ত খেলা পরিচালনা করে সেগুলি হল ফুটবল , ক্রিকেট, হকি ও অ্যাথলেটিক্স। জেলা ক্রীড়া সংস্থার অ্যাফিলিয়েটেড পাঁচটি মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা রয়েছে। জেলা ক্রীড়া সংস্থার অ্যাফিলিয়েটেড ৬৫ টি ক্লাব রয়েছে। তিন চার বছর আগে এই সংখ্যা ছিল ৮০ । ১৯৭৭ সালের পর থেকে ব্লকগুলিতেও পরিকল্পিত খেলাধুলোর প্রতিযোগিতা হচ্ছে। ব্লকগুলি মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার সঙ্গে যুক্ত। আব্দুর রশিদ বর্ধমান জেলা ক্রীড়া সংস্থার বর্তমান সম্পাদক। তিনি এই দায়িত্বে রয়েছেন ৩৬ বছর যাবৎ।

বর্ধমানের খেলাধুলো চর্চার তিনটি প্রধান কেন্দ্র জেলা ক্রীড়া সংস্থা, জেলা ভলিবল ও বাস্কেটবল সংস্থা, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও আরও কিছু ছোটবড় সংস্থা রয়েছে বর্ধমানের খেলাধুলোর উন্নয়নে যাদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। এদের মধ্যে নাম করতে হয় আলমগঞ্জের চিলড্রেন্স কালচারাল সেন্টার ও টেবিল টেনিস সংস্থার কথা।

বর্ধমানের খেলাধুলোর যে ঐতিহ্য ও সম্ভাবনা ছিল তাতে বর্ধমান কলকাতার প্রতিস্পর্ধি হয়ে উঠতে পারত। কিন্তু তা হয়নি। খেলাধুলোর জগতে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। খেলাধুলোয় আগ্রহী ছেলেমেয়ের সংখ্যা কমে গেছে। খেলার মানও বাড়ছে না। এর পেছনে নানা রকম স্থানীয় কারণ আছে। একই সঙ্গে আছে কিছু সর্বব্যাপী কারণ। খেলাধুলোর জগতের সঙ্গে যুক্ত এমন অনেকের অভিমত গটআপ খেলা পশ্চিমবঙ্গের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে। ছেলেরা পরিশ্রম বিমুখ হয়ে পড়েছে। চাকরী পেলেই খেলার ইচ্ছা কমে যাচ্ছে। খেলোয়াড়ের সংখ্যা কমে যাওয়ায় উন্নতমানের খেলোয়াড় পাওয়া যাচ্ছে না। যারা আসছে তাদের পরিশ্রম করার ক্ষমতা অতি সাধারণ। কিন্তু এখন ছেলেরা স্কিলটা তাড়াতাড়ি শিখে ফেলছে - টিভির দৌলতেই হোক বা কোচিং ক্যাম্পের সুযোগ বৃদ্ধির জন্যেই হোক। বর্তমানে সংবাদ মাধ্যমগুলি ক্রিকেটের প্রচার বেশী চালানোর ফলে অন্যান্য খেলাগুলি আকর্ষণ হারাচ্ছে। এই যুগের তরুণ তরুণীরা ভালো খেলোয়াড় তৈরী হচ্ছেননা, টি ভি'র দৌলতে তারা ভালো দর্শক তৈরী হচ্ছেন। সর্বোপরি খেলাকে জীবিকা

করে নেবার সুযোগ খুব কম তাই অভিভাবকরা খেলাধুলোয় উৎসাহ দিচ্ছেন না। বর্ধমানও এর ব্যতিক্রম নয়।

বর্ধমান কলকাতা হয়ে উঠতে না পারার আর একটি ব্যাখ্যা এরকম বিজয়চাঁদ ক্রীড়ানুরাগী ছিলেন, উদয়চাঁদ নিজে খেলতেন এমনকি বর্ধমানের খেলাধুলোর মাঠ রাধারানী স্টেডিয়াম বা বিশ্ববিদ্যালয়ের মোহনবাগান মাঠ তাঁদের দান, বা জেলা ক্রীড়া সংস্থাও তাঁদের উদ্যোগে গড়ে উঠলেও তাঁরা সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন। জেলার ক্রীড়া পরিকাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁদের উদাসীনতা ছিল তাই আজ বর্ধমানের ঐতিহ্য ও অনেক সম্ভাবনা থাকলেও আর পাঁচটা জেলার মতই এই জেলাও সাধারণের দলে মিশে গেছে। খেলে টাকা পাওয়া যায় অথবা খেলে চাকরী পাওয়া যায় এই ধারণাই এখন জায়গা করে নিয়েছে। খেলাধুলো শরীরচর্চার অঙ্গ এই ভাবনা এখন গৌণ হয়ে গেছে। খেলার মাঠে নিজেকে উজার করে দেবার কথা না ভেবেই পেশাদার হতে চাইছেন অনেকে। অতীত ও বর্তমানের মধ্যে পরিবেশগত ফারাক যাই থাকুক যাদবেন্দ্র সামন্ত, রমেশ দাশ, বিষ্ণুদাস তেওয়ারী, মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জী, অমর্ত্য ঘোষ, দেবাশিষ কোনার, অরিন্দম বটব্যাল, গণেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীরা মাঝে মাঝেই বর্ধমানের মুখ উজ্জ্বল করেছেন নিজস্ব ক্ষমতা ইচ্ছাশক্তির বলে। অধিকাংশ অভিভাবকরা এখন চাইছেন ছেলেমেয়ে শুধু লেখাপড়া করুক। খেলার মাঠ তাঁদের কাছে অচ্ছ্যুৎ। তবুও খেলাধুলোর দুর্নিবার আকর্ষণে আজও মুখরিত হয় বর্ধমানের শ্রীঅরবিন্দ স্টেডিয়াম, রাধারানী স্টেডিয়াম, স্পন্দন স্টেডিয়াম, কল্পতরু মাঠ অথবা টাউন স্কুল, মিউনিসিপ্যাল স্কুলের মাঠ। সমাজ, পরিবার ও তারুণ্যের নানাবিধ টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়েই এগিয়ে যাবে ক্রীড়া চর্চা। স্থান করে নেবে নতুন শতাব্দীতে কিছু নতুন মুখ।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ
রথীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, দীপ্তিকুমার ঘোষ, রাখহরি সরকার, বারীণ ব্যানার্জী, গণেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী।

বর্ধমান গ্রামনাম

শ্যামাপ্রসাদ কুণ্ডু

।। এক ।।

মানুষ শুধুই বন কেটে বসতি স্থাপন করেনি, খাল বিল নদীনালা ছেঁচে, জলাজমি বুজিয়ে নদীর তীরে তীরে জেগে ওঠা চরভূমিতে, পাহাড় ভেঙ্গে সম্ভব অসম্ভব জায়গায় ঘরসংসার পেতেছে, থিতু হয়েছে। তারপর সে সেই জায়গাটির একটা নাম রেখেছে। নিজের স্বাতন্ত্র বোঝানোর জন্য। এভাবেই একে একে গ্রামনামের সৃষ্টি হয়েছে। এই যে নাম রাখলো, সে কি ভেবেচিন্তে রাখলো ? আমাদের সবকিছুরই একটা অর্থ খোঁজার নাছোড়বান্দা অভ্যাস। যেমন ব্যক্তিবিশেষের তেমনই গ্রামবিশেষের নামের অর্থ কি আমাদের জানতে ইচ্ছে হয়। কিছু সহজ সরল নাম আছে ঠাকুর-দেবতা এবং প্রকৃতি সম্বন্ধিত গাছগাছালি, পশুপাখীর নাম দিয়ে। কিছু জাতিবাচক নাম আছে। এ সব নামের অর্থ বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় না। কিন্তু কিছু নামের আদৌ কোন অর্থ হয় না। এমন হতে পারে যখন ঐ বিশেষ গ্রামটির পত্তন হয়েছিল তখন হয়তো তার একটা অর্থবোধক নাম ছিল, পরে কালের অমোঘ প্রভাবে তা বদলে গিয়ে অর্থহীন ধ্বনিমাত্রে পরিণত হয়েছে। একমাত্র ভাষাতাত্ত্বিকরাই অভিধান ঘেঁটে ঘেঁটে, নানারকম দুর্বোধ্য লিপির পাঠোদ্ধার করে সে সব নামের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ উদ্ধার করতে পারেন। বেলতলায় বেলগাছ খুঁজে পাওয়া যাবেই অথবা কদমতলায় বাঁশি হাতে কেষ্টঠাকুর দাঁড়িয়ে আছেনই এমন নাও হতে পারে।

অথচ গ্রামনামগুলির অর্থ এবং ইতিহাস যতদিন না উদ্ধার করা যাচ্ছে কোন নির্দিষ্ট ভূগোলের আর্থসামাজিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস অসম্পূর্ণই থেকে যাবে। এই কাজ শ্রম ও সময়সাধ্য। কিন্তু জরুরী। বর্ধমান একটি প্রাচীন জনপদ। এই জেলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার জন্য গ্রামনামগুলির সঠিক অর্থ ও ইতিহাস খুঁজে বার করা সহজসাধ্য নয়। অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় জাতিসমূহ একদা এই জনপদে বিচরণ করত, আর্যসভ্যতার অনুপ্রবেশ ঘটেছে অনেক দেরীতে। অনেক গ্রামনামের মধ্যে অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষার লুপ্ত-স্মৃতির আভাস রয়ে গেছে। মুসলমান যুগে কিছু আরবী ও ফারসী নামও গ্রামনামের অঙ্গীভূত হয়ে দিব্যি চলে আসছে। তারও আগে বর্ধমানের কোন কোন অঞ্চল যে শিবঠাকুরের আপন দেশ ছিল অনেক গ্রামনামে তা স্পষ্ট। অনার্য দেবদেবী বিশেষতঃ মনসা, চণ্ডী, শিব ও ধর্মঠাকুরের নামে অসংখ্য গ্রামের নাম পাচ্ছি আমরা। চৈতন্যদেব প্রবর্ত্তিত সহজিয়া বৈষ্ণবধর্ম এক সময়ে এই জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানুষকে ভক্তিরসে উদ্বেল করে তুলেছিল। মঙ্গলকোট থেকে কালনা পর্যন্ত দীর্ঘ গঙ্গাতীরবর্তী অঞ্চলের গ্রামগুলির শরীরে এবং নামে এই পরিচয় তিলক-চন্দনের মতই স্পষ্ট হয়েছে। অনেকানেক কিংবদন্তী, নানা কথা ও কাহিনী এবং ইতিহাসের কালপর্বে ঘটে যাওয়া ঘটনা এবং দুর্ঘটনার সাক্ষ্য বহন করছে কিছু গ্রামনাম। বর্তমান নিবন্ধে আমরা এই বর্ধমান জেলার কিছু বাছাই করা গ্রামনামের অর্থ উদ্ধারের চেষ্টা কোরব।

।। দুই ।।

'দিসেরগড়' যে আসলে 'ডিহি' শেরগড় বা 'উখড়া' যে উট থেকে এসেছে শব্দতাত্ত্বিক ধরিয়ে না দিলে আমরা তা বুঝব কেমন করে? এই রকম কিছু গ্রামের নাম এবং বন্ধনীর মধ্যে তার অর্থ দেওয়া হোল।

আম্বুয়া (অম্বিকা বা আম্র), বড়া (বট), শর (নল), কাটোয়া (কন্টক অথবা একাধিক নদীবেষ্টিত দুর্গমস্থান), খেতিয়া (ক্ষেত্র), নিমো (নিম্ব বা নিম), পলাশী (পলাশ), সুপুর (সুপুরি), আতুষা (তুষহীন), উকতা (উৎক্ষিপ্ত), উজনা (উদ্যান), কালনা (কল্যাণ), চুপি (নিঃশব্দ), পোষলা(শস্যশালী), বড়োয়াঁ (বর্ধমান), বেগুনিয়া (বেগুনচাষের উপযুক্ত), বোড়ো (বানে ডুবে যায়), কাইতি (কায়স্থ), বামনে (ব্রাহ্মণ), ভিটা (পৈতৃক আবাসস্থল), মাড়ো(মণ্ডপ), কোপা (শক্তমাটি), কাঁদড়া (দুদিক বন্ধ নদী বা কাঁদড়)। পারাজ (ফারসী অভ্যাগত অথবা উচ্চপদাধিকারীকে দেওয়া উপহার), মেমারী (আরবী মামুরি, মানে সমৃদ্ধ কৃষি স্থান), রায়না (আরবী রানা - নিরুদ্বেগ স্থান), কোলকোল (হুঁকো, আরবি কুলকুলা সম্ভবত), দমদমা (যেখানে কামান ছোড়ার শব্দ হয়?), পলাশন (পলাশবন), বেলুন (বিম্ববন), পিপলন (পিপলবন), মন্দারণ (মান্দারাবন), হিজলনা (হিজ্জল বনক), কুড়মুন (বুনোস্থান), আস্থাই (অশ্বত্থ), বোঁয়াই(বনদুর্গা), সগড়াই(রথারূঢ়াদেবী), চেচাঁই (তেঁতুল), বহুলাড়া(বকুল + আড়া), মৌরী (মধুক + আড়ি), বেলেড়া(বিল্ব + আড়া), কইতাড়া (কপিত্থ + আড়া), খাগড়া (শর + আড়া) অনুরূপ বামুনাড়া, জামার, তৈলাড়া, পালাড় (পল্লব), কাঁকসা (কংক - এক রকমের বক), ধামাস (ধর্ম + আবাস), রূপসা (রূপের বাসা), ধ্রুপসা(ধ্রুব + বাসা), ইন্দাস (ইন্দ্র + আবাস), দেয়াস (দেব + আবাস)।

কর অর্থে খাজনা। আমরা পাচ্ছি মানকর, বরাকর। খণ্ড অর্থে টুকরো আবার চাপ ক্ষীরও। তাঁতখণ্ড, শ্রীখণ্ড, চোৎখণ্ড পাচ্ছি। আবার খণ্ডঘোষ। কোষ্ঠ অর্থে পাকাঘর। কোটশিমুল, মঙ্গলকোট, শিলুট (শিলা + কোষ্ঠ), 'গড়' হল দুর্গম বা বেড়াঘেরা স্থান। পানাগড়, অমরারগড়, আমগড়িয়া, কামারগড়ে ; এইসব নাম পাওয়া যাচ্ছে।

'জৌগ্রাম' যে আসলে 'যৌতুকগ্রাম', ক্ষীরগাঁ যে 'ক্ষীর গ্রাম', 'কেতুগ্রাম' - কেতুকাদেবীর গ্রাম, 'জারগা হল যষ্টি + গ্রাম এসব জানতে ব্যাকরণের সন্ধি সমাসের সাহায্য লাগে।

টিকর বা টিকরি হ'ল চারিদিকে নীচুভূমির মধ্যে উচ্চ জায়গা। যেমন সরাইটিকর, নিমটিকুরি, বালটিকুরি, টিকরহাট। ডাঙ্গা তো উঁচু জমি। দাউকডাঙ্গা, বালিডাঙ্গা। ডাল বা ডালা এমন স্থান যেখানে অনেক গাছ আছে কিন্তু তা বন নয়। যেমন অণ্ডাল (অবনী গাছের ডাল), একডালি, সিমডাল প্রভৃতি। 'ডিহি' ফারসী 'দিহ' থেকে মানে সহর, শাসন কর্তার বাসস্থান, গৌরাঙ্গডি, রণডিহা, আলডিহি।

তাড় বা তাড়া হ'ল তাড়গাছ যেমন জামতাড়া, কেওতাড়া (কেতক গাছ), গনতার (গন মানে পথ)। দ, দা, দই একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন সুবলদহ (শ্বেতোৎপল + দহ) বেলদা

(বিল্ব + দহ)। দীঘি অর্থে বড় পুকুর। মলানদীঘি (মৃণাল + দীঘি), চকদীঘি (চারকোণা দীঘি), দেওয়ান দীঘি, বুজরুকদীঘি (ফারসী বুজুর্গ বা জ্ঞানী ব্যক্তি)।

।। তিন ।।

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেছেন, 'পশ্চিম বাংলায় আমার দেখা প্রায় আড়াই হাজার গ্রামে এককভাবে প্রয়াস চালিয়ে দেখেছি অনেক গ্রামনাম এখন এমনই অর্থহীন যে তাদের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ের চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র। বহুকাল পূর্বে সে সব গ্রামের নামের অর্থ হয়তো খুঁজে পাওয়া যেতে পারত। কিন্তু এখন সে আশা দূরাশা মাত্র'। এই আক্ষেপ সত্ত্বেও তিনি দীর্ঘকাল ধরে বিপুল পরিশ্রম করে অনুসন্ধান ও গবেষণার পর কিছু সাধারণ সূত্র আমাদের জানিয়েছেন। গ্রামনামের প্রথমে বা শেষে যুক্ত হয়ে এই শব্দগুলি গ্রামনামগুলির অর্থ বুঝতে আমাদের সাহায্য করে। এখানে বর্ধমান জেলার ক্ষেত্রে প্রযুক্ত সূত্রগুলি আমরা উল্লেখ করবো এবং কিছু গ্রামকে এভাবে আমরা চিনে নেব।

আইমা - মুসলমান সাধুসন্তদের ভরণ-পোষণ, ধর্মপ্রচার ও দান-দাতব্যের জন্য দেয় নিষ্কর জমি।

উদাহরণ ঃ আইমাখেগের (খণ্ডঘোষ)। সোনা আইমা।

আবাদ - কর ধার্য করে চলমান সৈন্যবাহিনীর রসদ যোগাড় করা হোত। যেমন - জগদাবাদ।

'আবাস 'এর উল্লেখ আগেই করা হয়েছে।

ক্ষুদ্র - খোর্দ - অর্থাৎ ছোট গ্রামের খণ্ড সৃষ্টি। খোর্দপলাশী (জামালপুর) 'গড়' এর উল্লেখ আগে করা হয়েছে। 'চক' - মৌজা থেকে বিচ্ছিন্ন নিষ্কর জমি। বর্ধমানে অসংখ্য এ রকম চক আছে। যেমন চক নিয়াজি, চক সুজাপুর, চক খানজাদি (এখন চক্ষণজাদি)। 'চর' তো নদীর চর। ডহর বা 'দহ' - যে জমি বর্ষায় ডুবে যায়। যেমন - 'দামদহ' (সালানপুর), (জোত জমিদারের অধীনস্থ জমি)। যেমন - 'জোতশ্রীরাম' (জামালপুর) ডাঙ্গা - উঁচু আবাদযোগ্য জমি। 'তুরুকডাঙ্গা', 'জয়রামভাঙ্গা', 'মধুডাঙ্গা'। ডি। ডিহা। ডিহির উদাহরণ আগেই দেওয়া হয়েছে। দিয়ার বা দিয়ারা - পলিজমি বা পাড়ভূমি যেমন দিয়ারা। বাজে-বাজে জমি, যা খাজনা ফেলার যোগ্য নয়। যেমন বাজেপ্রতাপপুর।

বেড়া বেষ্টনী বা বেড়া সীমানা - জগৎবেড়, গোপালবেড়া। 'হাট' বা 'বাজার' এবং গঞ্জ এর অসংখ্য উদাহরণ - নবাবহাট, কাজির হাট, উজির হাট, হাট শিমূল, বোরহাট, নূতনগঞ্জ, রাণীগঞ্জ, দলুইবাজার।

নগর এবং পুর যুক্ত গ্রামনামগুলি বোধহয় বোঝাতে চাইছে কোনদিন এই সব স্থানগুলি নগরের বা জমিদারের বসতবাটীর অংশ ছিল। অথবা 'পুর' অর্থে বসতি। উদাহরণ নিষ্প্রয়োজন। শাই অর্থাৎ শাহী বা নবাবী। বর্ধমানে বনসাই নামক গ্রাম আছে।

আড় বা আড়ি অর্থে উঁচু ডাঙ্গা জমি। যেমন - বাঘার, জামার, পালাড়, ভাতাড়।

আসন - নিবাস বা বসতি যেমন বাঘাসন।

কাঁদর - খাল। যেমন কান্দরসোনা, কাঁদড়া। কুড়ি। কুড়, কুড়া। কুঁড়ি - স্তুপ, গোবরগাদা - সোনাকুর, 'শুকুর' কোনা - অংশ। কিশোরকোনা।

খণ্ড - টুকরো, জমাট ক্ষীর। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। খোলা - ক্ষেত। 'কীর্তনখোলা'।

কুলা - একটি লাঙ্গলে চাষ করা যায় এমন পরিমাণ জমি। যেমন বানকোলা, আংকোলা,

গাছা/গাছি - কুঁড় শব্দের রূপান্তর / যেমন - বামুনগাছি/সাতগাছিয়া/পাঁচগেছিয়া।

জোর - যুগল অর্থে। যেমন - 'কেলে জোড়া',

ঝোরা - ঝরণা / 'বালিঝুরি'

টোলা - তলা

ডহর - গর্ত বা খাল।

ডাঙ্গা - ডাঙ্গাজমি।

ডি, ডিহা , ডিহি - দ্বীপ বা বসতি। 'মাঝলাডি' , 'মালাডি' , 'শ্যামডি

ডোবা - ছোট জলাশয়। 'জামডোবা'।

বাটি - দেবতার স্থান। 'শ্যামবাটী'।

দীঘি - পুষ্করিণী 'মলানদীঘি'।

বাঁধ - বাঁধা - জল আটকানোর বাঁধ।

ভিটা - বাস্তুজমি। 'ভৈটা'

শাল/শালা/শালী - অধিষ্ঠান ক্ষেত্র (কোন দেবতার) যেমন কাষ্ঠশালী। 'দেবসালা'।

সোল - জনবসতি বা প্রাপ্তিস্থান/আসানসোল (আসন গাছ যেখানে পাওয়া যায়), মুর্গাসোল।

হাট বা হাটী সাধারণ অর্থেই ব্যবহৃত হয়।

সায়র মানে দীঘি।

।। চার ।।

এই পর্যায়ে কিছু বিচিত্র গ্রামের নাম উল্লেখ করা যাক ।

সুললিত গ্রামনাম ঃ ফুলঝুরি (কাঁকসা), মন্দ্রা, ময়ূর (খণ্ডঘোষ), নিশিরাগ (মেমারী), পারাজ (গলসী), মাণিকহার (কালনা), শীলা (কাটোয়া), শিউলি, অকালপৌষ।

ধ্বন্যাত্মক ঃ গনগনিয়া (মন্তেশ্বর), চলবলপুর, বুদবুদ, দমদমা, কুরকুবা, কোলকোল, ইছাবাছা, ভিনভিনা। দেশজ শব্দঘটিত - পানিফলা (বারাবনী) ভাতার, মাহিন্দার, বেশভূষা সম্বন্ধিত ঃ খরমপুর।

খাদ্যদ্রব্য সম্বন্ধিত গ্রামনাম ঃ ডালপুর, অম্বলগ্রাম, ক্ষীরগ্রাম, ঝাঁঝরা।

সংখ্যাবাচক গ্রামনাম ঃ এগারো (রানীগঞ্জ), সত্তর (জামুরিয়া), আটাশপুর (মন্তেশ্বর)।

পৌরাণিক উৎসব সম্পর্কিত ঃ কুর্মগঙ্গা, কেতুগ্রাম, কৈলাশপুর।

ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থানের নামানুসারে ঃ উদয়পুর, কানপুর, বিক্রমপুর, শিয়ালকোট, সাহেবগঞ্জ।

কিংবদন্তী সম্পর্কিত ঃ জামাইপোতা, সাধুমারা।

প্রশংসাবাচক ঃ পূন্যগ্রাম

বিদ্রূপাত্মক নাম ঃ আতুষি, আহ্লাদিপুর, প্রেমগঞ্জ,

কৌতুকবাচক নাম ঃ আড্ডা, তামাসাপুর, ভোজপুর।

নিন্দাবাচক নাম ঃ পাষণ্ডা, সুরা।

নামবাচক ঃ হাট গোবিন্দপুর, কানী বামনী, বামুনদি।

আত্মীয়তাসূচক ঃ নন্দাই, জামাইপোতা।

জাতিসংক্রান্ত ঃ কেওতাড়া (কেওট - কৈবর্ত), ব্রাহ্মণ, ঘোষ।

প্রাণীবাচক ঃ কেউটে, মশাগ্রাম, পানডুবি, বেঙা, ফড়িংগাছি, কৈগ্রাম, বাঘাসন, কৈচর।

ঋতু সংক্রান্ত ঃ জাড়গ্রাম (শীত), বাদলা, চৈতপুর, উষা, নিশিরাগ, অকালপৌষ।

।। পাঁচ ।।

প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই কোনো না কোনো অধিষ্ঠাত্রী দেবী বা দেবতার বাস। এই সব দেবদেবীর নামে গ্রামের নামকরণ তাই অত্যন্ত স্বাভাবিক। বর্ধমান জেলায় যে সব দেবদেবী

সম্বন্ধীয় গ্রামনাম আছে তার মধ্যে রাম নামের গ্রামের সংখ্যা ৫৮ টি। এর মধ্যে রামপুর, শ্রীরামপুর, রামচন্দ্রপুর, রামডি সীতারাম, বলরাম - সব রকমের 'রাম' যুক্ত নাম আছে। কৃষ্ণের একশ আটটি নাম। কোথাও তিনি কৃষ্ণ, কোথাও শ্যাম, কোথাও শ্যামসুন্দর, কোথাও বা তিনি নবঘন আবার কোথাও মধুসূদন। কৃষ্ণনাম সম্পর্কিত গ্রামনাম ৯৬ টি। এ ছাড়া শুধু শ্যাম নামে ১৬ টি। রাধা যুক্ত গ্রাম নাম ১২ টি।

অন্যান্য দেবতার নামে গ্রামনাম -১৮ টি। এরমধ্যে কিছু নাম ব্যক্তি বিশেষেরও হতে পারে। সরাসরি 'ভগবানপুর', 'শিবপুর', বিষ্ণুপুর, 'ইন্দ্রপুর', 'ঈশ্বরপুর' নামের গ্রামনাম পাওয়া যাচ্ছে বর্ধমানে। এতো গেল দেবতাদের কথা। দেবীদের নামযুক্ত গ্রামের সংখ্যা ৪৭ টি। এরমধ্যে কিছু পৌরাণিক চরিত্র রয়েছেন যেমন - বহুলা, জানকী, সীতাহাটি। বাকিগুলি দুর্গা, চণ্ডী, লক্ষ্মীদের প্রভাব। সরস্বতীগঞ্জ একটি।

কিছু গ্রামনামের অনুষঙ্গে ধর্মস্থান, পূজা-আরতি, দেবদেবী, স্থান মাহাত্ম্য লক্ষণীয়। এরকম গ্রামনামের সংখ্যা ৫৪ টি। 'হরভঙ্গ' গ্রামে কি হরধনু ভঙ্গ করা হয়েছিল? যদি তাই হয় তাহলে 'রতিবাটি' র অর্থ কি? 'আরতি' চমৎকার একটি নাম। 'ধর্মডাঙ্গা'-য় ধার্মিক লোকেদের বাস যদি হয় 'গোপীপুরে' কি গোপিনীদের বাস ছিল একদা ? 'পাঁচ দেউলি', 'নিকুঞ্জপুর', 'বরণডালা' চমৎকার সব নাম। কিন্তু 'দেবপুর' কেন? 'বৃন্দাবনী' কি বৃন্দাবনের অনুষঙ্গে? 'দয়ালপুর', 'ধরমপুর' খুব সহজসুন্দর নাম। কারা রেখেছিল এই সব নাম? জানতে ইচ্ছে করে।

মুসলিম গ্রামনাম ২০৭ টি। এরমধ্যে মাত্র ৩৩টি চিত্তরঞ্জন থেকে গলসী পর্যন্ত। বাকি ১৭৪ টি কৃষি অঞ্চলে। এর মধ্যে কিছু গ্রামের নাম শাসন কর্তার নাম অনুসারে, কিছু আউলিয়াদের নামে, বাদবাকি ধর্মীয় অনুষঙ্গযুক্ত।

।। ছয় ।।

এবার কিছু বিচিত্র গ্রামনামের উল্লেখ করা যাক। 'শাকাটি', 'সাধপুখরিয়া' (কার সাধ?), 'পোতা নাই (কি পোতা নাই?), 'মধুবন' (এখন জনশূন্য), নন্দাই (কার সম্পর্কে ?), কোয়েল ডাঙ্গা (সে সব কোয়েল কোথায় গেছে?), ঝারুবাটি (কে কাকে ঝারু মেরেছিল?) হাঁসহাটি -তে খুব হাঁস পাওয়া যেত ? 'দাতারপুর' (গ্রামের সবাই দাতা ছিল?), 'বৃদ্ধপাড়া'তে শুধুই বৃদ্ধদের বাস ছিল? এই গ্রামগুলি সব কালনা থানায়। কিন্তু 'ভেরুয়া' নামটি কার পছন্দ হয়েছিল?

পূর্বস্থলী থানায় এই বিচিত্র গ্রামনাম পাওয়া যাচ্ছে। 'সাতপোতা', 'সিঞ্জুলী'। 'পাঠানগ্রাম'তো পাঠানদের গ্রাম ছিল, কিন্তু 'পরাণপুর' - এ কারা থাকত ? 'নগদান ঘাটে' নগদ পয়সায় নৌকা পেরোতে হ'ত কিন্তু 'মেড়তলা'য় ? মেড় মানে তো ভেড়া। 'লোহাচুর' শক্তিশালী লোকেদের গ্রাম, কিন্তু 'হাপানীয়া'? 'কচুয়া'? আর 'ডাম্পাল' শব্দটির মানে কি?

মন্তেশ্বর থানায় 'ফুলগ্রাম', 'পিয়াগ্রাম', 'মথুরা', 'বরুণা', 'বরণডালা'র মত সুন্দর গ্রামনাম পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু 'ঘরপুর', 'হুড়কোডাঙ্গা' ?

কাটোয়া থানায় 'সুরগ্রাম', 'সাগরপুর' (জনশূন্য), 'ঘুমুরিয়া', 'মালঞ্চ , খুব সুললিত নাম। কিন্তু পাশাপাশি রয়েছে 'মেড়া', 'কাটারি', 'গাফুলিয়া', 'ঘোড়ানাশ', 'চরচাটাইপুর', এবং 'বীরবেগুন'। 'বিকিহাট' - এ বিক্রিবাটা হয় কিন্তু 'বাঘাসন' এবং 'বাঘটোনা'য় ?

কেতুগ্রাম থানায় সুন্দর গ্রামনাম 'উজলপুর', 'শঙ্খাই', 'মৌগ্রাম', 'মৌরী', 'দধিয়া'। 'বামুনদি', 'খাতুনদি'ও ঠিক আছে। কিন্তু 'চিতাহাটি' ? 'অম্বলগ্রাম', গুড়পাড়া', 'কচুটিয়া' এবং 'বেগুনকোলা', 'পানপাড়া' 'তালারি' যাহোক তাহোক নাম।

মঙ্গলকোটে একটা অদ্ভুত নাম পাচ্ছি - উমাতাতারপুর। এমন হতে পারে দুটো গ্রাম যুক্ত হয়ে এই নাম হয়েছে। শ্রুতিসুখকর গ্রামনাম - 'মুরুলিয়া', 'ইছাবরগ্রাম', 'দেউলিয়া', 'চন্দ্রা' 'চক পরাগ', 'বনকাপাসী' এবং 'সুখপুখরিয়া'। কিন্তু পাশাপাশি 'ঠেঙাপাড়া', 'মশারু', 'ভালুগ্রাম' ভয় পাইয়ে দেয় না কি ? আচ্ছা 'জলপড়া' গ্রামের নাম কে রেখেছিল ?

ভাতার থানায় 'ঊষা' অসাধারণ নাম। 'মুরাতিপুর', 'বসুধা', 'বসতপুর' সুন্দর। কিন্তু 'ভাতার', 'ধাঁধলসা', 'কাটারি' ? 'ছাতিনি' মজার নাম।

বর্ধমান থানায় 'মাটিয়াল', 'মাণিকহাটি', 'সিমড[illegible]' চমৎকার নাম। এখানে একটা 'শিয়ালদহ'ও আছে। কিন্তু 'চামারদীঘি', 'নেড়োদীঘি', 'বামনসিরাজপুর' ? মেমারী থানার 'উন্টে', 'মেরুয়া', 'মহিষপুর', 'কেন্না', 'নান্না', 'কাটুয়া', 'মাকড়া', 'ভণ্ডুল' এইসব নামের পাশাপাশি 'ইচ্ছাপুর', 'ইছাবাছা', 'নিঃশঙ্ক', 'দিলালপুর', 'বংশীপুর' এবং 'আশাপুর' পাওয়া যাচ্ছে। এখানে একদা 'জোয়ানপুর' নামে গ্রাম ছিল। 'কিষ্কিন্ধ্যা' শুধু লঙ্কায় নয় মেমারীতেও রয়েছে। 'গোরাপুর' - এ সাহেবরা থাকত কোনদিন ?

জামালপুর থানায় 'সাদিপুর', 'রূপপুর', 'শুখপুর' পাওয়া যাচ্ছে। 'কুলীনগ্রাম', 'উজিরপুর'ও না হয় বোঝা গেল। কিন্তু 'ধাপধাড়া' এবং 'কেলিরি' ? এখানে যেমন বশিষ্ঠপুর আছে তেমনি 'বাগ কালাপাহাড়' রয়েছে।

রায়না থানায় 'রূপসোনা', 'রূপসারা', 'পসরা', 'সিঙ্গার', 'মণিয়ারী', 'মন্দারপুর', 'বন্তির', 'আহ্লাদিপুর', 'আনগুনা' প্রভৃতি সুন্দর গ্রামনামের পাশাপাশি এই নামগুলি লক্ষ্য করুন ঃ 'মেড়াল', 'মাদানগর', 'ক্ষেমটা', 'জামাইপোতা'। শুনতে মোটেই ভালো না উচ্চারণ করতেও লজ্জা লাগে।

খণ্ডঘোষ থানায় শ্রুতিসুখকর গ্রামনাম 'রূপসা', 'মৌর', 'পুরিয়া' (পুরিয়া ?), 'অরিণ'। কিন্তু 'কেলেটি', 'উলকুণ্ডা', 'বোনাই', 'বড়াশিয়ালি' শ্রুতিমধুর নয়। 'কুমিরকোলা' দামোদর নদের তীরবর্তী গ্রাম। এখানে কি কুমিরেরা রোদ পোয়াত ?

গলসী থানায় 'পুরাঙ্গন', 'ঘাঘরা, 'দয়ালপুর', 'বনদুতিয়া', 'আতুষি' চমৎকার কাব্যিক নাম। কিন্তু পাশাপাশি 'কুরকুবা', 'কুতরুকিং', 'ডালপুর', 'তেঁতুলমুড়ি','ইটারু' রয়েছে; তেঁতুল মেখে কি মুড়ি খাওয়া সম্ভব?

আউসগ্রাম থানায় সুন্দর সুন্দর গ্রামনাম পাচ্ছি আমরা। 'রাঙাখিলা', 'পুবার', 'প্রেমগঞ্জ', 'মৌক্ষীরা', 'কুঞ্জনগর', 'বনকুল', 'বাবুইসোল', 'বনকাড়া', 'আলুটিয়া', 'আকুলিয়া', 'আদুরিয়া'। আবার 'পিচকুড়ি', 'কুড়াল', 'কেলেটি','খাটনগর', 'ডোমবন্দী', 'ছোড়া', 'ভোতা', 'বেরেন্দা' নামও পাচ্ছি।

বুদবুদ থানায় 'শুখডাল', 'সোনাই', 'চন্দ্রা', 'সন্ধিপুর', 'মৌগ্রাম' চমৎকার গ্রামনাম। কিন্তু 'খাণ্ডারী' বা 'কাকড়া' শ্রুতিকটু।

কাঁকসা থানার 'তালবাহারী', 'সাতকাহানিয়া', 'রাজকুসুম', 'পিত্তরিগঞ্জ', 'ফুলঝুরি', 'পাঁচপুখরিয়া', 'নূতনগ্রাম', 'মণিকাড়া', 'মহাল চাঁদনী', 'গাঙবিল', 'বনাটি', 'আনন্দপুর' চমৎকার নাম। 'রূপগঞ্জ' এখানেও আছে, আছে 'কাজলাডিহি' এবং 'ঠাকুরাণী বাজার'।

দুর্গাপুরে পাচ্ছি 'পরাণগঞ্জ', 'বনসোল' এবং 'ধাবনী'। ফরিদপুরে 'রাঙামাটিয়া', 'পান শিউলী', 'নাচন', 'মান্দারবানী', 'ভাচুরিয়া' এবং 'বিলপাহাড়ী'। কি চমৎকার কাব্য সুষমামণ্ডিত নাম। 'আরতি' ও আছে, আছে 'ইছাপুর'। পাশাপাশি 'যাবুনা', 'জোয়ালডাঙ্গা' এবং 'ভালুকা' একেবারেই গ্রাম্য।

অণ্ডালে 'পলাশবন' আছে 'দিগনালা' আছে। পাশাপাশি 'গাইধোবা' এবং 'ধাণ্ডাদিহি' ও।

রাণীগঞ্জে 'সোনাচোরা', 'হরভঙ্গ' এবং 'চলবলপুর'। জামুরিয়াতে কাব্যিক নাম 'তপসী', 'সেমাল্য', 'মনপুর' এবং আহা কি চমৎকার! 'বনালি'। এখানে একটা 'সার্থকপুর' ও আছে আবার 'ভাতেরদহ' ও 'আন্ধাইরা' এবং 'বাঘডিহা'। বরাবনীতে 'পারুলবাড়িয়া', 'খোশনগর', 'বিজরী', ভাসকাজুরী' এবং 'দোমহানী'র সন্ধান পাচ্ছি। আবার 'রসুনপুর' ও 'পানিফলা'ও এখানে।

আসানসোলে 'সাতুপুখরিয়া' এবং 'পলাশডিহা' আমাদের 'নিশ্চিন্ত' করে। কিন্তু 'মরিচকাটা' এবং 'বরতারিয়া'? হীরাপুরের 'পাটমোহানা', 'ছোট দিগরী' এবং 'বড়দিগরী' না হয় 'আলুথিয়া' হ'ল কিন্তু 'সাস্তা'?

কুলটির 'গাঙ্গুটিয়া' এবং 'দিগরী'ও 'আসানবনি' শুনতে ভালো। তবে 'ইদকাটা', 'সাবানপুর' এবং 'কান্দুয়া' ভালো শোনায় কি ?

সালানপুরের কিছু গ্রামনাম চমৎকার। যেমন, 'সাধনা', 'রাঙামাটি', ' মাঝলাদি', 'কুসুমকনালী', 'বাথানবাড়ি', 'আঙ্গারিয়া', 'আন্নাদি' এবং 'আমঝরিয়া'। 'ধুন্দাবাজ', 'আছড়া' ভালো শোনায় না। আর গ্রামের নাম 'পাতাল' কেন? চিত্তরঞ্জন কি 'অন্নদহি'র

জন্য বিখ্যাত ? 'সুন্দর পাহাড়' কিন্তু চমৎকার নাম।

।। সাত ।।

এবার আমরা কিছু গ্রামের নাম নিয়ে আলোচনা করবো যে সব নামের ঐতিহাসিক তাৎপর্য বা অন্য কোন বৈশিষ্ট্য আছে।

কেতুগ্রাম থানায় 'উদ্ধারণপুর' গ্রামে উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের সমাধি আছে। ইনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন। অনেকে বলেন চাঁদ সদাগরেব 'উদ্দানপুর' কালক্রমে 'উদ্ধারণপুর' হয়েছে। 'বিল্লেশ্বর' গ্রামে বিল্লেশ্বর শিবের প্রাচীন মন্দির আছে। 'শ্রীগ্রামে' ধর্মরাজপূজা, গাজন ও চরকের মেলা বসে।

কাটোয়া থানার 'শ্রীখণ্ড' গ্রামে খণ্ডেশ্বরী দেবীর (কালী) মন্দির আছে। পরে বৈষ্ণব তীর্থ -এখানে শ্রী চৈতন্যের দারুময় মূর্তি স্থাপিত। 'বাঁদরা' - বন্দর থেকে বাঁদরা - অজয় নদীর বন্দর ছিল। গ্রামের নাম 'রাধাকৃষ্ণপুর' কিন্তু মাতা খাদিম বিবির তিরোধান উৎসব উপলক্ষে ধুমধাম করে মেলা ও উৎসব হয়। 'গোপালপুর' গ্রাম পাঁচালীকার দাশুরায়ের বংশের জনৈক গোপাল চন্দ্র রায়ের নামের স্মৃতি বহন করছে। 'আলিমপুর' মুসলমান নাম কিন্তু পঞ্চানন ঠাকুরের পূজা হয়, মুসলমান নেই বললেই চলে।' গৌরডাঙ্গা -তে গৌরচণ্ডীর মেলা ও পূজা হয়। 'সিঙ্গি' প্রাচীন পুঁথিতে 'সিদ্ধি' নামে উল্লেখিত কাশীরাম দাসের জন্মস্থান। বৃদ্ধশিব এ গ্রামের জাগ্রত দেবতা।

মঙ্গলকোট থানার 'বৈরাগ্যতলা' বৈরাগ্যচাঁদ নামক সাধুর স্মৃতিবাহী। 'চৈতন্যপুর' -কথিত আছে যে ধর্মপ্রচার উপলক্ষে মহাপ্রভু যখন পরিভ্রমণ করছিলেন তখন একদিন পার্শ্ববর্তী কোন গ্রামে অচৈতন্য হয়ে পড়েন। ভক্তরা এই গ্রামে নিয়ে আসলে 'চৈতন্য' লাভ করেন। 'উজানি' কে অনেকেই 'উজ্জয়িনী'র অপভ্রংশ বলে মনে করেন। ধনপতি সদাগর এই গ্রামেই বাস করতেন। 'কাঁকোড়া' বা কর্কটনাগ - এই গ্রামের উপাস্য দেবতা এক ধরনের গোখুরা সাপ। 'মাজিগ্রাম' হ'ল মা (শাকম্ভরী) + জি। 'ইছাবটগ্রাম' পুরনো 'ইছানিগ্রাম' উজানির পার্শ্ববর্তী কৃষ্ণবাটী' মুসলিম গ্রাম পুরনো নাম জয়দেব।

'মন্তেশ্বর' শিবেরই এক নাম। পূর্বস্থলী থানার 'জাহান্নগর' কি জাহ্নুমুনির আশ্রম ছিল। ছিল 'জহ্নুনগর' ? চাঁদসদাগর নাকি এই গ্রামেই প্রথম মনসাপূজা করেন। কালনার 'বৈদ্যপুর'-এ একদা বৈদ্য রাজাদের আধিপত্য ছিল। 'মেমারী'র প্রাচীন নাম ছিল 'মহবতপুর'। ইংরেজ আমলে মেমারী হয়। মেমারী থানার 'গন্তার' নাকি আসলে 'কন্তার' - এখানে সতীর কর্ণ বা কান পতিত হয়েছিল। 'মগরা' মগ জলদস্যুদের স্থাপিত গ্রাম। কালনা থানার 'উদয়পুর' গ্রামে সতী বেহুলা ভেলায় ভাসতে ভাসতে 'উদিত' হয়েছিলেন।

জামালপুরের 'চক্ষণজাদি' আসলে ধনাঢ্য মুসলিম ব্যক্তির কন্যাকে দান করা গ্রাম - চক্ খানজাদি। 'শুঁড়ে কালনা' দামোদর নদের পার্শ্ববর্তী। প্রাচীনকালে এখানে নাকি একটা 'দহ' ছিল এবং সেই দহে কালনাগিনীর আস্তানা ছিল। 'বোড়ো বলরাম' গ্রামে বলরামের

বিশাল দারুময় মূর্তি ও মন্দির আছে।

রায়না থানার 'বড় কয়রাপুর' কয়রা খাঁ নামক জনৈক আউলিয়ার নামে। 'মির্জ্জাপুর' মোগল আমলে সৈন্যঘাটি ছিল মীর আলি ছিল সৈন্যাধ্যক্ষ। 'পহলানপুর' হোসেন শাহের সেনাপতি পহলান খানের মুণ্ডবিহীন দেহ এখানেই সমাধিস্থ করা হয়। 'আলমপুরে' আহির চণ্ডীর পূজা উপলক্ষে বড় মেলা বসে। খণ্ডঘোষে 'বোঁয়াই' এ 'বোঁয়াই' চণ্ডীর মেলা বসে। 'মোগলমারি' গ্রামে মোগল সেনাদের সঙ্গে স্থানীয় মানুষদের যুদ্ধ হয়েছিল। সদর থানার 'বড়শুল' গ্রামের উল্লেখ মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গলে' পাওয়া যায়। আউসগ্রাম থানার একটা গ্রামের নাম 'ভাল্কী'। কথিত আছে এখানে রাজা ভল্লুপাদ রাজত্ব করতেন। ফরিদপুর থানার 'পাণ্ডবেশ্বরে' পঞ্চ পাণ্ডবদের প্রতিষ্ঠিত পাঁচটি শিবমূর্তি আছে।

'ক্ষীরগ্রামে' - সতীর দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ পতিত হয়েছিল।

।। আপাত উপসংহার ।।

যেমন ব্যক্তির নাম তেমনই গ্রামের নাম বা স্থান নামের বৈচিত্র অতুলনীয়। বিশেষতঃ গ্রাম বা স্থান নামগুলির মধ্যে অনেক ইতিহাস, পুরাকাহিনী, লোকশ্রুতি, প্রবাদ, ঘটনা এবং দুর্ঘটনার সংবাদ লুকিয়ে আছে। আবার অনেক গ্রামনাম হেলাফেলা করেই রাখা। কেউ একজন বলেছিলেন তারপর মুখে মুখে চলে আসছে । সব মিলিয়ে এ এক চমৎকার গবেষণার বিষয়।

বর্ধমান জেলার মোট ছাব্বিশশোরও বেশী গ্রামনামের মধ্যে মাত্রই কয়েকটির সম্পর্কে এখানে সংক্ষিপ্ততম বলতে গেলে ভাসাভাসা আলোচনা করা হোল। যদি কোন উৎসাহী গবেষকের অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত হয় এই আশায়।

বর্ধমান গ্রামনাম (মৌজা অনুসারী)

(বর্ণানুক্রমিক)

থানা ঃ চিত্তরঞ্জন

মোট গ্রামের সংখ্যা ৭ ।

আমলাদহি, বারমুরি, দুর্গাডি, ফতেপুর, নামো কাশিয়া, সিমজুড়ি এবং উপর কাশিয়া।

(এই সাতটি গ্রামের মধ্যে মাত্র দুটি গ্রামের গ্রামীণ অস্তিত্ব আছে বারমুরি এবং নামোকাশিয়া। বাকিগুলি চিত্তরঞ্জন শহরের পেটের মধ্যে ঢুকেছে।)

থানা ঃ সালানপুর

মোট গ্রাম - ৭৩ টি, ১২ টি লোকশূন্য।

আছড়া, আলকুশ, আন্নাদি, আঙ্গরিয়া, বনবিরডি, বাঁশকাটিয়া, বরাবৈ, বাসুদেবপুর, বাথানবাড়ি, বেনাগড়িয়া, বোলকুণ্ডা, বৃন্দাবনী, ছায়েনপুর, দাবর, দামদহ, দাঁদুয়া, দামিনবেড়িয়া, ধানগুড়ি, ধানুদি, ধরাসপুর, ধুন্দাবাদ, এথোরা, ঘিয়াডোবা, হাদলা, হরিশহাদি, জেমারী, জিৎপুর, কালাদাবার, কালিপাথর, কালিসাঁকো, কল্যা, কাঁকরকুণ্ডা, কেওহার্ডি, খুদকা, কীর্তনশোলা, কুসুমকনালী, লাহাত, মাধাইচক, মহেশপুর, মহেশমুড়া, মাঝলাডি, মালিয়াকোলা, মালাডি, মনহরা, মোহনপুর, মুছিদি, নেকড়াজুরিয়া, পাহাড়গড়া, পাহাড়পুর, পর্বতপুর, পাতাল, ফুবেড়িয়া, পিঠকিয়ারী, প্রতাপপুর, রাধাবল্লভপুর, রামচন্দ্রপুর, রামডি, রূপনারায়ণপুর, সাধনা, সিয়াকুল বেড়িয়া, সালানপুর, শ্রীশ্‌বেড়া, শ্যামডি, সিধাবাড়ি, শ্রীরামপুর, উত্তর রামপুর। লোকশূন্য ঃ তালবেড়িয়া, সরকুড়ি, রাঙামেটা, মালবহাল, জোড়বাড়ি, গামারকুড়ি, ঘাটাকুল, ধরম্মা, বরবকপুর, বড়পাথরবাড়া ও আমঝরিয়া।

লোকসংখ্যা ঃ ৮১-র জনগণনা অনুযায়ী লোকসংখ্যা ঃ ৫১,৫৮৪(৭১-এ ৪২,১২৯)

থানা ঃ কুলটি

মোট গ্রাম - ৬০ টি ঃ লোকশূন্য - ১ টি।

আলডিহি, আসানবানি, বদিরচক, বালিতাড়া, বামনডিহা, বরাকর, বারিরা, বেজডিহি, বেলরুই, ভানরা, বোলদি, চলবলপুর, চাম্পতাড়িয়া, ছোটধেমুয়া, চিনাকুড়ি, চুঙ্গারি, ডামাগড়িয়া, দেবীপুর, দেদি, দিগরী, ডিসেরগড়, ডুবুরদি, গাঙ্গুটিয়া, হাতিনল, হেরালগড়িয়া, ইঁদকাটা, জামালডি, জসাইডি, কালিকাপুর, কমলপুর, কান্দুয়া, কুলদি, কুলতাড়া, কুলটি, কুমারডিহা, লচ্ছিপুর, লছমনপুর, লালবাজার, মাহুতাডি, মাহুতডি, মানবেড়িয়া,

মনোহরচক, মেথানি, নমআরারা, নারায়ণচক, নিয়ামতপুর, পাইড়ি পারা, পেটানা, পুনুরি, রাধানগর, রামনগর, রামপুর, রায়ডি, সাবানপুর, সাঁকতোড়িয়া, শিপুর, শীতলপুর, সীতারামপুর, সোদপুর।

লোকসংখ্যা ঃ ৮১-র জনগণনা অনুযায়ী - ৫৫,১৩১

থানা ঃ হীরাপুর

মোট গ্রাম - ২৭ টি । লোকশূন্য ১টি নামোবারা।

আলুথিয়া, বনগ্রাম, বড়দিগরী, বরাথল, ভালাডি ভারতচক, বিদ্যানন্দপুর, চাপরাডি, ছোটদিগরী, ধেনুয়া, ডিহিকা, হীরাপুর, ইস্‌মাইল, জামডিহা, জুনুৎ, কালাঝরিয়া, কুলিয়াপুর, জাক্‌সতা, নবঘনডি, নামোবারা, নরসিংবাঁধ, পাটমোহনা, পুরুষোত্তমপুর, সান্‌তা, শ্যামরাণা, শ্যামডিহি, তালকুনারী।

লোকসংখ্যা ঃ ৮১-র জনগণনা অনুযায়ী ২৩,৫৭৪ ।

থানা ঃ আসানসোল

মোট গ্রাম - ৩৮ টি। লোকশূন্য - সরকডি।

আসানসোল, বনবিষ্ণুপুর, বনসরকড়ি, বরাবক, বড়ধেমো, বড়পুখরিয়া, বড়তারিয়া, চককেশগঞ্জ, দক্ষিণ ধাদকা, দামড়া, গণরুই, গড়পাড়িয়া, ঘোষিক, গোবিন্দপুর, গোপালপুর, হাতগড়ুই, জগৎডি, কালিপাহাড়ি, কন্না, কণ্ড্যা, কেশবগঞ্জ, কোটালডিহি, কুমারপুর, মুহুজুরি, মরিচকাটা, মহীশিলা, ন'ডিহা, নরসমুডা, নিশ্চিন্ত, পলাশডিহা, ফতেপুর, রঘনাথবাটি, রামজীবনপুর, সাতপুখরিয়া, শীতলা, সুড়ি, উত্তর ধাদকা।

লোকসংখ্যা ঃ ৮১-র জনগণনা অনুযায়ী ৫৭,৫০৬।

থানা ঃ বারাবনী

মোট গ্রাম - ৫৩ টি ।

আলিগঞ্জ, আলিপুর, আমডিহা, আমনালা, আমুলিয়া, বলাইপুর, বরাবানী, বরাডাঙ্গা, ভানোয়ারা, ভাসুকাজুরি, বিজরী, বিলা, চরণপুর, ছোটকরা, চিনচুরিয়া, দশকিয়ারী, দোমহানী, গোপালবৈদ, গৌড়বাজার, হোসেনপুর, ইটাগোড়া, জামগ্রাম, জনার্দ্দন সায়র, জয়রামডাঙ্গা, কাঁশকুলি, কাঁটাপাহাড়ী, কন্যাপুর, কব্যাবৈদ, কপিষ্ঠা, কেলেজোরা, খয়েরবাদ, খামরা, খোশনগর, লালগঞ্জ, মদনপুর, মাজিয়ারা, মনোহরবলহাল, নপাড়া, নুনি, পাঁচগেছিয়া, পানিফলা, পানুরিয়া, পারুলবারিয়া, পুছড়া, পালুলিয়া, রঘুনাথচক, রানীগঞ্জ, রসুনপুর, রোপনা, সর্ষলতি, শ্যামসুন্দরপুর, তালডাঙ্গা।

লোক সংখ্যা ঃ ৮১-র জনগণনা অনুযায়ী - ৬৭,৩৫৯

থানা ঃ জামুরিয়া

মোট গ্রাম - ৭৪ টি। লোকশূন্য ৭ টি।

আন্ধাইরা, বাগডিহা, বাগরা, বাগুলি, বাহাদুরপুর, বলানপুর, বামনাবাঁধ, বনালি, বারুল,বাতাসপুর, চেনাসোল, ভাতেরদহ, ভুরি, বিজয়নগর, বীজপুর, বীরকুলটি, চাকদলা, চাঁদা, ছত্রিশগণ্ডা, চিচুরবিল, চিচুরিয়া, চুরুলিয়া, ডাহুকা, দামোদরপুর, দরবারডাঙ্গা, দেশের মোহন, ধাশালা, ধাসনা, ডোবরাণা, হিজলগারা, ইকরা, জামসোল, জামুরিয়া, জয়ন্তিপুর, জয়নগর, ঝিলা, জোবা, জোতজানকী, কৈথি, কাটাগড়িয়া, কেদা, কামারসোল, খোসকুলা, কুমারডিহা, কুন্দলিয়া, কুনুস্তরা, লালবাজার, মাদানতোর, মাধবপুর, মধুডাঙ্গা, মামুদপুর, মণ্ডলপুর, মনপুর, মিঠাপুর, নন্দী, নায়কপুর, নিমসা, নিঙ্গা, পরযসিয়া, পরিহরপুর, পাথরচুর, বাথকুড়া, সড়কডিহি, সার্থকপুর, সাতগ্রাম, সত্তর, শেখপুর, সেমাল্য, শাঁখাড়ি, শিবপুর, সিধপুর, শ্রীপুর, তালতোর, তপসী।

জনশূন্য ঃ ঝিলা , কামারসোল,মনপুর, জয়ন্তিপুর, চেনাসোল, বাতাসপুর, বামনাবাঁধ।

লোকসংখ্যা ঃ ৮১-র জনগণনা অনুযায়ী - ৯৫, ৬৮৩।

থানা ঃ রানীগঞ্জ

মোট গ্রাম - ৩২ টি। লোকশূন্য ২টি

আমকুলা, বক্তারনগর, বল্লভপুর, বাঁশরা, বেলেবাথান, চকজনাধরা, ছলবলপুর, চাপুই, চেলাদ, দামালিয়া, এগারো, হরভঙ্গ, জেমেরি, কুমারবাজার, কুমারডিহা, মঙ্গলপুর, মুর্গাশোল, নাপুর, নারাণকুড়ি, নিমচা, রঘুনাথচক্, রানীগঞ্জ, রতিবাটি, রোনাই, সোনাচোরা, তিরাট।

লোকশূন্য ঃ চক জনার্দ্দনপুর, আমরাসোতা।

লোক সংখ্যা ঃ ৮১-র জনগণনা অনুযায়ী - ৪৭৪৫৯

থানা ঃ অণ্ডাল

মোট গ্রাম - ৬০ টি। লোকশূন্য ১ টি টিয়ারমারা।

আমলৌকা, অণ্ডাল, আরতি, বাবুইশোল, বহুলা, বৈদ্যনাথপুর বাজারি, বনগুড়ি, বনবহাল, বসকা, ভাদুড়, ভালুকা, ভাতমুড়া, বিলপাহাড়ী, চকবনবহাল, চক বাংকোলা, চকঝরিয়া, চক কারালা, চক রামবাটি, ছোড়া, দক্ষিণখণ্ড, ডালুরবাঁধ, দনিয়া, দেশলোপা, ধাণ্ডাড়িহি, দিগনালা, ডুবচুরুরিয়া, গাইধোবা, গোবিন্দপুর, হাঁসডিহা, হরিপুর, হরিশপুর, জাবুনা,

জোয়ালডাঙ্গা, কাজোরা, কেঁদবাখোট্রাম, খাঁদড়া, কোনারডিহি। কোণ্ডা, কুমারখালা, মদনপুর, মাধবপুর, মধুসূদনপুর, মহাল মাহিরা, মুকুন্দপুর, নবগ্রাম, পলাশবন, পরাশকোল, গাঠসাওরা, রামনগর, রামপ্রসাদপুর, শংকরপুর, শ্যামসুন্দরপুর, সিদুঁলি, সোনপুর, শ্রীরামপুর, তামলা, উখরা।

লোক সংখ্যা ঃ ৮১-র জনগণনা অনুযায়ী - ৯৭,২৭৫।

থানা ঃ ফরিদপুর

মোট গ্রাম - ৭২ টি। লোকশূন্য ২ টি কামারডাঙ্গা, ও চক্‌লাউদহ।

আমদহি, আমলৌকা, আরতি, বৈদ্যনাথপুর, বাজারি, বালিঝুরি, বনবহাল, বনগ্রাম, বাঁশগড়া, বনগুড়ি, বাঁশিয়া, বনশোল, বরাগড়িয়া, বেনেবন্দী, ভাবুরিয়া, ভদ্রপুর, ভালুকা, ভাতমুড়া, বিলপাহাড়ী, চকঝরিয়া, চককরালা, চকলাউডোহা, চাপাবন্দী, দুলারবাঁধ, দন্যা, দেশলোপা, ধাবনী, গোবিন্দপুর, গোগলা, গোপীডাঙ্গা, হাঁসডিহা, হরিপুর, হেটেডোবা, ইছাপুর, জাবুনা, জগন্নাথপুর, জামগড়া, ঝাঁঝরা, জোয়ালডাঙ্গা, জোত বলরাম, কালিকাপুর, কালিনগর, কাটাবেড়া, কোঁদড়া কোট্রাডি, কেন্দুয়া, কেন্দুলা, খাটগড়িয়া, কোনারডিহি, কোণ্ডা, কুমারখালা, লস্করবাঁধ, লাউডোহা, মাধাইগঞ্জ, মাধাইপুর, মহাল মহেশপুর, মান্দারবনী, নবঘনপুর, নবগ্রাম, নাচন, নাকড়াকোণ্ডা, নূতনডাঙ্গা, পানশিউলি, পাটসাওড়া. প্রতাপপুর, রামনগর, রাঙামাটিয়া, সরপি, শ্যামপুর, শ্যামসুন্দরপুর (২), সিরপা।

লোক সংখ্যা ঃ ৮১-র জনগণনা অনুযায়ী - ৬২,৬৯০

থানা - দুর্গাপুর

বনসোল, ধাবনী। ১৫১৫

থানা - নিউটাউনশিপ

জামুয়া, কালিগঞ্জ, পরাণগঞ্জ, শংকরপুর, তেতিখালা।

জনসংখ্যা ঃ ৫,৯৭৬।

থানা ঃ কাঁকসা

মোট গ্রাম - ৯২টি, লোকশূন্য - ৫ টি

আকনদারা, আমলাজোরা, আনন্দপুর, আরা, আয়মন, বিশ্বনাথপুর, বাবনাবেড়া, বামুনাড়া, বনগ্রাম, বাঁদরা, বনাটি, বাঁশকোপা, বাসুদেবপুর, বসুধা, বেহারপুর, বিনোদপুর, ধোবারাও, ভগবানপুর, বিদবিহার, বীরুডিহা, বিষ্টুপুর, ব্রাহ্মণগ্রাম, বৃন্দাবনপুর, চক বিষ্ণুপুর,

চকনারায়ণপুর, চুয়া, চুয়ামুড়াগা, ধাঁধাশপুর, দেবীপুর, ডিহিবেটা, ডোমরা, দুবরাজপুর, গাঙবিল, গাড়াদহ, গড়কিলা, খেওরবাড়ি, গোপালপুর, গৌরাঙ্গপুর, হারিকি, জিগতগঞ্জ, জামবন, জামডোবা, জাতগড়িয়া, কাজলাডিহি, কাঞ্চনপুর, কাঁদরকোনা, কাঁকসা, কেশবপুর, খাটপুকুর, কোটালপুকুর, কৃষ্ণপুর, কুলডিহা, মহাল চাঁদনী, মাঝিডাঙ্গা, মলানদীঘি, মণিকাড়া, মশনা, মোবারকগঞ্জ, নবগ্রাম, নপাড়া, নতুনগঞ্জ, নিমটিকরি, পানাগড়, পাঁচপুখরিয়া, পশ্চিমগঙ্গারামপুর, পাথরডিহা, ফুলঝুরি, পিত্তরিগঞ্জ, প্রয়াগপুর, রাধামোহনপুর, রাধানগর, রঘুনাথপুর, রাজহাট, রাজকুসুম, রক্ষিতপুর, রাণীপুর, রাউতপুর, রূপগঞ্জ, সাধুমারা, সরস্বতীগঞ্জ, শশীপুর, সাতকাহানিয়া, শ্যামবাজার, শিবপুর, শিলমপুর, সোকনা, শ্রীরামপুর, সুনদিয়ারা, সুণ্ডিপুর, তালবাহারি, তেলিপাড়া, ঠাকুরাণী বাজার, তিলকচন্দ্রপুর।

লোকশূন্য ঃ রাণীপুর, চকবিষ্ণুপুর, ভগবানপুর, চুয়ামুড়াগা, পাঁচপুখরিয়া।

লোকসংখ্যা ঃ ৮১-র জনগণনা অনুযায়ী ৮৭,৫৫৯।

থানা ঃ বুদবুদ

মোট গ্রাম - ৬৬ টি, লোকশূন্য ঃ ৪ টি

আমার, অর্জুনপুর, বলরামবাটি, বলরামপুর, বনগ্রাম, বড়চাতরা, বড়ডোবা, ভগবানপুর, ভাতকুণ্ডা, ভরতপুর, বিলাসপুর, বুদবুদ, চকপিয়ারীগঞ্জ, চক তেঁতুল, চাঁদরা, চন্দ্রচক, দক্ষিণখাঁড়া, দেবশালা, ডাহাগ্গানা, দুর্গাপুর, ফতেপুর গোপালমাঠ, হাঁসোয়া, হাওড়া, জয়কৃষ্ণবাটি, জিঁজরা, কল্যাণপুর, কসবা, কেদুয়াটিকুরি, খাণ্ডারী, কোমারবন্দ, কোটাচণ্ডীপুর, কৃষ্ণরামপুর, লক্ষ্মীনারায়ণপুর চক, মল্লিকপাড়া, মানকর, মাড়ো, মৌগ্রাম, মোকাটা, নারাণপুর, নস্করবাঁধ, পাদুমা, পড়ডাবা, পরিষা, পশ্চিমচণ্ডীপুর, পতিহার, পণ্ডালি, রঘুনাথপুর, রাইপুর, রামনগরচক, সালডাঙ্গা, সর্বঙ্কপুর, সোদপুর, সোনাই, সোনাই আইমা, সোনাই আইমাপূর্ব, শুকডাল, শ্যামসুন্দরপুর, রাইপুর, মনগ্রাম, সোদপুর, দুর্গাপুর, আউয়ার, কাকরা।

লোকশূন্য ঃ সোনাই আইমাপূর্ব, রামনগরচক, বলরামবাটী, দক্ষিণপাড়া।

জনসংখ্যা ঃ ৮১'র জনগণনা অনুযায়ী ৮৭,০৪৬।

থানা ঃ আউসগ্রাম

মোট গ্রাম - ১৬০ টি। লোকশূন্য ঃ ৭ টি

অভিরামপুর, আদুরিয়া, আকুলিয়া, আলেফনগর, আলিগ্রাম, আলুটিয়া, অমরারপুর, অমরাগড়, আওগ্রাম, আরজুড়ি, আসিণ্ডা, আউসগ্রাম, আঁশগ্রামচক, বাবুইশোল, বাবুরবাঁধ, বাঘবাটি, বাহাদুরপুর, বহমানপুর, বক্সীবাদ পোগ্রাম, বাঙ্কারা, বাংকুল, বননবগ্রাম, বড়

চাতড়া, বটগ্রাম, বেলাড়ি বেলগ্রাম, বেলুটি, বেরাগুা, ভাদা, ভালকি, ভাতগোন্না, ভেদিয়া, ভিটি, ভোতা, ভূয়েরা, বিজয়পুর বিলষাগুা, বিষ্ণুপুর, ব্রাহ্মণডিহি, ব্রজপুর, বুদরা, চকরাধামোহনপুর, চকতিলাঙ্, চণ্ডীপুর, চন্দ্রদ্বীপ,ছোড়া, ছোট রামচন্দ্রপুর, চোনারী, দেয়াশা, ধানতোর, ধরমপুর, ধোনেকাড়া, দিঘা, দিগনগর, ডোমবন্দী, দোনাইপুর, দরিয়াপুর, এড়াল, গঙ্গারামপুর, গেনারী, গোয়ালপোতা, গোবিন্দপুর পূর্ব, গোহালারা, গন্না, গোপালপুর, গোস্বামীখণ্ডী, মল্লিকপুর, গুসকরা, হরিনারায়ণপুর, হরিনাথপুর, হরিশপুর, হেদোগয়ংগা, ইটাচাঁদা, যাদবগঞ্জ, জালালপুর, জালিকান্দর, জামতারা, জয়কৃষ্ণপুর, জয়রামপুর, কয়রাপুর, কলাইঝুটি, কল্যাণপুর, কমলনগর, কাঁটাটিকুরী, করঞ্জি, করাতিয়া, কেলেটি, খাটনগর, খোরদা দরিয়াপুর, কুলডিহা, কুমারগঞ্জ, কুঞ্জনগর, কুরাল, কুড়ুম্বা, লক্ষ্মীনারায়ণপুর, লক্ষ্মীগঞ্জ, মদনমোহনপুর, মাঝেরগ্রাম, মাজুরিয়া, মালচা, মালিয়ারা, মল্লিকপুর, নবগ্রাম, নওদা, নওপাড়া, নৃপতিগ্রাম, নৃসিনপুর, পঞ্চমহালী, পাণ্ডুক, পরশুরামপুর, ফাঁড়িজঙ্গল, পিচকুড়ি, প্রতাপপুর, প্রেমগঞ্জ, পুবার, গুম্নগড়, পূর্বতাতি, পুরচা, রাধাবল্লভপুর, রাধামোহনপুর, রামচন্দ্রপুর, রামহরিপুর, রামনগর, রামনগর উত্তর, রাঙাখিলা, বেওবা, সাহাপুর, সাঙ্কো, সামন্তপাড়া, সর, সাতলা, শিবদা, শিববাটী, শিলুট, শীতলগ্রাম, শিউলি, সোয়ারা, সোমাইপুর, শ্রীচন্দ্রপুর, শ্রীকৃষ্ণপুর, শ্রীনগর, সুয়াতা, সুন্দলপুর, টাকিপুর, তেলাটা, তিলাঙ্। তুরুকডাঙ্গা, উক্তা, চন্দ্রদ্বীপ, গোপালপোতা, ডোমবন্দী, বাহামনপুর, ওয়ারিপুর, বনকাটরা, কুড়াল, গোস্বামীখানা, মল্লিকপুর, ধানকোড়া, রামাইপুর।

লোকশূন্য ঃ সাঙ্কো, হরিনারায়ণপুর, শ্রীনগর, আউসগ্রামচক, মদনমোহনপুর, কুঞ্জনগর, চন্দ্রদ্বীপ।

লোকসংখ্যা ঃ ৮১'র জনগণনা অনুযায়ী ১,৬১,৫৯৬

থানা ঃ গলসী

মোট গ্রাম - ১২৬ টি । লোকশূন্য - ১টি - জোতকোলকোল।

আদ্রা, অমরপুর, আসকরণ, আতুসি, বাবলা, বাহিরঘনিয়া, বক্তা, বলনা, বামুনাড়া, বনদুতিয়া, বনসুজাপুর, বেলান, ভারিচা, ভাসাপুর, ভীমসারা, ভুড়ি, বিক্রমপুর, বিরিংপুর, বোলপুর, বৃন্দাবনপুর, চকআলম, চকখণ্ডজুলি, চকমুড়িয়া, চন্দনপুর, চান্না, ছোটোমুড়ে, দাদপুর, দক্ষিণভাসাপুর, ডালটনগঞ্জ, ডালপুর, দরবারপুর, দয়ালপুর, ধরমপুর, ডুমুর, গলসী, গরম্বা, গরীববাটি, ঘাঘরা, ঘোষকমলপুর, গোহগ্রাম, গোলগ্রাম, গোমাই, গোপালপুর, গোপডাল, হরিপুর, হিট্টা, ইরকোনা, ইটারু, জগুলপাড়া, জয়কৃষ্ণপুর, ঝারুল, জোত কোলকোল, জুজুটি, কইডাড়া, কালনা, করকডাল, করকোনা, কাশপুর, কেতনা, কামারগ্রাম, খানহাটি, খানো, খানপাড়া, খানারজুলি, খেতুরা, খুরজ, কিশোরকোনা, কোলকোল, কোনারপুর, কোন্দাইপুর, কুরকুবা, কুড়মুনা, কুতরুকি, লোয়া, লোহাপুর, মাহারা,

মাশুলারা, মল্লসারুল, মল্লটিকুরি, মল্লিকপুর, মসজিদপুর, মৌরি, মেরুয়াল, মিঠাপুর, মোহনপুর, নবগ্রাম, নবখণ্ড, নলডাঙ্গা, নুরকোনা, ওমরপুর, পারাজ, পরশুরা, পাত্রহাটি, পিলগ্রাম, পোতনা, পূরণদরগার, পুরাঙ্গন, পুরষা, রাকোনা, রামগোপালপুর, রামপুর, রানাড়ি, সানোটা, সাঁকো, শাঁখারী, সারুল, সসঙ্গা, শাটীনন্দী, শিবিগ্রাম, শিকারপুর, শিল্ল্যা, সিমাসিপুর, সিমনাড়ী, শিররাই, সণ্ডা, শ্রীধরপুর, শ্রীরামপুর, সুজাপুর, সুন্দলপুর, শ্যামসুন্দরপুর, তাহেরপুর, তারানগর, তেঁতুলমুরি, উচ্চগ্রাম, উড়া।

জনসংখ্যা ঃ ৮১'র জনগণনা অনুযায়ী ১,৭৩,৫৯২

থানা ঃ খণ্ডঘোষ

মোট গ্রাম - ১১২টি। লোকশূন্য ৯টি মালাধরপুর, জোতনিয়াজী, পারিয়াপুর, নারায়ণপুর চক, আলমাখাগের। কামদেবপুর, পলাশডাঙ্গা, ওয়ানিয়া, তারুল।

আইমাখেগের, আলাদিপুর, আলিপুর, আমবা, আমিলিয়া, আমড়া, আমড়াল, আনগ্রাম, আড়াডাঙ্গা, আরিণ, আটকুল্যা, আঁটিরা, বাদুলিয়া, বামুনপুকুর, বলাবাটি, বামনআড়ি, বনমালিপুর, বড় গোপীনাথপুর, বড়িশিয়ালি, বায়দা, বেলডাঙ্গা, বেরুগ্রাম, বিছখরা, বনোয়াই, চাগ্রাম, চক বাদুলিয়া, চকসুকডাল, চণ্ডীপুর, চিন্তামণিপুর, দৈয়ার, ধরমপুর, দাওরগা, দুবরাজহাট, এনায়েতনগর, গৈতানপুর, গয়েশপুর, ঘরকুড়া, গোপালবেড়া, গোপালপুর, গোপীনাথপুর, গুইর, হামিরপুর, হাড়িয়া, ইন্দুটি, জারুল, জোত ধর্মদাস, জুবিলা, কৈয়র, কালনা, কমলদেবপুর, কমলপুর, কাটাপুকুর, করিমপুর, কাপসিট, কেলেটি, কেন্দুর, কেশবপুর, কেউড়িয়া, খণ্ডঘোষ, ক্ষান্তিকর, খেজুরহাটি, খুদকুড়ি, কৃষ্ণনগর, কৃষ্ণপুরকুকরা, কুলচৌরা, কুলে, কুমিরকোলা, লোদনা, মালাধরপুর, মাসিলা, মৌর, মেটেডাঙ্গা, মুইধারা, মনসবপুর, নবগ্রাম, ন'পাড়া, নারায়ণপুর, নারায়ণপুর চক, নরিচা, নিকুঞ্জপুর, নিশ্চিন্তপুর, ওয়াঁরি, পদুয়া, পলাশডাঙ্গা, পীতাম্বরপুর, পুনিয়া, পুনসুর, পুরিহা, পূর্বচক, রাউতারা, রায়পুর, রূপসা, সাধনপুর, সগড়াই, সালুন, শাঁখারী, শংকরপুর, সরঙ্গা, শরিফপুর, সসঙ্গা, শিবরামবাটি, শিকারপুর, সুলতানপুর, শুনিয়া, শ্যামাডাঙ্গা, তারাপোশ, তারুই, তেলুয়া, তিলডাঙ্গা, তোরকোনা, উখরিদ, উলকুণ্ডা, ওয়নিয়া।

লোকসংখ্যা ঃ ৮১'র জনগণনা অনুযায়ী - ১,২৩,৫৬৯

থানা ঃ রায়না

মোট গ্রাম - ১৫৯ টি ।

আদমপুর, আগরপাড়া, আল্লাদিপুর, আখিনা, আলালপুর, আলমপুর, আনগুনা, আরুই, আস্তিপুর, আটাপুর, আউসারা, বারবকপুর, বাবলা, বহরামপুর, বৈদ্যপুর, বয়রা, বৈথারী, বাজে কয়রাপুর, বাজিতপুর, বলাগড়, বালিয়ারপুর, বল্লা, বামুনিয়া, বনগ্রাম, বাঁধগাছা,

বনসা, বস্তির, বড়বৈনান, বরাটি, বরপুর, বাসুদেবপুর, বাতাসপুর, বেলার, বেলসর বেলুড়, বেন্দুয়া, ভাডিয়ারা, ভগবতীপুর, ভঞ্জপুর, ভীমপুর, ভরকুণ্ডা, বিদ্যানিধি, বিজিপুর, বিনোদপুর, বিরামপুর, বীরপুর, বিশ্বেশ্বরবাটি, বোকড়া, বোরা, বোরাজপোতা, ব্রাহ্মণগঙ্গা, বুজরুকদিঘী, বুলচন্দ্রপুর, বুরার, চাবুকপুর, চকবসন্তপুর, চকভুরুয়া, চকচন্দন, চকফকিরপুর, চককাইতি, চককিয়ামপুর, চকমুস্তাফা, চকনরসিংপুর, চকপুরোহিত, চণ্ডীপুর, ছটাদীঘি, ছোট বৈনান, ছোট ফকিরপুর, ছোট কজরপুর, চৌডাঙ্গা, দক্ষিণগোপালপুর, দক্ষিণকুল, দক্ষিণ মোহনপুর, দামিন্যা, দরবেশপুর, দেবীবরপুর, দেনো, দেরিয়াপুর, ধামাস, ধামনারী, ধারান, দিশড়া, দুর্গাবাটি, একলক্ষ্মী, ফকিরপুর, ফতেপুর, গোবিন্দপুর, গোলগ্রাম, নুরপুর, গোপালপুর, গোপীনাথপুর, গোতান, গুয়াগড়ে, গুনার, হাকৃষ্ণপুর, হরিহরপুর, হরিপুর, হাটপুষ্করিণী, হিজলনা, ইবিদপুর, জগতপুর, যাক্তা, জামাইপোতা, জামনা, জামুই, জসাপুর, জোত রাঘব, জোত রাজারাম, জোতরাম, জোতসাদি, জোতসিলম, কাইতি, কালুই, কামারগাড়িয়া, কামারহাটি, কানাই, চাতরা, কাঁটাবিল, কেউন্টা, খালিনা, ক্ষেমটা, কোনা কৃষ্ণপুর, কোনারপুর, কোটশিমুল, কুকরা, কুলিয়া, কুড়চিগ্রাম, লোহাই, মাছখাড়া, মাদানগর, মাধবডিহি, মহেশবাটি, মকরকোলা, মন্দারপুর, মানিয়ারী, মসজিদপুর, মাঠনুরপুর, মেড়াল, মীরপুর, মীর্জাপুর, মোগলমারি, মোমরেজপুর, মুগুরা, মুক্তিপুর, নালে, নন্দাল, নন্দনপুর, নরসিংহপুর, নারায়ণপুর, নরোত্তমবাটী, নারুগ্রাম, নসিপুর, নতু, নিওর, নেত্রখাঁড়া, নীলুট, নিজামপুর, পহলানপুর, পাঁইটা, পলাশন, পশ্চিমপাড়া, পাষণ্ডা, পসরা, পিপিলা, পিপুলদহ, পিরিজপুর, পুরশুনা, রামানন্দপুর, রামবাটি, রামচন্দ্রপুর, রামকৃষ্ণপুর, রামপুর, রসুইখাড়া, রসুলপুর, রায়না, রায়নগর, , রূপসরা, রূপসোনা, সহজপুর, শাকিটা, শাকনাড়া, শালগাছা, সামাসপুর, শংকরপুর, সাঁকো, নারায়ণপুর, সেহারা, শেখপুর, শেরপুর, শিব্রামপুর, সিঙ্গারপুর, শিপটা, শ্রীপুর, শ্রীরামপুর, সুবলদহ, শুকুর, সুন্দরপুর, সন্ধিপুর, শ্যামদাসবাটী, তৈলাড়া, তেয়াণ্ডুল, উচালন, উচিতপুর, উদগাড়া, উজিরহাটি, উত্তর মোহনপুর, সোলগাছা, চটা কয়রাপুর, ভীমপুর, বউগ্রাম, ধামা, তৈন্দুল, সুরার, বালিয়ারপুর, উজিরহাটি, উদগনা, মাঠনুরপুর, মূর্তিপুর, খলিনা, আস্তিকপুর, দবিয়াপুর, মুগুরা, সরিতা, সনার, রোশনী খাঁড়া, রুসোনা, জোত রোজারন, বেজিপুর, নিওর, নেত্রখাড়া, বনসাই, আগরপাড়া, চুয়াডাঙ্গা, সুয়াগড়া, ভাণ্ডিরা, মোমরেজপুর, দিঘরা, নীলট, চাবুকপুর, যশপুর, নিজামপুর, আটপুর, বড়ধামাস, পিরিজপুর।

লোক শূন্য - চকনরসিংপুর, জোত রাঘব, চকবসন্তাটী, ছোট দীঘি, চোট ফকিরপুর, গৌগাড়, চকফকিরপুর, কানাই চাত্র, হাটপাস করিনি, চককাইতি, চককিয়ামপুর।

লোকসংখ্যা ঃ ৮১'র জনগণনা অনুযায়ী - ২,২৭,১২০

থানা ঃ জামালপুর

মোট গ্রাম - ১২২ টি।

আবুজহাটি, আজাপুর, আঝাপুর, অমরপুর, আমরা, আঁটপাড়া, অন্তাই, বাগ কালাপাহাড়, বাহাদুরপুর, বলরামপুর, বল্লভবাটি, বড়টিকরা, বসন্তপুর, বশিষ্টপুর, বেরুগ্রাম, বেত্রাগড়, ভৈরবপুর, বিদ্যাবতীপুর, বিষ্ণুবাটী, বিশ্বম্ভরপুর, চকদীঘি, চক মুজফ্ফরপুর, চকখানজাদি, ছলালপুর, চৌবেড়িয়া, দাদপুর, দক্ষিণমোহনপুর, দাসপুর, দস্তানপুর, দত্তপাড়া, দত্তপুর, ধাপধাড়া, ধুলুক , দোগাছিয়া, ডুমো, কৈমপুর, গঙ্গারাম বাটি, গোহালদহ, গোপালপুর, গোপীকান্তপুর, গুড়েঘর, হাবাসপুর, হৈবতপুর, হলারা, হরগোবিন্দপুর, হরেকৃষ্ণপুর, হিরণ্যগ্রাম, ইলামপুর, ইলসরা, ইটলা, যাজনপুর, জামদহ, জানকীবাটী, জারগ্রাম, জৌগ্রাম, জোতদক্ষিণ, জোত রাঘব, জোতশ্রীরাম, জোতসুবল, কালেরা, কালনা, কমলপুর, কনকপুর, কাঁশড়া, কেলিডি, কেওতাড়া, খাঁপুর, খোর্দপলাশী, কোরা, কৃষ্ণচন্দ্রপুর, কৃষ্ণপুর, কুবজপুর, কুলীনগ্রাম, মাধবপুর, মহিন্দরা, মহিষগড়িয়া, ময়না, মসাগ্রাম, মথুরাপুর, মীরজাপুর, মুইদিপুর, নবগ্রাম, নন্দনপুর, নপাড়া, নারায়ণপুর, পাইকপাড়া, পাঁচশিমূল, পারাতল, পর্বতপুর, পিরিজপুর, পরাণবল্লভপুর, পূর্ব্বসাদিপুর, রাধাবল্লভবাটী, রাজারামপুর, রামচন্দ্রপুর, রামকৃষ্ণপুর, রেসালতপুর, রুডা, রূপপুর, সদরপুর, সাদিপুর, সাহাপুর, শাহ্‌হোসেনপুর, সাজিপুর, শালমূলা, শম্ভুপুর, সাঁচড়া, সরঙ্গপুর, সাতঘড়িয়া, সেলিমাবাদ, শিয়ালি, সিপটাই, শিরোমণি, শীতলপুর, সোনারগড়িয়া, শ্রীকৃষ্ণপুর, শূকপুর, সুরা, তিলকুড়িয়া, উজিরহাট।

লোকসংখ্যা ঃ ৮১'র জনগণনা অনুযায়ী - ১,৭১,২২৩

থানা ঃ মেমারী

মোট গ্রাম - ২২২ টি।

আদিত্যপুর, আহিরা, আকালিয়া, আলিপুর, আমাদপুর, আমুদপুর, আনদুর, আশাপুর, আউসা, বাগিলা, বাহাবপুর, বাহারা, বহরামপুর, বৈদ্যডাঙ্গা, বাজে রসুলপুর, বালিডাঙ্গা, বামুনা, বামুনপুকুর, বনগ্রাম, বাণেশ্বরপুর, বাঁশিপুর, বড়গ্রাম, বড়পলাশন, বরার, বরারি, বারাসাত, বড়েয়া, বরকোনা, বড়শুয়া, বড়োয়াঁ, বসতপুর, বেগুনিয়া, বেগুট, বেলুই, বেলুট, বেনাপুর, ভগবানপুর, ভৈটা, ভগুল, ভরপোতা, বিজরা, বিজুর, বিলবাড়ি, বীরশিমুল, বিষ্ণুপুর, বিষকোপা, বিটরা, বোধপুর, বোহার, ব্রাহ্মণপাড়া, চক বলরাম, চকনাড়া, চকনারায়ণ, চকখুণ্ডি, চাঁচাই, চণ্ডীপুর, চানপিড়া, ছিলিণ্ডা, ছোট ধামাস, চোতখণ্ড, দাদপুর, দখলপুর, দক্ষিণরাধাকান্তপুর, দলুইবাজার, দান্দুর, দেবীপুর, দেবপুর, দেহা, দেউলে, ধর্ম শিমলা, ধুনাই, ডিহিপলাশন, দিলালপুর, দুর্গাডাঙ্গা, দুর্গাপুর, ফারাকপুর, গাগেশ্বর, গন্ধপুর, গন্তার, গন্তি, গৌরীপুর, গেনরাঘাটা, ঘোষ, ঘোষপুর, গোয়ালডিঙ্গি, গোবিন্দপুর, গোপীনাথপুর, গোরাপুর, হরিগ্রাম, হলধরপুর, হরিরামবাটী, হরকলা, হাটবক্স, হিঙ্গলগড়িয়া, ইছাবাছা, ইছাপুর, ইলানডাঙ্গা, ঈশ্বমপুর, জাবুই, জাকরা, জয়রামপুর, ঝিকড়া, জোয়ানপুর, জোত চৈতন্য, জোতকানু, কবসৃটিকরী, করীবপুর, কৈলাশপুর, কালেশ্বর, কালীবালে, কলসী, কল্যাণপুর, কমলপুর, কানপুর,

কাঁটাবাড়ি, কাঁঠালগাছি, কান্তিপুর, করন্দা, কাশিয়ারা, কাশিপুর, কাটাপুর, কাঠালিয়া, কাটুয়া, কেজা, কেন্না, খানোরগ্রাম, খানরো, খয়েরপুর, কিষ্কিন্দা, কোল, কোনারপাড়া, কৃষ্ণজীবনপুর, কৃষ্ণপুর, কুচুট, মোবারকপুর, মধুপুর, মাগলামপুর, মগরা, মহেশডাঙ্গা মহেশপুর, মহিষডাঙ্গা, মহিষপুর, মাকড়া, মালম্বা, মল্লিকপুর, মামুদপুর, মণ্ডলগ্রাম, মণ্ডলজানা, মশাগাড়িয়া, মেলনা, মেমারী, মেরুয়া, মসরা, মুটরা, নবগ্রাম, নবস্থা, নগরকোনা, নলসরা, নন্দীয়ারা, নন্না, নাওহাটি, নাওপাড়া, নিশঙ্ক, নিমো, নিশিরগড়, নুদিপুর, পাইকরা, পাল্লা, পলসা, পালসিট, পলটা, পাঁচখেয়া, পারহাটি, পরতনা, পশ্চিমচণ্ডীপুর, পশ্চিমমেমারী, পশ্চিম শ্রীরামপুর, পশ্চিম তাজপুর, পটরা, পিঙ্গুর, পূন্যগ্রাম, পূর্বকাশিয়াড়, পূর্বশ্রীরামপুর, রাণীহাটি, রসুলপুর, রায়বাটি, রিয়ান, রোকনপুর, রুকাশপুর, সাহানগর, সাহাপুর, সহজপুর, সালদা, শালিগ্রাম, শংকরপুর, সানুই, সরগাছি, সড়া, সাশীনাড়া, সাতগাছা, সেখপুর, সেনপুর, সিধরিয়া, শিকারপুর, সিমলা, সীতারামবাটী, সোনারা, শ্রীধরপুর, শ্রীহরিপুর, সুরা, শ্যামনগর, তাহেরপুর, তাজপুর, তালচিনি, তাঁতিবাকোয়া, তরলপুর, তাতারপুর, তেতসরা, উলারা, উন্টে, উত্তর রাধাকান্তপুর।

লোকশূন্য ঃ পশ্চিম শ্রীপুর।

লোকসংখ্যা ঃ ৮১'র জনগণনা অনুযায়ী - ২,৫৮,৯০২

থানা ঃ বর্ধমান

মোট গ্রাম - ১৬৬টি।

আলমগঞ্জ, আলমপুর, আলিসা, আমাড়, আমিরপুর, আমড়া, অশ্বত্থগড়িয়া, আটাগড়, বাবুরবাগ, বাগার, বহরপুর, বাহির সর্ব্বমঙ্গলা, বৈকুণ্ঠপুর, বাজেসালেপুর, বাকসালা, বলগনা, বালিডাঙ্গা, বামনাসিরাজপুর, চন্দনদৈপুর, বনগ্রাম, বণ্ডুল, বংপুর, বরারিচক, বারাসতি, বড়শুল, বসতপুর, বেচারহাট, বেলকাশ, বেলনা, ভাণ্ডারডিহি, ভাতছালা, ভিটা, বিদছালা, বীরুটিকুরি, বর্ধমান, চৈতপুর, চকডালিয়া, চামারদীঘি, চাণ্ডুল, চান্দুটিয়া, ছোলাবেলুন, দক্ষিণ গোপালপুর, ডাঙ্গাছয়, দাসপুর, দেবগ্রাম, দিউড়ি, দুর্গাবাটি, একবালপুর, ফকিরপুর, ফরিদপুর, গাংপুর, ঘাটশিলা, গোদা, গোপালবাটি, গোপালনগর, গোপালপুর, হলদি, হরিহরপুরচক, হাটগোবিন্দপুর, হাট শিমুল, হাটকান্দা, ইছারামবাটি, ইছলাবাদ, ইদিলপুর, ইসুজাপুর, জগরাবাদ, জগদাবাদ, জগৎবেড়, জাবালপুর, জামার, জাতের, ঝিঙ্গুটি, জিয়ারা, জোতগোদা, জোতরাম, কড়িগাছা, কাদড়া, কলিগ্রাম, কালিনগর, কল্যাণপুর, কামারকিতা, কামনাড়া, কানাইনাটশাল, কাঞ্চননগর, কান্দরসোনা, কাঁঠালগাছি, কানটিয়া, করোরি, কাষ্ঠকুড়ুম্বা, কাশিয়ারা, কাশিমপুর, কাটরাপোতা, খইড্যা, খাজাআনোয়ারবেড়, খড়গেশ্বর, খারজুলি, ক্ষেতিয়া, কোরার, কোরার চক, কৃষ্ণপুর, কুড়মুন, কুশ, লাকুর্ডি, মাহিনগর, মহিপাল, মালকিতা, মাণিকাহাটি, মতিয়াল, মিরছোবা, মিরজাপুর, নবাবহাট, নবগ্রাম, নলা, নাঁদরা, নাদুর, নওপাড়া, নাড়ি, নাথপুর,

নেড়াগোহালিয়া, নিত্যানন্দপুর, নূতনগ্রাম, পলাশী, পালিতপুর, প্যামড়া, পাড়ুই, পতিকৃষ্ণপুর, পিলখুরি, পূর্ব কাশিয়ারা, পূর্ব কৃষ্ণপুর, পূর্ব মালকিতা, পূর্ব বালিসা, পুতুণ্ডা, রাধানগর, রাইপুর, রামচন্দ্রপুর, রামনগর, রায়ান, রায়পুর, সাধনপুর, সড্যা, সাহাপুর, সৈয়দপুর চক, শক্তিগড়, সামন্তি, সামন্তিচক, শাঁখারী পুকুর, সাপুর, সেহারা, সরাইটিকর, শিয়ালদহ, সিমডলি, সিরাজপুর, সোনাকুড়, শোনপুর, শ্রীরামপুর, সুহারী, শুকুর, শ্যামসুন্দরপুর, তাজপুর, তালিত, তাতখণ্ড, তেনত্রাল, তেঁতুলিয়া, টোটপাড়া, টুবগ্রাম।

জনশূন্য ঃ শাহাপুর, সৈয়দপুর চক, নাথপুর, হরিহরপুরচক, একবালপুর, চক ঢালিয়া, বরারি চক, আমিরপুর।

লোকসংখ্যা ঃ ৮১'র জনগণনা অনুযায়ী - ১,৯৪,০৪৯

থানা ঃ ভাতার

মোট গ্রাম - ১০৫ টি ।

আমারুন, আমবনা, আড়া, বলগনা, বলশিডাঙ্গা, বামশোর, বামুনাড়া, বনগ্রাম, বনপাশ, বড়বেলুন, বসতপুর, বসুদা, বাজার মহম্মদপুর, বেলেণ্ডা, বেরানা, ভারতপুর, ভাটাকুল, ভাতার, বিগড়া, বিজয়পুর, বিজিপুর, চণ্ডাই, চণ্ডীবাটি, চাদিপুর, ছাতিনী, ডাঙ্গসরা, দাউরা, দেবপুর, ধাঁধলসা, ধেনরিয়া, এওড়া, এওড়াচক, এরাচ্যা, এরুয়ার, ঘোলাদা, ঘুসিয়া, গোপীনাথবাটী, গ্রামডিহি, হৈরগ্রাম, হরিবাটি, হরিপুর, জলদগ্রাম, ঝারুল, ঝিকরডাঙ্গা, কাচগড়িয়া, কালাপাহাড়ী, কানপুর, কানপুরহাট, কাপসর, কর্জ্জনা, কাশিগ্রাম, কাশিপুর, কাটারী, খেরুর, খুরুল, কুবাজপুর, কুলচণ্ডা, কুলনগর, কুরুম্ব্যা, মাধপুর, মহাচান্দা, মাহাতা, মান্দারবাটি, মান্দারডিহি, মিত্রপুর, মোহনপুর, মুকুন্দপুর, মুরারিপুর, মুরাতিপুর, নবস্থা, নারায়ণপুর, নরদা, নাসিগ্রাম, নওয়ালা, নিত্যানন্দপুর, নৃসিংহপুর, নুনারী, নুরপুর, নুতা, নুতনগ্রাম, ওরগ্রাম, পালার, পলসোনা, পানোয়া, পারহাট, পশলা, পূর্ব রামচন্দ্রপুর, রাজিপুর, রামচন্দ্রপুর, রামপুর, রতনপুর, সুলকুনি, সালুন, সন্তোষপুর, সেলেণ্ডা, সেরুয়া, শিকারতোর, শিলাকোট, সোনাচালিদা, সাতখালি, শ্রীপুর, সুনুর, তুলসীডাঙ্গা, উষা।

লোকশূন্য ঃ মিত্রপুর, গোপীনাথপুর।

লোকসংখ্যা ঃ ৮১'র জনগণনা অনুযায়ী - ১,৭৯,২৩৩

থানা ঃ মঙ্গলকোট

মোট গ্রাম - ১৩৫ টি।

আমডোব, আওগ্রাম, আটঘরা, বাবলাডিহি, বাকুলিয়া, বলরামপুর, বালিডাঙ্গা, বামুনাড়া, বামুনগ্রাম, বনকাপাসী, বনপাড়া, বারুইপারা, বারুলিয়া, বেবচা, বেলগ্রাম, ভালুগ্রাম,

ভাটপাড়া, ভিনভিনা, ব্রহ্মপুর, বুঁইচি, চৈতন্যপুর, চাকদহ, চকখরিজা, ক্ষীরগ্রাম, চকপরাগ, চকপ্রতাপপুর, চাকুলিয়া, চানক, চাঁদরা, ছোটপোষলা, দেবগ্রাম, দেউলিয়া, ধান্যরুখি, ধারসোনা, দুর্মুট, দ্বারসিনি, গোতিষ্ঠা, গোবর্ধনপুর, গোবিন্দপুর, গোহগ্রাম, গোপালবেড়া, হালিমপুর, হরিপুর, ইছাবরগ্রাম, ইটা, যবগ্রাম, জগদীশপুর, যজ্ঞেশ্বরডিহি, জলপড়া, জরথা, জয়কৃষ্ণপুর, জয়রামপুর, ঝিলেরা, ঝিলু, কৈচর, কালিয়াপাড়া, কল্যাণপুর, কানাইডাঙ্গা, কানকোরা, কাশিয়ারা, কেওতসা, কেশবপুর, ক্ষরিজা, ক্ষীরগ্রাম, খেরুয়া, খুদরুন, খুরতুবা, কোগ্রাম, কোনারপুর, কোটালঘোষ, কৃষ্ণবাটি, কৃষ্ণপুর, ক্ষীরগ্রাম, কুলসনা, কুণ্ডা, লাখুরিয়া, লক্ষ্মীপুর, মাধপুর, মহারুবা, মাজিগ্রাম, মাঝখাঁড়া, মালিয়াড়া, মল্লিকপুর, মঙ্গলকোট, মুসারু, মাথরুন, মুখা, মুরুলিয়া, নবগ্রাম, নারায়ণপুর, ন'পাড়া, ইরশনদা, নয়াপাড়া, নিগন, নূতনহাট , পলাশী, পালিগ্রাম, পালিশগ্রাম, পালপাড়া, পলশোনা, পশ্চিমগোপালপুর, পশ্চিম নব গ্রাম, পিলসোয়ান, পিণ্ডিরা, পুরাতন কুড়গ্রাম, পূর্বগোপালপুর, পূর্বনয়াপাড়া, বড়পোষলা, রাধানগর, রঘুনাথপুর, রামনগর, সাগিরা, সাকোনা, সালাণ্ডা, শংকরপুর, ষাঁড়ী, আওতা, সরঙ্গপুর, সারুলিয়া, শিমুলিয়া, সিঙ্গত, সিনুট, সীতাহাটি, শীতলগ্রাম, সিউর, সুখপুখরিয়া, শ্যামবাজার, তালডাঙ্গা, তাঁতবন্দী, ঠেঙ্গাপাড়া, টিকুড়ি, উজিরপুর, উমাতাতারপুর, উত্তর বনপাড়া, উত্তর বেলগ্রাম, উত্তর ব্রহ্মপুর।

লোকশূন্য ঃ তাঁতবন্দী, নবগ্রাম, জগদীশপুর।

লোকসংখ্যা ঃ ৮১'র জনগণনা অনুযায়ী - ১,৭৭,১৪০

থানা ঃ কেতুগ্রাম

মোট গ্রাম - ১২২ টি।

আগরডাঙ্গা, আইয়াপুর চক, অম্বলগ্রাম, আমগড়িয়া, আমন্তপুর, আনখোনা, আর্গুন, বাহারা, বহগ্রাম, বকালসা, বালুটিয়া, বামুনদি, বাঙ্কুই, বেগুনকোলা, বেনীনগর, বেরুগ্রাম, ভাণ্ডারগরিয়া, বিল্লেশ্বর রসুই, বীড়া, বীররহিমপুর, বিরুরী, বিষ্ণুপুর, ব্রাহ্মডাঙ্গা, চাকদহ, চক্ষরুলিয়া, চাকতা, চরখি, চরনারায়ণপুর, চর সুজাপুর, বেচুরিয়া, চিনিসপুর, চিতাহাটি, দাইয়া, দক্ষিণডিহি, দত্তবাটি, এহিয়াপুর, এনায়েতপুর, গঞ্জুল, গঙ্গাটিকুরি, ঘাটকুড়িয়া, গোঁমাই, গোপালপুর, গুড়পাড়া, হলদি, হাটপারা, ইছাপুর, জামালপুর, জামালপুর চক, ঝামাতপুর, কচুটিয়া, কল্যাণপুর, কমলাবাড়ি, কাঁচরা, কাঁদানাগ, কাঁদরা, কাকুরহাটি, কাঁটাডিহি, কাটান্দিডাঙ্গা, কোরি, কেচুনিয়া, কেতুগ্রাম, কেউগুড়ি, রইলিপুর, খাঁজি, খাশপুর, খাটুন্দি, খেনাইবাঁধা, কোজলসা, কোনারপুর, কোমডাঙ্গা, কোপা, কুলাই, কালুন, কুলুটিয়া, কুর্মডাঙ্গা, করুটিয়া, লোহারুন্তি, মন্থুলা, মাঝিনা, মলাগ্রাম, মালিহা, মাসুন্দি, মৌগ্রাম, মৌরী, মিত্রটিকুরী, মোরগ্রাম, মুরগ্রাম, মুরুন্দি, মুরুটিয়া, নবগ্রাম, নৈহাটী, নলিয়াপুর, নারায়ণপুর, নারেঙ্গা, নিরল, নোয়াপাড়া, নূতনগ্রাম, পাচণ্ডী, পালিটা,

পাণ্ডুগ্রাম, পানপাড়া, পানপাড়াচক, পশ্চিম সুজাপুর, পুরুলিয়া, রঘুপুর, রায়খানা, রাজুর, শঙ্খাই, সেনপাড়া, সরানডি, শিবলুন, শিরুলি, সীতাহাটি, শ্রীগ্রাম, শ্রীপুর, শ্রীরামপুর, সুজাপুর, তাজপুর, তালারি, তেওড়া, উদ্ধারণপুর, উজলপুর।

লোকশূন্য ঃ পানপাড়া, পানপাড়াচক, অজয়পুর চক, জামালপুর চক, চর নারায়ণপুর।

লোকসংখ্যা ঃ ৮১'র জনগণনা অনুযায়ী - ১,৮৫,৮৩৬

থানা ঃ কাটোয়া

মোট গ্রাম - ১৪০ টি ।

অগ্রদ্বীপ, আখড়া, আলমপুর, আমগঙ্গা, আমুল, আরঙ্গাবাদ, অর্জুনডিহি, অতুলহাট চক, আউরিয়া, বাঘটিকরি, বাঘটোনা, বৈকুন্ঠপুর, বঁইচি, বাঁধমুরা, বাঁদরা, বড়খাঁজি, বড় কুলগাছি, বড় ফুলগাছি, বড় মেইগাছি, বরামপুর, বরুয়া, বেঙ্গা, বেরা, ভালসুনি, ভাতাপেকুয়া, ভাইসিং, বিকিহাট, বীরবেগুন, বিষ্ণুপুর, চাঁদপুর, চন্দ্রপুর, চান্দুলি, চর ব্রজনাথপুর, চর পটাইহাট, বেতঢাকা, ছোট কুলগাছি, ছোট মেইগাছি, চুরপুনি, দাঁইহাট, দেয়াসিন, দেবগ্রাম, দেবকুণ্ডা, দেপাড়া, দেরিয়াপুর, ডোনা, দুর্গা, একাইহাট, এলগ্রাম, গাফুলিয়া, গাড়াগাছিয়া, গৌরডাঙ্গা, গাজিপুর, ঘোড়ানাশ, ঘোষহাট, ঘুমুরিয়া, গোয়াই, গোপীখানাজ, গুসূন্দা, ইসলামপুর, জগদানন্দপুর, জাদিগ্রাম, জামরা, যমুনাপটাই, কবিরাজপুর, কৈথন, কালিকাপুর, কালসা, কল্যাণবাটি, কামাল, করজগ্রাম, কড়ুই, কাশিগ্রাম, কাটারি, কাটোয়া, কেশিয়া, খাজুরডিহি, খানেরহাট, খাশপুর, ক্ষেতপুর, পলাশী, কুয়ারা, কুমরি, কুরচি, মাখালতোর,মালঞ্চ, মল্লিকপুর, মণ্ডলহাট, মাঝিয়ারী, মেড়া, মোস্তাফাপুর, মুলগ্রাম, মুলটি, কৃষ্ণনগর, মুস্থলী, মুস্থলীচক, নাহাতা, নলাহাটি, নউয়াগর, নন্দীগ্রাম, নারায়ণপুর, নরসনা, নসিপুর, নোয়াগাড়া, নূতনগ্রাম, ওকরসা, ওকিদওপুর, পাইকপাড়া, পলাসনী, পাঁচবেড়িয়া, পাঁচঘড়া, পাঁজোয়া, পামুহাট, পরশুরাম, পারুলিয়া, পশ্চিমবীজনগর, পাতাইহাট, পোষ্টগ্রাম, পুইনি, পূর্ববীজনগর, রাধাকৃষ্ণপুর, রঘুনাথপুর, রামদাসপুর, রাউতারা, রণ্ডা, সাগরপুর, সাহাপুর, সুরগ্রাম, শিলা, শিমুলগাছি, সিঙ্গি, শ্রীবাটী, শ্রীখণ্ড, শ্রীরামপুর, শ্রীসুরুয়া, সুয়াগাছি, সুদপুর, শুনিয়া, তাতপুরা, তিতারখাঁজি, উলসটিকরি।

লোক শূন্য ঃ ওকিদওপুর, তাঁতপাড়া, সাগরপুর, রঘুনাথপুর, মুস্থলীচক, চর ব্রজনাথপুর, বাঘটিকরি, পাতাইহাট, বৈকুন্ঠপুর, বেরা, রাউতারা,

লোকসংখ্যা ঃ ৮১'র জনগণনা অনুযায়ী - ১,৯৬,০৯৯

থানা ঃ মন্তেশ্বর

মোট গ্রাম - ১৪৪ টি ।

আকবরনগর, আসুরি, আতসপুর, আউসগ্রাম, বাঘাসন, বলরামপুর, বালিজুরি, বামুনিয়া, বামুনপাড়া, বন্ধুপুর, বনপুর, বনুই, বড়কলমি, ববণডালা, বরুণা, বসতপুর, বাসুদেবপুর, বেলেণ্ডা, ভাদাই, ভাগরা, ভাণ্ডারহাটি, ভাণ্ডারপুর, ভারুচা, ভেলিয়া, ভেটি, ভোজপুর, ভুরকুণ্ডা, বিঘা, বিষ্ণুপুর চক, ব্রহ্মপুর, বুধপুর, চক বসুপুর, চক ব্রহ্মপুর, চক ধাবরী, চরকডাঙ্গা, ছোট ধেরিয়া, দলুইপুর, ডাউকডাঙ্গা, দেবপুর, দেনুর, দেওয়ানগদি, দেওয়ানি, ধান্যখেউর, ধেনুয়া, ধেউরচাঁদ, দ্বারী, ফজলপুর, গবরুপুর, গলাতুন, গনগনিয়া, গনগুরিয়া, গড় সোনাডাঙ্গা, ঘোড়াডাঙ্গা, গোয়ালডাঙ্গা, গোপালনগর, গুলিতা, দাসপুর, হাটডাঙ্গা, হাজরাপুর, হোসেনপুর, হুড়কোডাঙ্গা, ইব্রামবাদ, ইন্দ্রপুর, ইসমা, বুজরুক, জামনা, জয়পুর, জয়রামপুর, ঝিকড়া, কইগ্রাম, কালেশ্বর, কলুই, কামরা, কাঞ্চনডাঙ্গা, করন্দা, কাসা, কাটসিহি, খাঁদরা, খানাপুর, খরমপুর, খোরাজ, খোরদা, ইসনা, কুলে, কুলি, কুলজোরা, কুলুট, কুসুমগ্রাম, লস্করপুর, লোহানা, লোহার, মাঝেরগ্রাম, মামুদপুর, মঙ্গলপুর, মন্তেশ্বর, মরাইপিড়ি, মশডাঙ্গা, মথুরা, মউসা, মিরসাহর, মিঠানি, মুলগ্রাম, মুরুলিয়া, নবগ্রাম, নূতনগ্রাম, পাইকুর, মুড়ি, পানবেড়িয়া, পারুলিয়া, পশ্চিম খরমপুর, পশ্চিম মামুদপুর, পাতিখালডাঙ্গা, পাতুন, ফুলগ্রাম, পাইগ্রাম, পিপলন, প্রসাদপুর, পূর্ববলরামপুর, পূর্ব খাপুর, পূর্ব মিথানি, পুরশুনা, পুরুনিয়া, পুটসুরি, পুটসুরিচক, রাইগ্রাম, রাউতগ্রাম, বিপিচক রুইগড়িয়া, সফরদা, সাহাপুর, শাহজাদপুর, সেনহাটি, সামসপুর, সেলে, সিহিগ্রাম, সিনহলি, সিরাজপুর, সেনাগাছি, সিজনা, সুগুনা, শুশুনি, সূত্রা, তাজপুর, তেমোহানী, তেতুলিয়া, তুল্লা, উজনা, উত্তরডিহি।

লোকশূন্য ঃ মিঠানি, পুটসুরিচক, চরকডাঙ্গা, সেনহাটী, রিপিচক, দলুইপুর, তেউহানী, প্রসাদপুর।

লোকসংখ্যা ঃ ৮১'র জনগণনা অনুযায়ী - ১,৫৭,০৭৭

থানা ঃ পূর্বস্থলী

মোট গ্রাম - ১৯৩ টি।

আকবপুর, অর্জুনপুকুর, আটকাডাঙ্গা, আটপাড়া, বাকপুর, বাগচরা, বাগিয়ারা, বাগিয়ারাচক, বাঘপুর, বাহারা, বৈদ্যপুর, বলরামপুর, বামনগড়িয়া, বাঁকি, বরাচক, বড়গাছি, বরারপাড়া, বারাটি, ধরিয়া, বেলগাছি, বেলগড়িয়া, বেতপুকুর, ভদ্রপাড়া, ভাণ্ডারটিকুরি, ভাতড়া, ভাতশালা, ভাবুরিয়া, বিদ্যানগর, বিশ্বরম্ভা, বড়শা, চক বহাড়া, চক রাহাতপুর, চন্দনপুর, শিমুলডাঙ্গা, চাকিপুর, দসতিপাড়া, ধামচি, ধানাস, ধর্ম্মতলা, ধিৎপুর, ধোবা, দীর্ঘপাড়া, দোগাছিয়া, দোঘড়ি, দুবরাজপুর, একডালা, ফালিয়া, গাছা, গাগরা, গহক, গঙ্গানন্দপুর, ঘোলা, ঘুনি, গোয়ালপাড়া, গোবিন্দপুর, গোকর্ণ, গোলাহাট, গোপীনাথপুর, গোপীপুর, হলদিপাড়া, হাপানিয়া, হরিপুর, হরিশপুর, হাট শিমলা, হাট সিউরি, হৃষি, ইসবপুর, ইসলামপুর, জাহান্নগর, জ্ঞানেশ্বরপুর, জাকর, জলাহাটি, জালুইডাঙ্গা, জামালপুর,

জয়কৃষ্ণপুর, ঝাউডাঙ্গা, জিয়লগড়িয়া, কচুয়া, কইবাটি, কমলাপুর, কমলনগর, কমলপুর, কঙ্কল, কাঁসারিপুর, করাইল, কাশিপুর, কাষ্ঠশালী, করশগ্রাম, খরদত্তপাড়া, খোর্দকইবাটি, কোলাচক, কোনরাপুর, কৃষ্ণবাটি, কুবাজপুর, কুচসিমলা, কুমীরপাড়া, কুণ্ডপাড়া, কুড়চা, কুশগড়িয়া, কুরুরিয়া, লক্ষ্মণপুর, লক্ষ্মীপাড়া, লোহাচুর, মাধুপুর, মহাদেবপুর, মহাতাপুর, মহেশগড়িয়া, মাজিদা, মালতিপুর, মালগড়িয়া, মামুদপুর, মাদরা, মঙ্গলপুর, মারুইডাঙ্গা, মসগড়িয়া, মৌডাঙ্গা, মেড়তলা, মীনাপুর, মোআইল, মুদাফফর, কলহরী, মুকসিমপাড়া, মুড়াগাছা, নগদানঘাট. নালাডাহা, নম ভাণ্ডার টিকুরি, নাওপাড়া, নারায়ণপুর, নসরতপুর, নোয়াপাড়া, নিমদহ, নিত্ররা. পলাশবেড়িয়া, পলাসপুলি, পাঁচলকি, পরাণপুর, পারুলডাঙ্গা, পারুলিয়া, পাঠানগ্রাম, পাটুলি, পোলগ্রাম, পূর্ব্বস্থলী, রাহাতপুর, রাজাপুর, রাজীবপুর, রাজ্যধরপুর, রামচন্দ্রপুর, রঞ্জাপুরপটি, রুকসপুর, সাহাপুর, সঙ্খোষপাড়া, সাকঁড়া, সন্তোষপুর, পিলা, সড়ঙ্গপুর, সরডাঙ্গা, সরিষা, সাতগাছি, সাতগড়িয়া, সাতপোতা, সেওড়াগড়িয়া, সিহিপাড়া, সিমলা, সিনহরি, সিনজুলি, সোনারুদ্র, শ্রীরামপুর, সুলস্তু, সুমুরিয়া, শ্যামবাটি, শ্যামপুর, তেগাছা, তেলিনাওপাড়া, উখরা, উত্তর লক্ষ্মীপুর, উত্তর নাওপাড়া, উত্তর শ্রীরামপুর।

লোকশূন্য ঃ বরাটি, চরঝাউডাঙ্গা, একডালা, কোবলচক, বাগিয়াড়াচক, রঞ্জাপুরপটি।

লোকসংখ্যা ঃ ৮১'র জনগণনা অনুযায়ী - ২,৩৫,৩৪৫

থানা ঃ কালনা

মোট গ্রাম - ২১৭ টি।

আগ্রাদহ, অকালপৌষ, আলাগড়ি, আমদাবাদ, আনাখাঁ, অঙ্গারসন, আনুখাল, আড়া, আনবেলিয়া, আরজুনা, আটাশহরিয়া, আটকটিয়া, বাধগাছি, বাদলা, বাঘাডাঙ্গা, বাহারা, বৈদ্যপুর, বৈঠিপাড়া, বাজিতপুর, বালিয়া, বালিন্দর, বনসাই, বড় বহরকুলি, বড় ধামাস, বারাসত, বরডালিয়া, বরুহা, বাতাসপুর, বাজার কৃষ্ণপুর, বেগপুর, বেগুনি, বেলতুলি, বেশবাটি, ভবানন্দপুর, ভবানীপুর, ভাতড়া, ভেরুয়া, ভুরুয়া, ভুরকুণ্ডা, বিজরা, বীরুহা, বোয়ালিয়া, বৃদ্ধপাড়া, বুন্দেবাজ, বুরুমপাড়া, চাগ্রাম, চাকসিমলা, চৌঘড়িয়া, ছোট বহরকুলি, দাতারপুর, দক্ষিণ দুর্গাপুর, দক্ষিণ গোয়ারা, দক্ষিণ কৃষ্ণপুর, দক্ষিণ নোয়াপাড়া, দমদমা, দমপাড়া, দিয়ারা, ধনেশ্বর, ধর্মডাঙ্গা, ধাত্রীগ্রাম, দীঘা, ধুপসা, দুর্গাপুর, দোয়ারিটোন, একচাকা, ফরিঙগাছি, ঘনশ্যামপুর, গোদা, গোবিন্দবাটী, গোপালদাসপুর, গোপালপুর, গ্রাম কালনা, গুপ্তিপাড়া, মানসপুকুর, হরগুনা, হাঁসহাটি, হাটবেলে, হাটগাছা, হাটযাছনা, হিজলি, হোসেনাবাগ, হৃদয়পুর, ইছাপুর, ইন্দ্রপুর, ইসবপুর, জয়পুর, জয়রামপুর, ঝাড়বাটি, ঝেরো জমিরতলা, ঝিকড়া, ঝিনধারা, জোতশ্যাম, জুড়েপাড়া, কদম্বা, কাদিপাড়া, কাদিপুর, কাগড়িয়া, কাকুরিয়া, কালনা, কল্যাণপুর, কান্দরপাবটি, কানি বামনী, কামারপুর. কর্পূরডাঙ্গা, কাশিমপুর, কাশীপুর, কেলেনাই, কেশবপুর, খাগড়াকর, খলিশপুর, খানপুর,

ঘড়িনান, ঘাশপুর, খোদবিটরা, কোলা, কোয়ালডাঙ্গা, (কোয়েল ডাঙ্গা?) কৃষ্ণদেবপুর, কৃষ্ণপুর, কুলারা, কুলাদহ, কুলাপাড়া, কুলটি, কুমারপাড়া, কুশডাঙ্গা, কুতবপুর, কুটিরডাঙ্গা, কুতুবপুর, মদনহাসা, মধুবন, মধুবাটি, মধুপুর, মহেশ্বরপুর, ময়নাগড়িয়া, মালতিপুর, মাণিকহার, মসিদপুর, মসলন্দপুর, মেদগাছিয়া, মেদগাছি, পাইকপাড়া, মীরহাট, মীরপুর, মীর্জাবাটি, মোক্তারপুর, মীর্জাপুর, মুড়াগাছা, নগাগাছি, নন্দাই, নাওপাড়া, নারায়ণপুর, নারেঙ্গা, নারিকেলডাঙ্গা, নোয়াপাড়া, নেপাকুলি, নীরলগাছি, নিশ্চিন্তপুর, নোয়ারা, পাহাড়পুর, পাঁচদেউলি, পাঁচরাখি, পারদুপসা, পারসাহারা, পশ্চিমসাহাপুর, পাথরডাঙ্গা, পাথরঘাটা, পাতিলপাড়া, পিয়ারীনগর, পিণ্ডিরা, পোতানাই, পূর্ব সাহাপুর, রাধানগর, রাহাতপুর, রাজখাড়া, রামানন্দপুর, রামেশ্বর, রামেশ্বপুর, রামপুর, রাঙ্গাপাড়া, রাণীবাঁধ, রসুলপুর, রুক্সপুর, রুস্তমপুর, সাবিদপুর, সাধ পুখরিয়া, সৈয়দপুর, শাকাটি, শালঘড়া, সন্তোষপুর, সুগড়িয়া, শাসপুর, সাতাবালী, সাতগাছি, সেহারা, শিবপুর, সিমলা, সিমলন, সিঙা, সিঙ্গারকোন, সিঙরাইল, সোন্দলপুর, শ্রীরামপুর, সুইপাড়া, সুলতানপুর, সূর্যপুর, শুয়া, তেপাড়া, টালা, তামসপুর, তেহাটা, টোলা, উদয়পুর, উমরপুর, উপলতি, উসমানপুর, উটরা, উত্তরগোয়ারা, উত্তর রামেশ্বরপুর।

লোকশূন্য ঃ সন্তোষপুর, কামারপুর, দীঘা, মধুবন।

লোকসংখ্যা ঃ ৮১'র জনগণনা অনুযায়ী - ২,২৬,৪৮২

তথ্যপঞ্জী ঃ

১। পশ্চিমবাংলার গ্রামের নাম, ১৯৮০, জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স, শ্রী অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

২। বাংলা স্থাননাম, ১৯৮৯, আনন্দ পাবলিশার্স, সুকুমার সেন

৩। পশ্চিমবঙ্গের পূজা - পার্বণ ও মেলা (পঞ্চম খণ্ড), সম্পাদক অশোক মিত্র

৫। Census Report 1981.

পরিশিষ্ট-১

বর্ধমান জেলা ঃ এক নজরে কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য

বিবরণ	বছর	একক	পরিসংখ্যান
আয়তন এবং জনসংখ্যা ঃ			
আয়তন	১৯৯১	বর্গাকাম	৭,০২৪
জনসংখ্যা	১৯৯১	সংখ্যা	৬,০৫০,৬০৫
জনসংখ্যার ঘনত্ব	১৯৯১	সংখ্যা / বর্গকিমি	৮৬১
লিঙ্গ অনুপাত ঃ			
পুরুষ	১৯৯১	শতকরা	৫২.৬৭
মহিলা	১৯৯১	,,	৪৭.৩৩
জনসংখ্যার অনুপাত ঃ			
গ্রামীণ	১৯৯১	,,	৬৪.৯১
শহরাঞ্চল	১৯৯১	,,	৩৫.০৯
কাজে নিযুক্ত	১৯৯১	,,	৩০.৬৬
কাজে নিযুক্ত নয়	১৯৯১	,,	৬৯.৩৪
মোট তপসিলী জাতিভুক্ত লোক	১৯৯১	সংখ্যা	১,৬৬০,৪৯৩
মোট তপসিলী উপজাতিভুক্ত লোক	১৯৯১	,,	৩৭৬,০৩৩
ধর্মীয় সম্প্রদায়ভুক্ত লোক ঃ হিন্দু	১৯৯১	শতকরা	৭৯.৬৯
মুসলমান	১৯৯১	,,	১৯.৫৫
অন্যান্য	১৯৯১	,,	০.৭৬
কর্মে নিযুক্ত জনগোষ্ঠী ঃ			
রাজ্য সরকারের করণে	১৯৯৬-৯৭	সংখ্যা	৩২,১৩৭
নথীভুক্ত কারখানায় নিযুক্ত	১৯৯৭	,,	১০৯,৩৩৫
ক্ষুদ্র শিল্পে নিযুক্ত	১৯৯৭ - ৯৮	,,	২৫৪,৯৩৭
শাসন বিভাগ সংক্রান্ত ঃ			
মহকুমা	১৯৯৭	সংখ্যা	৬
থানা	,,	,,	৩২
স্থায়ী বসতিযুক্ত গ্রাম	১৯৯১	,,	২,৪৮৮
ব্লক	১৯৯৭	,,	৩১
পঞ্চায়েত সমিতি	,,	,,	৩১
গ্রাম পঞ্চায়েত	,,	,,	২৭৮

বিচার ব্যবস্থা (১৯৯৭)

নথিভুক্ত অপরাধ

খুন	১৬৮

ডাকাতি	২৪
ছিনতাই	৪১
সিঁদ চুরি	৪২
চুরি	১,২১৪
দাঙ্গা	৩৫৮
ছোট অপরাধ	৫৯৯
অন্যান্য	৩,৪৩৩
মোট	৫,৮৭৯
বিচার হয়েছে	
খুন	০
ডাকাতি	০
ছিনতাই	০
সিঁদ চুরি	২৯
চুরি	৪৭৬
দাঙ্গা	২৬৭
ছোট অপরাধ	৮৫
অন্যান্য	১,৫৮৪
মোট	২,৪৪১
দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত	
খুন	০
ডাকাতি	০
ছিনতাই	০
সিঁদ চুরি	৮
চুরি	২৫
দাঙ্গা	১৭
ছোট অপরাধ	১৫
অন্যান্য	৭৮
মোট	১৪৩
মুক্তি প্রাপ্ত	
খুন	০
ডাকাতি	০
ছিনতাই	০
সিঁদ চুরি	২১
চুরি	৪৫১
দাঙ্গা	২৫০
ছোট অপরাধ	৭০
অন্যান্য	১,৫০৬
মোট	২,২৯৮

পরিশিষ্ট

কৃষি এবং জলসেচ ঃ

চাষযুক্ত জমির পরিমাণ	১৯৯৭ - ৯৮	১০০০ হেক্টর	৪৭৫.৭
জলসেচের আওতাধীন চাষযোগ্য ভূমি	,,	শতকরা	৬৯.০৪
চাষের আওতাধীন জমির পরিমাণ ঃ			
ধান	,,	১০০০ হেক্টর	৬৫৩.৬
গম	,,	,,	৪.০
আলু	,,	,,	৪০.৯
মোট তৈলবীজ	১৯৯৭ - ৯৮	১০০০ হেক্টর	৩৯.৯
কৃষিজ ফসলের উৎপাদনের হার ঃ			
ধান	,,	কেজি / হেক্টর	২,৯৫২
গম	,,	,,	১,৯৪৮
আলু	,,	,,	২২,২২২
জলসেচের বিভিন্ন উৎসের মাধ্যমে উপকৃত ভূমি ঃ			
সরকারী খাল	,,	১০০০ হেক্টর	৩০.২
জলাশয়	,,	,,	৫
অন্যান্য উৎস	,,	,,	২১
জলসেচে ব্যবহৃত নলকূপের সংখ্যা ঃ			
গভীর নলকূপ	,,	সংখ্যা	৫৬২
অগভীর নলকূপ	,,	,,	৪০৮
কৃষিতে ব্যবহৃত সারের পরিমাণ ঃ			
নাইট্রোজেন	,,	১০০০ টন	৬১.৫
ফসফরাস	,,	,,	২৭.৮
পটাশিয়াম	,,	,,	১৮.৬

স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ঃ

হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, Dispensaries, Clinics	১৯৯৭ - ৯৮	সংখ্যা	২৩৭
পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	,,	,,	৭৩৭
হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা	১৯৯৭	,,	৭,০৮৫
একলক্ষ জনসংখ্যা প্রতি হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা	,,	,,	১১৭
সরকারী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রুগীর সংখ্যা	,,	,,	২,৮৭৮,৩৭২

জনস্বাস্থ্য (১৯৯৭)

মহকুমা	হাসপাতাল	স্বাস্থ্যকেন্দ্র	ক্লিনিক	ডিস্পেনসারী	মোট	শয্যাসংখ্যা
আসানসোল	২০	২৭	৯	৬	৬২	২,৭১৯
দূর্গাপুর	১০	১৮	৫	১	৩৪	১,৪৪৩

সদর	৬	৫২	৮	১৭	৮৩	২,২২৭
কাটোয়া	২	১৭	৬	২	২৬	৩৬২
কালনা	২	২০	৪	৬	৩২	৩৩৪
মোট	৪০	১৩৪	৩২	৩১	২৩৭	৭,০৮৫

শিল্প ঃ

নথিভুক্ত চালু (working) কারখানা	১৯৯৭	সংখ্যা	৬৭৯
ক্ষুদ্রশিল্প সংস্থা (C & S.S.I অনুমোদিত)	১৯৯৭ - ৯৮	সংখ্যা	৪৪,৭৭৮
বিদ্যুৎ সংযোগ ঃ			
বিদ্যুৎ সংযোগ প্রাপ্ত শহর	,,	,,	৭১
বিদ্যুৎ সংযোগ প্রাপ্ত গ্রাম	,,	,,	২,৩৯৫

সমবায় ব্যবস্থা ঃ

সমবায় সংস্থা	১৯৯৭ - ৯৮	,,	২,৬২৮
সদস্য সংখ্যা	,,	,,	৮১৩,৮৩৯
বিলগ্নীকৃত মূলধন	,,	১০০০ টাকা	৮ ৫০৮,৩১১

যোগাযোগ ব্যবস্থা ঃ

ডাকঘর	১৯৯৭ - ৯৮	সংখ্যা	৭৫৯
ডাক ও তারঘর (একত্রে)	,,	,,	৯৫

১। সড়কপথ (১৯৯৭-৯৮) (কিলোমিটারে)

পি.ডব্লিউ.ডি	
পাকা রাস্তা	১,৯৩২.৪
কাঁচা রাস্তা	৬.০
মোট	১,৯৩৮.৪
স্থানীয় প্রশাসন	
পাকা রাস্তা	৩০৬.০
কাঁচা রাস্তা	১,৩০৮.০
মোট	১,৬১৪.০
মোট পাকা রাস্তা	২,২৩৮.৪
কাঁচা	১,৩১৪.০
সর্বমোট	৩,৫৫২.৪
পি.ডব্লিউ.ডি. রক্ষণাবেক্ষনে বিভিন্ন ধরণের রাস্তা (১৯৯৭-৯৮)	
ন্যাশনাল হাইওয়ে	১৫৮.৪
স্টেট হাইওয়ে	৩১৫.০
শহরাঞ্চলে	৭২৮.০
গ্রাম্যরাস্তা	৭৩৭.০
মোট	১,৯৩৮.০

পরিশিষ্ট

বিভিন্ন পৌরসভার রক্ষণাবেক্ষণে রাস্তার পরিমাণ (১৯৯৭-৯৮)

	পাকারাস্তা	৮২২.০
	কাঁচা রাস্তা	৬২৬.০
	মোট	১,৪৪৮.০
২।	রেজিস্ট্রিকৃত যন্ত্রযান (৩১.৩.৯৭ পর্যন্ত)	
	মালবাহী যান	২৩,২২২
	কার এবং জিপ	১১,০৫২
	মোটর সাইকেল ও স্কুটার	১৯৪,৭২৭
	ট্যাক্সি ও ভাড়ার গাড়ি	১,১৯৪
	অটো রিক্সা	২,৬৫৩
	মিনিবাস	৫৪০
	স্টেজ ক্যারেজ	৩,২০৫
	ট্র্যাক্টর	৬,৩১৭
	অন্যান্য	২,১৭০
	মোট	২৪৫,১১০
৩।	পথ দুর্ঘটনা (১৯৯৭)	
	দুর্ঘটনার সংখ্যা	৭৫২
	আহত মানুষের সংখ্যা	৭৯৪
	নিহত	১৯৬
৪।	ডাক ও তার অফিস (১৯৯৮)	
	পোস্ট অফিস	৭৫৯
	তার অফিস	৪
	মিলিত অফিস	৯৫

শিক্ষা সংক্রান্ত :

সাধারণ শিক্ষা : বিদ্যালয়			
প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯৯৭ - ৯৮	,,	৩,৭৬৬
Middle School	,,	,,	২০৫
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	,,	,,	৪৪৯
উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়	,,	,,	১২৭
মহাবিদ্যালয়	,,	,,	২৭
পেশাগত এবং কারিগরী শিক্ষা :			
বিদ্যালয় -ইঞ্জিনীয়ারিং / কারিগরী	,,	,,	৪
শিক্ষক - শিক্ষণ	,,	,,	৫
মহাবিদ্যালয় : ইঞ্জিনীয়ারিং	,,	,,	৪
শিক্ষক - শিক্ষণ	,,	,,	৩
অন্যান্য	,,	,,	২

স্বাক্ষরতা ঃ

সাক্ষরতা কেন্দ্র	,,	,,	১,৯৯৫
পুরুষ	১৯৯১	শতকরা	৭১.২২
মহিলা	,,	,,	৫১.৪৬
মোট	,,	,,	৬১.৮৮

[illegible]

২০০১-এর জনগণনা অনুযায়ী

আয়তন ঃ ৭০২৪ বর্গকিমি

মোট জনসংখ্যা ঃ ৬,৯১৯,৬৯৮ জন

পুরুষ ঃ ৩,৬০২,৬৭৫ জন

নারী ঃ ৩,৩১৭,০২৩ জন

জনঘনত্ব (প্রতি বর্গকিমিতে) ঃ ৯৮৫ জন

দশবছরে (১৯৯১-২০০১) জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ১৪.৩৬ শতাংশ অনুযায়ী

প্রতি হাজার জন পুরুষে মহিলার সংখ্যা ঃ ৯২১ জন

০)৬ বছরের মধ্যে জনসংখ্যা ঃ ৮৭৬,৩৮৭ জন

০)৬ বছরের মধ্যে ছেলের সংখ্যা ঃ ৪৪৭,১২৯ জন

০)৬ বছরের মধ্যে মেয়ের সংখ্যা ঃ ৪২৯,২৫৮ জন

স্বাক্ষর মানুষের সংখ্যা ঃ ৪,২৯০,৬৭২ জন

স্বাক্ষর পুরুষ ঃ ২,৫০২,৪২২ জন

স্বাক্ষর মহিলা ঃ ১,৭৮৮,২৫০ জন

স্বাক্ষরতার হার ঃ ৭১.০০ শতাংশ

স্বাক্ষরতার হার (পুরুষ) ঃ ৭৯.৩০ শতাংশ

স্বাক্ষরতার হার (নারী) ঃ ৬১.৯৩ শতাংশ

দশ বছরে (১৯৯১)২০০১) স্বাক্ষরতা বৃদ্ধির হার ঃ ৯.১২ শতাংশ (স্বাক্ষরতার ক্ষেত্রে জনগণনায় ৬ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের ধরা হয় না)

সূত্র ঃ *Provisional Population Totals, series - 20, West Bengal, Paper-1 of 2001 Vikram Sen, Director of Census Operations, West Bengal.*

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট - ১

সদর মহকুমা থেকে প্রকাশিত

	পত্রিকা	প্রকাশকাল
১)	দৈনিক মুক্তবাংলা	দৈনিক
২)	দৈনিক স্বীকৃতি	দৈনিক
৩)	বর্ধমান জ্যোতি	সাপ্তাহিক
৪)	সাপ্তাহিক মুক্ত বাংলা	সাপ্তাহিক
৫)	নতুন চিঠি	সাপ্তাহিক
৬)	পল্লী বর্ধমান	ঐ
৭)	সংযুক্তি চাই	ঐ
৮)	বর্ধমান দর্শন	ঐ
৯)	অজানা পথিক	ঐ
১০)	পূর্বক্ষণ	ঐ
১১)	বর্ধমান সমাচার	ঐ
১২)	বিজয়তোরণ	ঐ
১৩)	সাপ্তাহিক প্রফুল্ল	ঐ
১৪)	বর্ধমান শ্রুতি	ঐ
১৫)	সোচ্চার	ঐ
১৬)	ধ্বনি	ঐ
১৭)	গণচিন্তা	ঐ
১৮)	মুক্ত কলম	ঐ
১৯)	ভাবনা চিন্তা	পাক্ষিক
২০)	গ্রাম্য সমাচার	ঐ
২১)	কামদুখা	ঐ
২২)	পবিত্র বাণী	ঐ
২৩)	সময়ের ভীড়	ঐ
২৪)	সহানুভূতি	ঐ
২৫)	আলিকালি পত্রিকা	ঐ
২৬)	চিন্তা ভাবনা	ঐ
২৭)	দক্ষিণ দামোদর	ঐ
২৮)	জিরো পয়েন্ট	ঐ
২৯)	রসুলপুর বার্তা	ঐ
৩০)	মেমারী সংবাদ	ঐ
৩১)	বর্ধমান ঐকতান	ঐ
৩২)	সংস্কৃতি সংবাদ	ঐ
৩৩)	স্বীকৃতি	ঐ
৩৪)	বর্ধমান টুডে	ঐ
৩৫)	চাষ আবাদ	ঐ
৩৬)	মেঘনাদ	ঐ
৩৭)	বর্ধমান লিপি	পাক্ষিক
৩৮)	পল্লী প্রাঙ্গন	ঐ
৩৯)	বর্ধমানের হালচাল	ঐ
৪০)	বর্ধমানের পাপারাৎজি	পাক্ষিক
৪১)	অগ্নিরথ	ঐ
৪২)	জবর খবর	ঐ
৪৩)	অতন্দ্র প্রহরী	ঐ
৪৪)	স্বাস্থ্য ও মানুষ	ঐ
৪৫)	কলকল্লোল	ঐ
৪৬)	ছোটদের কথা	মাসিক
৪৭)	সময়ের কথা	ত্রৈমাসিক
৪৮)	সাহিত্য সানাই	ত্রৈমাসিক
৪৯)	র‍্যাডার	ঐ
৫০)	কলমের মুখ	ঐ
৫১)	ধ্রুবতারা	ঐ
৫২)	অভিযান সাময়িকী	ঐ

দুর্গাপুর মহকুমা থেকে প্রকাশিত

	পত্রিকা	প্রকাশকাল
৫৩)	পানাগড় বার্তা	সাপ্তাহিক
৫৪)	কোল্ডফিল্ড পোস্ট	ঐ
৫৫)	দুর্গাপুর জনজীবন	ঐ
৫৬)	দুর্গাপুর সংবাদ	ঐ
৫৭)	ইস্পাত বলয়	পাক্ষিক
৫৮)	বর্ধমান দুর্গাপুর হেরাল্ড	ঐ

	পত্রিকা	প্রকাশকাল
৫৯)	খোলা কথা	ঐ
৬০)	সমকণ্ঠ	ত্রৈমাসিক
৬১)	কল্প বিভাস	ঐ
৬২)	চিঠি সাকাম(সাঁওতালী ভাষায়)	ত্রৈমাসিক
৬৩)	দুর্গাপুরের আনন্দধারা	ষান্মাষিক
৬৪)	ছোটোদের শিক্ষা ও সাহিত্য	ত্রৈমাসিক
৬৫)	সপ্রতিভ	ঐ
৬৬)	ঝিল্লী	ঐ
৬৭)	অন্বিষা সাহিত্য	ঐ
৬৮)	জাতির কথা	পাক্ষিক
৬৯)	আলোর পাখি	ত্রৈমাসিক

আসানসোল মহকুমা থেকে প্রকাশিত

৭০)	দৈনিক লিপি	দৈনিক
৭১)	জাতীয় পত্রিকা	ঐ
৭২)	পর্যবেক্ষক	সাপ্তাহিক
৭৩)	আসানসোল অবজারভার	ঐ
৭৪)	ইন্ডাষ্ট্রিয়াল অর্গ্যান (বাংলা)	ঐ
৭৫)	খনি ও ইস্পাত	সাপ্তাহিক
৭৬)	প্রান্তভূমি	ঐ
৭৭)	প্রতিনিয়ত	ঐ
৭৮)	গ্রামাঞ্চল শিল্পাঞ্চলের খবর	ঐ
৭৯)	ঈশ্বর আল্লাহ (উর্দু)	পাক্ষিক
৮০)	আজকের যোধন	মাসিক

কালনা মহকুমা থেকে প্রকাশিত

৮১)	পল্লীবাণী	সাপ্তাহিক
৮২)	পাক্ষিক দেশমাতৃকা	পাক্ষিক
৮৩)	হোত্রী	ঐ
৮৪)	অম্বিকা সমাচার	ঐ

	পত্রিকা	প্রকাশকাল
৮৫)	অম্বুকণ্ঠ	ঐ
৮৬)	সংবাদ পল্লীচিত্র	ঐ
৮৭)	সীমায়ন	ত্রৈমাসিক
৮৮)	ক্রমান্বয়	ঐ
৮৯)	ষান্মাষিক পৌরদিশারী	ষান্মাষিক
৯০)	শুভ মহুয়া	ঐ
৯১)	কালনা জ্যোতি	ঐ
৯২)	ছোট নদী	ত্রৈমাসিক
৯৩)	সাম্প্রতিক	পাক্ষিক
৯৪)	অনুনাদ	ঐ
৯৫)	ধাত্রীগ্রাম সমাচার	ঐ
৯৬)	অনুরণন	ঐ
৯৭)	কুঁড়ির মেলা	ত্রৈমাসিক
৯৮)	আমার মা	ষান্মাষিক

কাটোয়া মহকুমা থেকে প্রকাশিত

৯৯)	কাটোয়ার কলম	সাপ্তাহিক
১০০)	সাপ্তাহিক কাটোয়া	ঐ
১০১)	কাটোয়ার জোয়ার	ঐ
১০২)	কাটোয়ার দর্পণ	পাক্ষিক
১০৩)	এক টুকরো বাঁশ	সাপ্তাহিক
১০৪)	ধূলা মন্দির	পাক্ষিক
১০৫)	কথার কথা	ঐ
১০৬)	তোমাদের কথা	ঐ
১০৭)	কাটোয়া কালিগঞ্জ বার্ত্তা	ঐ
১০৮)	কালনা কথা	ঐ
১০৯)	জনগণ বলবে	ঐ
১১০)	বাংলা বলছে	সাপ্তাহিক
১১১)	গোপন তথ্য	পাক্ষিক
১১২)	মহকুমা প্রেস টাইম	ঐ

৩১/৩/২০০১ পর্যন্ত জেলা তথ্য দপ্তর সূত্রে পাওয়া

উনবিংশ শতাব্দীতে বর্ধমান জেলা থেকে প্রকাশিত পত্র - পত্রিকা

(তালিকা অসম্পূর্ণ হতে পারে)

১৮৪৯ - সংবাদ বর্ধমান জ্ঞানপ্রদায়িণী (সাপ্তাহিক), বর্ধমান চন্দ্রোদয় (সাপ্তাহিক)

১৮৫০ - সংবাদ বর্ধমান (সাপ্তাহিক) (বর্ধমানরাজের পৃষ্ঠপোষকতায়)

১৮৬৬ - বর্ধমান মাসিক পত্রিকা

১৮৭০ - প্রচারিকা (মাসিক, পরে পাক্ষিক ও ১৮৭৪-এ সাপ্তাহিক)

১৮৭৬ - ভারতভাতি (মাসিক), দিবাকর (মাসিক), বিশ্বসুহৃৎ (সাপ্তাহিক)

১৮৭৭ - জ্ঞানদীপিকা (মাসিক), আর্যপ্রতিভা (মাসিক)

১৮৭৮ - কালনা প্রকাশ (সাপ্তাহিক), বর্ধমান সঞ্জীবনী (সাপ্তাহিক) (ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র)

১৮৯৭ - পল্লীবাসী(সাপ্তাহিক) (পত্রিকার উত্তরাধিকারীদের মতে ১৮৯৬, সম্প্রতি শতবর্ষ পালিত)

(মোট ১৩ টি)

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বর্ধমান জেলা থেকে প্রকাশিত পত্র - পত্রিকা

(তালিকা অসম্পূর্ণ হতে পারে)

১৯০০ - কালিকাপুর গেজেট (মাসিক), তরুণ (দ্বিসাপ্তাহিক)

১৯০৩ - প্রসূন (কাটোয়া থেকে প্রকাশিত প্রথম পত্রিকা)

১৯০৯ - ১০ - রত্নাকর

১৯১৯ - নবারুণ (মাসিক)

১৯২২ - বর্ধমান (সাপ্তাহিক)

১৯২৩ - শক্তি (সাপ্তাহিক)

১৯২৪ - ২৫ - আসানসোল সমাচার(এই অঞ্চলের প্রথম পত্রিকা)

১৯২৭ - বর্ধমান বাণী (সাপ্তাহিক), ভীমরুল (সাপ্তাহিক)

১৯৩১ - আসানসোল হৈতিষী (সাপ্তাহিক)

১৯৩২ - সাম্য (সাপ্তাহিক)

১৯৩৪ - দেশপ্রিয় (সাপ্তাহিক), শান্তিজল (মাসিক)

১৯৩৬ - সংবাদ (সাপ্তাহিক), দামোদর (সাপ্তাহিক)

১৯৩৮ - বর্ধমান বার্তা (সাপ্তাহিক)

১৯৩৯ - ছাত্র (মাসিক)

১৯৪০ - পল্লীর কথা (সাপ্তাহিক)

১৯৪১ - শ্রী (মাসিক)

১৯৪৪ - দৃষ্টি (সাপ্তাহিক)

১৯৪৬ - আর্য্যপত্রিকা (সাপ্তাহিক)

১৯৪৮ - বর্ধমান (সাপ্তাহিক)

১৯৪৯ - বর্ধমানের ডাক (সাপ্তাহিক)

এছাড়াও উপায় (মাসিক), আজান, বিদ্রোহী, অভিযাত্রী, চাবুক, অভিযান ও যুগশঙ্খ নামক কয়েকটি পত্রিকারও উল্লেখ পাওয়া যায়।

(মোট ৩১ টি)

১৯৫০ - এর দশকে প্রকাশিত বর্ধমান জেলার পত্র-পত্রিকা

(তালিকা অসম্পূর্ণ হতে পারে)

সাপ্তাহিক : সর্বোদয়, জি.টি.রোড, সীমা (হিন্দি), একতা (বাংলা-হিন্দি-উর্দু)

পাক্ষিক : যুগচক্র

মাসিক : মৈত্রী, শিক্ষা সমাচার, শ্রীলেখা, পথের সন্ধানে।

দ্বিমাসিক : সজীবপত্র

অন্যান্য : বঙ্গবাণী, উদয়ন, শান্তি, নবাঙ্কুর।

(মোট - ১৪ টি)

১৯৬০ - এর দশকে প্রকাশিত বর্ধমান জেলার পত্র - পত্রিকা

(তালিকা অসম্পূর্ণ হতে পারে)

সাপ্তাহিক : মেহনতী, ধরিত্রী, আসানসোল বাণী, অঙ্গার, খোলাকথা, কোলফিল্ড ট্রিবিউন (ইংরাজী), দুর্গাপুর বাণী, পর্যবেক্ষক, আসানসোল সমাচার, স্পষ্টকথা, বর্ধমানবার্তা, বীক্ষণ, সাপ্তাহিক কাটোয়া, ভেদিয়াবার্তা, উদয় অভিযান, বর্ধমান শ্রমিক, নূতন পত্রিকা।

পাক্ষিক : পক্ষান্তর, চলমান, আলিকালি পত্রিকা, বিকাশ।

ত্রৈমাসিক : স্বগত, লোকভারতী, সাহিত্য সানাই, লোকায়ত, আলাপী।

বাৎসরিক : বর্ধমান সংস্কৃতি সম্মেলন।

অন্যান্য : স্বীকৃতি, লোকবার্তা, জয়ধ্বনি, রাঙামাটি (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মুখপত্র)

(মোট ৩১ টি)

১৯৭০ - এর দশকে প্রকাশিত বর্ধমান জেলার পত্র - পত্রিকা

(তালিকা অসম্পূর্ণ হতে পারে)

দৈনিক : স্বীকৃতি, দৈনিক দামোদর।

সাপ্তাহিক : পূর্বক্ষণ, বর্ধমান জ্যোতি, বিজয়তোরণ, স্বীকৃতি, মুক্তি চাই, বর্ধমান এক্সপ্রেস, ধ্বনি, বর্ধমান নিরন্তর, বর্ধমান মজদুর, বর্ধমান লোকাল, বর্ধমান রিপোর্টার, বর্ধমান শ্রুতি, বর্ধমান দর্পণ, পল্লী বর্ধমান, গোলাপবাগ, উখড়া দর্পণ, নন্দনঘাট সংবাদ, অভীক, জনচিন্তা, গণচিন্তা, কথা বলো, খন্ডঘোষ সমাচার, বর্ধমান - দুর্গাপুর হেরাল্ড

(ইংরাজী), পিপলস উইকলি (ইংরাজী), দুর্গাপুর সংবাদ, কোলফিল্ড এক্সপ্রেস, কোলফিল্ড টাইমস, পানাগড় বার্তা, আসানসোল কথা (বাংলা), আসানসোল কথা (হিন্দি), কুনুরিকা (ইংরাজী), দুঃসাহস (হিন্দি), আসানসোল অবজারভার, সুইট ইন্ডিয়া, কাটোয়া হিতৈষী, কাটোয়া দর্পণ, কাটোয়া জোয়ার, কাটোয়ার কলম, নতুন চিঠি।

পাক্ষিক : সমিৎ, গরীবের রাস্তা, ভাবনাচিন্তা, সময়ের ভীড়, বর্ধমানের বিজয়বার্তা, দাঁইহাট বিচিত্রা, বর্ধমানের খেলাধুলা, আঞ্চলিক সংহতি, যুগভেড়ি, বর্ধমান ডায়েরী, কবুতর, চাষ-আবাদ, সংস্কৃতি সংবাদ, গ্রাম্য সমাচার, কুলটি বার্তা, জামুড়িয়া দর্পণ, মেয়েদের বার্তা, কৃষি সমবায় পত্রিকা, সত্যবাক্, প্রতিনিয়ত।

মাসিক : প্রচেষ্টা, ছোটদের কথা, মফস্বলের বার্তা, দীপায়ণ।

দ্বিমাসিক : বোবাযুদ্ধ, অভিযান সাময়িকী।

ত্রৈমাসিক : রৌদ্দুর, সীমায়ন, আকরিক, চিত্রকূট, সঙ্গীত, শিল্পতীর্থ, বাল্মীকি, নানান কথা, বোধ, কোমল দুর্বা, প্রয়াস ও প্রতীতি।

যান্মাসিক : চিন্তা।

অন্যান্য : বাইরে দূরে, তাপ-উত্তাপ, নগ্ন তাপস, মাতৃকা, রাষ্ট্র দর্পণ, ইন্ডাস্ট্রি লাইফ (ইংরাজী)

(মোট ৮৪ টি)

১৯৮০ - ১৯৯৭ পর্যন্ত প্রকাশিত বর্ধমান জেলার পত্র - পত্রিকা

(তালিকা অসম্পূর্ণ হতে পারে)

দৈনিক : দৈনিক মুক্তবাংলা, দৈনিক লিপি, দৈনিক পূর্বক্ষণ (সান্ধ্য), আসানসোল পরিক্রমা (সান্ধ্য), দৈনিক মহাজাতি (হিন্দি), জাতীয় পত্রিকা, দৈনিক বঙ্গপত্রিকা, খবর সেতু(হিন্দি)।

সাপ্তাহিক : জাতীয় সংবাদ, ট্রান্সমিটার, শিল্প পরিক্রমা, ইন্ডাস্ট্রিয়াল অর্গান, তথ্য দর্পণ, দিগন্তিকা, খনি ও ইস্পাত, এজাহার, অজয় পাড়ে, দুর্গাপুর পার্সপেকটেড, সাপ্তাহিক মুক্তবাংলা, দুর্গাপুর জনজীবন, হালচাল রাজনৈতিক, নিউজ কেলট্রন, দুর্গাপুর কথা ও কাহিনী, নয়া চিন্তা, অজানা পথিক, বর্ধমান সমাচার, সাপ্তাহিক প্রফুল্ল, মুক্ত কলম, সাপ্তাহিক কাটোয়া, এক টুকরো বাঁশ, প্রান্তভূমি, কোলফিল্ড পোস্ট, বর্ধমান লোকাল, উত্তর বর্ধমান, রানীগঞ্জ দর্পণ, বর্ধমানের স্বর্ণশিল্পী বার্তা, সোচ্চার, টেলি টাইম্স।

পাক্ষিক : যুবজোয়ার, পবিত্র বাণী, চিন্তাভাবনা, মঙ্গলকোট বার্তা, তোমাদের কথা, ভোর, সংবাদের শিরোনাম, হোত্রী, ধুলামন্দির, দেশমাতৃকা,

মহিলামহল, আগামী আওয়াজ, কালনা সমাচার, কামদুঘা, সহানুভূতি, রোদবৃষ্টি, বার্তাঝুলি, ভাগ্যের সন্ধানে, জিরো পয়েন্ট, রসুলপুর

বার্তা, মেমারী সংবাদ, ম্যাসেঞ্জার, কলকল্লোল, ভূমিপূজা, সাম্প্রতিক,
অম্বুকণ্ঠ, অম্বিকা সমাচার, সংবাদ পল্লীচিত্র, কথার কথা, গোপন তথ্য,
দুর্গাপুর জনসমাচার, ইস্পাতবলয়, প্রীতি ও সংহতি, শতাব্দীর সংবাদ,
বর্ধমান ঐকতান, শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস, গ্রামাঞ্চল শিল্পাঞ্চলের খবর,
কৃষি সমবায় পত্রিকা, পরিবহণ সমাচার, সাহিত্য সম্মেলন বার্তা, দক্ষিণ দামোদর প্রকাশনী পত্রিকা, কিশোর জগৎ।

মাসিক ঃ সেবিকা, জবাভাবা, ভবঘুরে, শুভলিপিকা, অনুবর্তন, ঝলমলে
ঝিলমিল, ময়রামুক্তি, এক জাতি একতা, কাঁচামিঠা, প্রাথমিক শিক্ষক পত্রিকা, শিল্প-সাহিত্য গবেষণা।

ত্রৈমাসিক ঃ প্রমিথিউস, সময়ের কথা, ধন্যভূমি, শুধু শব্দ নয়, জলপ্রপাত
সাহিত্য, কয়লাকুঠির দেশ, বযুসান, রাঢ়বঙ্গ, প্রতিভাস, আমাদের ছুটন্ত ঘোড়াগুলি, মনীষা, নৈরঞ্জনা, উত্তরণ, স্বাস্থ্য ও মানুষ, সাহিত্য
সানাই, র‍্যাডার, নভস্পৃক, কলমের মুখ, ভোরের তারা, ক্রমান্বয়, বিভাস, ইস্পাতের চিঠি, প্রতিশ্রুতি, বাংলা গল্প আকাদেমী, দিগন্ত সাহিত্য সম্মেলন, মানবেন্দ্র রায়ের ত্রৈমাসিক পত্রিকা, শিল্পনগর মধ্যনগর।

ষান্মাষিক ঃ এষণা, পৌর দিশারী, শুভ মহুয়া, দুর্গাপুরের আনন্দধারা, প্রতিভার সন্ধানে, ছোটদের শিল্প ও সাহিত্য, আসানসোল মাস-মিডিয়া।

অন্যান্য ঃ কৃষ্ণমৃত্তিকা, প্রান্তছায়া, সূত্রপাত, সরেজমিনে, ত্রিপিটক, ঋত্বিক, নতুন মুখ, প্রথমত, এবং পদ্য, অঙ্গন, কবিতা সম্প্রতি, দ্বান্দ্বিক, সাহিত্য সংক্রামক, মাধুকরী, অকপট, যোধন, দীধিতি, বাল্মীকি, সুচেতনা, অভিযান সাময়িকী, অর্ণব, কুরুক্ষেত্র, দিগন্ত, একলব্য, নতুন দিগন্ত, টেলিটাইম্‌স, দুর্গাপুর হেরাল্ড, স্ফুলিঙ্গ।

(মোট ১৫৪ টি)

১৮৪৯ থেকে ১৯৯৭ পর্যন্ত পত্র-পত্রিকার নামগুলির তালিকা তৈরীর ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ 'বর্ধমান সংখ্যা'য় প্রকাশিত জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য্যের লেখার সাহায্য নেওয়া হয়েছে। তবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে যে বছরগুলিতে পত্রিকার প্রকাশকাল, সেই সেই বছর ছাড়াও পরবর্তী ক্ষেত্রে অনেক পত্রিকা যেমন প্রকাশ হয়ে চলেছে, সেরকম প্রয়োজনে কিছু পত্রিকার 'পর্যাবৃত্তি'র ও পরিবর্তন হয়েছে। আবার নানা কারণে বেশ কিছু পত্রিকার প্রকাশ বন্ধও হয়ে গেছে। উদাহরণ হিসাবে ১৯৬০ সালে প্রকাশিত 'উদয় অভিযান' পত্রিকার কথা ধরা যায়। পত্রিকাটি মাসিক, ত্রৈমাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক, অর্ধ-সাপ্তাহিক হিসাবে নানা সময়ে প্রকাশিত হয়ে ১৯৭০ সালে 'অভিযান সাময়িকী' প্রকাশের পর বন্ধ হয়ে যায়।

পরিশিষ্ট - ৩

স্বাধীনোত্তর বর্ধমানের নির্বাচনী ফলাফল

প্রথম বিধানসভা নির্বাচন - ১৯৫২

ক্র নং	কেন্দ্র	মোট ভোট	প্রদত্ত ভোট	বিজয়ী	প্রাপ্ত % ভোট	পরাজিত	প্রাপ্ত% ভোট
১	বর্ধমান	৫৩১৯২	২২৪৬২	বিনয় কৃষ্ণ চৌধুরী (সি পি আই)	৫০.৯	উদয়চাঁদ মহতাব (কংগ্রেস)	৪২.২
২	খণ্ডঘোষ	৫০৪৯২	১৭৬১১	মহঃ হোসেন (কংগ্রেস)	৩৭.০	এ বি বসু (নির্দল)	৩১.৪
৩,৪	রায়না (সাঃ+তপঃ)	১০২,২৬১	৭৩,৯৬৬	মৃত্যুঞ্জয় প্রামাণিক এবং	২১.২	জি পাকড়ে এবং	২০.৪
				দাশরথি তা (কে এম পি পি)	২০.৪	এন সিনহা রায় (কংগ্রেস)	২০.১
৫,৬	গলসী (সাঃ+তপঃ)	১০২,৬১৭	৭৩,৫৬৯	যাদবেন্দ্র নাথ পাঁজা ও	২৪.১	পি সি রায় (নির্দল) ও	১৯.২
				মহীতোষ সাহা (কংগ্রেস)	২২.৯	কৃষ্ণচন্দ্র হালদার (সি পি আই)	১৯.১
৭,৮	আউসগ্রাম (সাঃ+তপঃ)	১০৭,৮৪১	৬৮,০৫৫	কানাইলালদাস ও	২৬.০	ডি নাথ রায় (ফঃ বঃ মাঃ) ও	৯.৭
				আনন্দ গোপালমুখোপাধ্যায় (কংগ্রেস)	২৪.০	এ কে চট্টোপাধ্যায় (নির্দল)	৭.৭
৯, ১০	রাণীগঞ্জ (সাঃ+তপঃ)	৯৯৬২৮	৭২,৫৮১	পি নাথ মালাইয়া (নির্দল) ও	২৭.৪	সি এল কেজরিওয়াল (কংগ্রেস) ও	১৫.৭
				বি বি মণ্ডল (কংগ্রেস)	১৬.৩	প্রবীর সেন (নির্দল)	১১.৫
১১, ১২	কুলটি (সাঃ+তপঃ)	১০২২০২	৬২,২০৩	বৈদ্যনাথমণ্ডল ও	২২.১	রজনী বারুই ও	৯.৩
				জয় নারায়ণ শর্মা	১৫.৭	এম চট্টোপাধ্যায় (নির্দল)	৯.০
১৩	আসানসোল	৫৩,৮৯৬	১৯,৭৬৪	এ এন বসু ফঃ বঃ	৪০.১	জে এন রায় (কংগ্রেস)	২৫.৫
১৪, ১৫	কালনা (সাঃ+তপঃ)	১০৬,৫০৪	৯৩৯১৩	বৈদ্যনাথসাঁওতাল ও	২২.৫	জমাদার মাজি (সি পি এম) ও	১৯.২
				আর বি সেন (কংগ্রেস)	১৯.৬	এ জি কোনার (কে এম পি পি)	১৮.৬
১৬	পূর্বস্থলী	৫০,৬৫৯	২৪,৬০৭	বি এন তর্কতীর্থ (কংগ্রেস)	৫৬.৯	মনোরঞ্জন সেন (বি জি এস)	২৭.০
১৭	মন্তেশ্বর	৫২,৮৯৭	২৯,৫৭৬	এ আর মণ্ডল (কংগ্রেস)	৫২.৫	এস চৌধুরী (কে এম পি পি)	৪৭.৫
১৮	কাটোয়া	৫৭,৪৪৯	২৮,৫৮৮	সুবোধ চৌধুরী	৩৫.১	বি কে বন্দ্যোপাধ্যায	২৭.৯

				বিজয়ী		পরাজিত	
				(সি পি আই)		(কংগ্রেস)	
১৯	মঙ্গলকোট	৫৪,৯৯৯	২২,৩৩৮	বি সি রায় (কংগ্রেস)	৩৯.৯	এস সি বন্দ্যোপাধ্যায় (নির্দল)	৩২.৬
২০	কেতুগ্রাম	৫৪,৭১১	৩১,০২৩	টি বন্দ্যোপাধ্যায় (হিন্দু মহাসভা)	৩৭.৪	আব্দুল কাশিম (কংগ্রেস)	৩৭.২
		১,০৪৯,৩৭৮	৬০৪,২৫৬	৫৭.৫৮			

১৯৫৭ সালের বিধানসভা নির্বাচন

ক্র নং	কেন্দ্র	মোট ভোট	প্রদত্ত ভোট	বিজয়ী	প্রাপ্ত % ভোট	পরাজিত	প্রাপ্ত% ভোট
১,২	কেতুগ্রাম (সাঃ+তপঃ)	১,২৩,৯৭০	১,১৬,৬৭২	শঙ্কর দাস (কংগ্রেস)	৩০.৬	আর এস সাহা ও	১৩.২
				আবদুস সাত্তার (কংগ্রেস)	২৭.৩	জে সি সিনহা (সি পি আই)	১৪.২
৩	কাটোয়া	৬৫,২১৪	৩৭,০২২	টি চৌধুরী (কংগ্রেস)	৫৪.৩	এস চৌধুরী (সি পি আই)	৪২.৭
৪	পূর্বস্থলী	৫৮,৯৪২	৩৩,১৯৪	বি তর্কতীর্থ (কংগ্রেস)	৫৬.৩	বি সি ভাওয়াল (সি পি আই)	৪৩.৭
৫	মন্তেশ্বর	৬০৭০৮	২৮,৬২৮	বি সি রায় (নির্দল)	৪৫.১	এ পি মণ্ডল (কংগ্রেস)	৪৩.৯
৬,৭	কালনা	১২৭,৭১৬		হরেকৃষ্ণ কোঙার এবং	২৬.০	বৈদ্যনাথ মাজি ও	২১.২
				জমাদার মাজি (সি পি আই)	২৫.২	রাস বিহারী সেন (কংগ্রেস)	১৭.৪
৮,৯	রায়না	১০৮,৯১৭		দাশরথি তা ও	২৭.৮	কিষাণলাল তা ও	২৩.২
				গোবর্ধন পাকড়ে (পি এস পি)	২৬.৫	মৃত্যুঞ্জয় প্রমাণিক (কংগ্রেস)	২২.৬
১০	বর্ধমান	৬৭৬১২	৩১৯২৫	বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী (সি পি আই)	৪৮.৬	নারায়ণ চৌধুরী (কংগ্রেস)	৪৭.৪
১১, ১২	গলসি	১২৩৭২৭	৯৯৮২৬	এফ সি রায় (নির্দল)	২৮.৪	মহীতোষ সাহা (কংগ্রেস)	২০.৫
				পি এন ধীবর (ফঃ বঃ মাঃ)	২০.৫	মহঃ হোসেন (কংগ্রেস)	১৯.৪
১৩	আউসগ্রাম	৬০২০৬	২৩০৩৫	কানাইলাল দাস (কংগ্রেস)	৪৫.২	এ কে চ্যাটার্জী (নির্দল)	২৭.৯
১৪	ভাতাড়	৬৮৯৮৩	৩০১৮০	আভালতা কুণ্ডু (কংগ্রেস)	৪৯.৪	এস জি মিত্র (আর এস পি)	৩৪.০
১৫, ১৬	জামুরিয়া	৯৮৭৩৫	৫৯১০০	ডি মণ্ডল (কংগ্রেস)	২১.৫	ডি বি এল সিংহে (পি এস পি)	১৯.২

				এ মণ্ডল (পি এস পি)	২১.৫	ইউ চ্যাটার্জী (কংগ্রেস)	১৬.৭
১৭	অণ্ডাল	১০৪৩৫০	৭৭২২২	আনন্দ গোপাল মুখার্জী	২৮.৭	রবীন সেন	১৯.৮
১৮				ডি মণ্ডল (কংগ্রেস)	২৭.৮	পি বি সুরথ (সি পি আই)	১৫.৭
১৯	কুলটি	৪০১২৭	১৭৮৮৬	বি পি ঝা (আর এস পি)	৪৮.৯	জে শর্মা (কংগ্রেস)	২৮ ৪
২০	হীরাপুর	৪৮৮৪৬	২৩৯৪২	তাহের হুসেন (নির্দল)	৫৫.২	এ আর আচার্য্য (কংগ্রেস)	৩৫.৪
২১	আসানসোল	৫৯৯০৬	২৩৩০২	এস ডি ঘটক (কংগ্রেস)	৪৫.৪	বিজয় পাল (সি পি আই)	৩৯.৪
২২	খণ্ডঘোষ	-	-	-	-	-	-

তৃতীয় সাধারণ নির্বাচন ঃ ১৯৬২

ক্র নং	কেন্দ্র	মোট ভোট	প্রদত্ত ভোট	বিজয়ী	প্রাপ্ত % ভোট	পরাজিত	প্রাপ্ত% ভোট
১	কেতুগ্রাম	৬৭৭৯৬	৩৫৩২৬	এস এম ঠাকুর (সি পি আই)	৩৮.০	আব্দুল কাশিম (নির্দল)	২৫.০
২	কাটোয়া	৭৬৬২৭	৪৩০৮৯	এস চৌধুরী (সি পি আই)	৫৬.৮	এস ঠাকুর (কংগ্রেস)	৪৩.২
৩	পূর্বস্থলী	৭৪৯৫১	৪২৬৩৫	বি তর্কতীর্থ (কংগ্রেস)	৫১.৪	বি সি ভাওয়াল (সি পি আই)	৪৫.৩
৪	মন্তেশ্বর	৭৩৫২৬	৩৯৫৯৪	এস এ এম হবিবুল্লাহ (সি পি আই)	৫০.৬	নারায়ণ চৌধুরী (কংগ্রেস)	৪৯.৪
৫	কালনা	৭৭৯১৮	৪৪৮৩৬	হরেকৃষ্ণ কোঙার (সি পি আই)	৫৩.৪	ডি বি ঘোষ (কংগ্রেস)	৪৫.১
৬	রায়না	৭২৫৪৮	৪১১৯৯	পি কে গুহ (কংগ্রেস)	৬৬.০	দাশরথী তা (এস এস পি)	৩০.৫
৭	বর্ধমান	১০২৪৮০	৫১৩০৩	রাধারাণী মহতাব (কংগ্রেস)	৬৭.৪	বিনয় চৌধুরী (সি পি আই)	৩১.১
৮	গলসী	৭০২০৪	২৯৯১৭	কানাইলালদাস (কংগ্রেস)	৫৪.৯	পি এন ধীবর (ফঃ বঃ মাঃ)	৪৫.১
৯	খণ্ডঘোষ	৬৮২১২	২৩০৩৮	জে এল ব্যানার্জী (কংগ্রেস)	৫৩.০	এফ সি রায় (নির্দল)	১৯.০
১০	আউসগ্রাম	৭১৭৪৬	২৮১১৮	মনোরঞ্জন বক্সী (নির্দল)	৩০.৯	এল জি ঘটক (কংগ্রেস)	২৮.৯
১১	ভাতার	৮২৫৪৫	৩৮৪৭৪	অশ্বিনী রায় (সি পি আই)	৫৫.৪	এস এস গুপ্ত (কংগ্রেস)	৪০.০
১২	রাণীগঞ্জ	৭১৩৩৬	২৪১৯৫	লক্ষ্মণ বাগদী (সি পি আই)	৫২.৬	ডি মণ্ডল (কংগ্রেস)	৩৯.৮
১৩	দুর্গাপুর	৮১৬৭৩	৩৫১৭৪	আনন্দ গোপাল		অজিত সেন	২১.০

				মুখোপাধ্যায় (কংগ্রেস)		(এফ বি এল)	
১৪	জামুরিয়া	৬২৬০০	১৯৭৮৬	এ মণ্ডল (কংগ্রেস)	৫৭ ৬	তিনকড়ি মণ্ডল (পি এস পি)	৩৩.৪
১৫	বারাবনী	৬৫৬৩৪	২২৩২৬	এইচ জি চক্রবর্ত্তী (সিপি আই)	৪২.৫	আর কে রায় (কংগ্রেস)	৩৬.৮
১৬	কুলটি	৪১৫০৬	২০৪৮০	জে শর্মা (কংগ্রেস)	৩৯ ৩	তাহের হোসেন (সিপি আই)	২৯.৪
১৭	হীরাপুর	৬১১৯৬	২৭৬৯২	জি আর মিত্র (কংগ্রেস)	৪৯ ৮	সি এস মুখার্জী (সিপি আই)	৩৫.৬
১৮	আসানসোল	৭০৭৭৫	৩০০৭৪	বিজয় পাল (সিপি আই)	৪৩ ৭	এস ডি ঘটক (কংগ্রেস)	২৭.৭

চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন : ১৯৬৭

ক্র নং	কেন্দ্র	মোট ভোট	প্রদত্ত ভোট	বিজয়ী	প্রাপ্ত % ভোট	পরাজিত	প্রাপ্ত% ভোট
১	হীরাপুর	৬৪১৩৬	৪১৭৮৯	শিবদাস ঘটক (কংগ্রেস)	৩৮.৩	চন্দ্রশেখর মুখার্জী (সিপি এম)	৩৬.৫
২	কুলটি	৬৭২০৯	৩৭২৫২	জয় নাবাযণ শর্মা (কংগ্রেস)	৩৫ ১	টি এন চক্রবর্তী (এস এস পি)	৩২ ৭
৩	বারাবনী	৬৪৩৮৮	৩৬৬৪০	মিহির উপাধ্যায় (কংগ্রেস)	৪৯.২	এস বি রায় (সিপি এম)	৩৯.০১
৪	আসানসোল	৬৯৩২০	৩৯৪১৩	জি আব মিত্র (কংগ্রেস)	৪৫.০	বামাপদ মুখার্জী (সিপি এম)	৩৩.৯
৫	রাণীগঞ্জ	৬৪১৪৯	৩৭৬৯৪	হারাধন বায় (সিপি এম)	৪৮.১	এস পি ঘোষ (কংগ্রেস)	৪৫.১
৬	জামুরিয়া	৪৮৬৫৭	২৫৪২২	তিনকড়ি মণ্ডল (সিপি এম)	৫৩.৯	অমরেন্দ্র মণ্ডল (কংগ্রেস)	৪৩.২
৭	উখরা	৬৬১২৬	৩৭২৫৯	হারাধন মণ্ডল (কংগ্রেস)	৪৬.৯	লক্ষণ বাগদী (সিপি এম)	৪০.৩
৮	দুর্গাপুর	৮৯৯৮৯	৫৯৪৭৮	দিলীপ মজুমদাব (সিপি এম)	৪৯.৬	আনন্দ গোপাল মুখার্জী (কংগ্রেস)	৪৬.৬
৯	ফরিদপুর	৬৪৩৯১		মনোরঞ্জন বক্সি (বি এ সি)	৪৯ ৫	এল জি ঘটক (কংগ্রেস)	৪৬.৯
১০	আউসগ্রাম	৭৪৭৬৮	৩৭১০৩	কৃষ্ণচন্দ্র হালদাব (সিপি এম)	৫১.৯	কানাইলাল দাস (কংগ্রেস)	৩৮.৮
১১	ভাতার	৬৫৩৮৫	৩৫৫৭৫	শান্তিময় হাজরা (কংগ্রেস)	৩৮ ২	অশ্বিনী রায (সিপি আই)	৩৬.৯
১২	গলসী	৬৮০৫৯	৪১৯৫১	ফকিরচন্দ্র বায় (নির্দল)	৫৭.৬	সুধীর চ্যাটার্জী (কংগ্রেস)	৩৪.৮
১৩	বর্ধমান (উঃ)	৭১২৬৮	৪৫৪১৮	সৈয়দ শাহেদুল্লাহ (সিপি এম)	৪৮ ৫	জি বসু (কংগ্রেস)	৪১ ৯

১৪	বর্ধমান(দঃ)	৮২২৭৪	৪৬৫৫৭	এস বি চৌধুরী (কংগ্রেস)	৪৫.৭	বিনয় চৌধুরী (সিপিএম)	৪১.৮
১৫	খণ্ডঘোষ	৬৫৩৩৮	৩৩৩৯৬	পি এন ধীবর (কংগ্রেস)	৪৫.০	গোবর্ধন পাকড়ে (এস এস পি)	৪০.৪
১৬	রায়না	৭০৮৯১	৪৪৭৭৪	দাশরথী তা (পি এস পি)	৩৭.৯	প্রবোধ গুহ (কংগ্রেস)	৩৬.০
১৭	জামালপুর	৬৬০৯২	৩৭৪৪২	পুরঞ্জয় প্রামাণিক (কংগ্রেস)	৬৪.৫	টি সরকার (সিপিএম)	২৪.৯
১৮	মেমারী	৭৩৩১৩	৫০১২৬	পি বিষয়ী (কংগ্রেস)	৪৯.৫	বিনয় কৃষ্ণ কোঙার (সিপিএম)	৪৭.৬
১৯	কালনা	৬৯৪৭১	৪৮৭৫৪	হরেকৃষ্ণ কোঙার (সিপিএম)	৪৭.৬	ডি বি ঘোষ (কংগ্রেস)	৪৪.৯
২০	নাদনঘাট	৭০২২৩	৫২৭৭০	পি সি গোস্বামী (কংগ্রেস)	৫১.৩	এস সি ভাওয়াল (সিপিএম)	৪১.৬
২১	মন্তেশ্বর	৭০৯৫২	৪৭৫৮১	নারায়ণ চৌধুরী (কংগ্রেস)	৫৬.৮	এ এম হবিবুল্লাহ (সিপিএম)	৩৭.৪
২২	পূর্বস্থলী	৭০৫৯৭	৪৭৭১১	ললিত হাজরা (সিপিএম)	৪৬.৮	রমা দেবী (কংগ্রেস)	৪৩.১
২৩	কাটোয়া	৭৪৪৪৫	৪৪৯০১	সুবোধ চৌধুরী (সিপিএম)	৪৮.৮	টি ব্যানার্জী (কংগ্রেস)	৪৭.৪
২৪	মঙ্গলকোট	৭০০৫০	৩৭৯৩৫	এন সাত্তার (কংগ্রেস)	৫২.৪	এস এস চৌধুরী (সিপিএম)	৪৭.৬
২৫	কেতুগ্রাম	৭৬৩২৪	৪১৩২৪	প্রভাকর মণ্ডল (কংগ্রেস)	৫২.৬	নারায়ণ দাস (সিপিএম)	৪৭.৫

১৯৬৯ সালের নির্বাচন

ক্র নং	কেন্দ্র	মোট ভোট	প্রদত্ত ভোট	বিজয়ী	প্রাপ্ত % ভোট	পরাজিত	প্রাপ্ত% ভোট
১	হীরাপুর	৭৪৩৬৮	৪৫২১৬	বামাপদ মুখার্জী (সিপিএম)	৫৭.৮	শিবদাস ঘটক (কংগ্রেস)	৪২.২
২	কুলটি	৬৯৪৪৮	৩৫৪০০	টি এন চক্রবর্ত্তী (এস এস পি)	৬০.৭	জয়নারায়ণ শর্মা (কংগ্রেস)	৩৬.৫
৩	বারাবনী	৭১৪৩৮	৩৮১৫৮	এস বি রায় (সিপিএম)	৬১.৩	মিহির উপাধ্যায় (কংগ্রেস)	৩৮.৭
৪	আসানসোল	৬৯৩২০	৩৯৪১৩	লোকেশ ঘোষ (সিপিএম)	৫৫.৯	জি আর মিত্র (কংগ্রেস)	৩৮.৭
৫	রাণীগঞ্জ	৭৫৫০৬	৪৪৪২৬	হারাধন রায় (সিপিএম)	৫৪.৩	এস সি ঘোষ (কংগ্রেস)	৪১.৭
৬	জামুরিয়া	৫৫৫০৪	২৮২৬৬	অমরেন্দ্র মণ্ডল	৫০.৭	দুর্গাদাস মণ্ডল	৪৭.৪

						(এস এস পি)	
৭	উখরা	৭১৮৩২	৩৫৯৯৭	লক্ষ্মণ বাগদী (সি পি এম)	৫৩.৭	হাবাধন মণ্ডল (কংগ্রেস)	৪৬.৫
৮	দুর্গাপুর	১২৮৭৩১	৭৯৬৬৮	দিলীপ মজুমদার (সি পি এম)	৫১ ৬	আনন্দ গোপাল মুখার্জী (কংগ্রেস)	৪৮.৪
৯	ফরিদপুর	৬৯৩০৪	৩৯৬৩৬	মনোরঞ্জন বক্সী (বাংলা কং)	৫১.৭	এল জি ঘটক (কংগ্রেস)	৪৬.৮
১০	আউসগ্রাম			কৃষ্ণচন্দ্র হালদার (সি পি এম)	৬০.১	শঙ্কর দাস (কংগ্রেস)	৩৫.৬
১১	ভাতার	৬৬৬১৪	৩৯৩৭৯	অশ্বিনী রায় (সি পি আই)	৬৮.৭	শান্তিময় হাজরা (কংগ্রেস)	২৪.২
১২	গলসী	৬৯১৮৬	৪৩৩১৬	ফকিরচন্দ্র রায় (নির্দল)	৬৬.১	এস কে চ্যাটার্জী (কংগ্রেস)	৩৩.৯
১৩	বর্ধমান (উঃ)	৭৩৫৯৪	৪৭৮২৮	দেবব্রত দত্ত (সি পি এম)	৬০.৯	জে কে বিশ্বাস (কংগ্রেস)	৩৩.৭
১৪	বর্ধমান (দঃ)	৯০৬৬৫	৫৩১৬১	বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী (সি পি এম)	৫৫ ৫	এস বি চৌধুরী (কংগ্রেস)	৪৪.৫
১৫	খণ্ডঘোষ	৬৬০৪৩	৩৭২৯৯	গোবর্ধন পাকড়ে (এস এস পি)	৬৬.৯	পি এন ধীবর (কংগ্রেস)	৩০ ৮
১৬	রায়না	৭২৩২২	৪৮৫৫৯	পি জি গুহ (সি পি এম)	৫৫ ২	দাশরথী তা (কংগ্রেস)	৩৭.৪
১৭	জামালপুর	৬৬৬৫৭	৪২৪৮৫	বাসুদেব মালিক (বাংলা কং)	৬০.৪	পুরঞ্জয় প্রামাণিক (কংগ্রেস)	৩৯.৬
১৮	মেমারী	৭৫৭৯২	৫৪৫৪৮	বিনয় কোঙার (সি পি এম)	৫৮.৯	পি বিষয়ী (কংগ্রেস)	৪০.৮
১৯	কালনা	৭২০৯৫	৫২৫৫৯	হরেকৃষ্ণ কোঙার (সি পি এম)	৫৭.০	ডি বি ঘোষ (কংগ্রেস)	৪৩ ০
২০	নাদনঘাট	৭১৫২৫	৫৪০৪৪	এ এম হবিবুল্লাহ (সি পি এম)	৫৩.৫	পি সি গোস্বামী (কংগ্রেস)	৪৫.৯
২১	মন্তেশ্বর	৭২০৬৬	৪৮৭৮৮	কে এন এইচ চৌধুরী (সি পি এম)	৫৩ ৫	নারায়ণ চৌধুরী (কংগ্রেস)	৩৭ ২
২২	পূর্বস্থলী	৬৯৪৫০	৫০১৬৮	এইচ কে মোল্লা (সি পি এম)	৫২ ৮	রমা দেবী (কংগ্রেস)	৪৫.৭
২৩	কাটোয়া	৭৬২৫৮	৫২৫২৪	নিত্যানন্দ সবকার (কংগ্রেস)	৫১.৪	এইচ এম সিনহা (সি পি এম)	৪৭.২
২৪	মঙ্গলকোট	৭০৯৬২	৪২৫২৭	নিখিলানন্দ সর (সি পি এম)	৬৩.১	এন সাত্তার (কংগ্রেস)	৩৬ ৯
২৫	কেতুগ্রাম	৭৭০২৯	৪৩৬০৪	রামগতি মণ্ডল (সি পি এম)	৫৬.৭	প্রভাকর মণ্ডল (কংগ্রেস)	৪৩.৩

১৯৭১ এবং ১৯৭২-এর নির্বাচন

কেন্দ্র	১৯৭১		১৯৭২		
হীরাপুর	সি পি এম	১৮,৬০৩	সি পি এম	১৮,০৬৮	(বামাপদ মুখার্জী)
	কংগ্রেস	৯,৯৪৫	কংগ্রেস	১৯,০৬৮	(তৃপ্তি আইচ)
	সি পি আই	১১,১৪৩	এস এস পি	২,০৮১	
	আদি কংগ্রেস	১,১৩৪			
	বাংলা কংগ্রেস	৩৫৭			
কুলটি	কংগ্রেস	১২,৮২৮	কংগ্রেস	১৬,৬৮৭	(রাম দাস ব্যানার্জী)
	সি পি এম	১০,৫০৯	সি পি এম	৮,৫৪১	(চন্দ্রশেখর মুখার্জী)
	বাংলা কংগ্রেস	৪,২৭২	এস এস পি	২,৮৩২	
	এস এস পি	৩,৬৭৮			
	আদি কংগ্রেস	১,৩৪৯			
বারাবনী	সি পি এম	২০,২১১	সি পি এম	১১,১৫০	(সুনীল বসু রায়)
	কংগ্রেস	১৩,৮৭৭	কংগ্রেস	২৯,২১৪	(সুকুমার ব্যানার্জী)
	সি পি আই	৫,৬০৮			
আসানসোল	সি পি এম	১৯,০৬৩	সি পি এম	১৫,৯৪০	(বিজয় পাল)
	সি পি আই	১৮,৩০৫	সি পি আই	২৪,০২১	(নিরঞ্জন ডিহিদার)
	আদি কংগ্রেস	৫,২৬৩			
রাণীগঞ্জ	সি পি এম	৩২,১৬১	সি পি এম	২১,৮৪০	(হারাধন রায়)
	কংগ্রেস	৭,৭৫১	কংগ্রেস	১৩,৫৯৮	(রবীন্দ্রনাথ মুখার্জী)
	সি পি আই	৬,৭৭৩			
জামুরিয়া	সি পি আই	১৫,৩৯৮	সি পি এম	১০,৩৯০	(দুর্গাদাস মণ্ডল)
	কংগ্রেস	১০,৪৪৮	কংগ্রেস	১৪,৫০৮	(অমরেন্দ্র মণ্ডল)
	এস এস পি	১,২৬২			
উখরা	নির্বাচন হয় নি		সি পি এম	১৩,৪৯০	(লক্ষ্মণ বাগদী)
১৯৬৯	সি পি এম	১৮,১৪৪	কংগ্রেস	২১,৩২৯	(গোপাল মণ্ডল)
	কংগ্রেস	১৫,৮৯৯			
দুর্গাপুর	সি পি এম	৪০,৯৯৯	সি পি এম	১৩,৪৯০	(দিলীপ মজুমদার)
	আদি কংগ্রেস	৩৬,২২৩	কংগ্রেস	৪৭,৩৯০	(আনন্দ গোপাল মুখার্জী)
	সি পি আই	৬,২১০			
ফরিদপুর	সি পি এম	১৭,৩৫৬	সি পি এম	১৮,৮৪০	(তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়)
	কংগ্রেস	৯,১৬০	কংগ্রেস	২১,২৭৪	(অজিত ব্যানার্জী)

	সি পি আই	৭,০৩৬			
	আদি কংগ্রেস	৫,৫০১			
আউসগ্রাম	সি পি এম	২৮,৪৪৫	সি পি এম	২৪,০২১	(শ্রীধর মালিক)
	বাংলা কংগ্রেস	১৭,৮৪৯	কংগ্রেস	২৩,৬৯২	(বংশীধর সাহা)
	সি পি আই	৩,৭০৪			
ভাতার	সি পি এম	১৮,৫১৬	সি পি এম	১১,৯৭৪	(অনাথ বন্ধু ঘোষ)
	বাংলা কংগ্রেস	১২,৪৭৭	কংগ্রেস	৩১,৮২২	(ভোলানাথ সেন)
	সি পি আই	৫,৩৯৯			
	আর এস পি	২,৫৯৫			
গলসী	সি পি এম	২১,২৯৯	সি পি এম	১৮,১৪৫	(অনিল রায়)
	বাংলা কংগ্রেস	১২,৩১৪	সি পি আই	২২,৪১৬	(অশ্বিনী রায়)
	ফঃ বঃ	২,৫৯৮			
	আদি কংগ্রেস	১,৪৪৩			
বর্ধমান উঃ	সি পি এম	৩৩,৯৫৪	সি পি এম	১৭,৫৯৫	(দেবব্রত দত্ত)
	কংগ্রেস	১৮,৪৩০	কংগ্রেস	৩৬,৮০৮	(কাশীনাথ তা)
	ফঃ বঃ	১,৩৪৯			
বর্ধমান দঃ	সি পি এম	২৮,২৫৭	সি পি এম	১৮,৫৪৪	(বিনয় চৌধুরী)
	কংগ্রেস	২৬,৯৮৫	কংগ্রেস	৪৭,০৯২	(প্রদীপ ভট্টাচার্য)
	আদি কংগ্রেস	৮১৮			
	নির্দল	৩৯৪			
খণ্ডঘোষ	সি পি এম	২২,৮৭১	সি পি এম	১৭,৪৫১	(পূর্ণচন্দ্র মালিক)
	কংগ্রেস	১৭,৫৮৮	কংগ্রেস	২৯,৪৬৩	(মনোরঞ্জন প্রামাণিক)
	আর এস পি	২,৪০৩			
রায়না	সি পি এম	৩১,৫৪৯	সি পি এম	২২,৬৭১	(গোকুলানন্দ রায়)
	কংগ্রেস	১৯,১৪২	কংগ্রেস	২৯,২৯৭	(সুকুমার চ্যাটার্জী)
	আদি কংগ্রেস	১,৬৫৬			
জামালপুর	ফঃ বঃ মাঃ	২২,৩৯৬	ফঃ বঃ মাঃ	১৫,৯৩৫	(নরেন্দ্র সরকার)
	কংগ্রেস	১৮,৭১৩	কংগ্রেস	৩০,৮২৭	(পুরঞ্জয় প্রামাণিক)
মেমারী	সি পি এম	৩১,৩৬৫	সি পি এম	১১,২৩৯	(বিনয় কোঙার)
	কংগ্রেস	২১,১৬৬	কংগ্রেস	৫৩,১১৯	(নব কুমাব চট্টোপাধ্যায়)
কালনা	সি পি এম	৩২,৮৯৬	সি পি এম	৯২৯	(দিলীপ দুবে)
	কংগ্রেস	২[illegible],৯৩[illegible]	কংগ্রেস	৬২,৩৩৬	(নুরুল ইসলাম)

	আদি কংগ্রেস	১,৭৫৪			
মন্তেশ্বর	সি পি এম	২৯,৭৫০	সি পি এম	৫,১৫৯	(কাশীনাথ হাজরা চৌধুরী)
	কংগ্রেস	১৭,৬৭২			
	বাংলা কংগ্রেস	১,৯৭০	কংগ্রেস	৫৩,৭৬৮	(তুহিন সামন্ত)
পূর্বস্থলী	সি পি এম	৩০,৬১৭	সি পি এম	১৪,৭৪৬	(মোল্লা হুমায়ুন কবীর)
	কংগ্রেস	২৫,২৯২	কংগ্রেস	৩২,৪৮৬	(নুরুন্নেসা সাত্তার)
কাটোয়া	সি পি এম	২৭,৬৫৯	সি পি এম	২১,৭০৩	(ডাঃ হরমোহন সিংহ)
	কংগ্রেস	২০,৯৯০	কংগ্রেস	৩৩,০৬১	(সুব্রত মুখার্জী)
	আদি কংগ্রেস	১,৯১৬			
মঙ্গলকোট	সি পি এম	২৮,৮১৪	সি পি এম	১৮,১১৮	(নিখিলানন্দ সর)
	বাংলা কংগ্রেস	১৬,৮১৪	কংগ্রেস	২৫,৩৭৯	(জ্যোতির্ময় মজুমদার)
কেতুগ্রাম	সি পি এম	১৮,৪০৮	সি পি এম	১৭,৪৮৩	(দীনবন্ধু মজুমদার)
	কংগ্রেস	১৭,৪৮২	কংগ্রেস	৩০,০৪৪	(প্রভাকর মণ্ডল)
	সি পি আই	৫,৭৯৭			

১৯৭৭ সালের নির্বাচন

ক্র নং	কেন্দ্র	মোট ভোট	প্রদত্ত ভোট	বিজয়ী	প্রাপ্ত % ভোট	পরাজিত	প্রাপ্ত% ভোট
১	কুলটি	৯১৭৮০	৩৭৩৫৮	মধু ব্যানার্জী (মাঃ ফঃ বঃ)	৩৪.৩	শিবদাস ঘটক (কংগ্রেস)	৩৩.৩
২	বারাবনী	১০৩৮২৩	৪৬৫১২	এস বি রায় (সি পি এম)	৪৯.৬	সুকুমার ব্যানার্জী (কংগ্রেস)	৩৪.৫
৩	হীরাপুর	৯২৭০০	৪১৭৭৫	বামাপদ মুখার্জী (সি পি এম)	৫৮.৬	শান্তিময় আইচ (কংগ্রেস)	২২.৪
৪	আসানসোল	১০৪৭২৮	৩৮১৭০	বিজয় পাল (সি পি এম)	৪৬.৬	জি আর মিত্র (জনতা)	৩৩.৫
৫	রাণীগঞ্জ	৯৭৯৫৩	৪২৩৮৯	হারাধন রায় (সি পি এম)	৫৯.৪	এস মুখার্জী (কংগ্রেস)	১৪.৯
৬	জামুরিয়া	৯০৭২৮		বিকাশ চৌধুরী (সি পি এম)	৫২.২	চন্দ্র শেখর ব্যানার্জী (কংগ্রেস)	২৩.১
৭	উখরা	৯৯৬৩৯	৪২৪০৩	লক্ষণ বাগদী (সি পি এম)	৫২.৬	গোপাল মণ্ডল (কংগ্রেস)	৩০.৮
৮	দুর্গাপুর-১	১২৩০৫৯		দিলীপ মজুমদার (সি পি এম)	৫৯.৩	টি ডি গুপ্ত (কংগ্রেস)	২১.৪
৯	দুর্গাপুর-২	১৪৪৭১৫	৫৪২৬৯	তরুণ চ্যাটার্জী (সি পি এম)	৬৪ ১	অজিত ব্যানার্জী (কংগ্রেস)	২২ ৩

১০	কাঁকসা	৮০৪১১	৪৫৯৪৯	এল এন সাহা (সি পি এম)	৬৩.৫	এস কে সাহা (কংগ্রেস)	২২.০
১১	আউসগ্রাম	৮৬৩১৯		শ্রীধর মালিক (সি পি এম)	৬৩.৫	মদন লোহার	১৮.৩
১২	ভাতার	৮৮০৪৭	৫২৮৫২	ভোলানাথ সেন (কংগ্রেস)	৫৬.৫	এস পি চ্যাটার্জী (এফ এব এল)	৩৯.৭
১৩	গলসী	৮৫৪১৩	৪৩৬২৩	দেবরঞ্জন সেন ফঃ বঃ	৬২.৩	নিরদেন্দু কোঙার	১৮.৯
১৪	বর্ধমান (উঃ)	৯৪৭১৪	৫৫৫১৬	ডি এন তা (সি.পি. এম)	৬৫.৫	এস সি দাঁ (কংগ্রেস)	২০.৮
১৫	বর্ধমান (দঃ)	১৩১১৯৮		বিনয় চৌধুরী (সি.পি. এম)	৫১.৮	প্রদীপ ভট্টাচার্য্য (কংগ্রেস)	২৯.৮
১৬	খণ্ডঘোষ	৮২৭৪৩		পূর্ণচন্দ্র মালিক (সি পি এম)	৫৯.৩	মনোরঞ্জন প্রামাণিক (কংগ্রেস)	৩০.৮
১৭	রায়না	৯০২৩১	৫৩০৪৪	রামনারায়ণ গোস্বামী (সি. পি. এম)	৬৩.৪	এ কে ভট্টাচার্য্য (কংগ্রেস)	২২ ৩
১৮	জামালপুর	৮০৫৪৭	৪৩৪৯৩	সুনীল সাঁতরা (ফঃ বঃ মাঃ)	৪৮.০	পুরঞ্জয় প্রামাণিক (কংগ্রেস)	৩৩.৩০
১৯	মেমারী	৯৫৫০১	৫৬৭২০	বিনয় কোঙার (সি পি.এম)	৬৫.২	এস এন পাল (জনতা)	১৭.৮
২০	কালনা	৮৯৩৪২	৫৭৬২১	জি এস রায় (সি পি এম)	৫৬.১	ডি বি ঘোষ (জনতা)	২৩.০
২১	নাদনঘাট	৮২৩৬৫	৫৫৩৭০	এস এ এম হবিবুল্লাহ (সি পি এম)	৬৫.৭	বিশ্বনাথ বসু (কংগ্রেস)	২২.৯
২২	মন্তেশ্বর	৮৬৩৭২	৫০২৭৯	এইচ কে রায় (সি পি এম)	৬৩.৬	তুহিন সামন্ত (কংগ্রেস)	২৪.১
২৩	পূর্বস্থলী	৮৩৫০৮		মনোরঞ্জন নাথ (সি পি এম)	৬৬.০	রমা দেবী (জনতা)	২৩.১
২৪	কাটোয়া	৯৬৮৫৮	৬০৩৩২	এইচ এম সিনহা (সি পি এম)	৬১.২	এন. ঠাকুর (জনতা)	২১.২
২৫	মঙ্গলকোট	৮১৩২২	৪৯৭২৭	নিখিলানন্দ সর (সি পি এম)	৬০.৮	মদন চৌধুরী (জনতা)	২৮.৮
২৬	কেতুগ্রাম	৮৬০৩৪	৪৮১৪১	রাইচরণ মাজি	৬০.৮	প্রভাকর মণ্ডল	১৯.৫

১৯৮২ এবং ১৯৮৭-র নির্বাচনী ফলাফল

	১৯৮২		১৯৮৭	
কুলটি	৯৯৮৮৪/৬৪২০০		১৩১,৩৭৫/৭৯৫০০	
	মধু ব্যানার্জী (ফঃ বঃ)	৫১.৪%	তুহিন সামন্ত (কংগ্রেস)	৩৯২৯০
	জি ডি নাগ (কংগ্রেস)	৩৯.৫%	মধু ব্যানার্জী (ফঃ বঃ)	২৯৯৩১
বারাবনী	১০৮১৪৫/৭১৮৬৭		১৩২,২৫৯/৯৩৫৫৬	
	অজিত চক্রবর্ত্তী (সি পি এম)	৫২.৪%	অজিত চক্রবর্তী (সি পি এম)	৪৪.৪৯৮

	ধীরাজ সাঁই (কংগ্রেস)	৩৪.৫%	মানিক উপাধ্যায় (কংগ্রেস)	৪১,৯৮৯
হীরাপুর	১০১০৯৭ / ৬৫৭৬৮		১৩২,২৫৯ / ৯৩.৫৫৬	
	বামাপদ মুখার্জী (সি পি এম)	৫১.৫%	সুহৃদ বসু মল্লিক (কংগ্রেস)	৪২,৪৯০
	শিবদাস ঘটক (কংগ্রেস)	৪৫.০%	বামাপদ মুখোপাধ্যায় (সি পি এম)	৩৬,৮৫৬
আসানসোল	১১২০৭৪ / ৬৭৬৫৭		১৩৪,৭৪৭ / ৮০৪৮৫	
	বিজয় পাল (সি পি এম)	৫২.৭%	প্রবুদ্ধ লাহা (কংগ্রেস)	৩৮১৪৩
	সুকুমার ব্যানার্জী (কংগ্রেস)	৪৫.৭%	গৌতম রায় চৌধুরী (সি পি এম)	৩৬৬৫১
রাণীগঞ্জ	১০৭৩১৪ / ৭১৩৫১		১৩৩১৮৫ / ৮৯১৬৬	
	হারাধন রায় (সি পি এম)	৫৮.৩%	বংশগোপাল চৌধুরী (সি পি এম)	৫৫৯৮৮
	এইচ কে গোস্বামী (কংগ্রেস)	৩৩.৮%	কল্যাণী বিশ্বাস (কংগ্রেস)	২৮৫৯৩
জামুরিয়া	১০৩০৭১ / ৭১৫৭০		১৩২৩৩৬ / ৯২৪৯০	
	বিকাশ চৌধুরী (সি পি এম)	৫২.৪%	বিকাশ চৌধুরী (সি পি এম)	৫৩১৮৪
	পি ভট্টাচার্য্য (কংগ্রেস)	৪৪.২%	বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী (কংগ্রেস)	৩১৫০৬
উখরা	১১৬৪৩২ / ৬৮৪৯৫		১৭৮৩১০ / ১০৬৬১৭	
	লক্ষণ বাগদী (সি পি এম)	৫১.১%	লক্ষণ বাগদী (সি পি এম)	৫২৮৭৯
	হারাধন মণ্ডল (কংগ্রেস)	৪৪.৫%	হারাধন মণ্ডল (কংগ্রেস)	৪৬৪৩৫
দুর্গাপুর-১	১০০৭৭/৭৩৯৫২		১২০৩৬৪/৯০৬৬৯	
	দিলীপ মজুমদার (সি পি এম)	৪৮.৬%	দিলীপ মজুমদার (সি পি এম)	৪৬১৭০
	সুদেব রায় (কংগ্রেস)	৪৩.৯%	সুদেব রায় (কংগ্রেস)	৩৯০৫৫
দুর্গাপুর-২	১৩৯৪৩৫/৯৭৮৫৯		১৭২১৯৮/১২২৬১৬	
	তরুণ চ্যাটার্জী (সি পি এম)	৫৫.১%	তরুণ চ্যাটার্জী (সি পি এম)	৬৭,১০৭
	বরেণ রায় (কংগ্রেস)	৪১.৫%	নারায়ণ হাজরা (কংগ্রেস)	৪৯,৯৩৬
কাঁকসা	৯৬১৯৬/৭৬৭১২		১১৫৯৬৫/৮৯৬১২	
	এল এন সাহা (সি পি এম)	৬৩.৩%	কৃষ্ণচন্দ্র হালদার (সি পি এম)	৫৭৪৬৪
	এন এন সাহা (কংগ্রেস)	৩১.৩%	সমীর সাহা (কংগ্রেস)	৩০২৬৯
আউসগ্রাম	৯৯০১৯/৮০৮৫৯		১২৪০৬৮/৯৫২৬৬	
	শ্রীধর মালিক (সি পি এম)	৬৭.৪%	শ্রীধর মালিক (সি পি এম)	৬৫৬১১
	সি কে মণ্ডল (কংগ্রেস)	৩১.৩%	বিশ্বম্ভর সাহা (কংগ্রেস)	২২২৪৫
ভাতার	১০৪৭৯৪		১২৩৭৮১/৯৭৪২৬	
	সৈয়দ মহম্মদ মশীহ (সি পি এম)	৫৪.১%	সৈয়দ মহম্মদ মশীহ (সি পি এম)	৫৫৯৫৮
	ভোলানাথ সেন (কংগ্রেস)	৪৫.৫%	বনমালী হাজরা (কংগ্রেস)	৩৮৪৯৩
গলসী	৯৭৮৩৪/৭৯৩৯৬		১১৯২৯৩/৯২৯৮৯	
	দেবরঞ্জন সেন (ফঃ বঃ)	৫৯.০%	দেবরঞ্জন সেন (ফঃ বঃ)	৫৭৩০৩
	এইচ বি রায় (কংগ্রেস)	৩৬.৪%	অজিত ব্যানার্জী (কংগ্রেস)	৩০৫৬৫
বর্ধমান (উঃ)	১১২৩৯৯/৮৯১২৪		১৩৯৪৯২/১০১৪১৩	
	রামনারায়ণ গোস্বামী (সি পি এম)	৬৫.২%	বিনয় চৌধুরী (সি পি এম)	৬৫৭০৪
	এন এন রেজ্জ (কংগ্রেস)	৩৩.১%	সন্তোষ সাহা শিকদার (কংগ্রেস)	৩৭৪৭৭

নির্বাচনী ফলাফল

বর্ধমান (দঃ)	১৩১৫২৯/৮৮৬৭৫		১৫৪২১৫/১১৪১৪০	
	বিনয় চৌধুরী (সি পি এম)	৫১.১%	নিরুপম সেন (সি পি এম)	৬০০২৭
	এস ডি ব্যানার্জী (কংগ্রেস)	৪৭ ১%	প্রদীপ ভট্টাচার্য্য (কংগ্রেস)	৪৮০৬৯
খণ্ডঘোষ	৯৪০৬৮/৮০৯৪৯		১১১৭১১/৯১৩৬০	
	পূর্ণচন্দ্র মালিক (সি পি এম)	৬০.৬%	শিবপ্রসাদ দলুই (সি পি এম)	৫৯১১২
	মনোরঞ্জন প্রামাণিক (কংগ্রেস)	৩৯.৪%	প্রমথনাথ ধীবর (কংগ্রেস)	৩০৮৯৭
রায়না	১০০৬৯০/৮১৮৩১		১১৫৫৩৪/৯১৫৫২	
	ধীরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী (সি পি এম)	৬৫.৪%	ধীরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী (সি পি এম)	৫৯৫৬৫
	এস চ্যাটার্জী (কংগ্রেস)	৩২.৭%	উদয় শঙ্কর সাঁই (কংগ্রেস)	৩০০২৪
জামালপুর	১০৩২৫৪/৮৬৫৪০		১২২৫২৪/১০২১৮৮	
	সুনীল সাঁতবা (মাঃ ফঃ বঃ)	৫৭.০%	সুনীল সাঁতরা (মাঃ ফঃ বঃ)	৫৮৪৭৯
	পুবঞ্জয় প্রামাণিক (কংগ্রেস)	৪০.৯%	পুরঞ্জয় প্রামাণিক (কংগ্রেস)	৩৯৩৪৩
মেমারী	১১৪২৬৮/৯৩০৬২		১৪৪১৮২/১১৬৬৮৪	
	মহারাণী কোনার (সি পি এম)	৬৩.৯%	মহারাণী কোনার (সি পি এম)	৭৩৫২১
	এস সামন্ত (কংগ্রেস)	৩৫.৭%	নব কুমার চ্যাটার্জী (কংগ্রেস)	৩৯৯০৪
কালনা	১০৩৯৬২/৮৫৭৯৪		১২০৯৯৬/৯৯৩৯৭	
	অঞ্জু কর (সি পি এম)	৫৬.৮%	অঞ্জু কর (সি পি এম)	৫১০৯২
	সুধীর ঘোষ (কংগ্রেস)	৪০.৮%	ধীরেন চ্যাটার্জী (কংগ্রেস)	৩৬৯৭৮
নাদনঘাট	১০৪০৯৯/৮৮০৬২		১২৬৯৪৯/১০৬২৪৯	
	সৈযদ মনসুর হবিবুল্লাহ (সি পি এম)	৫৮.৩%	সৈয়দ মনসুর হবিবুল্লাহ (সি পি এম)	৬০,৩৯৬
	পরেশচন্দ্র গোস্বামী (কংগ্রেস)	৩৯.৭%	স্বপনকুমার দেবনাথ (কংগ্রেস)	৪৩,১৩২
মন্তেশ্বর	১০২৪৩৭/৭৬২৫৫		১২৩৪৭৮/৯২৭৮৪	
	এইচ কে রায় (সি পি এম)	৬০ ৫%	হেমন্ত কুমার রায় (সি পি এম)	৫৫,২৪৭
	পি সি গোস্বামী (কংগ্রেস)	৩৯ ৭%	গৌবগোপাল রায় (কংগ্রেস)	৩১,৭৯১
	৯৮৭২১/৭৮০৫২		১১৯০২৬/৯৩৩২৫	
	মনোরঞ্জন নাথ (সি পি এম)	৫৪.৬%	মনোরঞ্জন নাথ (সি পি এম)	৫১০৩৮
	মুকুল ভট্টাচার্য্য (কংগ্রেস)	৪৩.১%	মুকুল ভট্টাচার্য্য (কংগ্রেস)	৩৭০৭৫
কাটোয়া	১১১১৫৮/৮৫৬৭৬		১২৮৬৭৬/১০০০৯১	
	এইচএম সিনহা (সি পি এম)	৫৩.৩%	অঞ্জন চ্যাটার্জী (সি পি এম)	৫৩২৩৩
	এস মুখার্জী (কংগ্রেস)	৪৩.১%	রবীন্দ্রনাথ চ্যার্টাজী (কংগ্রেস)	৪২৭৪১
মঙ্গলকোট	১০০১৪৮/৭৯৬৫৬		১২২৫৯৩/৯১১৮৯	
	নিখিলানন্দ সর (সি পি এম)	৬২.২%	নিখিলানন্দ সব (সি পি এম)	৫৬৮৬০
	শেখ বোরশেদ (কংগ্রেস)	৩৭ ০%	জগদীশ দত্ত (কংগ্রেস)	২৭৩৭০
কেতুগ্রাম	১০১৪৬৮/৭৯০৪২		১২১২৭৯	
	রাইচবণ মাজি (সি পি এম)	৫৬.৪%	রাইচবণ মাজি (সি পি এম)	৫৮৮৬৮
	এল এন সিনহা (কংগ্রেস)	৪৩ ৬%	প্রভাকব মণ্ডল (কংগ্রেস)	৩৩৫৮৮

পরিশিষ্ট

১৯৯১ সালের বিধানসভা নির্বাচন

কেন্দ্র	ভোটার সংখ্যা/ প্রদত্ত ভোট	নাম ও দল	প্রাপ্ত ভোট	%
কুলটি	১,৪৬,৮৬২/৯২,৮৫০	১. মানিকলাল আচার্য/ফ.ব.	৪৩০৩০	৪৮.৯৮
		২. হৃষিকেশ পুরতুণ্ডি/ভাজপা	২৪,০৭৪	২৭.৪০
		৩. তুহিন সামন্ত/জাতীয় কং	১৭,১৪৪	১৯.৫১
বারাবণি	১,৫৫,৫০১/১,১৪,২৪৬	১.এস.আর.দাস/সি.পি.এম.	৫০,৫৬০	৪৫.৫০
		২. মানিক উপাধ্যায়/জাতীয় কং	৪৮,০৯৭	৪৩.২৮
হীরাপুর	১,৪৪,৮০৫/৯১,৫৪৬	১. মমতাজ হাসান/জনতা পার্টি	৩০,২০৯	৩৪.৫৫
		২. সুহৃদ বসু মল্লিক/জাতীয় কং	২৮,৬৮৪	৩২.৭২
		৩. প্রদীপ মজুমদার/ভাজপা	২৫,৬১৭	২৯.২২
আসানসোল	১,৬৬,৫০৭/১,০৩,৭৬৭	১. গৌতম রায়চৌধুরী/সি.পি.এম	৪৩,৮৪৪	৪৩,৫১
		২. বজরঙ্গি গুপ্ত/ভাজপা	৩১,৬০২	৩১.২২
		৩. প্রবুদ্ধ লাহা/জাতীয় কং	২৪,২২৮	২৩.৯৩
রাণীগঞ্জ	১,৪৬,৫৭৮/১,০১,৮৭৭	১.বংশগোপাল চৌধুরী/সি.পি.এম	৫৮,৯০৩	৫৯.৫৪
		২. শংকর দত্ত/জাতীয় কং	২৪,৭৯৫	২৫.০৬
জামুরিয়া	১,৪৮,৯৮৬/৯৮,৭৪৯	১. বিকাশ চৌধুরী/সি.পি.এম	৫৮,৬৪২	৬০.৯৬
		২. তাপস ব্যানার্জী/জাতীয় কং	২২,৫২০	২৩.৪১
উখড়া	২,১৬,৯৬৮/১,১৯,৮৮০	১. লক্ষ্মণবাগ্দী/সি.পি.এম	৫২,০২২	৪৪.৮০
		২. গোপা[illegible] মণ্ডল/জাতীয় কং	৪৬,০৩৭	৩৯.৬৪
দুর্গাপুর-১	১,৪৯,৩৭৯/১,০২,০৫৯	১.দিলীপ মজুমদার/সিপিএম	৫০,৫৪৬	৫০.৫৪
		২. নারায়ণ হাজরা চৌধুরী /কং	৩৪,৪৫১	৩৪.৪৪
দুর্গাপুর-২	২,১৩,৫৬৬/১,৪৮,৮২১	১. তরুন চ্যাটার্জী/সিপিএম	৭৩,৩৭১	৫০.৫০
		২. অসিত চট্টরাজ/জাতীয় কং	৫০,১৩৯	৩৪.৫১
কাঁকসা	১,৩৮,২৬২/১,০৬,৫১৭	১. কৃষ্ণচন্দ্র হালদার/সিপিএম	৬৫,৮১৭	৬৩.৭৪
		২. মানিকলাল বাউরী/জাতীয় কং	২৫,৩২২	২৪.৫২
আউসগ্রাম	১.৪১,৪৮৬/১,০৮,৫৪২	১. শ্রীধর মালিক/ সিপিএম	৬৭,২৫৯	৬৩.৩৬
		২. ছায়ারাণী চৌধুরী/জাতীয় কং	২৫,৭০৭	২৪ ২২
ভাতাড়	১,৩৮,৭০১/১,১২,৬৩১	১. মেহবুব জাহেদী/সি.পি.এম.	৫৬,৪৪৮	৫১.২২
		২. ভোলানাথ সেন/জাতীয় কং	৪৮,৭৮৫	৪৪.২৬
গলসী	১,৩৪ ৫৯৩/১,০৩,১৬৮	১. ইদ্রিস মণ্ডল/ফ.ব.	৫৯,৫১৭	৬০.০১
		২. চম্পক গড়াই/জাতীয় কং	২২,৫১৩	২২.৭০
বর্ধমান উত্তর	১,৬৩,১১১/৩,১৬,৪৩১	১. বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী/সি.পি.এম.	৮০,৬১৬	৬২.৩৬
		২. সাধন ঘোষ/জাতীয় কং	৩৭.৩৪১	২৮ ৮৯
বর্ধমান দক্ষিণ	১.৮৭.৭৯৯/১.৩৯,১৫২	১. শ্যামাপ্রসাদ বসু/সি.পি.এম.	৬৩,৭৮৯	৪৬.৭৯

		২. শ্যামদাস ব্যানার্জী/জাতীয় কং	৫০,৩৬৪	৩৬.৯৪
খন্ডঘোষ	১,২৮,২৯৮/১,০৪,৯৮৭	১. শিবপ্রসাদ দলুই/সি.পি.এম	৬৬,৯১৩	৬৪.৯৫
		২ শঙ্করনাথ মাঝি/ জাতীয় কং	২৬,৪৮৪	২৫.৭১
রায়না	১,৩৪.৬৪৬/১,০৯,৮৯৪	১ ধীরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী/সি.পি এম.	৬৭,২১৭	৬২.১৬
		২. সুনীল দাস/জাতীয় কং	৩০,১৬৫	২৭.৮৯
জামালপুর	১,৪৩,২৫৭/১,২১,০৭৯	১. সমর হাজরা/সি.পি.এম.	৭০,৪৩৬	৫৯.২১
		২. অজয় প্রামাণিক/ জাতীয় কং	৩৩,৭৯৮	২৮ ৪১
মেমারী	১,৬৫,৪৮৮/১,৩৭,৪৩৮	১. মহারাণী কোঁয়ার/সি.পি.এম	৮২,৬০২	৬০.৯৯
		২. আব্দুল ওহিদ মোল্লা/জাতীয় কং	৩৬,০১৮	২৬.৬০
কালনা	১,৪৩,৮৫২/১,২০,৪৮৯	১. অঞ্জু কর/সি.পি.এম.	৬৪,৫৬০	৫৪.৪৩
		২. ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়/কং	৩৭,৯১০	৩১.৯৬
নাদনঘাট	১,৫০,১৫০/১,২৫,৫১২	১. বীরেন ঘোষ/সি.পি.এম.	৬২,৩৭০	৫০.৮১
		২. পরেশ গোস্বামী/জাতীয় কং	৩৫,৫৫৩	২৮.৯৬
		৩. চিত্তরঞ্জন দেবনাথ/ভাজপা	২৩,৪৭১	১৯.১২
মন্তেশ্বর	১,৪০,৩৬৫/১,০৬,১৯৯	১. আবু আয়েস মণ্ডল/সি.পি.এম.	৬০,১৯৯	৫৮ ০০
		২. বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য/জাতীয় কং	৩০,৫৭৮	২৯.৪৬
পূর্বস্থলী	১,৩৬,৬৪৪/১,১০,৩৬৯	১ মনোরঞ্জন নাথ/ সি.পি.এম.	৪৭,৪৭৮	৪৪.২৩
		২ স্বপন ভট্টাচার্য/ভাজপা	২৮.১৬৮	২৬,২৪
		৩. মানবেন্দ্র রায়/জাতীয় কং	২৪,২৫৯	২২.৬০
কাটোয়া	১,৪৯,৫৬৪/১,২০,৫১৩	১. অঞ্জন চ্যাটার্জী/সি.পি.এম.	৪৯,২২৩	৪২.০৮
		২. রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী/জাতীয় কং	৪৫,১৮০	৩৮.৬৩
মঙ্গলকোট	১,৩৩,৩০৫/১,০১,৪৪০	১ সমর বাওড়া/সি.পি.এম.	৫৫,৯৯১	৫৬.৪৪
		২. হৃদয় কৃষ্ণ সর/জাতীয় কং	২৫,৭৮১	২৫.৯৯
কেতুগ্রাম	১,৩৭,৪৪৭/১,০৭,৯৭২	১. রাইচরণ মাঝি/সি.পি.এম	৫৬,৬৯৭	৫৪.৮৬
		২. চাঁদকুমার সাহা/ভাজপা	২১.৭৩৮	২১.৩০
		৩ বনানী মাঝি/জাতীয় কং	২১,৬২৫	২০.৯২

১৯৯৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন

কেন্দ্র	ভোটার সংখ্যা/ প্রদত্ত ভোট	নাম ও দল	প্রাপ্ত ভোট	%
কুলটি	১,৭৩,৮৬১/১,১৯,৬৩১	১. মানিকলাল আচার্য/ফ.ব.	৪৯,৮৫২	৪৪.০৩
		২. অজিতকুমার ঘটক/ জাতীয় কং	৪৭,৯৮৭	৪২.৩৮
বারাবনি	১,৬৬,০৬৩/১,২৫,১১৬	১. মানিক উপাধ্যায়/জাতীয় কং	৬১,২২৫	৫০.৪০
		২. পরেশ মাঝি/সি.পি এম	৫১,৯৫৯	৪২.৭৭
হীরাপুর	১,৪৮,২৯৫/১,০১,৪৯০	১ শ্যামদাস ব্যানার্জী/ জাতীয় কং	৩১৮১৩	৩৩.১৩

		২. মমতাজ হোসেন/জনতা দল	২৫,৮৭৩	২৬.৭৪
		৩. পরেশ দত্ত/ভাজপা	২৩,৪৪৩	২৪.৪১
আসানসোল	১,৭৪,৮৮৩/১,২১,৪৯৯	১. তাপস ব্যানার্জী/জাতীয় কং	৫৮,৮৪৫	৫০.০৬
		২. গৌতম রায়চৌধুরী/সি.পি.এম.	৪৭,২১১	৪০.১৬
রাণীগঞ্জ	১,৬০,১০৩/১,১৭,০৯	১. বংশগোপাল চৌধুরী/সি.পি.এম.	৭১,৩৩৭	৬২.৮১
		২. সেনাপতি মণ্ডল/জাতীয় কং	৩৫,৬৮৯	৩১.৪৩
জামুরিয়া	১,৫৫,৫১৩/১,১২,৬৬৩	১. পেলব কবি/ সি.পি.এম.	৬৮,৭৫৮	৬৩.০৬
		২. সন্তোষ অধিকারী/জাতীয় কং	৩২,৯৩৬	৩০.২১
উখড়া (তফঃ)	২.৩০,৫৫৪/১,৪৪,২৩৩	১. লক্ষণবাগদী/সি.পি.এম.	৬৭২৯৮	৪৮.২২
		২. জেঠু রাম/জাতীয় কং	৫৮,৭২২	৪২.০৭
দুর্গাপুর -১	১,৫৬,৪৮৩/১,১৭,৯৪৪	১. মৃণাল ব্যানার্জী/সি.পি.এম.	৫৯,৬৩০	৫১.৮৪
		২. মৃগেন্দ্রনাথ পাল/জাতীয় কং	৪২,৬৩৫	৩৭.০৭
দুর্গাপুর - ২	২,৫৩,৩৮৮/১,৯৩,১৯৭	১. দেবব্রত ব্যানার্জী/সি.পি.এম.	৯৫,২৯৮	৫০.৭৮
		২. মলয়কান্তি দত্ত/জাতীয় কং	৬৭,৯০৬	৩৬.১৮
কাঁকসা (তফঃ)	১,৫০,৮৬৮/১,২৩,৭৬৬	অঙ্কুরা সরেন/সি.পি.এম.	৭৪,২৪২	৬১.৬৫
		২. হিমাংশু মণ্ডল/জাতীয় কং	৩০,৭৫৪	২৫.৫৪
আউসগ্রাম (তফঃ)	১,৪৬,৩৩৪/১,২৫,৭৫৭	১. কার্তিকচন্দ্র বাগ/ সি.পি.এম.	৮১,২৭৮	৬৬.১৯
		২. সুকুমার সাহা/জাতীয় কং	৩২,৭৯৭	২৬.৭১
ভাতাড়	১,৪২,৯১৮/১,২২,২১১	১. সুভাষ মণ্ডল/সি.পি.এম.	৭০,৩৪০	৫৮.৯৯
		২. সুশান্ত ঘোষ/জাতীয় কং	৩৯,৩৩৬	৩২.৯৯
গলসী	১,৪২,৪২০/১,২০,৬১৩	১. ইদ্রিস মণ্ডল/ফ.ব.	৭০,২৪২	৬০.৮২
		২. সৈয়দ ইমদাদ আলি/জাতীয় কং	৩১,৩২৭	২৭.১২
বর্ধমান উত্তর	১,৭৬,৩৪১/১,৫৩,২৮৫	১. নিশীথ অধিকারী/সি.পি.এম.	৯৩,৬১৭	৬২.৪৮
		২. রাইমনি দাস/জাতীয় কং	৪৬,০৮১	৩০.৭৫
বর্ধমান দক্ষিণ	২,০১,৮৫৮/১,৬৭,৫০৫	১. শ্যামাপ্রসাদ বসু/সি.পি.এম.	৮২,৬৬৭	৫০.৫৮
		২. সাধনকুমার ঘোষ/জাতীয় কং	৬৮,৩৭৭	৪১.৮৪
খণ্ডঘোষ	১,৩৭,৪৮৮/১,১৮,৫০৬	১. শিবপ্রসাদ দলুই/সি.পি.এম.	৭৭,১০২	৬৬.৩৮
		২. বাসুদেব মণ্ডল/জাতীয় কং	৩২,০৪১	২৭.৫৯
রায়না	১,৪৫,৯৭১/১,২৪,৫৯৩	১. শ্যামাপ্রসাদ পাল/সি.পি.এম.	৭৯,৬৬৪	৬৫.২৫
		২. অরবিন্দ ভট্টাচার্য/জাতীয় কং	৩৪,০৫৫	২৭.৮৯
জামালপুর	১,৫৭,৩৬৬/১,৩৯,২০০	১. সমর হাজরা/সি.পি.এম.	৭৯,৯৭২	৫৮.৬৫
		২. বৈদ্যনাথ দাস/জাতীয় কং	৪৫,২৪৭	৩৩.১৮
মেমারী	১.৮২.২৪৯/১.৫৯.৪২৩	১. তাপস চট্টোপাধ্যায় /সি পি.এম.	৯৪,৬৩৬	৬০.৩৭
		২ নবকুমার চ্যাটার্জী/জাতীয় কং	৪৯,৮২৬	৩১.৭৮

কালনা	১,৫৮,১৮৭/১,৪০,৬৯৬	১. অঞ্জু কর/সি.পি.এম.	৭২,৩২৯	৫২.৪০
		২. লক্ষ্মণকুমার রায়/জাতীয় কং	৫৫,৮২৫	৪০.৪৪
নাদনঘাট	১,৭০,৪৭০/১,৫১,৭৯১	১. বীরেন ঘোষ/সি.পি.এম.	৬৯,৭৭০	৪৭.০২
		২. স্বপন দেবনাথ/জাতীয় কং	৫৮,৮০২	৩৯.৬৩
মন্তেশ্বর	১,৪৫,৬১৯/১,২০,৩৪৫	১. আবু আয়েস মণ্ডল/সি.পি.এম.	৬৭,৭৫৭	৫৭.৫১
		২. দেবব্রত রায়/জাতীয় কং	৪৪,৪৫১	৩৭.৭৩
পূর্বস্থলী	১,৫৬,৮৫৭/১,৩১,৮১৩	১. হিমাংশু দত্ত/সি.পি.এম.	৬১,০৭৬	৪৭.৫৩
		২. আনসার মণ্ডল/জাতীয় কং	৪১,২৩৩	৩২.০৯
		৩. স্বপন ভট্টাচার্য/ভাজপা	২৩,৫৫৩	১৮.৩২
কাটোয়া	১,৬৫,৭৯০/১,৪৩,১১৯	১. রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী/জাতীয় কং	৭০,৫১৭	৫০.৪২
		২. অঞ্জন চ্যাটার্জী/সি.পি.এম.	৬৩,১৭২	৪৫.১৭
মঙ্গলকোট	১,৩৫,৯৯৬/১,১৪,০৬৫	১. সাধনা মল্লিক/সি.পি.এম.	৬০,৬৭৭	৫৪.৫৮
		২. আবসার নুরুল মণ্ডল/জাতীয় কং	৪০,১৮৬	৩৬.১৫
কেতুগ্রাম	১,৪৭,৪১৮/১,২২,৬৫১	১. তমাল মাঝি/সি.পি.এম.	৬৬,৬১৩	৫৬.৬৪
		২. নারায়ণচন্দ্র পোদ্দার/জাতীয় কং	৪২,৭১৯	৩৬.৩২

২০০১ সালের বিধানসভা নির্বাচন

কেন্দ্র	ভোটার সংখ্যা	নাম ও দল	প্রাপ্ত ভোট	%
কুলটি	১,৮৩,৭০০	১. মানিকলাল আচার্য/ফ.ব.	৪৪,২৯৬	৪৬.৬৫
		২. সুহৃদ বসু মল্লিক/তৃণমূল	৪১,৮২৬	৪৪.০৫
বারাবনি	১,৮০,৯০৪	১. রুদ্রনাথ মুখার্জী/সিপিএম	৪৭,২৫২	৪২.২৩
		২. মানিক উপাধ্যায়/তৃণমূল	৫২,২৭৭	৪৬ ৭২
হীরাপুর	১,৫৯,৭২১	১. অজিত ঘটক(মলয়)/তৃণমূল	৪৩,২২৬	–
		২. দিলীপ ঘোষ/নির্দল	২০,৬৯৭	–
		৩. সহরাব আলি/রাষ্ট্রীয় জনতা	১৭,১৮৯	–
আসানসোল	১,৮৭,৯৭৫	১. গৌতম রায়চৌধুরী/সিপিএম	৪৯,২০৭	৪৫.৫৪
		২. কল্যাণ ব্যানার্জী/তৃণমূল	৫১,৪২০	৪৭.৫৯
রাণীগঞ্জ	১,৬৭,৯৮২	১. বংশগোপাল চৌধুরী/সিপিএম	৮৪,২৬৪	৭২.৭৬
		২. শ্রীমতী শম্পা সরকার/কং	২১,৬৮৮	১৮.৭৩
জামুরিয়া	১,৭০,৮৭৯	১. পেলব কবি/সিপিএম	৭৯,৫৮১	৭০.৮৯
		২. শিবদাশন নায়ার/তৃণমূল	২৪,২০৯	২১.৫৬
উখড়া	২,৪৭,৫৫৯	১. মদন বাউড়ি/সি.পি এম.	৭৩,১৮৬	৫২.১৩
		২ ডাঃ নির্মল মাঝি/তৃণমূল	৫৭,৫৫৩	৪১.০০

পরিশিষ্ট

দুর্গাপুর -১	১,৬৩,৮১৩	১. মৃণাল ব্যানার্জী/সি.পি.এম.	৫৩,২২০	৫১.০৪
		২. চন্দ্রশেখর ব্যানার্জী/কংগ্রেস	৪৩,২৯৪	৪১.৫২
দুর্গাপুর - ২	২,৬৮,৯৭৬	১. দেবব্রত ব্যানার্জী/সি.পি.এম.	৮৪,৩৬১	৪৪.৪৭
		২ অপূর্ব মুখার্জী/তৃণমূল	৯৩,৮৪০	৪৯.৪৭
কাঁকসা	১,৬৫,১০৯	১. সরেশ আঁকুড়ে /সি.পি.এম.	৭৪,৮৮০	৫৯.৭৭
		২. হিমাংশু মণ্ডল/কংগ্রেস	৩৬,৪৭৮	২৯,১১
আউসগ্রাম	১,৬০,৮৩১	১. কার্তিকচন্দ্র বাগ/সি.পি.এম.	৮১,৬৪০	৬৪ ৫২
		২. সুকুমার মণ্ডল/তৃণমূল	৩৫,৯৮৮	২৮.৪৪
ভাতাড়	১,৫৯,৭২১	১. সুভাষ মণ্ডল/সি.পি.এম.	৬৬,৯০২	৫২.২৫
		২. বনমালী হাজরা/তৃণমূল	৪৯,৮২৩	৩৮.৯১
গলসী	১.৫২,৮৭৩	১. মেহবুব মণ্ডল/ফ.ব.	৭৩,৪৮৪	৬০.৮২
		২. আজিজুল হক মণ্ডল/কং	৪১,৪৯১	৩৪.৩৪
বর্ধমান উত্তর	১,৯১,৭৩৫	১. নিশীথ অধিকারী/ সি.পি.এম.	৯৫,৮৬২	৬২.৫৩
		২. লক্ষ্মীনারায়ণ নায়েক/ কং	৪৫,০৫৯	২৯ ৩৯
বর্ধমান দক্ষিণ	২,১৩,৬৭২	১. নিরুপম সেন/ সি.পি.এম.	৯২,৩৫৮	৫৩.৩৬
		২. পরেশ সরকার/তৃণমূল	৬৮,০৩১	৩৯.৩০
খণ্ডঘোষ	১,৫০,৬৬৩	১. শ্রীমতী জ্যোৎস্না সিং/সি.পি এম.	৮১,১৯৫	৬৫.৪২
		২. বংশীবদন রায়/তৃণমূল	৩৫,৫৪২	২৮.৬৪
রায়না	১,৫৯,১৯২	১. শ্যামাপ্রসাদ পাল/সি.পি.এম.	৭৮,২৯৭	৬১.২৬
		২. অরূপ দাস/তৃণমূল	৩৮,৭৫৩	৩০.৩৩
জামালপুর	১,৭২,৯৫৩	১. সমর হাজরা/সি.পি.এম.	৮৪,৪০৮	৫৮.৯৭
		২. অজয় প্রামাণিক/তৃণমূল	৫৬,০৩২	৩৮.৮৬
মেমারী	১,৯৩,৭৬০	১. তাপস চট্টোপাধ্যায়/সি পি.এম.	৮৯,৭৬৯	৫৬ ১৩
		২. মুস্তাক মুরশেদ/তৃণমূল	৫৭,৩৩২	৩৫.৮৪
কালনা	১,৬৭,৬৯২	১. শ্রীমতী অঞ্জু কর/সি.পি.এম.	৭৯,৪০১	৫৪.২৮
		২. শ্রীধর ব্যানার্জী/তৃণমূল	৫৪,৪৪৮	৩৭.২২
নাদনঘাট	১,৮৫,৮২৫	১. রতন দাস/সি.পি.এম.	৬৯,৮১৭	৪৩.৬৯
		২. স্বপন দেবনাথ/তৃণমূল	৬৭,৬১৯	৪২.৩১
		৩. সুখময় নাগ/বিজেপি	১৩,৬২৯	৮.৫২
		৪. সৈফুদ্দিন চৌধুরী/পিডিএস	৪৯৬৪	–
মন্তেশ্বর	১,৫৭২৩৫	১. আবু আয়েশ মণ্ডল/সি.পি.এম.	৬৪,৮৯৬	৫২ ৪৮
		২. নারায়ণ হাজরা/তৃণমূল	৪৭,৯৯৮	৩৮.৮২
পূর্বস্থলী	১,৬৮,১১৬	১ সুব্রত ভাওয়াল/সি.পি.এম	৬৩,০২৬	৪৭.৫১
		২ আনসার আলি মণ্ডল/তৃণমূল	৪৮,২৮১	৩৬.৩৯

		৩. বিপুল কুমার দাস/বিজেপি	১৫,৩৬৪	১১.৫
কাটোয়া	১,৮১,৫৩৪/১,৩৫,৭৪৮	রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় /কং	৭৭,৯৫২	৫৭.৫২
		কণক গোস্বামী/সি.পি.এম.	৬১,১৩৩	৪৫.০৩
মঙ্গলকোট	১,৫৩,৮৫৩/১,১৬,৯৪৯	শ্রীমতী সাধনা মল্লিক/ সি.পি.এম	৬২,২৩৫	৫৩.২১
		চন্দ্রনাথ মুখার্জী/তৃণমূল	৪৮,০২২	৪১.০৬
কেতুগ্রাম	১,৫৭,৫২১/১,২৩,৭০২	তমালচন্দ্র মাঝি /সি.পি.এম.	৬৩,৭১০	৫১.৫০
		অমর রাম /কং	৫০,০৬১	৪০.৪৬

লোকসভা নির্বাচনগুলির ফলাফল

প্রথম লোকসভা নির্বাচন : ১৯৫২

বর্ধমান : ভোটার সংখ্যা - ৭,২২,৪৩৪, প্রদত্ত ভোট - ৫,১২,২১৯

১.	মনমোহন দাস	কং	১,০২,৫২৩
২.	অতুল্য ঘোষ	কং	১,১৯,৯৮৭
৩.	সুবিমান ঘোষ	ফ: ব:	৯০.২৪২
৪.	হরিপদ মণ্ডল	ফ:ব:	৬৮,৫৮৫
৫.	শরৎচন্দ্র পণ্ডিত	কে.এম.পি.পি.	৫৯,৭৯০
৬.	নলিনী রঞ্জন সেনগুপ্ত	নি:	৭১,০৯২

কালনা - কাটোয়া : ভোটার সংখ্যা - ৩,৭৭,২১৯, প্রদত্ত ভোট - ১.৮৫,৬৭২

১.	জনাব আব্দুস সাত্তার	কং	৭২,৬৮২
২.	প্রমথনাথ ব্যানার্জী	নি:	২২,৬২৬
৩	আশুতোষ লাহিড়ী	এইচ.এম.এস.	৫০,৭৯১
৪.	শৈলেন্দ্র নাথ রায়	নি:	২,২০৬
৫.	জ্যোতিষচন্দ্র সিংহ	নি:	৩১,৮৬৭
৬.	পুরুষোত্তম সামন্ত	ফ :ব:	৫,৫২১

দ্বিতীয় লোকসভা নির্বাচন : ১৯৫৭

বর্ধমান : ভোটার সংখ্যা - ৪,২৫,২৮২, প্রদত্ত ভোট - ২,১৩,২৯০

১.	সুবিমান ঘোষ	ফ:ব:	১,০৭,৬৭০
২	দর্গাপদ চৌধুরী	কং	১,০৫,৬২০

আসানসোল : মোট ভোটার - ৭,৯০,৩২২, প্রদত্ত ভোট - ৬,২৯,৫৮৯

১	মনমোহন দাস	কং	১,৮৬,৩৭৮

২	অতুল্য ঘোষ	কং	১,৬৩,৭২৫
৩.	অম্বুজাভূষণ বসু	আর.এস পি	১,২৬,০২৬
৪.	মণিমোহন ঘোষ	নিঃ	৪৪,৩১৫
৫.	অমরেন্দ্র নাথ সাহা	নিঃ	১,০৯,১৪৯

তৃতীয় লোকসভা নির্বাচন ঃ ১৯৬২

আসানসোল ঃ মোট ভোটার - ৪,৫৪,৭০০, প্রদত্ত ভোট - ১,৮৮,৯৯২

১.	অতুল্য ঘোষ	কং	৭০,৮৩৫
২.	কেত নারায়ণ মিশ্র	সি.পি.আই.	৬১,৯৯১
৩.	দেবেন সেন	পি.এস.পি.	৪৯,৫৬৩

আউসগ্রাম (তপঃ) ঃ মোট ভোটার - ৪,৯৮,৯৯০, প্রদত্ত ভোট- ২,৩৩,০৬৫

১.	মনমোহন দাস	কং	১,১৪,৮২৯
২.	কৃষ্ণচন্দ্র হালদার	সি.পি.আই.	৯১,১৪০
৩.	গোবর্ধন পাকড়ে	পি.এস.পি.	১৮,৪৩৫

বর্ধমান ঃ মোট ভোটার - ৫,৩৪,২৭৩, প্রদত্ত ভোট - ২,৮৭,৬৮৫

১.	গুরুগোবিন্দ বসু	কং	১,৫৫,৪৮৫
২	সুবিমান ঘোষ	ফ ঃ বঃ	১,২৩,০১৫

(এন.সি.চ্যাটার্জী (নিঃ) ২৪-১২-৬৩ তারিখে উপ নির্বাচনে জয়লাভ করেন)

কাটোয়া ঃ মোট ভোটার - ৫,১৯,৩৬২, প্রদত্ত ভোট - ২,৭৭,৩২৯

১.	শরদীশ রায়	সি.পি.আই.	১,৫১,৭৭৪
২.	অনিল কুমার চন্দ	কং	১,১৬,৫২৮

চতুর্থ লোকসভা নির্বাচন ঃ ১৯৬৭

আউসগ্রাম (তপঃ) ঃ মোট ভোটার-৫,২৫,২৭২, প্রদত্ত ভোট - ৩,০৪,৯০৮

১.	মনমোহন দাস	কং	১,৪৪,০৪৬
২	ভগবান দাস	সি.পি.এম.	১,৫২,৯০৪

আসানসোল ঃ মোট ভোটাব - ৪,৪৩,৯৪৫, প্রদত্ত ভোট - ২,৫৫,৫৫৬

১	কল্যাণ শঙ্কর বায	সি পি আই	৪৯ ১৩৮

২.	জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	কং	৯২,২৮৪
৩.	দেবেন সেন	এস.এস.পি.	৯৯,২৭৬
৪.	হিমাংশু সিংহ রায়	নিঃ	৪.০৪১

বর্ধমান ঃ মোট ভোটার - ৪,৯৪,৫৬১, প্রদত্ত ভোট - ২.৯৩.২৬৬

১.	এন.সি.চ্যাটার্জী	নিঃ	১,৪৩,০১৫
২.	চিত্তরঞ্জন চ্যাটার্জী	কং	১.০৬.৯২৯
৩	সুবিমান ঘোষ	ফ ঃ বঃ	২৮.৯৫০

কাটোয়া ঃ মোট ভোটার - ৪.৮৫.৮৯৪, প্রদত্ত ভোট - ৩,৩৪.৯৮৯

১.	জে.সি.মৈত্র	নিঃ	১২.০৯৯
২.	দ্বৈপায়ন সেন	কং	১,৬১,২৭৪
৩.	সরোজকুমার মুখার্জী	সি.পি এম.	১.৫০.৩১৯

পঞ্চম লোকসভা নির্বাচন ঃ ১৯৭১

আউসগ্রাম (ত ফ ঃ) ঃ মোট ভোটার - ৬,২৯,০৯৪, প্রদত্ত ভোট - ৩.৬৩.৯৮১

১.	কৃষ্ণচন্দ্র হালদার	সি.পি এম.	১.৬০.১০০
২.	শঙ্কর দাস	কং - ও	৪,৩৯৯
৩.	নিতাই সাহা	নিঃ	৩,৯৫৬
৪	মহাদেব সাহা	বি.সি.	৬৯.১৮৮
৫.	পঞ্চানন রায়	সি.পি.আই.	৫৭,৩৮৭

আসানসোল ঃ মোট ভোটার - ৫,৪২,৯১৪, প্রদত্ত ভোট - ২,৮০.৩৩৮

১.	রবীন সেন	সি.পি.এম	১.৩২.২৬৮
২.	অতুল্য ঘোষ	কং - ও	৮,১৪৪
৩.	ইয়ার মহম্মদ	নিঃ	২,৮৩০
৪.	দেবেন সেন	এস এস.পি.	২১,৩৬৪
৫.	নারায়ণ চৌধুরী	কং-আর	৯৮.৬০৮
৬.	সোহনপ্রসাদ ভার্মা	বি সি.	৪.৬০৬

বর্ধমান ঃ মোট ভোটার - ৫.৭৭.৫১২, প্রদত্ত ভোট - ৩.৭২.০৪০

১	সোমনাথ চ্যাটার্জী	সি পি এম	২.০৩.৬৪৫
২	দাশরথি তা	কং-ও	১৫.৮৫৫

৩.	ভোলানাথ সেন	কং - আর	১,৩৯,৫৬৫

কাটোয়া ঃ মোট ভোটার - ৫,৩০,৩৭৭, প্রদত্ত ভোট - ৩,৮২,৭৩৩

১.	সরোজ মুখার্জী	সি.পি.এম.	২,১০,৪২২
২.	দ্বৈপায়ন সেন	কং-আর	১,৪১,৯৩৫
৩.	ভক্ত চন্দ্র রায়	কং -ও	১৭,৩৮০

ষষ্ঠ লোকসভা নির্বাচন ঃ ১৯৭৭

দুর্গাপুর (তফ ঃ)

১.	কৃষ্ণ চন্দ্র হালদার	সি.পি.এম.	২,১৮,৮৩৩
২.	মনোরঞ্জন প্রামাণিক	কং	১,২৭,৪০২

আসানসোল

১.	রবীন সেন	সি.পি.এম.	১,৬৩,৪৯২
২.	আদিত্যবরণবন্দ্যোপাধ্যায়	নিঃ	৪,৭৪৬
৩.	নরেশ চন্দ্র রায়চৌধুরী	নিঃ	৩,৮৯৭
৪.	নীরোদপ্রসাদ মুখার্জী	নিঃ	৫,৬৫৭
৫.	বাদলবাউড়ী	নিঃ	৭,৭১৬
৬.	সৈয়দ মঃ জালাল	কং	৯১,২৬৫

বর্ধমান

১.	রাজকৃষ্ণ দাঁ	জনতা	১,৯০,৩১৮
২.	নারায়ণ চৌধুরী	নিঃ	৪৪,৮৪০
৩.	শ্যামাপ্রসাদ কুণ্ডু	কং	১,১৯,৩১৫

কাটোয়া

১	ধীরেন্দ্র নাথ বসু	কং	১,৭৯,৯২৭
২.	কৃষ্ণদাস চট্টোপাধ্যায়	নিঃ	১২,৩২৬
৩.	সৈয়দ মনসুর হবিবুল্লাহ	সি.পি.এম.	১,৬৮,০৪৭

সপ্তম লোকসভা নির্বাচন ঃ ১৯৮০

দুর্গাপুর (তফঃ) ঃ প্রদত্ত ভোট - ৫,১৩,১৭০, বৈধ ভোট - ৪,৯৮,৩০৭

১.	কৃষ্ণচন্দ্র হালদার	সি.পি.এম.	২,৮৫,৩৬৯
২	সূর্যকুমার রায়	কং - ই	১,৯০,১৮২
৩	কুমারী নীহার সাহা	জনতা	১০,৯২০

৪.	বিমল কুমার সাহা	জনতা-এস	৭,০০৩
৫.	বঙ্কিম সাঁতরা	নিঃ	৪,৮৩৩

আসানসোল : প্রদত্ত ভোট - ৪,২৩,৮৪৯, বৈধ ভোট - ৪,০৯,৫৩৮

১.	আনন্দ গোপাল মুখার্জী	কং-ই	১,৭৫,৪২২
২.	রবীন সেন	সি.পি এম	১,৬৫,৮৮০
৩.	ডাঃ জি.আর.মিত্র	জনতা	২৭,২২৮
৪.	প্রদীপ ভট্টাচার্য	কং-আর্স	৯,৪১৬
৫.	মহাদেব মুখার্জী	সি.পি.আই(এম.এল)	৩,৫৫৭
৬.	বাদল বাউড়ী	নিঃ	৮,৬৪০
৭.	মুসলেম খান	নিঃ	২,১৬০
৮.	দমনপ্রসাদ ভুইঞা	রিপাব্লিকান	৫,৭৪৯
৯.	জয়শঙ্কর চৌধুরী	আর.এস.পি.আই(এম.এল)	৬,৩৮৬
১০.	মানিক ঘাটি	আঃ বাঙালি	৫,১০০

বর্ধমান : প্রদত্ত ভোট - ৫,৫৮,৭৪২, বৈধ ভোট - ৫,৪৪,৩১৮

১.	সুশীল কুমার ভট্টাচার্য	সি.পি.এম.	৩,২১,০১২
২.	নারায়ণ চৌধুরী	কং (ই)	২,০১,২৪১
৩.	সত্যনারায়ণ রায়	জনতা	১০,৩৮৬
৪.	হরিবল্লভ ঝা	জনতা (স)	৪,০৩১
৫	সহদেব দত্ত	(আমরা বাঙালি)	৫,২০৯
৬.	রেণুকা মিত্র	নির্দল	২,৪৩৯

কাটোয়া : প্রদত্ত ভোট - ৫,৪৯,৩৬৮, বৈধ ভোট - ৫,৩৭,০৫৬

১.	সৈফুদ্দিন চৌধুরী	সি.পি.এম.	৩,২২,০৮০
২.	ধীরেন্দ্রনাথ বসু	কংগ্রেস	২.০০,৯২০
৩.	লক্ষ্মীনারায়ণ রেজ	কং(আর্স)	১৪,০৫৬

অষ্টম লোকসভা নির্বাচন : ১৯৮৪

দুর্গাপুর (তফঃ) : মোট ভোটার - ৮,২৮,৮৬৯, বৈধ ভোটার - ৬,৩০,৬০৮

১.	পূর্ণচন্দ্র মালিক	সি.পি.এম.	৩,৩৪,৬৮৮
২.	গোপাল মণ্ডল	কং-ই	২,৯৫,৯২০

আসানসোল : মোট ভোটার - ৮,৯৩,৬৮৫, বৈধ ভোট - ৬,০৫,৬২৮

১	আনন্দ গোপাল মুখার্জী	কং	৩,৩৪,২১২

২.	বামাপদ মুখার্জী	সি.পি.এম.	২,৪৭,৫৪৬
৩	মানিক বাউড়ি	নির্দল	৭,৩৬০
৪.	সামশুল হক	নিঃ	৪,৯৬৮
৫.	মানিক ঘাটি	আঃ বাঃ	৪,৪৭৪
৬.	ছেদিলাল জালানা	নিঃ	৩,৯৯৩
৭.	গোপাল শর্মা	নিঃ	৩,০৭৫

বর্ধমান ঃ মোট ভোটার - ৮,৪০,৪৫৬, বৈধ ভোট - ৬,৮৫,১১৪

১.	সুধীর রায়	সি.পি.এম.	৩,৬৬,৫৪৭
২.	প্রদ্যোৎ গুহ	কং	৩,০৪,৮৬৩
৩.	অসিত মিত্র	নিঃ	৭,২৪২
৪.	রাজেশ্বর মণ্ডল	নিঃ	২,৪৬২

কাটোয়া ঃ মোট ভোটার - ৮,০০,৫৩৬, বৈধ ভোটার - ৬,৪৯,০৫২

১.	সৈফুদ্দিন চৌধুরী	সি.পি.এম.	৩,৪৬,২৫১
২.	মৌলনা সিদ্দিকুলা চৌধুরী	কং	৩,০২,৮০১

নবম লোকসভা নির্বাচন ঃ ১৯৮৯

দুর্গাপুর (তফঃ) ঃ মোট ভোটার - ১০,১২,২৯০, বৈধ ভোটার - ৭,৩২,৭৭৮

১	পূর্ণচন্দ্র মালিক	সি.পি.এম.	৪,৬৮,৭১০
২.	গোপাল মণ্ডল	কং	২,০৬,০৮৬
৩.	ব্যোমশঙ্কর রুইদাস	বি.জে.পি.	১২,৭৭১
৪.	পরেশনাথ ধীবর	আঃ বাঃ	৫,৪৬৭
৫.	নিখিল মণ্ডল	ঝাড়খণ্ড	৯,২৪৭
৬.	কাকা যোগীন্দর সিং	নিঃ	১,৪৮০
৭	নির্মল মণ্ডল	নিঃ	৪,৪৬২
৮.	ভক্তদাস মণ্ডল	নিঃ	৫,৩৫৪

আসানসোল ঃ মোট ভোটার - ১১,০৪,২৩৭, বৈধ ভোট - ৭,৫৪,৭৭৪

১.	হারাধন রায়	সি.পি.এম.	৩,৭৪,২৮১
২.	প্রদীপ ভট্টাচার্য	কং	৩,৩২,০৪৪
৩.	অমরনাথ কেশরী	বি.জে.পি.	২১,০৭৭
৪.	মহেন্দ্র পাশোয়ান	বি.এস.পি	৫,০১৯
৫	মানিক ঘাটি	আঃ বাঃ	৩,০৩৫
৬	শম্ভুনাথ বাজড়ড	দূরদর্শী	৯১৪

৭.	গণেশ পাল	সি.পি.আই(.এম.এল)	১২,০৯৬
৮	সুদেশ মুর্মু	ঝাড়খণ্ড	২,৪৭১
৯.	নারায়ণ পণ্ডিত	নিঃ	১,৫১০
১০.	জি কে.শর্মা	নিঃ	১,৫০৬
১১	সমীর কুমার দে	নিঃ	৮২১

বর্ধমান ঃ মোট ভোটার - ১০,২৪,৭৭৩, বৈধ ভোট - ৮,৪০,৬৯০

১.	সুধীর রায়	সি পি এম.	৫,১৫,১৪০
২.	প্রদ্যোৎ গুহ	কং	৩,১৯,৬১০
৩	ভৃগুনাথ সিং	দূরদর্শী	৩,৪২৪
৪.	বরুণ কুমার বসু	নিঃ	২,৫১৬

কাটোয়া ঃ মোট ভোটার - ৯,৬৯,৯৮৩, বৈধ ভোট - ৭,৯৯,৫৩৭

১	সৈফুদ্দিন চৌধুরী	সি পি এম	৪,১৯,০৪২
২.	নূরুল ইসলাম	কং	৩,০৯,৯৩৩
৩.	শ্রীমতী শান্তি রায়	বি.জে.পি	৫৪,১৯৪
৪.	কাশীনাথ মুন্সী	বি.এস.পি.	১,৫০৭
৫.	রাজনাথ কুর্মী	দূরদর্শী	১,১০১
৬.	মহাদেব দালাল	জনতা পার্টি	২,৯৯৩
৭.	গোপীনাথ বাস্কে	ঝাড়খণ্ড	৯,৫৬৮
৮	গোপীনাথ মাণ্ডি	নিঃ	১,১৯৯

দশম লোকসভা নির্বাচন ঃ ১৯৯১

দুর্গাপুর (তফঃ) ঃ মোট ভোটার - ১০,৪১,১৬০, বৈধ ভোট - ৭,৪৯,৭৯৬

১.	পূর্ণচন্দ্র মালিক	সি.পি.এম.	৪,১৫,০১১
২.	ভাগবত মাঝি	কং	২,৩০,৩৯৫
৩.	ব্যোমশঙ্কর রুইদাস	বি.জে.পি.	৮৫,৮০৬
৪.	অসিত মণ্ডল	নিঃ	৫,৪০৮
৫.	দেবব্রত বাগ	দূরদর্শী	২,৩৫১
৬	প্রফুল্ল কুমার মণ্ডল	জে.এম.এম	৫,৯৯০
৭.	ভক্তদাস মণ্ডল	বি এস.পি	৪,৮৩৫

আসানসোল ঃ মোট ভোটার- ১১,২৬,২০৭, বৈধ ভোট - ৭,০১,২৪০

১	আশিষ রঞ্জন সরকার	নিঃ	৮৭৮

২.	মিহির উপাধ্যায়	জনতা পার্টি	৪,৫৬৬
৩.	কিঙ্কর তপানন্দ ব্রহ্মচারী	বি.জে.পি.	১,৩৫,৬৪১
৪.	মানিক চ্যাটার্জী	নিঃ	৩,৩৫২
৫.	জরাসন্ধ বাউড়ি	নিঃ	৫,৬০০
৬.	দেবপ্রসাদ রায়	কং	২,২১,৬৪৬
৭.	দেবীদাস মুখার্জী	নিঃ	৮৪৩
৮.	মহঃ বদরুদ্দোজা	নিঃ	১,৬৯৫
৯.	বলহরি মণ্ডল	সি.পি.আই.(এম.এল)	৫,৭৩৯
১০.	বিকাশচন্দ্র ঘোষ	নিঃ	১,০০৯
১১.	দুর্গাদাস মণ্ডল	নিঃ	১,৪৫৯
১২.	রাজনাথ কুর্মী	দুরদর্শী	১,৫৪২
১৩.	সুব্রত মিত্র	নিঃ	৭৬৬
১৪.	হারাধন রায়	সি.পি.এম.	৩,১৬,৫০৪

বর্ধমান ঃ মোট ভোটার - ১০,৬১,৩০০, বৈধ ভোট - ৮,৪১,৪৩৯

১.	সুধীর রায়	সি.পি.এম.	৪,৭৯,৭২১
২	অসিতবরণ পাত্র	কং	২,৫৭,৮২৯
৩.	সত্যেন রায়	বি.জে.পি.	৯০,২৪২
৪.	সৈয়দ নাজিবুদ্দিন	জনতা পার্টি	৪,৫২৪
৫.	শম্ভুনাথ রাজভড়	দুরদর্শী	১,৯৯৪
৬.	চরণ হাঁসদা	জে.এম.এম.	৪,০২৩
৭.	ভাস্কর রায়চৌধুরী	নিঃ	৩,১০৬

কাটোয়া ঃ মোট ভোটার - ১০,১০,০৭৭, বৈধ ভোট - ৮,০৪,৮৪৮

১.	সৈফুদ্দিন চৌধুরী	সি.পি.এম.	৪,০৪,৩৫৮
২.	নুরুল ইসলাম	কং	২,৪৯,৬৩৪
৩.	শ্রীমতী শান্তি রায়	বি.জে.পি.	১,২৬,৮৭৩
৪.	মৃত্যুঞ্জয় রক্ষিৎ	নিঃ	৬,৮৭০
৫.	গোপীনাথ বাস্কে	জে.এম.এম.	৬,৪৫১
৬.	গোপীনাথ নন্দী	নিঃ	৭,৪৯০
৭.	নলিনী হালদার	বি.এস.পি.	৩,১৭২

একাদশ লোকসভা নির্বাচন ঃ ১৯৯৬

দুর্গাপুর (তফঃ) ঃ মোট ভোটার - ১১,৩৯,৪৮৭, বৈধ ভোট - ৮,৯১,২৪২

১.	সুনীল খান	ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মাঃ),	৪,৯৬,২৫০
২.	চিত্তরঞ্জন প্রামাণিক	ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস	৩,১৪,৫৩৭
৩.	ডাঃ পরেশনাথ ধীবর	নির্দল	৪,৩৯০
৪.	ব্যোমশঙ্কর রুইদাস	ভারতীয় জনতা পার্টি	৭৩,৫৯৯
৫.	ভক্তদাস মণ্ডল	নির্দল	২,৪৬৬

' ঃ মোট ভোটার - ১২,০৯,২৭২, বৈধ ভোট - ৮,১২,৫২৫

১.	আজত সোরেন	জে.কে.এম.এম	৮,৪৬৭
২.	কিশোর চ্যাটার্জী	ইন্দিরা কংগ্রেস(তেওয়ারী)	২,৭৩৭
৩.	গণেশ পাল	নির্দল	১১,৫৫৬
৪.	মানিক ঘাটি	আমরা বাঙালি	৩,২০৫
৫.	সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস	৩,২৯,৮৫৬
৬.	হারাধন রায়	ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি(মাঃ)	৩,৭৬,৮০৬
৭.	ব্রহ্মদেব রাম	নির্দল	৬,২১৫
৮.	ভবানীতোষ মুখার্জী	নির্দল	৮৯১
৯.	ভৃগুনাথ শর্মা	নির্দল	১,১৮৬
১০.	সুরেন্দ্রনাথ লাম্বা	ভারতীয় জনতা পার্টি	৬৯,৭৩৭
১১.	হরিশচন্দ্র রাজভড	নির্দল	১,৮৬৯

বর্ধমান ঃ মোট ভোটার - ১১,৪৪,১৯১, বৈধ ভোট - ৯,৬৫,১১১

১.	রবিলাল হাঁসদা	জে.কে.এম.এম.	১০,০১৫
২.	বলাই রায়	ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি	৫,৭৮,২৭৯
৩.	রীতেশ কুমার দত্ত	ভারতের জাতীয় কংগ্রেস	৩,১৫,৫৬৫
৪.	সত্যেন্দ্রনারায়ণ রায়	ভারতীয় জনতা পার্টি	৫৪,৯১৭
৫.	কাজী মনোয়ার হোসেন	নির্দল	২,৮৮৪
৬.	বিপুল ঢালি	নির্দল	১,৮২৭
৭.	মুরলীধর তেওয়ারী	নির্দল	৫৮৯
৮.	শিবরাম মজুমদার	নির্দল	১,০৩৫

কাটোয়া ঃ মোট ভোটার - ১১,১৫,১০৭, বৈধ ভোট - ৯,৪১,৮০১

১	নুরুল ইসলাম	ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস	৩,৬৯,০৬২
২	গোপীনাথ বাস্কে	জে কে এম . এম	৯,০৭৮

৩.	মহবুব জাহেদী	ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মাঃ)	৪,৭৫,২৬৪
৪	শিবপ্রসাদ রায়	ভারতীয় জনতা পার্টি	৭৭,৩৩৮
৫.	পরেশ ব্যানার্জী	ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (এম.এল)	৬,২৭৭
৬.	গোপীনাথমাণ্ডি	নির্দল	১,৯৬২
৭.	ব্রহ্মদেও নারায়ণ সিং	নির্দল	১,৩৫৬
৮.	সেখ ইউনুস রহমান	আই.ডি.পি.পি.	১,৪৬৪

দ্বাদশ লোকসভা নির্বাচন ঃ ১৯৯৮

দুর্গাপুর (তফঃ) ঃ ভোটার সংখ্যা - ১১,৯১,৬৯৭, বৈধ ভোট - ৯,০৪,১২২

১.	সুনীল খান	ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি(মাঃ)	৪,৬৮,৪৪৯
২.	ভাগবত মাঝি	ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস	১,০৯,২৫৩
৩.	সূর্য রায়	ভারতীয় জনতা পার্টি	৩,২৬,৪২০

ঃ ভোটার সংখ্যা - ১২,৪২,৬৯০, বৈধ ভোট - ৮,৬৪,৮৪০

১.	এস.এস.আলুওয়ালিয়া	ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস	১,১০,৬১৮
২.	বিকাশ চৌধুরী	ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মাঃ)	৩,৫৫,৩৮২
৩.	অজিত ঘটক	পঃ বঃ তৃণমূল কংগ্রেস	৩,২৯,২৩৩
৪	সোহরাব আলি	রাষ্ট্রীয় জনতা দল	৪৩,৬৪৩
৫.	মানিক বাউড়ি	বহুজন সমাজ পার্টি	৮,৩৮৬
৬.	জ্যোতির্ময় মাইতি	সমাজবাদী জনতা পার্টি (রাষ্ট্রীয়)	৭,১০৬
৭.	গণেশচন্দ্র সরকার	নির্দল	১,১২৭
৮.	সুনীল পাল	নির্দল	৯,৩৪৫

বর্ধমান ঃ ভোটার সংখ্যা - ১১,৯০,৩৭৯, বৈধ ভোট - ৯,৮৩.১০৭

১.	আভাষ ভট্টাচার্য	ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস	৯৪,৯৯৭
২.	শ্রীমতী শান্তি রায়	ভারতীয় জনতা পার্টি	৩,০৬,৫৭২
৩.	নিখিলানন্দ সর	ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মাঃ)	৫,৭৮,৮২৫
৪.	রবিলাল হাঁসদা	ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা	২,৭১৩

কাটোয়া ঃ ভোটার সংখ্যা - ১১.৫৬.৫৪২, বৈধ ভোট - ৯,৫১,২২৫

১.	গোপীনাথমাণ্ডি	বহুজন সমাজ পার্টি	৩,৭১৫
২.	সিদ্দিকুলা চৌধুরী	ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস	১,৩৫,৬৭২
৩.	মেহবুব জাহেদী	ভাবতের কমিউনিস্ট পার্টি (মাঃ)	৪.৭০,৫৪৩
৪	কার্তিক পাল	ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মাঃলেঃ)(এল)	৭.৮৯০
৫	স্বপন দেবনাথ	পঃ বঃ তৃণমূল কংগ্রেস	৩.৩১.৮৩৬

৬.	লুৎফর রহমান	ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা	১,৫৬৯

ত্রয়োদশ লোকসভা নির্বাচন ঃ ১৯৯৯

দুর্গাপুর (তফঃ) ঃ মোট ভোটার - ১২.১২.৩৬৬. বৈধ ভোট - ৮,৬৯,০৯১

১.	অনিলকুমার সাহা	ভারতীয় জনতা পার্টি	৩.৪৩.৯৭৭
২.	সুনীল খান	ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মাঃ)	৪.৬১.৯৪০
৩.	হারাধন মণ্ডল	ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস	৫৮,৪০৭
৪.	তারাপদ মণ্ডল	নির্দল	৩,২২২
৫.	রবীন্দ্রনাথ সাহা	নির্দল	১.৫৪৫

আসানসোল ঃ মোট ভোটার - ১২.৬৫,৩৩০, বৈধ ভোট - ৮,১৫.২৯২.

১.	অজিত ঘটক (মলয়)	সারা ভারত তৃণমূল কংগ্রেস	৩,৩৯,৪০১
২	বিকাশ চৌধুরী	ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মাঃ)	৩.৭৭.২৬৫
৩.	মানিক উপাধ্যায়	ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস	৮৯,২৬১
৪	মানিক বাউড়ি	বহুজন সমাজ পার্টি	৫,২২[illegible]
৫	জিতেন্দ্র মণ্ডল	এ এম বি.	২,৩৫৪
৬.	দিলীপ পাশোয়ান	নির্দল	৮১৯
৭.	প্রদীপ কুমার ব্যানার্জী	নির্দল	৯৭০

বর্ধমান ঃ মোট ভোটার - ১২,১৬.২৭৪, বৈধ ভোট - ৯,৭১.৭৫৪.

১.	অনুপ মুখার্জী	ভারতীয় জনতা পার্টি	২,৯৬,৪৮৭
২.	রাজকৃষ্ণ দাঁ	ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস	৬৭,০৯৬
৩.	নিখিলানন্দ সর	ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মাঃ)	৫.৯৮,১৭০
৪	চামরু ওঁরাওঁ	ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা	৯,৩৫৩
৫.	মানব বন্দ্যোপাধ্যায়	নির্দল	৬৪৮

কাটোয়া ঃ মোট ভোটার - ১১,৮২,৩৩৯. বৈধ ভোট - ৯,১৮.৩৪৯

১	অমলকুমার দত্ত	সারাভারত তৃণমূল কংগ্রেস	৩.৫৩.১৪০
২.	তুহিন সামন্ত	ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস	৯১,২০৪
৩.	মেহবুব জাহেদী	ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মাঃ)	৪.৬১,৫০২
৪.	রাণু গোলদার	বহুজন সমাজ পার্টি	২.৮৩১
৫.	সলিল দত্ত	ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মাঃ-লেঃ)(লিবারেশন)	৮.১৯৪
৬	অজয় মণ্ডল	নির্দল	১.৪৭৮

পরিশিষ্ট-৪

বর্ধমান জেলার উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি

অক্ষয় কুমার দত্ত ঃ জন্ম ১৮২০ সালের ১৫ জুলাই, ১লা শ্রাবণ ১২৮৭ সালে পূর্বস্থলী থানার চুপী গ্রামে। বাংলা গদ্য ভাষা চর্চায় পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রধান সহযোগী। 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। বাংলা ভাষায় প্রথম বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক 'পদার্থ বিদ্যা' রচনা করে অক্ষয় কুমার দত্ত অমরত্ব লাভ করেছেন। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত অক্ষয় কুমারের পৌত্র ছিলেন। মৃত্যু ২৮ মে, ১৮৮৬।

অরবিন্দ প্রকাশ ঘোষ ঃ ১২৭৬ বঙ্গাব্দে কালনা মহকুমার অকালপৌষ গ্রামে জন্ম। বর্ধমানের স্বদেশী আন্দোলনে আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। ১৩১৪ বঙ্গাব্দে বর্ধমানে দুর্ভিক্ষের সময় সেবামূলক কাজে তিনি স্মরণীয় ভূমিকা পালন করেছেন। সেই সেবা কার্য থেকেই জন্ম 'বর্ধমান সম্মিলনী'র। ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

অমরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে ২৩ ডিসেম্বর কেতুগ্রামের গঙ্গাটিকুরী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বর্ধমানের বিশিষ্ট রস সাহিত্যিক ও আইনজীবি ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্র ছিলেন অমরনাথ। ১৯৫৬ এবং ১৯৫৯ সালে বন্যা বিধ্বস্ত কাটোয়া অঞ্চলের সেবাকার্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। ন্যাশনালিস্ট ল ইয়ার্স ফোরামের যুগ্ম সম্পাদক, পঃ বঃ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি ও আইন কমিটির সদস্য ছিলেন। তাঁর স্ত্রী মলয়া দেবী ছিলেন কলকাতার প্রাক্তন মেয়র চিত্তরঞ্জন চট্টোপ্যাধ্যায়ের কন্যা।

অমরনাথ দত্ত ঃ জন্ম খণ্ডঘোষ থানার কেশবপুর গ্রামে। খ্যাতনামা আইনজীবি ছিলেন। কংগ্রেসের জাতীয় আন্দোলনের শুরু থেকেই যুক্ত। কংগ্রেসের জেলা অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন। লালা লাজপৎ রায়ের সভাপতিত্বে ১৯২০ কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে অমরনাথ দত্ত বর্ধমান জেলার প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। অমরনাথ দত্তের সাথে ছিলেন যাদবেন্দ্র পাঁজা।

অমলাচরণ সেন ঃ নাদনঘাটের সাতগাছিয়া গ্রামে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ১৯ মার্চ শুক্রবার জন্ম। *পিতা* - ডঃ ত্রিপুরা চরণ সেন। কবিরাজ শিরোমণি শ্যামাদাস বাচস্পতির কাছে আয়ুর্বেদ শিক্ষার পর কাশীতে সংস্কৃত শিক্ষায় পরিদর্শিতা লাভ করেন। ১৯৫০ সালে কলকাতার আয়ুর্বেদ স্টেট ফ্যাকাল্টির সদস্য হন। ''আরোগ্য মঞ্জরী'' গ্রন্থের রচয়িতা। ১৯৭৩ সালের ২২ মে কলকাতায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

অনাথবন্ধু সেনগুপ্ত ঃ ১৩০৫ বঙ্গাব্দের ২০ ভাদ্র জন্ম পাতিল পাড়া গ্রামে। বিশিষ্ট কবি এবং শিক্ষাব্রতী। বৈদ্যপুর হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় স্বর্ণপদক লাভ করেন। বসুমতী, সংহতি, রামধেনু, নবশক্তি প্রভৃতি পত্রিকা সহ বেতারে অনাথ বন্ধু সেনগুপ্ত

রচিত কবিতা প্রচারিত হয়েছে। প্যারডি রচনায় তাঁর লেখনী ছিল অনবদ্য। অসংখ্য স্কুল পাঠ্য সহ শিশুদের উপযোগী গ্রন্থ রচনা করেছেন। ইং - ১৯৭২ সালের ৫ ফেব্রুয়ারী নবদ্বীপে তাঁর মৃত্যু হয়।

অনিলবরণ রায়ঃ ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ৩ জুলাই রায়না থানার গুইর গ্রামে জন্ম। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজী এবং দর্শন শাস্ত্রে এম.এ.। পরে আইন বিদ্যাতেও পারদর্শিতা লাভ করেন। ৩১ বছর বয়সে ১৯২১ সালে তিনি অধ্যাপনার চাকরি ছেড়ে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ১৯২৩ সালে স্বরাজ্য দলে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। ১৯২৪ সালে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সাথে তিনিও বিনা বিচারে কারারুদ্ধ হন। ১৯২৬ সালে মুক্তির পর শ্রী অরবিন্দের কাছে যান পন্ডিচেরীতে। দীর্ঘ ৪০ বছর (১৯৬৬ পর্যন্ত) তিনি সেই আশ্রমেই যোগ সাধনায় রত ছিলেন।

অপর্ণাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ রঙ্কিনী মন্হুলা গ্রামে জন্ম। ন্যায় বাগীশ প্রসঙ্গের লেখক।

আবু রাম রাই ঃ বর্ধমান রাজ বংশের আদি পুরুষ। সঙ্গম রায়ের পৌত্র। ভারত সম্রাট শাজাহানের আদেশে সেই আমলে শরিফাবাদ (বর্ধমান) ফৌজবাদের অধীনে রাজস্ব আদায়কারী (কোতোয়াল) নিযুক্ত হন। শরিফাবাদ অন্তর্ভুক্ত রেকাবী বাজার, মোগলটুলী এবং ইব্রাহিমপুর ছিল আবু রাইয়ের এলাকা। তাঁর পুত্র বাবু রাই পরবর্তী পর্যায়ে বর্ধমান সহ আরও তিনটি পরগণার রাজস্ব আদায়কারী মনোনীত হন। পরবর্তী পর্যায়ে ঘনশ্যাম রাই, কৃষ্ণরাম রাইয়ের আমলে বর্ধমান রাজ বংশ সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে।

আবদুল্লা রসুলঃ মেমারীর সলদহ গ্রামে ১৯০৩ সালে ১০ই জুন জন্ম। মৃত্যু ১৯৯১, ২১ নভেম্বর। কেজা গ্রাম পিতার আদি নিবাস। ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। পরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ও খিলাফৎ কমিটির সাথে যুক্ত হন। ১৯৩৮-এ কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দেন এবং কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। তাঁর লিখিত গ্রন্থ 'সারা ভারত কৃষক সভার ইতিহাস (মূল গ্রন্থ ইংরাজীতে)', 'নীল বিদ্রোহের অমর কাহিনী', 'মার্কসীয় অর্থ বিজ্ঞান', 'কৃষক সভার নীতি ও লক্ষ্য', 'সাঁওতাল বিদ্রোহের অমর কাহিনী', 'কমিউনিজম কাকে বলে', 'শহর থেকে গ্রামে' কৃষক আন্দোলনের মূল্যবান দলিল। এছাড়া 'আবাদ' উপন্যাস।

আবদুল জব্বার খান (নবাব)ঃ মঙ্গলকোট থানার কাশিয়াড়া বৈরাগীতলা (পরবর্তী পর্যায়ে কাশেমনগর) গ্রামে ১৮৩৭ জন্ম গ্রহণ করেন। কলকাতার ম্যাজিস্ট্রেট পদ লাভ করেছিলেন। কর্ম জীবনে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সমসাময়িক। অবসর গ্রহণের পর ভূপালে নবাব শাহজাহান বেগমের প্রধাম মন্ত্রী হয়ে ছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলনে গান্ধীজীর আহ্বানে কলকাতা টাউন হলে জনসভায় স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে আবদুল জব্বার খান সভাপতিত্ব করেছিলেন।

আব্দুল কাশেম মৌলভী ঃ মঙ্গলকোট থানার বৈরাগীতলা (পরবর্তীকালে কাশেম নগর) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অবিভক্ত বাংলার জাতীয়তাবাদী নেতা। রেল বোর্ডের সদস্য হয়েছিলেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ বহু জনহিতকর কাজের সাথে যুক্ত ছিলেন মৌলভী আবুল কাশেম। তাঁকে স্মরণীয় করে শ্রদ্ধা জানাতেই বৈরাগী তলার নাম পরিবর্তন করে কাশেমনগর হয়।

আফতাব চন্দ ঃ বংশ গোপাল নন্দের পুত্র। পূর্বনাম ব্রহ্মপ্রসাদ নন্দে। ১৮৭৯ থেকে ১৮৮৬ ছয় বছর বর্ধমানের রাজা ছিলেন। অপুত্রক অবস্থায় মারা যাওয়ার আগে বনবিহারী কাপুরের পুত্র বিজন বিহারীকে (পরবর্তীকালে বিজয় চন্দ মহতাব) দত্তক পুত্র হিসাবে গ্রহণ করেন। এক কথায়, বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ বিজয়চন্দের পূর্ব রাজা ছিলেন আফতাব চন্দ ।

আজিম উসসান ঃ মুর্শিদকুলী খাঁ যখন বাংলার দেওয়ান তখন সুবাদার পদে তিন বছরের জন্য আসীন ছিলেন ঔরঙ্গজেবের এই পৌত্র। ইনি ঢাকার বদলে বর্ধমানে বসে বাংলা সুবার কাজ পরিচালনা করতেন। বর্ধমানের সুবাদার থাকা কালীন এঁর হাত থেকেই ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মাত্র ১৬০০০ টাকার বিনিময়ে কলাকাতা সহ তিনটি গ্রামের স্বত্ত্ব লাভ করেন। সেই গ্রামগুলি ছিল ডিহি কলকাতা, গোবিন্দপুর এবং সুতানুটি। এই স্বত্ত্ব ইংরাজরা লাভ করেন ৯ নভেম্বর ১৬৯৮ । বর্ধমান থেকেই পরবর্তী পর্যায়ে কলকাতা মহানগরীর জন্ম হয়। কলকাতা মহানগরীর ইতিহাসের সাথে তাই জড়িয়ে আছে আজিম উসসানের নাম।

আব্দুস সাত্তার ঃ ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ৩ মার্চ টোলা গ্রামে জন্ম। কিশোর বয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথ,নজরুল, মহাত্মা গান্ধী, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, মৌলনা মহম্মদ ইব্রাহিম খাঁ এর আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। এম.এ., এল.এল.বি. পাশ করে ওকালতি শুরু করেন। জাতীয়তাবাদী আন্দোলন করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় নির্বাচিত হয়ে রাজ্যের শ্রম মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৬৫ সালের ২০ জুলাই কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়।

আব্দুল গণি ঃ বর্ধমানের পীর বাহারাম এলাকার অধিবাসী ছিলেন। বিশিষ্ট কবি এবং সাহিত্যিক ছিলেন। বর্ধমান রাজবংশের ইতিহাস সহ বহু কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ কেতুগ্রাম থানার গঙ্গাটিকুরির কাছে পাণ্ডুগ্রামে জন্ম ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে (বাংলা ১২৫৬ সনের ২ জ্যৈষ্ঠ্য)। ১৮৬৯ সালে কলকাতা ক্যাথিড্রাল মিশন কলেজ থেকে স্নাতক (বি.এ.) হন। বর্ধমান জেলার ওকরমা এবং বীরভূম জেলার হেতমপুরে শিক্ষকতা করেন। আইন পাশ করেন ১৮৭১ সালে। ওকালতি শুরু করেন ১৮৭১ থেকে। বাংলা সাহিত্যে পঞ্চানন্দ নামে সুপরিচিত ছিলেন ইন্দ্রনাথ। গদ্য এবং

পদ্য সাহিত্যের সাথে ব্যঙ্গ সাহিত্যেও অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। ভারত উদ্ধার, কল্পতরু প্রভৃতি ব্যঙ্গ রচনা তাঁর সৃষ্টি।

উদয় চন্দ মহতাব ঃ বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ বিজয়চন্দ মহতাবের জ্যেষ্ঠ পুত্র। জন্ম বাংলা ৩০ আষাঢ় ১৩১২ বঙ্গাব্দ। ড. প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষের সুযোগ্য ছাত্র উদয় চন্দ সুশিক্ষিত সংস্কৃতি মনস্ক মানুষ ছিলেন। ১৯২৬ সালে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে স্নাতক। ১৯৪১ থেকে ১৯৫৫ বর্ধমানের মহারাজা রূপে দীর্ঘ ১৪ বছর এলাকার শিক্ষা সংস্কৃতির প্রসারে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন। বর্ধমান জেলার উদয়চাঁদ গ্রন্থাগার তাঁর অমূল্য অবদান। জেলার প্রথম মহিলা কলেজ তাঁর নিজস্ব 'মোবারক মঞ্জিল' প্রাসাদে ১৯৫৫ সালে স্থাপিত হয়। বর্তমানে এই কলেজের নাম মহারাজ উদয় চন্দ মহিলা মহাবিদ্যালয়।

উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী ঃ পূর্বস্থলী থানার সরডাঙ্গা গ্রামে আদি নিবাস। জন্ম ১৮৭৫ সালের ৭ জুন। পিতা নীলমণি ব্রহ্মচারী। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে মাত্র ২৬ বছর বয়সে উপেন্দ্রনাথ মেডিসিন এবং সার্জারি পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভ করেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে উপেন্দ্রনাথ কালাজ্বরের ঔষধ আবিষ্কার করেন। ইউরিয়া স্টিবামাইন নামে এই ঔষধ আবিস্কার হওয়ায় সারা দেশে তীব্র আলোড়নের সৃষ্টি হয়। বৃটিশ সরকার তাঁর গবেষণার স্বীকৃতি স্বরূপ "স্যার" এবং "রায়বাহাদুর" খেতাব দিয়ে সম্মানিত করেছিল। ১৯৪৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারী তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সেই আমলে কালাজ্বর ছিল প্রাণঘাতী রোগ। শতকরা ১৫ জন রোগীর মৃত্যু হত কালাজ্বরে। ইউরিয়া স্টিবামাইন ১৯২১ সালে আবিস্কৃত হলেও ১৯৩০ সালে তা স্বীকৃতি পায়। মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসেন অসংখ্য মানুষ।

উপেন্দ্রনাথ হাজরা চৌধুরী ঃ কালনার ভগবানপুর এলাকায় জাতীয়তাবাদী নেতা ছিলেন। পেশায় মোক্তার উপেন্দ্রনাথ কালনা আদালতের উকিল পূর্ণচন্দ্র দত্তের সহযোগিতায় দেশীয় বস্ত্র উৎপাদনে উৎসাহ দিতে অসংখ্য তাঁত প্রতিষ্ঠা করেন। উত্তর রাঢ় অঞ্চলে উপেন্দ্রনাথ বিপ্লববাদের মুখ্য প্রচারক ছিলেন।

উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ সুদীর্ঘ ৩৯ বছর কাল ধরে তিনি বর্ধমান রাজ কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন(১৮৮৯ - ১৯২৮)। ১৮৮৩ সালে ঢাকা কলেজের সংস্কৃত অনার্স স্নাতক। কিছুকাল কলকাতার সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনার পর ১৮৮৮ সালে বর্ধমান রাজ কলেজে সংস্কৃত এবং ইতিহাসের অধ্যাপক রূপে যোগ দেন। তখন অধ্যক্ষ ছিলেন রামনারায়ণ দত্ত। কলেজে আসার মাত্র এক বছরের মধ্যে উমাচরণ অধ্যক্ষের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

উমেশচন্দ্র দত্ত ঃ রায়না থানার পাঁইটা গ্রামে ১২৬০ বঙ্গাব্দে জন্ম। দেশ হিতৈষী, দানশীল, শিক্ষানুরাগী উমেশ তাঁর পল্লী দরদী ভূমিকার জন্য "দক্ষিণ বর্ধমানের গান্ধী"

রূপে পরিচিত ছিলেন। ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

কবিশেখর কালিদাস রায় ঃ কাটোয়া থানার কড়ুই গ্রামে জন্ম। ৯ জুলাই ১৮৮৯। পিতা যোগেন্দ্র নারায়ণ রায়, মাতা ব্রজবালা দেবী। কবির বাল্যকাল অতিবাহিত হয়েছে পিতার কর্মস্থল বহরমপুরে। কলকাতা ভবানীপুরের মিত্র ইনস্টিটিউশনে শিক্ষকতার পাশাপাশি সাহিত্য কাব্য সাধনায় তিনি নিরলস পরিশ্রম করেছেন। ১৯৫৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে জগত্তারিণী স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৯৭০ সালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে দেশিকোত্তম উপাধি প্রদান করে। ১৯৭২ সালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সাম্মানিক ডি লিট দেয়। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কবি শেখর কালিদাস রায়কে ১৯৭৬ সালে মরণোত্তর ডি লিট উপাধি প্রদান করেছে। ২৫ অক্টোবর ১৯৭৫ তিনি শেষ নিঃস্বাস ত্যা : করেন। ব্রজরেণু, বল্লরী, কুন্দ, বৈকালী, পর্ণপুট, রসকদম্ব, আহরণ, খুদকুঁড়ো প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ তাঁকে চির স্মরণীয় করে রেখেছে কাব্য চর্চার জগতে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিশেখর কালিদাস রায়কে লিখিত পত্রে "তোমার কাব্যগুলি পড়িলে বাংলার ছায়া শীতল নিভৃত আঙিনা, তুলসী মঞ্চ ও মাধবী কুঞ্জ মনে পড়ে।" উল্লেখ করেছিলেন।

কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ঃ রায়না থানার দামুন্যা গ্রামে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জন্মগ্রহণ করেন। মুকুন্দরামই ছিলেন মঙ্গল কাব্যে কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাঁর পিতা হৃদয় মিশ্র 'গুণরাজ' উপাধি ভূষিত ছিলেন। বাংলার শাসনকর্তা মানসিংহের আমলে মামুদ শরীফ নামে এক অত্যাচারী জমিদারের কোপে মুকুন্দরামকে গ্রাম ত্যাগ করতে হয়। কথিত আছে, কষ্টকর পথে চলতে চলতেই তিনি দেবীর আদেশে চন্ডীমঙ্গল কাব্য রচনার প্রেরণা লাভ করেন। রচনাকাল ১৫৯৪ থেকে ১৬০৫। মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল-আররা এলাকার জমিদার বাঁকুড়া রায় সানন্দে গুণী কবিকে আশ্রয় দেন। তাঁর পরবর্তী জমিদার রঘুনাথ তাঁকে কবিকঙ্কন উপাধি প্রদান করেন।

কমল মিত্র ঃ (১৯১২-১৯৯৩) বর্ধমান শহরের বিখ্যাত মিত্র পরিবারের সন্তান। পিতা বিশিষ্ট আইনজীবি নরেশচন্দ্র মিত্র। বর্ধমান রাজ কলেজিয়েট স্কুল থকে ১৯৩৭-এ ম্যাট্রিক পাশ। বর্ধমান কালেকটারিতে এগারো বছর করণিকের চাকরি। চারের দশকে চলচ্চিত্র ও নাটকে প্রবেশ। ১৯৮৩তে শেষ অভিনয়। প্রায় দেড়শ' ছবিতে অভিনয় করেছেন। স্টার থিয়েটার ছাড়াও অন্যান্য মঞ্চে ত্রিশটি সফল নাটকে অভিনেতা। বিখ্যাত ছবিগুলির মধ্যে 'কংস', 'সাতনম্বর বাড়ি', 'মায়ামৃগ', 'পথের দাবি', 'সবার উপরে', 'সাগরিকা', 'দেয়ানেয়া' অন্যতম। সমস্ত সঞ্চয় 'নন্দন'কে দান করে গেছেন। আত্মজীবনী মূলক গ্রন্থ 'ফ্ল্যাশব্যাক'।

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য (সাধক) ঃ ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে মাতুলালয়ে বর্ধমান জেলায় গলসী থানার চান্না গ্রামে জন্ম সাধক কমলাকান্তের। পিতা মহেশ্বর, মাতা মহামায়া দেবী। তাঁর পিতৃভূমি ছিল অম্বিকা কালনায়। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে পিতার মৃত্যু হলে মাতুলালয় চান্না গ্রামে আসেন। সাধক কালিকানন্দ ব্রহ্মচারীর মন্ত্র শিষ্য কমলাকান্ত বাল্যকাল থেকেই

বাশুলী দেবীর মন্দিরে সাধনা শুরু করেন। ভাবে আত্মভোলা এই সাধকের কণ্ঠ সঙ্গীত শুনে মুগ্ধ হন বর্ধমান রাজ তেজচন্দ। তিনি বর্ধমান রাজবাড়িতে তাঁকে সভাপন্ডিতের সম্মানে ভূষিত করেন। তেজচন্দ এবং তাঁর পুত্র প্রতাপচন্দ কমলাকান্তের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। শ্রুতিমধুর অসংখ্য শ্যামা সঙ্গীত রচনা করে কমলাকান্ত স্মরণীয় হয়ে আছেন। বর্ধমানের বোরহাট - কোটালহাট এলাকায় তাঁর পঞ্চ মুন্ডির আসন রয়েছে। আছে কমলাকান্ত কালী মন্দির। মৃত্যু ১৮২১।

কাশীরাম দাস ঃ বাঙলায় মহাভারত রচয়িতা। বর্তমান কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত ইন্দ্রানী পরগনার সিঙ্গি গ্রামে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে জন্ম। পিতা কমলাকান্ত দেব। তিনি বৈষ্ণব ভক্ত হওয়ায় পদবী 'দেব' স্থলে দাস ব্যবহার করতেন। মেদিনীপুরে হরিহরপুর গ্রামের জমিদার কাশীরাম দাসের অগাধ পান্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁর পাঠশালায় প্রধান পন্ডিতের দায়িত্ব দেন। সেই সময় সংস্কৃত জ্ঞান বর্জিত মানুষ মহাভারতের রসাস্বাদ গ্রহণে অক্ষম ছিলেন। জমিদারের বিশেষ অনুগ্রহে সংস্কৃত পন্ডিতদের সম্মিলিত বাধা দান সত্ত্বেও কাশীরাম দাস বাংলায় মহাভারত রচনায় মনোনিবেশ করেন।

'মহাভারতের কথা অমৃত সমান
কাশীরাম দাস কহে শুনে পূণ্যবান'।

কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত ঃ কালনা মহকুমার বৈদ্যপুর পাতিল পাড়ায় জন্ম। ৯ অক্টোবর ১৮৯৩। পিতা ডাঃ চন্দ্রকান্ত সেনগুপ্ত। মাতা দীনতারিণী দেবী। একাধারে সুচিকিৎসক, কবি, শিল্পী, গীতিকার, নাট্যকার এবং দেশপ্রেমিক হিসাবে ডাঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। ১০ জুলাই ১৯৮৬ খৃষ্টাব্দে ৯৩ বছর বয়সে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ কাটোয়া থানার দুগা গ্রামে নিবাস ছিল। ইতিহাসের গবেষক। নবাবী আমলের ইতিহাস রচনা করে কালীপ্রসন্ন সকলের প্রশংসা অর্জন করেছিলেন।

গোলাম রহমান (কচি মিঞা)ঃ বর্ধমানের জাতীয়তাবাদী নেতা, দেশপ্রেমিক। মহাত্মাগান্ধীর ভাব শিষ্য ছিলেন। মহাত্মা গান্ধী বর্ধমানে এসে চাঁদনী (বর্তমান কৃষ্ণসায়র) এলাকায় থাকাকালীন তাঁর সেবার গুরুদায়িত্ব ছিল কচি মিঞার ওপর।

কালীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ মন্তেশ্বর থানার কাইগ্রামে জন্ম ১২ আগষ্ট ১৯১৯। মাতুলালয়ে। পৈত্রিক নিবাস ভাড়ুল। ১৯৩৯ সালে শ্রীরামপুর কলেজ থেকে দর্শন শাস্ত্রে অনার্স নিয়ে স্নাতক হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. ১৯৪২। ১৯৫৮ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিভাগের অধ্যাপকরূপে যোগ দেন। অস্থায়ী উপাচার্যও ছিলেন এখানে। ১৯৫৯ - ৬৭ ভারতীয় দর্শন মহাসভার সহকারী সম্পাদক ছিলেন।

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ২৪ মে জন্ম। পিতা কাজী ফকীর আহমেদ, মাতা জাবেদা বিবি। গ্রামের মক্তব থেকে নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে রাণীগঞ্জের সিয়ারসোল রাজ স্কুলে এবং পরে মঙ্গলকোট থানার মাথরুণ হাইস্কুলে ভর্তি হন। অর্থাভাবে তাঁকে স্কুলের পাঠ শেষ না করেই চাকরীর জন্য ছুটতে হয়। পড়াশোনা ছেড়ে নজরুল সেনা বিভাগে যোগ দেন। চলে যান করাচী। দশম শ্রেণীতেই তাঁর পড়াশোনার ইতি হয়ে যায়। তখন ১৯১৭। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে তিনি সেনা বিভাগের চাকরী ছেড়ে কলকাতায় চলে আসেন। নিয়মিত কবিতা এবং গান লেখা শুরু করেন। ১৯২১ সালে 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় তাঁর প্রথম কবিতা "বিদ্রোহী" প্রকাশিত হয়। গ্রামোফোন কোম্পানিতে সঙ্গীত শিক্ষকের চাকরি পান। শেষ জীবনে কবি স্বাধীন বাংলাদেশে ছিলেন। সারাজীবন অসংখ্য কবিতা গান লিখে গেছেন। বাংলা ভাষার পদ্য এবং গদ্য সাহিত্যে নতুন এক মাত্রা এনে বাঙলাকে সমৃদ্ধ করে গেছেন। ১৯৭৬ সালের ২৯ আগষ্ট ঢাকা শহরে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

কুমুদরঞ্জন মল্লিক ঃ মঙ্গলকোট থানার কোগ্রামে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ৩ মার্চ জন্ম। পল্লীর মানুষের জন্য পল্লীকবি কুমুদরঞ্জনের দরদ ছিল অপরিসীম। বি.এ. পাশ করে শিক্ষকতা শুরু করেন। মাথরুণ হাইস্কুলে দীর্ঘদিন প্রধান শিক্ষক ছিলেন। উজানী, একতারা, শতদল, বনতুলসী প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেছেন। নাটক রচনাও করেছেন, কুহেলী এবং দ্বারবতী। উল্লেখযোগ্য ছোটদের রচনা মুখোশের দোকান, হরে মাঝি। ১৯৭০ সালের ১৪ ডিসেম্বর কলকাতায় কবি কুমুদরঞ্জনের জীবনাবসান হয়।

কেশব ভারতী ঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে মন্তেশ্বর থানার দেনুড় গ্রামে বাস করতেন। কেশব ভারতী ছিলেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গুরু। ১৫১০ খৃষ্টাব্দে কাটোয়ায় তিনি শ্রী চৈতন্যকে সন্ন্যাস দীক্ষা দেন।

কামাক্ষ্যা চরণ মুখোপাধ্যায় ঃ জন্ম মেদিনীপুরে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে। বাল্যে পড়াশোনা শান্তিনিকেতনে, পরে মাথরুণ স্কুল এবং রাঁচী জেলা স্কুল। শেষে ন্যাশনাল মেডিকেল স্কুলে পড়াশোনা করেন। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে কারাবরণ করেন। কাটোয়ার কাছে শ্রীখন্ড ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি ছিলেন। কামাক্ষ্যা চরণ কাটোয়া সেন্ট্রাল কোঃ অপঃ ব্যাঙ্কের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। অসংখ্য জনসেবামূলক কাজে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল। ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

কুঞ্জলাল নাগ ঃ ১৮৫৮ - ১৯২৪ ঢাকা জেলায় বারদীর সুবিখ্যাত নাগ পরিবারের সন্তান। সেই যুগে অসাধারণ প্রতিভাবান ব্যক্তি। শতবর্ষের ঐতিহ্যবাহী বর্ধমান রাজ কলেজে প্রথম ভারতীয় অধ্যক্ষ রূপে তিনি দায়িত্বভার গ্রহণ করেন মাত্র ২৪ বছর বয়সে। সংস্কৃত অনার্সে তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছিলেন (১৮৭৮)। বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন দ্বিতীয় শ্রেণীতে। সংস্কৃতে অনার্স হয়েও বিদ্যাসাগর কলেজে (সেই আমলে কলকাতা

মেট্রোপলিটন ইন্সটিটিউশন) ইংরাজী সাহিত্য ক্লাসে তাঁর পড়ানো দেখে ইংরাজরা বিস্মিত হয়েছিলেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ ঃ কাটোয়া মহকুমার গঙ্গাটিকুরির কাছে ঝামটপুর গ্রামে ১৪৯৬ খৃষ্টাব্দে জন্ম। চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের রচয়িতা । বাল্যকাল থেকেই অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। বাংলা এবং সংস্কৃত ভাষায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল কৃষ্ণদাস কবিরাজের। ঝামটপুর গ্রামে তাঁর প্রতিষ্ঠিত দেব বিগ্রহ সহ দেবালয় রয়েছে।

কৃষ্ণধন রায় ঃ রানীগঞ্জে সিয়ারসোল রাজ স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। আশি বছর বয়সে কালনায় ফিরে স্বদেশী আন্দোলনে যুক্ত হয়ে তিনি এই মহকুমায় প্রথম স্বদেশী বস্ত্র তৈরীর জন্য তাঁত প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কালনার রাজপথে সঙ্গীত পরিবেশন করে ৮০ বছরের এই যুবা স্বদেশী কাপড় ব্যবহারের জন্য আবেদন জানাতেন।

ক্ষেত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ পেশায় মোক্তার ক্ষেত্রনাথ থাকতেন ভাতাড় থানার বড়বেলুন গ্রামে। বৃদ্ধ বয়সে সাহিত্য সাধনা শুরু করেন। শেষ জীবনে সংসার ত্যাগ করে বর্ধমান শহরের কালনা রোডেএসে 'বিশ্বেশ্বরী যোগাশ্রম' প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে তিনি রামায়ণ সম্বন্ধীয় 'দন্ডালিকা' এবং অন্যান্য গ্রন্থ রচনা করেন।

খক্কর শাহ ঃ ষোড়শ শতাব্দীতে বর্ধমান মুঘলদের অধীনে এলেও তার বহু আগে থেকেই বর্ধমানে অসংখ্য মুসলমান পীর এসেছিলেন। খক্কর শাহ তাঁদের অন্যতম। এই সুফী পীর আফগানিস্তানের খাকরোহীর মানুষ। আসল নাম শাহ আলম। মারা যান ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দে। বর্ধমান শহরে রাজবাড়ির পিছনে পায়রাখানা এলাকায় পীর সাহেবের মাজার আছে।

গণপতি পাঁজা (ডাঃ) ঃ মঙ্গলকোট থানার মাজিগ্রামে জন্ম। ১৯১৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ. ফাইনাল পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন। ১৯৪৭ সালে ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেসের সভাপতি হন। মাজিগ্রামে স্বীয় মাতার নামে বিশ্বেশ্বরী উচ্চ বিদ্যালয় এবং পিতার নামে বিনোদ বিহারী পাঁজা নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৯৫৯ সালের ৭ ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়। সাংসদ অজিত পাঁজা এবং সাংসদ ডাঃ রঞ্জিত পাঁজা প্রয়াত গণপতি পাঁজার পুত্র।

গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ঃ ভারতীয় ভাষায় প্রথম সংবাদ পত্র ''বঙ্গাল গেজেটি'' র সম্পাদক। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ১৫ মে শুক্রবার পূর্বস্থলী থানার বহড়া গ্রামের ছাপাখানা ডাঙ্গা থেকে প্রথম এই সংবাদ পত্র প্রকাশিত হয়।

গিরিন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় ঃ ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের নভেম্বরে জন্ম। জেলার অন্যতম

শ্রেষ্ঠ ব্যবহারজীবি এবং সুবক্তা ছিলেন। বর্ধমান পৌরসভাকে স্বয়ং চালিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে তাঁর ভূমিকা স্মরণীয়। সুদীর্ঘকাল ভাইস চেয়ারম্যান এবং চেয়ারম্যান পদে তিনি বর্ধমানের নাগরিকদের সেবা করে গেছেন পৌরসভার মাধ্যমে।

গোপীনাথ দাস ঃ বৈষ্ণব সন্ন্যাসী। কাটোয়ায় এসে তিনি চৈতন্য অনুচর মাধাই এর সমাধিস্থল চিহ্নিত করে নিত্য সেবার ব্যবস্থা করেন। কাটোয়ার এই মাধাই তলায় বহু সন্ন্যাসীর সমাধি আছে।

গোবিন্দদাস কর্ম্মকার ঃ শ্রী চৈতন্যের সমসাময়িক কবি। বাঙলা সাহিত্যের অঙ্গনে বর্ধমানের প্রদীপ স্থায়ী ভাবে জ্বেলে দিয়েছিলেন ভক্ত কবি গোবিন্দ দাস। শ্রী চৈতন্য দেবের জীবন ইতিহাস অতি সুন্দরভাবে কবিতার (গোবিন্দদাসের কড়চা) মাধ্যমে তুলে ধরে স্মরণীয় হয়ে আছেন। বর্ধমানের কাঞ্চননগরে পঞ্চদশ শতাব্দীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

গোবিন্দ দাস কবিরাজ ঃ কাটোয়া মহকুমার শ্রীখন্ড গ্রামে জন্ম ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে। বিশিষ্ট বৈষ্ণব পদকর্তা। শ্রী নিবাস আচার্যের কাছে তিনি বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

গোবিন্দ প্রসাদ পন্ডিত ঃ রানীগঞ্জে উপাধি প্রাপ্ত রাজা। কাশ্মিরী ব্রাহ্মণ (মতান্তরে পাঞ্জাবী) সদাশিব পন্ডিতের পুত্র গোবিন্দ প্রসাদ রানীগঞ্জে এসেছিলেন উত্তর ভারত থেকে। ইংরাজী ভাষায় দক্ষ ছিলেন। রাজা রামমোহন, মহর্ষি দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি দেশ নেতার সাথে ঘনিষ্ট ছিলেন। ১৮৭০ পর্যন্ত তিনি কয়লা শিল্পে যুক্ত ছিলেন। ১৮৫৬ সালে তিনি রানীগঞ্জে প্রথম সিয়ারসোল ইংরাজী উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

গোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ ঃ ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে আসানসোল হিতৈষী নামে পত্রিকা সম্পাদনা করেন।

গিরীশচন্দ্র বসু ঃ জামালপুর থানার বেড়ুগ্রামে জন্ম। বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও সমাজসেবী ছিলেন। বঙ্গবাসী কলেজ ও স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।

গুণেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (ডাক্তার) ঃ মাতুলালয় নদীয়া জেলার বামুনপাড়া গ্রামে জন্ম ১২৮৩ বঙ্গাব্দের ৭ আশ্বিন। পিতৃনিবাস কাটোয়া মহকুমার অগ্রদ্বীপের কাছে কালিকাপুর গ্রাম। স্বাধীনতা আন্দোলনে কাটোয়ার প্রাণপুরুষ। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৪২ এর আন্দোলন পর্যন্ত দীর্ঘ চার দশক ধরে স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ১৮৯৯ কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে এল.এম.এফ. পাশ করেন। ১৮৯৬ কলকাতা কংগ্রেসে রাজনীতিতে হাতেখড়ি। ১৯০৫ শ্বশুরবাড়ি সূত্রে কাটোয়ায় আসেন। তাঁর শ্বশুর কাটোয়ার খ্যাতনামা শিক্ষক ডাঃ সত্যহরি চট্টোপাধ্যায় ছিলেন কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্ঞাতি ভাই। নেতাজী

সুভাষ চন্দ্র কাটোয়ায় এসে গুণীবাবুর বাড়িতে তিনদিন ছিলেন। ১৯৫২ সালে বিধানসভা নির্বাচনে স্বতন্ত্র দলের প্রার্থী হয়ে পরাজিত হন। কাটোয়ার পৌরপতি ছিলেন। ১০ আগষ্ট ১৯৫৫ তাঁর মৃত্যু হয়।

ঘনরাম চক্রবর্তী ঃ খন্ডঘোষ থানার কৃষ্ণপুর - কুকুরা গ্রামে ১৭১১ খৃষ্টাব্দে জন্ম। ধর্মমঙ্গলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। বর্ধমান মহারাজ কীর্তিচন্দ রাজসভায় ঘনরামকে স্থান দিয়েছিলেন "কবিরত্ন" উপাধি দিয়ে।

চন্ডীচরণ মিত্র ঃ ১৯২৮ থেকে ১৯৪৮ দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে বর্ধমান রাজ কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯১৩ সালে কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ইংরাজী অনার্স নিয়ে বি.এ. পাশ করেন। ১৯১৫ সালে এম.এ. পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রথম হন। প্রথমে প্রেসিডেন্সী, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে অধ্যাপনার পর আশুতোষ কলেজে প্রফেসর অফ ইংলিশ রূপে যোগ দেন।

চন্দ্রনারায়ণ লায়েক ঃ আসানসোলের জসাইডি এলাকার বিখ্যাত লায়েক পরিবারের সুসন্তান। আশুতোষ লায়েকের পুত্র। কলকাতা উচ্চ আদালতের চেম্বাবশিপ পরীক্ষায় প্রথম হয়ে রাসবিহারী স্বর্ণপদক লাভ করেন। কলকাতা উচ্চ আদালত সহ ফেডারেশন কোর্ট এবং সুপ্রীম কোর্টের অ্যাডভোকেট হয়ে বহু স্মরণীয় মামলা পরিচালনা করেছেন। ১৯৬১ সালে কলকাতা উচ্চ আদালতের বিচারপতি নিযুক্ত হন।

চারুচন্দ্র দত্ত ঃ আই.সি.এস। শ্রী অরবিন্দের সহপাঠী ছিলেন। রায়না থানার মেড়াল গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। প্রথমে বম্বে হাইকোর্টের জজ রূপে কাজে যোগ দেন। শ্রী অরবিন্দের সংস্পর্শে এসে রাজা সুবোধ মল্লিকের সাহায্যে বিপ্লবী দল গঠন করেন। চারুচন্দ্র এবং সুবোধ মল্লিকের পরিকল্পনা অনুসারে বড়লাট হত্যার পরিকল্পনায় ক্ষুদিরাম বসুকে প্রেরণ করা হয়।

চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ মাতুলালয় ভবানীপুরে জন্ম, ৩১ ডিসেম্বর ১৮৭৭। লন্ডন মিশনারী স্কুলে বাল্য শিক্ষালাভ। চাকরি ছেড়ে ব্যবসা, পরে ১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অন্তরঙ্গ সহকর্মী রূপে যোগ দেন। একনিষ্ঠ কংগ্রেস সেবী এবং মহাত্মা গান্ধীর মন্ত্র শিষ্য ছিলেন। ১৯৪৫ সালের ৫ নভেম্বর টালিগঞ্জের বাসভবনে তাঁর মৃত্যু হয়।

ছকড়ি দেবী ঃ আসানসোল মহকুমার স্বাধীনতা সংগ্রামী। বৃটিশ সরকারের বহু নির্যাতন ভোগ করে বিপ্লবীদের প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করতেন হাসিমুখে।

জগবন্ধু মিত্র (ডাক্তার) ঃ ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে জন্ম । বিশিষ্ট চিকিৎসক, সমাজসেবক এবং বর্ধমান পৌরসভার প্রধান পদে দীর্ঘদিন সেবামূলক কাজে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

পণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তাঁর অনুরোধেই মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে চিকিৎসক হিসাবে বর্ধমানে আসেন। বিদ্যাসাগরের অর্থানুকুল্যে দাতব্য সমিতির তিনি পরিচালক ছিলেন। ১৮৯৪ থেকে ১৮৯৭ তিনি বর্ধমান পৌরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন। তাঁর পুত্র নরেশ চন্দ্র মিত্র পরে পৌরপ্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। জগবন্ধু মিত্রের পৌত্র কমল মিত্র বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা। ২৩ মার্চ ১৯৩০জগবন্ধু মিত্র শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

জয়ানন্দ মিশ্র ঃ চৈতন্যদেবের জীবনী কাব্য চৈতন্যমঙ্গল রচয়িতা। ১৫১১ খৃষ্টাব্দে আমাইপুর গ্রামে জন্ম। শ্রী চৈতন্য নীলাচল যাওয়ার পথে জয়ানন্দের পিতা সুবুদ্ধি মিশ্রের গৃহে অবস্থান করেছিলেন। তিনিই শিশুপুত্রের নামকরণ "জয়ানন্দ" করেন। জয়ানন্দের রচনার বৈশিষ্ট্য , তিনিই শ্রী চৈতন্যের মৃত্যু কাহিনী বর্ণনা করেছেন তাঁর রচনায়। ঐ রচনায় আছে পুরীর রথযাত্রা উৎসবে বিভোর হয়ে পথের মাঝে নৃত্য করতে করতেই পায়ে পাথর ফুটে আহত হন শ্রী চৈতন্য। তাঁর পা সেপটিক হয়ে যায়। সেই রোগেই মৃত্যু হয় চৈতন্য মহাপ্রভুর। জয়ানন্দের এই বর্ণনা স্বীকার করেননি তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য বৈষ্ণব ও কবিরা। তাঁরা জয়ানন্দকে ঘৃণা করতেন।

জাহেদ আলি ঃ কুড়মুন - পলাশী গ্রামে জন্ম ১৩০৫ বঙ্গাব্দের ৫ ফাল্গুন। মূলতঃ ব্যবসায়ী হলেও বিশিষ্ট দেশপ্রেমিক এবং সমাজসেবক ছিলেন। কুড়মুন কৃষক সমিতির সক্রিয় সদস্য ছিলেন। ১৯৭১ খৃষ্টাব্দের ২৯ জানুয়ারী তাঁর মৃত্যু হয়।

জিতেন্দ্র নাথ মিত্র ঃ কাটোয়া মহকুমার দাঁইহাটে জন্ম। কালনা মহকুমার বৈদ্যপুর উচ্চ (ইংরাজী) বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। জনপ্রিয় শিক্ষাব্রতী ছাত্রদরদী জিতেন্দ্রনাথ একাধারে সুগায়ক, অভিনেতা এবং সুবক্তা ছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি বহুবার কারারুদ্ধ হন। প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্পাদক , বর্ধমান জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন।

জ্যোতিষ ঘোষ (ডাক্তার)ঃ রানীগঞ্জ পৌরসভায় দীর্ঘ পনের বছর পৌরপ্রধান (১৯৩০ -১৯৪৫) ছিলেন। জন্ম ১৮৭৪। লব্ধ প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক ছিলেন। ১৯৪৩ এর দুর্ভিক্ষের সময় তাঁর ভূমিকা ছিল অসাধারণ। ৬ জানুয়ারী ১৯৫১ তাঁর মৃত্যু হয়।

জ্যোতিষ চন্দ্র সিংহ ঃ বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং জনসেবক।

জ্যোতিষ চন্দ্র পাল ঃ আজকের শিল্প নগরী দুর্গাপুর বিংশ শতাব্দীর শুরুতে তাঁত বস্ত্রের জন্য খ্যাত ছিল। দুর্গাপুর, সগরভাঙ্গা প্রভৃতি গ্রামে ছিল প্রচুর তাঁত এবং তন্তুবায়। বৃটিশ শাসনে প্রচুর তাঁত বস্ত্রের উৎপাদন করে দুর্গাপুরে স্বদেশী বস্ত্র ব্যবহারে উৎসাহ দিতে বস্ত্র যজ্ঞ শুরু হয়েছিল ১৯৩০ সালে। এই যজ্ঞের মহানায়ক ছিলেন জ্যোতিষ চন্দ্র পাল। গ্রামের বর্ষীয়ান তাঁতী ঈশ্বরকে তাঁতশালার অধ্যক্ষ করে জ্যোতিষ স্বদেশী

আন্দোলনের জন্য অসংখ্য তাঁত বস্ত্র উৎপাদন করিয়ে অসহায় তাঁতীদের মুখে ক্ষুধার অন্ন জুগিয়েছিলেন।

জ্ঞানদাস ঃ আনুমাণিক ১৫৩০ জন্ম (কেতুগ্রাম ২ নং ব্লকের কাঁদরা গ্রামে)। ''ষোড়শ গোপাল'' এর রূপ বর্ণনা করে প্রথম পদ রচনা করেন। রচিত গ্রন্থ 'মাথুর', 'মুরলী শিক্ষা'।

টোগো (প্রণবেশ্বর) সরকার ঃ আদি নিবাস বোলপুরের কাছে সুরুল গ্রামে. জন্ম ১৯০৫ সালের অক্টোবরে। মৃত্যু ১৬ এপ্রিল ১৯৬১। বর্ধমান স্কুল বোর্ডের প্রথম ভাইস চেয়ারম্যান। ১৯৪৬ থেকে ১৯৫২ পর পর তিনবার তিনি বর্ধমান পৌরসভার প্রধান নির্বাচিত হন। দেশপ্রেমী প্রণবেশ্বর সর্ব স্তরের মানুষের কাছেই অত্যন্ত প্রিয়জন ছিলেন। খেলাধূলা, সমাজসেবা ইত্যাদি ক্ষেত্রে টোগো-দা অথবা টোগো সরকার নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন প্রণবেশ্বর। তিনি ছিলেন বর্ধমানের সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবি দেবেন্দ্রনাথ সরকারের কনিষ্ঠ পুত্র।

তারানাথ তর্ক বাচস্পতি ঃ কালনায় জন্ম ১৮১২ খৃষ্টাব্দে। পিতা কালিদাস সার্বভৌম। সংস্কৃত কলেজে উত্তীর্ণ হয়ে তর্ক বাচস্পতি উপাধি লাভ করেন তারানাথ। আইন, বেদান্ত প্রভৃতি পাঠের পর তিনি কালনা শহরে চতুষ্পাঠী চালু করেন। পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিশেষ অনুরোধে সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেছিলেন। দীর্ঘ ১২ বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে তিনি সংস্কৃত ভাষায় বাচস্পত্যাভিধান রচনা করেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। শুধুই সংস্কৃত শিক্ষাদান নয়, কালনা মহকুমাকে ব্যবসায় অগ্রণী রূপে গড়ে তুলতে তারানাথের ভূমিকা ছিল অনবদ্য। তাঁত প্রতিষ্ঠা, গো পালন, কৃষি, পুস্তক মুদ্রণ, কাঠ, সোনা রূপার ব্যবসা সব কিছুতেই প্রত্যক্ষভাবে তারানাথ যুক্ত ছিলেন।

তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ঃ বর্ধমানের লব্ধ প্রতিষ্ঠিত আইনজীবি ছিলেন। বর্ধমান জেলা বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান হয়েছিলেন। জন্ম ১২৭২ বঙ্গাব্দে। বৃটিশ সরকার তাঁকে রায় বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করে।

তেজচন্দ ঃ রাজত্বকাল (১৭৭০ - ১৮৩২)। বর্ধমানরাজ ত্রিলোকচাঁদ বা তিলকচাঁদের পুত্র। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এঁর আমলেই পুত্র প্রতাপচাঁদ বলবৎ করেন জমিদারী রক্ষা করবার জন্য যা ভারতে প্রথম। বর্ধমান-কালনা রাজপথ তেজচাঁদের কীর্তি। শাক্তসাধক কমলাকান্ত ভট্টাচার্যকে ইনি বর্ধমানে আনেন।

দাশরথি রায় ঃ কাটোয়ার কাছে বাঁধমুড়া গ্রামে জন্ম ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে। পিতা - দেবীপ্রসাদ রায়, মাতা শ্রীমতী দেবী। পাঁচালী গানের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন এই দাশু রায়। আমাদের দেশে তিনিই ছিলেন প্রথম সমাজ সচেতন কবি। জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা, সুখ দুঃখ,

সমস্যা ও অনুভুতিকে দাশু রায় পৌরাণিক চরিত্রের মধ্য দিয়ে সরস বাণীরূপ দিয়েছিলেন।

দাশরথি তা ঃ স্বাধীনতা সংগ্রামী, বলিষ্ঠ সাংবাদিক, দেশপ্রেমী ছিলেন। দৈনিক দামোদর নামে পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। রায়না থানার ধামাশ গ্রামে জন্ম বাংলা ১৩১৮ সনের ২৩ কার্তিক বুধবার। গ্রামের পাঠশালার পর তিনি বোরো বলরাম লালবিহারী বিদ্যামন্দিরে ভর্তি হন। পরে চলে আসেন বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুলে এবং বর্ধমান টাউন স্কুলে। স্কুলে পাঠের সময়েই দাশরথি স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ১৯৩০ সালে কংগ্রেসে যোগ দেন। কংগ্রেস ছেড়ে প্রজা সমাজতন্ত্রী দল, জনতা পার্টি প্রভৃতিতে নেতৃত্ব দেওয়ার পর দীর্ঘ ৫০ বছরের রাজনৈতিক জীবন নিঃশব্দে ত্যাগ করেন ১৯৮০ সালের ৬ এপ্রিল। বিধানসভার সদস্য থাকাকালীন তাঁর ব্যঙ্গাত্মক সরস ভাষণ সকলকে মুগ্ধ করত। ১৯৮০ সালের ১৪ এপ্রিল রবিবার তাঁর মৃত্যু হয়।

দামোদর ঃ কাটোয়ার কাছে শ্রীখণ্ডের অধিবাসী ছিলেন। মহাকবি। পাণ্ডিত্যের জন্য যশোরাজ উপাধি পেয়েছিলেন।

দুকড়িবালা দেবী ঃ বীরভূমের নলহাটি থানার ঝাউপাড়া গ্রামে জন্ম (১৮৮৭ সালের ২১ জুলাই) হলেও তাঁর দিদির শ্বশুরবাড়ি রানীগঞ্জের সিয়ারসোল এলাকায় দুকড়ি বালার যাতায়াত ছিল। দিদির পুত্র (বোনপো) নিবারণ চন্দ্র ঘটক ছিলেন জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী। নিবারণের প্রতি অগাধ স্নেহের কারণেই দুকড়িবালা প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। সম্ভবতঃ তিনিই প্রথম মহিলা বিপ্লবী, যিনি কারারুদ্ধ হন। ১৯২১ সালে তিনি ডাঃ বিপিন বিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে কংগ্রেসে যোগ দেন। ২৮ এপ্রিল ১৯৭০ ঝাউপাড়া গ্রামে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

দীননাথ দাস ঃ বর্ধমান কাঞ্চন নগরে দানশীল মহানুভব চিকিৎসক ছিলেন ডাঃ দীননাথ দাস। সারা জীবনে উপার্জিত অর্থ তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ বিভিন্ন হাসপাতালে অকাতরে দান করে গেছেন।

দেবকী কুমার বসু ঃ কালনা মহকুমার অকালপৌষ গ্রামে জন্ম ২৫ নভেম্বর ১৮১৪। স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ গ্রহণের সাথে সাথে সাহিত্য চর্চাও করতেন। তাঁর পরিচালনায় ৪৫ টির বেশী বাংলা চলচ্চিত্র হয়েছে। প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক ছিলেন। তাঁর পরিচালনায় 'সাগর সঙ্গমে' সিনেমা ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার লাভ করে। সঙ্গীত নাটক একাডেমী পুরস্কার পাওয়ার পর দেবকী বাবু পদ্মশ্রী উপাধি লাভ করেছিলেন।

দুর্গাদাস তেওয়ারী ঃ দীর্ঘ ৩০ বছর পৌর সদস্য ছিলেন বর্ধমানে। বিশিষ্ট সমাজসেবী দুর্গাদাস বর্ধমানের মানুষের কাছে ছিলেন অত্যন্ত কাছের মানুষ।

দেবেন্দ্রনাথ মিত্র ঃ সুবিখ্যাত ব্যবহারজীবি এবং সমাজসেবক ছিলেন। বর্ধমান

পৌরসভার সাথে দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন। আইনজীবি হিসাবে বহু মামলায় তাঁর ভূমিকা ছিল স্মরণীয়। কথিত আছে, বহুদিন ধরে রেল দপ্তরের কাছে বকেয়া পৌর কর আদায়ের জন্য তিনি আদালতে মামলায় বর্ধমান স্টেশনে পাঞ্জাব মেল ক্রোক করেন। পৌর কর দিতে বাধ্য হয় রেল মন্ত্রক।

ধরণীধর চট্টোপাধ্যায় ঃ কবি। বাংলার সাহিত্য জগতে এক সময় আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। রানীগঞ্জের প্রখ্যাত রায় সাহেব মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের একমাত্র পুত্র। জন্ম ১৮৯১, সালে। মৃত্যু ১৯২২ খৃষ্টাব্দে। নাট্যাচার্য শিশির ভাদুড়ী তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন।

নবদ্বীপ হালদার ঃ বর্ধমানের সোনাপলাশী গ্রামে জন্ম। বর্ধমান পৌর বিদ্যায়তনের ছাত্র ছিলেন। ছোটবেলা থেকেই অভিনয়ে পটু। বর্ধমানের বিভিন্ন নাট্য দলে নিয়মিত অভিনয় করেছেন। বাংলা চলচিত্রের যশস্বী হাস্যকৌতুক শিল্পী।

নলিনাক্ষ বসু ঃ কুলীনগ্রামের মালাধর বসু বংশের সুসন্তান। জন্ম ১২৫১ বঙ্গাব্দের ৩১ আশ্বিন। মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে তিনি প্রথম শ্রেণীতে ওকালতি পাশ করেন। ১৮৯২ সাল থেকে তিনি বর্ধমান রাজসরকারের উকিল হন। বর্ধমান পৌরসভার প্রথম ভারতীয় পৌরপ্রধান ছিলেন। ১৮৯০ সালে বৃটিশ সরকার তাঁকে রায়বাহাদুর উপাধি ভূষিত করে। তাঁর আমলেই বর্ধমান পৌরসভায় পানীয় জলের জন্য প্রথম জলকল স্থাপিত হয়। ভূগর্ভে পাইপ বসিয়ে রাস্তা এবং গৃহের কলে জল সরবরাহ শুরু হয় ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে। ২০ মার্চ ১৯২১ নলিনাক্ষ বসু শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

নরেন্দ্রনাথ দত্ত ঃ স্বামী বিবেকানন্দ। পৈতৃক নিবাস ছিল কালনা থানার দত্ত দেড়িয়াটোন গ্রামে। পিতা বিশ্বনাথ দত্ত। মাতা ভূবনেশ্বরী দেবী। জন্ম ১২ জানুয়ারী ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দ। মৃত্যু ১৯০২ খৃষ্টাব্দে।

নরেশ চন্দ্র মিত্র ঃ বর্ধমানের প্রাক্তণ পৌরপ্রধান। তাঁর পিতা ডাঃ জগবন্ধু মিত্রও ছিলেন পৌরপ্রধান। নরেশচন্দ্র মিত্র প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবি এবং দক্ষ পৌরপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর পুত্র কমল মিত্র বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা।

নরহরি দাস ঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কাটোয়া মহকুমার শ্রীখণ্ডে জন্ম। বিখ্যাত বৈষ্ণব কবি। মৃত্যু ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে।

নরহরি সরকার ঃ আনুমানিক ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম কাটোয়া মহকুমার শ্রীখন্ড গ্রামে। পিতা নরনারায়ণ দেব। নবদ্বীপে শিক্ষালাভের সময়েই শ্রীচৈতন্যের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়। বৈষ্ণব পদ রচয়িতা নরহরি ভক্তিচন্দ্রিকা পটল, ভক্তামৃতস্টিক প্রভৃতি পরিবেশন করে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে গেছেন। ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি ছিলেন চিরকুমার।

নবীন চন্দ্র ভাস্কর ঃ দাঁইহাট, উনবিংশ শতাব্দীতে জন্ম। বিখ্যাত ভাস্কর। দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী মূর্তি এবং ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা মূর্তি এরই হাতে তৈরী।

নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঃ কুড়মুনের কাছে বুড়ার গ্রামে জন্ম ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে। বিশিষ্ট কবি ছিলেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, নবীন চন্দ্র সেন তাঁর কবিতার প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। প্রথম কাব্যগ্রন্থ ভুবন মোহিনী প্রতিভা ১৮৭৫ সালে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় খন্ড প্রকাশিত হয় ১৮৮০ সালে। এছাড়াও তাঁর রচিত দ্রৌপদী নিগ্রহ কাব্য, আর্য্যসঙ্গীত , জাতীয় নিগ্রহ কাব্য, সিন্ধুদূত প্রভৃতি যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে।

নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ঃ স্যার এবং নাইট উপাধি ভূষিত নলিনীরঞ্জন ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ আইনজীবি। ১৯১০ সালে তিনি কলকাতা উচ্চ আদালতের বিচারপতি, ১৯২০ সালে প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন। মেমারী থানার বননবগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

নরেন্দ্রনাথ সামন্ত ঃ ডাক্তার। স্বদেশী যুগের নির্ভীক, নিষ্ঠাবান জাতীয়তাবাদী নেতা। চিকিৎসক হিসাবে তাঁর জনসেবা ছিল অতুলনীয়।

নিরালম্ব স্বামী (যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) ঃ ১৯ নভেম্বর ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে খানা জংশন রেল স্টেশনের উত্তরে চান্না গ্রামে জন্ম ১২৮৪ বঙ্গাব্দের ৫ অগ্রহায়ণ। বর্ধমান থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অগ্নিযুগের প্রপিতামহ ব্রহ্মা নামে খ্যাত নিরালম্বের পূর্ব নাম ছিল যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। অল্প বয়সেই মাতৃভূমিকে বৃটিশের দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার স্বপ্ন দেখতেন। যুদ্ধ কৌশল শিক্ষালাভের জন্য রাজ কলেজের এফ. এ. পাঠ শেষ করে তিনি যতীন উপাধ্যায় ছদ্মনাম গ্রহণ করে বরোদা রাজ্যের সেনাদলে যোগ দেন। বরোদায় শ্রী অরবিন্দের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়। দেশের নানা স্থানে বিপ্লবীদের জন্য গুপ্ত সমিতি স্থাপন করেছিলেন। ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩০ মৃত্যু।

নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় ঃ কণ্ঠবাবু ছিলেন প্রখ্যাত কৃষ্ণযাত্রা পালাকার। দুর্গাপুরের কাছে ধরণী গ্রামে জন্ম ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ৬ মার্চ। শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ , রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ কণ্ঠবাবুর রচিত পালা গান শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন। ১৩২০ বঙ্গাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

প্রতাপ চন্দ্র রায় ঃ গলসি থানার সাঁকো গ্রামে জন্ম ১৫ মার্চ ১৮৪১ খৃষ্টাব্দ। পিতা রামজয় রায়। প্রতাপচন্দ্র রায় সর্বপ্রথম ইংরাজীতে মহাভারত অনুবাদ করেন। সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলায় মহাভারত, রামায়ণ, শ্রীমদ্‌ভাগবত প্রভৃতি অনুবাদ করে তিনি প্রবল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ১৩ মে গদ্যে মহাভারতের প্রথম খন্ড ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত হয় এবং ম্যাক্সমুলারের কাছে পাঠালে তা প্রশংসিত হয়। প্রথম জীবনে কালীপ্রসন্ন সিংহের আপ্ত সহায়ক ছিলেন।

প্রমথনাথ মালিয়া ঃ রানীগঞ্জে সিয়ারসোলের রাজা সাহেব প্রমথনাথ মালিয়া স্বাধীনতা আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার পশুপতি মালিয়া ১৩৩৪ সনের বর্ধমান দুর্ভিক্ষে আত্মনিয়োগ করেন।

প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় ঃ ২৭ আগষ্ট ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে জন্ম চাভুল গ্রামে। রিপন কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। সারভেন্ট পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। ইতিহাস, দর্শন, পদার্থবিদ্যা এবং গণিতে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল প্রমথনাথের। 'ইতিহাস ও অভিব্যক্তি' গ্রন্থ রচনা করে তিনি খ্যাতিলাভ করেন। অহিংস জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতা ঋষি অরবিন্দের নেতৃত্বে জাতীয় শিক্ষা পরিষদে যোগ দেন। পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ ঃ পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত শিক্ষাগুরু । রায়না থানার শাকনাড়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন ১৫ এপ্রিল ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে। পিতা রামনারায়ণ ভট্টাচার্য। অসংখ্য সংস্কৃত গ্রন্থের টীকা রচয়িতা প্রেমচন্দ্র কলকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পন্ডিত হিসাবে প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ খ্যাতি লাভ করেছিলেন। সেই সময় পথ, যানবাহন প্রভৃতি ছিলনা। সুদূর বীরসিংহ থেকে পায়ে হেঁটে ঈশ্বরচন্দ্র রায়নার শাকনাড়া গ্রামে সংস্কৃত শিক্ষার পাঠ নিতে প্রেমচন্দ্রের কাছে এসেছিলেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে প্রেমচন্দ্রের মৃত্যু হয়।

পীর বাহরাম সাক্কা ঃ তুরস্কের সুফী সাধক বাহারাম সাক্কা ছিলেন বায়াত সম্প্রদায়ভুক্ত। পূর্বনাম শাহওয়াদি বায়াত। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে পীর বাহরাম সাক্কা একজন প্রতিভাবান দার্শনিক কবি এবং অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী সাধক ছিলেন। ১৫৬২ খৃষ্টাব্দে পীর সাহেব বর্ধমানে এসেছিলেন। তিনি থাকতেন শহরের পুরার্তন চক এলাকায়। সম্রাট আকবর ছিলেন তাঁর পরম ভক্ত। পীর সাহেবের মৃত্যুর পর স্বয়ং আকবর বর্ধমানে তাঁর সমাধি সৌধ নির্মাণ করান।

প্রতাপচন্দ (১৭৯০–১৮৫৬) ঃ তেজচন্দের ষষ্ঠ মহিষী নানকী কুমারীর গর্ভ জাত। পিতা মহী বিষুণ কুমারীর পরিচালনাধীন জমিদারীর উত্তরাধিকারী। তথাকথিত মৃত্যু কালনায় ১৮২১-এ। যদিও এ বিষয়ে বিতর্ক আছে। ১৮৩৫ - এ প্রত্যাবর্তন। কোনো কোনো গবেষকের মতে উনি মরেননি, আত্মগোপন করেছিলেন। বিখ্যাত 'জাল প্রতাপচাঁদ' মামলায় দ্বারকানাথ ঠাকুরের সাক্ষ্যে ইনি আদালত দ্বারা জাল প্রমাণিত হন। যদিও এ বিষয়ে বিতর্ক আছে। মারা যান ১৮৬২(?) রাজা রামমোহন রায় এবং ডেভিড হেয়ার ছিলেন এঁর বন্ধু স্থানীয়।

ফণীভূষণ সামন্ত ঃ ১৯৫৭ সালে কয়েক মাসের জন্য বর্ধমান পৌরসভার প্রধান হয়েছিলেন। বিশিষ্ট সমাজসেবক ছিলেন ফণীভূষণ সামন্ত।

বংশীবদন গোস্বামী ঃ পূর্বস্থলী থানার পাটুলী গ্রামে জন্ম। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পার্ষদ ছিলেন।

বনোয়ারীলালা ভালোটিয়া ঃ রানীগঞ্জে স্বাধীনতা আন্দোলনের স্মরণীয় বিপ্লবী। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ৯ আগষ্ট জন্ম। ১৯২০ সালে স্কুল ছাত্র অবস্থায় সহপাঠীদের নিয়ে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। প্রধানতঃ বনোয়ারী লালের সক্রিয় সহযোগিতা সহ আর্থিক সাহায্যেই পরিচালিত হতেন বিপ্লবীরা। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, ১৯৪২ এর ভারত ছাড়ো আন্দোলন সহ অসংখ্য উল্লেখযোগ্য আন্দোলনে যাবতীয় অস্ত্র সরবরাহে মুখ্য ভূমিকা তিনিই নিয়েছিলেন। ১৯৭৩ খৃষ্টাব্দে ২৩ আগষ্ট তাঁর মৃত্যু হয়।

বনোয়ারী লাল চৌধুরী ঃ বিশিষ্ট ব্যবহারজীবি এবং সমাজসেবক ছিলেন বনোয়ারীলাল চৌধুরী।

বনোয়ারী লাল হাটী ঃ বর্ধমানের সুপ্রসিদ্ধ আইনজীবি ছিলেন। জন্ম ১২৬৫ বঙ্গাব্দের ২০ ফাল্গুন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে তিনি বর্ধমান ফৌজদারী আদালতে সরকারী উকিল নিযুক্ত হন। ১৮৯২ থেকে ১৯১৮ পর্যন্ত দীর্ঘ ২৭ বছর জেলা বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান পদে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। ১৯১৭ সালে তিনি রায়বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯২১ সালে বর্ধমান পৌরসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

বংশগোপাল নন্দে ঃ বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ মহতাব চন্দের শ্যালক ছিলেন বংশগোপাল নন্দে। বর্ধমান শহরে টাউন হল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

বলাই দেবশর্মা ঃ বর্ধমানের সাহিত্য, সাংবাদিকতা এবং সাংস্কৃতিক জীবনে বলাই দেবশর্মা ছিলেন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। ১৩০০ বঙ্গাব্দের ১৬ আষাঢ় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সাপ্তাহিক 'শক্তি', সাপ্তাহিক 'আর্যপত্রিকা' প্রভৃতির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন। ১৯৬২ খৃষ্টাব্দের ৩ আগষ্ট তাঁর মৃত্যু হয়।

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ঃ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। কবি হিসেবে বাংলা ভাষাকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। দীপালি নামে প্রমোদ পত্রিকার জন্ম দেন। কবিতা ছাড়াও ছোটো গল্প, প্রবন্ধ, নাটক রচনায় বসন্ত ছিলেন সিদ্ধ হস্ত। কাটোয়া মহকুমায় জন্ম ১২৯৮ বঙ্গাব্দে। ১৩৬৬সনের ২৭ বৈশাখ তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

বিজয়চন্দ মহতাব ঃ বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ। মহারাজ আফতাব চন্দ মহতাবের দত্তক পুত্র ছিলেন বিজয় চন্দ। জন্ম ১৯ অক্টোবর ১৮৮৭। সুশিক্ষিত বিজয়চন্দ তাঁর আমলে বর্ধমান জেলা তথা বাংলার শিক্ষা জগতে বহু উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন। ইংরাজী, বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁর অগাধ পান্ডিত্য ছিল। বর্ধমানে সংস্কৃত শিক্ষার

জন্য বিজয় চতুষ্পাঠী, কারিগরী শিক্ষার বিদ্যালয় , মেডিকেল স্কুল, হাসপাতাল, বর্ধমানের দ্রষ্টব্য স্টার অব ইণ্ডিয়া গেট বা কার্জন গেট (বিজয়তোরণ)এমনকি বর্ধমানের প্রসিদ্ধ মিষ্টান্ন মিহিদানা , সীতাভোগও তাঁর রাজত্বকালেই তৈরী হয়েছিল। বর্ধমান পৌরসভার নিকাশী ব্যবস্থার উন্নয়নে তিনি এককালীন ৪০,০০০ টাকা সাহায্য করেন। হরিসভা, বর্ধমান সাহিত্য পরিষদ, হরিসভা বালিকা বিদ্যালয় প্রভৃতি তিনিই স্থাপন করেছিলেন। ১৯০৩ সালে তিনি মহারাজাধিরাজ বাহাদুর সম্মান ভূষিত হন। ১৯৪১ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

বিজয় কুমার ভট্টাচার্য ঃ বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং শিক্ষাবিদ । জন্ম ১৮৯৫ সালের ১৭জানুয়ারী, খন্ডঘোষ থানার ওঁয়াড়ি গ্রামে। পিতা হেরম্ব ভট্টাচার্য, মাতা রজতবালা দেবী। ১৯১৭সালে দর্শন শাস্ত্রে স্নাতকোত্তর পাঠের সময় তিনি বিপ্লবী অনুশীলনী দলের সংস্পর্শে আসেন। হুগলী ও বর্ধমান জেলার স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। বহুবার কারাবরণ করেন। আজীবন শিক্ষাব্রতী বিজয়কুমার ভট্টাচার্য ১৯৫৩ সালে কলানবগ্রামে "শিক্ষা নিকেতন" স্থাপন করেন। তিনি মধ্য শিক্ষা পর্ষদের সদস্য ও বর্ধমান জেলা স্কুল বোর্ডের সভাপতি ছিলেন। বুনিয়াদী শিক্ষার ওপর বাংলায় তাঁর রচিত দুইটি গ্রন্থ রাজ্যের শিক্ষা জগতের অমূল্য সম্পদ। ১৯৯৩ সালের ৩ জানুয়ারী তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

বিশালাক্ষ বসু ঃ রায়না থানার আহারবেলমা (বর্তমানে নাম "শ্যামসুন্দর" যা তাঁরই প্রদত্ত) গ্রামে জন্ম ১২৮৯ বঙ্গাব্দের ১৬ মাঘ। পল্লীবন্ধু , দানবীর বিশালাক্ষ বসু স্বগ্রামে টোল থেকে শুরু করে স্কুল, কলেজ, দেবদেবীর মন্দির প্রভৃতি অসংখ্য অবদান রেখে গেছেন। জনহিতকর কার্যে তিনি অমরত্ব লাভ করেছেন। বর্ধমান হাসপাতালে রোগীদের পানীয় জলের জন্য পাম্প তাঁর অর্থানুকুল্যেই স্থাপিত হয়। ১৩৬৫ বঙ্গাব্দের ৮ মাঘ তাঁর মৃত্যু হয়।

বিপিনবিহারী ঘোষ ঃ কলকাতা উচ্চ আদালতের বিচারপতি ছিলেন। আদি নিবাস দক্ষিণ দামোদর এলাকার তোড়কোনা গ্রামে। বিশিষ্ঠ জনসেবক ছিলেন।

বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস ঃ সাধকপ্রবর বিশুদ্ধানন্দ ছিলেন যোগীপুরুষ। পূর্ব নাম ছিল ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়। আদি নিবাস বর্ধমান থানার বন্ডুল গ্রামে। পিতা অখিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ১২৬২ বঙ্গাব্দের ২৯ ফাল্গুন জন্ম। বিশুদ্ধাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা। সূর্য বিছানের রশ্মি বিশ্লেষণের মাধ্যমে তিনি বিভিন্ন অলৌকিক তত্ত্ব ও যোগ প্রভাবে নানা কাজ দেখিয়ে জনসমাজে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের ২৭ আষাঢ় তাঁর মৃত্যু হয়।

বিমল প্রতিভা দেবী ঃ রানীগঞ্জ কয়লা খনি অঞ্চলের কয়লা খনি এলাকার শ্রমিক আন্দোলনে স্মরণীয় ভূমিকা পালন করেছিলেন বিমল প্রতিভা দেবী। সৌমেন ঠাকুরের নেতৃত্বাধীন নারী শ্রমিক আন্দোলনের সময় বিমল পুরুষের পোষাক পরতেন। ঘোড়ায়

চড়তেন। এই বিমল প্রতিভা দেবীরই মন্ত্র শিষ্য ছিলেন রবীনসেন। ১৯৪৬ সালে রবীন সেনকে নিয়ে তিনি রানীগঞ্জের বিপ্লবী দুর্গাদাস হালদারের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন।

বিনয় চৌধুরী ঃ স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। বামফ্রন্ট সরকারের জন্ম লগ্ন থেকেই গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রিত্বে থেকে এ রাজ্যের উন্নয়নমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ১৯৩২ সালে সরোজ মুখার্জীর সাথে যুগান্তর দল থেকে বেরিয়ে ইন্ডিয়ান সোস্যালিস্ট রিভলিউশনারি পার্টি গঠন করেন। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত ভারতের মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য এবং নেতা ছিলেন।

বীরেশ্বর তর্কতীর্থ ঃ মহামহোপাধ্যায়। সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিত রূপে বর্ধমান তথা সারা ভারতে সম্মানিত সজ্জন নিষ্ঠাবান ব্যক্তি হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ বিজয়চন্দ প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত শিক্ষাকেন্দ্র বিজয় চতুষ্পাঠীর প্রধান অধ্যাপক রূপে ১৩২১ (জন্ম লগ্ন) থেকে ১৩৬১ (স্বীয় মৃত্যুকাল) দীর্ঘ ৪০ বছর তিনি যুক্ত ছিলেন। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে গভঃ জেনারেল অফ ইন্ডিয়া তাঁকে মহামহোপাধ্যায় সম্মানে ভূষিত করেন।

বুনো রামনাথ ঃ কালনা মহকুমার সমুদ্রগড়ে জন্মেছিলেন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পন্ডিত। বনের মধ্যে বাস করে চতুষ্পাঠীতে ছাত্রদের শিক্ষা দান করতেন বলেই তিনি বুনো নামে খ্যাত। বর্ধমানের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর গুণমুগ্ধ ভক্ত ছিলেন। বুনো রামনাথের স্ত্রী উমাসুন্দরী দেবীও ছিলেন মহৎ চরিত্রের নারী।

বৃন্দাবন দাস ঃ শ্রী চৈতন্যদেবের জীবনী গ্রন্থ ''চৈতন্য ভাগবত' রচয়িতা। মন্তেশ্বর থানার দেনুড় গ্রামে জন্ম ষোড়শ শতাব্দীতে।

বৈকুণ্ঠনাথ সেন ঃ আলমপুরের সেন পরিবারে জন্ম। আইনজীবি বৈকুন্ঠনাথ ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবক। রায়বাহাদুর এবং সি আই ই উপাধিভূষিত হয়েছিলেন। ১৯১৭ সালে অ্যানি বেসান্তের সভাপতিত্বে কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে বৈকুণ্ঠনাথ ছিলেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। পরীক্ষামূলক স্বায়ত্ব শাসন ব্যবস্থার সূচনা করেন। তিনি বর্ধমান জেলায় প্রথম ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের মনোনীত চেয়ারম্যান হয়েছিলেন।

ভবানী সরকার ঃ পুরা নাম ভবানীপ্রসাদ সরকার। কেতুগ্রাম থানার রাজুর গ্রামে জন্ম ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে। পিতা ভুজঙ্গ ভূষণ সরকার। মাতা সুন্দরী দেবী। বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুল, রাজকলেজ থেকে স্নাতক। প্রখ্যাত অভিনেতা এবং নাট্য পরিচালক। একাধিক চলচ্চিত্রেও অভিনয় করেছেন। এক সময় বর্ধমানে অভিনেতা ও নাট্য পরিচালক হিসাবে ভবানী সরকার ছিলেন কিংবদন্তী পুরুষ। অত্যন্ত অভাবের মাঝে ১৯৯৯ সালের ৩১জুলাই তাঁর মৃত্যু হয়।

ভট্ট ভবদেব ঃ রাঢ়ের সিদ্ধল গ্রামের অধিবাসী। ইনি উত্তর রাঢ়ের অথবা দক্ষিণ রাঢ়ের মানুষ ছিলেন সে বিষয়ে বিতর্ক আছে। স্মৃতি, তন্ত্র, জ্যোতিষ, গণিত বিষয়ে বহু গ্রন্থ প্রণেতা।

ভারতীরঞ্জন নিত্যগোপাল সামন্ত ঃ প্রখ্যাত কবি এবং সাহিত্যিক। নিত্যগোপাল সামন্ত মন্তেশ্বর থানার কসা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে । পিতা ব্রজকিশোর সামন্ত। মাতা কৃষ্ণামণি দেবী। সুপ্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ 'শুকনো বকুল', উপন্যাস 'মহুয়া বনের মেয়ে' প্রভৃতির জন্য নিত্যগোপালকে ভারতীভূষণ উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল। জামালপুরের বুড়োরাজকে কেন্দ্র করে রহস্য উপন্যাস 'ললিতা কবিতা মেয়ে' অন্যতম উল্লেখযোগ্য অবদান।

ভাস্করানন্দ সরস্বতী ঃ প্রকৃত নাম সত্যকিঙ্কর গোস্বামী। বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী। বর্ধমান জেলা অজয় নদের তীরে কোন্দা-গোবিন্দপুর গ্রামে জন্ম ১২৯৮ বঙ্গাব্দে। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে মূলাজোড় সংস্কৃত কলেজ থেকে কাব্যতীর্থ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। উখড়া কুঞ্জবিহারী উচ্চ বিদ্যালয় এবং বাসন্তী বিজয় বিদ্যালয়ে দীর্ঘকাল সংস্কৃতের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ কীর্তি শ্রী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের সংস্কৃত অনুবাদ। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

ভামিনীরঞ্জন সেন ঃ বর্ধমানের সমাজ সেবায় স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে তিনি সেইসময় অনেককে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। বর্ধমান হাসপাতালের ভবন নির্মাণ তাঁহার উল্লেখযোগ্য কীর্তি। গান্ধীজীর বর্ধমান আগমন উপলক্ষ্যে ভামিনীরঞ্জন সেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হয়েছিলেন।

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ঃ জন্ম ১৮৮০। পৈতৃকসূত্রে বর্ধমানে কালনা থানার দত্ত দেড়িয়াটোন গ্রামের সন্তান। মৃত্যু ১৯৬১ খৃষ্টাব্দ। ১৯০৭ সালে যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদক থাকাকালীন বৃটিশ সরকার বিরোধী সংবাদ প্রকাশের দায়ে এক বছর কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। জার্মানীতে 'বার্লিন কমিটি' র সম্পাদক হন। ১৯২১ সালে লেনিনের সাথে পত্রালাপের পর মার্কসবাদী হন। ১৯২৫ সালে ভারতে ফিরে মার্কসবাদের পাশাপাশি শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। ১৯৩৩ সালে বর্ধমানের হাটগোবিন্দপুরে আয়োজিত কৃষক সমিতির সভায় ভূপেন্দ্রনাথ জেলা কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন।

ভৈরবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ঃ প্রখ্যাত নাটক যাত্রা পালাকার। মন্তেশ্বর থানার মূলগ্রামে জন্ম ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে। পিতা অমৃতলাল, মাতা বিন্দুবাসিনী দেবী। দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম হওয়ায় কোনওক্রমে স্কুলের গন্ডী অতিক্রম করেন। বাল্যকালেই যাত্রা শোনা এবং কবিতা লেখার ঝোঁক ছিল। তাঁর রচিত প্রথম নাটক 'নাচমহল'। জীবদ্দশায় দুই শতাধিক পালা নাটক রচনা করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য সৃষ্টির মধ্যে রয়েছে 'একটি পয়সা', 'রক্তে রোওয়া ধান', 'কান্না ঘাম রক্ত', 'মা মাটি মানুষ', 'সতী একাবতী' প্রভৃতি। ১৯৯৮ সালের ২৮ ডিসেম্বর দুরারোগ্য ক্যানসারে তাঁর মৃত্যু হয়।

ভোলানাথ মহন্ত ঃ বর্ধমানের প্রখ্যাত কবি ছিলেন। অসংখ্য কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা ভোলানাথ মহন্ত।

মঙ্গল চৌধুরী ঃ প্রখ্যাত অভিনেতা এবং নাট্য পরিচালক ছিলেন। পৈতৃক আদিবাড়ি অধুনা বাংলাদেশের পূর্ব দিনাজপুর হলেও কর্মসূত্রে দীর্ঘদিনের বাসিন্দা ছিলেন বর্ধমান শহরের। কলকাতার ভবানীপুরে জন্ম ইংরাজী ১৯১৮, বাংলা - ১ কার্ত্তিক, ১৩৩৫। পূর্ব রেলের কর্মী ছিলেন। পিতা প্রবোধচন্দ্র চৌধুরী। মঙ্গল চৌধুরীর স্ত্রী গোপা চৌধুরীও মঞ্চে অভিনয় করতেন। বর্ধমান শহরে কেশব সরকার ও ললিত কোনারের সহযোগিতায় মঙ্গ ল চৌধুরী "মৌলিক" নাট্য সংস্থার জন্ম দিয়েছিলেন। বর্ধমান শহরের রেলওয়ে রঙ্গমঞ্চে দৈনিক নাটক পরিবেশনের দুঃসাহসিক উদ্যোগ নিয়েছিল মৌলিক। এই সংস্থাই পরে বর্ধমান ড্রামা কলেজেরও সূচনা করে। ১৯৯০ সালের ২১ জুন তাঁর মৃত্যু হয়।

মতিলাল রায় ঃ প্রখ্যাত নাট্যকার এবং যাত্রাপালাকার, যাত্রা দলের পরিচালক মতিলাল রায় ১২৪৯ বঙ্গাব্দের ২১ মাঘ পূর্বস্থলী থানার ভাতশালা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা মনোহর রায়। সংবাদ প্রভাকর পত্রিকার সাথে যুক্ত ছিলেন। ১৩১৫ বঙ্গাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

মহেশচন্দ্র চৌধুরী ঃ পারস্য ভাষায় সুপন্ডিত ছিলেন। প্রখ্যাত আইনজীবি মহেশের জন্ম মেমারী থানার আমাদপুর গ্রামে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে। কংগ্রেস দল প্রতিষ্ঠার পর এর প্রসার সহ স্বদেশী আন্দোলনে মহেশ চন্দ্র নানাভাবে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। মূলতঃ তাঁর উদ্যোগেই পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং রাধাবিনোদ চৌধুরীর সহযোগিতায় উনবিংশ শতাব্দীতে আমাদপুর গ্রামে প্রথম ইংরাজী শিক্ষার বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। মেমারী থেকে আমাদপুর সড়কও তৈরী হয়।

মহতাব চন্দ (১৮৩২—১৮৭৯) ঃ ঐতিহাসিক বর্ধমান রাজবংশের ত্রয়োদশ পুরুষ। জন্ম ১৮২০ খৃষ্টাব্দে। সুরসিক, শিল্পী এবং গরীব দরদী হিসাবে বর্ধমানের রাজা মহতাব চন্দ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে মহতাব চন্দ ভারতের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। মহতাব চন্দ স্বহস্তে রামায়ণ-মহাভারতের বঙ্গানুবাদ সহ সেকেন্দরনামা, মসনবী, দরবেশ প্রভৃতি ফারসী - উর্দু আখ্যায়িকার বঙ্গানুবাদ করে বিনামূল্যে জনসাধারণের মধ্যে বন্টন করেছিলেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে মহতাবচন্দ গোলাপবাগের দারুল বাহার রাজপ্রাসাদে সমৃদ্ধ পাঠাগার স্থাপন করেছিলেন।

মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী (মহারাজা) ঃ পিতৃভূমি মঙ্গলকোট থানার মাথরুণ গ্রামে। বিশিষ্ট দানবীর ছিলেন মণীন্দ্রচন্দ্র। পিতা নবীনচন্দ্রের স্মৃতি রক্ষায় মাথরুণ নবীনচন্দ্র ইনস্টিটিউশন, যবগ্রামে স্ত্রী কাশীশ্বরীর স্মরণে কাশীশ্বরী বিদ্যালয়, আসানসোলের ইথোরা এলাকায় পুত্র শ্রীশচন্দ্রের নামে শ্রীশচন্দ্র ইনস্টিটিউশন তিনিই স্থাপন করেন।

মালাধর বসু ঃ জামালপুর থানার কুলীনগ্রামে জন্ম পঞ্চদশ শতাব্দীতে। ১৪৭০ থেকে ১৪৮০ এই সময় কালের মধ্যে ভাগবতের দশম - একাদশ স্কন্দ অবলম্বনে শ্রীকৃষ্ণ বিজয় কাব্য রচনা করেন। পিতা ভগীরথ, মাতা ইন্দুমতী দেবী। গৌড়ের রাজা রুকনুদ্দিন বরবক

শাহ শ্রীকৃষ্ণ বিজয় কাব্য পাঠে মুগ্ধ হয়ে মালাধর বসুকে 'গুণরাজ খান' উপাধিতেভূষিত করেন।

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী (কবিকঙ্কন) ঃ কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম দেখুন।

মৃত্যুঞ্জয় দে ঃ দাঁইহাটের সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক ছিলেন। পিতা সুরেন্দ্রনাথ দে। অগ্রদ্বীপের কাছে রঘুনাথপুরে জন্ম ১৩৩৭ সনের ১৪ ভাদ্র। অগ্রদ্বীপ অঞ্চল পঞ্চায়েতের সদস্য, কংগ্রেসের সদস্য এবং বিশিষ্ট সমাজসেবক হিসাবে মৃত্যুঞ্জয় খ্যাত ছিলেন।

মৃগেন্দ্রলাল মিত্র (ডাক্তার) ঃ প্রথম ভারতীয় এম.ডি. এবং এফ.আর.সি.এস. ডিগ্রীধারী ডাক্তার ছিলেন মৃগেন্দ্রলাল মিত্র। রায়না থানার কাইতি গ্রামে জন্ম ২৭ মে ১৮৬৭। ১৮৯১ সালে লাহোর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিকিৎসকের ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯০৫ সালে উচ্চতর শিক্ষার জন্য বিদেশে যান। ক্যালকাটা মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের তিনি প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। ১৯৩৪ সালের ৫ অক্টোবর ডাঃ মৃগেন্দ্রলাল মিত্রের মৃত্যু হয়। কাইতিতে তাঁর নামে একটি পাঠাগার স্থাপিত হয়েছে।

মৌলভী মহম্মদ ইয়াসিন ঃ বর্ধমান জেলা কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি ছিলেন ইয়াসিন সাহেব। দক্ষ ব্যবহারজীবি এবং সমাজসেবী রূপে তিনি আজীবন সাধারণ মানুষের সেবা করে গেছেন। তিনি বর্ধমান পৌরসভার প্রধানের দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর আমলেই বর্ধমানের পথে প্রথম বৈদ্যুতিক আলো জ্বলে। স্বরাজ্য পার্টির পক্ষে তিনি ব্যবস্থাপক সভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন শুরু করামাত্র মৌলভী মহম্মদ ইয়াসিন সাহেব আইন ব্যবসা ত্যাগ করে দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। বর্ধমান শহরের পার্কার'স রোডের নাম পরিবর্তন করে তাঁর নামে করা হয়েছে।

যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ নিরালম্ব স্বামী দেখুন।

যতীশ চন্দ্র সিংহ ঃ জ্যোতিষ চন্দ্র সিংহ দেখুন।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ঃ (১৮৮৭ – ১৯৫৪) প্রসিদ্ধ কবি। বর্ধমানের পাতিল পাড়ার মাতুলালয়ে জন্ম। 'মরীচিকা', 'মরুশিখা', 'মরুমায়া' প্রভৃতি কাব্য গ্রন্থের রচয়িতা।

যাদবেন্দ্র নাথ পাঁজা ঃ পশ্চিমবঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর আদর্শবাদের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। গলসী থানার সাটিনন্দী গ্রামে ১২৯৩ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে জন্ম। নগ্নপদ এবং কটিমাত্র সামান্য খদ্দর বস্ত্র পরিধান করে বর্ধমান জেলার গ্রামগ্রামাঞ্চল ঘুরে তিনি স্বদেশী অভিযানে নতুন মাত্রা যোগ করেছিলেন। গলসি থানার সাটিনন্দী গ্রামে নিবাস হলেও পাঁজা মশাই শহর বর্ধমানেই শৈশব, কৈশোর ও বার্ধক্য অতিবাহিত করেছেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মন্ত্রী সভার সদস্য ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি থাকাকালীন ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে তাঁর মৃত্যু হয়।

যোগেন্দ্রনাথ বসু (যোগেশ চন্দ্র বসু) ঃ জামালপুর থানার বেড়ুগ্রামে পিতৃনিবাস। অগ্নিযুগে দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র ১০ ডিসেম্বর ১৮৮১ 'বঙ্গবাসী'র জনক ছিলেন যোগেন্দ্র চন্দ্র বসু। বাংলায় সর্বপ্রথম বৃহত্তর উপন্যাস 'শ্রী শ্রী রাজলক্ষ্মী' তাঁর সৃষ্টি। ইংরাজীতে দৈনিক সান্ধ্য পত্রিকা টেলিগ্রাফ তিনিই প্রথম প্রকাশ করেন। যোগেন্দ্রনাথের জন্ম জামালপুর থানার ইলসড়া গ্রামে ৩ ডিসেম্বর ১৮৫৪। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ১৮ আগষ্ট তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। রাজলক্ষ্মী, বাঙ্গালী চরিত, মডেল ভগিনী, কালাচাঁদ এবং নেড়া হরিদাস প্রভৃতি গ্রন্থ্ রচনা করে তিনি বাঙালী ও বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছেন।

রসময় মিত্র ঃ গুসকরার কাছে চাণক গ্রামে জন্ম। বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী। কলকাতার হিন্দু স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। পরম বৈষ্ণব রসময় শিক্ষা জগতে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের জন্য রায়বাহাদুর উপাধি লাভ করেছিলেন।

রঘুনাথ শিরোমণি ঃ নবদীপে জন্ম পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগে। শ্রীচৈতন্যদেবের (নিমাই) সহপাঠী ও বিশেষ বন্ধু ছিলেন রঘুনাথ। ন্যায় শাস্ত্রে অসাধারণ জ্ঞান লাভ করে তিনি শিরোমণি উপাধি লাভ করেন। কথিত আছে, ন্যায় শাস্ত্রের টীকা রচনা শুনে মুগ্ধ হয়ে নিমাই তাঁর স্বহস্তে লিখিত পুঁথি গঙ্গায় বিসর্জন দিয়েছিলেন। বন্ধু রঘুনাথের রচিত টীকাই দেশে শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হোক, এই ছিল নিমাই পন্ডিতের কামনা। মানকরের কাছে কোটা গ্রামেই রঘুনাথ টোল চালু করেছিলেন। দূর দূরান্ত থেকে ছাত্রেরা আসতেন তাঁর কাছে। পরে নিমাই পন্ডিত নবদ্বীপ ত্যাগ করলে সেখানের টোল চালানোর অভিপ্রায়ে রঘুনাথ নবদ্বীপ টোলে অধ্যক্ষের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য ভাগে।

রঘুনন্দন গোস্বামী ঃ মানকরের কাছে মাড়ো গ্রামে জন্ম ১১৯৩ বঙ্গাব্দে। রঘুনন্দন ছিলেন নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর বংশধর। পিতা কিশোরী মোহন গোস্বামী। রামরসায়ন কাব্য গ্রন্থ্ সহ তিনি সংস্কৃত ভাষায় ৩৫টি এবং বাংলা ভাষায় দুইটি গ্রন্থ্ রচনা করেন।

রঘুনাথ রায় ঃ পূর্বস্থলী থানার চুপী গ্রামে জন্ম। মহাসাধক এবং পন্ডিত ছিলেন। বর্ধমান মহারাজার প্রথম দেওয়ান হয়েছিলেন। তাঁর লেখা চর্যাপদ প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ কালনার কাছে বাকুলিয়া গ্রামে জন্ম ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে। পিতা রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। কবি প্রতিভার পরিচয় পেয়ে সংবাদ প্রভাকর পত্রিকার সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্ত তাঁকে এই পত্রিকায় লেখার সুযোগ দেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. পাশ করে প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন রঙ্গলাল। বাংলা ভাষায় তাঁর রচিত প্রথম ঐতিহাসিক কাব্যগ্রন্থ ''পদ্মিনী উপাখ্যান'' বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উজ্জীবিত করতে তাঁর রচিত কবিতা. কাব্য, গান প্রভৃতি ছিল নবজাগরণের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। নবজাগরণের উত্তাল তরঙ্গে রঙ্গলালের রচিত

দেশাত্মবোধক গান যুবক দলের রক্তে নতুন প্রেরণা এবং উত্তেজনার সৃষ্টি করত। তাঁর রচিত গান এখনও রক্তে উন্মাদনার সৃষ্টি করে ঃ

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায়।
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে
কে পরিবে পায়।"

রাখালদাস নন্দী ঃ স্বাধীনতা আন্দোলনে বৈদ্যপুর গ্রামে কংগ্রেসের প্রাণস্বরূপ ছিলেন রাখাল। মূলতঃ তাঁর উদ্যোগেই অজগ্রাম বৈদ্যপুর এক সময় কংগ্রেস নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিন চন্দ্র পাল প্রমুখের পাদস্পর্শে ধন্য হয়েছিল।

রাসবিহারী বসু ঃ রায়না থানার সুবলদহ গ্রামে ১২৯৩ বঙ্গাব্দের ১২ জ্যৈষ্ঠ জন্মেছিলেন। বিপ্লবী দলের মহানায়ক । আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠন করে তিনিই সুভাষ চন্দ্র বসুর হাতে এই বাহিনীর দায়িত্বভার অর্পণ করেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ২৩ ডিসেম্বর রাসবিহারী দিল্লীতে বড়লার্ট লর্ড হার্ডিঞ্জকে লক্ষ্য করে স্বহস্তে বোমা নিক্ষেপ করেছিলেন। ভারতের পক্ষে জাপানের জনমত সংগ্রহে তাঁর ভূমিকা ছিল অনবদ্য। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন নিয়ে তিনি জাপানী ভাষায় ১৬ টি পুস্তক রচনা করেছিলেন। ১৯৪৫ সালের ২১ জানুয়ারী তাঁর মৃত্যু হয়।

রাসবিহারী ঘোষ ঃ প্রখ্যাত আইনজীবি এবং দানবীর রাসবিহারী ঘোষ জন্মেছিলেন খন্ডঘোষ থানার তোড়কোনা গ্রামে ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ২৩ ডিসেম্বর। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন পরীক্ষায় তিনি প্রথম হন। জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন ১৯০৭ সালে। তাঁর দানে কলকাতা সায়েন্স কলেজ, কলকাতা ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সেই আমলে নানাভাবে সমৃদ্ধ হয়েছিল। সেই আমলে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একুশ লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার টাকা দান করেছিলেন। তোড়কোনা গ্রামে তিনি নিজ পিতা জগবন্ধু ঘোষের নামে বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। দানবীর আইনজীবি রাসবিহারী ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ২৮ ফেব্রুয়ারী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

রাজকৃষ্ণ রায় ঃ গুসকরার কাছে ভাতাড় থানার মাহাতা-রামচন্দ্রপুর গ্রামে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ২১ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। সংস্কৃত রামায়ণের আক্ষরিক বঙ্গানুবাদ সহ অসংখ্য নাটক, উপন্যাস রচনা করে রাজকৃষ্ণ বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। কলকাতার 'বীনা' নাট্যমঞ্চ তিনিই প্রতিষ্ঠা করেছেন। তরণীসেন বধ, মীরাবাঈ, লায়লা মজনু, সরোজিনী, অনলে বিজলী প্রভৃতি নাটক তাঁর অমর কীর্তি। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ১১ মার্চ মাত্র ৪৫ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

রাধাশ্যাম চৌধুরী ঃ মন্তেশ্বর থানার দেনুড় গ্রামে জন্ম। স্বাধীনতা সংগ্রামে কালনা মহকুমায় কংগ্রেসের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কালনা মহকুমা কংগ্রেসের সম্পাদক হয়েছিলেন।

রাধাগোবিন্দ দত্তঃ বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী। জন্ম বর্ধমান থানার কুড়মুন গ্রামে। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত 'বর্ধমানের ডাক' সংবাদ সাপ্তাহিক সম্পাদনা করেছেন।

রামাই পন্ডিত ঃ দশম শতাব্দীতে 'শূন্য পুরাণ' রচনা করেছিলেন রামাই পন্ডিত। পিতা বিশ্বনাথ, মাতা কেশবতী। ধর্ম ঠাকুর বাবা ভোলানাথের পুজো পদ্ধতির জন্য সুপ্রাচীন বৌদ্ধকাব্য ছিল শূন্যপুরাণ। প্রাচীনকালে মেমারী থানা এলাকায় দামোদরের শাখা নদী ভল্লুকার তীরে বাস করতেন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বিশ্বনাথ। এই বিশ্বনাথের পুত্র ছিলেন রামাই পন্ডিত। দশম শতাব্দীতে তিনি ভল্লুকা নদী তীরে প্রথম ধর্মপূজার প্রচলন করেন। রাঢ় বঙ্গে শূন্যপুরাণ সবথেকে প্রাচীন কাব্য। নিরাকার বা শূন্যাকার ধর্ম ঠাকুরের কোনও মূর্তি ছিল না। ডিম্বাকার পাথরকে ধর্মঠাকুর রূপে পূজা করা হত। শূন্যপূরাণে রামাই লিখেছেন - 'পূজি শ্রী নৈরাকার, শূন্যমূর্তি ধ্যান করি।'

রাধারাণী মহতাব ঃ বর্ধমান মহারাজ উদয় চন্দের সহধর্মিনী ছিলেন মহারানী রাধারানী। ১৯৬২ সালে বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের প্রার্থীরূপে তিনি জনসেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেন।

রামচন্দ্র গোস্বামী ঃ কালনা মহকুমার প্রখ্যাত সমাজসেবক ছিলেন। বাঘনা পাড়া গ্রাম স্থাপনে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল।

রূপমঞ্জরী (হটু বিদ্যালঙ্কার)ঃ (১৭৭৫ ?-১৮৭৫) গ্রাম কলাইঝুটি, জেলা-বর্ধমান। বৈষ্ণব পিতার কাছে ব্যাকরণ, সাহিত্য এবং চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষা। কন্যার অসাধারণ শিক্ষানুরাগ ও মেধার পরিচয় পেয়ে তাকে নিকটবর্তী এক বৈয়াকরণের গৃহে রেখে ছেলেদের সঙ্গেই একই টোলে ব্যাকরণ পড়ার ব্যবস্থা করেন। পিতার মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধাদি সমাপন করে আবার গুরুগৃহে গিয়ে বিদ্যাচর্চায় মন দেন। ব্যাকরণ পাঠ শেষ হলে তিনি সরগ্রাম নিবাসী আচার্য গোকুলানন্দ তর্কালঙ্কারের কাছে সাহিত্য এবং তারপর চরক, শুশ্রুত ইত্যাদি জটিল চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যায়ন করেন। চিকিৎসা শাস্ত্রে তাঁর নৈপুণ্যের জন্য বিভিন্ন স্থান থেকে বহু চিকিৎসক তাঁর কাছে চিকিৎসা বিষয়ে উপদেশ গ্রহণ করতে আসতেন। ব্যাকরণ, নিদান, চরক ইত্যাদি পাঠ গ্রহণের জন্যে তাঁর কাছে বহু ছাত্রও আসতেন। তিনি পুরুষের মত মস্তক মুন্ডন , শিখা ধারণ ও উত্তরীয় পরিধান করতেন। সারাজীবন অবিবাহিতা থেকে জ্ঞানের ও চিকিৎসা বিদ্যার সাধনা করে গেছেন। হটু বিদ্যালঙ্কার নামে তিনি সুপরিচিতা হন।

রূপ-সনাতন ঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের ছয় গোস্বামীর অন্যতম রূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামী। জন্ম কেতুগ্রামের নৈহাটী গ্রামে। পূর্ব নাম সাকর মল্লিক ও দবীর খাস। গৌড়ের নবাবের অধীনে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ছিলেন। চৈতন্যদেবের অনুগামী হওয়ার পরে আমৃত্যু এঁরা বৃন্দবনে কাটান।

রূপরাম চক্রবর্তী ঃ রায়না থানার কাইতি গ্রামের কাছে শ্রীরামপুরে ষোড়শ শতকের কবি রূপরাম চক্রবর্তীর জন্ম হয়। পিতা অভিরাম ছিলেন খ্যাতনামা পন্ডিত। কথিত আছে ভক্তিবান রূপরাম ধর্মঠাকুর শিবের স্বপ্নাদেশ লাভ করে ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন। ধর্মমঙ্গল কাব্যে গোপভূমির রাজা ইছাই ঘোষের সেনাপতি কালু ডোম এবং পত্নী লক্ষ্মীর অপূর্ব বীরত্ব কাহিনী পাঠ করলে রোমাঞ্চ জাগে। ধর্মমঙ্গল কাব্য পাঠ করে সেকালের লোকশিক্ষা সমাজ সংস্কৃতির অপরূপ পরিচয় লাভ করা যায়।

রাজশেখর বসু ঃ জন্ম ১৬ মার্চ ১৮৮০, মৃত্যু ২৭ এপ্রিল ১৯৬৮। শক্তিগড়ের কাছে বামুনপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক এবং হাস্যরস স্রষ্টা রাজশেখর 'পরশুরাম' ছদ্মনামে লিখতেন। ভেষজ শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সাধনায় তিনি বেঙ্গল কেমিক্যাল কারখানায় অতুলনীয় অবদান রেখে গেছেন।

রেভারেন্ড লালবিহারী দে ঃ বর্ধমান জেলার সোনাপলাশী গ্রামে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী রেভারেন্ড লালবিহারী দে। খৃষ্ঠধর্ম গ্রহণ করলেও তিনি ছিলেন খাঁটি বাঙালি। 'Bengals Peasant Life' গ্রন্থ রচনা করে তিনি ইংরাজদের কাছে এই বাংলার গরীব সমস্যা জর্জর কৃষককুলের করুণ ছবি তুলে ধরেছিলেন। বাংলার লোকমুখে প্রচলিত উপকথার গল্পগুলি ইংরাজী ভাষায় লিখে তিনি 'Folk Tales of Bengal' গ্রন্থ রচনা করেন। বেঙ্গল ম্যাগাজিন নামে এক মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করতেন লালবিহারী দে। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় তাঁর মৃত্যু হয়।

লালা নির্মল প্রকাশ নন্দে ঃ বর্ধমান রাজ পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত এই মানুষটির বর্ধমান পৌরসভার জন্য অবদান অনেক। পৌরসভার ভবনটি এরই অর্থে তৈরী।

লোচন দাস ঃ পূর্বনাম ছিল ত্রিলোচন দাস। জন্ম উজানি কোগ্রামে ১৫২৩ খৃষ্টাব্দে। কবি নরহরি দাসের সুযোগ্য শিষ্য লোচন দাস চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ কালনা থেকে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে পল্লীবাসী পত্রিকার সম্পাদক। শতবর্ষের ঐতিহ্যবাহী এই পত্রিকাটি একবিংশ শতাব্দীতেও প্রকাশিত হচ্ছে।

শ্যামদাস বাচস্পতি ঃ কবিরাজ শিরোমণি। পূর্বস্থলী থানার চুপী গ্রামে জন্ম ১৭৭১ শকাব্দে। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে অগাধ পান্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। কাশীতে যোগীপ্রবর শ্যামাচরণ লাহিড়ীর কাছে যোগক্রিয়া শিক্ষাগ্রহণ করে অদ্বিতীয় নাড়ী জ্ঞান লাভ করেন। চিকিৎসা শাস্ত্র ছাড়াও পান্ডিত্যের প্রতিভার জন্য শ্যামদাস বাচস্পতি খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তিনি বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। গরীব অথচ মেধাবী ছাত্রদের তিনি নিজ গৃহে স্থান দিয়ে অন্ন বস্ত্রের সংস্থান সহ শিক্ষা দিতেন। স্বাধীনতা আন্দোলনেও তাঁর যথেষ্ট অবদান ছিল। ১৩৪১ বঙ্গাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর বৌদ্ধ, খৃষ্টান,

মুসলমান, হিন্দু প্রভৃতি সব ধর্মের মানুষ তাঁর স্মরণসভার আয়োজন করেছিলেন। এই ঘটনাই প্রমাণ করে তিনি সকলের কাছে কেমন প্রিয় ছিলেন।

শ্যামলাল গোস্বামী ঃ কালনার স্বাধীনতা সংগ্রামী। বিত্তবান, শিক্ষিত শ্যামলাল সেই যুগে কালনার পাথুরিয়া ঘাটায় সর্বপ্রথম স্বদেশী দ্রব্যের দোকান চালু করেছিলেন। বিক্রি বাটা তেমন না হলেও স্বদেশী দ্রব্য প্রচারে এই উদ্যোগ ছিল স্মরণীয়। স্বদেশী ভান্ডার পরবর্তীকালে বিপ্লবীদের গোপন কেন্দ্র রূপে কাজ শুরু করে।

শৈলবালা ঘোষজায়া ঃ পূর্ববঙ্গে জন্ম। মেমারীর গৃহবধূ। দীর্ঘদিন সাহিত্য চর্চা করেছেন। শেষ জীবন কাটিয়েছেন আসানসোলে। মহীয়সী মহিলা। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলনের আদর্শ স্থাপনে তিনি তাঁর রচনার মাধ্যমে গ্রাম বাংলার সাহিত্য সমৃদ্ধ করেছেন।

শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ঃ ডাক্তার। জামালপুর থানার ইলসড়া গ্রামে জন্ম ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ১০ ফেব্রুয়ারী । কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে আই.এস.সি. পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভ করে কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। বর্ধমানের চিকিৎসা জগতে ডাঃ শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব । বর্ধমানের অভিযান গোষ্ঠী বইমেলায় তাঁকে দেবপ্রসন্ন পুরস্কারে ভূষিত করেছে। বর্ধমানের শিক্ষা, কলা, সংস্কৃতি এবং সমাজসেবায় শৈলেন ডাক্তার মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছেন।

শ্রীকুমার মিত্র ঃ জামালপুর থানার রাজারামপুর গ্রামের জমিদার বংশে জন্ম ১৯০২ খৃষ্টাব্দে। বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং সমাজসেবক ছিলেন। খন্ডিত ভারতে পূর্ববঙ্গ থেকে ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের জন্য তিনি বর্ধমানের কাঞ্চননগর এলাকায় উদয়চন্দের সাহায্যে ৫৫০ টি পরিবারকে স্থান দিয়ে উদয়পল্লী স্থাপন করেছিলেন। সেই সময় জেলায় কারিগরী শিক্ষা প্রসারের জন্য জেলা বোর্ড সভাপতি জিতেন্দ্রনাথ মিত্রের অনুরোধে তিনি মহারাজ উদয়চন্দের কাছ থেকে ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের জন্য ২২ বিঘা জমি সংগ্রহ করেছেন। ১৯২৫ সালে সাংবাদিকতা শুরু করেন। 'স্পষ্টকথা' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদনা করেতেন বর্ধমানের ঢলদিঘী পাড়া থেকে। হিন্দু মহাসভা, সর্বমঙ্গলা ট্রাষ্ট বোর্ড, সাংবাদিক সঙ্ঘ প্রভৃতি অসংখ্য সংগঠনের সাথে তিনি যুক্ত ছিলেন। বর্ধমানের অভিযান গোষ্ঠী বইমেলায় তাঁকে দেবপ্রসন্ন পুরস্কারে সম্মানিত করেছে। এই পুরস্কারের অর্থ পাওয়া মাত্র তিনি তা শ্রী অরবিন্দ ট্রাস্ট কমিটিকে দান করেন।

শ্রীশচন্দ্র চৌধুরী ঃ জন্ম আমাদপুর গ্রামে। মৃত্যু ১৯৩১। বলিষ্ঠ আইনজীবি এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। সঙ্গীত ও কলাবিদ্যায় তিনি পারদর্শী ছিলেন। অসংখ্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থেকেস্মরণীয় এবং বরণীয় হয়ে আছেন।

শ্যামদাস আচার্য ঃ কালনা মহকুমার মাতিশ্বর গ্রামে জন্ম হলেও শ্যামদাস আচার্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেরণায় ভৈটা এলাকায় সাধনপীঠ স্থাপন করেছিলেন। মহাপ্রভুর

প্রেম ভক্তি ধারাকে বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার কাছে শ্যামদাস আচার্য নিরলস পরিশ্রম করে গেছেন।
মতান্তরে ইনি চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ অদ্বৈত আচার্যের চতুর্থ পুত্র। সীতাদেবীর গর্ভে এঁর জন্ম কুলীনগ্রামে। পূর্বনাম আশুতোষ। অদ্বৈত আচার্যের প্রথম তিনপুত্র চৈতন্য অনুসারী হলেও ইনি এবং অপর দুই ভাই অদ্বৈতবাদ অনুসারী ছিলেন। এই অপরাধে বিতারিত হন কুলীনগ্রাম থেকে। পরবর্তীকালে বৈষ্ণব ভাবধারায় সাধনা করলেও গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতের মানুষ ছিলেন না।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ঃ জন্ম ১৯০১ সালে, ২১ মার্চ বর্ধমান জেলার অন্ডালে। শৈলজানন্দের প্রকৃত নাম ছিল শ্যামলানন্দ, ডাক নাম শৈল। তার থেকেই শৈলজানন্দ। আবাল্য বন্ধু কাজী নজরুল ইসলাম। প্রথমে কবিতা লিখতেন, পরে কথাসাহিত্যিক হ'ন। পরে চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশ করেন। কয়লা অঞ্চলের সাহিত্যের প্রথম লেখক তিনি।

ষষ্ঠী নারায়ণ গড়াই ঃ আসানসোল মহকুমার বিশিষ্ট সমাজসেবী। জন্ম ১৯১৬ খৃষ্টাব্দ। পৈত্রিক বাসভূমি বর্ধমান জেলার রাজকুসুম গ্রাম। তাঁর সক্রিয় সহযোগিতা এবং দানের ওপর ভিত্তি করে জেলায় অসংখ্য সেবা প্রতিষ্ঠান, চিকিৎসা কেন্দ্র, সড়ক পথ, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি গড়ে উঠেছে। বর্ধমান সম্মিলনীর আসানসোল শাখার সভাপতি ছিলেন।

সৈয়দ শাহেদুল্লাহ ঃ জন্ম ২৪ মার্চ, ১৯১৩,মৃত্যু ২৪ জানুয়ারী ১৯৯১। স্বাধীনতা সংগ্রামী, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আপোষহীন লড়াকু নেতা। কমিউনিষ্ট পার্টির একজন প্রথম শ্রেণীর নেতা। বেশ কয়েকটি পুস্তকের রচয়িতা। বিধানসভা ও সংসদের সদস্য ছিলেন। 'নন্দন' পত্রিকার সম্পাদনার কাজও সুষ্ঠুভাবে করেছেন।

সঙ্গম রাই ঃ বর্ধমান রাজ বংশের আদি পুরুষ। সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকে (১৬১০) পঞ্জাব থেকে ব্যবসার প্রয়োজনে বর্ধমান শহরের কাছে বৈকুণ্ঠপুর - রাইপুর এলাকায় বসবাস শুরু করেন। তাঁর পৌত্র আবু রায় মুঘল সরকারের কোতোয়াল নিযুক্ত হলে রাজবংশের সূচনা হয়।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ঃ পূর্বস্থলী থানার চুপী গ্রামে ১১ ফেব্রুয়ারী ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে জন্মেছিলেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁর পিতা রজনীনাথ ছিলেন মনীষি অক্ষয় কুমার দত্তের পুত্র। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাব শিষ্য সত্যেন্দ্রনাথ প্রায়ই জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে যেতেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় ছন্দের অপূর্ব মাধুর্য উপলব্ধি করে সত্যেন্দ্রনাথের নাম দিয়েছিলেন "ছন্দের যাদুকর"। অসংখ্য দেশাত্মবোধক কবিতা লিখে তিনি বাংলার যুব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। বহু বিদেশী কবিতার বাংলা অনুবাদ করে খ্যাতি অর্জনের পর মাত্র ৩৯ বছর বয়সে ২২ জুন ১৯২২ ছন্দের যাদুকরের মৃত্যু হয়।

সত্যকিঙ্কর গোস্বামী ঃ ভাস্করানন্দ সরস্বতী দেখুন।

সর্বানন্দ ন্যায় বিদ্যাবাগীশ ঃ জন্ম বর্ধমান জেলার বিদ্যাবতীপুরে। সংস্কৃত শব্দকোষ "শব্দ কল্পদ্রুম" গ্রন্থ রচনা করে সর্বানন্দ খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

সত্যচরণ মৈত্র ঃ ডাক্তার সত্যচরণ মৈত্র বর্ধমান পৌরসভার সদস্য এবং উপ পৌরপ্রধান রূপে দীর্ঘদিন বর্ধমানের মানুষের সেবা করে গেছেন। ডাক্তার হিসাবে তাঁর দানশীলতা ও সুন্দর ব্যবহার বহুদিন বর্ধমানের মানুষের মনে থাকবে।

সন্তোষকুমার বসু ঃ বর্ধমানের বিশিষ্ট সমাজসেবক এবং ব্যবহারজীবি সন্তোষকুমার বসু ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ১১ ফেব্রুয়ারী মাতুলালয় গলসি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা বিশিষ্ট ব্যবহারজীবি শশিভষণ বসু। ইংরাজী শিক্ষার সাথে সাথে বৃটিশ সংস্কৃতি, নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলাবোধের একনিষ্ঠ ধারক ও বাহক সত্যেন্দ্রনাথ বর্ধমানে 'বোস সাহেব' নামে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বেশ কয়েকবার তিনি বর্ধমান পৌর সভার প্রধান নির্বাচিত হয়েছিলেন। জেলায় অসংখ্য সমাজসেবা সংস্থা, বিদ্যালয়, হাসপাতাল প্রভৃতির সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। মৃত্যুর আগে তাঁর প্রিয় বাগান বাড়িটি তিনি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেন।

সজনীকান্ত দাস ঃ পৈতৃক নিবাস বীরভূম জেলায় হলেও জন্ম (২৫-৮-১৯০০) বর্ধমান জেলার মানকরের কাছে বেতালবন গ্রামে, মাতুলালয়ে। বীরভূম, মালদহ, দিনাজপুর প্রভৃতি জায়গায় প্রাথমিক লেখাপড়ার শেষে প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়তে যান। রাজনৈতিক কারণে বাঁকুড়ায় গিয়ে সেখান থেকে আই এস সি পাশ করে স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে বি এস সি পাশ করেন। বেনারসে দেড় বছর মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার পর ভাল না লাগায় ফিজিক্স নিয়ে কলকাতা সায়েন্স কলেজে ভর্তি হন। সাহিত্যের জন্য 'শনিবারের চিঠি' যোগ দেওয়ার ফলে এম এস সি ডিগ্রী থেকে বঞ্চিত হন। শনিবারের চিঠির একাদশ সংখ্যা থেকে আমৃত্যু সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন। সাহিত্য সমালোচক হিসাবে নাম করলেও সৃজনশীল লেখাতেও পারদর্শী ছিলেন। প্রথম প্রথম অনেকেই তাঁর সমালোচনায় ক্ষুব্ধ হলেও পরে সবাই বুঝেছিলেন তাঁর সমালোচনা 'মধুর হুল'। মৃত্যু হৃদরোগে, ১১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬২।

সুকুমার সেন ঃ যথার্থ পন্ডিত আচার্য ডঃ সুকুমার সেনের জন্ম ১৯০০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে। পিতা হরেন্দ্রনাথ সেন, মাতা নবনলিনী সেন। পিতৃনিবাস রায়না থানার গোতান গ্রামে। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রেমচাঁদ রায় চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। ১৯৩৭ সালে পি.এইচ.ডি। ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস, ভাষার ইতিবৃত্ত, ইসলামী বাংলা সাহিত্য, প্রাচীন বাংলা ও বাঙ্গালী, বাংলা স্থান নাম, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দিনের পর দিন যে গেল প্রভৃতি অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করে ডঃ সুকুমার সেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন।

সুচরিতা পাল ঃ বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী কালনার এই গৃহবধূর জন্ম কলকাতার মঙ্গলপাড়ায় ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ৫ মে। ১৯১৯ সালে মাত্র ১৪ বছর বয়সে জ্ঞানেন্দ্র পালের সাথে তিনি বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হন। ১৯৩০ সালে গান্ধীজির স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ কালনায় এসে পৌঁছালে বিদেশী কাপড় বর্জনের দাবীতে গৃহবধূ সুচরিতা কালনার গৃহবধূদের নিয়ে আন্দোলনে নামেন। জেলা সমাজকল্যাণ সমিতি, কালনা হাসপাতাল, জেলখানা, লিগ্যাল এড, মহিলা সমিতি প্রভৃতি অসংখ্য সমাজসেবা মূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি বর্ধমান জেলা কংগ্রেসে প্রথম সহ সভানেত্রীর পদ অলঙ্কৃত করেন। কালনার প্রথম পৌর সদস্য ছিলেন। ৭৯ বছর বয়সে সিরোসিস অফ লিভার রোগে তাঁর মৃত্যু হয়।

সুবোধ মুখোপাধ্যায় ঃ ডাক্তার এবং বিশিষ্ট সমাজসেবক। বর্ধমানের সংস্কৃতি জগতে সুপরিচিত নাম ডাঃ সুবোধ মুখোপাধ্যায়। শহরে রবীন্দ্রভবন প্রতিষ্ঠা, বর্ধমান রবীন্দ্র সংস্কৃতি পরিষদ প্রভৃতি গঠনে ডাক্তারবাবুর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। নিয়মিত সাহিত্য চর্চা করতেন; কবিতা ও নাটক লেখার সাথে সাথে নিজে অভিনয়ও করতেন। বর্ধমান রাজ পরিবারের ইতিহাস নিয়ে তিনি প্রচুর নিবন্ধ লিখেছেন। এ সম্পর্কে "জাল প্রতাপচন্দ" নাটক লিখে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন।

সুধাংশু মোহন ভট্টাচার্য ঃ বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী। পরাধীন ভারতে (১৯৩৪) তিনি বর্ধমান জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাঁর সহকারী সম্পাদক ছিলেন আব্দুস সাত্তার। ১৯৩২ সালে বৃটিশ সরকার তাঁকে কারারুদ্ধ করে। বর্ধমান থেকে দেশপ্রিয় নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করতেন।

সৈয়দ শাহ আলম খাঁ ঃ ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর বাদশাহ ফারুকশিয়ারের আমলে বাংলার নবাব ছিলেন মুর্শিদকুলি খাঁ। সেই সময় ধর্মপ্রাণ সৈয়দ শাহ আলম কার্যোপলক্ষ্যে কাটোয়ায় এসেছিলেন স্বয়ং বাদশাহের নির্দেশে। দিল্লীর বাদশাহের অর্থানুকুল্যেই তিনি কাটোয়ার নীচু বাজারে সুন্দর একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। কাটোয়ায় শাহী মসজিদের সাথেই অমর হয়ে আছে সৈয়দ শাহ আলম খাঁয়ের নাম।

হটী বিদ্যালঙ্কার ঃ (? - আনুঃ ১৮১০) সোয়াই - বর্ধমানে। পিতার কাছে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও নব্য ন্যায় অধ্যায়ন করে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। পরে কাশীতে বিশেষ শিক্ষা এবং টোল স্থাপন করেন। বিদ্যালঙ্কার উপাধি পান। প্রকাশ্যে পণ্ডিত সভায় তর্ক বিতর্কে যোগ দিতেন। পুরুষের মত করে ধুতি পরতেন, মস্তক মুণ্ডিত করে শিখা রাখতেন। চতুষ্পাঠীর পণ্ডিতদের মত তিনিও দক্ষিণা নিতেন। কাশীতেই মারা যান।

হটু বিদ্যালঙ্কার ঃ রূপমঞ্জরী দেখুন।

হরেকৃষ্ণ কোঙার ঃ জন্ম ১৯১৫ সালের ৫ আগষ্ট বর্ধমান জেলার রায়না থানার কামারগড়িয়া গ্রামে। অল্প বয়সেই মেমারীর কাছে দক্ষিণ রাধাকান্তপুর গ্রামে পড়াশোনার জন্য চলে আসেন। নবম শ্রেণীর এই মেধাবী ছাত্র ১৯৩০ সালেই আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেন এবং প্রথম কারাবরণ করেন। শ্রী কোঙার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রী সভায় থাকাকালীন ভূমি সংস্কার আন্দোলনকে তীব্রতর করেন। অথচ তিনিই আবার নীতিগতভাবে নকশাল বাড়ি আন্দোলনকে সমর্থন করতে পারেননি। দেশ-বিদেশে প্রচুর ঘুরেছেন। দেশে - বিদেশে তাঁকে বক্তৃতার জন্য ডাকা হত। তত্ত্ব ও তথ্যকে তিনি সাধারণের উপযুক্ত করে বলতে পারতেন সুন্দরভাবে। মৃত্যু ২৩ জুলাই ১৯৭৪।

হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ঃ জন্ম মেমারী থানার শ্রীধরপুর গ্রামে। কৃষক বন্ধু নামে খ্যাত হরিশচন্দ্র পরাধীন ভারতবর্ষে চাষীদের ওপর নীলকর সাহেবদের অমানুষিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। কৃষকদের ওপর সাহেবদের অত্যাচারের ধারাবাহিক বিবরণ প্রতিবেদনের মাধ্যমে তুলে ধরে হরিশচন্দ্র সারা বিশ্বে কৃষকদের স্বার্থে জনমত গড়ে তোলেন।

হেমন্ত কুমার সরকার ঃ জন্ম ১৮৯৬ সালের ১৭ নভেম্বর। পূর্বপুরুষদের নিবাস ছিল মঙ্গলকোট থানার চিত্রপুর গ্রামে। পুরো নাম ছিল হেমন্ত কুমার দে সরকার। পিতা মদন মোহন দে সরকার। ১৯১২ থেকে ১৯২৪ দীর্ঘ ১২ বছর তিনি নেতাজী সুভাষচন্দ্রের খুবই ঘনিষ্ট ছিলেন। সুভাষচন্দ্র তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনী 'ভারতপথিক' (সিগনেট ১৯৪৮) এ হেমন্তকুমারের কাছে ১৯১২ সালে প্রথম রাজনৈতিক প্রেরণা লাভ করেছিলেন বলে উল্লেখ করেছিলেন। আধ্যাত্মিক গুরুর সন্ধানে সুভাষ এবং হেমন্তকুমার দুই বন্ধু বাড়ি থেকে পালিয়ে (১৯১৪) বৃন্দাবন, কাশী-গয়া প্রভৃতি সফর করেছিলেন। বোম্বাই থেকে এস.এ.ডাঙ্গে প্রকাশিত The Socialist পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক বাংলার কথার সহকারী সম্পাদক ছিলেন। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর তিনি কলকাতা থেকে দৈনিক পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন। কৃষ্ণনগর থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক জাগরণের তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক।